ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

চতুর্দ্দশ বর্ষ

মাঘ, ১৩৪৭—পৌষ, ১৩৪৮

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬নং টাউনসেণ্ড্ রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা

বার্ষিক ২।৵০ ষাণ্মাসিক ১।৵০

রামধনু

(মাঘ, ১৩৪৭—পৌষ, ১৩৪৮)

বিষয়-সূচী

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
অতিকায় মানব ওয়াডলো (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	১০৫
অন্ধকারের আতঙ্ক (শিকার-কাহিনী)	বন্দে আলি মিয়া	৩৭৯
অবাক্ (কবিতা)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্. এ, বি. টি	৩২২
অরুণের গল্প (গল্প)	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্. এ	৫৯৩
অর্থনীতির এক অধ্যায় (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৬
অসি বাজে ঝন্ ঝন্ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৫৪, ৯১, ১২১. ১৮৯, ২৪৪, ২৭৬, ৩৩৫, ৩৯০, ৪৯০, ৫৩১, ৫৭৭
আফিংখোরের সাক্ষ্য (কবিতা)	বন্দে আলি মিয়া	৪৮৩
আব্ হাওয়া ও স্বাস্থ্য (বিজ্ঞানের কথা)	অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি, এম্. বি.	৪৩৯
আমাদের অস্পৃশ্য বন্ধু (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	১৭৬
ইউরোপে গ্রীষ্মের মোহ (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	২৩৯
ইতিহাসের পাতায় যে স্থান পায় নি (গল্প)	শ্রীঅসীম রাহা	২১৭
একটা চৌরিক দুর্ঘটনা (গল্প)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	৩৫৫
একটি ধূসর বস্তু (গল্প)	ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল	৪১
একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা (সত্য ঘটনা)	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ	৫৬৯
একটি রাত (গল্প)	শ্রীমিহির রায়	৫১৯
এক রাত্রের বিভীষিকা (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৭৫
এবারের ফুটবল খেলা (খেলাধূলা)	শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য	৩৬৭
কবিকিশোর (জীবনী)	শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্ চী, এম্. এ	৮৬
কলেজ স্কোয়ার রহস্য (গল্প)	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্. এ	৩৬১
কামান আর গোলার কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২০৭
কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্রজয়ন্তী	...	৩০৫
কৃপণের ধন (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্. এ, বি, টি.	৭০
কে কি পারে	...	২১৮
খাদ্যের অবজ্ঞাত উপকরণ (স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	৫৩৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
খেলাধূলা (খেলাধূলা)	শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮
খোকার পাখী (গল্প)	শ্রীমতী করুণা দেবী	২৩৮
গবেষণা (ঐ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	১৪৫
গালপাট্টার মিয়াদ (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্. এ, বি. টি	৪১৭
গোটের বাড়ীতে ও ভাইমারে (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	২
গোবরে পোকার গুণ্ডামী (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৪২৮
গোলা খা ডালা (ইতিহাসের গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	২২
গোলাপগঞ্জের কয়েদখানা (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৫৪১
চালাকির জয় (কবিতা)	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	২৪৯
চিঠিপত্র	...	৫৭, ১৬১, ২১৯, ৩৭২, ৪৭৯, ৫২৪, ৫৬৭, ৬১৫
ছবি দেখি আর মনে মনে বলি (কবিতা)	শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্ চী, এম্. এ	১
ছুটীর ক'দিন (ভ্রমণ-কাহিনী)	ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্. এস-সি (ক্যাল্) পি-এইচ্. ডি (ক্যান্টাব্)	১৬৮
ছোটখাট ব্যাপার (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২১০
ছোটদের চিত্রশালা	...	৩১, ৩৪৮, ৩৯৭, ৫৬৮
জগৎমোহন (জীবনী)	শ্রী———	৫১
জান কি ?	শ্রীরণেন্দ্রচন্দ্র রায়	২৪৩
জাপানের দীর্ঘপুচ্ছ ময়ূর (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী	৫০৪
ট্যাঙ্কের কথা (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২৬৪
ঠেকে শেখা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী	৬৫
ডাক্তারি প্রহসন (সত্য ঘটনা)	শ্রীরেণুকণা সুর	১৪২
ডায়াটম্ (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য	৩৪৮
তাম্রতত্ত্ব (ঐ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৫৫১
তিমির ব্যবসা (সচিত্র প্রবন্ধ)	ঐ	১৪৭
দুলাল নং ১ (গল্প)	ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল	১৭৯
দেওঘরের স্মৃতি (কবিতা)	শ্রীমাধুরী ঘোষ	১৫৭
ধাঁধার উত্তর		৬২, ১১৩, ১৬৫, ২২১, ২৭৪, ৩২৬, ৩৭৫, ৪২৬, ৪৮২, ৫২৭, ৫৭৩, ৬১৬
ধূমপানের পাইপ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৩০৩
নববর্ষ (কবিতা)	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম. এ, বি. এল্	১৬৭
নানা কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	৪৬৬
নিঝুম দুপুর (কবিতা)	শ্রীবিভাকুসুম চট্টোপাধ্যায়	৫৫০

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
নিরুদ্দিষ্টের দল (ধারাবাহিক উপন্যাস).	শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্. এ, বি. এল্	১২, ১০০, ১৩২, ২১১, ২৫৪, ২৯৮, ৩৪৩, ৪১২, ৫০৮, ৫৬১, ৫৯৯
পুতন ধাঁধা		৬২, ১১৪, ১৬৬, ২২২, ২৭৪, ৩২৬, ৩৭৬, ৪২৬, ৪৮২, ৫২৮, ৫৭৪, ৬১৬
নোটবুক (গল্প) ...	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ ...	১৫২
পঁচিশে বৈশাখ ...	... ...	২৬৭
পাষাণ খোকা (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	৩২৭
পাঁচশ' বছর পরে রবীন্দ্রনাথ	শ্রীনিভা ঘোষ ...	৪৬২
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ...		৫৭, ১৫৭, ২২১, ২৭১, ৩২৫, ৪৮১
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল ...		৫৬, ১৫৬, ২৭২, ৩২৫, ৪২৪, ৫৬৮
পুস্তক পরিচয় ...	... ...	৫৬৩
পূজার উপহার (গল্প) ...	শ্রীদীপেন্দ্র সান্যাল ...	৪৭২
প্রথম প্রাণ (বিজ্ঞানের কথা) ...	শ্রীনিখিলেশ সেন	৩৯৯
প্রফুল্ল জয়ন্তী ..	... ...	৪২৪
ফ্রান্সের একটি সহরে (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায় ...	৫৫৭
বজ্রদেবতার কাহিনী ...	শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী, বি. এ ...	২৫৮
বন্ধুবৎসল ভ্যাণ্টা (গল্প) ...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু, এম্. এ ...	৩৩
বরষায় (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ...	২৭৫
বাগান (কবিতা) ...	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ...	২২৩
বাদল ঝরে (ঐ) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ, বি. টি ...	৩৭১
বাঁদুরে বর (গল্প) ...	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ ...	৪৩৬
বাসিখেকো বাঘ (শিকার-কাহিনী)	বন্দে আলি মিয়া ...	২২৯
বিচার-সভা ...	...	১৬১, ২০৬, ২৭০
বিচিত্র ভারত ...	...	৩২, ৮৩, ১২৮, ৩১৯
বিশ্বকবির তিরোভাব (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ, বি. টি ...	৪৪৮
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ...	... ...	৪৪৫
বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ (জীবন-কথা)...	শ্রীচণ্ডীচরণ দে ...	৪৯৪
বৃষ্টিতে ভেজা (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি ...	৩০২
বেতারে চিত্র (বিজ্ঞানের কথা) ...	শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী ...	৫৮৮
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক ...		১১২, ১৫৯, ২৬৮, ৩২৩, ৩৬৯, ৪২৩, ৫৬৪, ৬১৩
ভারী একটা যুদ্ধের গল্প (গল্প) ...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ...	১৩৬
ভীম ভাসমান মাইন (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৩৫১
ভোলানাথের আত্মবিলাপ (গল্প)...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি ...	৪৯৮

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ভ্যাণ্টার ডাক্তারি (গল্প) ...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু, এম্. এ ...	৪৬৯
মজার বাড়ী ...	... ...	৫৩৮
মণি-মঞ্জুষা ...	...	১০৯, ২১৫
মনিব্যাগ (গল্প) ...	শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়, বি. এস্-সি ...	৫৮২
মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা	... ...	৬১৪
মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল	... ...	৫৬
মহাময়ূর জাতক (জাতকের গল্প)	শ্রীকালিদাস রায়, বি. এ, কবিশেখর ...	৪৩৩
মাটি খোঁড়ার কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্. এ, পি. আর. এস্ ...	৫১২
মাটিং চকার (কবিতা) ...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ, বি. টি ...	৯০
মেনী (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ ...	১১৫
যুদ্ধে গুপ্তচর (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	২৪
যুদ্ধে যাবার [illegible] কবিতা) ...	শ্রীসমর সরকার, এম্. এ, বি. টি, বি. এল্ ...	১৭৪
খোগী (গল্প) ...	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি. এ, এস্-টি-সি ...	৩১৪
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) ...	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্	৩০৮
রবীন্দ্রনাথ (ঐ) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ ...	৪২৭
রবীন্দ্রনাথের আরো গল্প (জীবন-কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৪৫১
রবীন্দ্রনাথের গল্প (ঐ) ...	ঐ ...	৩০৮
রবীন্দ্র-প্রয়াণে (কবিতা) ...	শ্রীহরিপদ গুহ ...	৪৯৭
রামধনু রং (ঐ) ...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	৬৩
রামুর বুজরুকি (বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ বি. এস্-সি ...	৪৪৩
লণ্ডনে (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীঅমলশঙ্কর রায় ...	৩২৮
লাল কোর্ত্তার দল (গল্প) ...	শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়, বি. এস্-সি ...	১৪৪
শরৎ-প্রসঙ্গ (জীবন-কথা) ...	শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় ...	৫৮৪
শাকের আঁটি (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্. এস্-সি ...	৩১৯
শাওন পরী (কবিতা) ...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৭৭
শান্তিনিকেতনে কবির শ্রাদ্ধবাসর ...	শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত ...	৪৫৮
শিশুসাহিত্য-সংবাদ ...		১০৮, ১৫৮, ২৭১, ৩২১, ৩৭২, ৪৭৯, ৫২৩
শীতে (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ, বি. এস্-সি	১৬
শ্রীরামচরিত (গল্প) ...	শ্রীপ্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য ...	৬০২
ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের গল্প (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি ...	৬০৭
সজারু (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ ...	৮৪

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
সতেরো নম্বর বাড়ী (গল্প) ...	শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়	... ৪৭৪
সন্দেশ		৬০, ১১০, ১৬৩, ২২০, ২৭২, ৩২৪, ৩৭৪, ৪২৫, ৪৮০, ৫২৬, ৫৭১, ৬১৫
সবুজ কোটের কাহিনী (গল্প) ...	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্. এ	... ৩৮৩
সবুজ পরী (কবিতা) ...	শ্রীবিমল দত্ত, এম্. এ	... ৫২৯
সমস্যা (কবিতা) ...	শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	... ৩৯৬
সর্ব্বনেশে মাদুলী (গল্প) ...	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ	... ২৯০
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা ...	...	৬১, ৩৭৩
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর ...	...	৮৯, ৪১৬
সাধুর অদ্ভুত ধূমপান (ম্যাজিক) ...	শ্রীদেবকুমার ঘোষাল	... ১৯৫
সান্ত্বনা পুরস্কার (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	... ২৮৩
সামান্য একটা বিরোধ (গল্প) ...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	... ২০২
সুইজারল্যাণ্ডের স্মৃতি (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	... ৪০৮
সুমেরিয় সভ্যতার গোড়ার কথা (ইতিহাস)	শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ	... ২৫০
সুমেরিয় সমাজ ও ধর্ম্ম (ঐ)	ঐ	... ২৮০
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য (ইতিহাস) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	... ১২৯
স্মৃতিতর্পণ (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি. এ	... ৫৬৯
হরিবিলাস বাবুর উপাখ্যান (গল্প)	শ্রীসমর সরকার, এম্. এ, বি. টি, বি. এল্	... ২৬০
হরে মাঝি (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ	২০, ৯৮, ১২৫, ১৯৮, ২২৫, ২৯৪, ৩৪০, ৪০৪, ৪৮৫, ৫৩৯, ৫৯০
হামবুর্গের পথে ও হামবুর্গে (ভ্রমণ-কাহিনী	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	... ১১৬
হাসিকান্না (কবিতা) ...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৪০
হাঁসা ও হাঁসী (গল্প) ...	শ্রীআরতি ঘোষাল	... ২৩৫
হিমেল হাওয়া (কবিতা) ...	শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত	... ৫৭৫

১৪শ বর্ষ   মাঘ, ১৩৪৭   প্রথম সংখ্যা

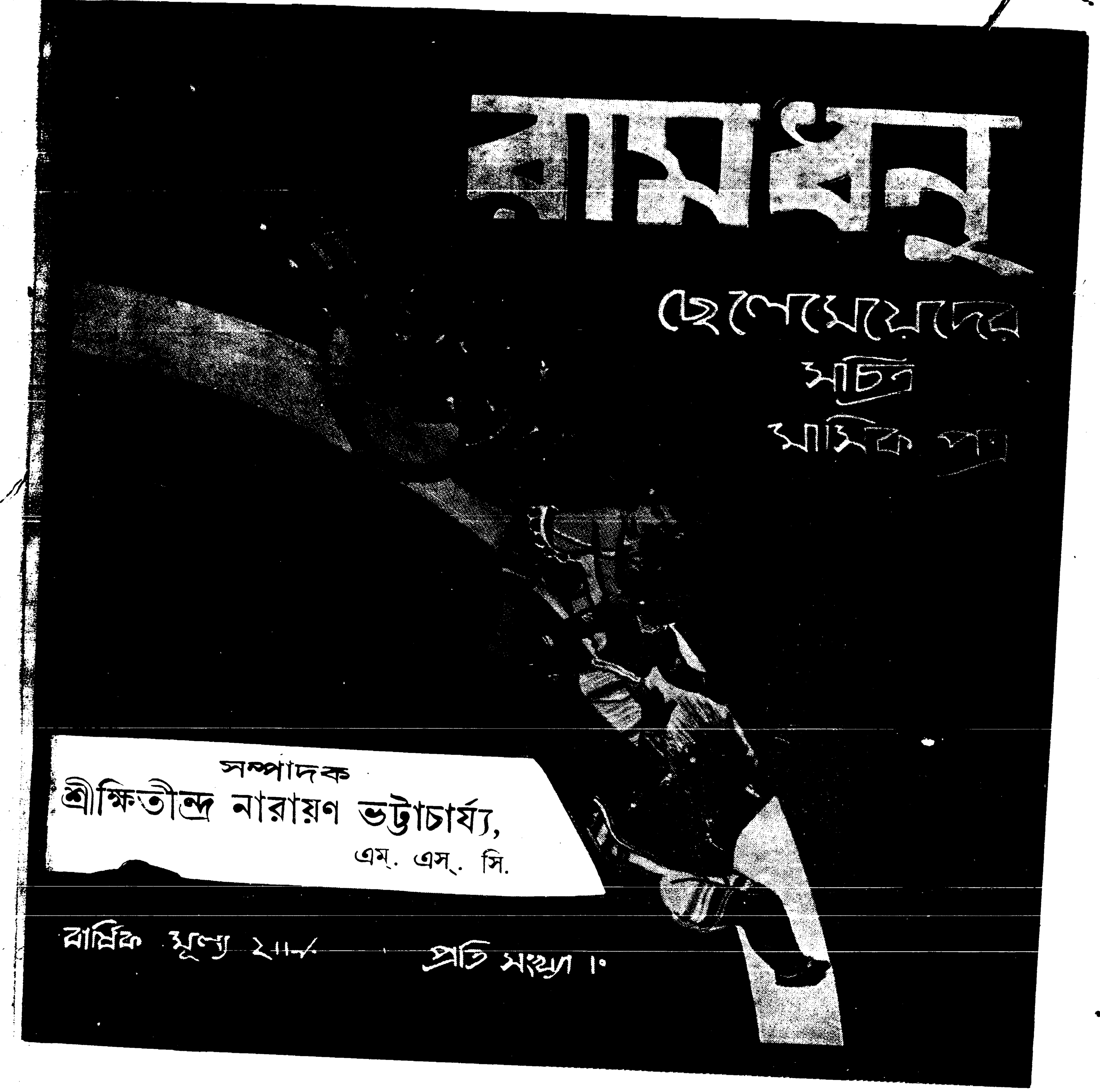

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক	পৃষ্ঠা
সতেরো নম্বর বাড়ী (গল্প)	...	শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়	... ৪৭৪
সন্দেশ	...		৬০, ১১০, ১৬৩, ২২০, ২৭২, ৩২৪, ৩৭৪, ৪২৫, ৪৮০,
	...		৫২৬, ৫৭১, ৬১৫
সবুজ কোটের কাহিনী (গল্প)	...	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্. এ	... ৩৮৩
সবুজ পরী (কবিতা)	...	শ্রীবিমল দত্ত, এম্. এ	... ৫২৯
সমস্যা (কবিতা)	...	শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	... ৩৯৬
সর্ব্বনেশে মাদুলী (গল্প)	...	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ	... ২৯০
সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা	...	...	৬১, ৩৭৩
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর	...	...	৮৯, ৪১৬
সাধুর অদ্ভুত ধূমপান (ম্যাজিক)	...	শ্রীদেবকুমার ঘোষাল	... ১৯৫
সান্ত্বনা পুরস্কার (সচিত্র প্রবন্ধ)	...	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি	... ২৮৩
সামান্য একটা বিরোধ (গল্প)	...	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	... ২০২
সুইজারল্যাণ্ডের স্মৃতি (ভ্রমণ-কাহিনী)		শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	... ৪০৮
সুমেরিয় সভ্যতার গোড়ার কথা (ইতিহাস)		শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ	... ২৫০
সুমেরিয় সমাজ ও ধর্ম্ম (ঐ)		ঐ	... ২৮০
স্বাধীন হিন্দুরাজ্য (ইতিহাস)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ	... ১২৯
স্মৃতিতর্পণ (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি. এ	... ৫৬৯
হরিবিলাস বাবুর উপাখ্যান (গল্প)		শ্রীসমর সরকার, এম্. এ, বি. টি, বি. এল্	... ২৬০
হরে মাঝি (ধারাবাহিক উপন্যাস)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি. এ	২০, ৯৮, ১২৫, ১৯৮, ২২৫,
	...		২৯৪, ৩৪০, ৪০৪, ৪৮৫, ৫৩৯, ৫৯০
হামবুর্গের পথে ও হামবুর্গে (ভ্রমণ-কাহিনী		শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	... ১১৬
হাসিকান্না (কবিতা)	...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৪০
হাঁসা ও হাঁসী (গল্প)	...	শ্রীআরতি ঘোষাল	... ২৩৫
হিমেল হাওয়া (কবিতা)	...	শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত	... ৫৭৫

১৪শ বর্ষ মাঘ, ১৩৪৭ প্রথম সংখ্যা

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

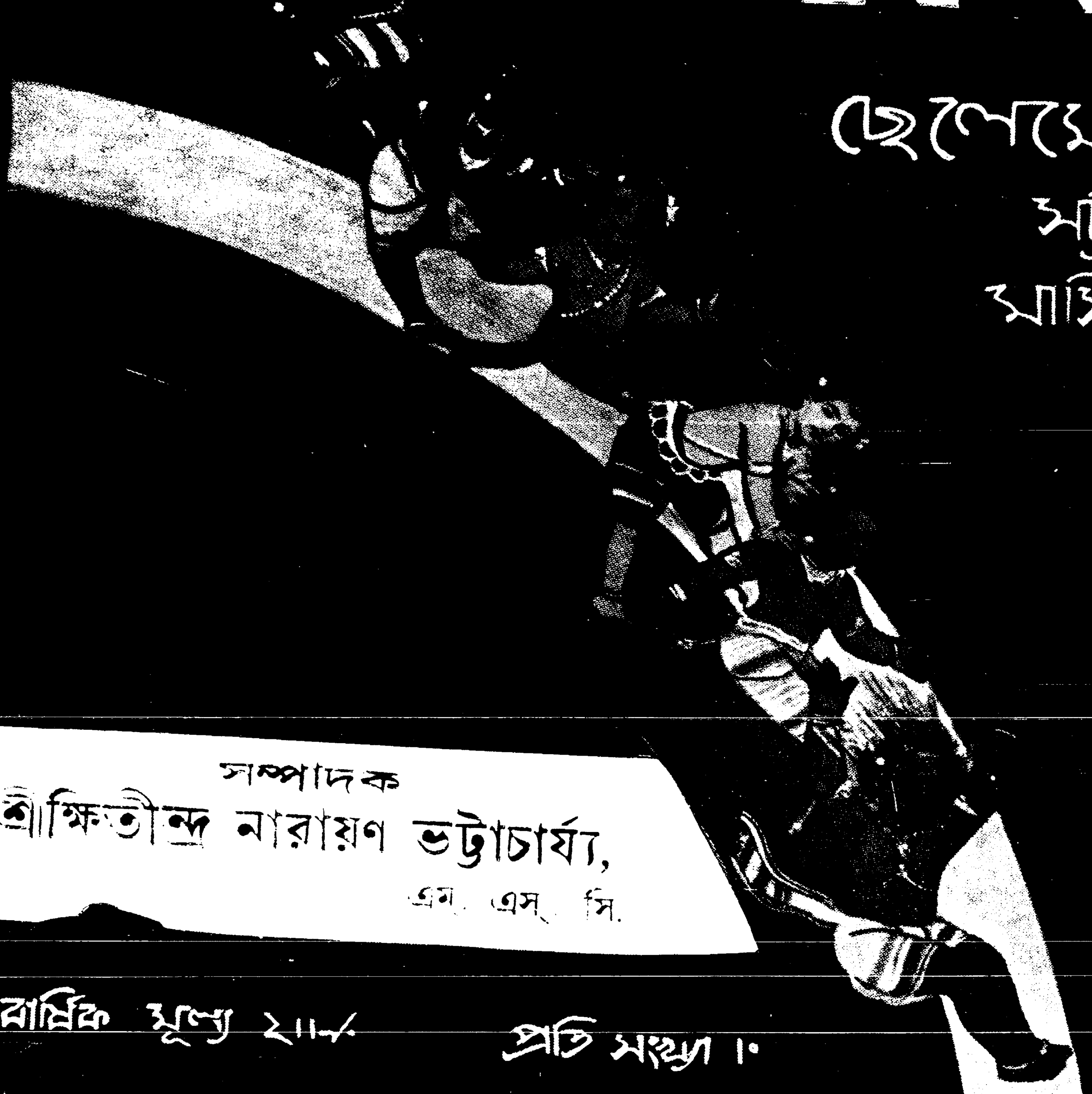

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি.

বার্ষিক মূল্য ২।৵ প্রতি সংখ্যা ।০

কার্য্যালয়
[illegible]৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২[illegible]

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০ ; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

'রামধনু' শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনুমোদিত।

নতুন বছরের রামধনু !

এই মাঘে রামধনু চৌদ্দ বছরে পড়্‌ল।

এ মাসের রামধনুতে যাঁরা লিখেছেন :

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীবুদ্ধদেব বসু
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস
শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল
শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য্য
শ্রীঅমলেন্দু সেন
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং আরো অনেকে

আসছে মাসে যাঁরা লিখবেন :

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস
শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী
শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত এবং
আরো কয়েকজন বিখ্যাত
শিশুসাহিত্যিক

স্কুলের বই

রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের অনেকেই এবার নতুন ক্লাসে উঠলে, তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নতুন ক্লাসের সমস্ত বই-ই আমাদের কাছে পাবে। নিজে এসে বেছে নাও কিংবা আজই ভি. পি. অর্ডার দাও।

রামধনুর যাঁরা পরিচালক, আমাদের দোকানেরও তাঁরাই পরিচালক।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কো., লিঃ
১বি, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা ; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

আমাদের এ বছরের পূজা বার্ষিকী—

এ প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল

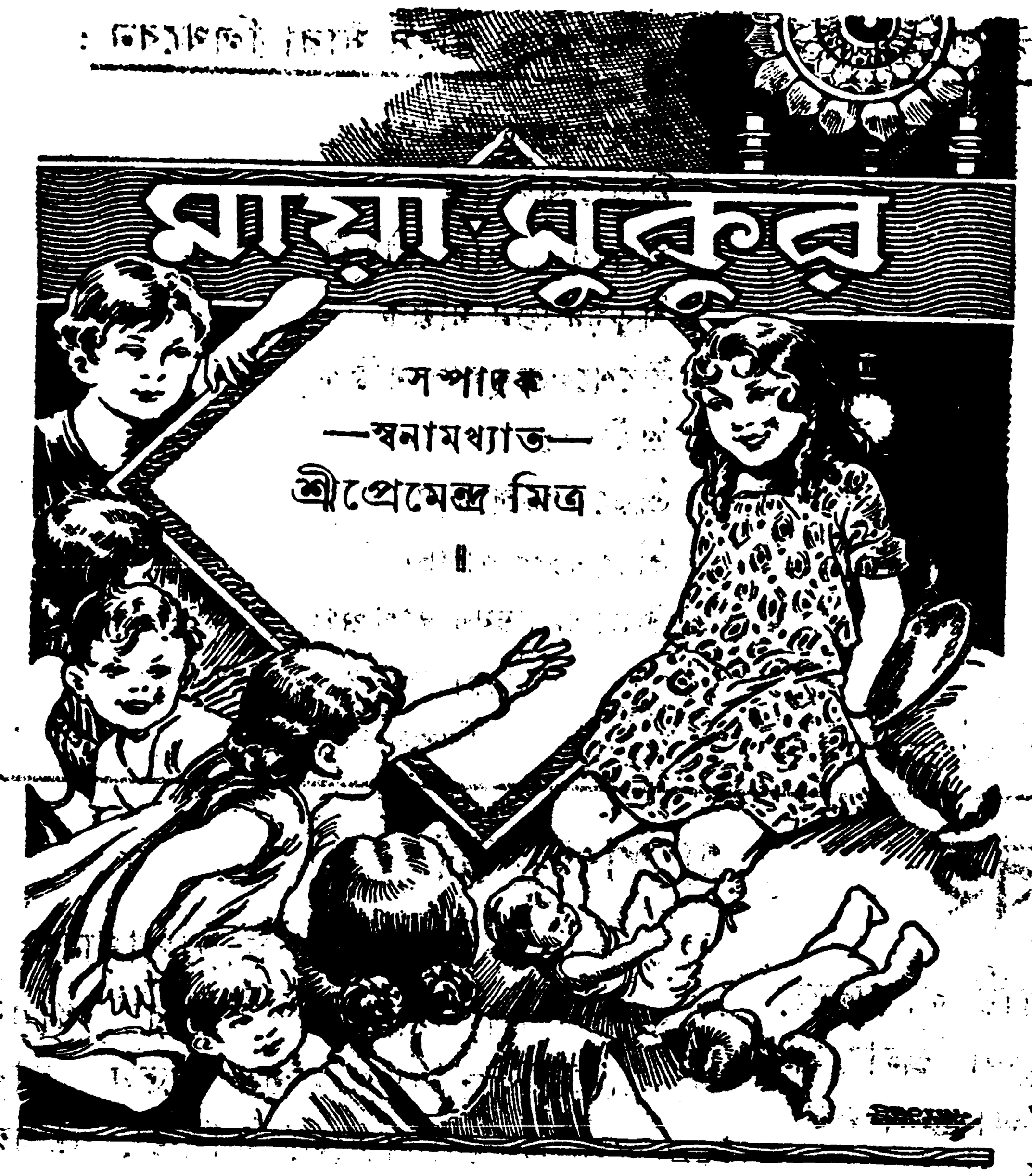

'মায়ামুকুর যে কোন বিলাতী বার্ষিকী অপেক্ষা রূপে, রংয়ে ও লেখায় যে নিকৃষ্ট নহে তাহা পুস্তকটি হাতে পড়িবা-মাত্রই মনে হয়।

অথচ দাম মাত্র— **দেড় টাকা**

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে এরূপ অল্প মূল্যে এমন সুন্দর একখানি পুস্তক যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ দেব সাহিত্য-কুটীরের শিশুদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। বাংলার খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা অগণিত রঙিন ও একরঙা চিত্র ও বিখ্যাত বহু সাহিত্যিকের মধুর রচনায় সমৃদ্ধ এই পুস্তকটি শিশুদের মনের খোরাক তো যোগাইবেই, বড়রাও না পড়িয়া পারিবে না।'—

আনন্দ বাজার

এ ছাড়া অমৃতবাজার পত্রিকা, আহ্লাদ, মাতৃভূমি, এডভান্স, যুগান্তর, মৌচাক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাগজে উচ্চ প্রশংসিত।

বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত

"বলীদের গল্প"

দেশ-বিদেশের পালোয়ানদের সচিত্র কাহিনী অতি সরসভাবে লিখিত, বাংলা দেশে এরূপ বই এই প্রথম। রাশি রাশি হাফটোনচিত্রে শোভিত। মূল্য—১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত

"রঙিন-আকাশ"

রঙ ফলাইয়াছেন কারা জানো, তাঁরাই এখনও পর্য্যন্ত তোমাদের পড়িবার ঘরে আছে, সেই পরিচিত লেখকগণ। (নানা গল্পে, কবিতায় নাটিকায় ছবিতে ছাপাছাপি) দৈনিক কাগজে সমালোচনা বোধ হয় দেখছ। মূল্য—১৲ টাকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

আমাদের সদ্য প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য

—আমরা আজে বাজে বই প্রকাশ করি না—

বীরবাহুর বনিয়াদী চাল
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়
কয়েকটি হাসির গল্পের ডালি। নির্দ্দোষ গল্পে নির্দ্দোষ হাসিই ছেলেদের মনকে সুস্থ ও সরল করে। ।৵০

আদিম দ্বীপে
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
ছোটদের এ্যাডভেঞ্চারের উপন্যাস। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের জন্তু-জানোয়ারের পরিচয় পাবে—তাদের সঙ্গে এ যুগের মানুষের কি ভয়ানক যুদ্ধ। পড়তে পড়তে গা শির্ শির্ করে। ।৵০

ব্যোমদাসের মাদুলি
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বিখ্যাত কথাশিল্পীর শ্রেষ্ঠ গল্পচয়ন। প্রত্যেকটি গল্প মৌলিক—একবার পড়তে বসলে শেষ না ক'রে উঠতে পারবে না। ।৵০

তিন আজগুবি
বন্দে আলী মিয়া
সোহ্‌রাব ও রোস্তম, ঈশ্বর বিদ্রোহী বাদশাহ নমরুদের পরিণতি এবং আর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের ছোটদের সংস্করণ ।৵০

পথের রাত্রি
শ্রীবুদ্ধদেব বসু
কয়েকটি ঝরঝরে গল্পের সমষ্টি। বুদ্ধদেব বাবুর গল্পের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—কেন না, হীরক খণ্ডের পরিচয় দিতে হয় না। ।।০

পাতাল পুরীর আংটি
শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত ।।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
মানুষের উপকার কর ।৵০

শ্রীগৌরাঙ্গ বসু
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি ।৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
ছায়া-কায়ার মায়াপুরে ।৵০

মড়ার মৃত্যু ।।০
শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
ও
শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী

এক রোমাঞ্চকর য়্যাডভেঞ্চার ।৵০

ছোটদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সঞ্চয়ন
সুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

—আরতি—

সব রকমের গল্প, বিজ্ঞান-কথা, কবিতা, নাটক, গাথা, কার্টুন ছবিতে হাসির গল্প প্রভৃতির অপূর্ব্ব সঞ্চয়ন। এ যেন শ্রেষ্ঠ ফুলগুলির মধু-আহরণ। নাম করা চিত্রকরদের আঁকা ছবি।

৪৫৫ পাতার বই
দাম এক টাকা চারি আনা!

প্রাপ্তিস্থান :—ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মোহনতোষ ব্রাদার্স লিঃ

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শাখা—১৩৩এ আশুমুখার্জি রোড, ভবানীপুর

পানবাজার, গৌহাটী, আসাম

ছেলেদের স্বাস্থ্য ও মনস্তুষ্টির জন্য

খোকন ব্র্যাণ্ড ফুটবল—ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট—ক্যারম সর্ব্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল—(ব্লাডার সহ)	ব্যাডমিন্টন (সেট)	**ক্যারমবোর্ড**
	৪ খানা ব্যাট ১টী জাল	(ঘুঁটি ও ষ্ট্রাইকার সহ)
খোকন ১নং ১৷০ ও ১৸০	৩টী সাটেলকক সহ	প্র্যাকটিস—৪৷০ ও ৬৲
ঐ ২নং ২৲ ও ২৷০	প্র্যাকটিস—৬৷০ ঐ	ম্যাচ— ৭৷০ ও ৮৷০
ঐ ৩নং ২৸০ ও ৩৷০	ভাল ৮৷০, বীণা ১০৷০	কম্পিটিসন—১৩৷০ ও ১৬৷০
ঐ ৪নং ৪৷০ ও ৫।০	ভিক্টোরিয়া ... ২৷০	বাগাটেলী—৪৷০ ও ৬৷০
সিল্ড উইনার—৩নং ৪৷০ ও ৫৲	র‍্যাকেট—১।০ ... ১৷০	স্কিপিংরোপ—।০ ও ।৶০
৪নং ৬৷০, ৮৲ ৫নং ৭৷০ ও ১১৲	১৸, ২৷০ ও তদূর্দ্ধ	—০—
ব্লাডার ১নং ৷৶০, ২নং ৸০	সাটেলকক—২।০, ... ৩৲	**হকিষ্টিক্**—ছোট—১৲
৩নং ৸৶০ ৪নং ১৲ ৫নং ১।০	৩৸০ ও ৪৷০ ডজন	মাঝারি—১৷০
পাম্প—১।০, ১৸০ ও ২৷০	জাল—১৲ ১৷০ ও ২৲	বড়— ২৲

বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাইবেন—ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইব।

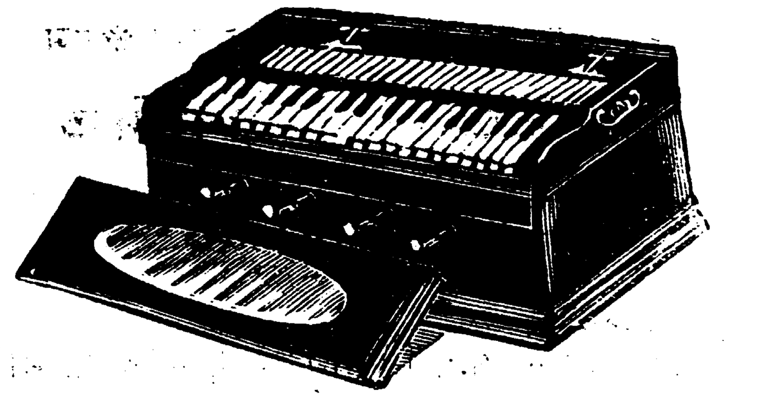

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং-র

হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং

৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বহুচিত্র শোভিত, ছেলেদের হাতে দিবার
মত কয়েকখানি প্রাইজ বই।

একবার দেখিলে আর ভুলা যায় না।

১। আসামের জঙ্গলে—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৷০

২। গুপ্ত শত্রুর জালে—সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী ... ৷০

৩। এ যুগের দৈত্য—হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।৶০

আজই অর্ডার দিন।

এন, এল, পাল এণ্ড কোং

সকল রকমের **বই, কাগজ** এবং **খাতা**
বিক্রেতা

২০৩।২,এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ

হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

হাস্য ও রহস্য

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙিন মলাট। দাম ৷৶০

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস।
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷০

নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৷৶০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক
একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায়
হাসি। দাম ৷৶০

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—
প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ১৲

আবিষ্কারের গল্প

দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী
অভিযান-কাহিনী।
পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৷০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—
পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৷৶০

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—
চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙীন বাঁধাই,
চমৎকার ছবি। দাম—৷৵০

আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—
অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৸১০

ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের"
মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থানঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী

[প্রত্যেকখানি ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত]

ছড়া ও ছবি
৬ষ্ঠ সংস্করণ—তিন আনা

ছবির বই
১৮শ সংস্করণ—চার আনা

নূতন ছবি
১৩শ সংস্করণ—চার আনা

মজার গল্প
১৭শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

আষাঢ়ে স্বপ্ন
১৪শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

খেলার সাথী
১৬শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

রাঙা ছবি
২০শ সংস্করণ—ছয় আনা

হিজিবিজি
৮ম সংস্করণ—ছয় আনা

ছড়া ও পড়া
৪র্থ সংস্করণ—আট আনা

হাসি খুসি
১ম ভাগ
৩৮শ সংস্করণ—মূল্য ।৵০ আনা

—০—

হাসি খুসি
২য় ভাগ
২১শ সংস্করণ—মূল্য ।৵০ আনা

—০—

'বর্ণমালা' ও 'সংযুক্তবর্ণ' শিখাইবার এমন **সহজ, সুন্দর** অথচ **'বিজ্ঞান-সম্মত'** পদ্ধতি আর কোনও বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। অসংখ্য ভাল ভাল চিত্রে সুশোভিত।

—০—

যোগীন্দ্র বাবুর
ছোটদের রামায়ণ
২০শ সংস্করণ—মূল্য আট আনা

ছোটদের মহাভারত
১৬শ সংস্করণ—মূল্য এক টাকা

মোহনলাল
ছেলেদের উপন্যাস—।০ আনা

হাসিরাশি
২০শ সংস্করণ—দশ আনা

হাসি ও খেলা
১৭শ সংস্করণ—দশ আনা

ছোটদের উপকথা
নূতন সংস্করণ—দশ আনা

হাসির গল্প
৭ম সংস্করণ—দশ আনা

ছবি ও গল্প
১৫শ সংস্করণ—এক টাকা

খুকুমণির ছড়া
১০ম সংস্করণ—এক টাকা

জানোয়ারের কাণ্ড
২য় সংস্করণ—এক টাকা

ছোটদের চিড়িয়াখানা
৩য় সংস্করণ—এক টাকা

সিটি বুক্ সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

" কাউকে বলো না আমি লিলির কার্নিভ্যাল বিস্কুট ভালবাসি। "

ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।

কলিকাতা **লিলি বিস্কুট কোং** বোম্বাই

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া
দুর্ব্বল শিশুরা
অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১৷০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৶০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—৷৶০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

স্বর্গ কাশ্মীর

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৪৭ { ১ম সংখ্যা

ছবি দেখি আর মনে মনে বলি কোন্ ছবি !

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্.এ

ছবি দেখি আর মনে মনে বলি
কোন্ ছবি ? কোন্ ছবি ?
পথ চলি আর মনে মনে বলি
কা'র ছবি ? কা'র ছবি ?

হাল্‌কা তুলির রঙের লেখায়
কোন্ যাহুকর এ ছবি দেখায়—
মনে হয় যেন শুধু চেয়ে থাকি
প্রাণ লভি, প্রাণ লভি।

বনে বনে চলি, ছবি দেখি আর
মনে মনে বলি—কা'র ছবি, কা'র ছবি!

প্রাচীরের 'পরে নত হ'য়ে পড়ে
ঘন ছায়া, ঘন ছায়া—
ঘন বেণুবনে সরু সাদা পথ
কা'র মায়া, কোন্ মায়া—
বন হ'তে বনে এঁকে বেঁকে যায়
দূরের কবিরে টানে ইসারায়,
নিবিড় গহন বনতলে আজি
কা'র ছায়া, কোন্ মায়া?
বনে বনে চলি, ছবি দেখি আর
মনে মনে বলি—কা'র ছায়া, কা'র ছায়া!

গ্যেটের বাড়ীতে ও ভাইমারে

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

জার্ম্মানীতে মহাকবি গ্যেটের বাড়ী দেখবার আমার ভারী একটা সখ ছিল। ভালবাসা মানুষের মনকে এক নতুন ধরণের মোহে আবৃত করে। যাকে ভালবাসা যায় তার সব কিছুই ভাল লাগে। এমন কি তার ব্যবহৃত সব দ্রব্য, তার বাড়ী-ঘর, আসবাব-পত্র, তার কাপড়-জামা সবই মনকে টানে। মহাকবি গ্যেটেকে ভালবেসেছি তাঁর 'ফাউষ্ট' নাটক পড়ে। তাঁর নাটকের অদ্ভুত চরিত্র-সৃষ্টি, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও কবিত্ব আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। তোমরা হয়ত এ নাটকখানির সঙ্গে পরিচিত নও, কিন্তু বড় হয়ে নিশ্চয়ই এখানি পড়বে।

গ্যেটে জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু জার্ম্মানী কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

সাহিত্যিকদেরও তিনি একজন। তাঁর পরিচয় তোমাদের নিশ্চয়ই নতুন করে দিতে হবে না। গ্যেটে অবশ্য বহুদিন হ'ল মারা গেছেন। কিন্তু জার্ম্মানরা আজও তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছে। সেই খাট যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শয্যা যেখানে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন সবই রয়েছে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত হয়ে। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাঁর লাইব্রেরীতে টেবিলের ওপর একটি মাথার খুলি ও খানিকটা মাটি রয়েছে। শুনতে পাই মৃত্যুর দিন কয়েক আগে কবি ঐ মাটি নিয়ে কি এক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন।

গ্যেটে শুধু কবিই ছিলেন না। বিজ্ঞান, আইন ও দর্শনশাস্ত্রেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। যথেষ্ট পড়াশুনা করেও তিনি জেনেছিলেন, সব জিনিষ মানুষ জানতে পারে না, কোন কোন বিষয় মানুষের কাছে এখনও একেবারে অজ্ঞাত। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি শায়িত অবস্থায় চীৎকার করে উঠেছিলেন, "আলো, আলো, আরও আলো।" কি ভেবে তিনি ও কথা বলেছিলেন কে জানে!

যে ঘরে গোটে জন্মেছিলেন

কবির ভাইমারের বাড়ীর পিছনে একটি ছোট বাগান। বাগানটিকে যত দূর সম্ভব পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। দু' চারটে গাছে ফুল ধরে ছিল। কবি ফুল খুব ভালবাসতেন। ভাইমারের লোকেরা কবিকে অবসর সময়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে ফুলের বাগানে প্রায়ই বেড়াতে দেখেছে। শুধু ফুলের বাগানেই নয়, শৈশবে তিনি এক আঙুরের ক্ষেতে তাঁর বাবার সঙ্গে প্রায়ই যেতেন। প্রথমে বাগান করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না, কিন্তু প্রায়ই বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসে

তিনি তার ভিতর প্রাণের সন্ধান পেলেন। এমনিই হয়। প্রথমে অনেক জিনিষ চোখে ভাল ঠেকে না, কিন্তু বারে বারে দেখার ফলে সেইটিই ভাল লাগে, মন আপনা-আপনি তার দিকে এগিয়ে যায়।

গ্যেটে ভারতীয় সাহিত্যের খুব উপকার করেন। বিদেশী ভাষার গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করতে করতে কালিদাসের "শকুন্তলা"র অনুবাদ তাঁর হাতে পড়ে। বইখানি পড়ে তিনি এত মুগ্ধ হ'ন যে এর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে ফেলেন। বিদেশে "শকুন্তলা" আগে হয়তো খুব কম লোকেই পড়েছিল, গ্যেটের প্রশংসাসূচক কবিতা পড়ে বহু বিদেশী "শকুন্তলা" পড়তে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে কালিদাসের নাম ইউরোপের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যেটের অন্তিম-শয্যা।

ভাইমারে গ্যেটের বাড়ীর উল্‌টো দিকে কবি শীলারের বাড়ী। শীলারও গ্যেটের একজন মহাভক্ত ছিলেন। জার্ম্মান্ কবিদের মধ্যে অনেকেই গ্যেটের পর শীলারের স্থান দেন। কেউ কেউ আবার লেগীং এবং হায়েনেকেও শীলারের তুল্য বলে গণ্য করেন।

মহাকবি গ্যেটের জীবনী পড়লে অনেক কিছু শেখা যায়। পাণ্ডিত্য, সাহস ও উচ্চ অন্তঃকরণ এ তিনটি গুণই তাঁর ছিল। তিনি বলতেন, কাজের নেশায় ডুবে থাকাই জীবনের সব চাইতে বড় আদর্শ হওয়া উচিত। চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে ক'রে যেতে হবে। যে মানুষ তার চিন্তা ও কল্পনাকে কাজে লাগাতে পারে সেই প্রকৃত মানুষ।

একদিন ভাইমারে গ্যেটের বাড়ীতে তন্ময় হয়ে ঘুরছি এমন সময় এক জার্ম্মান্ বৃদ্ধা এসে আলাপ করলেন। বৃদ্ধা তাঁর দুই নাতি ও নাত্‌নী নিয়ে সেখানে বেড়াচ্ছিলেন আর কবির জীবন-কথা, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে গল্প করছিলেন। ভারতবর্ষের ওপর এঁর গভীর শ্রদ্ধা দেখলাম। বেদ, উপনিষদ্, বৌদ্ধধর্ম্ম ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইনি কিছু পড়াশুনা করেছেন। বল্‌লেন, "প্রাচীন ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য বোধ করি এখন নষ্ট হ'য়ে গেছে। কিন্তু তা'তে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কোন সভ্যতাই চিরদিন টিঁকে থাকতে পারে না। কোন দেশ যদি তার পুরনো সভ্যতা হারিয়ে নতুন কোন সভ্যতায় দীক্ষা নেয় তাতে লজ্জার কি আছে? শুধু দেখতে হবে এই নতুন দীক্ষায় দশের উপকার হয় কি না। এই হচ্ছে প্রকৃত সভ্যতার রূপ।"

মহিলা বল্‌লেন, কোনও বিদেশী যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবির আবাসস্থান দেখতে এসেছে এতে তাঁদের গর্ব্ব বোধ হয়। ভদ্রতা ক'রে তিনি আরও বল্‌লেন যে ইচ্ছা করলে তাঁর ছেলেকে নিয়ে আমি ভাইমারের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানে বেড়াতে যেতে পারি। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হ'ল, বিশেষ কোন কাজে আমাকে সেইদিনই কেম্‌নিট্‌জ্‌এ রওনা হ'তে হবে।

ভাইমার সহরটি খুব পুরনো। খৃঃ নবম শতাব্দীতে এ সহরটি প্রথম গড়ে ওঠে। কত পুরনো দিনের স্মৃতি এর গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে! জার্ম্মানীর ছোট বড় প্রায় সহরেই সহরের মাঝখানে পাথরে গাঁথা একটু জায়গা আছে আর তার পাশে রয়েছে গীর্জ্জা। এইটিই সহরের কেন্দ্র, তাই বড় বড় দোকান-পাট এরই চারদিকে বসে গেছে।

পুরনো হ'লেও ভাইমার সহরটি মনোরম। চারদিকে পাহাড় ও বন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। জার্ম্মানীর শিল্প-প্রধান সহরগুলি ছাড়া এ গুণটি প্রায় সহরেই আছে। ভাইমারে লোকসংখ্যা খুব কম। এখানে দু' একটি মিউজিয়ম্ আছে ছোটখাটো। ড্রেসডেন, মিউনিখ্, লাইব্‌জিক ও বার্লিনের মত মিউজিয়মের ছড়াছড়ি নেই। শিল্প-কেন্দ্রও এটি নয়, তাই এখানকার লোকদের চলাফেরার মধ্যে ক্ষিপ্রতা ও কর্ম্মপ্রবণতা কম।

ভাইমারের প্রধান গীর্জ্জা বিশেষভাবে বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গীর্জ্জাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর। শুনেছি কবি গ্যেটের নিজের তত্ত্বাবধানে এটি তৈরী হয়েছে। এখনও গীর্জ্জার একপাশে চারটি ছোট ছোট ঘর দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি জার্ম্মানীর চারজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্মৃতি রক্ষা করছে—গ্যেটে, শীলার, হার্ডার ও ভিলাণ্ড।

কেমনিট্জ, জার্ম্মানী, ১৯৩৭

অর্থনীতির এক অধ্যায়

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

দরকারটা খুবই জরুরি। এত জরুরি যে হরিদয়ালবাবু এক্ষুণি একটা টেলিগ্রাম ক'রে জানানো দরকার মনে করলেন।

টেলিগ্রাম করার কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই। এর আগে আর কখনো তাঁকে টেলিগ্রাম করতে হয় নি।

অথচ এটা এমনি জরুরি ব্যাপার যে—

অতএব, তাঁর ছোট্ট তেপায়াটার ধারে একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে তিনি বসলেন—তাঁর জীবনের প্রথম টেলিগ্রামটার মুসাবিদা করতে বসলেন।

হরিদয়ালবাবুর জানা ছিল যে তার-বার্ত্তার প্রত্যেকটা কথার জন্য এক আনার মাশুল

লাগে, আর নাকি বারো আনার কমে করা যায় না। তিনটে কথা তার ক'রে পাঠাতেও বারো আনা—আর বারোটা কথার বেলাও তাই।

হরিদয়ালবাবুর এটা ভারী বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয়।

যা হোক্, যাই লাগুক্, টেলিগ্রামটা ছোট করার দরকার—খুব সংক্ষেপেই সার্‌তে হবে—কথা পিছু যা মারাত্মক মাশুল। অবশ্যি তা ব'লে বারোটা কথার কমে তিনি কিছুতেই সারবেন না। দামের দিকে যখন ক্ষতি সইছেন, কথার দিক্ দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেওয়া চাই বই কি। ঠকে যেতে হরিদয়ালবাবু নিতান্তই গর্‌রাজি।

যাই হোক্, অনেকক্ষণ ধ'রে, অনেক কাটাকুটি ক'রে, হরিদয়ালবাবু অবশেষে টেলিগ্রামখানা দাঁড় করালেন—

খুব সংক্ষেপেই খাড়া কর্‌লেন ; অবশ্যি, তাঁর ধারণা মত যথাসাধ্য সংক্ষেপে। এই দাঁড়াল :—

সুনীলকুমার সেন এস্কোয়ার, ২।৩ হলধর বর্দ্ধন লেন, বউবাজার, ক্যাল্‌কাটা।

ডিয়ার স্যর, আই শ্যাল্ বি প্লীজ্‌ড্ টু পুট্ ইউ আপ ফর্ ওয়ান্ মান্থ্ ফ্রম্ দিস স্যাটারডে য়্যাট্ দি টার্ম্‌স ষ্টেটেড্ ইন্ ইয়োর লেটার, ফিফ্‌টি রুপীজ পার্ মান্থ। আই অল্‌সো বেগ্ টু ইন্‌ফর্ম্ ইউ দ্যাট্ ঘাটশীলা ইজ্ বেষ্ট্ প্লেস ফর্ এ চেঞ্জ্ দিস্ টাইম্ অব্ দি ইয়ার্। ইয়োর্‌স ফেথ্‌ফুলি হরিদয়াল ব্যানার্জ্জি, ঘাটশীলা, বি. এন্. আর।

তার পর তিনি কথাগুলো সব গুণলেন। পঁয়ষট্টিটা কথা। তার মানে, চার টাকা এক আনা! যদি আর্জ্জেন্ট টেলি করেন তা হ'লে তো আট টাকা দু' আনার ধাক্কা! শীতের প্রাতঃকালেও হরিদয়ালবাবু ঘেমে নেয়ে উঠ্‌লেন।

না, তিনি অর্ডিনারিই করবেন। আর একবার কথাগুলো তিনি গুণে দেখ্‌লেন। সেই পঁয়ষট্টি! একটাও কমে নি। পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাড়া পাবার খাতিরে, তাও কেবল এক মাসের জন্যে, নগদ চার টাকা এক আনা! হরিদয়ালবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল।

ভাড়াটেকে তাড়িয়ে আন্‌তেই চার চার টাকা খরচ—ভাব্‌তেই হাড় হিম হয়ে আসে। সত্যিই খুবই দুঃসহ, কিন্তু উপায় কি? যদি তাড়াতাড়ি এটা না বাগাতে পারেন, তা হ'লে, হলধর বর্দ্ধন লেনের সুনীলকুমার সেন, এস্কোয়ার, অন্য কোথাও চেঞ্জে চলে যাবেন। চাই কি, এই ঘাটশীলাতেই, অন্য কারো আস্তাবলে এসে উঠ্‌তে পারেন হয় তো। এবং সেটা আরো অসহ্য হবে।

অতএব বৃদ্ধ হরিদয়ালবাবু, তাঁর নব্য নাতিটিকে ডাক দিলেন। সে যদি এটাকে এধারে-ওধারে কেটে-ছেঁটে আরো একটু ছোট-খাটো ক'রে আন্‌তে পারে।

"অলক, অলক, এই অলক !"

অলক আস্‌তেই, মুসাবিদাটা তার হাতে—সঁপে দিয়ে বল্‌লেন—"দেখ্‌ তো, এটাকে চার টাকা এক আনার কমে পাঠানো যায় কি না ?"

অলক টেলিগ্রামখানা পড়ল, প'ড়ে নাক সিঁটকাল, তার পরে মুখ বেঁকিয়ে বল্‌ল—"ও বাবা, এ যে একটা 'এসে' লিখে ব'সে আছ !"

"যাঃ যাঃ, তোকে আর মুরুব্বিগিরি ফলাতে হবে না। এর চেয়ে আরো সংক্ষেপে বানাতে পারিস্ কি না তাই দেখ্‌। খাটো করা অত সহজ নয়। আমি বহুৎ চেষ্টা করেছি। দেখেছি, আর ছোট করা যায় না।"

অলক বল্‌ল : "খুব খুব।"

হরিদয়ালবাবুর কৌতূহল হ'ল। "কই, কর তো দেখি ?" বিস্মিতও তিনি হ'লেন।

"এই যে, এই রকম হবে—" অলক তার প্রৌঢ় দাদুকে প্রাণপণে বোঝাতে সুরু কর্‌ল : "ডিয়ার্ স্যর্, ইয়োর্স্ ফেথ্‌ফুলি এ সব্ দেবার দরকার নেই—এক্কেবারেই না—এ কি তুমি চিঠি লিখ্‌ছ যে—? তার পর, সুনীলকুমার এক কথায় ক'রে দাও—একদম্ সেন পর্য্যন্ত এক কথা, বুঝ্‌লে ?"

"সেন পর্য্যন্ত এক কথা, তা কি হয় ?" হরিদয়ালবাবুর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে।

"বেশ দু' কথায় দিতে চাও দাও, তোমাকেই লোকে 'ইন্‌সেন' ভাব্‌বে : আমার কি ? কেউ কক্ষণো দেয় না কিন্তু। তার পর হলধর বর্দ্ধন লেন, কলকাতা, সেই যথেষ্ট,—বৌবাজার আবার কেন ? বৌবাজার যে কলকাতার মধ্যেই তা কে না জানে ? আর ঘাটশীলা যে বি. এন্ আর-এ তাও জানা কথা। ও সব বাতিল, তা ছাড়া টু, ফ্রম্, ফর্—এ সব কি জন্যে ? সমস্ত প্রিপোজিশন্ একেবারে বাদ, টেলিগ্রামে গ্রামার ভুল হয় না। তার পরে—এটা—এটা কি ? সুনীলকুমার সেনের পরে এইটে ? জড়পুঁটুলি ক'রে পাকিয়ে এটা কি বসিয়েছ, দাদু ?"

"এস্কোয়ার।" আম্‌তা আম্‌তা ক'রে দাদু জবাব দেন।

"এ স্কোয়ার ? স্কোয়ার কেন ? সুনীলকুমার লোকটা কি তা হ'লে চৌকো নাকি ?"

"উঁ হুহু ! সে স্কোয়ার নয়—জিওমেট্রির স্কোয়ার নয়। এ হচ্ছে এস্কোয়ার—ভদ্রলোকদের নামের পেছনে বসাতে হয়।"

"চেহারায় চৌকো না হ'লেও ? তবু—তবু ওটা বাদই দাও বরং। ভদ্রলোক যদি চৌকোস্ হয়, বুঝে নেবে, অপমান জ্ঞান করবে না। আমি ব'লে দিচ্ছি।"

তার পর দু'জনের সম্মিলিত কচ্‌কচি আর কাঁচির সাহায্যে আরো অনেক কথা বাদ পড়্‌ল—অনেকখানিই বরবাদ্ গেল টেলিগ্রামের। টেলিগ্রামের রহস্যটাও ক্রমেই আরও ফিকে হয়ে

আস্‌তে লাগল হরিদয়ালের কাছে—নিজের রচনা-করা কথাশিল্পের ওপরেও দয়ালুতা কম্‌তে লাগল। অলক, 'আই শ্যাল্ বি'—গোড়ার এই তিন তিনটে কথা অম্লানবদনে কেটে দিল দেখেই, তিনি নির্দ্দয়ভাবে 'আই অল্‌সো বেগ্‌ টু ইনফর্ম্ ইউ' থেকে—'দিস্ টাইম্ অব্ দি ইয়ার্' পর্য্যন্ত—মানে, দ্বিতীয় বাক্যটার পুরো এ কোণ থেকে ও কোণ—এ কান থেকে ও কান সমস্তটা কচ্ ক'রে কেটে দিলেন।

দিয়ে বল্‌লেন : "ঘাটশীলা যে চেঞ্জের পক্ষে ভালো এ কথা জানাবার কি দরকার ? সব্বাই তা জানে। আর জানে বলেই তো আসতে চেয়েছে। নাহক্ কেবল টাকা খরচ—নয় কি রে ?"

"ঘাটশীলায় আসা নাহক্ টাকা খরচ ছাড়া আর কি ?" অলক সায় দেয় : "আমার তো কেবল কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে।"

"দূর্, আমি তা বলি নি। টেলিগ্রামে সেই বাহুল্য কথাটা জানানোর বাজে খরচের কথাই বল্‌ছি।"

"টেলিগ্রাম করেই জানাও, আর ঢাক পিটেই জানাও একই কথা।" অলক বলে ; "ঘাটশীলায় এসে থাকা মানেই বোকামি।"

"অনেক তো কাটা গেল—" হরিদয়ালবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন : "এবার আর কি কাটা যায় ?"

কলকাতায় যেতে পারছে না, ঘাটশীলায় এসে পড়ে থাকৃতে হচ্ছে এই ভেবে অলক মুষ্‌ড়ে পড়েছিল, কাটাকুটির কথায় আবার সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে ; কাটা-পড়া টেলিগ্রামটার আগাপাশতলা একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে : "তোমার ল্যাজটা কেটে দাও।"

"ল্যাজ ? আমার ল্যাজ ? সে আবার টেলিগ্রামে কোথায় পেলি ?" হরিদয়ালবাবু ভারী রেগে যান : "দরকারি কাজের সময় ইয়ার্কি হচ্ছে ?"

"ল্যাজ মানে তোমার নামের ল্যাজাটা। ব্যানার্জ্জিটা বাদ দিতে পার। হরিদয়াল বল্‌লেই বুঝ্‌বে।"

"উঁহু, তা হয় না।" নিজেকে খর্ব্ব কর্‌তে হরিদয়ালবাবুর বিশেষ আপত্তি। "উপাধিটাই হচ্ছে জম্‌কালো। উপাধি বাদ দেওয়া যায় না। তাতে আর কত বাড়বে—এক আনাই তো ? তা আমি দিতে পারব।"

উপাধির জন্যে, রাজা-মহারাজা-রায় বাহাদুরদের মত, অর্থব্যয়ে তিনি কৃপণ নন্। পূরো এক আনার ঐশ্বর্য্য—তাঁর পক্ষে নিতান্ত কম নয়, তাও তিনি অকাতরে বিলিয়ে দেবেন ! হয়েছে কি ?

"তা হ'লে নামটাই কেটে দাও। কেবল ব্যানার্জ্জিই যথেষ্ট।"

"উঁহু, তাও হয় না।" হরিদয়ালবাবু ঘাড় নাড়েন: "নাম-কাটা সেপাই আমি হ'তে পারব না।" কেবল উপাধিই নয়, নামের দিকেও তাঁর রীতিমত লোভ রয়েছে।

অলক ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলে: "তা হ'লে কাটাকুটি করতে আমাকে ডাকছ কেন? তুমি নিজেই যখন সমস্ত পার—"

নামজাদা এক সার্জ্জনকে অপারেশন করতে ডেকে এনে যদি নন্-কো-অপারেশন করা হয়—তার মতই অনেকটা মনের ভাব অলকের।

"—তখন আমাকে আর কেন ডাকা?" এই ব'লে ক্ষোভাচ্ছন্ন গলায় মর্ম্মন্তুদ বাক্যটি নিঃশেষ ক'রে অলক বাইরের দিকে পা বাড়ায়: "তা হ'লে আমি চললাম। তুমি নিজেই কাঁচ-কলা কর গে!"

হরিদয়ালবাবু একটুও বাধা দেন্ না। টেলিগ্রাম কি ক'রে বানাতে হয়, এতক্ষণে ভালোমতই তাঁর জানা হয়েছে,—এর পর যা করবার তিনি নিজেই মাথা খাটিয়ে ক'রে নিতে পারবেন। যে নাতি উপাধি-বর্জ্জনের স্বপক্ষে আর নাম-হানি করতেই মজবুদ্, তেমন অপদার্থকে এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। নাতি না তো হাতী একখান্!

অবশেষে টেলিগ্রামটা এইভাবে খাড়া হ'ল:—

'সুনীলকুমারসেন, ২।৩, হলধরবর্দ্ধন লেন, ক্যাল্‌কাটা। প্লীজ্ ড্ পুট্ আপ্ মাস্থ্ স্যাটারডে টার্ম্‌স ষ্টেটেড্ ইয়োর লেটার ফিফ্‌টি রুপীজ্ পার্ মান্থ্, হরিদয়াল ব্যানার্জ্জি, ঘাটশীলা।'

তার পর গুণ্‌তে আরম্ভ করলেন। এখনো বাইশটা! এক টাকা ছ' আনা এখনো!

উঃ! সারা দেহ তো ঘেমে গিয়েছিলই, এখন তাঁর চোখেও জল ছাপিয়ে উঠ্‌ল। নাঃ, আর পারা যায় না। এই ক'টা কথার জন্য এক টাকা ছ' আনা! তিনি বারম্বার শিউরে উঠ্‌লেন।

তার পর, চোখের কোণ মুছে আর একবার তিনি উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। আরো কমানো যায় না কি? আরো কচুকাটা করলে হয় না?

তিনি ভেবে দেখলেন, সুনীলকুমার সেন তাঁর নিজের চিঠিতে যে সব টার্ম্ জানিয়েছেন তা তো তাঁর নিজের জানা থাকবার কথাই,—অতএব তাঁকে আবার ফের তা জানানো কেন? অতএব সুনীলকুমার সেনের চিঠির বিষয় সুনীলকুমার সেনের কাছে উল্লেখ করবার কোন দরকার করে না।

হরিদয়ালবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন—"আঃ।"

হরিদয়ালবাবুর ক্রমশঃই আরও মাথা খুলতে লাগল। তিনি আবিষ্কার করলেন—ওই 'পুট্ আপ্' করবার কথাটাও বাদ দেওয়া যায়। কেননা, কী নিয়ে যে দু'জনের মধ্যে এই সব সংবাদ আদান-প্রদান চলছে তা দু'জনের কারোই অজানা নয় তো!

হরিদয়ালবাবু বললেন—"আহা!" এবং টেলিগ্রামখানা আরও একটু কেটে ফেললেন।

সব শেষে, মুসাবিদাটার এখানে-ওখানে-সেখানে আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে সর্ব্বত্র খোঁচাখুঁচি ক'রে শেষমেষ যা প'ড়ে থাকল তা এই:

'সুনীল ২।৩ হলধরবর্দ্ধনলেন ক্যাল্‌কাটা এগ্রী টার্ম্‌স ষ্টেটেড্ মান্থ্ কমেন্সিং স্যাটারডে হরিদয়ালব্যানার্জ্জি ঘাটশীলা'।

তেরটা কথা তবুও! ঘাটশীলাটা বাদ দিয়ে—ঘাটশীলার আবার কী দরকার? কেননা, কোথায় বাড়ী খুঁজছেন সুনীল সেন তা কি জানেন না? প্রেতশীলায় নিশ্চয়ই নয়!—অনেক হদ্দমুদ্দ ক'রে সবশুদ্ধ বারোটা কথায়—যার থেকে আর কমানো কেবল অনাবশ্যক নয়, অনুচিত—সেই ক'টি মাত্র কথায় হাজির হলেন হরিদয়ালবাবু।

"বিউটি ফুল্!"

হরিদয়ালবাবু অবশ্যি এ কথাটা আর টেলিগ্রামে বসালেন না, মুখেই বললেন কেবল।

"বাহাদুর!"

এই শব্দটা, টেলিগ্রামের বিশেষণে নয়, নিজেকে সম্বোধন করেই তিনি উচ্চারণ করলেন।

আনা বারোয় আনা গেছে অবশেষে।

তার পর কপালের ঘাম মুছে টেলিগ্রাফ আপিসের উদ্দেশে তিনি রওনা হ'লেন।

পথে নিবারণের সঙ্গে দেখা। নিবারণ কলকাতায় যাচ্ছে। তবে আর তার করা কেন? ওর হাতে দিয়ে দিলেই তো চুকে যায়। টেলিগ্রাম কি আর ওর আগে কলকাতা পৌঁছবে?

হরিদয়ালবাবু টেলিগ্রামের কপিটা একটা সাদা খামের মধ্যে পুরে নিবারণবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—"নিবারণ ভায়া, এই টেলিগ্রামটা—মানে—এই চিঠিখানা হলধর বর্দ্ধন লেনের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারবে কি? খুব কি অসুবিধা হবে?"

"না না, এ আর বেশী কি?" আপ্যায়িত হাসি হেসে নিবারণবাবু জানালেন।

হরিদয়ালবাবু খোদাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—"বাঁচা গেল। একটা সামান্য চিঠির ষ্ট্যাম্প্ খরচাও লাগল না। ইকনমিক্‌স পড়া আমার ব্যর্থ হয় নি। একেই বলে অর্থনীতি, বুঝলে বাপু?" নিজেকে অভিনন্দিত করেই তাঁর শেষ প্রশ্নটা নিক্ষিপ্ত হ'ল।

নিবারণবাবু, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর, দু'য়ের তিন হলধর বর্দ্ধনের দ্বার-দেশে এসে করাঘাত করলেন। সুনীলবাবু বেরিয়ে আসতেই তাঁর হাতে খামখানি দিয়ে জানালেন: "ঘাটশীলার হরিদয়ালবাবুর চিঠি।"

চিঠি—অথবা সেই টেলিগ্রাম হস্তগত ক'রে সুনীলবাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন।

"ট্যা লেট্! ট্যা লেট্! আমি অন্য জায়গায় বাড়ী ঠিক ক'রে ফেলেছি। কিন্তু এত দেরি করলেন কেন তিনি খবর দিতে? চিঠির জবাব দিতেই পনের দিন?"

নিবারণবাবু আর কী বল্‌বেন?

"দেখুন, ঘাটশীলা থেকে কলকাতা কমখানি পথ নয় তো—ধীরে সুস্থে আস্‌তে হ'লে পনের দিন লাগে নাকি? আপনিই বলুন!" এই কথা তিনি বল্‌লেন কেবল।

[ধারাবাহিক উপন্যাস]

১

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন ইংরাজী মার্চ্চ মাস। সেই মার্চ্চ মাসের একদিন রাত্রি এগারোটার সময় পৃথিবীর উপর এক মহাপ্রলয় চলিতেছিল। সমস্ত পৃথিবীর খবর আমরা জানি না, আমাদের এই গল্পের সূত্রপাত যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, শুধু সেই স্থানের কথাই বলিব।

সেদিন রাত্রি এগারোটার সময় সীমাহারা এক মহাসমুদ্রের উপর প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত চলিতেছিল। একে দুর্য্যোগময় রজনীর গভীর দুনিরীক্ষ্য অন্ধকার, তার উপর অমন ভয়ঙ্কর ঝড় ও মুষলধার বৃষ্টি, আবার তার উপর রাজ্যের যত কুয়াশা সেই সুদূর সাগর-বক্ষে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। সে এমন ভীষণ অন্ধকার যে দুই হাত তফাতের কোন জিনিষও চক্ষে পড়ে না। সেই কালো গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গগুলি শত শত লোলজিহ্ব ক্রূর সর্পের মত পরস্পরের উপর লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া চারিদিকে শতচির হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

প্রকৃতির এমনি ভয়াবহ রুদ্র-লীলার মাঝে সেই সুদূর মহাসাগরের উপর দিয়া একখানি

নিতান্ত ছোট্ট জাহাজ মোচার খোলার মত তীব্রবেগে ভাসিয়া চলিতেছিল। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ জাহাজের উপর আসিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাথার উপর তীব্র বৃষ্টিধারা। ঝড়ের দাপটে জাহাজখানা একবার করিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, আবার পরক্ষণেই সমুদ্রের তীব্র স্রোতের মুখে পড়িয়া তীরের মত ছুটিয়া চলে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, এইবার বুঝি এই ক্ষুদ্র জাহাজখানা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। এখন পর্য্যন্ত সমুদ্র যে কেন ইহাকে গ্রাস করে নাই, তাহাই আশ্চর্য্য।

জাহাজখানা নিতান্ত ছোট। সেখানা স্কুনার জাতীয় একটা ক্ষুদ্র দুই মাস্তুল-বিশিষ্ট জাহাজ। এ রকম স্কুনার কখনও মহাসমুদ্রে পাড়ি দেয় না, ছোট ছোট সমুদ্রের উপকূল ধরিয়াই ইহারা চলা-ফেরা করে। কেন যে ইহা এই সুদূর মহাসাগরের উপর আসিয়া পড়িল তাহা এই জাহাজের আরোহীগণও ভালো রকম জানে না। জাহাজখানাও যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি ইহার আরোহীগণও নিতান্ত ক্ষুদ্র। জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে তিনটি ছেলে নিতান্ত নিঃসহায়ের মত চুপটি করিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর; অন্য দুইটির বয়স তেরোর বেশী নয়। এই তিনজন ছাড়া জাহাজের চাকার নিকট বসিয়াছিল আর একটি ছেলে। এটি নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মাওরিদের ছেলে। ইহারও বয়স মাত্র তেরো বছর। এই চারিটি ছেলে মিলিয়া প্রাণপণে জাহাজখানিকে ঢেউ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রতি মিনিটেই এক একটা পাহাড় সমান ঢেউ আসিয়া জাহাজখানির উপর আছড়াইয়া পড়ে, আর সেই সাহসী মাওরি ছেলেটি অসীম চেষ্টার সহিত হাল ঠিক ভাবে ধরিয়া ঢেউ কাটিয়া চলিতে থাকে। হালখানা যে কেন এখনো খুলিয়া গেল না, তাহাও আশ্চর্য্য! রাত্রি দুইটার পর হইতে ঝড়, জল ও ঢেউএর প্রতাপ যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। এক একটা ঢেউ আসিয়া জাহাজের উপর পড়ে, আর ছেলেগুলিও হুড়মুড় করিয়া ডেকের উপর শুইয়া পড়ে। ছেলেগুলির মনে অসীম সাহস বলিতে হইবে; নচেৎ সাধারণ ছেলে হইলে এতক্ষণে ভয়েই তাহারা মরিয়া যাইত। আবার হালও ঠিক ভাবে ধরা না হইলে এতক্ষণে জাহাজও সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হইত। এখানে ছেলে ক'টির একটু পরিচয় দেই। প্রথম তিনটি ছেলের নাম, যথাক্রমে, সুশান্ত, অশোক ও রঞ্জিৎ। মাওরি ছেলেটির নাম বুনো। ছেলেগুলির মুখে অনেকক্ষণ কোন কথা ছিল না। তাহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া প্রকৃতির সেই তাণ্ডবলীলা দেখিতেছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

অনেকক্ষণ পরে অশোক প্রথম কথা কহিল। সে সুশান্ত নামক ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"জাহাজ চল্‌ছে কি থেমে আছে কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সুশান্ত!"

সুশান্তর বয়স চৌদ্দ, অর্থাৎ সকলের বড় সে। সে অশোকের কথায় উত্তর দিল—"জাহাজ চল্‌ছে বলেই তো মনে হচ্ছে। রঞ্জিৎ রঞ্জিৎ, খুব চেপে ধর, সামনে প্রকাণ্ড এক ঢেউ! বুনো বুনো, দেখো জাহাজের মুখ যেন ঠিক থাকে।"

সুশান্তের কথা শেষ হইতে না হইতেই এক প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজের উপর আসিয়া পড়িল। বুনোর দক্ষতায় জাহাজ সেই ঢেউ কাটিয়া ভাসিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই ডেকের উপরিস্থিত একটা কামরার তুয়ার খুলিয়া তুইটা নূতন মুখ বাহির হইয়া আসিল। তাহারাও ক্ষুদ্র বালক মাত্র। বয়সেও আরো ছোট। তাহাদের সঙ্গে আবার একটি কুকুর ছিল। ভয়ে সে তখন কেবলই ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া সুশান্ত বলিল, "ধ্রুব, বাব্‌লু, তোমরা বাইরে আস্‌ছ কেন? যাও, শীগ্‌গির ঘরের ভিতর যাও। বাব্‌লু, কেঁদো না, কোন ভয় নেই। যাও, চোখ বুজে ভিতরে ব'সে থাক গে, যাও!" সুশান্তের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঢেউ সশব্দে জাহাজের পার্শ্বদেশে ভাঙিয়া পড়িল। ওদিকে আবার ঘরের তুয়ার খুলিয়া আর একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল। এটির নাম শঙ্খচূড়—বয়সে আগের ছেলে তুটির চেয়ে কিছু বড়; তবে অশোক ও রঞ্জিতের চেয়ে ছোট। অর্থাৎ শঙ্খচূড়ের বয়স তেরোর বেশী নয়।

শঙ্খচূড় বাহিরে আসিয়া অন্ধকারের মাঝে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সুশান্ত, আমি ভিতরে না থেকে তোমাদের সাহায্য কর্‌ব?"

সুশান্তও সমস্বরে চীৎকার করিয়া উত্তর দিল, কারণ চীৎকার না করিয়া কথা কহিলে তখন একে অপরের কথা শুনিতে পাইতেছিল না,—"শঙ্খচূড়, তুমি ভিতরে যাও, তোমার সাহায্যের এখন কোন দরকার নেই। আর কমলাক্ষ, কুণাল, নীলাদ্রি, রোহিতাশ্ব—তোমরা সব ভিতরে ব'সে কি করছ? ছোট ছেলেগুলো যে ভয়ে কাঁদ্‌ছে, তাদের কি একটু থামিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছ না?"

শঙ্খচূড় আবার কামরার মধ্যে প্রবেশ করিল ও সশব্দে তুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

পাঠক-পাঠিকারা এতক্ষণে নিশ্চয় অবাক্ হইয়াছ? এই সুদূর মহাসমুদ্রের উপর, এই শীতজর্জ্জর অন্ধকার মধ্যরাত্রির মাঝে, এই দারুণ ঝড়-জলের ভিতর এতগুলি ভারতীয় ছেলে কোথা হইতে আসিল! বাস্তবিক বড় আশ্চর্য্যের কথা। জাহাজটির আরোহীগণ সকলেই ক্ষুদ্র বালক মাত্র। তাও, একটির বয়স চৌদ্দ, তুইটির বয়স তেরো, পাঁচ ছয়টির বয়স মাত্র বারো, আর বাকিগুলির কাহারও দশ, কাহারও নয়, কাহারও বা আট বৎসর মাত্র। কথার সুরে ও ব্যক্তিত্বের

ব্যঞ্জনায় সুশান্ত ছেলেটি যে তাহাদের দলপতি তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। আর সুশান্তের পরই যে রঞ্জিৎ ও অশোকের স্থান তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। আর বুনো তাহাদের দক্ষিণ হস্ত; অমন সুন্দর নৌকাচালনা তাহাদের মধ্যে আর কেহই জানে না; তাহা ছাড়া বুনোর গুণ অনেক। কিন্তু তাহার আসল গলদ—সে জঙলী মাওরী জাতের ছেলে। কাজেই তাহার কোন স্থান বা পদমর্য্যাদা নাই। তাহা না হইলে, সুশান্ত, অশোক ও রঞ্জিতের পরই তাহার স্থান হইত।

জাহাজটির ক্ষুদ্র আরোহীগণের সংখ্যা কয় জন জান? সব শুদ্ধ পনেরোটি। বাহিরে চারিজন আর ঘরের ভিতরে এগারো জন। এই পনেরো জন বালক ব্যতীত জাহাজে আর কোন পুরুষ বা অন্য কোন নাবিক নাই। আবার সব চেয়ে তুঃখের বিষয়, এই ছেলেগুলির একটিও জাহাজ চালনার কিছুই জানে না; অথচ জাহাজখানিকে লইয়া তাহারা এই মহাসমুদ্রের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। তার উপর তাহারা জানে না পৃথিবীর কোন্ অংশে এখন তাহাদের জাহাজ চলিয়াছে? শুধু এইমাত্র জানে যে তাহারা এক মহাসমুদ্রের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আবার তাহা যে সে সমুদ্র নয়, প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রশান্ত মহাসাগর! এই বহু দূরপ্রসারী সীমাহারা নীল নির্জ্জন মহাসাগরের কি আর শেষ আছে? ইহার মাঝে কত লক্ষ লক্ষ দ্বীপ! কত পুঞ্জীভূত প্রবাল-স্বর্গ! আর ইহার গভীরতাই কি নিঃসীম। এমন অগাধ অতল মহাসমুদ্র পৃথিবীতে আর একটিও নাই। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের এক উপকূল হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার আর এক উপকূলের বিস্তৃতি কত জান? ছয় হাজার মাইল। এই ছয় হাজার মাইলব্যাপী নীলকান্ত মহাসমুদ্রের কথা তোমরা কল্পনাও করিতে পারিবে না। এই ছয় হাজার মাইলব্যাপী মহাসমুদ্রের উপর আর এক ছয় হাজার মাইলব্যাপী নীল নির্জ্জন মহাকাশ সাগরের সুনীল জলের উপর কি সুন্দর স্বপ্নের ইন্দ্রজাল বুনিতে থাকে, তাহা কি তোমরা কখনো নিরালায় বসিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ? যখন দিনের শেষে দিগন্ত-যোড়া ক্লান্ত অবসন্ন সন্ধ্যা চারিদিক্ হইতে এই মহাসমুদ্রের উপর ধীরে ধীরে নামিয়া ঢলিয়া পড়ে, তখন সেই গোধূলির আধ-অন্ধকারে এই দিক্‌চিহ্নহীন মহাসমুদ্রের অপার জলরাশি টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করিয়া তুলিতে থাকে। আর মধ্য রাত্রির গভীর অন্ধকারের আবরণে এই প্রশান্ত মহাসাগরের যে কি দারুণ ভয়াবহ মূর্ত্তি হয়, তাহা কি একবারও তোমাদের মনে করিতে ইচ্ছা হয় না! এই প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে এই জাহাজটি কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল? জাহাজের আর সব লোকজন ও নাবিকদের কি হইল? তাহারা কি ঢেউএর মুখে ভাসিয়া গিয়াছে? না, কোন জলদস্যুর হাতে পড়িয়া ইহাদের এমন তুর্দ্দশা হইয়াছে? বোধ হয় তাই, নিশ্চয় কোন মালয় জলদস্যুর দল মাঝসমুদ্রে একখানা বড় নৌকার উপর ইহাদের নামাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে! নচেৎ এমন সুদূর সমুদ্রের উপর, এমন একখানা জাহাজে নিশ্চয় তাহার

ক্যাপ্‌টেন থাকিত, ফাষ্ট মেট্, সেকেণ্ড মেট্ থাকিত, আরো অন্যান্য নাবিকও থাকিত। কিন্তু, সে সব কিছুই নাই! আর এই জাহাজটাই বা কোন্ দেশের? জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া চলিয়াছে তখন নিশ্চয় অষ্ট্রেলিয়ার কোনও বন্দর হইতে ইহা আসিয়াছে। শুধু অষ্ট্রেলিয়ার নামই বা করি কেন? প্রশান্ত মহাসাগরে কত লক্ষ লক্ষ দ্বীপ! তাহাদেরই কোন একটা বন্দর হইতে যে ইহা ছাড়ে নাই তাই বা কে বলিতে পারে? তা ছাড়া জাহাজখানা সমুদ্রের উপর এমনিভাবে যে ক'দিন ধরিয়া ভাসিতেছে, তাই বা কে জানে? সমুদ্রের এই অংশটা নিতান্ত নির্জ্জন। কোন দিকে একটা জাহাজ বা ষ্টীমার বা জনমনুষ্যের কোন চিহ্নই নাই। তাই সুশান্ত ও তাহার বন্ধুগণ জাহাজখানিকে প্রাণপণে ঠিকভাবে চালাইয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আর কিছু দূর গেলে যদি কোন ডাঙ্গার চিহ্ন মেলে।

জাহাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। উহার প্রধান মাস্তলের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সামনের মাস্তলটা তখনও পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল, কিন্তু তাহার পালগুলির অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছিল—এমনভাবে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, যে প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল এইবার বুঝি পালগুলি ফাঁসিয়া যাইবে! বড় মাস্তলটা ঠিক থাকিলেও তাহাতে বড় পালটা লাগনো যাইত, জাহাজের গতিও আরো বর্দ্ধিত হইত। কিন্তু তাহা তো এখন আর সম্ভবপর নয়! জাহাজের গতি তখন সোজা পূর্ব্বদিকে। কোনও দিকে একটা ছোট দ্বীপও চোখে পড়ে না; মহাদেশের উপকূল ত দূরের কথা।*

(ক্রমশঃ)

শীতে

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি এস্-সি

আমাদের দেশে (আমাদের দেশে কেন, সর্ব্বত্রই, এবং তোমাদের মধ্যেও) এমন একদল লোক আছে যারা শীত পড়িলেই রীতিমত ঘাবড়াইয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকদের চলতি কথায় আমরা বলি "শীত-কাতুরে"। ইহারা শীত একদম সহ্য করিতে পারে না, কেউ কেউ আবার সমস্ত শীতকাল ধরিয়াই সর্দ্দি-কাসিতে কষ্ট পায়। এবারেও বেশ শীত পড়িয়াছে, কাজেই এ সময়ে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতে পারে।

* একটি বিখ্যাত বিদেশী উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ।

শীতের সঙ্গে লড়িবার প্রধান উপায় অবশ্য কাপড়-জামা। অনেকের ধারণা পশমী কাপড় না হইলে শীতের সময় চলে না। এ ধারণা ভুল। প্রসিদ্ধ পদার্থ-বিদ্যাবিদ্ লর্ড কেল্‌ভিনের নাম তোমরা সবাই জান। কেল্‌ভিন সাহেব একবার জাহাজে চড়িয়া শীতসমুদ্রে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার পরনে কিন্তু ছিল পাৎলা সূতি-কাপড়ের পোষাক। দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। একজন ইহার কারণ জানিতে উৎসুক হওয়াতে কেল্‌ভিন নিজের ভিতরকার জামা একটু দেখাইলেন। দেখা গেল, পাৎলা কাপড়ের অনেক স্তর জামা তাঁহার গায়ে। তিনি বলিলেন, তিন-চারটি উপরি উপরি পরিহিত পাৎলা জামার সঙ্গে তিন-চারটি বাতাসের স্তরও শরীরের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে; এই বাতাসের স্তরই সব চেয়ে ভাল "তাপ-অপরিচালক"—ইংরাজীতে যাহাকে বলে "নন্‌কণ্ডাক্‌টার অব্ হীট্"। আমাদের দেশে পূর্ব্বে লোকে শীতের সময়ে তূলা ও পাৎলা কাপড়ে তৈরী বালাপোষ গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করিত। পশ্চিমের বেশী শীতের সময়ও সেখানকার লোকেরা বালাপোষের জামা ব্যবহার করিত। কাবুলীওয়ালাদের ও কাশ্মীরীদের পায়জামা সূতার তৈরী, কিন্তু উহা খুব ঢাউস ও ভাঁজ-যুক্ত হওয়ায় অনেকটা অচল বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। ফলে শরীর হইতে তাপ বেশী বাহির হইতে পারে না—শরীর বেশ গরম থাকে। বাঙ্গালী বয়স্ক ব্যক্তিগণ যে কোঁচা গুঁজিয়া কাপড় পরেন তাহা শীতের পক্ষে বেশ উপযোগী। দোমড়ান কোঁচার ভাঁজে অনেকটা বায়ু আবদ্ধ থাকে, তাহাতে পেটের নীচেকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ গরম থাকে।

গেঞ্জি আজকাল বেশ সস্তা। দুইটী গেঞ্জি ব্যবহার করিলে একটা পশমী সোয়েটারের মত গরম হয়। শীতের সময় অনেকে মাথা বা কান ঢাকা দিয়া থাকে। কিন্তু শরীরের ধড় অংশটাকে যদি ভাল করিয়া গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা যায় তাহা হইলে মাথা বা কান ঢাকিবার কোনও প্রয়োজন থাকে না; শরীরের গরম অংশের রক্ত উক্ত স্থানগুলিকে গরম রাখে। আজকাল কেহ কেহ অতি শীতের দিনেও ঘরের জানালা-দরজা খুলিয়া বা বারান্দায় নিদ্রা যান। কাহারও কাহারও উহা খুব শক্ত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। একটু বেশী তূলাযুক্ত মোটা লেপ ব্যবহার করিলে, বা একটা লেপের

উপর একটা কম্বল ব্যবহার করিলে, কিংবা গোটা দুই গেঞ্জি গায়ে দিলে ব্যাপারটা একবারেই সোজা হইয়া যায়। এরূপ ভাবে শোয়া একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর সহজে ঠাণ্ডা লাগে না—সর্দ্দি-কাসিও হয় না।

উপযুক্ত আহারের নিয়ম করিলে শীতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। প্রোটিন খাদ্যের শরীরের তাপ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা খুব বেশী। কার্ব্বোহাইড্রেট খাদ্য (চিনি, শ্বেতসার) ব্যায়ামকালে শরীরের তাপ বৃদ্ধি করে। প্রোটিন খাদ্য কিন্তু শরীরের মধ্যে গিয়া পরিশ্রম না করিলেও—আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া শরীরের মধ্যে প্রচুর তাপ উৎপাদন করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ডালে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। খিচুড়ী খাইলে শরীর বেশ গরম হয়। প্রচুর মাংস খাইলে শীতের দিনেও গা জ্বালা করে।

কিন্তু কতক লোক আছে যাহারা যথেষ্ট মাত্রায় মাছ, মাংস, দুধ, ঘি খায় এবং সর্দ্দি-কাসিতেও ভোগে। এরূপ লোকের সর্দ্দি-কাসির কারণ অতি-ভোজন। উহাদের যকৃৎ-যন্ত্র প্রায়ই দুর্ব্বল। যকৃৎ শরীরের অনেক কাজ করে; প্রোটিন, কার্ব্বোহাইড্রেট এবং ঘৃত জাতীয় খাদ্যের বিবিধ পরিণামক্রিয়া ঐ যন্ত্রের দ্বারাই সংসাধিত হয়। শরীরে বিবিধ ব্যাকৃটিরিয়া বিনাশকারী "য়্যাণ্টিটক্সিন্" নামে ওষুধ সৃষ্টি করাও যকৃতের একটি কাজ। যাহারা অতি-ভোজন করে অথচ পরিশ্রম করে না তাহাদের যকৃৎ কার্ব্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন দ্বারা ভর্ত্তি থাকায় সম্যক্ মাত্রায় য়্যাণ্টিটক্সিন্ প্রস্তুত করিতে পারে না। এ কারণে ঐ সকল ব্যক্তি সর্দ্দি, কাসি ও অন্যান্য পীড়ায় সহজেই আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ঐ সকল লোকের পক্ষে কম ভোজন হিতকর। তাহাদের খাদ্যে ভাত, রুটি, লুচি, মাছ, মাংস কমাইয়া আলু ও অন্যান্য আনাজপত্র, লেবু প্রভৃতি ফল বর্দ্ধিত করিলে তাহাদের যকৃতের কার্য্য ভাল হইবে। সর্দ্দি-কাসির উপদ্রব কমিবে, শীত সহ্য করিবার ক্ষমতাও বাড়িবে।

পরিশ্রম ও ব্যায়াম শীতসহিষ্ণুতা বাড়াইবার আর একটি উপায়। গরীব বা যারা সারাদিন খাটে তাহারা স্বল্প পরিচ্ছদে আবৃত হইয়াও শীতে তত কষ্ট পায় না যতটা কষ্ট যারা বহু বস্ত্রাবৃত হইয়া বিনা ব্যায়ামে ঘরে বসিয়া থাকে তাহারা পায়। পরিশ্রমের বা ব্যায়ামের আর একটা পরম উপকার যে

উহা দ্বারা যকৃৎ-যন্ত্র সংশোধিত হয়—শরীরের রোগ আক্রমণ রোধ করিবার ক্ষমতা বাড়ে।

স্নান শীতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করিবার আর একটি উপায়। শীতল জলে স্নান করিলে চামড়ার রক্তনলগুলি সঙ্কুচিত হয়; সমস্ত রক্ত চামড়া হইতে শরীরের অভ্যন্তরে চলিয়া যায়; শরীর হইতে অধিক তাপ বাহির হইতে পারে না—এই জন্য শীতকালে স্নানের পর শীত শীত ভাবটা অনেকটা কাটিয়া যায়।

আমি সম্প্রতি শীত সহান' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরীক্ষা করিতেছি। অন্য কেহ এ পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল জানাইলে সুখী হইব। আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র। সাধারণ অনেক লোকের পক্ষে নিজেদের ও ছেলেমেয়ের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় পশমী কাপড় কিনিবার সঙ্গতি নাই। সস্তা পশমী কাপড়ের মধ্যে অনেক ভেজাল থাকে, এ জন্য সেগুলিতে তেমন শীত নিবারণ হয় না অথচ দামও বেশী পড়ে। অতএব সস্তায় শীত নিবারণের উপায় বাহির করিতে পারিলে দেশের উপকার হইবে।

আমার পরীক্ষা এই : তিনটী গেঞ্জি (দাম ৩×।৶০=১।/০) পর পর পরি। তার উপর পরি একটি সাদা সূতির পাঞ্জাবী। এই ভাবে এ বছর ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমার সান্ধ্য ভ্রমণ (মাঠে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত) চালাইয়াছিলাম। সম্প্রতি ঐ পোষাকের উপর একটা র‍্যাপার ব্যবহার করিতে হইতেছে। কোনও রূপ পশমী জামা, সোয়েটার বা গেঞ্জি ব্যবহার করিতে হয় নাই, এবং এখন পর্য্যন্ত কোনও অসুবিধা বোধ হয় নাই।

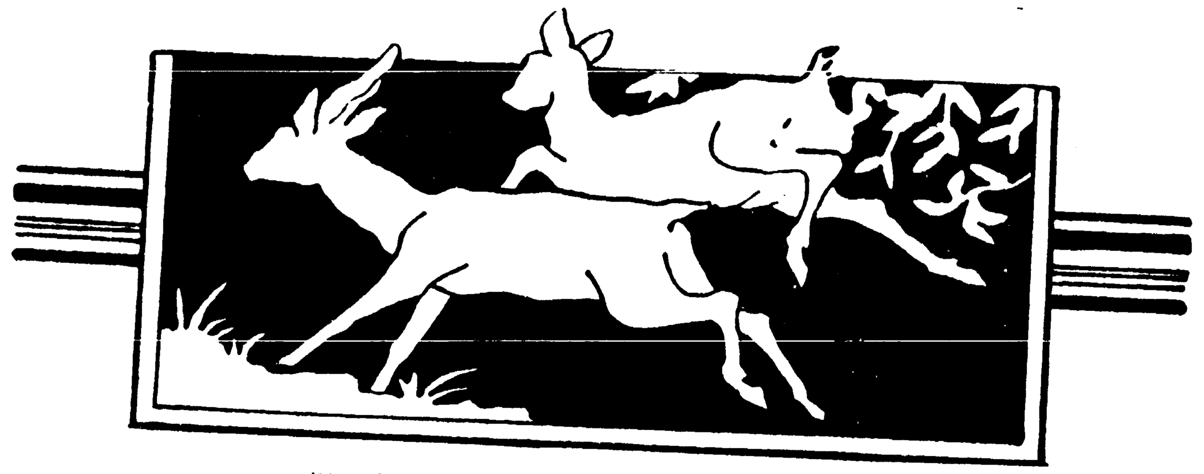

হরে মাঝি

[সত্য ঘটনামূলক উপন্যাস]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

অজয়ের তীরে একটা বন ছিল, তার নাম 'কুঁচলারি' বন। সে বন এত নিবিড়, এত ঘন শ্যামল যে সেখানে দিনের বেলাতেই সাঁজের মত আঁধার। বন্য শূকর, শৃগাল প্রভৃতি বন্যজন্তুর সেটা ছিল বিশ্রামাগার। বনে নানা রকম পাখীর বাসা ছিল, সন্ধ্যায় ও প্রভাতে বন তাহাদের বিচিত্র কাকলীতে মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই বনের পশ্চিমে একটা উঁচু জায়গায় গ্রামের প্রান্তে ছিল হরে মাঝির বাড়ী। হরে জাতিতে মেটে বাগ্দী,—বেশ উচ্চ শ্রেণীর, সেইজন্য তার একটা আভিজাত্যের গর্ব্ব ছিল। সে ছিল 'থানা ঘাটে'র খেয়ারী; তার বড় বড় দু'খানা নৌকা ছিল। হরির ছেলে অখিলই ঐ ঘাটে থাকিত, হরি ছিল গোপনে একজন প্রসিদ্ধ জলদস্যু। তার ঘরগুলি তক্তকে ঝক্ঝকে, চালে 'তরুলতা' ফুলের রাঙা শোভার সমারোহ, আঙিনায় শিউলি ও নয়নতারা ফুলের গাছ। হরির চেহারা বীরত্বব্যঞ্জক, দুটী অতি উজ্জ্বল চক্ষু, বাহু দীর্ঘ ও সবল, মাথায় বাবরী চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরিধানে সাধারণ কাপড় কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন। তার গান-বাজনারও বেশ সখ ছিল। অজয়ে হরপা পড়িলে, সেই রাঙা জলের প্রলয় নৃত্যের মধ্যে নৌকায় পাড়ি দিতে হরির সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। সে শশক শিকারে যোগ দিত না, কিন্তু বন্য শূকর শিকার করিতে পটু ও অগ্রণী ছিল। দুর্ব্বলের প্রতি তার একটা সহজাত স্নেহ ও মমতা ছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের। তখন ইংরাজ রাজ

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে কিন্তু ডাকাতি ও মানুষ মারার উপদ্রব তখন খুব প্রবল। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ঐরূপ দল ছিল। ধনী ও জমিদারগণ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং দ্বিধাহীন চিত্তে লুটের টাকার অংশ লইতেন।

বর্দ্ধমান জেলায় নরজা, কর্জ্জনা, গর্দ্দানমারী, ওর গ্রামের ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান তখন ভীতিসঙ্কুল ছিল। যাতায়াত মোটেই নিরাপদ ছিল না।

হরি মাঝি বর্দ্ধমানের একটী ক্ষুদ্র পল্লীতেই জন্মগ্রহণ করে। গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেষ্টনীর মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও কেন যে সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল তাহা বুঝা কঠিন। তাহার আকৃতিতে ও আচরণে তাহাকে দস্যু বলিয়া সন্দেহ করিবার শক্তি অতি বড় বুদ্ধিমানেরও ছিল না। গ্রামের লোকে তাকে ভালবাসিত, সে নির্ব্বিচারে ধনী-দরিদ্রের উপকার করিত। তার চরিত্র ছিল নির্ম্মল। সে যখন গাহিত—

"মন রে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

তখন গ্রামবৃদ্ধেরা তন্ময় হইয়া সে গান শুনিতেন। তার দু'জন সাকরেদ ছিল দীনু আর তিনু। তাহারা সঙ্গীতে তার সহকারী ছিল এবং গোপনে ছিল দুই জন উৎকৃষ্ট 'কালীর পাক'।

চৌকী কাটোয়ায় 'শালোণ্ডা' গ্রামের রায়েরা তখন বিখ্যাত ধনী ও জমিদার, সমস্ত ডাকাতদের লোলুপ দৃষ্টি এড়াইয়া তাঁহাদের অর্থ ও বিভব বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাঁহাদের পাইকেরা বড় বড় লাঠিয়াল, তাহাদের সহিত মোহড়া দিতে কোন সর্দ্দারই সাহস করিত না।

একবার কোগ্রামে বক্সী মহাশয়দের বাড়ী একটা খুব ধূমধামের বিবাহে জেলার শ্রেষ্ঠ রায়বেশে দল সমবেত হয়। তাহাদের খেলা দেখিতে দূর দূর গ্রাম হইতে বহু লোক ও বহু খেলোয়াড় আসে। শালোণ্ডার রায়েদের পাইক সুবল ও বিনোদ খেলায় খুবই সুখ্যাতি লাভ করে কিন্তু তাহাদের পরাজয় ঘটিল হরির সাকরেদ দীনু ও তিনুর কাছে। চতুর্দ্দিকে একটা জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। সকল রায়বেশে দল একবাক্যে দীনু-তিনুর নৈপুণ্য ও শারীরিক বলের প্রশংসা করিতে লাগিল। শালোণ্ডার জমিদার-পক্ষ হইতে পাইকের চাকুরী লইবার জন্য তাহাদের আহ্বান আসিল কিন্তু তাহারা বক্সী মহাশয়দের প্রজা, গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরী লইতে স্বীকৃত হইল না। হরিও বক্সী মহাশয়দের প্রজা, সে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত।

হরি কখনো রায়বেশে নাচে যোগ দিত না। সে স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল, তাহাকে ভদ্রলোকেরাও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। (ক্রমশঃ)

'গোলা খা ডালা'

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

এই কাহিনীর শিরোনামা দেখেই তোমরা যেন ভেবে নিও না যে আমি কাউকে ডালা অথবা গোলা খেতে অনুরোধ করছি। কিন্তু যদি ব'লে দি' যে এটা হিন্দী কথা, তা হ'লে তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এর মানে বুঝে নেবে। আর, যারা তা' না পারবে, তা'দের আমি এখন এর মানে না ব'লে একটা গল্প আগে ব'লে নেব'। তাই ব'লে ভেবো না যে এটা বানানো গল্প—এ একেবারে সত্য ঘটনা।

বারাসতের নাম তোমরা হয়তো শুনেছ। বারাসতের ওদিকে হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। সে আজ প্রায় ১৫০ বছর আগেকার কথা। তিতুমীর ছেলেবেলা থেকেই শারীরিক শক্তিচর্চ্চা ক'রে ক'রে খুব বলবান্ হ'য়ে ওঠেন।

বড় হ'য়ে তিনি লাঠিয়ালী আর পালোয়ানী কাজ করতে থাকেন। একবার একটা দাঙ্গা করবার ফলে তাঁকে জেলেও যেতে হ'য়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে তিতু মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ মক্কা দর্শন করতে যা'ন। মক্কা যাওয়াকে বলে হজ, আর মক্কা দেখে যারা ফিরে আসে তাদের বলে হাজী। তিতুমীর মক্কায় গিয়ে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের শিষ্য হ'ন এবং নাম একটু বদলে তিতুমিঞা উপাধি নেন। তা হ'লে তিনি তখন হ'লেন হাজী তিতুমিঞা।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিতু দেশে ফিরে এসে ওয়াহাবী মত প্রচার আরম্ভ করেন। মিশ্‌কিন শাহ্ নামে একজন ফকিরও তাঁর কাজে যোগ দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ক্রমে তিতুর বেশ বড় একটা দল গ'ড়ে ওঠে। দলের লোকেরা জোর ক'রে নিজেদের মত চালাবার জন্য হিন্দু-মুসলমান যত লোক তাদের বিরুদ্ধে যেত সকলের উপরেই নানা রকম অত্যাচার আরম্ভ করে। ক্রমে তিতুর দলবল এত অত্যাচারী হ'য়ে ওঠে যে স্থানীয় জমিদাররা তাঁকে সাজা দেবার জন্য চেষ্টা করতে বাধ্য হ'ন। তখনকার দিনে তো এত পুলিশ ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত ছিল না,

তাই জমিদাররাই যা হয় করতেন। এর জন্য তাঁদের অনেক পাইক, লাঠিয়ালও মাইনে দিয়ে রাখতে হ'ত। গোবরডাঙ্গার জমিদার আর পুঁড়ার জমিদার তাঁদের লোকজন নিয়ে তিতুকে 'শিক্ষা' দিতে যা'ন, কিন্তু তিতুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। এমন কি বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেব কতকগুলি সৈন্য নিয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তিতুর দল এদের একেবারে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এই যুদ্ধে জিতে তিতুর খুব অহঙ্কার হ'ল। তিনি তখন নিজেকে বাদশাহ্ ব'লে ঘোষণা করেন আর বাঁশ দিয়ে এক কেল্লা তৈরী ক'রে সেখানে বর্শা, বন্দুক, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র সংগ্রহ ক'রতে থাকেন। নীলকুঠির সাহেবদের সঙ্গেও তিতুর সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের মেরে অনেকগুলি গ্রামে তিনি তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন।

ক্রমে তিতুমিঞার কথা বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের কানে পৌঁছায়। তিনি তখন দুটো কামান দিয়ে এক শ' গোরা সৈন্য আর তিন শ' দেশী সেপাই পাঠিয়ে দেন তিতুকে দমন করবার জন্য। এই দলের সেনাপতি এসে তিতুর কেল্লার সামনে নিজের দলবল সাজিয়ে তিতুকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। তিতুর লোকজন তা'তে কিছুমাত্র কান না দিয়ে তাদের ওপর ইট-পাটকেল ফেলতে থাকে। তখন সেনাপতি সাহেব হুকুম দেন যে ওদের ভয় দেখাবার জন্য কামানের ফাঁকা আওয়াজ করা হোক্, কেননা অনর্থক কতকগুলি মানুষ মেরে লাভ কি? কামানের ফাঁকা আওয়াজ শুনে তিতুর লোকেরা প্রথমে ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু যখন তা'রা দেখ্‌ল যে এতে তাদের কোনও অনিষ্ট হ'ল না তখন তাদের একটু সাহস হ'ল। আর তিতুর সহকারী মিশ্‌কিন শাহ্ তখন গর্ব্ব ক'রে বল্লেন—"গোলা খা ডালা", অর্থাৎ ও গোলা আমি খেয়ে ফেলেছি। কাজেই তিতুর লোকেদের মনে ভারী সাহস হয় যে এমন লোক সহায় থাকতে ইংরাজের কামান তাদের কিছুই করতে পারবে না। এই ভেবে তারা সরকারী সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। তখন আর উপায় নেই দেখে সৈন্যেরা গুলি-গোলা চালায়। বাঁশের কেল্লা তো অল্প সময়ের মধ্যেই গেল, তিতুও উরুতে এক গুলি লেগে মারা পড়লেন। তখন সব পালাতে আরম্ভ করল। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথা? সৈন্যেরা সব ঘেরাও ক'রে সাড়ে তিন শ' লোককে

ধ'রে ফেলল। তিতুর সেনাপতি মাসুমকে ঐ পোড়া বাঁশের কেল্লার সামনেই ফাঁসি দেওয়া হ'ল। তার পর বন্দীদের বিচার হ'য়ে বহু লোক শাস্তি পেল।

সেই থেকে কেউ কোনও বাড়াবাড়ি রকম চালের কথা বল্‌লে লোকে বলে "গোলা খা ডালা"। এখন মানে বুঝলে ?

যুদ্ধে গুপ্তচর

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

আধুনিক যুদ্ধে গুপ্তচর বিভাগ একটা বড় অঙ্গ। শুধু বড় অঙ্গ নয়, অপরিহার্য্য অঙ্গ বলা যেতে পারে। আকাশে উঠে বোমারু বিমান থেকে বোমা ফেলে বিপক্ষ দেশ তছ্‌নছ্ করে ফেলা, কিংবা ডাঙ্গার ওপর কামান-বন্দুক, সাঁজোয়া গাড়ী, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির সাহায্যে মুখোমুখী আক্রমণ করা, কিংবা জলের ওপর বড় বড় রণতরী, ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার বা ডুবো-জাহাজ থেকে লড়াই করা এ সবে যা কাজ হয়, এই গুপ্তচর-বিভাগ, এক রকম নিরস্ত্র অবস্থায়, শুধু বুদ্ধি এবং কৌশল-বলে বিপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে তার চেয়ে কম কাজ করে না।

মনে কর, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে। এক পক্ষ তার জন্য নানা রকম তোড়জোড় করছে। অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্যসামন্ত সমাবেশ করছে, কি ভাবে যুদ্ধ চালাবে তার গোপন পরামর্শ চালাচ্ছে নিজেদের মধ্যে। এই সময় যদি বিরুদ্ধ পক্ষের কোন লোক ছদ্মবেশে কৌশল ক'রে তাদের সমস্ত ভিতরের খবর জেনে নিয়ে নিজেদের দলে খবর দিতে পারে তবে সে দলের পক্ষে কত না সুবিধা হয়! শত্রুর সামরিক শক্তি বুঝে তারা প্রয়োজন মত ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে ; শত্রুর গোপন মতলব আগে থেকে টের পেলে তখন তা বানচাল ক'রে দেওয়া আর তাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হয় না।

প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টেই আজকাল এই গুপ্তচর বিভাগ রয়েছে। স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করতে গেলে এদের না হ'লে চলে না। শুধু আজ বলে

নয়, অতি প্রাচীন কাল থেকেই রাজ্যশাসন ব্যাপারে এদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষেও সেই গুপ্ত রাজাদের আমলে পর্য্যন্ত এই গুপ্তচর বিভাগ খুব কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে গেছে ব'লে বর্ণনা পাওয়া যায়। এমন কি এই বিদ্যা শেখাবার জন্য তখন নাকি দস্তুরমত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা স্কুলেরও ব্যবস্থা ছিল। সীজার, নেপোলিয়ন্, ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট্ প্রভৃতি বড় বড় বীর, যাঁরা বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁদেরও দক্ষিণ হস্ত রূপে রাখতে হয়েছিল বিরাট্ গুপ্তচর বাহিনী। তার পর আধুনিক যুগে তো কথাই নেই,—ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান্ যুদ্ধই বল, আর রুষ-জাপান যুদ্ধই বল, আর গত মহাযুদ্ধই বল। আর এবারকার যুদ্ধে তো এই বিভাগের কার্য্যকলাপ আশ্চর্য্য রকম ভাবে বেড়ে গেছে। তোমরা হিটলারের "ফিফ্থ্ কলম্" বা "পঞ্চম বাহিনীর" কথা হয়তো অনেকেই শুনেছ। হিটলার যে প্রথমটা বিনা যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলি একের পর এক দখল করেছিলেন তা'তে তাঁর একটা বড় সহায় হয়েছিল এই "পঞ্চম বাহিনী", আর এই "পঞ্চম বাহিনী" জিনিষটা গুপ্তচর-বিভাগেরই একটা অঙ্গ বলা যেতে পারে।

পঞ্চম বাহিনী ব্যাপারটা অনেকটা এই। যাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে যুদ্ধ বাধবার আগে অর্থাৎ শান্তির সময় তাদের দেশে একদল বাছা বাছা লোক পাঠান হয়। এরা নানা রকম ছদ্মবেশে—কেউ বা ব্যবসাদার সেজে, কেউ বা শ্রমিক নেতা বা ঐ ধরণের কিছু একটা সেজে নানা রকম আন্দোলন সুরু ক'রে দেয়—যার ফলে সে দেশের সরকারের ওপর লোকের মনে একটা অহেতুক বিদ্বেষ আর সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ দেশের সরকারের প্রতি অনুকূল মনোভাব জেগে ওঠে। সেই সঙ্গে এই ছদ্মবেশধারীরা সে দেশ সম্বন্ধে সামরিক ও অন্যান্য তথ্য যতটা পারে সংগ্রহ করে নেবার চেষ্টা করে। তার পর সুবিধামত একটা ছুতো নিয়ে দেশের মধ্যে বাধায় গণ্ডগোল। তার পর যদি যুদ্ধ বাধেই, তখন দেখা যায় আক্রমণকারী দেশের স্বপক্ষে জমি বেশ তৈরী হয়ে আছে, ফলে যুদ্ধে জিততে তাদের বেশী বেগ পেতে হয় না। এই পঞ্চম বাহিনীর মধ্যে আক্রান্ত দেশের লোকও অনেক থাকে। বলা বাহুল্য এজন্য বিপক্ষ দলকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

গুপ্তচরের কাজ বড় সহজ নয়। উপস্থিত-বুদ্ধি, কূটবুদ্ধি, নানা রকম ছল-চাতুরী, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান—অনেক কিছুই তাদের থাকা দরকার। গুপ্তচর-বিদ্যা শেখাবার জন্য আজকাল প্রায় সব দেশেই সরকার থেকে স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা আছে। এই সব স্কুল-কলেজে গুপ্তচরেরা নানা দেশের ভাষা, ছদ্মবেশ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, ফটোগ্রাফী, সাঙ্কেতিক চিঠিপত্র আদান-প্রদান, ম্যাপ তৈরী—এবং আরও হরেক রকম কলা-কৌশল আয়ত্ত করে। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে প্রচুর মাথা খাটিয়ে এই সব প্রক্রিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে আবিষ্কার করতে হয়েছে। স্কুল থেকে পাশ করে যেমন কলেজে যেতে হয় এই সব গোয়েন্দা-স্কুল থেকেও তেমনি পাশ করে গোয়েন্দা-কলেজে যেতে হয়।

শিক্ষানবীশী শেষ হ'লে গুপ্তচর নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে পড়ে। প্রয়োজন মত কত রকমের পেশার লোকের ছদ্মবেশ যে এদের নিতে হয় তা ভাবলেও অবাক্ হ'তে হয়। ডাক্তারী, মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, ব্যবসাদারী, বৈজ্ঞানিকের কাজ, হোটেলওয়ালার কাজ, ফেরিওয়ালার কাজ, ঠিকাদারের কাজ, সৈনিকের কাজ, থিয়েটারের কাজ—কিছুই বাদ থাকে না। এদের হাব-ভাব, চাল-চলনে ঘুণাক্ষরেও কেউ এদের গোপন মতলব বুঝতে পারে না। সুযোগ মত এরা নানা রকম ভাবে গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। সামরিক তথ্যের কথা তো আগেই বলেছি, তা ছাড়া আরও কত খবর! দেশের কোথায় কি আছে, ম্যাপ্ এঁকে, ফটোগ্রাফ তুলে তা সংগ্রহ করে। পথঘাট, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ-লাইন, বেতার-ঘাঁটি, দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, রসদপত্র, খাদ্যসঞ্চয়—এক কথায় যত রকম তথ্য দরকার হ'তে পারে সব। শুধু সংগ্রহ করা নয়, এ সব খবর কৌশলে নিজেদের দলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করাও তাদের কাজ।

শান্তির সময়ে গুপ্তচরের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ তখন তাদের গতিবিধির ওপর ততটা নজর দেওয়া হয় না যতটা দেওয়া হয় যুদ্ধের সময়। ওদিকে আবার যুদ্ধের সময়েই গুপ্তচরের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। যদিও শান্তির সময়েও তাদের নিজ নিজ কাজ গুছিয়ে রাখতে হয়। যুদ্ধের সময় বাধা বড় কম নয়। প্রথমতঃ যুদ্ধ বাধলেই শত্রুরাজ্যের যে সব লোক বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে অপরের

দেশে বাস করছে তাদের গ্রেপ্তার ক'রে ফেলা হয়। কাজেই তখন কোন গুপ্তচরের পক্ষেই প্রকাশ্য ভাবে থাকা সম্ভব নয়। তার পর গুপ্তচরের ওপরেও গুপ্তচর আছে,—সব দেশেই থাকে। এই সব গোয়েন্দারাও কম চালাক নয়, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ—বিশেষতঃ নিজেদের দলে সে সংবাদ পাঠান নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। গুপ্তচরেরা এ জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন ক'রে থাকে। ২।১টি উদাহরণ দিচ্ছি।

যুদ্ধ বাধবার মুখে একদল গুপ্তচর হয়তো বেতারের যন্ত্রপাতি সরবরাহের কারবার খুলে বসল। শত্রুরাজ্যের বেতার-ঘাঁটির জন্য তারা অর্ডার সংগ্রহ করতে লাগ্‌ল। এমনি ভাবে ঐ সব বেতার-ঘাঁটির কর্ত্তাদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে তারা তাদের ভিতরকার সমস্ত ব্যাপার জেনে নিল। তার পরেই সেই অর্জ্জিত বিদ্যার সাহায্য নিয়ে দেশের মধ্যে খুলে বস্‌ল কতকগুলো নকল বেতার-ঘাঁটি। আধুনিক যুগে প্রচার-কার্য্যে বেতারের প্রভাব বড় কম নয়। তাদের মিথ্যা প্রচারের ফলে দেশের মধ্যে দেখা দিল প্রচণ্ড গণ্ডগোল, এবং তার সুযোগ নিয়ে গুপ্তচর তার নিজের উদ্দেশ্য হাসিল ক'রে ফেল্‌ল।

শত্রুসৈন্য শিবির বসিয়ে বিশ্রাম করছে। ফেরিওয়ালা এল জিনিষ বেচতে। সামান্য একজন ফেরিওয়ালাকে কেই বা গ্রাহ্য করে, সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা চালাতে লাগল। ফেরিওয়ালাবেশী গুপ্তচর অনেক গোপন তথ্য জেনে নিয়ে গেল।

মস্ত বড় খানাপিনার আয়োজন হয়েছে। বড় বড় সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যুদ্ধবিশারদরা জড় হয়েছেন। নাচ-গান, স্ফূর্ত্তি পূরো দমে চলেছে। স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে কর্ত্তারা কথাবার্ত্তায় বিশেষ সংযত থাকা আবশ্যক বোধ করছেন না—আর নাচের মজলিসে কেই বা সব কথায় কান দিচ্ছে? তুমিও যেমন! ফলে নানা কথার সঙ্গে যুদ্ধ সম্বন্ধে গোপন কথাও ২।১টা বলা হচ্ছে। ওদিকে খাবার পরিবেশনকারী একটি ভৃত্য যে সমস্ত কথা আড়ি পেতে শুনে নিল সে খবর আর কেউ রাখে না। পরে দেখা গেল, সেই ভৃত্যটি হচ্ছে একজন মহা ধুরন্ধর গুপ্তচর।

এ সব ছল-চাতুরী ছাড়া গোপনে আড়াল থেকে বা এরোপ্লেনে চড়ে ওপর থেকে ফটো তুলে নেওয়া, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে দূর থেকে অদ্ভুত ভাবে অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় খবর বার করে নেওয়া—এ সব তো আছেই।

খবর সংগ্রহ করার চাইতে খবর পাঠান' ব্যাপারেও হাঙ্গামা কম নয়। এর জন্যও গুপ্তচরকে নানা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতে দেখা গেছে। গলায় মুক্তার মালা পরে, তার মধ্যে নকল ফাঁপা মুক্তা বসিয়ে তার মধ্যে গোপন সংবাদ ভরে নেওয়া, প্যান্টের বেল্ট্ চিরে তার ভাঁজে লুকান কাগজ বসিয়ে নেওয়া, নকল দাঁতের নীচে, শরীরে ক্ষত ক'রে তার মধ্যে পুরে কাগজ নেওয়া—এ সব তো হামেশাই হচ্ছে। সিগারেটের কাগজের ওপর অদৃশ্য কালিতে সংবাদ লিখে সেই কাগজে সিগারেট মুড়ে সিগারেট খেতে দেবার নাম করে গোপন সংবাদ প্রেরণের কাহিনীও শোনা গেছে। যুদ্ধের সময় সন্দেহজনক চিঠিপত্র পরীক্ষা না ক'রে বিলি করতে দেওয়া হয় না। চিঠি—তা সে যত অদৃশ্য ভাবে লেখা আর যত সাঙ্কেতিকই হোক্ না কেন, ওস্তাদ্ পণ্ডিতেরা তার পাঠোদ্ধার করে ফেলেন। এ জন্য একবার এক গুপ্তচর চিঠির টিকেটের পেছনে গোপন খবর লিখে পাঠাতেন। খামে লাগান টিকেট, তার পেছন দিকে আবার কিছু লেখা থাকতে পারে এ সন্দেহ কারও মনে আসে নি—টিকেট খুলে পরীক্ষাও কেউ করে নি। গুপ্তচরের কাজ বেশ চলছিল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত একদিন অসতর্ক ভাবে লেখায় ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল। আজকাল চিঠিপত্র পরীক্ষার ব্যাপারে এত ভীষণ রকম কড়াকড়ি আর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে যে সহজে কোন গোপন খবর কর্ত্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না।

সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর অনেক সময় অনেক অসমসাহসিক কাজ ক'রে বসে; একটা সামান্য খবরের জন্য নির্ব্বিবাদে জীবন বিপন্ন করতেও দেখা গেছে।

একবার একদল সৈন্য নদীর ধারে ছাউনী ফেলেছে। সবাই ভিতরে বিশ্রাম করছে, এমন সময় একজন প্রহরী দেখতে পেল জলের ওপর দিয়ে একটা হাঁড়ী ভেসে আসছে, কিন্তু হাঁড়ীর ভাসবার ধারণটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। সৈনিকের

সন্দেহ প্রবল হ'ল, সে ব্যাপার দেখবার জন্য হাঁড়ী লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাল। পরক্ষণেই দেখা গেল হাঁড়ীর তলায় রয়েছে একটি বিপক্ষ দলের লোক—ঐ ভাবে হাঁড়ী আড়াল দিয়ে সাঁৎরে সাঁৎরে সে বিপক্ষ-শিবিরে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য আসছিল। এক গুলিতেই বেচারার সে সাধ জন্মের মত চুকে গেল।

ধরা পড়লে গুপ্তচরের আর রক্ষা নেই। আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের আইনে সাধারণ যুদ্ধের বন্দীরা যুদ্ধ চুকলে মুক্তি পায়; এদের কিন্তু ধরা পড়লেই প্রাণ-দণ্ড—কোন রকম ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না। গুপ্তচরের কাজে যে নামে তাকে এ সব জেনেশুনেই ওকাজে হাত দিতে হয়। গত মহাযুদ্ধে বিখ্যাত নারী-গুপ্তচর মাটা হারির নাম তোমরা শুনে থাকবে। বায়স্কোপে এ সম্বন্ধে ছবিও হয়তো অনেকে দেখেছ। মাটা হারি ছিল জাতে ওলন্দাজ। চেহারা ছিল তার যেমন সুন্দর, নাচতে-গাইতেও সে পারত তেমনি চমৎকার। এই সব গুণের জোরে মাটা হারি বড় বড় সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সহজেই ভাব জমিয়ে ফেলত, তার পর তাদের কাছ থেকে কৌশলে নানা গোপন খবর বার করে জার্ম্মান্‌দের সরবরাহ করত। অবশেষে একদিন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে ধরা পড়ে যায়, তখন তাকে দেওয়া হয় প্রাণদণ্ড। বিখ্যাত ইংরেজ নারী-গুপ্তচর নার্স্ এডিথ্ ক্যাভেলও অমনি ভাবে হাসপাতাল থেকে ইংরেজ ও বেল্‌জিয়ান্ সৈন্যদের পালাবার সাহায্য করতে গিয়ে জার্ম্মান্‌দের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ দিয়েছিল—গত মহাযুদ্ধে। ধরা পড়ে যাওয়ায় গুপ্তচরকে গুলি ক'রে মারা হ'ল—এ রকম খবর এবারকার যুদ্ধেও অনেকবার খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

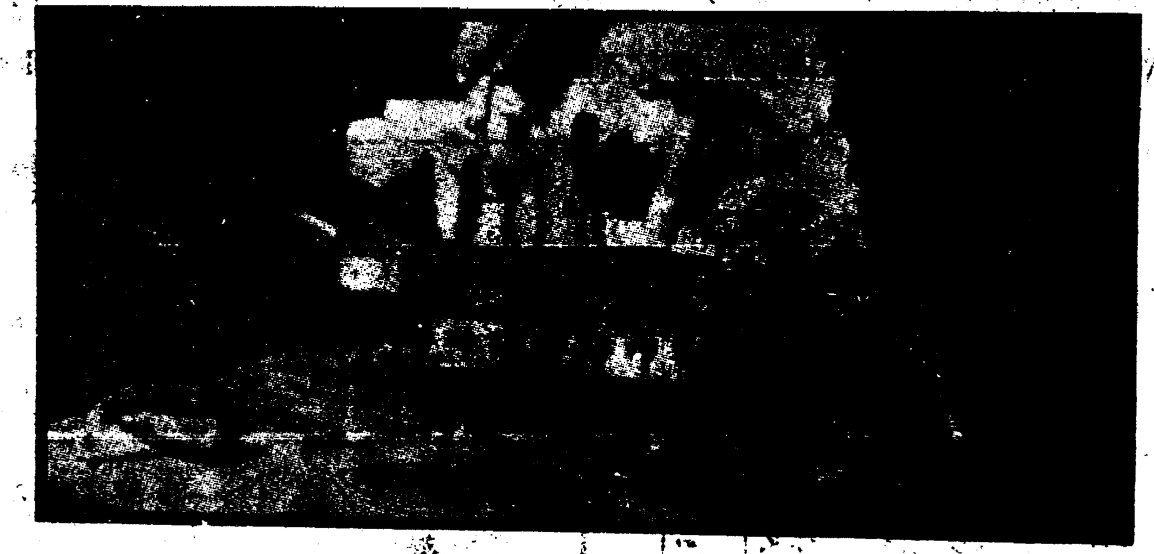

আধুনিক গুপ্তচরের সঙ্গী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বাক্স

ওপরের বর্ণনা থেকে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে গুপ্তচরের কাজ আর যাই

হোক্ খুব আরামদায়ক বা নিরাপদ কাজ নয় নিশ্চয়ই। অথচ অনেকে এদের সম্বন্ধে বেশ একটু বিতৃষ্ণার ভাবই পোষণ ক'রে থাকে। তবে লোকে এ কাজে যায় কেন? মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এর কয়েকটা কারণ দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ একদল মানুষের থাকে সর্ব্বদাই বিপদের মুখে এগিয়ে যাবার বা য়্যাড্‌ভেঞ্চারের একটা মোহ, দ্বিতীয়তঃ স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণা—এই কাজ করলে আমার দেশ যুদ্ধে জিতবে, এই ভাবেই আমি দেশের সেবা করব, এই রকম একটা ভাব। আর একটা আকর্ষণ—এবং কারো কারো মতে একটা প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এ থেকে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা। কারণ এই সব গুপ্তচরদের পারিশ্রমিক বড় কম নয়।

একটি বিখ্যাত 'গুপ্তচর' পায়রা—পায়ে গোপনীয় চিঠি বাঁধা। বাঁ-দিকে—সৈন্যের পিঠে সংবাদবাহী পায়রার খাঁচা; উপরে—পায়রার খাঁচাওয়ালা গাড়ী

গুপ্তচরের কথা বলতে গেলে আর এক রকম গুপ্তচরের কথা না বল্‌লে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এরা কিন্তু মানুষ গুপ্তচর নয়, আমি শিক্ষিত পায়রা গুপ্তচরদের কথা বলছি। যুদ্ধে সংবাদ প্রেরণের জন্য শিক্ষিত পায়রার ব্যবহার অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আজকাল অবশ্য বেতারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদের ব্যবহার কমে এসেছে। তবু গত মহাযুদ্ধেও এদের দিয়ে যে কাজ পাওয়া গেছে তা উল্লেখ না করে পারা যায় না।

পায়রা দিয়ে সংবাদ পাঠান হয় কি ক'রে তোমরা বোধ হয় জান; পায়রার পায়ে সংবাদ লেখা কাগজ বেঁধে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়—শিক্ষিত পায়রা সেই সংবাদ নিয়ে বিদ্যুৎবেগে গন্তব্যস্থানে গিয়ে হাজির হয়। অনেক সময় পায়রার পায়ে ছোট ছোট ক্যামেরা (যাতে আপনা থেকে ফটো ওঠে) বেঁধে দেওয়া হয়,

পায়রা আড়াল থেকে শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে তাদের অনেক গোপন বিষয়ের ফটো তুলে নিয়ে আসে। ধরা পড়লে অবশ্য তারও রক্ষা নেই,—মানুষ গুপ্তচরের মত তাকেও শত্রুর গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়। গত মহাযুদ্ধে "স্পাইক্" নামে একটা আমেরিকান্ শিক্ষিত পায়রা ৫২ বার এই রকম মূল্যবান্ সংবাদ সরবরাহ করেছিল। "চের আমি" নামে আর একটি পায়রা ৪৫ মিনিটে প্রায় ২৫ মাইল পথ উড়ে গিয়ে ১২টা জরুরী খবর দিয়ে এসেছিল। তেমন তেমন একটা শিক্ষিত পায়রা নাকি এক দিনে ৬০০ মাইল্ রাস্তা উড়ে গিয়ে সংবাদ পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। এমন কি রাত্রেও নাকি এরা উড়তে কসুর করে না।

ছোটদের চিত্রশালা

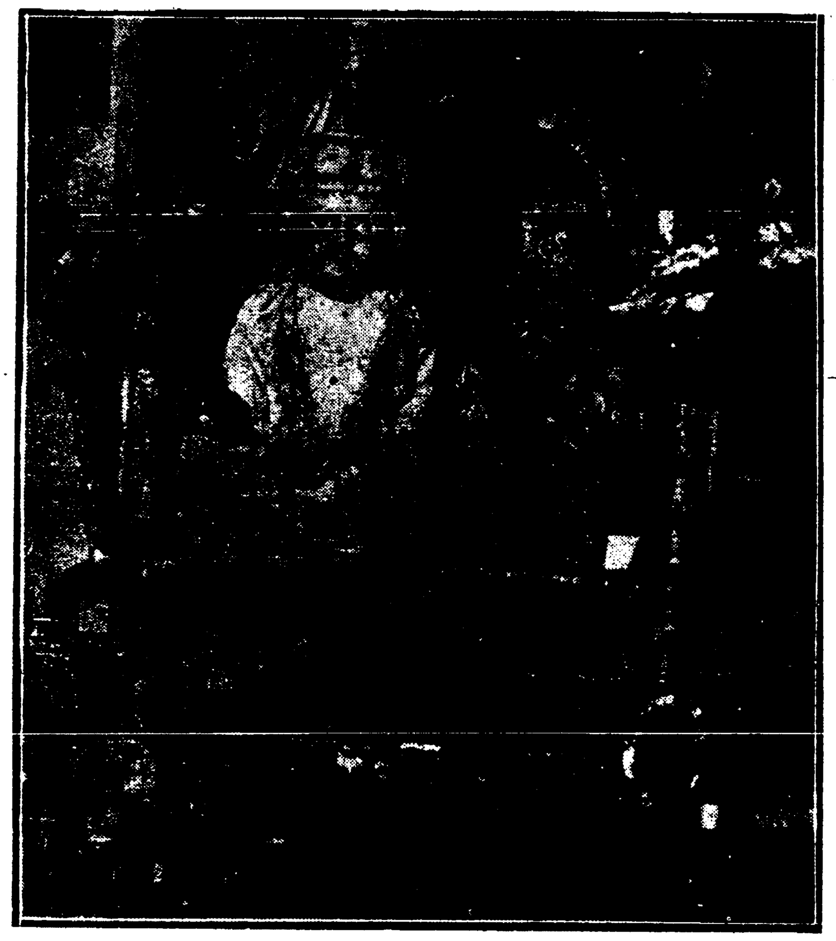

পুতুলের বিয়ে

আলোকচিত্র—শ্রীশচী-সোনালী সেন রায়

বিচিত্র ভারত

প্রকৃতির দুলালী ভারতবর্ষ

পাথরের বুকে জলের খেলা, কাশ্মীর

উশ্রীর জলধারা, গিরিডি

বন্ধুবৎসল ভ্যাণ্টা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সেদিন মংটুর বাড়ি গিয়ে দেখি, মংটু ওর গদি-আঁটা মস্ত ইজি-চেয়ারটায় কপালে হাত রেখে মড়ার মতো প'ড়ে আছে, আর ওর সামনে পিঠ-খাড়া চেয়ারে ব'সে কে একজন ঘ্যাঙোর-ঘ্যাঙোর ক'রে কথা ব'লে যাচ্ছে। তার পরনে সায়েবদের মতো গরম কাপড়ের পেন্টেলুন, পায়ে কিরিকিরি-নক্সা-কাটা মোজা আর বাচ্চাদের শোবার তেলতেলে কাপড়ের মতো চক্‌চকে কালো জুতো, গায়ে রোঁয়া-রোঁয়া শেয়াল-রঙের কোট, গলায় গোল-গোল উল্কি-আঁকা নেকটাই আর কুত্তার বগলসের মতো শক্ত শাদা কলার—কোটের পকেটে দুটো ফাউণ্টেন পেনের ক্লিপ ঝক্‌ঝক্ করছে, আর টেড়ির কী বাহার, যেন মাথার মধ্যে দিয়ে চৌরঙ্গী চলে গেছে। ঘরে ঢুকেই আমি তো থ। প্রায় পালাচ্ছিলুম, মংটু কেমন কাঁদো-কাঁদো গলায় ডাকলে—'এই গবা, শোন্।' আর আমার নাম শুনেই সেই লোকটি আমার দিকে তাকালো, আর তক্ষুণি আমি মনে-মনে বললুম, গেছি রে ভাই।

—'এই যে গবা, এসো। কেমন আছো? কী খবর?'

হায় হায়, এতদিন পরে আবার বুঝি ভ্যাণ্টার খপ্পরে পড়লুম! ওকে এড়াবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে কি আগুনে লাফিয়ে পড়া কিছুই নয়, আমরা তো শুধু রংপুর থেকে কলকাতায় পালিয়েছি। তখনই বোঝা উচিত ছিলো এত সহজে ওর হাত থেকে রেহাই নেই। ঠিক এসেছে কলকাতায়, ঠিক খুঁজে বা'র করেছে আমাদের আড্ডা। ওর পাল্লায় একবার পড়লে আর কি রক্ষে আছে! চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে, পায়ে ধ'রে কাঁদলেও ছাড়বে না। রংপুরে সাত জন জোয়ানকে ও পাগল ক'রে ছেড়েছে, তারা এখন রাঁচির হাসপাতালে যেখানে আর-কেউ থাকে না এমন ঘরে একা-একা মহাসুখে আছে, কোনো মানুষ কাছে এলেই খেঁকিয়ে ওঠে; আর এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ভ্যাণ্টা রোজ সকালে গিয়ে দু' ঘণ্টা কাটাতো, তিনি হঠাৎ একদিন জানলা দিয়ে দেখলেন ভ্যাণ্টা আসছে, যেই না দেখা, হার্টফেল ক'রে ম'রে গেলেন তক্ষুণি। আড়চোখে মংটুর দিকে একবার তাকিয়ে দেললুম তার মুখ ফ্যাকাশে, চুল উসকোখুসকো, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে বার-বার, যে-কোনো তাজা জ্যান্ত টগবগে মানুষকে আধ-মরা ক'রে আনতে ভ্যাণ্টার ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না।

ভ্যাণ্টা খুব বন্ধুভাবে আমার পিঠে এক চাপড় দিয়ে আবার বল্‌লে, 'ভালো তো?'

আমি আমার চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে বল্‌লুম, 'কবে এলে কলকাতায়?'

—'এই তো কাল মোটে। মংটু কোথায় থাকে জানতুম না তো, হঠাৎ আজ ট্রামে দেখা। (এখানে মংটুর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো।) মংটু তো আমাকে চিনতেই পারে নি—আমার পরনে এই এ-সব কি না—তা ভাই এ-সব ধড়াচূড়া পরতে কি আর ভালো লাগে, তবে আমাদের প্রোফেশনে এ সব না-হ'লেও চলে না। এই দুর্দিনে এ-সব কাপড়-চোপড় করাতে দেখো দু'শো টাকা বেরিয়ে গেলো—তা যা-ই বলো ভাই, এ-সব পরলে ভারি স্মার্ট লাগে—'

ব'লে ভ্যাণ্টা এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো যেন আমি একটা প্রকাণ্ড আয়না। শীতকাল, ঘাম নেই, তবু খামকা একবার পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বা'র ক'রে মুখ মুছে বল্‌লে—'হ্যাঁ, মংটু আমার পাশ দিয়েই নেমে যাচ্ছিলো, আমি ওর গায়ের জামার কোণ চেপে ধরলুম—(আবার মংটুর দীর্ঘশ্বাস) ও তবু খেয়াল না ক'রে জামা ছাড়িয়ে নিয়ে নেমে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে আমিও চলতি ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়লুম। হ্যাঃ-হ্যাঃ!'

ভ্যাণ্টা ঘোড়ার মতো হেসে উঠলো, আর মংটু এবার ঠিক ডেঙ্গু রোগীর মতো ক্যাঁ-কোঁ ক'রে উঠলো।

—'যাচ্ছিলুম কাজে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব দেখলে আমি সব কাজ ভুলে যাই, ঐ আমার একটা মস্ত উইকনেস্।'

আমিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লুম—'কদ্দিন আছো কলকাতায়?'

—'কদ্দিন? একটা সুখবর দিচ্ছি, শোনো, এখন থেকে আমি কলকাতাতেই থাকবো।'

—'বলো কী—থাকবে?'

—'হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এখানেই প্র্যাকটিস করবো, অজ মফঃস্বলে কিছু হবে না। ধর্ম্মতলায় চেম্বার নেবো—তোমাদের খুব সুবিধেই হ'লো, একজন বিনি পয়সার ডাক্তার পেলে। আরে না—না—তোমরা আবার টাকা দেবে কী—যক্ষুণি দরকার হয় ডাকবে। আমি তো আছিই—ভয় কী?'

ওর থাকাটাই যে ভয়ের কারণ সে-কথা ওকে কেমন ক'রে বোঝাই, মনে-মনে ভাবছি, এমন সময় ও আবার বল্‌লে (আর কেউ কিছু না বল্‌লেও একা-একা কথা ব'লে যাবার ক্ষমতা ওর আশ্চর্য্য), 'এখানে তোমরা কোথায় বাড়ি নিয়েছো?'

—'এই তো কাছেই।'

—'সাদার্ন্ এভিনিউতেই?'

আমি কিছু বলবার আগেই মংটু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—'গবার ঠিকানা হ'লো পি ২।৭১ সাদার্ন্ এভিনিউ, দোতলার ফ্ল্যাট।'

আমি বিষের মতো চোখে মংটুর দিকে একবার তাকালুম, কিন্তু ও উদাসীনভাবে মুখ ঘুরিয়ে রইলো।

ভ্যাণ্টা বল্‌লে—'তা হ'লে তো আজই একবার যাওয়া যায় তোমাদের বাড়ি।'

আমি শুধু একবার ঢোঁক গিললুম।

—'তুমি এখানে কতক্ষণ আছো?'

—'আছি খানিকক্ষণ, তার পর একবার যেতে হবে শ্যামবাজার, সেখান থেকে শেয়ালদা ষ্টেশনে আমার মামিমাকে ঢাকা মেলে তুলে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরবো।'

—'তা তোমাদের বাড়ির আর সবাই তো আছে—বিণু, বেনু, শম্ভু, কুটকুট—আর মাসিমা—'

মংটু হঠাৎ উৎসাহিতভাবে ব'লে উঠলো—'হ্যাঁ, সবাই আছে। এ-সময়ে ওরা সকলেই বাড়ি থাকে—অন্ততঃ কেউ-না-কেউ থাকেই।'

মংটুর ভাবখানা এইরকম মনে হ'লো যেন ওর মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসছে।

ভ্যাণ্টা একবার ওর সোনার হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—'থাক্, আজ আর না গেলাম। আটটার সময় আবার ডক্টর বোসের সঙ্গে একটা এনগেজমেণ্ট করেছি—তিনি আর আমি একসঙ্গে চেম্বার নিচ্ছি কিনা।'

আমি আর মংটু চট্ ক'রে একসঙ্গে বড়ো দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালুম—বাব্বাঃ, আটটা বাজতে এখনো সওয়া ঘণ্টা দেরি!

ভ্যাণ্টা তার ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'গবা, আজ আর তা হ'লে তোমাদের বাড়ি না গেলুম, এনগেজমেণ্টটা বড্ড জরুরি। কিছু মনে কোরো না ভাই। মাসিমা না জানি কত রাগ করবেন আমার উপর—এত কাছে এসেও তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম না। তা আমি যাবো নিশ্চয়ই—কালই যাবো—মাসিমাকে বোলো তিনি যেন রাগ না করেন, কেমন?'

আমি বল্‌লুম—'আরে না, না, পাগল নাকি! আমরা কেউ কিচ্ছু মনে করবো না, মা একটুও রাগ করবেন না—তুমি তো এখন কতই ব্যস্ত থাকবে, কাজকর্ম্মের হিড়িকে যদি আমাদের বাড়ি একবারও যেতে না পারো তা হ'লেও আমরা কেউ একটুকু রাগবো না, আমার এই একটা কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

আমার কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই ভ্যাণ্টা ব'লে উঠলো—'কী যে বলো তুমি! আমার হাজার কাজ থাকলেও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা না ক'রে কি পারি! জানো তো ভাই, আমার

জীবনে আমার ঐ একটিই উইকনেস, বন্ধু-বান্ধব দেখলে আমি আর স্থির থাকতে পারি নে। আর এতে আমার ক্ষতিই কি হয়েছে কম! সে সময় মন দিলে হাজার-হাজার টাকা রোজগার করতে পারতুম—কিন্তু কাজে তো আমার মন বসে না, কোথায় কোন্ চেনা লোক আছে খুঁজে-খুঁজে বেড়াই, অচেনা লোকের সঙ্গে যতক্ষণ না আলাপ হয় ছটফট করি। জানো তো তোমরা আমার স্বভাব—'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লুম; 'তা জানি।'

—'আচ্ছা, কালই যাবো তোমাদের বাড়ি, কথা রইলো। কোন্ সময়ে বাড়ি থাকো তুমি?'

আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলুম—'সারাটা দিন তো আপিসেই কাটে, আর সন্ধ্যেবেলা এখানেই আসি রোজ।'

—'রোজই আসো? বাঃ, বেশ আড্ডাটি জমেছে তোমাদের। ভালোই হ'লো।'

—'গবাকে সকালবেলায় বাড়ি পাওয়া যায় ন'টা পর্য্যন্ত', মংটু হঠাৎ বল্‌লে। 'আর বিকেলের দিকেও পাঁচটার পরে তো বাড়িতেই থাকো, থাকো না গবা?'

মংটুর এই মিনিমুখো ভালোমানষি দেখে শরীরটা রাগে জ্বলে গেলো। ভ্যাণ্টা বল্‌লে—'যদি পারি কাল সকালেই যাবো তোমাদের ওখানে।' আর তার পর ও পুরো এক ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বকর বকর করলে—উঠলো যখন, আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ততক্ষণে আমাদের হ'য়ে এসেছে। ও চ'লে যাওয়া মাত্র মংটু একবার 'উঃ' ব'লে ইজিচেয়ারে একেবারে এলিয়ে পড়লো, আর আমার মনে হ'লো ডুকরে কেঁদে উঠলে হয়তো এ-যন্ত্রণার কিছু শান্তি হয়।

২

পরদিন সকাল থেকে ভয়ে-ভয়ে আছি—কখন ভ্যাণ্টা এসে পড়ে। জানলার ধারে দাঁড়াতে সাহস হয় না, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলেই বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চুপচাপ কাটালুম, তার পর সাড়ে-আটটা বাজতেই মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে, দু' গরাস ভাত মুখে পুরে ভোঁ দৌড় আপিসের দিকে। জীবনে যা কখনো হয় নি—আধ ঘণ্টা আগেই আপিসে হাজির হলুম—আমাকে দেখে দরওয়ান পর্য্যন্ত অবাক্।

শীতকালে বাড়ি ফিরতে-ফিরতেই সন্ধ্যে। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় একদম লম্বা, এক্ষুণি চা আসবে, শুয়ে-শুয়েই সেটা পেটে চালান করবো, সময়টা যে কত আরামের তা তোমরা যখন বড়ো হ'য়ে আপিসে যাবে তখন বুঝবে। এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে শুনি—এ কী! ভ্যাণ্টার গলার আওয়াজ না? বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগলো, তিড়িং ক'রে উঠে আলোটা নিবিয়ে দিয়েই আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। সঙ্গে-সঙ্গে শুনি শম্ভুটা আমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে—'এই যে, ন' দা এ-ঘরে আছেন।'

ন' দা আছেন! বটেই তো! দাঁড়া না, তোকে মজা দেখাচ্ছি।

আমি গলা মোটা ক'রে ডাকলুম—'শম্ভু!'

কোথায় শম্ভু! ভ্যাণ্টা ঘরে ঢুকে বল্‌লে, 'শম্ভু তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলো। তুমি এই অসময়ে শুয়ে যে?'

ওরা বেশ চালাক কিন্তু, চট্ ক'রে সটকেছে সব। এইমাত্র শুনছিলুম পাশের ঘরে দারুণ হল্লা, এখন সমস্ত বাড়ি চুপচাপ, যেন কেউ নেই। ধরা প'ড়ে গেলুম আমি। আবার বলা হচ্ছিল ন'দা এ-ঘরে আছেন। পাজি, ছুঁচো, গণ্ডার।

—'কী হে, শুয়ে আছো যে?'

আমি সংক্ষেপে বল্‌লুম, 'শুয়ে আছি।'

—'এই সময়ে শুয়ে আছো! উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই, স্ফূর্ত্তি নেই, কী যে হয়েছো তোমরা! আমাকে দেখো তো! সকাল থেকে এগারোটি বাড়িতে দেখা করেছি, জানো? তাই তো তোমাদের এখানে আসতে-আসতে সন্ধ্যে হ'য়ে গেলো। সকালে আসি নি ব'লে রাগ করো নি তো? শোভনদের বাড়ি গিয়েছিলুম, কিছুতেই ছাড়লে না, দেরি হ'য়ে গেলো।'

শোভনের কথা ভেবে কিছু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলুম, সান্ত্বনা পেলুম না।

চাকর চা নিয়ে এলো। চা আমার এত প্রিয়, কিন্তু ভ্যাণ্টার বিরামহীন বক্‌বকানি শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিলো যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঠিকই বলেন, চা-পান আর বিষপান সমান কথা।

চায়ের পরে ভ্যাণ্টা বল্‌লে—'আজ যাবে না মংটুর ওখানে?'

আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লুম—'আমি একটু পরে যাচ্ছি, তুমি যাও।'

—'চলো এক সঙ্গেই যাই। আর কে-কে আসে এখানে?'

—'ওঃ, অনেকেই আসে। তুমি যাও না, অনেক চেনা লোক পাবে। আমি এই হাত-মুখ ধুয়েই চ'লে আসছি।'

—'আচ্ছা, আমি না-হয় একটু বসছি।'

আমি করুণ স্বরে বল্‌লুম—'তুমি আগেই যাও না। মংটু কাল ক'ত খুসি হ'লো তোমাকে দেখে।'

ভ্যাণ্টা একগাল হেসে বল্‌লে—'হ্যাঁ, আমাকে দেখে সবাই খুসি হয়, কেন বলো তো? বাস্তবিক, কেন যে তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো ভেবেই পাই নে। শুধু তোমরাই নয়, যেখানেই যাই, যার সঙ্গেই দেখা হয়, আমাকে একবার পেলে আর ছাড়তে চায় না।'

—'যা বলেছো ! তুমি তা হ'লে এগোও', বলতে-বলতে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার ধারে দাঁড়ালুম, 'আমি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

—'মাসিমার সঙ্গে তো—'

—'মা বাড়ি নেই, বায়োস্কোপ দেখতে গেছেন। তুমি শীগ্‌গির যাও, মংটু আবার বেরিয়ে না যায়। এক রকম জোর ক'রে ঠেলে-ঠুলেই দরজার বাইরে নিয়ে সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলুম ওকে। তার পর এক দৌড়ে বাথ-রুমে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে অষ্টমীর পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগলুম।

পাঞ্জাবীর উপর আলোয়ান জড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, আরশিতে আর-একজনের ছায়া পড়লো। চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি, মংটু।

—'এ কী করেছো তুমি!' আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে ব'লে উঠলো। 'এতদিনের বন্ধুতার এই কি প্রতিদান?'

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, 'চাচা, আপন বাঁচা। তার পর, তুমি পালালে কেমন ক'রে?'

—'একটা টেলিফোন করতে হবে, এই অছিলায় বেরিয়ে এসেছি। ও ব'সেই আছে। তুমি কোথায় বেরুচ্ছো?'

—'তোমার ওখানে নয়।'

—'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

—'কোথায়?'

—'যেখানে হয়।'

কিন্তু কোথায়ই বা যাওয়া যায়? শীতকালে পার্কে বসা যায় না, সিনেমা আরম্ভ হ'য়ে গেছে, মিছিমিছি রাস্তায়ই বা কতক্ষণ ঘুরে বেড়ানো যায়? দু' জনে চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ মংটু ব'লে উঠলো—'এক কাজ করি না। এখানেই বসি।'

—'তার পর?'

—'ও আমার ওখানে ব'সে থেকে-থেকে চ'লে যাবে—আর কী হবে?'

—'ওকে তুমি তা হ'লে চেনো না। ঠিক টের পাবে। এখানে এসেই হাজির হবে আবার।'

—'তবে উপায়?'

—'তোমার তো এ-সব বিষয়ে খুব মাথা খোলে। একটা বুদ্ধি বাৎলাও।'

দু' জনে চুপচাপ ব'সে অনেক ভাবলুম, কিন্তু কোনো বুদ্ধিই মাথায় এলো না। অগত্যা মংটু বল্‌লে, 'চলো না হয় খানিকক্ষণ ট্র্যামেই ঘুরে আসি—দু' জনেরই তো মান্থ্‌লি টিকিট আছে। তবু অন্ত কথাবার্ত্তা ব'লে মনটা ভালো হবে। আশা করি আমার এই দুর্ব্যবহারের পর ও আর আসবে না।'

—'পাগল হয়েছো তুমি! ও কিছুই মনে করবে না এতে—কাল আবার আসবে, পরশুও আসবে, রোজই আসবে, দেখো না মজা!'

আমার কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। মংটুর সঙ্গে আমার চকিতে একবার চোখাচোখি হ'য়ে গেলো, তার পর দু' জনেই এক লাফে ঘরের বাইরে। সিঁড়ির দরজার একটা কপাটের আড়ালে দাঁড়ালুম আমি, আর-একটার পিছনে মংটু কোনো রকমে লুকোলো। একটু পরেই ভ্যাণ্টা দরজা দিয়ে ঢুকলো। আমার ঘরে উঁকি মেরে বল্‌লে—'এ কী! কোথায় গেলো সব? গবা! গবা!'

আমি আর মংটু একসঙ্গে সিঁড়ির দিকে ছুটলুম, দু' জনের মাথাটা একবার ঠুকে গেলো। দৌড়িয়ে নেমে আসতে-আসতে টের পেলুম, ভ্যাণ্টা পিছনে ধাওয়া করেছে। ফুটপাথে এসে নামতেই ও আমাদের ধ'রে ফেললো; এক হাত মংটুর, আর-এক হাত আমার কাঁধে রেখে বত্রিশ পাটি দাঁত বার ক'রে হেসে বল্‌লে—'কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা ভাই? ওঃ, ভাগ্যিস তোমাদের ধ'রে ফেলেছি। মংটু, তোমার টেলিফোন করা হয়েছে? একা ব'সে-ব'সে ভালো লাগছিলো না, ভাবলুম আর-একবার গবারই খোঁজ করি। চলো, কোন্ দিকে যাচ্ছিলে, চলো।'

আমরা দু' জনে তখনো হাঁপাচ্ছিলুম; তা ছাড়া মনের অবস্থাও এমন যে মুখে একটা কথা ফুটলো না।

—'চলো, মংটু, তোমার বাড়িই যাওয়া যাক্। আমার আর বেশি দেরি করা উচিত নয়, সাতটার সময় তুষার বাবুদের বাড়ি যাওয়ার কথা—তা একটু দেরি হ'য়ে যাবে—কী আর করা? আমার স্বভাবই ঐ—বন্ধুবান্ধবের জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়তে পারি। তুষার বাবুরা নিশ্চয়ই রাগ করবেন—কিন্তু আমি তোমাদের ঘাড়েই দোষ চাপাবো, তা কিন্তু ব'লে দিলাম। বলবো, মংটু, গবা ওরা কিছুতেই ছাড়লে না—জোর ক'রে ধ'রে রাখলে।'

ভ্যাণ্টা কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে দু' হাতে আমাদের দু' জনের হাত চেপে ধরলো, তার পর টেনে নিয়ে চললো মংটুর বাড়ির দিকে।

আগামী সংখ্যায়—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

"একরাত্রের বিভীষিকা"

হাসি-কান্না

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পারুল গাঁয়ের হারু গোঁসাই—
গোবর্দ্ধনের দাদামশাই
বল্লে সেদিন সকাল বেলা
"সারা জীবন কাঁদছি মেলা।
বাঁকা মুখে নাকি সুরে
কাঁদছি সবাই ভুবন জুড়ে।
ব্যাঙ কাঁদিছে বাদল রাতে,
গোব্‌রা কাঁদে পাঠশালাতে।
কাঁদছে বুড়ো, কাঁদছে ছেলে,
চোখের বাদল দিচ্ছে ঢেলে।
সাগর-নদী উঠ্‌ছে ভ'রে,
কাঁদছে সবাই সল্লা ক'রে।
কান্না থেমে হাসির বানে
ভরুক ভুবন সকল খানে।
আয় ত' হাসি আয় ত' বুকে,
ভোরের আলোর নতুন সুখে।
আয় ত' সবুজ বনে বনে,
আয় ত সুনীল গগন-কোণে।
সবুজ পাতায়, ফুলের ঝাড়ে—
বিলিয়ে খুসি আয় সবারে।
হল্লা ক'রে আয় রে সবে,
পাল্লা দিয়ে হাস্‌তে হবে।"
হারু গোঁসাই সেদিন ভোরে
হাসেন বিষম রকম জোরে।
ইস্কুলেতে অঙ্ক ভুলে
হাস্‌ছে সবাই দুলে দুলে।
ঘরে ঘরে ছুটছে হাসি,
হাস্‌ছে খুড়ি, হাস্‌ছে মাসি।
ককিয়ে বলে দাদামশাই—
"আয়রে দাদা, হাস্ না রে ভাই।"
নাচেন তিনি হাসির সাথে
আল্‌সে ধ'রে চিলের ছাতে।
ঠান্‌দি' হঠাৎ এলেন ছুটি
কুইনাইনের বড়ি দুটি
গিলিয়ে দিলেন হারুদা'কে
থাব্‌ড়া মেরে ধ্যাব্‌ড়া নাকে।

এক নিমেষে থাম্‌ল হাসি;
পালিয়ে গেল সটান্ কাশী।
ককাই দেশের কান্না কেম—
হাসির দেশে টান্‌ল জের।

একটি ধূসর বস্তু

(কাহিনী)

রুণু, মণ্টু ও তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের জন্যে লেখা

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

বুড়ী শাক-উলীর পালং শাক, ধনে শাক আর উচ্ছের ভাগার পাশে সেদিন আর একটি ভাগা দেখা গেল। খরিদ্দারেরা হেসে শুধায়, "হ্যাঁ গো বাছা, এই ভাগাটিও দেবে নাকি তুলে, ঐ দু'পয়সায় তিন ভাগা হ'লো ত'?" কেউ বা তার লম্বা লেজটি উঁচু ক'রে ধ'রে বলে, "ওরে বাবা, এ যে দেখ্‌ছি বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি!" কলাপাতার যে কোণটিতে এক ফালি রোদ্দুর ঝিক্ ঝিক্ করছে, সেইখানটিতে কুণ্ডলী পাকানো ভাগাটি কেউটে সাপের ফণার মত ধারাল মাথা চাবুক-গতিতে উঁচিয়ে তুলে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়। খরিদ্দাররা হুড় মুড় ক'রে দূরে পালায়। শাক-উলী তার পায়ে বাঁধা দড়িটা ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে এনে আশ্বাস দিয়ে বলে, "না গো বাপু, তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? ও-ও কামড়াবে না, এই ত' দিন পনেরোর বাচ্চা, আমার ছেলেটা যকোন ওরে ধরেছিলো, কানাচের গত্ত থেকে, তকোন বলে কিনা ওর চোখ অবদি ফোটে নি ভালো ক'রে। ছেলেটা বলে, মা আমি ওটারে পুষবো। আমি বলি, আমাদের নিজেরই পেটে বলে ভাত নেই, তায় আবার এই উপসগ্‌গ! বলি, বলি যাই গে আজ বাজারে নে' যাই, যদি বাবুরা কেউ কেনে পোষবার জন্যে।" খরিদ্দার জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ গা, কী জন্তু ওটা? না ইঁদুর, না ছুঁচো, না কাঠবেড়ালী!" একজন বিজ্ঞ গোছের ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাকিয়ে বল্‌লেন, "আরে এ যে বেজীর বাচ্চা! তবে পাগুলো কালো হবার ত' কথা নয়। আর আকারেও আর একটু বড় হওয়া উচিত।" শাক-উলী প্রতিবাদ করে, "হ্যাঃ, বল্‌লেই হ'লো বেজী নয়। ওর মা'টা এই আমার চোখের সাম্‌নে একটা কেউটেরে কেটে একেবারে দু' কোন্ ক'রে ফেল্‌লে, গেল আষাঢ় মাসে। আর আপনারা বল্‌ছেন, বেজী নয়! কৈ ইঁদুর, ছুঁচো, কিম্বা

কাঠবেড়ালীর সাক্ষি হোক্ দিকি একটা ছেলে সাপ মারতে! ছেলেটা বলে, মা, বেজীর বাচ্চাটারে নে' যাচ্চো বটে, কিন্তু ছ' গণ্ডা পয়সার কমে একটি পয়সাও নয়।"

রফা হ'লো তের পয়সায়।

বেজীর পো সন্তুর দাদার পকেটে চড়ে এসে হাজির হ'লো একেবারে তার পড়ার ঘরে। পথে আস্‌তে আস্‌তে কেনা হলো পাতলা চামড়ার ঘুঙুর দেওয়া বুকে বাঁধবার বক্‌লোস আর ঘড়ির চেনের চেয়েও সরু শেকল।

সন্তুর পড়ার ঘরে দস্তুরমত সভা বসে গেল বেজীর নামকরণ নিয়ে। সন্তুর অবশ্য মনে নেই সে কথা, তার নিজের অন্নপ্রাশনের সময়েও তার নাম রাখা নিয়ে এত জল্পনা, কল্পনা, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয় নি যতটা হ'লো বেজীর বাচ্চার নাম রাখা নিয়ে।

সন্তুর দাদা চশমাটা দু' একবার নাক থেকে নামিয়ে, আবার নাকে চড়িয়ে, প্রোফেসারি গলায় বল্‌লেন, "হুঁ, তোমরা অবশ্য কিপ্‌লিঙের 'রিকি-টিকি-ট্যাভি'র গল্প পড়েছ। ওর নামও তাই রাখা হোক। রিকি-টিকি-ট্যাভি।" সন্তুর দিদিদের তা পছন্দ নয়, তাঁরা একবাক্যে বল্‌লেন, "হ্যাঃ, ইংরেজের দেওয়া নাম রাখা কেন রে বাপু? ওসব বাঙ্গালীর কাণে বেয়াড়া শোনায়।" সন্তুর পিসিমার ইচ্ছেটা যেন বেজীটার একটা ঠাকুর-দেবতার নাম রাখা হয়। তাতে ডাকবার সময় ডাকাকে ডাকা এবং পুণ্যকে পুণ্য দুই-ই হবে।

অনেক বাক্‌-বিতণ্ডার পর বেজীর পো'র যে সব নাম প্রস্তাবিত হ'ল তার ফর্দ্দটা এই :— "সাপুড়ে, রণজিৎ, হরিহর, বিশ্বনাথ, ট্যাবি, কেউটে, মঙ্গুস্‌, বৃহল্লাঙ্গুল, সর্পারি, টমি, পুষী, দুলাল, আন্তোয়ান্‌, সিকন্দর, নাপোলেয়ঁ, টিক্‌ট্যাক্‌, মধুসূদন, টিপু, চ্যাং-কাই-শেক্‌, শঙ্কর, সুলতান, কালিয়দমন।"

এক একজন এক এক রকম নাম প্রস্তাব করছে, কিন্তু কোনটাই কারো ঠিক পছন্দসই হচ্ছে না। অবশেষে সবাই গিয়ে দ্বারস্থ হলো সন্তুর এক বৌদির। সিঙ্গাপুরের এক মেমসাহেবী ইস্কুলে তিনি মানুষ। "ঘণ্ট"কে বলেন "গ্যাণ্ট্‌", "সুক্তো"কে বলেন "শুক্‌ টো", রঘুয়াকে ডাকেন "র‍্যাগ্‌গি", পিঁড়িকে বলেন "পিণ্ডি"। প্রায়ই বলেন, "পিণ্ডির উপর বসিয়া বাটু কায়াও স্বাস্থ্যকর নহে।" তিনিই ত' ঝাঁকড়া-চুলো কুকুরটার নাম রেখেছেন "পশমী", শ্যামদেশী বেড়ালটার নাম দিয়েছেন "রেশমী", চন্দনাটাকে ডাকেন "সবুজ", আর কাকাতুয়াটার নাম রেখেছেন "ঝোঁটন"। বেজীর বাচ্চাকে আদর ক'রে বল্‌লেন, "হাউ লাভ্‌লি, হাউ সুইট্‌! হোয়াট্‌ এ লিট্‌ল্‌ ডার্লিং! সণ্ট্, টুমি পেলে কোটায় এমন সুণ্ডর বস্‌টুটিকে? ও ইউ লিট্‌ল্‌ গ্রে থিং! এর নাম রাখা হোক্‌ টা'ই যার অর্ট বাংলা বাষায় এ গ্রে থিং একটি ঢূসর বস্‌টু।" সেই থেকে বেজীর বাচ্চার নাম হ'লো "পাট্‌কিলে"।

পাট্‌কিলের আস্তানা হ'লো সন্তুর পড়ার ঘরের এক কোণে। পিজ্‌বোর্ডের বাক্সে একটা ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবী। বাক্সের ডালাটাকে কেটে তাকে টন্‌-সুতো দিয়ে বেঁধে হ'লো ঘরের দরজা। লিক্‌লিকে সরু শেকলটা সন্তু বাঁধলে তার পড়ার টেবিলের একটা পায়ার সঙ্গে। পাট্‌কিলে তার নতুন আস্তানা থেকে সাপের মত মুখ বাড়িয়ে, তার ঐ ছোট্ট পুতুল-ভাল্লুকের মত নাকটি কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে কিসের গন্ধ শুঁকতে লাগ্‌লো। সন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে টাকা-আনা-পাইএর আঁক কষ্‌ছিল, পাট্‌কিলেকে দেখে তার কেমন ভালো লেগে গেল, ভারী ভালো লাগলো, যেমন ভালো লেগেছিল তার গত বছরের বন্ধু হিমাদ্রিকে। হিমাদ্রি তার বাবার সঙ্গে চলে গেল কলকাতা ছেড়ে, ইস্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট্‌ নিয়ে। যাবার সময় সন্তুকে দিয়ে গিয়েছিল তার নিজের পড়ার একখানা বই। সন্তু বইখানার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। হিমাদ্রির সঙ্গে তার প্রথম আলাপ সন্তুর পেন্‌সিল কাটবার ছুরিখানা নিয়ে। হিমাদ্রি চেয়ে নিয়েছিল, কিন্তু টিফিনের সময় অসাবধানতা বশতঃ হারিয়ে ফেলে। বলে, "ভাই, এই নতুন ছুরিখানা তুমি নাও।" সন্তুর চোখে প্রায় জল এসেছিলো। সে কি জানে না? হিমাদ্রির কাছে গুনোগার নেবে? তার পর প্রায় প্রতিদিন বিকালে তারা একসঙ্গে বেড়াতে যেত। প্রায় সকালে পড়া জানবার ছুতো ক'রে সন্তু যেত হিমাদ্রিদের বাড়ীতে তার ছোট্ট সাইকেলখানায় চড়ে, মিনিট পাঁচেকের জন্যে। হিমাদ্রিকে যেমন ভালো লাগতো, পাট্‌কিলেকে দেখে সন্তুর যেন ঠিক সেই রকম ভালো লেগে গেল। পাট্‌কিলে তার আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে এমন উট-মুখো হয়ে সন্তুর দিকে তাকিয়ে রইল যে সন্তু হাসি চেপে রাখতে পারলে না। তার চেহারা দেখলে সত্যিই হাসি পায়। বিশেষ ক'রে যখন সে মুখখানা উঁচু ক'রে যেন কিসের গন্ধ শোঁকে, উট যেমন ক'রে মরুভূমির ভেতর ঝড়ের গন্ধ পায়, তেমনি ভঙ্গী ক'রে। পাট্‌কিলে আরো কাছে এসে সন্তুর একেবারে পায়ের ওপর সাম্‌নের ছোট্ট কালো পা দু'খানি রেখে তা'কে খুব কাছ থেকে শুঁকতে লাগলো। তার পর তার একখানা চটির ভিতর তার ঐ ছোট্ট দেহটির যতটা সম্ভব পূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল। সন্তু বুঝতে পারলে, পাট্‌কিলে তা'কে বন্ধু ব'লে স্বীকার করলে। সন্তুও পাট্‌কিলের গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে জানিয়ে দিলে সে তার বন্ধু। এখন থেকে হ'লো তারা দুই বন্ধু,—সন্তু আর পাট্‌কিলে, যেমন ছিল সন্তু আর হিমাদ্রি। সন্তু পাট্‌কিলের গলা থেকে শেকল খুলে দিলে।

শীতকালের বেলা যেমন হু-হু করে বেড়ে ওঠে, পাট্‌কিলে তেমনি কয়েক দিনের মধ্যেই একেবারে চোখের সাম্‌নে দিব্যি ডাগরটি হয়ে উঠ্‌লো। দু'বেলা তাকে দেওয়া হয় দু' রেকাবী দুধ, আর মাঝখানে এটা, ওটা, সেটা, কখনো বা একটু মাছ, মাংস থাক্‌লে মাংস আর না হয় কোনো মিষ্টি ফল। মিষ্টি পেলে সে আর কিছু চায় না। সন্তুর জল খাবারের সন্দেশখানা ত তারই

বয়াক। বইএর আলমারীর তলায় বসে থাক অনেকক্ষণ ধ'রে তারিয়ে তারিয়ে, সন্তু যা যেন দেখতে না পায়। খাওয়া শেষ হ'লে জিভ দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পাটকিলে এসে বসে সন্তুর টেবিলের তলায় চুপটি ক'রে। অনেকক্ষণ বসে থাকে। সন্ধ্যেবেলা যেমনি শাঁখটি বাজলো তখন আর পাটকিলে স্থির থাকতে পারে না। ঘুমে তার চোখ দু'টি ঢুলে আসে। ঘন ঘন হাই তোলে, সাপের মত জিভটি বার করে, আর শালিক পাখীর ডাকের মত এক রকম শব্দ ক'রে জানিয়ে দেয়, তার দুধ খাবার সময় হয়েছে। দুধটি খায় চকচকিয়ে আর ঢোকে তার আস্তানায় সারা রাতের মত।

সন্তুর এখন ছুটি। হাতে সময় তার প্রচুর, বড় মানুষের পকেটে পয়সার মত অজস্র খরচ করা চলে। সকাল সন্ধ্যেয় আঁক কষা, আর সারাটা দুপুর তার একেবারে ফাঁকা, আসবাবহীন ঘরের মত। সন্তু সারাটি দুপুর কাটায় পাটকিলের সঙ্গে। বাড়ীতে লোক বেশী নেই। দাদারা, বৌদিরা প্রায় সকলেই যে যার মোটর নিয়ে গেছেন হাওয়া খেতে, বাড়ীতে মন টেঁকে না। সন্তু তার পোষাকের আলমারী খুলে বার করে যোধপুরী পায়জামা, শেরোয়াণীর ওপর লাগায় ক্রস্-বেল্ট, কাঁধে ফেলে তার ছোট্ট বন্দুক; পাটকিলেকে সঙ্গে নিয়ে যায় শিকার করতে, তাদের প্রকাণ্ড বাগানের পেছন দিকটায়, যেখানে পুকুরের ধারে একটা মস্ত বটগাছ থেকে সন্ন্যাসীর জটার মত ঝুরি নেমেছে।

প্রথম প্রথম সন্তু পাটকিলেকে শেকলে বেঁধে নিয়ে যেত। পাছে হঠাৎ পাটকিলের মনে পড়ে যায়, তার জন্ম বনে-জঙ্গলে, আর মানুষের বন্ধুতা ভুলে সে চলে যায় কোন্ গর্ত্তের কেল্লা আর মাটির তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে তার আপন দেশে। সন্তুর হাত থেকে একদিন শেকল ফসকে গেল। পাটকিলে যাচ্ছিল আগে আগে, মাটি শুঁকতে শুঁকতে, কাণ খাড়া ক'রে, পথে যদি কোনো বিপদ্ থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। শেকল শুদ্ধ সে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। কিন্তু সন্তুর পায়ের শব্দ না পেয়ে পাটকিলে থম্‌কে দাঁড়ালো। গলার শেকল মাটিতে লুটোতে লুটোতে ফিরে এসে দাঁড়ালো সন্তুর পায়ের কাছে, উটের মত মুখটি উঁচু করে। সন্তুর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। সে শেকলটা পাটকিলের গলা থেকে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে পুকুরের জলে। মনে মনে বল্‌লে, যে বন্ধুকে লোহার শিকলে নিজের কাছে আটক ক'রে রাখতে হয়, তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। যাক্ না সে চলে, হিমাদ্রিও ত' চলে গেছে। সে না হয় একলাই থাক্‌বে সারা জীবন। পাটকিলে চলে আগে আগে, মাটি শুঁকতে শুঁকতে আর ফিরে ফিরে তাকায় পেছন দিকে, সন্তু আসছে কি না।

পাটকিলের প্রথম শিকার এক তেলে কাঁকড়া, পুকুরের ঘাটের এক পাশে। দাড়া দু'টো উঁচু ক'রে ডাঙ্গা দিয়ে চলেছিল, পাটকিলে ছুটে এসে মার্‌লে এক থাবা। তেলে কাঁকড়া

চোট খেয়ে উল্টে পড়লো চিৎ হয়ে। পাট্‌কিলে চোখের নিমেষে কামড়ে ধরলে তার পেটটা, এমন জায়গায় যেখানে কাঁকড়া দাড়া দিয়ে তার নাগাল পায় না। সেই অবস্থায় সেটাকে ধরে তুলে নিয়ে পাট্‌কিলে এসে হাজির হোলো সন্তুর কাছে! পাটকিলের প্রথম শিকার। সেদিন সন্ধ্যেবেলা কাঁকড়ার শাঁস ভাগাভাগি হয়ে পড়লো তাদের দু'জনের পাতে। খোলাটাকে ভুয়ো ক'রে শুকিয়ে সন্তু তুলে রাখ্‌লে, যেমন তার এক কাকার নিজের হাতে শিকার করা বাঘ-ভাল্লুক আর নানান্ রঙের মরা পাখী সাজানো থাকে তাঁর বাড়ীতে।

পাট্‌কিলের দ্বিতীয় শিকার এক গিরগিটি। এক গাছ থেকে নেমে আর এক গাছে যাবার জন্যে মাটিতে হেঁটে যাচ্ছিল। পাট্‌কিলে দাঁড়ালো তার পথ আগ্‌লে। গিরগিটির তখন পালাবার উপায় নেই। গেরি মাটির মত রং ধ'রে সে ঘুরে দাঁড়ালো আত্মরক্ষার জন্যে। দু'জনে চোখোচোখি হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কারো চোখে পাতাটি পড়ে না। সন্তু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, ভাব্‌ছে গিরিগিটি হয়তো পাট্‌কিলেকে হিপ্‌নোটাইজ্ ক'রে ফেল্‌বে। টিকটিকি গিরগিটিদের নাকি ঐ রকম ক্ষমতা আছে। গিরগিটির চোখের অসাধারণ তেজ, কতকটা উন্মাদের মত। পাট্‌কিলের কিন্তু তাকাবার ভঙ্গী অন্য রকম, তার চাউনি ভারী সংযত, শান্ত। সন্তু দেখলে হঠাৎ পাট্‌কিলে লাফিয়ে উঠে একটু পেছিয়ে গেল। গিরগিটি আক্রমণ করতে গিয়েছিল, কিন্তু পারলে না। পাট্‌কিলের কাছেই এসে লাফিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পাটকিলে ধরলে গিরগিটির ঘাড় টিপে, তার ধারাল দাঁত দিয়ে গিরগিটির মাথাটাকে একেবারে চিবিয়ে তাকে মাটীতে ফেলে দিলে। গিরগিটির খস্‌খসে অসাড় দেহটাকে তুলে এনে সন্তু স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখলে।

পাটকিলের মত শিকার করতে না পারে পশমী না পারে রেশমী। পশমী শুধু বৌদির কোলে শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়। রেশমী একটা ইঁদুর পর্য্যন্ত ধরতে পারে না, এমন কি তার সাম্‌নে ইঁদুর-ধরা কল থেকে ইঁদুর ছেড়ে দিলেও সে এমন ভাব দেখায় যেন দেখ্‌তেই পাচ্ছে না। আর পাটকিলে! তার প্রতাপে বাড়ীতে একটি আরশুলা পর্য্যন্ত নেই। মাকড়সার জাল যত যেখানে ছিল, আলমারীর পেছনে, গারাজ-ঘরের কোণে, ভাঁড়ার-ঘরের তাকে, সব একেবারে সাফ হয়ে গেছে। বইএর আলমারীর তলায় উইয়ের বাসার চিহ্নটি নেই। আজকাল যেখানে সেখানে মিষ্টি জিনিষ ছড়ানো থাক্‌লে একটাও ডেয়ো পিঁপড়ে এ বাড়ীতে মাথাটি পর্য্যন্ত গলায় না। সন্তুর এক বৌদি এক একবার ঠাট্টা ক'রে বলেন, "ভাই ঠাকুরপো, তোমার ঐ ফ্লিট-জন্তুটাকে আমাদের ঘরে একবার ছেড়ে দিও ত', আলমারীটায় বেজায় আরশুলার বাচ্চা জমেছে।" কেউ বা জিজ্ঞেস করে, "কি হে সন্তু, তোমার 'য়্যাণ্ট্-ইটার'টির খবর কি?" সন্তু মনে মনে বলে, যেদিন পাটকিলে সবার চোখের সাম্‌নে একটা গোখ্‌রোর গলা টিপে ধরবে সেইদিন তারা

বুঝবে পাটকিলের কত ক্ষমতা। গোখ্‌রোর কথা মনে হ'লে সন্তুর গা'টা শিউরে ওঠে। অতটুকু পাটকিলে, যদি সত্যিই একদিন চার হাত লম্বা একটা গোখ্‌রোর সাম্‌নে পড়ে! কুলোর মত ফণা তুলে গোখ্‌রো পাটকিলেকে আক্রমণ করতে আসছে। দৃশ্যটা মনে হ'লেও যেন ভয় হয়। পাটকিলে সাপ কোনো দিন চোখেও দেখে নি। তার মা নাকি সাপ মারতে ওস্তাদ্। কিন্তু পাটকিলে মানুষের কাছে রয়েছে প্রায় জন্মাবধি। চোখ ফুটে অবধি সে মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখে নি। ছোট বেলায় পাখীদের মা যেমন তাদের উড়তে শেখায়, মানুষের মা যেমন হাঁটতে শেখায়, বেজীদের মাও বোধ হয় তেমনি ক'রে শেখায় কী কায়দায় সাপের মাথা চিবিয়ে ছাতু করতে হয়। সন্তু মনে মনে স্থির করলে পাটকিলেকে অন্ততঃ সাপ জিনিষটা কী তা একবার দেখানোও উচিত।

পরের দিন নতুন বাজারের খেলনার দোকান থেকে এল এক লম্বা রবারের সাপ। অবিকল জলজ্যান্ত সাপের মত তার চেহারা। সন্তু সাপটাকে জান্‌লার পেছনে লুকিয়ে রাখ্‌লে। তার পর সন্ধ্যেবেলা জান্‌লাটা বন্ধ করবার ভান ক'রে যেমন তাতে হাত দিয়েছে অমনি সাপটা মাটিতে পড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো। পাটকিলে ছিল টেবিলের তলায়। বিদ্যুৎ-গতিতে রবারের সাপের টুঁটি টিপে ধরলে। তার পর কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর সাপটা যখন নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল তখন পাটকিলে শান্ত হয়ে তার আস্তানায় ফিরে এল। সন্তু তাড়াতাড়ি সাপটাকে লুকিয়ে ফেল্‌লে, পাছে পাটকিলে বুঝ্‌তে পারে ওটা শুধু খেলনার সাপ।

সেদিন রাতে পাটকিলে স্থির হয়ে ঘুমোতে পারলে না। এ বাড়ীর ওপর যে তার একটা গুরুতর কর্ত্তব্য আছে তা যেন তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সন্তু তাকে কত সাধাসাধি ক'রে পূরে দেয় পিজ্‌বোর্ডের বাক্‌সটার মধ্যে, কিন্তু পাটকিলে বেরিয়ে আসে। সারা রাত বাড়ীর সর্ব্বত্র শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। ঐ লম্বা জন্তুটা কোথাও লুকিয়ে আছে কি না।

সকালে উঠে সন্তু দেখে তার খাটের ওপর পায়ের কাছে শুয়ে আছে পাট্‌কিলে। হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙ্গে সে উঠে দাঁড়ালো। সন্তু তাকে আদর ক'রে লেপের মধ্যে টেনে নিলে। হেসে জিজ্ঞেস করে, "পাগল, বোকচন্দর, সারা রাত পাহারা দিয়েছিস বুঝি?" তাকে বুকের ওপর চেপে ধরে। পাটকিলে কুকুরের মত সাম্‌নের পা' দু'খানির ওপর মাথাটি রেখে সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখ্‌লে অনেক সময় কুকুরের মত মনে হয়। কুকুরের মতই সে বিশ্বস্ত, মানুষের বন্ধু, সঙ্গী, প্রহরী। সন্তু ভাবে, জংলী জানোয়ার, কী ক'রে অমন পোষ মানে! সন্তুকে ছেড়ে পাটকিলে একদণ্ড থাক্‌তে পারে না। যেখানে সন্তু সেইখানে পাটকিলে, এমন কি সন্তু স্নান করতে কল-ঘরে ঢুক্‌লে পাটকিলে দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না তার স্নান শেষ হয়। সন্তুর পড়বার বা শোবার ঘরে কারো ঢোকবার সাধ্য নেই।

কুকুরের মত খ্যাঁক ক'রে শব্দ ক'রে কামড়াতে আসে। অচেনা লোকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত ঢোকবার উপায় নেই। সজারুর মত ফুলে উঠে খ্যাঁক্ করে শব্দ ক'রে পায়ে দেয় কামড়ে। নতুন ঝি-চাকররা ত' প্রথম কয়েকদিন ভয়েই অস্থির।

সন্তুর পড়ার ঘরের আস্তানা ছেড়ে পাটকিলে সন্তুর খাটের এক ধারে নিজের বিছানা ঠিক করে নিলে। থাকে কখনো বা লেপের ভেতর, কখনো বা লেপের ওপরটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মুখটি থাকে তার দু'টো পায়ের মাঝখানে লুকানো, কিন্তু তার ঐ বাদামের খোলার মত ছোট্ট কান দু'টি থাকে সজাগ সারা রাত্রি। সামান্য একটু খুস্‌-খাস শব্দ হয়েছে কি—পাটকিলে ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে খ্যাঁক্ ক'রে শব্দ ক'রে ওঠে। তখন তার চেহারা দেখে মনে হয় সন্তুকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সন্তুর আর বেলা করে ওঠবার উপায় নেই। একটু ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটকিলে তার ছোট্ট পা দিয়ে সন্তুর চোখের পাতার ওপর আঁচ্‌ড়াতে থাকে—নখগুলো গুটিয়ে নিয়ে, পাছে তার মুখ ছড়ে যায়। তার ঠাণ্ডা মুখটি সন্তুর মুখে বুলিয়ে দেয় আস্তে আস্তে। সন্তু যদি পাশ ফিরে শোয় ত' পাটকিলে আস্তে আস্তে কাম্‌ড়ে ধরে তার কান, আর না হয় টানে চুল ধরে। বিরক্ত হয়ে এক একদিন সন্তু পাটকিলেকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দোর দেয়। পাটকিলে নখ দিয়ে দোর আঁচড়ায়, কখনো বা খুব জোরে দুড়দাড় ক'রে দোর ঠেলে। সন্তু উঠে মজা দেখবার জন্যে জিজ্ঞেস করে, "কে ও?" অমনি দরজার তলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে খানিকটা ধূসর রঙের লেজ, আর না হয় কালো একখানি ছোট্ট থাবা, ঠিক কুকুরের থাবার মত। সন্তু হেসে বলে, "ওঃ পাটকিলে! আমি বলি বুঝি চোর-ডাকাত।" দোর খুলে দেয় তাড়াতাড়ি। পাটকিলে একলাফে সন্তুর বিছানায় উঠে পড়ে তার লেপের খাঁজগুলোর ভেতর উধাও হ'য়ে যায়। তার খানিক পরে সে এসে হাজির হয় সন্তুর পায়ের কাছটিতে, আর না হয় একেবারে তার বুকের ওপর।

পাটকিলের সাম্‌নে সন্তুর কাছে কারো আসবার জোটি নেই। হিংসেয় তার অতটুকু শরীরটি ভরপূর। সন্তুকে আদর করবার ভান করেও যদি কেউ তার গলা জড়িয়ে ধরে ত' পাটকিলে তার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে বিকট চীৎকার ক'রে আক্রমণ করতে আসে। অজয়ের সঙ্গে একবার বেড়াতে যাওয়া নিয়ে হিমাদ্রি সন্তুর সঙ্গে তিন দিন কথা কয় নি, মনে পড়ে। পশমী কি রেশমীর সন্তুর ছায়াটি পর্য্যন্ত মাড়াবার হুকুম নেই, বিশেষতঃ রেশমীর। আকারে রেশমীর চেয়ে পাটকিলে ঢের ছোট। কিন্তু পাটকিলের তাড়া খেয়ে রেশমী পালাবার পথ পায় না। সবুজ আর ঝোঁটন, দু'জনেই থাকে দাঁড়ের ওপর। সন্তু এক একবার মজা দেখবার জন্যে সবুজকে আদর করতে যায়, ঝোঁটনের ঝুঁটি চুল্‌কে দেয়, আরামে ঝোঁটনের

চোখ দু'টি বুজে আসে। পাটকিলে রেগে গস্‌গসিয়ে খাট থেকে লাফিয়ে উঠে ঝোঁটন আর সবুজকে আক্রমণ করতে যায়। অত উঁচু লাফানো তার সাধ্য নয়। লাফায় আর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ে, ঠিক যেন "শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের" ছবি। কিন্তু "দ্রাক্ষাফলগুলি অম্ল" ব'লে ক্ষান্ত হবার ছেলে পাটকিলে নয়। যত আছাড় খায় তত চড়ে তার রোখ। অবশেষে সন্তু হেসে পাটকিলেকে কোলে তুলে নেয়। সন্তুর কাঁধে চড়ে বিজয়গর্ব্বে সে তাকায় সবুজ আর ঝোঁটনের দিকে। সন্তুর ঠাট্টা সম্পর্কের লোকেরা কেউ কেউ হেসে বলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে ঠাকুরপো, কত দিন চলে এমন ক'রে। দেখ্‌বো।" বাবারে বাবা, জগতের বৌদি'গুলো এমন জ্বালাতেও পারে! পাটকিলেকে কাঁধে নিয়ে সন্তু রাগ ক'রে পড়ার ঘরে দোর দেয়। বলে, সে আজ খাবে না, খাবে না, খাবে না। বৌদি বলেন, "তা ভাই রাগ ক'রে গোঁসা-ঘরে দোর দিও না, ঠাকুরপো, বলো ত' এই মাঘ মাসেই—।" সন্তু লজ্জায় দোর খুলে বলে, "কিন্তু ফের যদি—", তার কথা ফুরোবার আগেই পাটকিলে বৌদির আল্‌তা-টুক্‌টুকে পায়ের বুড়ো আঙুলটি লক্ষ্য ক'রে ছুটে যায়। বৌদি ভয়ে পালিয়ে যান। বলেন, "বাবা! ঠাকুরপোর বাহনটিও যা হয়েছে, একেবারে যোড় মেলানো।"

দুপুরবেলা এক একদিন সন্তু বৌদির সঙ্গে দাবা খেল্‌তে বসে। দাবা খেলাটা নাকি ভারী বুদ্ধিমানের খেলা, প্রত্যেকটি বড়ের চালের জন্য কতই না মাথা ঘামাতে হয়। এ লুডোও না, স্নেক্‌স্ য়্যাণ্ড্ ল্যাডারস্‌ও না যে ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে খেলা যায়। এ যেন খুব জটিল একটা বুদ্ধির অঙ্ক। ছোট্ট টেবিলটার দু'পাশে দু'খানা ছোট মোড়া পেতে তাঁরা খেল্‌তে বসেন। পাটকিলে বুঝ্‌তে পারে, এ খেলায় একবার মজ্‌লে সন্তু সারাটা দু'পুর ঐ নিয়েই কাটাবে, তার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না। কেন, তাকে নিয়েও ত' সন্তু খেল্‌তে পারে! ব্যাড্‌মিন্টনের পশমের বলটা নিয়ে খেল্‌বার সময় তার খোঁজ হয়, বাগানে বেড়াতে যাবার সময় তার ডাক পড়ে, আর এই খেলাটার বেলাতেই তার যত দোষ! পাটকিলে পাশের একখানা চেয়ারে উঠে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দাবার দিকে। খেলা চলে পুরোদমে, সন্তু আর তার বৌদি দু'জনেই তন্ময় হয়ে যান্। পাটকিলেও চুপ করে বসে থাকে, যেন কী একটা চালের কথা ভাব্‌ছে খুব মন দিয়ে। হঠাৎ পাটকিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাবা-বড়ের ওপর, তার পর এক নিমেষে বৌদির মন্ত্রীটার গলাটা টিপে ধরে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে লুকোয় আলমারীর তলায়। সন্তু আর বৌদি দু'জনেই হেসে ওঠেন। বৌদি বলেন, "ভাই ঠাকুরপো, দুর্য্যোধনের ইঁদুরটির মত খুব শিখিয়েছ নিজের বাহনটিকে যা হোক। আচ্ছা, ও জান্‌লে কী ক'রে যে ওটা আমার মন্ত্রী, আর আমি মন্ত্রীটার একটা মাৎ'এর চাল ঠাওরাচ্ছিলাম! তা ভাই আমার ত আর রাজত্বি নেই!"

এমনি করে হেসে খেলে দিন যায় সন্তুর আর পাটকিলের।

কিন্তু সবার ত আর সব দিন সমান যায় না। সন্তু আর পাটকিলের বিচ্ছেদের দিন এলো একদিন; ঠিক যেন নিয়তির নির্দেশ। ভাগ্য ব'লে যে একখানা লটারীর চাকা ঘুরছে, সেটা কোথায় গিয়ে থামবে তা কেউ বল্‌তে পারে না।

সন্তুর ইস্কুল খুল্‌লো। দশটার সময় সে বাড়ী থেকে বেরোয়, ফেরে সাড়ে চারটেয়। পাটকিলে বুঝ্‌তে পারে না, সারা দিন সন্তু বাড়ীতে থাকে না কেন। যাবার সময় কী যেন অনেক কথা বলে যায়, মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়, ফিরে এসে আবার আদর করে, আগে আগে যেমন করতো তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সারাটা দিন পাটকিলের যে কী ভাবে কাটে! সমস্ত বাড়ীটায় পাটকিলে সন্তুকে খুঁজে বেড়ায়, এ ঘর, ও ঘর, সে ঘর, ছাদে, কলঘরে, বৈঠকখানায়, গারাজ-ঘরে। সন্তুর দেখা মেলে না। বাড়ীশুদ্ধ লোক চীৎকার ক'রে হাসে তার রকমসকম দেখে। এমন কি ঝোঁটনটা পর্য্যন্ত দাঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খক্ খক্ ক'রে হাসে। রেশমীটা দেখিয়ে দেখিয়ে বৌদির আদর খায়। পশমী আড়ম্বর ক'রে হাড় চিবোয় অনেকক্ষণ ধ'রে। কিন্তু পাটকিলেকে অনেক সময় খাবার দিতে পর্য্যন্ত কারো মনে থাকে না।

একদিন সন্তু যখন বাড়ী ফিরল, তখন পাটকিলে তাকে অনেক কথা বল্‌তে চেষ্টা করলে, তার মুখটি উঁচু দিকে তুলে, শালিক পাখীর ডাকের মত শব্দ ক'রে। সন্তু তার নালিশ বুঝ্‌তে পারে না। পাটকিলে যে তাকে কাল থেকে বাড়ী থেকে বেরোতে বারণ করছে, তা সন্তুর মনেও হ'ল না। সন্তু ইস্কুলের এক নতুন বন্ধুর সঙ্গে পড়ার ঘরে ব'সে গল্প করে, নতুন বছরের বই নিয়ে আলোচনা করে। পাটকিলে অচেনা লোকটিকে কামড়াতে যায়। সন্তু ধম্‌কে ওঠে। পাটকিলের রোখ্ চেপে যায়, সে আবার তেড়ে আসে সন্তুর নতুন বন্ধুকে কামড়াতে। বিরক্ত হয়ে সন্তু তাকে ঘর থেকে বার ক'রে দিলে। পাটকিলে অনেকক্ষণ ধ'রে দরজার ওপর নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগ্‌লো, কিন্তু সন্তু তা কাণেও তুল্‌লে না। তার নতুন বন্ধু সুহৃদের সঙ্গে কাটালে সারা সন্ধ্যেটা গল্প ক'রে। সুহৃদ্‌কে দেখ্‌তে অনেকটা হিমাদ্রির মত। সে রংপুর থেকে এ বছর কলকাতায় এসেছে; তার কথায় একটু উত্তর বঙ্গের টান আছে, ভারী মিষ্টি শোনায়। হিমাদ্রি আবার নতুন হয়ে ফিরলো নাকি?

পাটকিলে সেদিন সন্ধ্যেবেলা দুধের রেকাবীতে মুখ দিলে না পর্য্যন্ত। সন্তুর বিছানার ধারেও গেল না, আস্তে আস্তে ঢুক্‌লো নিজের পুরানো আস্তানায়। সন্তু তখন ভাব্‌ছে তার নতুন বন্ধুর কথা। সুহৃদ্ কী ভাবে কথা কয়! একবার জিজ্ঞেস করবে নাকি তার সঙ্গে হিমাদ্রির পরিচয় আছে কিনা? তারও ত' বাড়ী রংপুরে। সারা রাত তার মনের চারিপাশে ঘুরতে থাকে হিমাদ্রি আর সুহৃদ্, সুহৃদ্ আর হিমাদ্রি।

পরের দিন সন্তুর পাটকিলের কথা মনেও রইল না। রোজ সকালে সে নিজের হাতে তাকে যে দুধ খাওয়াত তাও না। সাড়ে ন'টা না বাজ্‌তেই ছুটলো ইস্কুলে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে, এতক্ষণ হয়তো সুহৃদ্ এসেছে। যাবার সময় পাটকিলেকে একটু আদরও ক'রে গেল না। পাটকিলে দেখ্‌লে সন্তু পড়ার ঘরে নেই। ছাদ থেকে গারাজ-ঘর পর্য্যন্ত একবার খুঁজে এলো। সন্তু নেই; বৌদির ঘরেও নেই, খাবার ঘরেও নেই। ফিরে এল নিজের আস্তানায়। সাম্‌নের পা দু'খানি মুড়ে তার ওপর কেউটের মুখের মত মুখখানি রেখে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপ্ ক'রে। বেলা বাড়লো, বারোটা, একটা, দু'টো। চাকরবাকররা সবাই খেয়ে দেয়ে খালি বৈঠকখানায় কী একটা খেলা নিয়ে খেল্‌তে বসলো। বাড়ী আস্তে আস্তে নিঝুম হয়ে এল, যেন রাত দু'টো। পাটকিলে বেরিয়ে এল সন্তুর পড়ার ঘর থেকে। দালানে ঝোঁটন আর সবুজ চোখ মুদে, এক পা তুলে ঢুল্‌ছে। পশমী আর রেশমী বৌদির ঘরে। পাটকিলে একলা, একেবারে নিঃসঙ্গ। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। খাবার ঘর, রান্না-ঘর, উঠান, তার পর ধূ-ধূ করছে সন্তুদের বাগান। দূরে ঝুরি-নামা বটগাছটা—যেখানে তারা শিকার করতে যেত। পুকুরটা দেখা যাচ্ছে, রোদ্দুর পড়ে তার জল ঝিক্‌মিক্ করছে। পুকুরের পাড়ে কত রকমের ছোট বড় গর্ত্ত। পাটকিলের হঠাৎ মনে পড়লো একটা গর্ত্তের কথা। তখনো তার ভালো ক'রে চোখ ফোটে নি। অন্ধকার সুড়ঙ্গ। তার ভেতর কে ছিল? সন্তু কি? ঝোঁটনও না, সবুজও না, পশমীও না, রেশমী ত' নয়ই! কে ছিল? কে ছিল? তার নজর পড়লো নিজের শরীরের দিকে। লম্বা লেজ, পাটকিলে রং, গায়ে রোঁয়া। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর ছিল যেন এই রকম একটি চেহারা। ভারী নরম, তার ওপর মুখ রেখে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে শুত কী? কখনো কখনো তার সর্ব্বাঙ্গ চেটে কি তাকে পরিষ্কার করতো? চোখে তাকে ভালো ক'রে দেখ্‌তে পেত না, কিন্তু তার স্নেহভরা স্পর্শের কথা মনে পড়লো পাটকিলের। হঠাৎ সে বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, মানুষের কান্নার মত। তার পর রোয়াক থেকে লাফিয়ে পড়লো উঠানে। উঠান ছাড়িয়ে দৌড়ল তীরের মত, পুকুরের পাড় দিয়ে বাগান পার হ'য়ে উধাও হ'য়ে গেল ধূ-ধূ করা মাঠ ছাড়িয়ে।

জগৎমোহন

শ্রী..................

অগ্রহায়ণ মাসের 'রামধনু'তে তোমরা 'রামধনু'র একজন বিশিষ্ট লেখক জগৎমোহন সেনের অকালমৃত্যুর খবর পেয়েছ। আজ তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল্‌ব।

জগৎমোহন জন্মেছিলেন ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে, কটকে। তাঁর বাবা ৺ভুবনমোহন সেন ছিলেন কটকের উকিল, তাঁর পিতামহ ছিলেন ৺প্যারীমোহন সেন—উড়িষ্যার স্কুল সমূহের পরিদর্শক। কটকে প্যারীমোহন সেনের নামে রাস্তা—সেই রাস্তার উপরই জগৎমোহনের বাড়ী। এঁরা বহু দিন হ'তেই উড়িষ্যা-প্রবাসী।

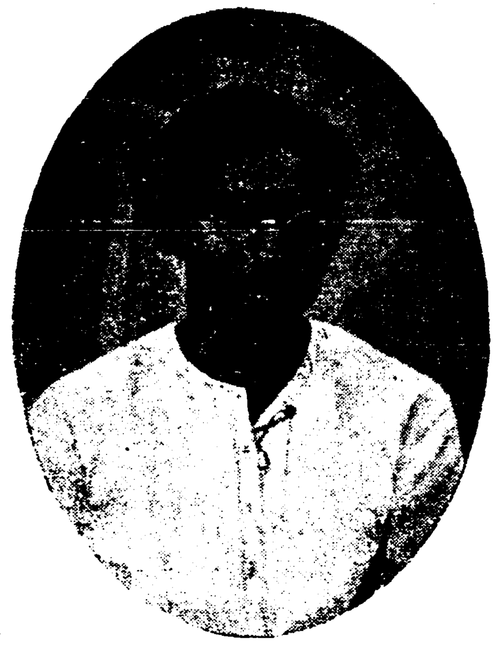

স্বর্গীয় জগৎমোহন সেন

জগৎমোহন যখন স্কুলে পড়েন, তখনই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। কটক কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এস্-সি পাশ করেন। পাশ করার পর তিনি শিক্ষা-বিভাগে সরকারী চাকরি পান এবং এক বছর পরে কটক টীচার্স ট্রেনিং কলেজে বিজ্ঞান, ভূগোল, ড্রয়িং ইত্যাদির শিক্ষক হ'ন। এই সময়ে সুবিখ্যাত কবি কবিশেখর কালিদাস রায়ের কন্যা কবিতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর এই চাকুরি অস্থায়ী ছিল। সম্ভবতঃ অন্য প্রদেশবাসী বাঙ্গালী ব'লেই তাঁর চাকরী স্থায়ী হয় নি। এর পর তিনি ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন।

জগৎমোহন শিক্ষকতার সঙ্গে সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পের চর্চ্চা করতেন। তিনি কবিতা লিখতেন, তাঁর অনেক কবিতা ভারতবর্ষ, বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ছেলেদের পাঠ্য-পুস্তকেও তাঁর অনেক কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর একটি কবিতা এখানে তুলে দিলাম—

"মুক্তি লভি হর্ষে সারা   উপল-পথে ঝরণা-ধারা
উছলি পড়ে গিরির গায়ে গায়ে,
লহরীগুলি আকুলি লুটে   তাদের হাসি ফেনায়ে উঠে,
নূপুরগুলি বাজিছে পায়ে পায়ে।
প্রতি প্রভাতে ভানুর কর   লুটায় তার তনুর 'পর
সুরভি গিরি-পবন দেয় দোল,
বরষা রাখে সতেজ করি   জ্যোছনা লয় শোচনা হরি'
সিন্ধু তারে ডাকিয়া উতরোল।
সে আবাহনে সরল প্রাণ   গাহিয়া উঠে তরল তান,
পথের বাধা তাহাতে কিবা ভয় ?
শাসনশিলা কি দিবে পীড়া   ব্রজের ডাকে সে যেন 'মীরা'
বেদনা তার তাও যে মধুময়।
যে শিলা তারে আঘাত হানে   তারে সে হাসি বক্ষে টানে
শিলার বুকে লীলার গীতি উঠে,
সরমে শিলা মরমে মরি'   পথের পাশে রহে যে পড়ি'
চির তরুণী ঝরণা-ধারা ছুটে।"

তিনি ছেলেদের জন্য গল্প লিখ্‌তেন। রামধনুতে তাঁর অনেক লেখা তোমরা পড়েছ। তাঁর উড়িষ্যার গল্পগুলি 'উৎকলিকা' নামক বই হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছে। কোণার্ক ও ধর্ম্মপদ তাঁর বিখ্যাত গল্প। বিজ্ঞানের কথা তিনি খুব সরস ক'রে লিখতে পারতেন। রামধনুতে তিনি জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কৈশোরক নামক মাসিক পত্রে 'ডিম্বপুরাণ' নামে তাঁর একখানি পক্ষি-বিজ্ঞানের বই ধারাবাহিক রূপে বেরিয়ে গিয়েছে। 'চিড়িয়াখানার গণৎকার' নামে তাঁর একখানা বই যন্ত্রস্থ আছে। তাঁর ভৌগোলিক প্রবন্ধগুলোও হ'ত চমৎকার।

জগৎমোহন উড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধেও গবেষণা করে গেছেন। প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের তুলনা ক'রে তিনি ভারতবর্ষে ধারাবাহিক

প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলায় যেমন তিনি প্রবন্ধ, গল্প লিখতেন উড়িয়া ভাষাতেও ঠিক তেমনি লিখতেন। উড়িয়া মাসিক পত্রে সেগুলো বেরুত।

সাহিত্যচর্চ্চার মত চিত্রাঙ্কনেও তাঁর অনুরাগ ছিল। ম্যাপ, চার্ট, ডায়াগ্রাম ইত্যাদির অঙ্কন তাঁর শিক্ষকতা ব্রতের অঙ্গ ছিল। কাঠের উপর তিনি ল্যাণ্ড্‌স্‌কেপ্‌ চিত্র আঁকতেন, অনেক উড়িয়া বই ও সাময়িক পত্রের প্রচ্ছদপট তাঁরই আঁকা। তাঁর রচিত পুস্তকের সমস্ত ছবিই তিনি নিজে আঁকতেন। চিত্রশিল্প ছাড়া সূচিশিল্প, সঙ্গীত, সীবনশিল্প ইত্যাদিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। ঘড়ি, দূরবীণ, ক্যামেরা ইত্যাদি যন্ত্র তিনি মেরামত করতে পারতেন। আর খেলা-ধূলাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

তাঁর পড়াবার ধরণ ছিল যেমন সরস, তেমনি চিত্তাকর্ষক। ছাত্রেরা তাঁকে বড় ভাইএর মত মনে করত। সর্ব্বদা ছেলেদের সঙ্গে নিজে খেলাধূলা, উৎসব-আমোদ করতেন—অথচ গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চল্‌তেন। চরিত্রের মাধুর্য্য ও নম্রতার জন্য তাঁকে সকলেই ভালবাস্‌ত।

তিনি বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করে গেছেন। বিশেষজ্ঞেরা সে সব বইএর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্যাকরণিকার' প্রশংসা ক'রে দীর্ঘ পত্র দিয়েছেন। তাঁর রচনাভঙ্গী কেমন সরস ছিল তার একটু নমুনা এখানে তুলে দিলাম—

"মাকড়শা বড় ওস্তাদ শিকারী, ওস্তাদ ভিখারী ও ওস্তাদ কারিগর। মাকড়শার পাতা জালিকে যদি পাতা ঝুলি মনে কর—তবে ওকে ওস্তাদ ভিখারী বলা যেতে পারে বৈকি। তবে এ ভিখারী খঞ্জও নয়, অন্ধও নয়। এর আট-আটটা পা আছে—আট-আটটা চোখ আছে। খুব মিহি মসলিনের মত জাল সে বুনতে পারে—কাজেই সে ওস্তাদ কারিগর। আর যে ভাবে জালে কীটপতঙ্গকে জড়িয়ে ফেলে তাতে ওস্তাদ শিকারীও বলতেই হবে।

পদগৌরবে মাকড়শা পোকার রাজা। মাকড় মানে পোকা, আর শা (শাহ্‌) মানে রাজা—নামেও তার প্রমাণ রয়েছে।"

অসি বাজে ঝন্ ঝন্

ধারাবাহিক উপন্যাস

[ভারতের বিস্মৃত যুগের একটি কাহিনী]

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এক

প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা।

মধ্য ভারতের পার্ব্বত্য ভূমির বুকে ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার ফিকা হয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ দেখা দিয়েছে। চূড়োগুলোকে পাশ কাটিয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো অভ্রের মত। যত দূর চোখ যায় শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়ের কালো ছায়া দিক্‌-সীমাকে আড়াল করে রেখেছে। সেই ছায়ার ঢেউ এসে লেগেছে সামনের গাছের মাথায়, চলা-পথের পায়ের গোড়ায়। তার পিছনে আকাশ ভরা তারার স্নিগ্ধ দৃষ্টি আর টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের শুভ্রতা।

সরু একটি পদ-রেখা বরাবর চলে গেছে গ্রামটিকে পাশ কাটিয়ে ঢালু উপত্যকার মধ্য দিয়ে ওদিক্‌কার কোন অজানা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল সেই ঢালু পাহাড়ী পথের বুকে ধূলো উড়িয়ে একদল অশ্বারোহী নেমে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পথের পাশের গ্রামখানিকে তারা ঘেরাও করে ফেললে, তার পরেই সেই কুটীরগুলোকে ঘিরে আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে লাফিয়ে উঠলো আকাশের গায়। অশ্বারোহীর দল সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলো। তাদের সেই চীৎকারকে ছাপিয়ে উঠলো ভীত-ত্রস্ত নরনারীর আর্ত্তনাদ। প্রাণের ভয়ে তারা এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লো। ঘোড়সওয়ারদের হাতে ছিল বেত। পলায়মান কেউ কাছে এলেই বেত্রাঘাতে তাকে জর্জ্জরিত করে তুললো। তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে চল্‌লো বহ্নিমান্ গৃহগুলির কাছে। তারা যত আর্ত্ত ও ভীত হয়ে ওঠে, চারিপাশের অশ্বারোহীদের হাতের বেত তত ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। জীবন্ত দগ্ধ হওয়া ছাড়া এই সব নিঃসহায় নর-নারী ও শিশুদের আজ আর কোন পথ নেই।

ঠিক সেই সময় পাহাড়ের মাথায় কালো ঘোড়ার পিঠে এক কালো সওয়ারকে দেখা গেল।

পাহাড়ের কিনারায় তার কালো ছায়া, মনে হ'ল কে যেন আকাশের গায় একটি কালো মূর্ত্তি খোদাই করে দিয়েছে।

অশ্বারোহী কতক্ষণ তাকিয়ে রইল নীচের বহ্নিমান্ গ্রামখানির পানে। দুরন্ত ঘোড়াটি অধৈর্য্য হয়ে ক'বার পা ঠুকলো, ক্ষুরের আঘাতে ধূলো আর কাঁকরের টুক্‌রো ছড়িয়ে পড়লো। তার পর শোনা গেল এক হ্রেষাধ্বনি। সে ধ্বনি অনেক দূর পৌঁছালো, কিন্তু নীচের নিষ্ঠুর উল্লসিত অশ্বারোহীরা তা শুনতে পেলে না। পলায়মান মানুষগুলোকে জীবন্ত দগ্ধ করার ঔৎসুক্যে তখন তারা মত্ত।

কালো ঘোড়ার সওয়ার কাঁধ থেকে ধনুকটি নামিয়ে নিলে, তার পর একটি তীর জুড়লো অশ্বারোহী দলের একজনকে লক্ষ্য করে। নীচে একজন অশ্বারোহী তখন পলায়মান ছোট একটি ছেলের উপর চাবুক চালাবার জন্য হাত তুলেছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তীরের ফলাটি এসে বিঁধলো তার পাঁজরের মধ্যে। আর্ত্তনাদ তুলে সে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে সেই ছোট ছেলেটিরই পায়ের কাছে।

আর একজন অশ্বারোহী এক রমণীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছিল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। উপরের কালো ঘোড়ার সওয়ার আর একটি শর নিক্ষেপ করলো তার উদ্দেশ্যে। রমণীটাকে ছেড়ে দিয়ে অশ্বারোহী ঘোড়ার উপর লাফিয়ে উঠলো। ঘোড়াটি ভয় পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ছুটতে সুরু করে দিলে।

সব ছাপিয়ে এক দৃপ্ত ধারাল অট্টহাসি এবার সমগ্র প্রান্তরকে মুখরিত সচকিত করে তুললো। সেই স্বরের ঢেউ পাহাড়ে পাহাড়ে আঘাত করে দিগন্তবিস্তারী প্রতিধ্বনি তুললো। নীচের অশ্বারোহীরা এবার সত্যিই চমকে উঠলো, সেই শব্দের অনুসরণে তারা মুখ তুলে তাকালো। দেখা গেল, মাথার উপর পাহাড়ের কিনারায় কালো ঘোড়ার পিঠে কালো বর্ম্ম পরা এক কালো সওয়ার, পিছনের আকাশের গায় কালো পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে আছে।

নীচের আশ্বারোহীরা এই মূর্ত্তি চিনতো। তাদের মধ্যে কে একজন চকিতে একটি শর নিক্ষেপ করলো কালো-ঘোড়ার সওয়ারের দিকে। কালো সওয়ারের বুকের লোহার বর্ম্মে লেগে ঠন্ করে তীরটি ঠিকরে পড়লো নীচে পাহাড়ের পাদদেশে। কালো সওয়ার আর একবার অট্ট-হাসিতে দিগ্‌-বিদিক্ ধ্বনিত করে তুললো।

প্রতিধ্বনি থামলে পরিষ্কার কণ্ঠে কালো সওয়ার বলতে সুরু করলো: "বর্ব্বর বিদেশীর দল, মনে রেখো অত্যাচার করারও একটা সীমা আছে, সেই সীমা তোমরা বার বার লঙ্ঘন করেছ, ভারতবাসী আর তোমাদের সহ্য করবে না। তোমাদের মাথার উপর মৃত্যুর কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। অসংখ্য হিন্দুর অনিবার্য্য প্রতিশোধকে তোমাদের অস্ত্রবল প্রতিরোধ করতে

পারবে না। সেদিন তোমাদের সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। হিন্দুস্থানের কোনখানে সেদিন তোমাদের এতটুকু আশ্রয় থাকবে না, তোমাদের সমাধি তখন তোমরা নিজেরাই খনন করবে। স্মরণ রেখো, আজ যাদেরকে তোমরা জীবন্ত দগ্ধ করছ, এই প্রত্যেকটি জীবনের জন্ম ছুটী করে হুন জীবন দেবে, মৃত্যুর ঋণ আমরা মৃত্যু দিয়েই শোধ করবো!"

অশ্বারোহী থামল। ধারাল দৃষ্টিতে নীচের সওয়ারগুলিকে একবার নিরীক্ষণ করে নিলে। লোকগুলি তখনও কিছু শোনার জন্ম উৎকর্ণ হয়ে আছে। তিন চারটি ঘোড়া ঘাড় বেঁকিয়ে দৃপ্তভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। পিছনে গ্রামবাসীদের একটা ভীড় জমেছে। আগুনের লেলিহান শিখা রাত্রির অন্ধকারকে ঠেলে দিয়েছে পাহাড়ের আড়ালে।

কালো সওয়ার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসী কয়েকটি মুহূর্ত্ত কেটে গেল একে একে। নীচের মানুষগুলি বিচলিত হয়ে উঠলো, এইবার বুঝি তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে। এমন সময় কালো সওয়ারের দৃপ্তস্বর আবার চারিপাশ কাঁপিয়ে তুললো—"আমার আদেশ, অবিলম্বে এই গ্রাম ত্যাগ কর, অন্যথা তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। কাল সকালের সূর্য্যোদয় দেখবার জন্ম তোমাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকবে না। যাও—"

হুন অশ্বারোহীরা একবার ভালো করে উপর দিকে তাকালো। কালো ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ কালো সওয়ার, দৃঢ় অচঞ্চল। পিছনের তারা-ভরা আকাশের গায় কে যেন একটা পাথরের কালো ছায়া ফেলেছে। ওই ছায়াটিকে তারা জানে; তাদের বুক কেঁপে উঠলো, দৃষ্টি ঠিক্‌রে ফিরে এল পাহাড়ী পথের উপর। নির্ব্বিবাদে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে একে একে তারা অগ্রসর হ'ল; যে পথে এসেছিলে ফিরে চললো সেই পথে।

শেষ হুনটি পর্য্যন্ত যখন দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল, কালো ঘোড়ার কালো সওয়ার আর একবার অট্টহাসিতে চারিদিক্ কাঁপিয়ে দিয়ে পাহাড়ের চূড়ো থেকে নেমে এল বহ্নিমান্ কুটীরগুলোর দিকে।

ক্রমশঃ

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

এ বছরকার উক্ত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলেন শ্রীচিন্ময়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা)। এঁর রচনার বিষয়—"আমার জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।"

এ ছাড়া শ্রীবাসুদেব বসু (ঢাকা), শ্রীরেণুকা দত্ত (ধুবড়ী), শ্রীবনতোষ সেনগুপ্ত (গৌহাটী), শ্রীসুপ্রিয়া সেনগুপ্তা (রংপুর), শ্রীমাধুরী দেবী (ঢাকা)—এঁদের লেখাও ভাল হয়েছে।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এ মাসের রামধনুতে ৩১ পৃষ্ঠায় "পুতুলের বিয়ে" নামে যে ছবি বেরিয়েছে তার ওপর একটা কবিতা লিখতে হবে। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে প্রেরকের নাম, নিজের গ্রাহক নম্বর, এবং বয়স লিখে দিতে হবে। ২টি পুরস্কার দেওয়া হবে—একটি যে সব গ্রাহক-গ্রাহিকার বয়স ১৫র নীচে, তাদের জন্য। অপরটি যাদের বয়স ১৫র বেশী, তাদের জন্য। লেখা ১লা ফাল্গুনের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

এ মাসে 'রামধনু' ১৪ বছরে পড়্‌ল। 'রামধনু'র জন্মদিনে তোমাদের কাছ থেকে অজস্র শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক চিঠি আমরা পেয়েছি। তোমাদের 'রামধনু'কে তোমরা কত ভালবাস এ সব চিঠি থেকেই তা বুঝতে পারি। তোমাদের এই শুভেচ্ছার পাথেয় নিয়েই 'রামধনু' তার যাত্রাপথে এগিয়ে চলবে।

এ মাসে মণিমঞ্জুষা, ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক, বিচার-সভা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ দেওয়া গেল না—সেগুলি বারান্তরে বেরোবে। গ্রাহকদের লেখা আর কয়েকখানি চিঠির কিছু কিছু অংশ এখানে দিলাম। রাঃ সঃ।

'হুকাকাশির দেখা তো আর পাব না, মাঝে মাঝে অন্য কোন ডিটেক্‌টিভের দেখা পেতে চাই। বিদেশী লেখকের অনুবাদ হ'লেও খুসি হব।' —জেবউন্নিসা।

'কিছুদিন যাবত রামধনুতে কয়েক পৃষ্ঠা পাৎলা সুন্দর কাগজ, আর বাকীটা মোটা কাগজ দেখছি। আগাগোড়া পাৎলা বা মোটা কাগজ দিলে ভাল হয় নাকি?'

—সত্যেশচন্দ্র পাকড়াশী

(যুদ্ধের জন্য মসৃণ কাগজ চেষ্টা ক'রেও প্রয়োজন মত সংগ্রহ করা যাচ্ছে না—তাই মোটা কাগজ দিতে হচ্ছে। মোটা কাগজে হাফ্‌টোন ছবি ভাল ছাপা যায় না তাই যে যে পৃষ্ঠায় হাফ্‌টোন ছবি আছে কেবল সেই সেই পৃষ্ঠায় মসৃণ কাগজ যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাই দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে এও পাওয়া যাবে

কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে যে কাগজ তৈরী হয় তা দেশের চাহিদা মেটাবার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। বিদেশী কাগজ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে না। —রাঃ সঃ)

'আমাদের য়্যাড্‌ভেঞ্চার-সাহিত্যে রেওয়াজ আছে, নায়ককে যেমন ক'রে হোক্ ফিরিয়ে আনতে হবেই। "মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর" এই প্রচলিত নিয়মের একটা "অনারেব্‌ল্ এক্‌সেপ্‌শন্"। রবিবাবুকে ধন্যবাদ।'

—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হিরণ্ময় বাবুর 'মাষ্টারী' খুব ভাল লাগ্‌ল। তবে তিনি যে ধুতি-পাঞ্জাবী তুলে দিতে বল্‌ছেন, তিনি কি পোষাক চালাতে চান? আমাদের ধারণা—কোনও পোষাক লোকে জোর ক'রে চালাতে পারে না, দেশের ভৌগোলিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার ওপর সেটা আপনি গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান পোষাকের চলনও ওই ভাবেই হয়েছে। যাই হোক্, কথাটা ভাববার মত। গ্রাহক-গ্রাহিকারা এ আলোচনায় যোগ দিলে সুখী হ'ব।

—অরুণকুমার রায় ও দীপ্তি রায়।

শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়দিনের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলারও মরশুম পড়ে গেছে; ক্রিকেট, টেনিস্, ব্যাড্‌মিণ্টন—এক সঙ্গে সব। প্রথমে ক্রিকেটের কথাই বলি।

এস্. ব্যানার্জ্জি

সিংহল থেকে একটা বাছাই-করা ক্রিকেট দল ভারতে খেলতে এসেছেন সে খবর তোমরা নিশ্চয়ই পেয়েছ। কলকাতায় ভারতীয় দলের সঙ্গে এঁদের খেলা হয়। ভারতীয় দল বলতে অবশ্য নিখিল ভারত দল—যাঁরা টেষ্ট্ ম্যাচে খেলেন তাঁরা নন, এ দলে প্রধানতঃ বাংলার নাম-করা খেলোয়াড়েরাই ছিলেন। এই খেলা শেষ না হ'ওয়ায় ড্র হয়েছে। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসএ করেন ২৫১, দ্বিতীয় ইনিংসএ ৫ উইকেটে ২৯৩। সিংহল দল ১ম ইনিংসএ করেন ৩৭২; ২য় ইনিংসএ ৮২ (২ উইকেটে)। এঁদের অধিনায়ক জয়বিক্রম খুব ভাল খেলেছেন। তিনি একাই ১৩৮ করেন।

এর পরেই কিন্তু সিংহল দল বোম্বাইএ এই রকম একটি ভারতীয় দলের সঙ্গে ভীষণ ভাবে হেরে গেছেন—এক ইনিংস্ ও ১১০ রানে। তাঁদের ১ম ইনিংসএ রান্ হয় ২৩৪, ২য় ইনিংসএ ১৩৪। ভারতীয় দল ১ম ইনিংসএ ৭ উইকেটেই ৪৭৮ রান্ তোলেন (বিজয় মার্চ্চেণ্ট ১৩৭, রজনেকার ১১৭)। অধ্যাপক দেওধর ছিলেন এই দলের অধিনায়ক।

তার পর কলকাতায় আর একটি খুব উল্লেখযোগ্য খেলা হয়ে গেছে—বড়লাটের দলের সঙ্গে বাংলার লাটের দলের। যুদ্ধ-ভাণ্ডারে চাঁদা তুলবার জন্য এই খেলা হয়েছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট ক্রিকেট-খেলোয়াড়ই এই খেলায় যোগ দিয়েছিলেন। বড়লাটের দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন পাতিয়ালার মহারাজা, বাংলা দলের অধিনায়ক হ'বার কথা ছিল পাটাউডির নবাবের, কিন্তু তিনি অসুস্থ হওয়ায় সি. কে. নাইডু অধিনায়কত্ব করেন। বাংলার লাটের দল প্রথম ইনিংসএ করেন ৩৬২ (এস্. ব্যানার্জ্জি ৬২, জাহাঙ্গীর খাঁ ৬০, মুস্তাক আলি ৫৯), ২য় ইনিংসএ ১২৩ (ব্যানার্জ্জি ২৯)। বড়লাটের দল করেন ১ম ইনিংসএ ৩০২ (আজমৎ হায়াত খাঁ ৬৫, অমরনাথ ৬২, কামারুদ্দিন ৪২), ২য় ইনিংসএ ৮ উইকেটে ১৮৫। শেষ দিনে দু'পক্ষের বোলাররাই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নাইডু, জাহাঙ্গীর খাঁ, মানকড়, আমির এলাহি, রামসিং, ব্যানার্জ্জি—এঁদের বোলিং উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

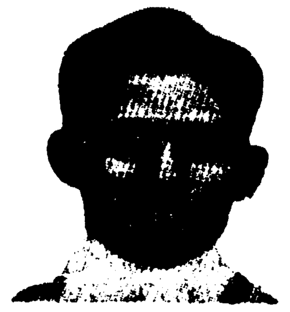

অমরনাথ

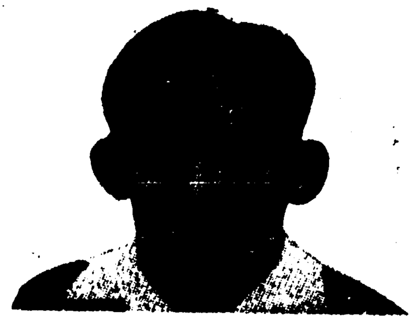

সি. এস্. নাইডু

ক্রিকেটের পর টেনিস্। কলকাতায় পূর্ব্ব-ভারতীয় টেনিস্ প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। এবার সোহানীরই জয় জয়কার। তিনি সিঙ্গল্‌স, ডাব্‌ল্‌স ও মিক্‌স্‌ড্ ডাব্‌ল্‌স্—তিনটেতেই বিজয়ী হয়েছেন। বিখ্যাত সুইস্ টেনিস্ খেলোয়াড় এলমার এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জিম্ মেটার কাছে হেরে গেছেন। মেটা ফাইনালে গিয়েছিলেন, কিন্তু সোহানী তাঁকে ষ্ট্রেট্ সেটেই হারিয়েছেন। দিলীপ বসুও ভাল খেলেছিলেন। তিনি সেমি ফাইনালে সোহানীর কাছে হেরে গেছেন। এই খেলাটি বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছিল। ডাব্‌ল্‌স্ ফাইনালে সোহানী ও সোনী মেটা ও সাবুরকে পরাজিত করেছেন।

বিজয় মার্চ্চেণ্ট

এইবার ব্যাড্‌মিণ্টনের কথা বলি। এই খেলাটিও আজকাল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মেয়েলী খেলা ব'লে আগে যে কেউ কেউ এটিকে কৃপার চোখে দেখতেন সে দিন আর নেই। সম্প্রতি কলকাতায় এরও নিখিল বঙ্গ ও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। প্রথমটিতে ম্যাডগাভকর সুনীল বসুকে হারিয়ে সিঙ্গল্‌স্ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছেন।

ডাব্‌ল্‌স্ ও মিক্সড্ ডাব্‌ল্‌স্ প্রতিযোগিতায়ও ইনি বিজয়ী হয়েছেন। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় পেনাংএর প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় চুচুন্ কেং পটবর্দ্ধনকে হারিয়ে সিঙ্গল্‌স্ বিজয়ী হয়েছেন। গেলবারের বিজয়ী লিউইস্ এবারে যোগ দেন নি। ডাব্‌ল্‌সএ জিতেছেন মাগ্‌ভি ভ্রাতৃদ্বয়।

শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ সাধন গুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের পক্ষ থেকে এ বছর জব্বলপুরে নিখিল ভারত বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে এসেছেন। শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু ল' কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি রামধনুর একজন পুরোনো গ্রাহক এবং লেখক। এঁর অনেক লেখা তোমরা রামধনুতে পড়েছ। শ্রীমান্ সাধন গুপ্ত হচ্ছেন শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্তের পুত্র। ইনি অন্ধ—চোখে দেখতে পান না। সেদিক্ বিবেচনা করলে এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ বলতে হবে। তোমরা শুনে সুখী হবে, লাহোরে এবং কলকাতায় যে নিখিল ভারত বিতর্ক-প্রতিযোগিতা হয়েছিল তা'তেও এঁরাই বিজয়ী হয়েছিলেন। আমরা এই দুই তরুণ 'তর্কবিদ'কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জব্বলপুরে নিখিল ভারত বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁ দিকে) ও শ্রীমান্ সাধন গুপ্ত।

* * *

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী ১॥০
(সাধারণ জ্ঞানের বিরাট্ বই)

ডক্টর সুশীলচন্দ্র মিত্রের
বৈজ্ঞানিক ভোজ ।০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের
মমীর জীবন্ত হাত ॥৵০

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্তের
দুরন্ত ॥৵০

শ্রীঅরুণা দাসের
কোন্ পথে ॥৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং … ॥০

—নতুন বই—
শ্রীলীলা মজুমদার, এম. এ প্রণীত
বদ্যিনাথের বড়ি—॥০
—অফুরন্ত ছবি—
—অফুরন্ত হাসি—
—অফুরন্ত মজা—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কল্‌কাতার হালচাল ৸৵০
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হাল্‌কা হাসির খাতা ॥০
নতুন কিছু … ॥৵০

শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেনের
চোরের মেয়ে … ॥৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর (আলেক্‌জান্দার-জীবনী) ॥০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম) ॥০
ঐ ২য় খণ্ড ॥০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প … ৶১০
ছুটীর গল্প … ৶১০

শ্রীমাঠবা ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার
আজব গল্প … ।০
অনেক গল্প … ।০

পুরাতন বার্ষিক রামধনু
১ম, ৩য়—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১॥০
৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, বসা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

উৎসব-আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হ'লে

লক্ষ্মী ঘি

চাই-ই।

বিবাহ-উৎসবে, পূজা-পার্ব্বণে এবং নিত্য প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি

না হ'লে চলে না এ কথা কে না জানে?

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি'এর তুলনা নেই।

— সর্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন: কলিঃ ৩৬৬

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

১৪শ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৪৭ দ্বিতীয় সংখ্যা

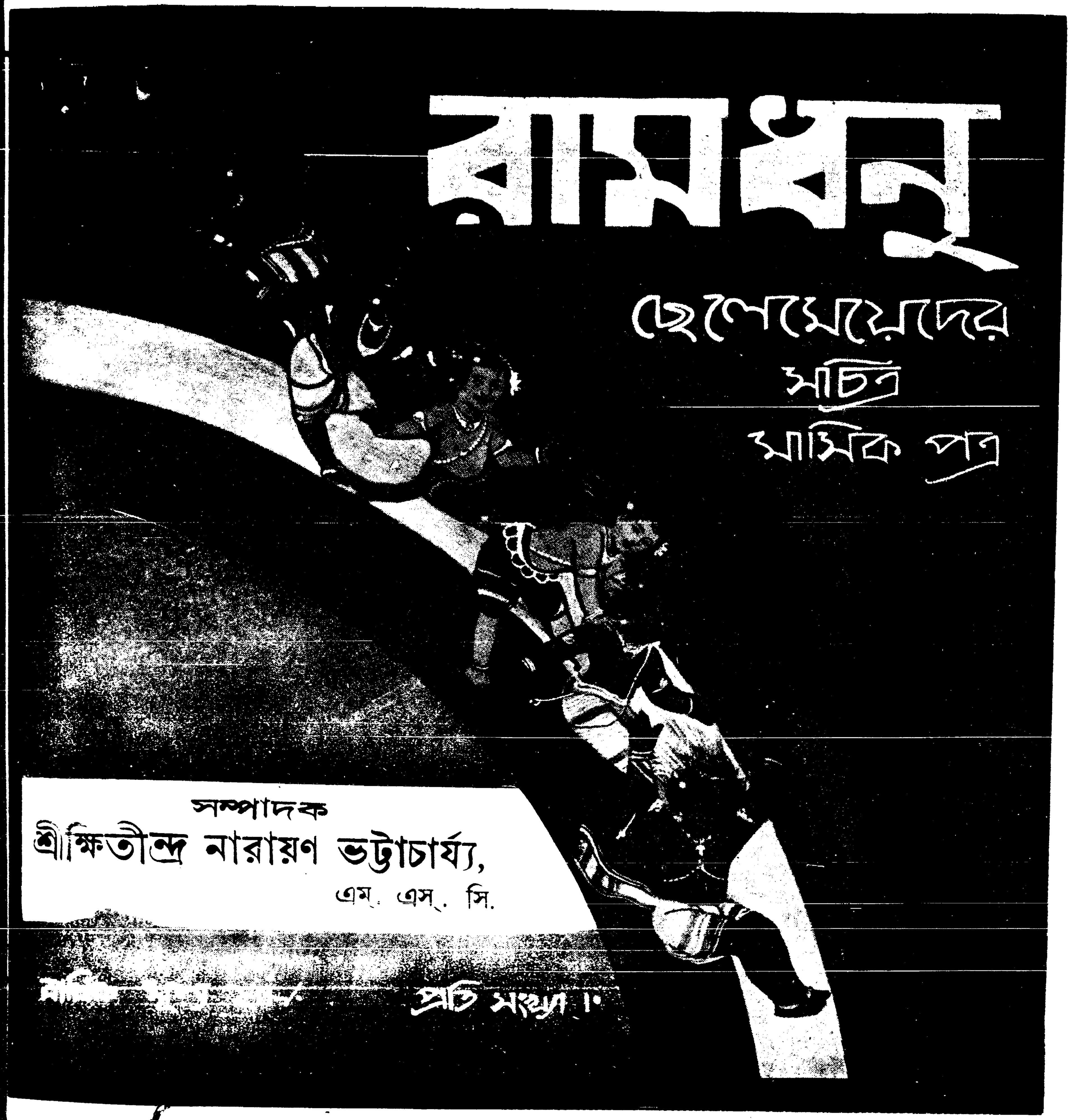

কার্য্যালয়

১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C—1641

উৎসব-আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হ'লে

লক্ষ্মী ঘি

চাই-ই।

বিবাহ-উৎসবে, পূজা-পার্ব্বণে এবং নিত্য প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি

না হ'লে চলে না এ কথা কে না জানে?

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি'এর তুলনা নেই।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বড়বাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন: কলিঃ

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

কার্য্যালয়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১১৮

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

[illegible]

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ
হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

হাস্য ও রহস্য
একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙিন মলাট। দাম ॥৵০

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস।
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷৷০

নূতন পুরাণ
একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৵০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। প্রত্যেক পাতায় হাসি। দাম ॥৵০

রামধনু-সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো
—বিজ্ঞানের গল্প—
প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

আবিষ্কারের গল্প
দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী।
পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
—বিজ্ঞানের গল্প—
পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

জন্মদিনের উপহার
—সরস, মজাদার গল্পের বই—
চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই,
চমৎকার ছবি। দাম—॥৴০

আকাশের গল্প
—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—
অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৵১০

ফুলের মূল্য
বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

আমাদের এ বছরের পূজা বার্ষিকী—

(প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল)

'মায়ামুকুর যে কোন বিলাতী বার্ষিকী অপেক্ষা রূপে, রংয়ে ও লেখায় যে নিকৃষ্ট নহে তাহা পুস্তকটি হাতে পড়িবামাত্রই মনে হয়।

অথচ দাম মাত্র—**দেড় টাকা**

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে এরূপ অল্প মূল্যে এমন সুন্দর একখানি পুস্তক যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ দেব সাহিত্য-কুটীরের শিশুদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। বাংলার খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা অগণিত রঙিন ও একরঙা চিত্র ও বিখ্যাত বহু সাহিত্যিকের মধুর রচনায় সমৃদ্ধ এই পুস্তকটি শিশুদের মনের খোরাক তো যোগাইবেই, বড়রাও না পড়িয়া পারিবে না।'—

আনন্দ বাজার

এ ছাড়া অমৃতবাজার পত্রিকা, আজাদ, মাতৃভূমি, এডভান্স, যুগান্তর, মৌচাক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাগজে উচ্চ প্রশংসিত।

বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত

"বলীদের গল্প"

দেশ-বিদেশের পালোয়ানদের সচিত্র কাহিনী অতি সরসভাবে লিখিত, বাংলা দেশে এরূপ বই এই প্রথম। রাশি রাশি হাফটোনচিত্রে শোভিত। মূল্য—১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত

"রঙিন-আকাশ"

রঙ ফলাইয়াছেন কারা জানো, তাঁরাই এখনও পর্য্যন্ত তোমাদের পড়িবার ঘরে আছে, সেই পরিচিত লেখকগণ। (নানা গল্পে, কবিতায় নাটিকায় ছবিতে ছাপাছাপি) দৈনিক কাগজে সমালোচনা বোধ হয় দেখছ। মূল্য—১৲ টাকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

মোহনতোষ ব্রাদার্স লিঃ

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—১৩৮এ আশু মুখার্জি রোড, ভবানীপুর

পানবাজার, গৌহাটী, আসাম

ছেলেদের স্বাস্থ্য ও মনস্তুষ্টির জন্য

খোকন ব্র্যাণ্ড ফুটবল—ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট—ক্যারম সর্ব্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল—(ব্লাডার সহ।	ব্যাডমিণ্টন (সেট)	**ক্যারমবোর্ড**
	৪ খানা ব্যাট ১টী জাল	(ঘুঁটি ও ষ্ট্রাইকার সহ)
খোকন ১নং ১॥০ ও ১৸০	৩টী সাটেলকক সহ.	প্র্যাকটিস—৪॥০ ও ৬৲
ঐ ২নং ২৲ ও ২॥০	প্র্যাকটিস—৬॥০ ঐ	ম্যাচ— ৭॥০ ও ৮॥০
ঐ ৩নং ২৸০ ও ৩॥০	ভাল ৮॥০, বীণা ১০॥০	কম্পিটিসন—১৩॥০ ও ১৬॥০
ঐ ৪নং ৪॥০ ও ৫।০	ভিক্টোরিয়া ... ২॥০	বাগাটেলী—৪॥০ ও ৬॥০
সিল্ড উইনার—৩নং ৪॥০ ও ৫৲	র‍্যাকেট—১।০ ... ১॥০	স্কিপিংরোপ—।০ ও ।৵০
৪নং ৬॥০, ৮৲ ৫নং ৭॥০ ও ১১৲	১৸, ২॥০ ও তদূর্দ্ধ	—০—
ব্লাডার ১নং ॥৵০, ২নং ৸০	সাটেলকক—২।০, ... ৩৲	**হকিষ্টিক্**—ছোট—১৲
৩নং ৸৵০ ৪নং ১৲ ৫নং ১।০	৬৸০ ও ৪॥০ ডজন	মাঝারি—১॥০
পাম্প—১।০, ১৸০ ও ২॥০	জাল—১৲ ১॥০ ও ২৲	বড়— ২৲

বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাইবেন—ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠাইব।

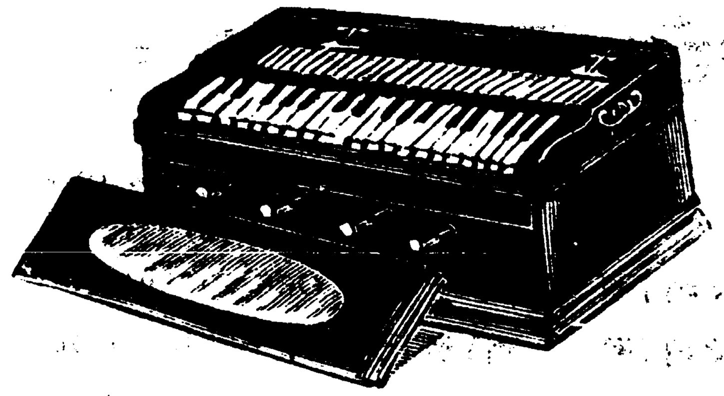

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং'র

হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে

আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং

১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বহুচিত্র শোভিত, ছেলেদের হাতে দিবার মত কয়েকখানি প্রাইজ বই।

একবার দেখিলে আর ভুলা যায় না।

১। আসামের জঙ্গলে—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ॥০

২। গুপ্ত শত্রুর জালে—সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী ... ॥০

৩। এ যুগের দৈত্য—হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।৵০

আজই অর্ডার দিন।

এন, এল, পাল এণ্ড কোং

সকল রকমের **বই, কাগজ এবং খাতা** বিক্রেতা

২০৩।২,এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া

দুর্ব্বল শিশুরা

অল্পদিনের মধ্যেই

পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—৷৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা—

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের খুব ক'রে প্রাণ ভ'রে হাস্‌তে দিন্‌!

ওদের দেহ-মন সারাবার, স্বাস্থ্য ভালো রাখ্‌বার ওই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায় এবং আপনি নিজেও খুব ক'সে হেসে নিন্‌—পরমায়ু বাড়াবার ওর চেয়ে মহৌষধ আর নেই। হাসির ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য্য আর কী আছে?

—আমাদের প্রকাশিত অপর্য্যাপ্ত হাসির এই সব বই—

শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত

পথের রাত্রি ৷০

এক পেয়ালা চা ৷৵০

গল্প ঠাকুরদা ৷৵০

খাঁটি বাংলা শেখবার জন্যেই বুদ্ধদেবের বই পড়া দরকার—প্রত্যেক ছেলে-মেয়েরই। হাল্‌কা ঝরঝরে প্রাণবান্‌ ভাষা—তার ভেতর দিয়ে হাসির ফল্গুস্রোত্‌ ঝির্‌ ঝির্‌ ক'রে বয়ে চলেছে—আমাদের চারধারে, আমাদের জীবনেই, যে-সব মজার গল্প অহরহ ঘট্‌ছে তারই রসালো কাহিনী। জীবনকে এবং জগতকে নানা দিক থেকে, বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা ভাবে, নানান্‌ রূপে জানবার জন্যে, ছেলে-মেয়েরা যাতে পুরোপুরি মানুষ হ'তে পারে তার জন্যেই, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে হাসির গল্প—বিশেষ ক'রে বুদ্ধদেবের গল্প—পড়তে দেয়া উচিত। বড়োরা পড়্‌লেও ক্ষতি নেই!

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু লিখিত

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ৷৵০

পরশুরাম, বুদ্ধদেব বসু এবং শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পরে গৌরাঙ্গপ্রসাদ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে এনেছেন। আন্‌কোরা নিজস্ব ষ্টাইল্‌, ইডিয়ম্‌-বহুল ভাষা, নতুন ধরণের প্লট্‌—এই সব কিছুর ভেতর দিয়েই গৌরাঙ্গপ্রসাদ যে আলাদা জাতের হাসির গল্প দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না, ছেলেরা-বুড়োরা তা সমভাবে উপভোগ করবেন। বুদ্ধদেবের পরেও যে আরও সহজ ভাষা, স্বচ্ছ ইডিয়ম্‌, এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী আনা যায়, এবং শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পরেও যে প্রাণখোলা প্রচণ্ড হাসি হাসানো সম্ভব—গৌরাঙ্গপ্রসাদের অসামান্য প্রতিভায় সেই বিস্ময়কর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্যে এ-বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই—এমন কি বাংলা সাহিত্যে বহুদিনের মধ্যে একখানি উপভোগ্য বই—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। সেই সঙ্গে শৈল চক্রবর্ত্তীর অসংখ্য অজস্র মজার ছবি।

—আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য নতুন বই এবং ভালো বই—

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মণ্টুর মাষ্টার (২য় সং) ৷৵০

মানুষের উপকার করো (যন্ত্রস্থ) ৷৵০

শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী সহযোগে

এক রোমাঞ্চকর য়্যাড্‌ভেঞ্চার ৷৵০

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সহযোগে

জীবনের সাফল্য ৷৵০

শ্রীসুকুমার দে সরকার.

অরণ্য রহস্য ৷৵০

আরতি (আমাদের সচিত্র বিরাট গল্পসঞ্চয়নী) ১।০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রাজার ছেলে ৷৷৵০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

বীরবাহুর বনিয়াদী চাল ৷৵০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আদিম দ্বীপে ৷৵০

গুজবের জন্ম ৷৵০

লালন ফকিরের ভিটে ৷৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আজব দেশে অমলা ৷৷০

মানুষ পিশাচ ৸০

মড়ার মৃত্যু ৷৷০

ছায়া কায়ায় মায়াপুরে ৷৵০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ব্যোমদাসের মাদুলি ৷৵০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম পথে ৷৷৵০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

'দে বল্‌ছি, দে!'
'উঁহু, দেব না — দেব না!'

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪৭ { ২য় সংখ্যা

রামধনু-রং

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

রামধনু-রং
রামধনু-রং—
প্রজাপতির অথির ডানায়,
রামধনু-রং
রামধনু-রং—
ফুল-কাননের কানায় কানায়;
সন্ধ্যা-ঊষায় নীল গগনে
মেঘ-মেখলায় ক্ষণে ক্ষণে
রামধনু-রং ঠিক্‌রে পড়ে
ঝিল্‌মিলিয়ে দূর সীমানায়।

রামধনু-রং
রামধনু-রং—
প্রজাপতির অথির ডানায়।

রামধনু-রং
মেঘলা দিনে
সত্যিকারের রামধনুকে,

রামধনু-রং
ফুলঝুরিতে,—
রং-মশালের আলোর মুখে ;
ময়ূর-পাখার চিকন গায়ে,
রঙের কুচি যায় ছড়ায়ে,—
ঝাড়ের কাঁচে আলোর আঁচে
রামধনু-রং কেমন মানায় !

রামধনু-রং
রামধনু-রং—
প্রজাপতির অথির ডানায়।

রামধনু-রং
ছড়িয়ে আছে
এই প্রকৃতির ঘরে ঘরে,

রঙের খেলা
রঙের মেলা
জড়িয়ে আছে থরে থরে ;
প্রবালপুরে সিন্ধু-তলে,—
শাঁখ-ঝিনুকের রং-মহলে,
রামধনু-রং হাজার ভড়ং
পিছলে পড়ে শ্যাওলা-পানায় ;

রামধনু-রং
রামধনু-রং—
প্রজাপতির অথির ডানায়।

শিশু-মনের
কল্পনাতে
রামধনু-রং গোপন থাকে,
তেপান্তরের
রঙের দেশে
উধাও ক'রে উড়ায় তাকে ;
রামধনু-রং অন্তরে যার
বাইরেতে তার রঙের বাহার,
মনের মাণিক ঝলতে থাকে
রামধনুকের রঙের হানায় ;
রামধনু-রং
রামধনু-রং—
প্রজাপতির অথির ডানায়।

ঠেকে শেখা

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

কথায় বলে, "ঠেলায় পড়্‌লে বাঘেও ধান খায়।" এটা কত দূর সত্যি তা জানি না,—হয়তো সত্যি নয়ই, তবে, মানুষ যে ঠেলায় পড়্‌লে যা'-তা' জিনিষ খায় তা' আমরা জানি। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মেনীর যে যুদ্ধ হয় (Franco-Prussian War), সে সময়ে ফ্রান্সের লোক মাংসের অভাবে ঘোড়ার

মাংস খেয়েছিল, এবং সেই যুদ্ধের পর, ফ্রান্সের অনেক জায়গায় ঘোড়ার মাংসের চলও হয়।

এবারের মহাযুদ্ধে জার্ম্মেনীতে নাকি কুকুরের মাংসের চল হচ্ছে। সে মাংস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা ব'লেছেন, "হ্যাঁ, এতে সার জিনিষ আছে বটে; তবে, খেতে ভাল না, গন্ধও ভাল না, আর একটু বেশী শক্ত।" তবেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ ব্যাপারখানা। নিতান্ত বেশী ঠেকা না হ'লে কেউ কুকুরের মাংস খাবে কিনা সেটাই সন্দেহ। নিতান্ত প্রাণের দায়ে যদি খায় তো সে অন্য কথা; কিন্তু, এর চল হওয়া সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ। তবে, মানুষের কথা কিছু বলা যায় না। হয়তো কুকুরদের খাওয়া পরিবর্ত্তন ক'রে, তাদের কোন রকম ওষুধ খাইয়ে ঐ অখাদ্য মাংসকেই নরম, সুস্বাদু আর সুগন্ধি করবে;—কে বল্‌তে পারে সে কথা?

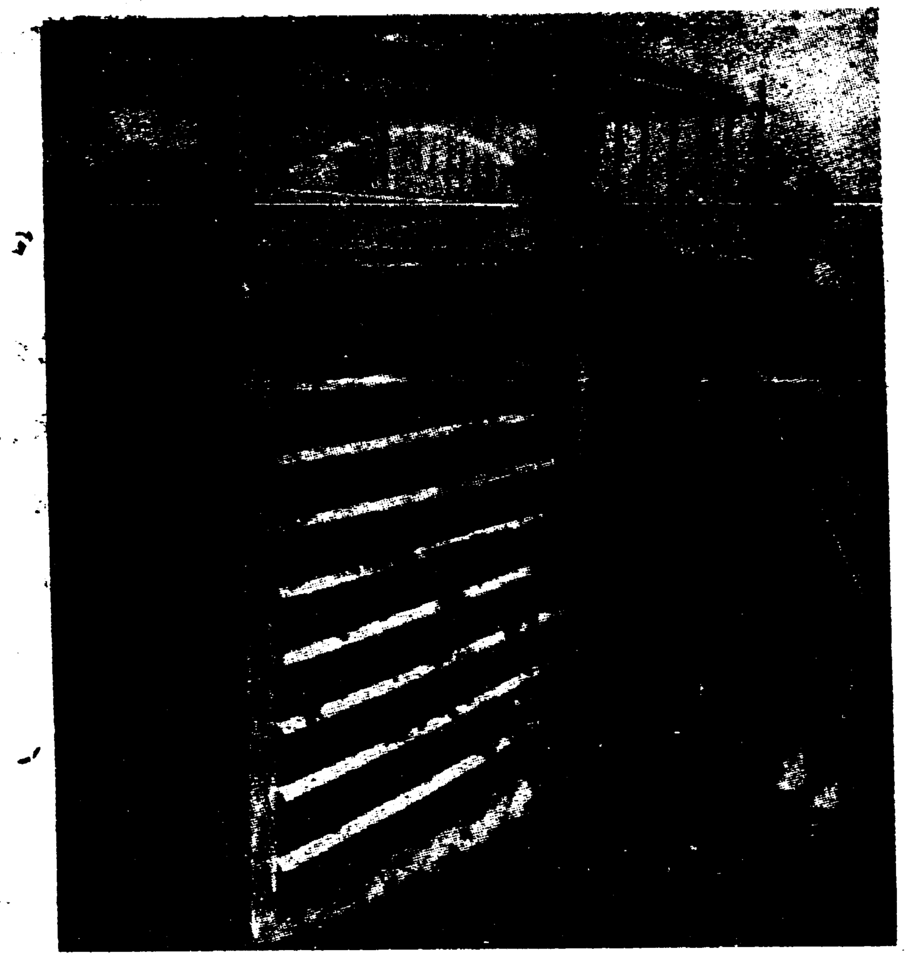

ছাদের ওপর একটার পর একটা থাক বসিয়ে সেই থাকে থাকে ফসল জন্মান হচ্ছে।

যুদ্ধ বাধ্‌লেই দেশের লোকের খাবারের দিকে নজর পড়ে। সাবধানে না চল্‌লে খাবারের অভাব হবে তাই সরকার থেকে নানা রকম ব্যবস্থা করা হয় যা'তে মাংস, ময়দা. চিনি, মাখন প্রভৃতি প্রধান প্রধান খাবারের জিনিষ প্রতি-জনে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পায়। তা'র জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়; প্রত্যেক পরিবারে খাবারের কার্ড পায়,—তা'তে লেখা আছে কত পরিমাণে কি জিনিষ তাদের প্রাপ্য। দোকানদার সেই কার্ড দেখে তাদের ঐ সব জিনিষ বিক্রী করে। বেশী দিলে দোকানদারের শাস্তি; ফাঁকি দিয়ে বেশী নিলে গৃহস্থের শাস্তি।

যে সব খাবার জিনিষ বিদেশ থেকে চালান আসে, অনেক সময় সে সবের চালান বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়—যেমন, কোন কোন রকমের ফল। তা'র পরিবর্ত্তে আরো আবশ্যকীয় জিনিষ আমদানী করা হয়।

খাবার জিনিষের অভাব হ'লে যুদ্ধ করা চল্‌বে কেমন ক'রে? আগে মানুষ খেয়ে শরীরে বল পাবে, তবে তো যুদ্ধ কর্‌বে? কাজেই যুদ্ধের সময় সাধারণ লোকের খাওয়ার চেয়ে সৈনিকদের খাবারের দিকে নজর বেশী দেওয়া হয়। ফলে, বেশী অভাবের সময় সাধারণ লোকেদের খাওয়া খারাপ হয়; পরিমাণেও কম হয়।

গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীতে ময়দার সঙ্গে খড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে, সাধারণ লোকেদের দেওয়া হ'তো। পাঁউরুটির মধ্যে এত ভেজাল দিতে হ'তো যে তার রং কালো হ'তো। জ্যাম, জেলি প্রভৃতি না হ'লে রুটি খাওয়া মুস্কিল; মাখনও তো অগ্নিমূল্য;—তাই মূলো আর বাজে তরকারি দিয়ে 'জ্যাম' তৈরী করা হ'তো। চিনির অভাব, তাই কাঠ থেকে চিনি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী ক'রে, কিছু স্যাকারিন মিশিয়ে দেওয়া হ'তো সেই জ্যামের সঙ্গে। মাংসের হাড় ফেলে দেওয়া হ'তো না। সেগুলোকে জমিয়ে রেখে, পরে তা' থেকে 'সূপ' তৈরী করা হ'তো।

ঠেলার সময় এইভাবে কাজ চালানো হয়; আবার, সঙ্গে সঙ্গে খাবারের অভাব দূর করার নানা রকম উপায় চিন্তা করা হয়। সব গৃহস্থের বাড়ীতে ফাঁকা জায়গায় চাষ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়; খেলার ময়দান, খোলা পার্ক সব চাষ ক'রে ফসল জন্মান হয়। ফলে, গৃহস্থের উঠানে, ছাদে, সর্ব্বত্রই ফল, তরকারি ইত্যাদির চাষ হয়। কেমন ক'রে অল্প জায়গায় ফসল জন্মান যায় বিশেষজ্ঞেরা তা'র উপায় ব'লে দেন। একজন চাষী তাঁর ছাদে একটার উপর একটা থাক বসিয়ে চার-পাঁচ থাক ফসল জন্মিয়েছেন। সেই ফসল গরু-ঘোড়ার উৎকৃষ্ট খাবার। এইভাবে, দশজনের সাহায্যে খাবারের অভাব অনেকটা দূর হয়। যুদ্ধ থেমে গেলেও এ সব পরীক্ষা চল্‌তে থাকে এবং অনেক নূতন আবিষ্কার এ সবের ফলে হয়। ফল, তরকারি টিনে ভ'রে রক্ষা করার নূতন এবং উন্নত উপায়ও

নানা পরীক্ষার ফলে আবিষ্কার করা হয়। মুরগীদের কি উপায়ে ডিম পাড়ার ক্ষমতা বাড়ান যায়, কি উপায়ে ভেড়া, গরু প্রভৃতিকে বেশী বাড়িয়ে তুলে মাংস এবং চর্ব্বির পরিমাণ বাড়ান যায়, এ সব পরীক্ষাও চলে এবং অনেক পরীক্ষা সফলও হয়েছে। এবারের যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে সৈনিকদের জন্য শূওরের মাংসের বদলে ভেড়ার মাংস দিয়ে 'নকল শূওর-মাংস' তৈরী ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সেই মাংসের নাম একজন দিয়েছেন 'Macon ' 'Bacon'এর প্রথম অক্ষরের বদলে Muttonএর প্রথম অক্ষরটি বসিয়ে ।

ঠেলার সময় চ'লে গেলেও খাবার জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা চল্‌তেই থাকে এবং ঠেলার কালের ফিকিরগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়। দুর্ভিক্ষের এবং মহামারীর সময়ও 'ঠেলা' উপস্থিত হয়; তখন এ সব ফিকির কাজে লাগ্‌তে পারে।

মানুষ ঘাস খেয়ে বাঁচ্‌তে পারে কিনা সে বিষয়ে অনেক পরীক্ষা গত মহাযুদ্ধের সময় হয়েছিল। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, "হ্যাঁ, ঘাসের মধ্যে খুব বেশী 'খাদ্যপ্রাণ' আছে, খাবার হিসাবেও কোন কোন ঘাস উঁচুদরের জিনিষ; তবে, সেই ঘাস আমাদের পেট বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌বে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। খেলে হয়তো পেটের গোলমাল সুরু হ'য়ে যাবে। তা'র স্বাদও আমাদের পছন্দ হবে কিনা সন্দেহ।"

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দু'জন বৈজ্ঞানিক ঘাসকে শুকিয়ে, গুঁড়ো ক'রে, তা'র সঙ্গে অন্য দু' একটি জিনিষ মিশিয়ে এক রকম খাবার নাকি তৈয়ারী করেছেন যা' দামে সস্তা, খেতেও মন্দ নয়; অথচ ঘাসের সব গুণ নাকি তা'তে বজায় রয়েছে। যদি এ কথা সত্যি হয় তা' হ'লে মানুষ ঘাস-খোর হয়ে যাবে শীগ্‌গিরই।

টিনে বন্ধ ক'রে ফল, তরকারি ইত্যাদি চালান দেওয়ার প্রণালীরও যুদ্ধের সময় অনেক উন্নতি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাজা ফল, তরকারি নেওয়া অসম্ভব; কাজেই সৈনিকদের জন্য টিনে ভরা খাবার পাঠাতে হয়। সে জন্য লক্ষ লক্ষ টিন খাবার সৈনিকদের জন্য প্রতি সপ্তাহে দরকার হয়। বড় বড় কারখানায় দিন রাত কেবল

টিনে খাবার ভরায় কাজ চল্‌তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও চল্‌তে থাকে, যা'তে আরো সস্তায় আরো সুন্দর ভাবে এ কাজ করা যায়।

দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এত ফল জন্মানো সত্ত্বেও, টিনে ফল এবং তরকারি ভরে বিক্রী করার ব্যবসায়ের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। যদি বড় সহরের বাজারে গিয়ে থাক তা' হ'লে নিশ্চয়ই দেখে থাক্‌বে, ফলের চালান যখন আসে, তা'র কত ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ, আমেরিকা থেকে যে আপেল জাহাজের ঠাণ্ডা-কামরায় (Cold storage চালান আসে, তা'র একটিও নষ্ট হয় না। সেটা শুধু ঠাণ্ডা-কামরার জন্য নয়, ফল বাক্সবন্দী করার কায়দায়ও। টিনে-ভরা ফলের চালানেও আমেরিকার ব্যবসায়ীরা ওস্তাদ্। তার ফলে, টিনের ফলের দামও অনেক ক'মে গেছে আজকাল। সেদিন খবরের কাগজে পড়্‌ছিলাম: "The Yankees eat what they can, and can what they can't."—অর্থাৎ ইয়াঙ্কিরা (যুক্তরাজ্যের লোকেরা) যা' পারে তা' খায় (ফলের ফসল), যা' পারে না তা' টিনে ভরে। সেখানের ফলের ফসলের শতকরা নিরানব্বুই ভাগই খাওয়া হয়, আর আমাদের দেশের অধিকাংশ ফলই শত করা ২৫।৩০ ভাগ নষ্ট হয়! যুদ্ধের সময় আমাদের দেশী ফল অনেক বেশী পরিমাণে টিনে ভরা হচ্ছে বটে কিন্তু, ফসলের তুলনায় সে আর কতটুকু? আশা করি, দেশের ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে ফল চালানের ব্যবসায়ের এতটা উন্নতি কর্‌তে পার্‌বেন যা'তে যুদ্ধের পরও প্রতিযোগিতায় তাঁ'রা দাঁড়াতে পার্‌বেন।

যুদ্ধের সময় শুধু খাবার জিনিষ নিয়েই যে বেশী পরীক্ষা হয় তা' নয়; আরো নানা বিষয়ে উন্নতি হ'তে থাকে। এই তো, আজ দু' বছর আগে শুন্‌তাম, "এরোপ্লেনের গতির বেগ ২০০ মাইল হয়েছে, শীগ্‌গিরই ৩০০ হবে, ৪০০ পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে হ'তে পার্‌বে ব'লে আশা করা যায়।" যুদ্ধ এক বছর চল্‌তে না চল্‌তেই শুন্‌লাম, "যুদ্ধের আধুনিক এরোপ্লেন ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে চল্‌ছে।" যুদ্ধের পরও যে ৪০০ মাইল বেগে চল্‌বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কৃত্রিম রবর, কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী পেট্রল প্রভৃতিও যুদ্ধের আশঙ্কায় প্রাণপণ উঠে-প'ড়ে লেগে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন।

এ রকম কত শত আবিষ্কার যে যুদ্ধের ফলে হয় তা'র হিসাব দেওয়াই মুস্কিল। যুদ্ধ জিনিষটাই খারাপ, কিন্তু, এই খারাপের মধ্যে থেকেও যে ভাল ফল হচ্ছে এটাই যা' ভাল।

কৃপনের ধন

[অসমীয়া গল্প]

শ্রীনলিনী দাশগুপ্ত, এম্.এ

সহরতলীর এক গাঁয়ে ধনীরাম বলে এক ধনী গৃহস্থ ছিল। ধনীরামের যেমন ধনসম্পত্তি, তেমনি খ্যাতি-প্রতিপত্তি। বাপ-দাদার আমল থেকে ক্ষেতের ধান-চাউল, আর বাগানের শাক-সব্জী বিক্রী করে এ যাবৎ কত সিন্ধুক যে তার ভর্ত্তি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মাসে ২।১ সের নুন কেনা ছাড়া সংসারে আর পাই পয়সাটী খরচ হবার যোটি ছিল না। সেই সনাতন নিয়মের জের ধনীরামের বেলায় এতটুকু নড়চড় হয় নি; বাগানের আম, কাঁঠাল, কলা, কুশিয়ার প্রভৃতি জিনিষপত্রের বাজারে বিক্রী হওয়া ছাড়া আর যে কোনো কাজ আছে, ঘরের ছেলেমেয়েরা তাও ভুলে গেছে। সুতরাং সব জিনিষই সোজা বাগান হ'তে বস্তাবন্দী বাজারে চালান হ'য়ে যায়। ঘরের ছেলেমেয়েরা তার টিকিও দেখ্‌তে পায় না।

ধনীরামের অভাব বলতে কিছুই নেই। ক্ষেতের শস্য, গোয়ালে গরু, হালে বলদ, ভাঁড়ারে ধান—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উপচে পড়ে যেন। কিন্তু এত থাকলে কি হবে, সে সব জিনিষ—এমন কি দুধটুকু অবধি কিছুই ঘরের কারো ভোগে লাগে না। শাক-সুক্তো দিয়ে এক গাল ভাত কোন মতে

গিলেই পিত্তিরক্ষা করা বাড়ীর সবারই অভ্যাস হয়ে গেছে। এর বেশী কিছু খাওয়ার কল্পনাও তারা করে না। বুড়ো ধনীরাম যক্ষের মত বাড়ী আগলে বসে থাকে—রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘর ওর নজরবন্দী—বাড়ীর কেউ কোনো জিনিষ এতটুকু অপচয় না করে সেদিকে তার সতর্কদৃষ্টি। কেউ ভাত খেতে বসলে একটু বড় হাঁ করলে পর্য্যন্ত নিজের অলক্ষ্যে চোখ বড় ক'রে হাঁ ক'রে তাকায়; ভাতের সাথে একটা লঙ্কা পর্য্যন্ত মেখে খাবার উপায় নেই—কারণ ধনীরাম ভাবে, যদি মুখে বেশী ঝাল লাগে তবেই ভাতের গ্রাস গপাগপ্ মুখে উঠ্‌বে—অনর্থক গুচ্ছের ভাতের শ্রাদ্ধ হবে। শুধু জলসিদ্ধ শাক দিয়ে কেউ আর বেশী ভাত গিলতে পারবে না এটা জেনেই ধনীরামের ঘরের রোজকার বরাদ্দ—শাকসিদ্ধ আর ভাত। ব্যস্!...

অথচ ঘরের লোক বলতে ধনীরাম নিজে, তার স্ত্রী আর একটী মাত্র ছেলে নিধিরাম। সহরতলীতে থাকে তারা। নিকটেই সহরের পাঠশালায় ছেলেদের পড়তে যেতে দেখে নিধিরামের ভারী পড়াশুনা করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পড়াশুনার নামে ধনীরামের এতটুকু আগ্রহ জাগে না। বাপ রে! ছেলে লেখাপড়া শিখলেই আর এক বিপদ্—পড়াশুনার খরচ তো লেগে আছেই, তার পর ঐ 'ইঞ্জিরী' পড়ার সাথে সাথে বাবুয়ানীর সখ চাপলে শ্রাদ্ধের ষোলকলা পূর্ণ! কাপড়ের ঝুল নেমে যাবে হাঁটুর নীচে, শাক-ভাত রুচবে না আদৌ মুখে—অমন বিদ্যের মুখে ছাই। অমন বাবু ছেলে হলে কি আর টাকা পয়সার থাকবে কিছু?

কিন্তু নিধিরামের পড়ার ইচ্ছা বেজায়—সে পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে বই এনে বাপের অজানিতেই পড়াশুনা সুরু করে। বিদ্যার পথে এগোতেও থাকে মন্দ না।

ইতিমধ্যে বুদ্ধি করে বাপ তার বিয়ে দিয়ে দিলে। ঘরে ছেলেমেয়ে বলতে এখন তাদেরই ছেলেমেয়ে। কিন্তু সেগুলিও না খেতে পেয়ে মরার মতো হয়ে থাকে। নিধিরাম যা হোক কিছু লেখাপড়া শিখেছিল—বুদ্ধিশুদ্ধিও কতকটা ঘটেছিল, ব্যাপার দেখে সে সহজেই আঁচ করে নেয়, এমনি না খেতে পেয়েই সংসারের লোকগুলো তাড়াতাড়ি প্রাণে মরেছে। আর এই ভাবে কিছুকাল চললে, যাও বা ২।৪ জন আছে, অদূরভবিষ্যতে তাদেরও অস্তিত্ব থাকবে না। বাধ্য হয়ে নিধিরাম মনে মনে উপায় চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু পয়সা খরচ করবার মত ফিকির একটীও তার মগজে খেলে না।

বাপ-দাদার আমল থেকে রাশি রাশি টাকাপয়সা যা জমেছে, তা সব ধনীরামের শোবার ঘরের মাচার নীচে একটা গর্ত্তের মধ্যে পোঁতা রয়েছে। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে দোরে তালা লাগিয়ে তবে সে ঘরের বার হয়। টাকাপয়সার মুখ সে ঘরের আর কেউ চোখেও দেখে না। জ'মে জ'মে যখন সিন্ধুক ভর্ত্তি হয়ে ওঠে তখন নিজেই থলে ভর্ত্তি করে সেগুলি কাঁইয়ার ঘরে নিয়ে

যায় ; আর তার বদলে সোনা কিনে আনে। সোনার পাত মুড়ে মুড়ে চেপ্টা করে গর্ত্তের ভিতর ভরে রাখে।

এমনি ধারা চলে এসেছে আজ তিন পুরুষ ধ'রে। ধনীরামের গর্ত্তে কি পরিমাণ সোনার তাল এ যাবৎ জমেছে তা কিন্তু বেচারা নিজেও জানে না। শুধু গর্ত্তভর্ত্তি সোনা আছে, এই বোধেই সে মহাখুসী।

ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটু গামছা পরেই দিন কাটে তার। ধুতে গেলে পাছে ফেঁসে যায় এই ভয়ে গামছাটা অবধি জল দিয়ে কাচে না বেচারা। যখন একান্ত বাইরে বেরুতে হয় তখন সাত জন্মের পুরোনো একটা উড়ুনি পরেই যেতে হয়—নইলে অতটুকু বিলাস কর্‌বার মত তুচ্ছপ্রবৃত্তি ধনীরামের মত লোকের হয় না।

এমনি ক'রে ক'রে গর্ত্তের সোনা উপচে পড়বার যোগাড় !

একদিন ঘরের দোরে তালা মেরে ধনীরাম তার সব্জীবাগে কাজ কর্‌ছিল। ছেলে-মেয়েরা অন্য দিকে যে যার তাঁত নিয়ে ব্যস্ত, ছেলে নিধিরাম গেছে তাগাদায়। ফিরে এসে ঘরের তালা খুলে ভিতরে পা দিতেই ধনীরামের চোখ কপালে উঠে যায়। ব্যাপার কী !

না—ওর ঘরের পেছন দিক্‌টায় খানিকটা ভাঙ্গা, আর ?—আর সেই সোনার গর্ত্তটা খুঁড়ে কে যেন সমস্ত সোনা চুরি করে সট্‌কেছে ! সর্ব্বনাশ ! সমস্ত গর্ত্তের মধ্যে ভর্ত্তি কতকগুলো পাথরের টুকরো ! তার উপরে একটা কাগজে লেখা—

"কৃপণের কাছে যাই সোনা তাই শিল।"

ব্যাপারটা বোধগম্য হতে ধনীরাম যেন আচম্‌কা আকাশ থেকে খসে পড়ে গভীর গর্ত্তে। হতবুদ্ধির মত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সে।

আবার একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে আসে তার, ভাবে,—হ্যাঁ ! তা তো বটেই। আমার কাছে শিলে আর সোনায় সত্যিই তো প্রভেদ নেই। যা ভোগেই লাগে না, তা সোনাই হোক আর শিলাই হোক—একই কথা। সত্যিই তো !……কিন্তু বেশীক্ষণ মনটা প্রবোধ মানে না। থেকে থেকে হু-হু করে ওঠে প্রাণটা। সে কি কম খানিক সোনা !……

ধনীরামের মনটা মুষড়ে পড়ে। কিছুতেই শান্তি পায় না সে। সর্ব্বদা গুম্ মেরে পড়ে থাকে, আগের মতো আর ক্ষেতখামারের জন্য দৌড়াদৌড়িতে মন বসে না। খালি ভাবে আর ভাবে—"হায় কী কর্‌লাম ! একটা আধলাও নিজে ইচ্ছামতো খরচ কর্‌লাম না, কেবল চোরের জন্যই সোনা যোগালাম !"

এত দিনে ধনীরামের চোখ ফোটে। পয়সা খরচ না করাটাই বোকামি হয়েছে এত দিন।

নিজের উপর ধিক্কার জন্মে তার। এই সব ব্যাপারে তার মন এত খারাপ হয়ে যায় যে আগে সে যাও বা চারটি ভাত খেত, এখন তাও মুখে রোচে না।

ফলে শুক্‌নো শরীর তার দিনে দিনে আরো শুক্‌নো হতে থাকে।

এ দিকে নিধিরাম দেখে, না খেয়ে খেয়ে বাবার শরীর ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে। লায়েক ছেলে সে, তার এ বিষয়ে উদাসীন থাকা একান্ত অনুচিত। তাই সে দৈ, ক্ষীর বিক্রী বন্ধ করে বাপকে আর ঘরের ছেলেমেয়েদের খুব খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর্‌তে হুকুম দিলে।

এবার ধনীরাম কিন্তু এতটুকু আপত্তি জানায় না। ছেলের বিবেচনাকে সন্দেহ কর্‌তে সাহস হয় না তার। বাপকে মৌনী দেখে সম্মতির আভাস পেয়ে নিধিরামেরও হাত খুলে যায়। রোজ রকমারী ফল, মাছ, মাংস, ঘি, আটার আমদানী হচ্ছে। পেট ঠেসে খেয়ে খেয়ে সকলের শুক্‌নো শরীরে চামড়ায় চেক্‌নাই ফুটে ওঠে। তবুও বাপ কিছু উচ্চবাচ্য করছে না দেখে নিধিরামের সাহস আরো বেড়ে যায়।

এই বার ধনীরামের হাঁটু-ঝুল গামছা ঘুচে গিয়ে মিহি সুতোর লম্বা ধুতি আসে। তবুও বাপের তরফ থেকে এতটুকু আপত্তি আসে না ! তার পর একদিন নিধিরাম বাগানের জন্য দু'টো মালী রেখে বাপের নিজ হাতে কোদাল ধরার পথও বন্ধ করে দেয়।

একটু একটু করে নিধিরামের আস্কারা বেড়েই চলে। নিজের হাতেই হাল চালাচ্ছিল সে এত দিন, এবার ক্ষেতের জন্য তিন-তিনটে হেলে চাষা লাগিয়ে দেয়।

পৌষ মাস। শীতের বড় চোট্। নিধিরাম একে একে ঘরের সকলের জন্য গরম জামা-কাপড় কিনে এনে দেয়। এত দেখেও কিন্তু ধনীরামের মুখে রা' নেই।

আরো ক'দিন যায়। সাহস পেয়ে পেয়ে নিধিরাম অনেক টাকা খরচ ক'রে একে একে রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘর, ঠাকুর-ঘর—সব পাকা করে তোলে।

বুড়ো ধনীরামের এইবার একটু গা সুড় সুড় করে বটে কিন্তু এখন আর ছেলেকে বলে কিছু লাভ নেই দেখে বেচারা থ' মেরে প'ড়ে থাকে।

আচ্ছা, এত টাকা আসে কোত্থেকে ?—মনে মনে ভাবে ধনীরাম। অথচ ধরবারও যো নেই। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে বলে, "আমি নিজে চাকরি করছি, বাবা, তারই মাইনে থেকে এ সব খরচ হচ্ছে আর কি।"

"চাকরি কর্‌ছিস ? তুই ?" চোখ কপালে তুলে বলে ধনীরাম, "তোর তো জানি ক' অক্ষর জ্ঞান নেই। কে দিলে তোকে চাকরি, শুনি ?"

"না বাবা", আপত্তির সুরে বলে নিধিরাম, "আমাকে আপনি পড়াতে চান্ নি। অথচ সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় টো টো ঘুরে বেড়াই বলে আপনি আমাকে কত গালমন্দ করেছেন,

কান্ত মেরেছেন, আমি সব সয়ে গেছি। আমি মিছিমিছি ঘুরে বেড়াই নি, বাবা! আপনার অজান্তে নানা জনের সাহায্যে কিছু লেখাপড়া শিখেছি। আর সেইটুকু বিদ্যের বলেই আজ যা কিছু রোজগার করে আপনাদের একটু সেবা করতে পাচ্ছি।”—কথাগুলি খুলে বলতে পেরে নিধিরামের মনটা যেন হাল্‌কা হ'ল এত দিনে।

“কি জানি, হবে ও বা!” সাঁত পাঁচ ভেবে ধনীরাম রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। ছেলের মতে সায় না দিয়ে বাপের আর উপায় থাকে না। সাহস পেয়ে, তখন নিধিরাম অনেক টাকা খরচ করে এক প্রকাণ্ড ছ' মহল বাড়ী ফেঁদে বসে। তার পর একে একে বাড়ী সাজাবার উপকরণ সব তৈরী হতে থাকে—খাট, পালঙ্ক, আলমারি ইত্যাদিতে ঘর ভরে যায়। দেখতে দেখতে চাকর-বাকর, ঝি-দাসীতে ধনীরামের সারা বাড়ী গম্‌গম্ কর্‌তে থাকে।

ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে ধনীরাম তো অবাক্! তার মনে দারুণ সন্দেহ জাগে—“উঁহু, ও সোনা নিশ্চয়ই নিধিরামের হাতে পড়েছে।” ভাবতেই ধনীরামের মনটা আবার হু-হু করে উঠে। “এত সোনা, এমন অযথা অপব্যয় হ'ল!”

এমনি ধারা চিন্তায় চিন্তায় বুড়ো আবার শুকিয়ে যেতে থাকে। শরীর তার আবার পাটকাঠির মতো সরু হ'তে সুরু করে। ছেলে তাকে যতই বোঝাতে চায়, কিছুতেই সে ছেলেকে সু-নজরে দেখতে পারে না।

এদিকে বাপ শুকিয়ে শুকিয়ে মরবার উদ্যোগ করছে দেখে নিধিরাম এক কাজ করলে। একটা লোহার বাক্স কিনে এনে তাতে এক বাক্স ভর্ত্তি টাকা পূরে, বাপের কাছে গচ্ছিত রাখলে। টাকা আগলানোর বাতিক যার অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে তাকে শত দুধ-ভাত দিলেও টাকার মুখ না দেখ্‌লে সে যে মরেই যাবে!

“এত টাকা কোত্থেকে পেলি তুই?” ধনীরাম মহাদুঃখে জিজ্ঞেস করে।

“আচ্ছা বাবা, আপনার গর্ত্তে জমা টাকা কতটা ছিল?” নিধিরাম শুধোয়।

“টাকা আর কোথায় ছিল? সোনা,—খালি সোনার তাল ভর্ত্তি ছিল রে!” হঠাৎ সে কথা স্মরণ করতে বুড়োর মনটা ছাঁৎ করে ওঠে।

“আচ্ছা বাবা, কত টাকার আন্দাজ সোনা ছিল তাতে?”

“তা…তা…তা আমি বলতে পারি নে ঠিক।” আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লে ধনীরাম; জীবনে কোনদিন তার মূল্য সংখ্যা কর্‌বার মত সুবুদ্ধি তার হয় নি।

বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে নিধিরাম, “আপনার সে জমা সোনা চুরি হয়েছে বলে বৃথা আফ্‌শোষ কর্‌ছেন বাবা! ভোগেই যদি না লাগে তবে আর তাল তাল সোনা জমিয়ে সুখটা কি? ও সোনাও যা শিলও তা।”

হঠাৎ কথাটা শুনে ধনীরামের মনে সেই লেখা কাগজটার কথা মনে পড়ে যায়। সন্দেহের চোখে তাকায় সে ছেলের পানে। কিন্তু নিধিরামের সাহস বেড়ে গেছে। এবার বলে, “এই কথা? আমি একটী বন্ধুর সাথে জোট করে, আপনার অজানতে, গর্ত্ত খুঁড়ে সোনার তালগুলি নিয়েছিলাম। আর তারই ফলে আজ আমার এই ঐশ্চর্য্য। এই যে বাক্স ভর্ত্তি টাকা দেখ্‌ছেন বাবা, এ তারই জের। আর বাকী টাকাও সুদ সমেত আমি শীগ্‌গিরই আপনাকে এনে দেব। আপনি মন খারাপ করে অনর্থক দুঃখ পাবেন না, বাবা, আপনার অর্থের কোন অপব্যয় আমি করি নি, বরং দেখুন, তার বাড়তির ব্যবস্থাই করেছি।”

“কী রকম?” আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন করেন ধনীরাম।

“প্রায় দু'লাখ পরিমাণ টাকা খাটিয়ে আমি আপনার নামে বড় বড় কারবার খুলেছি। শত শত লোক আপনার কারবারে কাজ করে জীবিকার সন্ধান কর্‌ছে। এত দিন ভয়ে ভয়ে কিছু বলি নি, আজ আপনার কাছে সাহস পেয়ে সব বল্‌লাম। যদি অমত না করেন, বাবা, তবে আজই আপনার কারবার কারখানা সব দেখিয়ে আনতে পারি।”

ছেলের কথা শুনে ধনীরামের আনন্দের অবধি থাকে না। খুঁটে খুঁটে সমস্ত কথা নিধিরামের কাছে জেনে নেয় সে। পুত্রের সু-বুদ্ধির প্রশংসায় পিতার মুখে ফুটে উঠে অপূর্ব্ব গর্ব্বের গরিমা।

এক রাত্রের বিভীষিকা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক

জায়গাটির নাম নেই-বা শুনলে! আমার সঙ্গীটির আসল নামও বলব না, কারণ তাঁর আপত্তি আছে। কারণ বোধ হয়, এই নৈশ নাটকে আমাদের কেউই বীরের ভূমিকায় অভিনয় করে নি। তবে এইটুকু শুনে রাখো, আমার সঙ্গীটি হচ্ছেন কলকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার। আমি তাঁকে সুবোধ ব'লে ডাকব।

এত লুকোচুরি কেন জানো? গল্পটি অমূলক নয়।

অনেক দিন আগেকার কথা। সুবোধ তখন সবে ডাক্তারি পাস করেছে, কিন্তু কোমর বেঁধে রোগী-বধকার্য্যে নিযুক্ত হয় নি।

ছেলেবেলা থেকেই ভাঙা-চোরা সেকেলে মন্দির প্রভৃতি দেখবার সখ ছিল আমার অত্যন্ত। ভারতবাসীর অধিকাংশ নিজস্ব খুঁজতে গেলে এই-সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সেদিনও আমরা দু'জনে একটি পুরানো মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। তার গর্ভ থেকে দেবতার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার গা থেকে কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য এখনো কেউ মুছে দিতে পারে নি। সেই-সব কারিকুরি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল আমার নয়ন-মন।

কিন্তু সুবোধ হ'ল নিরাশ। বিরক্ত স্বরে বল্লে, "বনজঙ্গল-মাঠের ভেতর দিয়ে পথে-বিপথে সাত মাইল পেরিয়ে এই দেখাতে আমাকে এখানে নিয়ে এলে? এ যে পর্ব্বতের মূষিক-প্রসব!"

আমি বল্লুম, "মেডিকেল কলেজে মড়ার সঙ্গে বাস ক'রে ক'রে তোমার মনও ম'রে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সুবোধ! নইলে এমন শিল্প-চাতুরী দেখবার পরেও মুখ-ভার করতে পারতে না!"

সুবোধ বল্লে, "আরে রেখে দাও তোমার শিল্প-চাতুরী! রোদ প'ড়ে আসছে, সামনে আছে সাত মাইল দুর্গম পথ! এ-সময়ে শিল্প-চাতুরী নিয়ে তর্ক না ক'রে বাসার দিকে পা চালাবার চেষ্টা কর। পথে আসতে আসতে শুনেছ তো, এখানকার বনে-জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের অভাব নেই? তারা শিল্প-রসিকের মর্য্যাদা রাখে না।"

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম। সূর্য্যের ছুটি নেবার সময় হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই অন্ধকারের কালো রাজত্ব সুরু হবে। শুনেছি এ-অঞ্চলে মাঝে মাঝে ডাকাতের ভয়ও হয়।

সুবোধ আগেই অগ্রসর হ'ল। আমিও তার অনুসরণ করলুম।

দুই

কিন্তু বরাত ভালো ছিল না।

একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খোলা মাঠের উপরে প'ড়েই দেখলুম, আকাশের একপ্রান্ত আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে কালির মতন কালো মেঘে মেঘে।

সেইদিকে আঙুল তুলে সুবোধ বল্লে, "দেখেছ?"

—"হুঁ, দেখেছি। মিশ্ কালো মেঘ, ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা।"

সুবোধ বল্লে, "মাঠের ওপর দিয়ে আমাদের প্রায় দু' মাইল হাঁটতে হবে। আসবার সময় দেখেছি, মাঠের ও-পাশে তিন-চারখানা কুঁড়ে ঘর আছে। কিন্তু সেখানে যাবার অনেক আগেই ঝড় আমাদের নাগাল ধ'রে ফেলবে। এখন উপায়?"

—"উপায় খুব-তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেওয়া।" ব'লেই আমি প্রায় ছুটতে সুরু করলুম।

কিন্তু মাইল-খানেক এগুতে-না-এগুতেই মেঘের দল এগিয়ে এল একেবারে আমাদের মাথার উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে কি ঝড়ের তোড়! সুবোধের মাথায় ছিল টুপী, ঝড়ের ছোঁয়া পেয়েই সে পক্ষী-ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে ফুড়ুক্ ক'রে আকাশে উড়ে গেল! চারিধারে হু-হু গোঁ-গোঁ গর্জ্জন, পিছন থেকে ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা এবং রাশি রাশি কাঁকর ছুটে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল, ছর্‌রা গুলির মত। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মেঘের কালিমা মিলে আমাদের দৃষ্টি ক'রে দিলে প্রায় অন্ধের মত। ভাগ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, নইলে নিশ্চয়ই আমরা পথ হারিয়ে ফেলতুম।

কোন রকমে মাঠ পার হলুম বটে, কিন্তু গায়ে পড়ল বড় বড় কয় ফোঁটা জল।

সুবোধ বল্লে, "ওহে, এইবার বৃষ্টির পালা আরম্ভ হবে। সামনে একটা ঘরের মতন কি দেখা যাচ্ছে, ঐদিকে চল—ঐদিকে চল।"

হ্যাঁ, পাশাপাশি দু'-তিনখানা কুঁড়ে ঘরই বটে! একটা দাওয়ার উপরে উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই ঝম্-ঝম্ ক'রে নামল মুষল-ধারে বৃষ্টি।

খানিকক্ষণ ধ'রে হাঁপ ছাড়বার পরে সুবোধ তেতো হাসি হেসে বল্লে, "বন্ধুবর, শিল্পচাতুরী এখন কেমন লাগছে?"

—"মন্দ কি?

ঝর-ঝর বরষা,
নাহি কোন ভরসা!

এও একটা নূতনত্ব ভেবে অনায়াসেই উপভোগ করা যেতে পারে।"

—"ভবিষ্যতে তোমার ভাবুকতার ফাঁদে আর কখনো পড়ব না। এখান থেকে আমাদের বাসা এখনো চার মাইলের কম হবে না। এই বৃষ্টি আর অন্ধকারে সেখানে যাওয়াও অসম্ভব, এখানে থাকাও অসম্ভব!"

—"থাকা অসম্ভব কেন?"

—"সারা রাত উপোস করব? হিন্দু বিধবার মত উপোস করবার শক্তি আমার নেই। এখনি আমার এত ক্ষিধে পেয়েছে যে, আমি যদি বাঘ হতুম, তোমাকে ধ'রেই গপ্ ক'রে খেয়ে ফেলতুম, বন্ধু ব'লে মানতুম না।"

ফিরে দেখলুম, আমাদের পিছনে একটা দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর লাইন দেখা যাচ্ছে। আমি সেই দরজায় ধাক্কা মারলুম।

দরজাটা খুলে গেল। হারিকেন লণ্ঠন হাতে ক'রে একজন স্ত্রীলোক আমাদের দেখেই বিস্মিত ভাবে দু' পা পিছিয়ে গেল।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী বিস্মিত হলুম আমরা!

বাবা, এত বৃহৎ স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখি নি! যেমন লম্বায়, তেমনি চওড়ায়! দেখলেই তাকে পালোয়ানের মতন জোয়ান ব'লে মনে হয়। এবং কি কালো আর কি কুৎসিত! বলতে কি, সে স্ত্রীলোক হ'লেও তাকে দেখে আমার বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করতে লাগল।

স্ত্রীলোকটা ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বল্‌লে, "তোমরা কে গো বাবুজী?"

—"আমরা এদিকে বেড়াতে এসেছিলুম গো! ফেরবার পথে এই ঝড়-বৃষ্টি! আমাদের বাসা এখান থেকে অনেক দূরে। আজ রাতটা এখানে থাকবার ঠাঁই হবে?"

সে বল্‌লে, "বাবুজী, আমরা ভারি গরীব। এই নোংরা ঘরে তোমরা থাকতে পারবে কি?"

—"খুব পারব গো, খুব পারব। অবিশ্যি কাল সকালে তোমাকে ভালো ক'রে বখ্‌সিস্ না দিয়ে যাব না।"

স্ত্রীলোকটা খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর বল্‌লে, "আচ্ছা, এস।"

আমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বল্‌লে, "আমার সঙ্গে চল।"

চললুম। সে-ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে স্ত্রীলোকটা বল্‌লে, "বাবুজী, এই ঘরে তোমাদের থাকতে হবে।"

চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। মাঝারি আকারের ঘর। মেঝে-ময় ছাগলের বিষ্ঠা, মেটে দেওয়াল, উপরে খড়ের ছাউনি। একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটা সস্তা দামের আল্‌মারি দাঁড় করানো রয়েছে, কিন্তু তার পাল্লায় কাচ নেই এবং ভিতরেও তাক নেই। আর একদিকে একখানা দড়ীর খাটিয়া। সারা ঘরে এমন বোঁটকা দুর্গন্ধ যে নাকে কাপড় চাপা দেবার ইচ্ছা হ'ল।

স্ত্রীলোকটা বল্‌লে, "বাবুজী, রাতে তোমরা খাবে কি?"

সুবোধ বল্‌লে, "আমিও তোমাকে ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম! রাতে খাব কি? তোমাদের বাড়ীতে খাবার-টাবার কিছু নেই?"

—"দু'টি চাল আছে, আর কিছু নেই। বাবুজী, আমরা বড় গরীব।"

সুবোধ ম্রিয়মাণ ক্ষীণস্বরে বল্‌লে, "বেশ, আজ ঐ চালেই আমাদের চলবে।"

স্ত্রীলোকটা বল্‌লে, "বাবুজী, তোমরা মোরগ খাও?"

—"মোরগ? অর্থাৎ ফাউল? নিশ্চয়ই খাই।"

—"আমার মোরগ আছে, বাবুজী!"

সুবোধ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বল্‌লে, "য়্যাঁঃ, তোমার মোরগ আছে? তবে কে বলে তুমি গরীব? মোরগ তো রাজভোগ! আচ্ছা, এখন এই একটা টাকা নাও, কাল সকালে তোমাকে আরো তিন টাকা বখ্‌সিস দিয়ে যাব।" ব'লেই সে ফস্ ক'রে পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করলে।

স্ত্রীলোকটার দুই চোখ হঠাৎ জল্-জল্ ক'রে জ্ব'লে উঠল। তার সেই লোলুপ দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে দেখলুম, সুবোধ তার ব্যাগ খুলেছে এবং ব্যাগের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে কয়েকখানা নোট।

ঠিক সেই সময়ে দরজার কাছ থেকে কর্কশ হেঁড়ে-গলায় কে বল্‌লে, "মণিয়া, এরা কারা?"

চমকে ফিরে দেখি, দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে আর একখানা বীভৎস মুখ! কালো পাথরের থালার মতন গোল মুখে দুটো ভাঁটার মত চোখ, থ্যাব্‌ড়া নাক, ঝাঁটার মত খোঁচা খোঁচা গোঁফ এবং হিংস্র জন্তুর মত বড় বড় দাঁত! যেন মা-দুর্গার অসুর!

মণিয়া—অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোকটা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "বাবুজীরা আজ এখানে থাকবে। চল্, তোকে সব বলছি।"

তিন

সেই দুই অদ্ভুত ও ভয়াবহ মূর্ত্তি অদৃশ্য হবার পর আমি বিরক্ত স্বরে বল্‌লুম, "সুবোধ, এই স্ত্রীলোকটার সামনে কে তোমাকে ব্যাগ খুলতে বল্‌লে?"

—"কেন ভাই, কিছু অন্যায় হয়েছে নাকি?"

—"অন্যায় হয়েছে কিনা আজ রাতেই হয়তো বুঝতে পারব। একে তো এই অজানা জঙ্গুলে জায়গা, ঝড়-বাদলের রাত, আর আমাদের এই অসহায় অবস্থা, তার উপরে কৃতজ্ঞতার খাতির রেখেও বলতে হচ্ছে, আমাদের আশ্রয় দিয়েছে যারা তাদের চেহারা হচ্ছে দানব-দানবীর মত! রক্ষক শেষটা ভক্ষক হয়ে না দাঁড়ায়!"

সুবোধ ভীত ভাবে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

খানিক পরেই দেখি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সেই দুষ্মণের মতন পুরুষটা। দরজার কাছেই ছিল হারিকেন লণ্ঠনটা। তার ম্লান আলোতেও স্পষ্ট দেখলুম, লোকটার হাতে

চক্-চক্ করছে একখানা প্রায় একহাত লম্বা ছুরি—না, ছুরি না ব'লে তাকে ছোট তরবারি বল্‌লেই ঠিক হয়! লোকটা একবার আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী হাসি হাসলে, তার পর দাওয়া থেকে উঠানে নেমে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

সুবোধও দেখেছিল। চোখ কপালে তুলে সে বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! এই রাতে অত-বড় ছুরি নিয়ে ও কি করবে?" ও আমাদের পানে তাকিয়ে অমন ক'রে হাসলে কেন?"

পাশের ঘর থেকে স্ত্রী-পুরুষের গলার আওয়াজ এল।

আমি বল্‌লুম, "আমরা এখানে এসে প্রথমে দেখেছিলুম খালি মণিয়াকে। তার পর দেখলুম আর-একটা লোককে। এখন দেখছি এ বাড়ীতে আরো পুরুষও আছে! তাদের চেহারাও বোধ হয় কার্ত্তিকের মতন নয়!"

সুবোধ ধপাস্ ক'রে খাটিয়ার উপরে শুয়ে প'ড়ে বল্‌লে, "এক মণিয়া-রাক্ষসী আক্রমণ করলেই আমরা দু'জনেই হয়তো কাবু হয়ে পড়ব, তার উপরে আবার পুরুষ সঙ্গীর দল! নাঃ, আমাদের আর কোনই আশা নেই!"

ঘণ্টা-দু'য়েক পরে মোটা লাল চালের ভাতের সঙ্গে এল গরম ফাউলের ঝোল। কিন্তু ফাউল খাবার জন্য সুবোধ আর কোন আগ্রহই দেখালে না। তার মুখের ভাব দেখলে মনে পড়ে বলির পাঁঠার কথা। আমার নিজের মুখের ভাব কি-রকম হয়েছিল, জানি না।

চার

রাতে শোবার আগে ঘরের দরজা আগে ভিতর থেকে খুব সাবধানে বন্ধ ক'রে দিলুম। হারিকেনের লণ্ঠনটা সেই কাচ ও তাক-হীন আলমারির মাথায় এমন ভাবে রেখে দিলুম, যাতে ঘরের সবটা দেখতে পাওয়া যায়।

সুবোধ বল্‌লে, "এরা কি জাত, বোঝা গেল না! এরা মুর্গী পোষে, মুর্গী রাঁধে, কিন্তু এদের মুসলমান ব'লে তো মনে হচ্ছে না!"

খাটিয়ার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে বল্‌লুম, "আমার বিশ্বাস, এরা সাঁওতাল কি ঐ-রকম কোন বুনো জাত!"

সুবোধ ত্রস্ত স্বরে বল্‌লে, "কি হে, তুমি ঘুমোবে নাকি? আমি কিন্তু সারা রাতই জেগে ব'সে থাকব। এখানে ঘুম মানে মৃত্যু বা আত্মহত্যা।"

—"তুমি যদি পাহারা দিতে রাজি হও, তা হ'লে আমি আর জেগে মরি কেন?" ব'লেই আমি চোখ মুদে ফেললুম।

বাইরে তখনো ঝম্-ঝম্ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। থেকে থেকে গাছে গাছে ঝোড়ো হাওয়ার কান্নাও শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শুনলুম, একটা ছাগলও চীৎকার করছে প্রাণপণে।

কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছি, কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছি জানি না, কিন্তু হঠাৎ সুবোধের প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির চোটে ভেঙে গেল আমার ঘুম।

ধড়্‌মড়্ ক'রে উঠে ব'সে বল্‌লুম, "কি, কি, ব্যাপার কি?"

সুবোধ প্রায় কান্নার স্বরে বল্‌লে, "বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা মারছে! তারা আসছে—তারা আসছে!"

—"কি বলছ? কারা আসছে?"

—"যারা আমাদের গলা কাটতে চায়! আর রক্ষে নেই।"

সভয়ে দরজার দিকে তাকালুম।

সুবোধ থর্-থর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে, "ও-দরজায় নয়, অন্য কোন দরজায়! ঐ শোনো।"

সত্য, ঘটাঘট্ ক'রে একটা দরজার শব্দ হ'ল! শব্দটা জাগছে এই ঘরের ভিতরেই, অথচ এখানে একটা ছাড়া দরজা নেই!

সুবোধ কাণ পেতে শুনে বল্‌লে, "শব্দটা আসছে যেন ঐ ভাঙা আলমারির পেছন থেকেই!"

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আলমারিটা একটু টেনে সরিয়ে তার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখলুম, সত্যসত্যই আলমারির পিছনে রয়েছে আর একটা দরজা!

সুবোধ বল্‌লে, "ভাই, আমরা পাকা ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি। ঐ দরজাটা লুকোবার জন্যেই ওখানে ওরা আলমারি রেখেছে!"

হাত বাড়িয়ে দেখলুম, সে-দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করবার কোন উপায় নেই।

বুঝলুম, একটু জোরে ধাক্কা মারলেই এই ভাঙা আল্‌মারিটা এখনি উল্টে হুড়্‌মুড়্ ক'রে প'ড়ে যাবে মেঝের উপরে। কিন্তু শত্রুরা জোরে ধাক্কা মারছে না কেন? আমাদের ঘুম ভেঙে যাবার ভয়ে? খুব সম্ভব তাই।

আলমারিটাকে আবার যথাস্থানে সরিয়ে রেখে তার গায়ে খাটিয়াখানা ঠেলে দিলুম। তার পর খাটিয়ায় ব'সে প'ড়ে ঘড়ী বার ক'রে দেখলুম, রাত সাড়ে-তিনটে।

পাঁচ

কিন্তু আমাদের প্রাণ এবং সুবোধের নোটগুলো এ-যাত্রা বেঁচে গেল, কারণ রাত্রে সন্দেহজনক আর কিছু ঘটল না।

সকালে ঘরের দরজা খুলেই দেখি, মণিয়া দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

সে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবুজী, রাতে ঘুম হয়েছিল তো?"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লুম, "সারা রাত তোমরা যদি দরজা ঠেলাঠেলি কর, তা হ'লে ঘুম হয় কেমন ক'রে?"

মণিয়া আবার হেসে বল্‌লে, "ও, বুনি বুঝি ওদিকের ভাঙা দরজাটা ঠেলেছিল? হ্যাঁ বাবুজী, বুনির ঐ স্বভাব। ও দরজার খিল নেই, বুনি তা জানে। তার জ্বালাতেই তো দরজার সামনে আলমারিটা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

—"বুনি কে, শুনি?"

—"আমাদের বক্‌ড়ী, বাবুজী!"

ছাগ্‌লী! একটা ছাগ্‌লীর ভয়ে কাল রাতে আমরা—

হঠাৎ সুবোধ একদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করলে।

উঠানের মাঝখানে রয়েছে একরাশ মুর্গীর পালক প্রভৃতি এবং তার পাশেই দেখা যাচ্ছে মস্ত একখানা একহাত লম্বা ছুরি!

তা হ'লে কাল রাতে সেই লোকটা এই ছুরিখানা নিয়ে বেরিয়েছিল মুর্গী কাটবার জন্যেই?

বিদেশ-বিভূঁই, ঝড়-বাদল, নিশুত রাত, অচেনা মানুষের বিকট চেহারা, বৃহৎ ছুরি, লুকানো দরজা এবং ছাগলী বুনির গৃহপ্রবেশ-চেষ্টা প্রভৃতি একসঙ্গে মিলে আমাদের ভীরু মনের ভিতরে যে ঘোরতর বিভীষিকার জগৎ সৃষ্টি করেছিল, সকালের সূর্য্যালোকে তা উড়ে গেল কুয়াশার মত।

নিজেদের মনে-মনে লজ্জাও যে হচ্ছিল না এমন কথা বলতে পারি না।

এবং অনুতাপও হচ্ছিল যথেষ্ট। হ'তে পারে মণিয়া আর তার সঙ্গীদের চেহারা অপ্সর-অপ্সরীদের মতন নয়। কিন্তু এই দুর্য্যোগের রাতে, গহন বনে আমাদের মতন অনাহূত অতিথিদের আশ্রয় ও আহার্য্য দিয়ে তারা যে-যত্নাদরটা করেছে, তার মর্য্যাদা না দিয়ে আমরা যে তাদের উপরেই অতি-অকৃতজ্ঞের মতন হীন সন্দেহ করেছি, এই অপ্রিয় সত্যটাই আমাদের মনকে আঘাত দিতে লাগল বারংবার।

বলা বাহুল্য, সুবোধের অঙ্গীকৃত তিন টাকা বখ্‌সিস্ পরিণত হ'ল পঞ্চ মুদ্রায়। এই অভাবিত সৌভাগ্যে মণিয়ার কালো মুখের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল মিষ্ট হাসির তরঙ্গ।

বিচিত্র ভারত

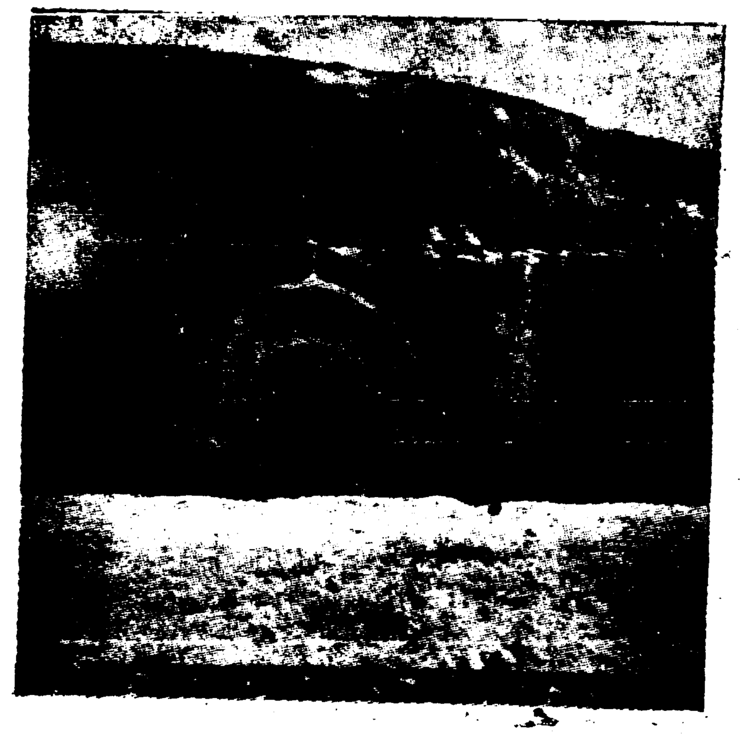

বৌদ্ধ যুগের গুহা

এটি গয়ার কাছে বরাবর পাহাড়ের সাত ঘরোয়া গুহা,—সম্রাট্ অশোকের সময়ে তৈরী।

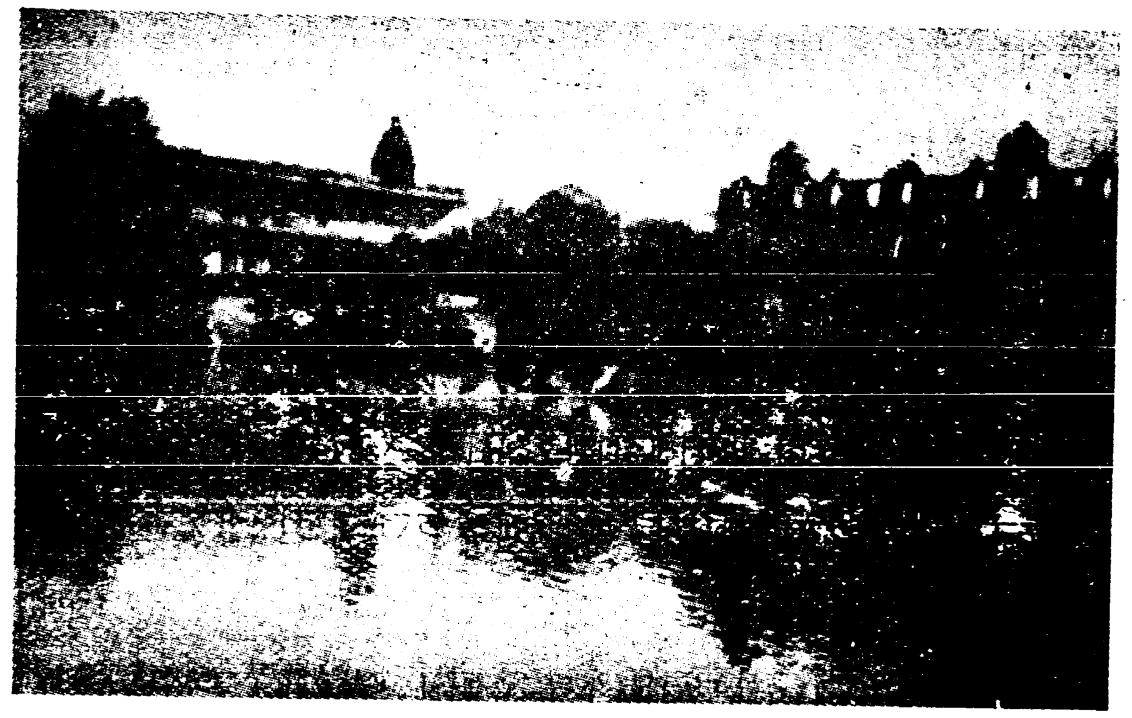

বৃন্দাবনের কাছে গিরিগোবর্দ্ধন

সজারু

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ.

শীতকাল। বড়দিনের ছুটিতে সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। এক বন্ধুর বাড়ীতে শুইয়া আছি। অনেক রাত্রে ঘরের পাশে ঝুন্ ঝুন্ শব্দ!

বন্ধুকে ডাকিলাম।

বন্ধু বলিলেন, 'সজারু এসেছে মান খেতে।'

সজারুর গায়ের কাঁটা

তার পর খবর দেওয়া হইল দীনুকে। দীনু চাকর। বাইরের ঘরেই সে ছিল। সজারুর নাম শুনিয়া সে সেই কন্কনে শীতের মধ্যেই তার বর্শা আর লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। স্থানটি যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায়। যশোহরের 'মান' খুব বড় হয়। এই মান সুস্বাদুও খুব। এইজন্য যশোরে মানের একটা সুনাম আছে। মানের রীতিমত আবাদ হয় এখানে। গরু-ঘোড়ারা কখনও মানের গাছ খায় না। মানের একমাত্র শত্রু এখানে সজারু। সেইজন্য মান-ক্ষেতগুলি বেশ করিয়া বেড়া দিয়া ঘিরিতে হয়।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, দীনু একটি মৃত সজারু লইয়া বিজয়গর্ব্বে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। সেই হত সজারুটিকে পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েরা ঘিরিয়া নানারূপ মন্তব্য করিতেছে। অনেকে সজারুর কাঁটা তুলিয়া লইয়া গেল—মাথার চুল-বাঁধা কাঁটা করিবার জন্য। আমাদের দেশে 'জাপানী' রকমারী মাথার কাঁটা আমদানী হওয়ার আগে সজারুর কাঁটা দিয়াই পল্লীগ্রাম অঞ্চলের অনেকে চুল বাঁধিত।

সজারুর মাংসও লোকে খায়। শুনিয়াছি, সজারুর মাংস বেশ নরম ও সুস্বাদু।

সজারুর সমস্ত গায়ে লোমের পরিবর্ত্তে কাঁটা। কাঁটাগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। খানিকটা শাদা আবার খানিকটা কালো।

আমাদের দেশে এক রকম পাখী আছে তার লেজের মাঝখানে একটি সুচের মত। ইহারা উপরে বাসা না বাঁধিয়া মাটিতে গর্ত্তের মধ্যে বাস করে। পক্ষী-জগতে ইহাদের কি নাম আমি জানি না—আমরা ইহাদের 'ছুঁই-চোরা' পাখী বলিয়াই জানিতাম। ছোট বেলায় ইহাদের সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছি, পূর্ব্বজন্মে এই পাখী সুচ চুরি করিয়াছিল বলিয়াই উহাদের এই শাস্তি!

মরুভূমির গায়ে-কাঁটা ইঁদুর

সজারু তাহা হইলে কি চুরি করিয়াছিল কে জানে!*

আসল কথা, উহাদের আত্মরক্ষার জন্যই ভগবান্ এইরূপ সমস্ত গায়ে লোমের পরিবর্ত্তে কাঁটা দিয়া দিয়াছেন। সজারু মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। সজারু একবার রুখিয়া কাঁটা ফুলাইয়া দাঁড়াইলে ইতর প্রাণীদের কাহারও সাধ্য নাই সজারুর কিছু করে। ইহাদের কাঁটাগুলি অত্যন্ত ধারাল এবং উহা চুম্বক-শক্তিসম্পন্ন।

কোন কোন মরুভূমির মধ্যে এক রকম ইঁদুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সমস্ত গায়ে লোমের পরিবর্ত্তে সূচের মত কাঁটা। ব্রেজিলে এক রকম প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, সজারুর মত তাহাদের সমস্ত গায়ে কাঁটা আছে।

* সজারু সম্বন্ধেও ও-দেশে এইরূপ গল্প আছে। যাঁহারা কিংসলির "ওয়াটার বেবিজ্" পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, বেচারী টম্ তাহার দুষ্টামীর জন্য কিরূপে হঠাৎ সজারু হইয়া পড়িল! —সম্পাদক

ইহারা গাছেও উঠিতে পারে। সজারু গাছে উঠিতে পারে না বা দিবাভাগেও বাহির হয় না।

দার্জ্জিলিংএর ও দিকে ঘাস দিয়া তৈরী এক রকম ছোট 'স্যুটকেস্' দেখিতে পাওয়া যায়। স্যুটকেস্-গুলি দেখিতে খুব সুন্দর। উহা বিক্রয়ও হয় যথেষ্ট। করাচী ও সিংহল প্রভৃতি অঞ্চলে সজারুর কাঁটা দিয়া তৈরী এক রকম 'স্যুটকেস্' দেখা যায়। জিনিষগুলি বেশ মজবুত এবং দেখিতেও সুশ্রী। বাংলা দেশেও সজারুর অভাব নাই—অথচ বাংলায় এরূপ স্যুটকেস্ তৈরী না হইবার কারণ—আমাদের শিল্প-প্রচেষ্টার অভাব।

ব্রেজিলের গাছে-চড়া সজারু শ্রেণীর কাঁটা-যুক্ত প্রাণী

কবিকিশোর

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী, এম্ এ

খেয়া ঘাটের হোটেল আর ইস্কুল

'সাহিত্য' পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের লেখা-ই (কবিতা) বেশী দেখেছি। তাঁ'র কবিতা, যত দূর মনে পড়ে, আমার প্রথম থেকেই ভালো লাগ্‌ত। কঠিন শব্দ ছিল সে সব কবিতাতে, কিন্তু তা' থাক্‌লেও হয়ত একটা অর্থবোধ আমার হ'ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অক্ষয়কুমারের কোনো কবিতার একটি চরণ মনে পড়ে—'আতুর

বনজ-গন্ধে বায়ু ওতঃপ্রোত।' বাতাসে ভেসে বেড়ায় বনের গাছ-গাছড়ার গন্ধ বা বাতাসে বনের গাছ-পালার, তাঁদের ফুলের, তাঁদের পাতার একটি স্নিগ্ধ গন্ধ আসে বা ভেসে বেড়ায়—এই অর্থটি তখনই আমার কাছে স্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। ভালো লাগ্‌ত তাঁ'র কবিতা এবং এখনো ভালো লাগে। কিন্তু এখনকার কথা বল্‌বার জন্যে এ কাহিনী বা শৈশব-কৈশোর-কথা নয়। আজ অনেকখানি পথ জীবনে আগিয়ে এসে সেই স্ফুটনোন্মুখ কিশোর কবিকে আমি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি। এ-ও এক রকমের মানস-ভ্রমণ।

গ্রাম ছেড়ে ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'তে নবদ্বীপে চল্‌লাম। বাবা, আমি, পিসিমা আর আমার এক ছোট বোন। ছোট বোন যে কেন সঙ্গে চল্‌ল, তা বুঝ্‌তে পারি নি। হয়ত সে পিসিমার খুব অনুগত ছিল, কিংবা পিসিমা তা'কে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌তেন না,—এমনি একটা কিছু হ'বে। যে কোনো কারণেই হোক, নবদ্বীপ ইস্কুলে আমার ভর্ত্তি হওয়া হ'ল না। বোধ হয়, সেখানকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ মত পড়াশুনো আমার হয় নি। সেখান থেকে নৌকো ক'রে গঙ্গা দিয়ে জলাঙ্গী দিয়ে একেবারে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের খেয়া ঘাটে এসে আমাদের নৌকো বাঁধা হ'ল। নদীর কথা—তখন যেমন দেখেছিলাম নদীকে কিছুই এখন আর তেমন মনে পড়ে না। সমস্ত মন যুড়ে ছিল ইস্কুলের ভয়। সেখানকার কড়া শাসনের বিভীষিকা। যাই হোক্, নৌকো থেকে ত' নামা হ'ল। বাবা কোথায় থাকা হবে কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌লেন না। শেষটায় ঠিক হ'ল জলাঙ্গীর ধারের এক হোটেলে থাকা হ'বে। কাজেই বেশী দূর আর যেতে হ'ল না। কাছেই হোটেল। সেখানে গিয়ে আমরা উঠ্‌লাম। তখন রাত হ'য়ে গিয়েছে। সে রাতে বাবা ঠোঙায় ক'রে খাবার নিয়ে এলেন দোকান থেকে। তাই খেয়ে আমরা সে রাত কাটালাম সেই হোটেলে। পর দিন সকালে বাবা বাজার ক'রে নিয়ে এলেন—হাঁড়ি, কাঠ, তরীতরকারী, মাছ প্রভৃতি। পিসিমা সকাল সকাল জলাঙ্গী বা খ'ড়ে নদী থেকে স্নান ক'রে এলেন। আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। খেয়া ঘাটের কাছে নদীর পার অত্যন্ত উঁচু। একেবারে খাড়া হ'য়ে জল পর্য্যন্ত চ'লে গেছে নদীর পার। পারের মাটি কেটে কেটে লোকে সিঁড়ি তৈরী করেছে। সেই পারের উপর

রাস্তার পাশে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। পিসিমা নেমে গেলেন নদীতে, তার পরে স্নান ক'রে উপরে উঠে এলেন। এই সময়টুকু আমরা সভয় বিস্ময়ে সেই অত্যন্ত উঁচু পারের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম।

...তার পরে, খুব তাড়াতাড়ি পিসিমা রান্না করলেন—মাছের ঝোল আর ভাত। কলাপাতা পেড়ে তাড়াতাড়ি তাই খেয়ে নিয়ে বাবার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে গেলায় ইস্কুল। ভয় ছিলই মনে বরাবর। বাবা গাড়ীতে চুপি চুপি বললেন, 'যদি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করে, What is your name ?—তুই কি উত্তর দিবি ?' বাবার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। বাবা বললেন, 'তবেই ত তুমি খেয়েছ। বলবে 'My name is—'

যাই হোক্, ইস্কুলে আমার ভর্ত্তি হওয়া পর্ব্ব শেষ হ'ল। অসংখ্য ছেলে। প্রকাণ্ড বাড়ী। ঘণ্টা পড়ছে। আর এমন একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য। ভয় বেড়ে গেল। অনেক মাষ্টার মশায়, কেরাণী, চাপ্‌কান, কোট-প্যান্ট—প্রভৃতিতে ভয় না এসে যায় না। ইস্কুলের বাইরে অনেকটা জমি—একটা চমৎকার বাগান, আম, লিচু ও কাঁঠালের। সবুজ ঘাস। সম্মুখের দিকে পাঁচীল দিয়ে ঘেরা একটা গোল জমিতে নানা রকম ফুলের গাছ—কেয়ারি চারা। সেই দিকে রইলাম তাকিয়ে।... কেউই আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। ইস্কুলের নীচেকার ক্লাসে ভর্ত্তি হ'য়ে গেলাম। তার পরে বইএর লিষ্ট নিয়ে ছুটি। দোকানে দোকানে ঘুরে বই কিনতে হ'ল। সহরের খোয়া-ওঠা রাস্তায় রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'লাম খুব।

তার পরে নতুন বই নিয়ে ফিরে এলাম সেই নদীর ধারের হোটেলে। তখন বিকেলের রোদ প'ড়ে এসেছে। কিছু পরে আমাদের একজন আত্মীয় এলেন। বাবা তাঁর সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। হোটেলের বাইরে চৌমাথায় একটা বড় কদম গাছের নীচে কি যেন ঠাকুর আছে—আমি আর আমার ছোট বোন তাই দেখ্‌ছি। বাবা তাঁ'র সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বললেন, বুঝলাম না বা শুনলাম না। তিনি আগিয়ে এসে আমার একটি হাত ধ'রে বললেন, 'এস খোকা, তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে।'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্‌লাম না। কিন্তু আমাকে আর বেশী বুঝ্‌বার অবসর

না দিয়ে বাবা একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে নিয়ে এলেন। খানিকক্ষণ পরে পিসিমা আর আমার ছোট বোন আমাকে না নিয়ে যখন গাড়ীতে উঠ্‌ল, তখন আমি অবাক্ হ'য়ে তাঁ'দের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এরা আমাকে ফেলে চল্‌ল কোথায় ?

গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে। পাণ্ডুর বিকেলের রোদ এসে পড়েছে সমস্ত রাস্তাটা যুড়ে। ঘোড়ার গাড়ী চ'লে গেল। আমি সেই কদমতলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। চেয়ে দেখ্‌লাম, পিসিমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্‌ছেন। বাবা মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছেন। আর আমার ছোট বোনটা গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বা'র ক'রে দিয়ে 'দাদা, দাদা' ব'লে চেঁচাচ্ছে। চোখটা ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল। এমন স্তম্ভিত অবস্থা হ'ল আমার। মনে হ'ল সম্মুখ নাই, পশ্চাৎ নাই—একটা আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে একেবারে একলাটি দাঁড়িয়ে আছি। নতুন বইগুলো বুকের উপরে নিয়ে পাশের আত্মীয়টির সঙ্গে সঙ্গে গোয়াড়ীর খোয়া-ওঠা রাস্তায় ঠোক্কর খেতে খেতে চল্‌তে লাগ্‌লাম।

তখন বুঝ্‌লাম, আমাকে হয়ত এখানে একলাই থাক্‌তে হ'বে।

গত মাসের সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন মাঘ সংখ্যার ৬১ পৃষ্ঠায় দেখ।]

(১) বিখ্যাত প্রাচীন গীর্জ্জা; লণ্ডনে।

(২) হানিম্যান্; বিখ্যাত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসক।

(৩) কাগজের একটি বিশেষ মাপ (২২½ ইঞ্চি × ১৭½ ইঞ্চি); অন্ধদের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী অক্ষর—লুই ব্রেল্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত; টেলিগ্রাফ্ পাঠাইবার জন্য সমুদ্রের তলায় পাতা তার (এই জন্য কেব্‌লের ভিতর দিয়া সংবাদ পাঠান'কেও কেব্‌ল্ করা বলে); ইংরাজীতে যেমন 'মিষ্টার', তেমনি ফরাসীতে পুরুষের নামের আগে ব্যবহৃত শব্দ; গুরু নানকের উপদেশ-সম্বলিত শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ।

মাটিং চকার

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি

বরষায় আজ ভাই, এসো, কোন কাজ নাই,
কোণ ঘেঁষে ব'সে করি জটলা খানিক—
মোহনবাগান খে'লে পেনালটি ক'টা পেলে,
গোল দিতে ঘোল খেলে কে পরামানিক ?
কালীঘাটে রাস্তায় আর কি রে বাস্ যায় ?
এক হাঁটু জলে নাকি নৌকা চলে ?
'উত্তরা'-সিনেমা'র উত্তরে দিলে মার
মাড়োয়ারী বারো জন গুণ্ডা-দলে।
শাল্‌খের ঘাটে শেষে হাওড়ার ব্রীজ্ মেশে,
পন্টুন্-পুলে হবে ডক্ তৈরি।
সাঁত্‌রিয়ে যেতে লেকে ডুব দিয়ে মরে কে কে ?
সুইমিং-ক্লাবে নেই শক্ত সিঁড়ি ?
চল্লিশ সালে নাকি ম্যাট্রিকে পাল ছাঁকি'
বা'র হ'ল তিন ভাগ থার্ড্ ডিভিশন্ ?
লেখাপড়া ঝক্‌মারি সিলেবাস্ রকমারি,
পাস করা দায় এ যে, দুরূহ ভীষণ !

কত আর পড়া যায়,—আছি মন-মরা, হায়,
সাত দিন বাকী আর একজামিনের—
এক গাদা বই খুঁড়ে ঘাম ঝরে বুক যুড়ে—
এ যে কাজ হাড়-ভাঙা কুলি-কামিনের।
যত ভাবি ভুলে যাই, বই ফেলে তুলি হাই—
আজ শুধু খাসা দিন খোস্-গল্পের—
অমনি মগজ-মাঝে ভূগোলের ভেঁপু বাজে,
জ্যামিতির ভূত আনে চোখে জল ফের।
জটলাটা মাটি হয়,—দুনিয়াটা খাঁটি নয়,
ছাত্র-জীবন এ যে যন্ত্রণাময়—
টিউটর্ এলো বুঝি,—আর নয়! মাথা গুঁজি'
অঙ্ক কষিতে হবে—করিনু যা' ভয়।

[ভারতের বিস্মৃত যুগের একটি কাহিনী]

দুই

সেই চাঁদিনী রাতে আর একজন ঘোড়-সওয়ার মধ্যভারতের পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে আসছিল। দীর্ঘ পথ চলার পরিশ্রমে অশ্বের গতি ঢিলা হয়ে এসেছে, মুখে শাদা ফেনা জমেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। অশ্বারোহীর সারা দেহ ঘর্ম্মাক্ত, প্রতি নিঃশ্বাসে তার প্রশস্ত বুকখানি ধক্ ধক্ করে উঠছে ও পড়ছে। শুধু এগিয়ে যেতে হবে বলেই অশ্ব ও অশ্বারোহী এগিয়ে চলেছে

পথের সরু রেখা কোথায় হারিয়ে গেছে। চারিপাশে কালো কালো পাহাড় মেঘের মত আকাশের গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, চারিদিকের পথকে ওরা যেন আড়াল করে আছে দৈত্যের মত। শুধু পাথরের পর পাথর, আর মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত আগাছার ঝোপ-ঝাড়, আর অনুর্ব্বর, অসমতল, নীরস পাষাণী উপত্যকা।

কতক্ষণ পরে একটা টিলার উপর উঠে অশ্বারোহী সামনে তাকালো। সামনে, ডাইনে ও বামে যত দূর চোখ যায় একটু আলোর নিশানা চোখে পড়ে না, কোন দিকে মানুষের বসতি আছে কিনা বোঝা যায় না, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা চারিপাশে মৃত্যুর যবনিকা টেনে দিয়েছে। বাকী রাতটুকু তা হ'লে তাকে পথেই কাটাতে হবে। রাশ ছেড়ে দিয়ে অশ্বারোহী ঘোড়ার ঘাড়ে দু'টি চাপড় মেরে বল্‌লে—চল্ বেটা, যেদিকে তোর খুসি। আজ সারা রাত এই ভাবেই চল্‌তে হবে!

ঘোড়াটি কি বুঝলো কে জানে, টিলা থেকে নেমে এসে মন্থরগতিতে যেমন চলছিল তেমনই চল্‌লো।

ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে যেন চোখে পড়লো সামনের পাহাড়ের গা দিয়ে একটা কালো ছায়া ক্ষিপ্র-গতিতে নেমে আসছে। ছায়াটী তারই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে অশ্বারোহী থমকে দাঁড়ালো। এক হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে, আর এক হাতে তলোয়ারের হাতল চেপে ধরলো। প্রতীক্ষা করতে লাগলো ছায়াটিকে ভালো ক'রে ঠাহর করার জন্য।

ছায়াটী ক্রমশঃ এক অশ্বারোহীর রূপ নিলে। প্রথম অশ্বারোহী কম বিস্মিত হ'ল না, এ যেন তারই প্রতিচ্ছবি। তারই মত কালো ঘোড়ার পিঠে কালো বর্ম্ম-পরা এক সওয়ার। এত রাতে এই নির্জ্জন প্রান্তরে এমন একজনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা। যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রথম সওয়ার দ্বিতীয় অশ্বারোহীর কাছে-আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

দ্বিতীয় সওয়ার তড়িৎ-গতিতে সামনে এসে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলে— কে যায়?

—পথিক।

—কোথা থেকে আসছ?

—উজ্জয়িনী।

—হিন্দু না হূন?

—আমি ভারতীয়।

—হিন্দু, জৈন, না সদ্ধর্ম্মী?

—কোন ধর্ম্মই আমি মানি না।

—কোথায় যাবে?

—যেদিকে দু'চোখ যায়।

—আমি যদি বলি তুমি হূনদের গুপ্তচর?

—সে তোমার ইচ্ছা।

—হূন গুপ্তচর হিসাবে আমি তোমায় বন্দী করলাম।

প্রথম অশ্বারোহী এবার হেসে উঠলো, বল্‌লে, উত্তর ভারতের সমগ্র হূন-বাহিনী আমায় বন্দী করতে পারলো না আর তুমি একা আমায় বন্দী করবে? তোমার স্পর্দ্ধার আমি প্রশংসা করি, আর্য্য!

—বেশ, পরীক্ষা করেই দেখ।

দ্বিতীয় অশ্বারোহী তরবারি কোষ-মুক্ত করলো।

প্রথম অশ্বারোহী প্রস্তুত ছিল, বল্‌লে—আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবে না বন্ধু!

তথাপি দ্বিতীয় অশ্বারোহী প্রথম অশ্বারোহীকে আক্রমণ করলো। প্রথম অশ্বারোহী সে আঘাত প্রতিরোধ করলো। অসিতে অসি কিচ্ কিচ্ করে উঠলো, ছিটকে বেরুলো বিদ্যুতের স্ফুরণ।

ঝন্ ঝন্ ঝনাঝন্ ঝচ্—অসিতে অসি বাধিয়ে দ্বিতীয় অশ্বারোহী একটা ঝোঁক দিলে, কিন্তু প্রথম অশ্বারোহী তাতে বিশেষ বিচলিত হ'ল না। দ্বিতীয় অশ্বারোহী সহসা কয়েক পদ পিছিয়ে গেল, তার দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য; প্রথম অশ্বারোহী চকিতে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিলে। দ্বিতীয় অশ্বারোহী কিন্তু আর আক্রমণ করলো না, অসি কোষবদ্ধ করতে করতে বল্‌লে—আমি তোমার সঙ্গে অসিযুদ্ধ করবো না যুবক, তুমি যেতে পার।

যুবকের মুখে এবার বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল, বল্‌লে, কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি কি বন্ধু?

—কালো সওয়ার কারুষ * রাজকুমারের দেহে অস্ত্রাঘাত করবে না!

প্রথম অশ্বারোহী চম্‌কে উঠলো, তার পরেই প্রতিবাদ তুললো, বল্‌লে, তুমি কী প্রলাপ বক্‌ছ আর্য্য? তোমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে!

—হাহাহাহাঃ—কালো সওয়ার অট্টহাসিতে চারিপাশে প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে বল্‌লে,—বাক্য দিয়ে দৃষ্টিকে ভ্রান্ত করা যায় না রাজকুমার—বিশেষতঃ পরিচিতের দৃষ্টিকে।

রাজকুমার এবার আর কিছু বল্‌লো না।

* প্রাচীন ভারতের একটি বিশিষ্ট জাতি। মালবের ও বিহারের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে এঁদের বসতি ছিল, রাজধানী ছিল 'রেওয়া'।

কালো সওয়ার বল্‌লে—এত রাত্রে একাকী এই শত্রু-সঙ্কুল প্রান্তর অতিক্রম করছ, তোমার দুঃসাহসের প্রশংসা করি রাজকুমার। এত রাত্রে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—তার উত্তর তো তোমাকে পূর্ব্বেই দিয়েছি।

—আমি যদি বলি সেটা তোমার সত্য কথা নয়?

—সে তোমার ইচ্ছা।

—বেশ, আমি তোমাকে আশ্রয় দেব, এসো।

রাজকুমার কিন্তু কালো সওয়ারের সঙ্গী হবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলো না।

উপহাস করে কালো সওয়ার বল্‌লে—ওঃ, আমার সঙ্গে আসতে ভয় করছে?

—ভয় নয়, সন্দেহ।

—বেশ। তা হ'লে আমার সঙ্গে আসার দরকার নেই। এই পথ ধরে বরাবর চলে যাও, সামনের ওই পাহাড়টার ওপাশে জনপদ পাবে। পল্লীতে প্রবেশ করে, সপ্তম গৃহটি রাজবৈদ্য বিষ্ণুবর্দ্ধনের আবাস, সেখানে আশ্রয় চাইলে আশ্রয় পাবে। আর যদি আশ্রয় না দিতে চায় তো বল্‌বে কালো ঘোড়ার সওয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে। তা হ'লে আর তারা দ্বিরুক্তি করবে না।

—কালো ঘোড়ার সওয়ার তো আমিও!

—তা দেখতে পাচ্ছি। তবে তোমায় আর আমায় একটু পার্থক্য আছে, সেটা শুধু ঘোড়ার রঙেই নয়, তার চেয়ে বেশী কিছু। যাক্, কথায় কথায় অনেক সময় গেল, রাতও গভীর হয়ে আসছে, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না রাজকুমার, নমস্তে।

—নমস্তে।

কালো সওয়ার ঘোড়ার মুখ ফেরালো, তার পর তার ঘোড়া ছুটলো ধূসর পাহাড়ী পথে ধূলোর মেঘ উড়িয়ে।

রাজকুমার কতক্ষণ তাকিয়ে রইল সেইদিকে, তার পর নির্দ্দেশ-করা পথে অগ্রসর হ'ল।

প্রায় যোজন খানেক পথ হবে। পরিশ্রান্ত অশ্বারোহীর পক্ষে সে-পথ বড় কম নয়।

পল্লীতে যখন রাজকুমার এসে পৌঁছালো ঘুমন্ত গৃহগুলি তখন মৃত্যুর মত নীরব। সেই স্তব্ধতার মাঝে শুধু তার ঘোড়ার পদধ্বনিই বার বার শব্দিত হচ্ছে—খট্ খট্ খটাখট্!

একে একে ছ'খানি বাড়ী পার হ'য়ে রাজকুমার সপ্তম গৃহের সামনে এসে দাঁড়ালো। কালো সওয়ারের নির্দ্দেশ মানা উচিত কি না, তার মনে দ্বিধা জাগলো। বারেক ইতস্ততঃ করলো, তার পর ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় করাঘাত করলো। প্রথম বারে সাড়া পাওয়া গেল না, দ্বিতীয় বারে উত্তর এলো—কে?

—দরজা খুলে একবার বাইরে আসবেন কি?

মাথার উপর একটি জানালা খোলার শব্দ হ'ল, এক ঝিলিক স্তিমিত আলো এসে পড়লো বাইরে। তার পর প্রশ্ন হ'ল—কে? এদিকে আসুন।

রাজকুমার জানালার সামনে সরে গেল, বল্‌লে—এইটাই কি রাজবৈদ্য বিষ্ণুবর্দ্ধনের বাড়ী?

—হ্যাঁ, আমিই বিষ্ণুবর্দ্ধন, আপনার কি প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—আমি আজ রাত্রির জন্য আপনার কাছে আশ্রয়প্রার্থী।

—এত রাত্রে আশ্রয়প্রার্থী?—সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাজকুমারের মুখের উপর রেখে বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—মহাশয় কোথা থেকে আসছেন জানতে পারি কি?

—আসছি বহু দূর থেকে। রাত্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম উপত্যকায়, কালো-ঘোড়ার সওয়ারের সঙ্গে দেখা, তিনিই আমাকে আপনার গৃহের নির্দ্দেশ দিয়ে এখানে পাঠালেন, বলে দিলেন আজ রাত্রের মত আপনার কাছে আশ্রয় মিলবে।

—কালো ঘোড়ার সওয়ার পাঠিয়েছে? বিষ্ণুবর্দ্ধনের কপালে চিন্তার রেখা পড়লো, বল্‌লে—আচ্ছা, ভিতরে আসুন।

পরক্ষণেই দরজা খোলার শব্দ হ'ল, রাজকুমার ঘোড়ার রাশ ধরে ভিতরে প্রবেশ করলো।

পরদিন সকালেই রাজকুমারের চলে যাবার কথা, কিন্তু বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—তোমার যখন বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই, তখন যাবার জন্য এত ব্যস্ততার কি আছে আর্য্য? কদ্দূর থেকে আসছ, দু'-দশ দিন থেকেই যাও, দেখে যাও হূনেরা আমাদের কি সুখে রেখেছে!

আশ্রয়দাতার অনুরোধ রাজকুমার উপেক্ষা করতে পারে না, তাকে থেকে যেতে হ'ল।

কথায় কথায় বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজকুমারকে নিয়ে বাহির হ'য়ে পড়ে।

উপত্যকায় তখনও প্রভাতী অরুণের আলো এসে পৌঁছায় নি। নগরীর বুকে সবে মাত্র কাজের সাড়া পড়েছে। দু'জনে পাশাপাশি চলতে চলতে আলাপ জমে।

রাজকুমার পরিচয় দেয়: তার নাম ধর্ম্মদেব। উজ্জয়িনীতে তাদের বাস। হূনের অকথ্য অত্যাচার অসহনীয় হওয়াতে সে গৃহত্যাগী হয়েছে।

বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—তোমাকে শক্তিমান্ বলে মনে হয়, বয়সও তোমার অল্প, পলাতক হিসাবে তোমাকে মোটেই মানায় না ভাই।

ধর্ম্মদেব সে কথার কোন জবাব দিলে না, একটা কালো ছায়া নেমে এল তার মুখের উপর।

কতক্ষণ দু'জনের মধ্যে আর কোন কথাই হ'ল না। পাশাপাশি দু'টি ঘোড়া এগিয়ে চল্‌লো মন্থর পদক্ষেপে।

জনপদ শেষে তারা শ্যামল উপত্যকায় এসে পড়লো। ওদিক্ দিয়ে ব্রাহ্মণের উপবীতের মত একটি সংকীর্ণ গিরিনদী নেমে গেছে। তার বালির রেখা মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরগুলির আড়াল থেকে উঁকি মারছে দুষ্টু ছেলের মত। পাহাড়ের আড়াল থেকে ইতস্ততঃ সূর্য্য-কিরণ এসে পড়েছে তির্য্যক্ গতিতে। বিক্ষিপ্ত ক্ষেতগুলির বুকে রবিশস্য সেই আলোর ছোঁয়া লেগে হেসে উঠেছে। ভোরের হাওয়ায় শীষ্‌গুলি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মানুষগুলোকে ডাকে, বলে—শোনো, শোনো। ভারী সুন্দর দেখায় চারিপাশ; তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে, ভালো লাগে এই সৌন্দর্য্যের মাঝে নিজেকে উপলব্ধি করতে। এখন কথা বলার চেয়ে স্তব্ধতাই বেশী উপভোগ্য, বাহিরে প্রকাশ করার চেয়ে নিজেকে অন্তরে গুটিয়ে নেওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয়।

দু'জনেই নির্ব্বাক্, সুদূরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কি যেন ভাব্‌ছে।

কোন এক সময় পিছনে পদশব্দ শোনা গেল, দেখা গেল অশ্বতরের পিঠে দু'টি লোক ছুটে আসছে।

কাছে এসে তারা বল্‌লে—বৈদ্যজী, আপনাকে এখনই একবার যেতে হ'বে আমাদের গ্রামে। কাল রাতে রেওয়ানার লোক আমাদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, ক'টি ছেলেমেয়ে তাতে ভীষণ ভাবে আহত হয়েছে, আপনাকে একবার গিয়ে দেখতে হবে—

—কোথায় তোমাদের গ্রাম?—বিষ্ণুবর্দ্ধন জিজ্ঞেস করলে।

সামনে একটা পাহাড় দেখিয়ে তারা বল্‌লে—ওই যে পাহাড়টি দেখছেন ওরই ওপাশে। এখান থেকে এক যোজন পথ হবে। আপনি একবার দয়া করে চলুন।

ক' লহমা কি ভেবে নিয়ে বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—বেশ, চলো—

চল্‌তে চল্‌তে তারা অনর্গল কথা বলে চল্‌লো,—অন্যায় তারা কিছুই করে নি, বছরের প্রথমেই তারা রাজকর হিসাবে অর্দ্ধেক ফসল রেওয়ানার ঘরে তুলে দিয়ে এসেছে। আবার তারা এখন বল্‌ছে 'রাজকর দাও'। তাই নিয়েই যত গোলযোগ। শেষে কাল রাত্রে ওরা এসে গাঁ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

—তোমাদের বউ-ছেলে পুড়ে মরলো আর তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলে?

—আজ্ঞে, হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজা-মহারাজারা যাদের সঙ্গে যুঝতে পারলো না, আমরা গরীব চাষা, তাদের কি করতে পারি বলুন?

—ওইখানেই তো তোমাদের ভুল। তোমরাই তো সব, তোমাদের নিয়েই তো দেশ। রাজা-মহারাজা ক'জন, আর তাদের সৈন্যই বা কত! তোমরা সবাই যদি একসঙ্গে অস্ত্র ধর, তা হ'লে হিন্দুস্থানে আর একজনও হূন বেঁচে থাকবে না। কিন্তু তোমাদের ওই ভীরুতাই নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে, তা জান?

—আজ্ঞে, কালো সওয়ার তো বার বার আমাদের সেই কথাই বলেন।

—ওই কালো ঘোড়ার সওয়ার, ভেবে দেখো দেখি ও একা তোমাদের জন্য কি না করছে! আজ যদি হূনেরা ওকে ধরতে পারে, জীবন্ত ওর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে, তা জান? সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে ওকে ধরে দেবার জন্য, তবু সে পিছ্-পা হয় নি। আর তোমরা?

—আজ্ঞে কালও তিনি এসেছিলেন, একেবারে ঠিক সময়টাতে। হূনেরা এসে সবে মাত্র তিনচারখানি ঘরে আগুন লাগিয়েছে, এমন সময় পাহাড়ের মাথায় তাঁকে দেখা গেল। হূনেরা প্রথমে দু'-দশটা তীর ছুড়লে বটে কিন্তু তাঁর গায়ে লেগে সব ঠিক্‌রে পড়লো। তার পর তিনি এমন এক ধমক দিলেন যে বাছাধনরা সুড় সুড় করে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল। তিনি নিশ্চয় তন্ত্রমন্ত্র কিছু জানেন, না হ'লে এত দিনে কবে ধরা পড়ে যেতেন—সহস্র সুবর্ণ তো বড় কম নয়!

ধর্ম্মদেব এবার জিজ্ঞেস করলো—কাল রাত্রে ওই লোকটির সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছিল, না?

—হ্যাঁ।

—ওকে আপনারা জানেন?

—ওকে কেউই চেনে না, চেনে ওর কালো ঘোড়া আর কালো লোহার বর্ম্ম। যখন যেখানে অত্যাচার ভয়াবহ হয়ে ওঠে তখনই সেখানে তাকে দেখা যায়। এই অঞ্চলের হূনেরা ওর নাম শুনলে ভয় পায়।

—এখনও তা হ'লে মধ্যভারতে একজন মানুষের মত মানুষ বেঁচে আছে!

বিষ্ণুবর্দ্ধন মৃদু হাসলো। পথ এবার আগের চেয়ে অনেক সুগম বোধ হওয়ায় বল্‌লে—একটু জোরে চল, ফিরে এসে আমাকে আবার হূন সর্দ্দারের কাছে একবার যেতে হবে।

সব ক'টি ঘোড়া এবার পিছনে ধূলো উড়িয়ে ছুটলো।

পাহাড়টা পাশ কাটাতেই নীচে গ্রামখানি দেখা গেল। তখনও কয়েকটি দগ্ধশেষ কুটীর থেকে ধোঁয়া উঠছে।

বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—এখনও জ্বলছে! তোমরা ঘরগুলোকে ভেঙে দিলেও তো আগুন নিভে যেত।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই আমরা করেছি, না হ'লে তো সারা গ্রামখানিই পুড়ে যেত।

সহসা গ্রামের দিক্ থেকে একটা সোরগোল ভেসে এল। তাড়াতাড়ি ওদিকে যেতেই দেখা গেল, কয়েকজন হূন ঘোড়-সওয়ার একদল গ্রামবাসীকে ঘিরে ধরেছে। তাদেরই একজন ঘোড়া থেকে নেমে, পনেরো ষোল বছরের একটি কিষাণ ছেলেকে বেত্রাঘাত করতে ব্যস্ত। ছেলেটি চীৎকার করছে আর চাষীদের জনতা বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার চারি পাশে। উপেক্ষাভরে সেদিক্ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বিষ্ণুবর্দ্ধন চাষী-সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের রোগী কি ওদিকে না এদিকে?

—আজ্ঞে, এদিকে।

—বেশ, চল। বিষ্ণুবর্দ্ধন ঘোড়ার মুখ ফেরালো।

ওদিকে ধর্ম্মদেব অন্যমনস্কের মত সেই হূনদের দিকেই চলেছে দেখে বিষ্ণুবর্দ্ধন ডাকলে, বল্‌লে—ওদিকে যেও না, আর্য্য, বিপদের সম্ভাবনা আছে।

ধর্ম্মদেব বল্‌লে—আমাদের চোখের উপর…

বিষ্ণুবর্দ্ধন হেসে উঠলো, বল্‌লে—ও তো সামান্য ঘটনা, ওর শতগুণ অত্যাচার চলছে সমগ্র উত্তরাপথে, তুমি আমি তার কতটুকু প্রতিবিধান করতে পেরেছি?

—এত দিন পারি নি কিন্তু আজ পারবো।

—কিন্তু তুমি একা…

—হাতে হাতিয়ার থাকলে একজন ক্ষত্রিয় একশ' হূনের সমান,—বলে ধর্ম্মদেব ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো, তরতর করে ঘোড়া ছুটে চল্‌লো হূনদলটীর দিকে। (ক্রমশঃ)

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২

একদিন অপরাহ্ণে হরি খাটিয়ায় বসিয়া জাল বুনিতেছে আর গাহিতেছে—

"নেচে নেচে আয় মা শ্যামা,
আমি মা, তোর সঙ্গে যাবো।"

পশ্চিমে রাঙা রবি অস্ত যাইতেছে, অজয়ের জল সে কিরণে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হঠাৎ হরির স্ত্রী গোলাপী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো, দেখ দেখ, ঘোড়া লোকটাকে মেরে ফেল্‌লে!"

হরি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিল একটা খুব বড় তেজী ঘোড়া ছুটিয়াছে আর তার পিছনে একটা লম্বা দড়ায় একটা হাত-বাঁধা মানুষকে সে হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। মানুষটা হয়ত মরিয়াছে, নয় ২০।২৫ হাত গেলেই মরিবে। হরি বিদ্যুৎ-বেগে অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ঘোড়ার মুখ ধরিল, দুর্দ্ধর্ষ ঘোড়া রুখিয়া পা তুলিয়া হরিকে আক্রমণের চেষ্টা করিল কিন্তু প্রচণ্ড দুই ঘুষিতে হরি তাহাকে শান্ত করিল। অশথের একটা শাখায় ঘোড়াটা বাঁধিয়া হরি লোকটাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া আনিয়া নিজের খাটিয়ায় শোয়াইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পর আহত ব্যক্তি সংজ্ঞা লাভ করিল। তখন হরির বাড়ী লোকে ভরিয়া গিয়াছে। লোকটী মঙ্গলকোটের জমিদার কাজি সাহেবের প্রিয় সহিস, বে-কায়দায় এমন নিদারুণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। তাহার পিছু পিছু বহু বরকন্দাজ, পাইক ও লোকজন ছুটিয়াছিল, কেহই রক্ষা করিতে পারে নাই। হরির বীরত্বে সবাই মুগ্ধ। অর্দ্ধমৃত সহিসটী চক্ষের জলে হরিকে প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। ডুলি করিয়া সকলে তাহাকে মঙ্গলকোটে লইয়া গেল। কাজি সাহেব তাহাকে জীবিত দেখিয়া উল্লসিত হইলেন এবং হরিকে একটী মূল্যবান্ সোনার তাগা উপহার দিলেন। হরির প্রশংসায় গ্রাম ভিন্‌গ্রাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল। হরি বন্যায় বহু লোককে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, সে সন্তরণে অসাধারণ পটু, বুকে দুর্জ্জয় সাহস, বাহুতে অপরিসীম বল। একবার একটা কুমীরের মুখে বাঁশের মুড়া গুঁজিয়া দিয়া সে একজন নৌকারোহীকে রক্ষা করে। এখন হইতে সম্ভব-অসম্ভব অনেক বীরত্বের কথা তাহার উপর আরোপিত হইতে লাগিল।

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে দেশে একটা বৃহৎ ব্যাপার ঘটিয়াছে। শালোণ্ডায় রায়েদের বাড়ী এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। যে বাড়ী ভরতপুরের গড়ের মত দুর্ভেদ্য ছিল সেখানে ডাকাতি একটা অসম্ভব ব্যাপার। আবার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় ডাকাতেরা কিছুই লইয়া যায় নাই। যাইতে পারে নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। সত্যই তাহারা সমস্ত বাক্স পেটরা ও অর্থাদি অঙ্গনে নামাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, লয় নাই। এই ব্যাপারটী ঐ ডাকাতি অপেক্ষাও রহস্যজনক। গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী শুধু ঐ ডাকাতির কথা, আর রায়েদের জোর বরাতের কথা। এমন কি ডাকাতেরা ঘৃতের মশাল জ্বালিয়া রাখিয়া জবা ফুল ও বিল্বপত্র দিয়া গিয়াছে। উহা বড়ই শুভচিহ্ন। উহাতে নাকি গৃহস্থের ভাবী সৌভাগ্যের সূচনা করে।

জাহানাবাদে নীলকর সাহেবদের কুঠি আছে। তাঁহারাও এ ডাকাতিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন এবং কোম্পানিকে জরুরী তদন্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। চারিদিকেই ডামাডোল পড়িয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

২

ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইল। সহসা সেই ভীষণ ঝড়, জল ও সমুদ্রের ঢেউএর শব্দ ছাপাইয়া আর একটি তীক্ষ্ণতর শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"জাহাজের সামনের মাস্তুল ভেঙ্গে পড়্ল।"

বুনো তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"মাস্তুল ভাঙ্গে নি, মাস্তুলের বড় পালটা ফেঁসে গেল।"

সঙ্গে সঙ্গে সুশান্তর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"অশোক, তুমি হাল ধরে থাকো; আর বুনো, রঞ্জিৎ, তোমরা শীঘ্র আমার সঙ্গে এস, জাহাজ এখনি বান্‌চাল হবে। দেখো, অন্ধকারে ঢেউএ ভেসে যেও না; চেপে ধরে এস।"

সুশান্ত তার বাপ-মায়ের সঙ্গে আরও কয়েকবার সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে। খুব বুদ্ধিমান্ ও প্রিয়দর্শন ছেলে এই সুশান্ত। দেখিতে যেমন সে সুশ্রী, চোখের চাহনি তেমন তার বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল, শারীরিক গঠনেও তেমনি সে সবল ও সুপুষ্ট। আর বুনো ত' ম্যাওরিদের ছেলে। সেও নৌকা চালনায় খুবই ওস্তাদ্। এই সুশান্ত ও বুনো ব্যতীত আর সকলেই সমুদ্র সম্বন্ধে অজ্ঞ। ভরসা যা ইহাদেরই উপর। সুশান্ত ও বুনো কুড়াল হস্তে ভাঙা মাস্তুলটাকে কাটিয়া নামাইয়া ফেলিল। অন্ধকারের মাঝেই পালগুলি ও লোহার তারগুলি একদিকে সরাইয়া রাখিল। দুইটা বড় মাস্তুলই কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এখন যা রহিল তা নিতান্ত ছোট। তাহাতেই কোনরকমে পাল খাটাইয়া তাহারা জাহাজের গতি ঠিক রাখিবার চেষ্টা করিল।

যাই হোক্, সেই ভাঙা মস্তুল ও ছেঁড়া পাল লইয়া জাহাজখানা ঝড়ের মুখে তীরের মত, টর্পেডোর মত পূর্ব্বদিকে ছুটিয়া চলিল। সেই দ্রুতবেগের যেন আর শেষ নাই। ভালো; জাহাজখানা এখন যত জোরে ছোটে ততই ভালো। এমন করিয়া ছুটিয়া যদি জাহাজখানা কোন দ্বীপের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও তাহারা বাঁচিয়া যায়!

স্কুনারটি খুব মজবুৎ ভাবে তৈরী ছিল, তাই রক্ষা। সাধারণ স্কুনার অপেক্ষা ইহা ঢের বেশী মজবুৎ। ভালো কাঠ ও ভালো যন্ত্রপাতি দিয়া ইহা নির্ম্মিত। তাই অত বড় বড় ঢেউ খাইয়াও তখনো পর্য্যন্ত সেটা টিকিয়াছিল।

রাত্রির অন্ধকার তখনো কিছুমাত্র কমে নাই। আকাশে মেঘের পর মেঘ আসিয়া জমিতেছিল। ঝড়ের বেগ যেন ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে পেট্রেল, সী-গাল্ প্রভৃতি সামুদ্রিক পাখীর তীক্ষ্ণ আর্ত্তস্বরও শুনা যাইতেছে। পাখীর ডাক যখন শুনা যাইতেছে তখন ডাঙ্গা কি নিকটেই আছে? না, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে। কারণ এই পেট্রেল পাখীকে ডাঙ্গা হইতে শত শত মাইল দূরের সমুদ্রবক্ষে দেখা যায়।

এই সময় আবার একটা জোরে শব্দ হইল; বাকি পালগুলাও ফাটিয়া গিয়াছে। পালের টুকরাগুলি পায়রার মত আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে!

রঞ্জিৎ কহিল—"যাক্, আর কোন পাল নেই; আর রক্ষাও নেই।"

সুশান্ত কহিল—"কোন ভয় নেই রঞ্জিৎ, ঝড়ের যেমন বেগ, সমুদ্রের যেমন স্রোত, তাতে আমাদের জাহাজ এখনো বেশ জোরে চল্‌বে। তবে, আগের মত জোরে নয় এই যা।"

এই সময় বুনো চীৎকার করিয়া তিনজনকে সাবধান করিয়া দিল—"সুশান্ত, রঞ্জিৎ, অশোক, খুব সাবধান, সামনে একটা রাক্ষস!"

বাস্তবিক সেটা রাক্ষস। অত বড় ঢেউ সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেই প্রকাণ্ড ঢেউ জাহাজের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। সকলেই শুইয়া পড়িয়া যে কোন একটা শক্ত জিনিষ ধরিয়া রহিল। ঢেউ চলিয়া গেলে দেখা গেল, জাহাজের বিনাকল যন্ত্র, ভাঙ্গা মাস্তুলের অংশ ও অন্যান্য কাষ্ঠদণ্ড সমস্তই ঢেউএর মুখে ভাসিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আর একটি জিনিষ অদৃশ্য হইয়াছে। সে বুনো। বুনোকে আর ডেকের উপর দেখা গেল না।

সুশান্ত তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"বুনো! বুনো!" রঞ্জিৎও লাফাইয়া উঠিল—"কোথায় গেল বুনো!" তিনজনে পাগলের মত চেঁচাইতে লাগিল। কিন্তু কোন দিক্ হইতে তাহার সাড়া পাওয়া গেল না।

সুশান্ত আকুল কণ্ঠে কহিল—"অশোক, যেমন ক'রে হোক্ ওকে বাঁচাতে হবে। শীঘ্র সমুদ্রে লাইফ বেল্ট ফেলে দাও। রঞ্জিৎ, সমুদ্রে লম্বা একটা দড়ি ফেলে দাও!" সকলে উত্তেজিত হইয়া ডাকিতে লাগিল—"বুনো! বুনো!"

এমন সময়ে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে এক্ করুণ শব্দ আসিল—"রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

সুশান্ত তখনই সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছিল। অশোক গিয়া তাহাকে আটকাইয়া বলিল—"কোথায় বুনো? ও শব্দ ত সমুদ্র থেকে আস্‌ছে না!" সুশান্ত কান পাতিয়া

শুনিবার চেষ্টা করিল। শুধু বুনোর গলার স্বর—"রক্ষা কর, রক্ষা কর!" ঝড়ের ও ঢেউএর যে রকম ভীষণ শব্দ, তাহাতে কোথা হইতে বুনো চেঁচাইতেছে তাহা সহজে বোঝা গেল না। আন্দাজে ভর করিয়া সুশান্ত অতি কষ্টে জাহাজের সম্মুখ পানে অগ্রসর হইল। ঢেউ খাইয়া খাইয়া ডেক্ ভীষণ পিছল হইয়াছে। তাহার উপর চারিদিকেই দড়ি ও লোহা-লক্কড় ছড়ানো। পদে পদে সুশান্ত হোঁচট্ খাইতে লাগিল।

শেষে দেখা গেল জাহাজের সামনের এক গলুইএর ভিতর বুনো আটকাইয়া রহিয়াছে। ঢেউএর মুখে সে নিশ্চয় সমুদ্রে গিয়া পড়িত যদি না দৈবক্রমে সে ঐ গলুইএর ভিতর গিয়া আটকাইত।

শুধু কি তাই? একটা প্রকাণ্ড পিপা সেই গলুইএর মধ্যে ঢুকিয়া বুনোকে চিপসিয়া ধরিয়াছে। তখন অতি কষ্টে সেই পিপা সরাইয়া তিনজনে মিলিয়া বুনোকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া গলুইএর ভিতর হইতে বাহির করিল। বুনোর তখন ভিজা কাকের মত চেহারা। কিন্তু পিছনে তখন বড় বড় ঢেউ আসিতেছিল, তাই সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া পুনরায় চাকা ধরিয়া বসিল।

তোমরা যাহারা গাণিতিক ভূগোল পড়িয়াছ, তাহারা নিশ্চয় জান যে দক্ষিণ ভূমণ্ডলের মার্চ্চ মাস উত্তর ভূমণ্ডলের সেপ্টেম্বার মাসের সমান। তখন রাত্রিগুলি দিনের চেয়ে ঢের ছোট। ভোর চারিটার সময়েই পূর্ব্বাচলে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিবে। ভোরের আলোয় হয়ত ঝড়-জল কমিতে পারে, হয়ত বা দূর দিক্‌চক্রবাল-রেখার অন্তরালে জমির আভাস দেখা যাইবে! ক্রমে চারিটা বাজিল, কিন্তু আলোর দেখাও নাই; ঝড় জলও এতটুকু কমে নাই। বেলা পাঁচটার সময় আকাশের দিক্-বলয় ঈষৎ ধূসরবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু আধ মাইলের বেশী দূরের জিনিষ তখনো চোখে দেখা যায় না—এমনি চাপ চাপ কুয়াশা চারিদিকে জমিয়া রহিয়াছে। ক্রমে বেলা যত বাড়িতে লাগিল, আলোর কনক রেখাও তত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চারিজনে বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির সেই ক্ষুব্ধ ধূসর মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ বুনো চীৎকার করিয়া উঠিল—"ডাঙ্গা! ডাঙ্গা! ঐ দেখ ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে!"

৩

বুনোর চীৎকারে তিনজনেই দূর দিগন্ত পানে চাহিয়া দেখিল। হাঁ, সত্যি, দূর পূর্ব্বাচলে ডাঙ্গার আভাসের মত কি যেন এক অপূর্ব্ব শ্যামলশ্রী দেখা যাইতেছে! কিন্তু আকাশে এত নিবিড় মেঘের মেলা যে তাহা সত্যি ডাঙ্গা না আকাশের মেঘ তাহা যথার্থ নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। সুশান্ত তখন দূরবীণ লইয়া ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, শেষে সেও স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল—"হাঁ, পূবদিকে সত্যিই ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে।"

পনেরো মিনিট পরে সেই শ্যামরেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। কে যেন তখন মন্ত্রবলে

সমুদ্রবক্ষ হইতে সেই ঘনীভূত কুয়াশাগুলিকে শূন্যে তুলিয়া লইতেছিল! জাহাজও ততক্ষণে পূর্ব্বদিকে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। তখন স্পষ্টই দেখা গেল, কিছুদূরে পূবদিকে এক অপূর্ব্ব শ্যামশ্রীময় স্থলভাগ দেখা যাইতেছে।

সুশান্ত পুনরায় বলিয়া উঠিল—"ডাঙ্গা! পূবদিকে বেশ সুন্দর ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে!" অশোক বলিল—"ডাঙ্গা, কোন সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু বড় নীচু জমি বলে মনে হচ্ছে।"

নীচুই হউক আর উঁচুই হউক, সেটা যে ডাঙ্গা, শ্যামল মৃত্তিকার অংশ, ইহাই তাহাদের যথেষ্ট। প্রায় ছয় মাইল দূরে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড তাহার অসীম বরাভয় ও নয়নাভিরাম রূপ মেলিয়া ছেলেগুলির পানে যেন সস্নেহ হাসিমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। জাহাজখানি যেমন ভাবে ছুটিতেছে তাহাতে মনে হয় আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সে সেই ডাঙ্গার উপর গিয়া পড়িবে। আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল সেই ভূখণ্ডের পশ্চাৎভাগে একটি অনুচ্চ পর্ব্বতমালা—প্রায় দুই শত ফুট উচ্চ। পর্ব্বতের সানুদেশেই বনরাজিশ্যাম সমতলভূমি। আর তাহারই কোলে চাপিয়া সুবিস্তৃত বালুময় বেলাভূমি। জাহাজও সোজা সেই বালুচরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখন ভগবানের কৃপায় দ্বীপের সম্মুখ ভাগে কোন 'কোরাল্-রীফ্' না থাকিলেই হয়।

সুশান্ত তখন অশোক, রঞ্জিৎ ও বুনোকে হাল ধরিতে বলিয়া জাহাজের সম্মুখের পাটাতনের উপর গিয়া দাঁড়াইল। সেই ডাঙ্গার চতুর্দ্দিকে চোখ ফেলিয়া সে এমন একটা নিরাপদ জায়গা দেখিতে পাইল না যেখানে জাহাজখানাকে ভিড়ানো যায়। সামনে নদী বা কোন নালার চিহ্ন নাই। নদীর বদলে যা আছে তা বড় ভয়ঙ্কর। সুবিস্তৃত বালুচরের এদিকে সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে এক দিগন্ত-প্রসারী প্রবাল পর্ব্বতশ্রেণী। সেই সব পাথরের মাঝে সমুদ্রজল যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে! সেই স্তূপীকৃত পাথরের উপর গিয়া পড়িলে আর দেখিতে হইবে না। জাহাজটা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে!

সকাল যখন ঠিক ছয়টা তখন জাহাজখানা প্রচণ্ড শব্দে সেই পর্ব্বতশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। কিন্তু জাহাজ ভাঙ্গিল না, সেই ভয়াবহ ঘূর্ণির মাঝে ঘুরিয়া হঠাৎ কেমন আট্‌কাইয়া গেল। যাক্, জাহাজ পাহাড়ের উপর আছাড় খায় নাই, তলাকার বালির মধ্যে আটকাইয়াছে। পিছন হইতে আর একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া জাহাজটাকে আরো কিছু তফাতে লইয়া গেল। সেখানেও নিবিড় পাথরের শ্রেণী। সেই ফুটন্ত জলে জাহাজখানা কাৎ হইয়া পড়িল। সামনের বালুচর মাত্র সিকি মাইল দূরে। এটুকু পথ এখন পার হইতে পারিলেই হয়!

৪

তখন কুয়াশা এক রকম কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঝড়ের বেগ ও সমুদ্রের ঢেউ তখনও কমে নাই।

কিছু দূরেই সেই অজ্ঞাত রহস্যময় ভূখণ্ড। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে সে যে কোন্ দ্বীপ বা কোন্ দেশ, তাহা কিছুই জানা নাই। সুশান্ত ও অশোক জাহাজের নীচেকার খোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। ঘণ্টা দু'য়েক পরে সুশান্ত কহিল—"আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই বোধ হয় ঝড় থেমে যাবে, সমুদ্রের ঢেউও কম্‌বে; সাগরে ভাঁটা এলে জলও কমে যাবে, তখন আমরা সামনের ডাঙ্গার দিকে যাবার চেষ্টা কর্‌ব।"

এ কথায় রঞ্জিৎ আপত্তি করিয়া বলিল—"আবার অপেক্ষার দরকার কি ?"

রঞ্জিতের কথায় সায় দিয়া উঠিল আর একটি ছেলে। নাম তাহার রোহিতাশ্ব, বছর বারো বয়স; সে বলিল—"ঠিক কথা, আবার অপেক্ষা করা কেন ? এখুনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্।"

রঞ্জিৎ ছেলেটি ছিল এক ধনকুবের সিন্ধী মহাজনের ছেলে। সুশান্ত বাঙালী। সকলে তাহাকে মানিয়া চলিলেও এই সিন্ধী ছেলেটি তাহাকে আমলের মধ্যেই আনিত না। সুশান্ত যাহা বলিবে তাহাতেই সে প্রতিবাদ করিবে। সে ভাবিত, কিসের সুশান্ত! টাকায়, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সে সুশান্তের চেয়ে ঢের বড়। ক'টা সাহেবের সঙ্গেই বা সুশান্ত মিশিয়াছে ? তাহার বাবা বোম্বাইএর একজন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার, এসোসিয়েসনের ডিরেক্টর। তাহাদের বাড়ীতে কত পার্টিতে কত সাহেব মেমের শুভাগমন হয়। আর সুশান্ত একজন সামান্য বাঙ্গালী—তার বাপ একজন সাধারণ ব্যারিষ্টার! রঞ্জিতের তিনজন অন্ধ অনুচর ছিল, তাহারা তাহার উৎকৃষ্ট সাহেবিয়ানার প্রাণপণ নকল করিয়া চলিত; তাহাদের নাম যথাক্রমে রোহিতাশ্ব, কুণাল ও কমলাক্ষ। জাহাজের এই চারিজন প্রাণী ছাড়া আর সকলেই সুশান্তর দলে।

সুশান্তের কথা অগ্রাহ্য করিয়া রঞ্জিৎ, রোহিতাশ্ব, কুণাল ও কমলাক্ষ জাহাজের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সিকি মাইল পথ শুনিতে, কিন্তু যে রকম প্রবল ঢেউ ও ঘূর্ণী, তাহার উপর নিবিড় প্রবাল শ্রেণী তাহাদের চোখে পড়িল তাহাতে উহার উপর দিয়া তখন নৌকা চালাইতে তাহাদের সাহস হইল না। কিন্তু মুখে তাহারা তাহা প্রকাশ করিল না। এমন ব্যস্ত ভাব দেখাইতে লাগিল যেন তাহারা তখনই যাত্রা করিবে।

সুশান্ত আর একবার নিষেধ করিতে রঞ্জিৎ একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিল। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে বলিল—"এত উপদেশ দেবার তুমি কে ? আমরা যা ভাল বুঝি তাই কর্‌ব।" মুখে বলিল বটে কিন্তু যাইবার লক্ষণ দেখা গেল না।

সামনের সেই স্থলভাগ দ্বীপ না মহাদেশ, তাহার কিছুই এখনও জানা যায় নাই। স্থলভাগের দুইদিক্ দুইটা অন্তরীপের মত প্রক্ষিপ্ত; তন্মধ্যে উত্তরভাগ উঁচু ও পর্ব্বতবহুল, দক্ষিণভাগ নীচু ও সমতল। সেই স্থলভাগ যদি বাস্তবিক কোন দ্বীপ হয় আর দ্বীপটা যদি একেবারে অনুর্ব্বর

ও মরুভূমির মত হয় তাহা হইলে তাহারা কি খাইয়া প্রাণধারণ করিবে ? দেশে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া ? আর যদি সেটা কোন মহাদেশের অংশ হয় তাহা হইলে অনেকটা নিরাপদ বটে। কিন্তু তাহা হইলেও মহাদেশের এমন কোন অংশ হইতে পারে যেখানে জন-মনুষ্যের বসতি নাই, আছে কেবল লক্ষ লক্ষ বন্যজন্তুর ভয়াবহ আবাসভূমি।

কিন্তু এ সব ত পরের কথা। এখন ডাঙ্গায় পৌঁছানো যায় কিরূপে ? সুশান্ত তখন দাঁড়াইয়া ডাঙ্গার দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল। ছোট ছোট পর্ব্বতমালার নীচে রহিয়াছে ছোট ছোট বন। তাহাতে নানা প্রকার ও নানা আকারের গাছ দেখা যাইতেছে। সামনেই সুবিস্তৃত বালুচর। কিছু দক্ষিণে একটা ছোট নদীর মোহানাও দেখা গেল। পাহাড়ের এ পাশটা নিতান্ত এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো; ও-পাশটা হয়ত বাসের উপযোগী, হয়ত বা উর্ব্বর জমিও মিলিতে পারে। সুশান্ত চারিদিকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও মানুষের বসতি দেখিতে পাইল না। একটা ছোট কুটীরও তাহার চোখে পড়িল না। (ক্রমশঃ)

অতিকায় মানব ওয়াডলো

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বছর কয়েক আগে জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোপা ষ্টেশনের কাছে কতকগুলি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখা গিয়াছিল। ছাপগুলি দেখিতে অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মত কিন্তু আকারে বিরাট্—এক-একটি দাগ ২২ ইঞ্চি লম্বা। ঐ পায়ের দাগ কয়েক মাস ধরিয়া লোকের মুখে এবং বিশেষ করিয়া খবর-কাগজ মহলে কম উত্তেজনা যোগায় নাই! অনেক গবেষণা হইয়াছে। অমন যার পায়ের ছাপ সে নিশ্চয়ই হয় 'কিং কং'এর মত কোন প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণী, নয় তো সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের কোন ভীমকায় রাক্ষস বা দানবের বংশধর।

যাই হোক্, সেই ২২ ইঞ্চি পায়ের মালিকের সন্ধান এ পর্য্যন্ত আর পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সম্প্রতি রবার্ট্ ওয়াডলো নামে আর একটি ছেলের কথা কাগজে বাহির হইয়াছে। এ ছেলেটি "কিং কং"এর জাতভাই বা কোন "অতিকায় দানব" না

হইলেও একজন "অতিকায় মানব" সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তুঃখের বিষয় ছেলেটি এই সেদিন—মাত্র ২১ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

ওয়াডলোর বাড়ী ছিল আমেরিকায়। অতি সাধারণ এক পরিবারে তার জন্ম। জন্মের সময় তার চেহারার মধ্যে অস্বাভাবিক রকম কিছুই ছিল না—একটু বড়সড় চেহারার খোকা যেমন অনেকের বাড়ীতে হয় সেই রকম আর কি!

রবার্ট ওয়াডলো (১৮ বছর বয়সে)। যে দরজীটি ওয়াডলোর জামার মাপ লইতেছে সে কিন্তু মোটেই বামন নয়; সাধারণ লোকের মতই সে লম্বা।

কিন্তু কয়েক মাস যাইতেই দেখা গেল ওয়াডলো শশিকলার চাইতেও অনেক তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিয়াছে। দেড় বছর বয়সের সময়েই তাকে ৪।৫ বছরের ছেলে বলিয়া মনে হইত। নয় বছর বয়সেই ওয়াডলোকে দেখিয়া একজন পূর্ণবয়স্ক লোক বলিয়া ভুল হইতে লাগিল—শুধু মুখখানাই যা ছিল ছেলেমানুষের মত। নয় বছরের ছেলের ওজন শুনিবে? প্রায় তু' মণ!

বয়স বাড়িয়া চলিল, কিন্তু ওয়াডলোর শরীরের বাড় বন্ধ হইল না। ১৮ বছর বয়সে তার দৈর্ঘ্য হইল ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি; তার পর ২১ বছর বয়সে তা বাড়িয়া দাঁড়াইল ৮ ফুট ১০ ইঞ্চিতে। ব্যাপারটা নেহাৎ সহজ মনে করিও না। সাধারণ এক-একজন মানুষ সাধারণতঃ সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশী লম্বা হয় না। ৬ ফুট লম্বা লোককে আমরা বেশ দীর্ঘকায় লোক বলিয়াই মনে করি, ৬ ফুটের বেশী উঁচু লোক খুব বেশী একটা চোখে পড়ে না। সেই জায়গায় ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি—অর্থাৎ প্রায় ৯ ফুটের কাছাকাছি লম্বা লোক পৃথিবীর একটা নতুন আশ্চর্য্য ছাড়া কি? সহরে না থাকিয়া জঙ্গলে থাকিলে এমন লোককে রাক্ষস বা দানব বলিয়া মনে না করিবার কোনও কারণ নাই।

এমন লম্বা ছেলে লইয়া বাপ-মাকে কম মুশ্‌কিলে পড়িতে হইল না! ওয়াডলোরা যে বাড়ীতে থাকিত তার ঘরগুলি ছিল নীচু—মাত্র ৮½ ফুট উঁচু। ১৮ বছর বয়সেই তো ওয়াডলো মাথায় তা ছাড়াইয়া গিয়াছে! কাজেই ছেলের জন্য তখন ঘরও বদলাইবার দরকার হইল। ছেলে লম্বায় বাড়িতেছে দেখিয়া তার জন্য ৮ ফুট লম্বা একটা খাট তৈরী করা হইয়াছিল, তু' দিনেই ওয়াডলোর ঠ্যাং সে খাট ছাড়াইয়া অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িল। তখন দরকার হইল আরও বড় এক খাটের! জামা-কাপড়-জুতার বেলাও তাই। দেখিতে দেখিতে মাপ ছোট হইয়া যায়, আর অত বড় জামা-জুতা তৈরীর খরচও জুটাইয়া উঠা গরীব বাপ-মার পক্ষে বড় সহজ কথা নয়। অবশ্য এ ঝঞ্ঝাট তাঁদের বেশী দিন পোহাইতে হয় নাই। কিছুদিন পরেই বড় বড় জুতাওয়ালারা, দরজীরা বিনা পয়সায় ওয়াডলোর জুতা-জামা তৈরী করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এমন একজন লোকের জুতা-জামা তৈরী করিবার ভার পাওয়াও তো ব্যবসার পক্ষে একটা বড় বিজ্ঞাপন!

ওয়াডলোর খাওয়াও ছিল তার দেহেরই মত। তার প্রাতরাশ ছিল এক গ্যালন তুধ, ৮টা ডিম, ১২ টুকরা পাঁউরুটী, ৫ পেয়ালা কফি, তা ছাড়া এক রাশ ফল-ফলারি। তুপুরের এবং রাত্রের খাবারও ছিল সকাল বেলাকারই অনুপাতে। এত যে খাইতে পারে তার গায়েও অস্বাভাবিক শক্তি হইবার কথা। ছিলও তাই। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে গায়ের জোরে ওয়াডলোর ধারে কাছেও কেউ ঘেঁষিতে পারিত না।

লেখাপড়ায় ওয়াডলোর বেশ মাথা ছিল। স্কুলের পড়া শেষ হইলে পর তার সাধ হইল কলেজে আইন পড়িয়া সে আইন-ব্যবসায়ী হইবে। কিন্তু তার সাংসারিক অবস্থায় তা সম্ভব হইল না, বাধ্য হইয়া ওয়াডলোকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য এক সার্কাস্ দলে যোগ দিতে হইল। ওয়াডলোর অতিকায় দেহ দেখাইয়া সার্কাস্ দলের কর্ত্তাদের বেশ কিছু রোজগার হইলেও ওয়াডলোর এ কাজ ভাল লাগিত না। কেউ তাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিলে সে দস্তুর মত বিরক্ত হইয়া যাইত।

আর একটা বিষয়ে ওয়াডলোর দেহ ছিল একটু অস্বাভাবিক। হাঁটুর

নীচেকার গোটা পায়ে তার কোন অনুভব-শক্তি ছিল না। পায়ে কাঁটা ফুটিলে সে তা টের পাইত না, জুতায় ফোস্কা পড়িলে বা কাঁকর ঢুকিলে তার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। কিন্তু এই অস্বাভাবিক ব্যাপারই তার কাল হইল। কি করিয়া জানি না, হঠাৎ তার বাঁ পায়ে একটা ঘা হইয়া সেখানকার রক্ত দূষিত হইয়া পড়িল। পায়ে কোন রকম অনুভব-শক্তি না থাকায় ব্যাপারটা ওয়াডলোর নজরেও আসিল না। যখন ধরা পড়িল, তখন আর কিছু করিবার নাই,—শরীরের সমস্ত রক্ত তখন বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও ওয়াডলোকে আর বাঁচান গেল না।

অনেকে মনে করেন পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত লোক দেখা গিয়াছে, তার মধ্যে ওয়াডলোই সব চেয়ে লম্বা। কেউ কেউ বলেন রাশিয়ায় ম্যাক্‌নভ্‌ নামে একটি লোক ছিল সে আরও লম্বা ছিল। সে ছিল ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি।

ওয়াডলো কি করিয়া এমন অস্বাভাবিক লম্বা হইল এ লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাইতে কসুর করেন নাই। তাঁরা বলেন, এর জন্য দায়ী ওয়াডলোর শরীরের কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড)। আমাদের মাথার খুলির মধ্যে মগজের নীচে "পিটুইটারী" নামে এক রকম গ্রন্থি আছে। কোন কারণে কারো শরীরের এই "পিটুইটারী" গ্রন্থির কাজ যদি অতি মাত্রায় বেশী হয় তবেই তার শরীরও অতি মাত্রায় পুষ্ট হইয়া উঠে এবং সময় বিশেষে তাকে অস্বাভাবিক অতিকায় চেহারায় দাঁড় করাইতে পারে। ওয়াডলোর ঐ বিরাট্ চেহারার জন্যও নাকি দায়ী তার মাথার পিটুইটারী গ্রন্থি।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

এক রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চার—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী। ইষ্টার্ণ ল হাউস্, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ।৵০

শিবরাম বাবুর চিরনূতন মজার মজার গল্প। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তরুণ লেখক ধ্রুবেশচন্দ্র। ছবি, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার। সেই তুলনায় দাম অসম্ভব রকম সস্তা বলতে হবে।

বইখানিতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। ভূমিকার বক্তব্য এ বইএর পক্ষে নিতান্তই অবান্তর। তা ছাড়া এর একটি গল্প তরুণ লেখক শ্রীগৌরাঙ্গ বসুর কাছ থেকে প্লট্ নিয়ে লেখা

ব'লে বইএর তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। গল্পটি কিন্তু অবিকল ঐ আকারে ইতিপূর্ব্বে সেই লেখকেরই নামে 'রামধনু'তে বেরিয়েছিল। অর্থাৎ শিবরাম বাবু তা হ'লে শুধু প্লট্ই নেন নি, গল্পটি হু-বহুই নিয়েছেন। তাঁর মত শক্তিশালী লেখকের সম্বন্ধে অন্য প্রশ্ন আসে না সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে—তবে কি এঁরা অভিন্ন ব্যক্তি? তা ছাড়া এ বইএর আর একটি গল্পের প্লট্ (সম্ভবতঃ বিলাতী) ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন। পূর্ব্বোক্ত লেখাটি সম্বন্ধে যখন লেখক তিন জায়গায় ঋণ স্বীকার করেছেন তখন এটির কথা অন্ততঃ এক জায়গায়ও উল্লেখ করলে ভাল হ'ত—নইলে কুলোকে লেখকের উপর পক্ষপাতিত্বের অপবাদ চাপাতে পারে।

এ সব সামান্য ত্রুটী বাদ দিলে অন্যান্য দিক্ দিয়ে বইখানাকে এক কথায় "অতিসুন্দর" বলা যেতে পারে।

হিটলারের শত্রু—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। দেশপ্রিয় লাইব্রেরী, ১৯২।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ১৲

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ রকম বই বোধ হয় এই প্রথম। গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম স্বীকার করে এর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এই শক্তিমান্ লেখকের লিখন-ভঙ্গীর সঙ্গে তোমরা খুবই পরিচিত; কাজেই সে বিষয়ে নতুন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

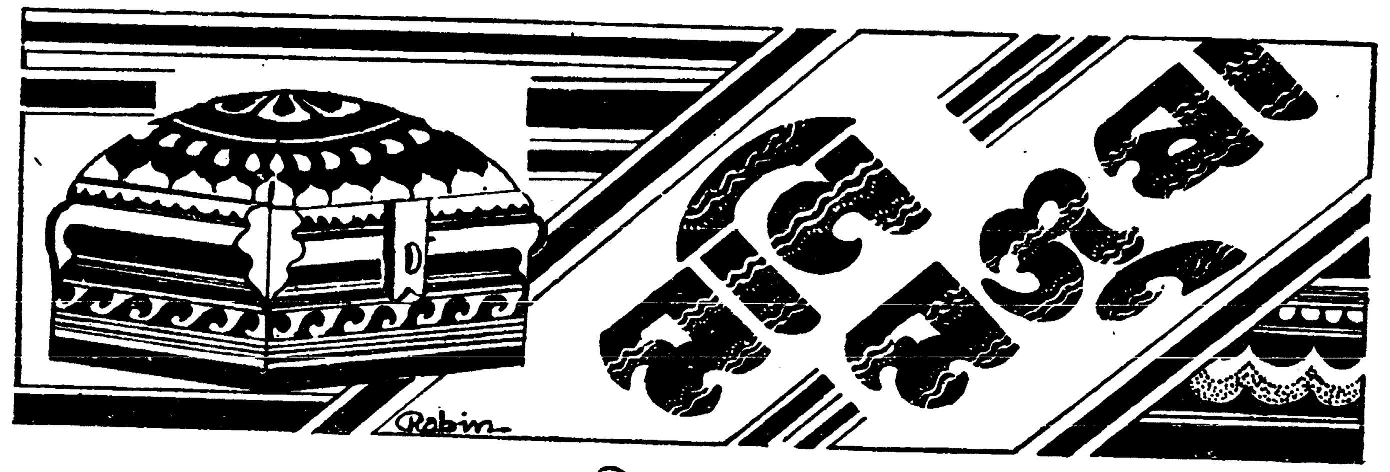

নীলদর্পণ

'নীলদর্পণ' ৺দীনবন্ধু মিত্রের লেখা বাংলা নাটক। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এ নাটকখানির মূল্য বড় কম নয়। আগে আমাদের দেশে নীলের চাষ হ'ত। সেই সময়ে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী তোমরা শুনে থাকবে। ধরতে গেলে দীনবন্ধু মিত্রের এই নাটকখানিই এ দেশ থেকে সেই অত্যাচার দূর করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। পাদরী লং সাহেব এই বইখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তার ফলে তাঁকে জেল খাটতে পর্য্যন্ত হয়েছিল। এই ঘটনায় 'নীলদর্পণ' নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যায় এবং ইয়োরোপের অনেকগুলি ভাষায় বইখানির অনুবাদ হয়। দেশব্যাপী

প্রতিবাদের ফলে নীলকরদের অত্যাচার ক্রমে কমতে থাকে। এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে 'নীলদর্পণে'র তুলনা নেই। বইটির গল্পাংশ এই রকম :—

স্বরপুর গ্রামে গোলোকচন্দ্র বসু নামে একজন লোক বাস করতেন। তাঁর দুই ছেলে—নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। নবীনমাধব নীলকরদের অত্যাচার থেকে গ্রামের প্রজাদের রক্ষা করতেন বলে নীলকুঠির বড় সাহেব উড্ তাঁকে দেখতে পারতেন না। উডেরই চক্রান্তে গোলোকচন্দ্রকে মিথ্যা মামলায় জেলে যেতে হ'ল। সেখানে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

এদিকে নীলকুঠির ছোট সাহেব রোগ্ সাধুচরণ নামে এক প্রজার মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে কৌশলে ধরে আনেন। নবীনমাধব তোরাপ নামে এক মুসলমান প্রজার সাহায্যে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন। কিন্তু উদ্ধার পেলে কি হবে, রোগের ঘুষির চোটে মেয়েটির মৃত্যু হ'ল।

তার পর একদিন নীল বোনা উপলক্ষ্য করে উড্ সাহেবের সঙ্গে নবীনমাধবের বাধল ঝগড়া। উড্ নবীনমাধবকে অত্যন্ত অপমানজনক ভাষায় গাল দিলে নবীনমাধব তাঁকে লাথি মারলেন। উড্ও তাঁকে পাল্টা লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। নবীনমাধব অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং তার পর তাঁরও মৃত্যু হ'ল

এদিকে নবীনের মা সাবিত্রী স্বামীপুত্রের শোকে পাগল হয়ে গেলেন এবং সেই অবস্থায় নিজের পুত্রবধূকে হত্যা করে বসলেন। পরে মাথা ঠিক হ'লে অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে গেল,—তিনিও স্বামীপুত্রের অনুসরণ ক'রে মৃত্যুর শীতল কোলে আশ্রয় নিলেন।

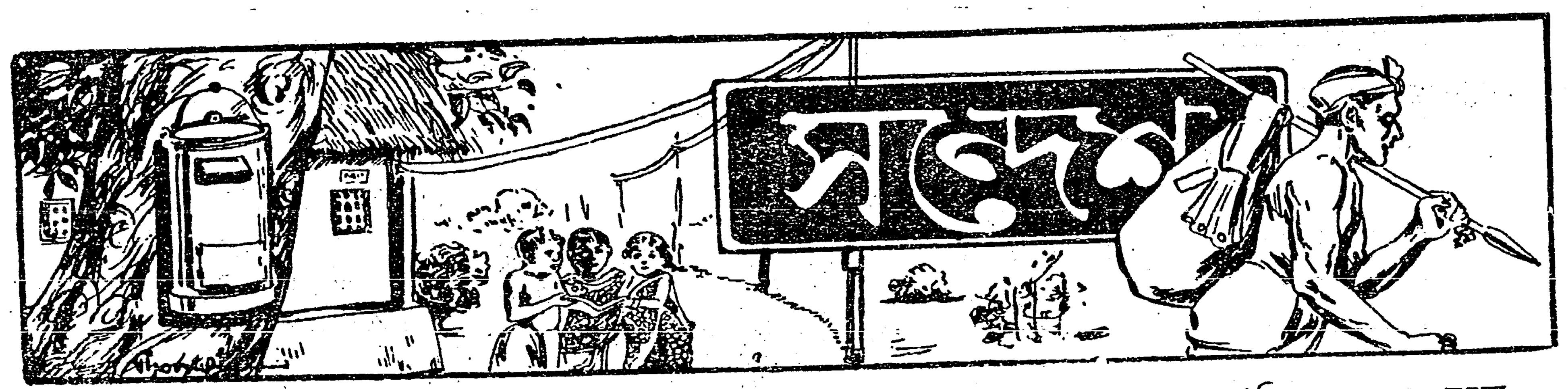

তোমরা এত দিনে নিশ্চয়ই খবর পেয়েছ, বাংলার জনপ্রিয় সুভাষচন্দ্র কয়েকদিন হ'ল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। অসুস্থ সুভাষচন্দ্র কিছু দিন যাবৎ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে সময় কাটাচ্ছিলেন। কথাবার্ত্তাও কারো সঙ্গে বলতেন না, এমন কি বাড়ীর লোকদের সঙ্গেও দেখা-শোনা করতেন না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সুভাষচন্দ্র কাউকে না জানিয়ে এক বস্ত্রে,—সম্ভবতঃ শুধু গায়ে এবং শুধু পায়ে, গৃহত্যাগ করে গেছেন। এজন্য অনেকেই মনে করছেন ধর্ম্মের প্রেরণায় তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন—যেমন আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষ করেছিলেন। কারণ ছাত্রাবস্থায়ও নাকি সুভাষচন্দ্র আর একবার এইভাবে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

সুভাষের খবর না পেয়ে সারা দেশ উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে পড়েছে। সকালে খবরের কাগজ এলে সবাই আগে দেখে—সুভাষের কোন খবর এসেছে কিনা। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক মামলাও বিচারাধীন ছিল; পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষেরাও তাঁর খোঁজ ক'রে ক'রে হয়রাণ হয়ে পড়েছেন,—কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

* * *

হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর গ্রাম হচ্ছে সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের বাড়ী। সম্প্রতি

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেখানে সমারোহের সঙ্গে তাঁর নামে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এই উপলক্ষ্যে দেবানন্দপুরে মিলিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—এই দেবানন্দপুর শুধু শরৎচন্দ্রেরই বাল্য-নিকেতন নয়—কবি ভারতচন্দ্রের বাল্যকালও এই গ্রামেই কেটেছিল।

* * *

গত বড়দিনের ছুটীতে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেছে। মূল সভাপতি হবার কথা ছিল বরোদার রাজারত্ন শ্রীসত্যব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি যোগ দিতে না পারায় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মূল সভাপতির কাজ করেন। সাহিত্য-শাখায় সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। বিজ্ঞান-শাখায় শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ এবং বৃহত্তর বঙ্গ-শাখায় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সেখানে এ বছরে প্রকাশিত বাংলা বইএর একটা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

* * *

সম্প্রতি কলকাতায় নিখিল ভারত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক-প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত এস. চ্যাটার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত মোদী।

* * *

এবার যুদ্ধের খবর একটু বলি। এখন যুদ্ধ জোর চলছে আফ্রিকায় ইটালিয় রাজ্যগুলিতে। দুর্দ্ধর্ষ বৃটীশ বাহিনীর কাছে ইটালিয়ান্‌দের নাস্তানাবুদ হ'তে হচ্ছে। ইংরেজরা একে একে তব্রুক, দার্না, বেনগাজী প্রভৃতি বড় বড় ঘাঁটিগুলির সবই দখল করে ফেলেছে,—প্রচুর ইটালিয়ান্ সৈন্য বন্দী করেছে—রসদপত্র হস্তগত করেছে। এদিকে এরিট্রিয়া, আবিসিনিয়া ও

ইটালিয়ান্ সোমালিল্যাণ্ডেও ইংরেজরা অভিযান করেছে।

ইংলণ্ডে জার্ম্মান্ আক্রমণ কমে গেছে। আলবেনিয়ায় গ্রীক্ ও ইটালিয়ান্‌দের যুদ্ধ সমানে চলেছে। জার্ম্মান্‌রা ইটালিয়ান্‌দের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। ফ্রান্সের কাছে জার্ম্মানীর নতুন দাবী নিয়ে সেখানেও একটু গণ্ডগোল সুরু হয়েছে। রুমানিয়ায়ও আয়রন্ গার্ড্ দল গোলযোগ সুরু করেছিল, এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে।

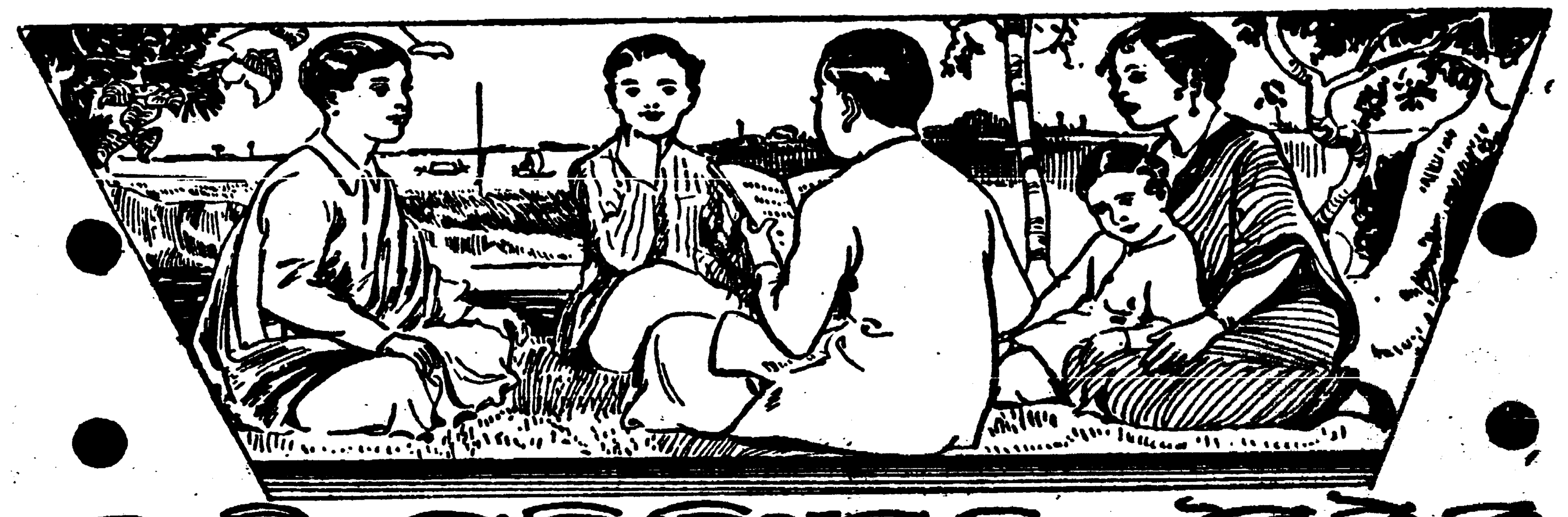

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বাণী-বোধন

শ্রীবীথিকা চক্রবর্ত্তী

কঠোর শিশির গেল চলি' লয়ে
কুহেলির আবরণ,
ঘনায়ে আসিল বোধন-লগন
কোথা তার আয়োজন!

কোথায় ভক্ত, এস ত্বরা করি'
বহিয়া অর্ঘ্য-ডালা,
মায়ের লাগিয়া আন গো গাঁথিয়া
কুন্দ কুসুমমালা।

ফুল সম আজি পড় গো লুটায়ে
চরণে পূজিবে ব'লে,
ভাই ভাই সম এক হ'তে হবে
মায়ের চরণ-তলে।

মিলন-বাঁশরী—মিলনের সুর
বাতাসে আসিছে ভাসি',
সেই সুরে আজি এক হও সবে
মায়ের চরণে আসি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

```
২০৩)৪৯৭৩৫(২৪৫
    ৪০৬
    ----
     ৯১৩
     ৮১২
    ----
     ১০১৫
     ১০১৫
    ----
```

উত্তরদাতাদের নাম

সন্তোষ ভট্টাচার্য্য ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর); প্রভাত, অমিয়, অমিতাভ, অশোক (ভবানীপুর); তুলু, বিজু, উমা, আশীষ, ডলী রায় প্রভৃতি (কলিকাতা); সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর); খুকু, লক্ষ্মী, করুণা, রেণু, সতী মৈত্র (রাজসাহী); রামেন্দু দাশগুপ্ত, আরতি সেন (ভবানীপুর); বাণী ও কিকি বসু (চাইবাসা); অমিয়, মিণ্টা, মানু, শ্যাম (রাউতাড়া—হাওড়া); সমীন্দ্র, বেবী, দীনেন্দ্রনাথ দত্ত (ধুবড়ী); কল্যাণ, পুণ্য, প্রিয়, ছুটু, বুড়ু প্রভৃতি (বর্দ্ধমান); সুপ্রিয়, সুবীর, মঞ্জুশ্রী, টুকুল বসু (ছাপরা); রত্না দেবী (বাঁকীপুর); মীরাজিত, বেবি, পুতুল, বুলু, কুশল বাগচী প্রভৃতি (কলিকাতা); সুনন্দা সেন (বরিশাল); রেবা সেন (নয়াদিল্লী); ছবি রায় (নিউদিল্লী); তরুকুমার রায়, মণিকা, শুভ্রা, মীরা রায় (রাঁচী) বিলু, তপন, মণ্টু, মিনু, শান্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি (খড়দা); জীবন দাস (চক্রবেড়ে—হাওড়া); প্রমথ ও সুধীর (ধপ্‌ধপি); মদনলাল ও অজন্তা সরাওগী (গোপালগঞ্জ); জ্ঞানরঞ্জন, পতিতপাবন, কৃষ্ণবরণ, অমূল্য (মুড়াগাছা); বাবু, জেবউন্নিসা (পার্ক সার্কাস); প্রীতি সেন, দুলাল, জগু, ভদ্রা, ভোলা (চাইবাসা); অজিত, মিহির, অরুণ, বাচ্চু, মীরা (পাবনা); দীপকরঞ্জন দেব (কুমিল্লা); সুশীল গাঙ্গুলী (সালকিয়া); তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (জলপাইগুড়ি), মণি, নিখিল (জলপাইগুড়ি); শিখা, মানস, তাপস, রণজিৎ, রত্না প্রভৃতি (শ্রীহট্ট); সৌতি বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর); রণজিৎকুমার বসু (ধুবড়ী); রামপ্রসাদ কুশারী (কুমিল্লা); অরুণা সেন (কলিকাতা); স্থাণুবালা কর (শ্যামবাজার); সেবাতৃপ্তি দত্ত (করিমগঞ্জ); শুভাশীষ সরকার (সরিষা); প্রতিভা দেবী (তেজপুর); কালিদাস পাল (বালুভরা); মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য ও অঞ্জলি ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা);

সিরাজ, কুটু, বুলবুল, মন্নু, খুকু (গোপালপুর); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভারা); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমশেদপুর); রমেশচন্দ্র, রণেন্দ্র, অজিতকুমার, কানু, লহর প্রভৃতি (রামচন্দ্রপুর); অজিতা ব্যানর্জ্জি; এন্. মজুমদার (নাটোর); ডলি বসু (কলিকাতা); রাণু, ছোটু, হাসি (নিউদিল্লী); অনিমা পাল (করিমগঞ্জ); রেণুকা দত্ত (ধুবড়ী); ফাল্গুনী দাস (কাটিহার); শতদল দে, আলোক, ইন্দ্রাণী, স্মৃতিকণা (সাহেবগঞ্জ); সরস্বতী ও সরোজকুমার মল্লিক (হাজারীবাগ); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা); যূথিকা চন্দ্র (মাদ্রাজ); বনতোষ, কমলেন্দু, ধ্রুব, নির্ম্মল, শ্যামল প্রভৃতি (গৌহাটী); শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীহট্ট); কণ্বমোহন সেন (চট্টগ্রাম); রাজবলী (কলিকাতা); শ্যামসুন্দর মাইতি (কোলাঘাট); নলচিড়া বালক সমিতির সভ্যবৃন্দ (বরিশাল); পূর্ণিমা রায় (বারাকপুর); রাঙ্গামাটী গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম); সৌরীন্দ্রনারায়ণ সরকার, গোপাল, শোভা, গৌরী, বড়দা প্রভৃতি (খড়গপুর); শক্তি, মণিকা, তুষার, শুভ্রা, বাবলু (ভাট্টাবাজার—পূর্ণিয়া); সুনীলকুমার সরকার (লাহেরিয়া সরাই); রাণা, বীণা, মাণিক, মণি, ফণী প্রভৃতি (হবিগঞ্জ); গৌরী সেন (শিলচর); শ্যামল ও গীতা মুখার্জ্জি (বেণিয়াদি); লিলি, বেলা, রবি, বাদল, বর্ষা (চাইবাসা); অজয়কুমার দত্ত (পাটনা); ফটিকচন্দ্র, অমিত, পাঁচুগোপাল (হীরাপুর); কল্যাণকুমার রায় (কলিকাতা); কান্তমণি চাকমা (সুবলং); রিণা রায় (টালিগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এক-একটি শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেকটি বাক্যে কেবল একটি ক'রে শব্দই বার বার ব্যবহার করা যাবে, একাধিক শব্দ নয়।

(১) আমার — ত্যাগে মনে করছ আ— গেল, কিন্তু তোমরা বি—মুক্ত নও।

(২) আমার প্র— কথা সাব—, নইলে সব — নষ্ট হবে।

(৩) —ইএর জন্য এ — মানাবে না, তিনি যে —তা!

(৪) এদিকে শুনি সা—, ওদিকে কেউই —, কাকে এটা জা— ?

(৫) মহা— করেন যত্রতত্র বি—, —কার্য্যের ত্রুটীতে প—য় তো হবেই!

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি
প্রণীত

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ব্যাবহারিক রসায়নে (Applied Chemistry) সুপণ্ডিত
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য এমন অনেক রাসায়নিক জিনিষ আছে যাহা আমরা বেশ চড়া দামেই বাজার হইতে কিনিয়া আনি; অথচ ইচ্ছা করিলে সেগুলি অতি অল্প খরচে ঘরেই তৈরী করা যায়। এই বইখানিতে সরল, সহজবোধ্য ভাষায় তাহারই উপায় বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে যাঁহারা অতি অল্প মূলধনে রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করিয়া ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদেরও বইখানি খুব কাজে আসিবে।

'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রশংসিত। বাঁধান মলাট। মূল্য এক টাকা।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাবভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

আদর্শ

(বাংলা ভাষায় ছোটদের একমাত্র পাক্ষিক)

বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব পত্রিকা। মাসে দুইখানা করিয়া বাহির হয়; তাহা ছাড়া প্রতি ঋতুতেই একখানা করিয়া বিশেষ সংখ্যা বাহির হয়। ১লা ফাল্গুন 'বসন্ত সংখ্যা' প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যার বর্দ্ধিত মূল্য ৵০ দুই আনা; ডাকে দশ খানা এক পয়সার ডাকটিকিট। সাধারণ সংখ্যার মূল্য ছয় পয়সা। ডাকে সাত পয়সা। নিয়মিত গ্রাহকদের নিকট হইতে বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য লওয়া হয় না। বার্ষিক চাঁদা মাত্র ২৲ দুই টাকা ও ষাণ্মাসিক ১৵০ এক টাকা দুই আনা। **২০শে ফাল্গুনের** মধ্যে যাহারা বার্ষিক গ্রাহক হইবে তাহাদের ১।৹ দেড় টাকায় ১ বৎসর কাগজ দেওয়া হইবে। আজই গ্রাহক হও। কার্য্যাধ্যক্ষ **"আদর্শ"**, C/o শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র গুহ বি.এল্, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

উৎসব-আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হ'লে

লক্ষ্মী ঘি

চাই-ই।

বিবাহ-উৎসবে, পূজা-পার্ব্বণে এবং নিত্য প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি

না হ'লে চলে না এ কথা কে না জানে?

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি'এর তুলনা নেই।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

১৪শ বর্ষ চৈত্র, ১৩৪৭ তৃতীয় সংখ্যা

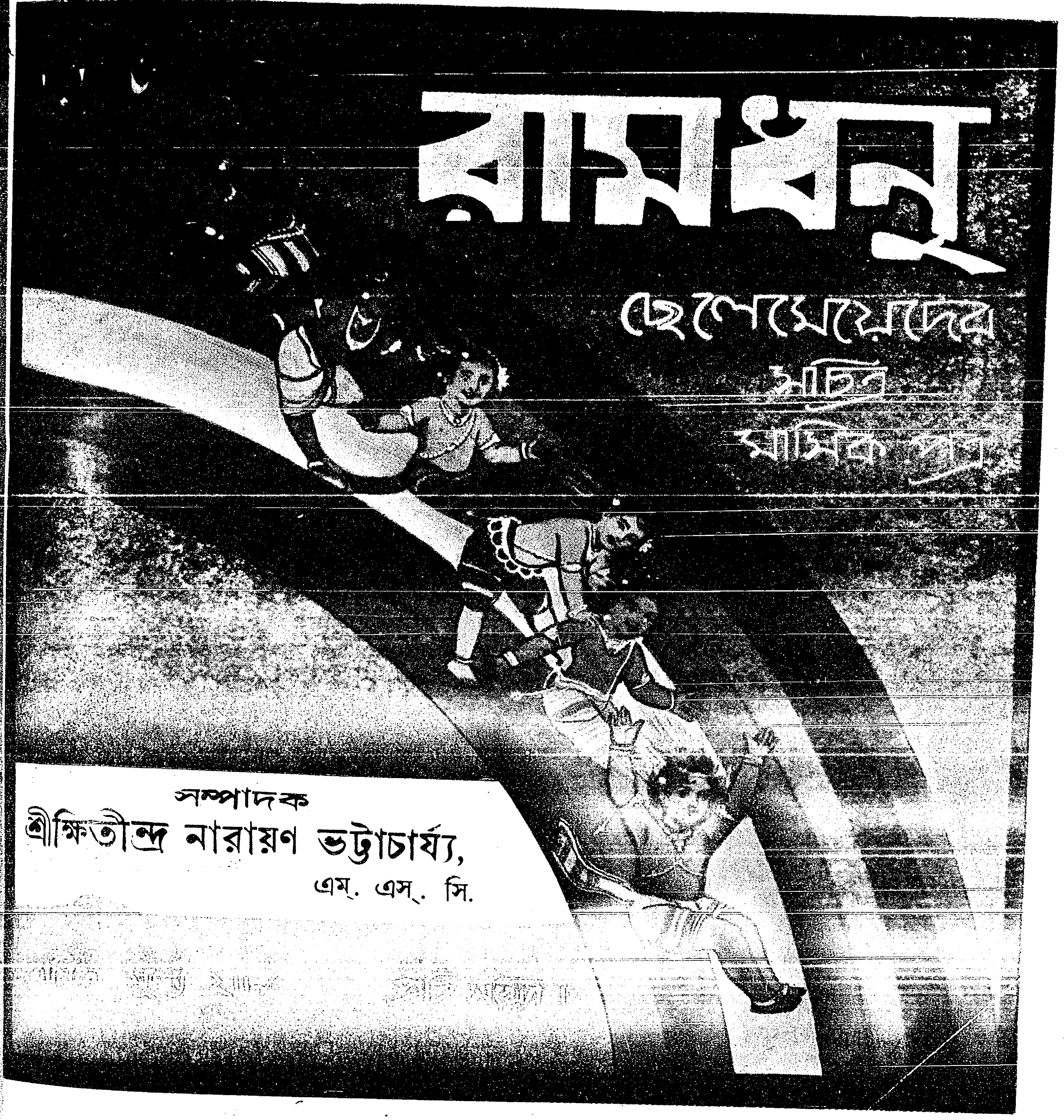

কার্য্যালয়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C—1641

উৎসব-আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে হ'লে

লক্ষ্মী ঘি

চাই-ই।

বিবাহ-উৎসবে, পূজা-পার্বণে এবং নিত্য প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি

না হ'লে চলে না এ কথা কে না জানে?

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি'এর তুলনা নেই।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co. 235/1, Bowbazar St., Cal.

১৪শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৭ | তৃতীয় সংখ্যা

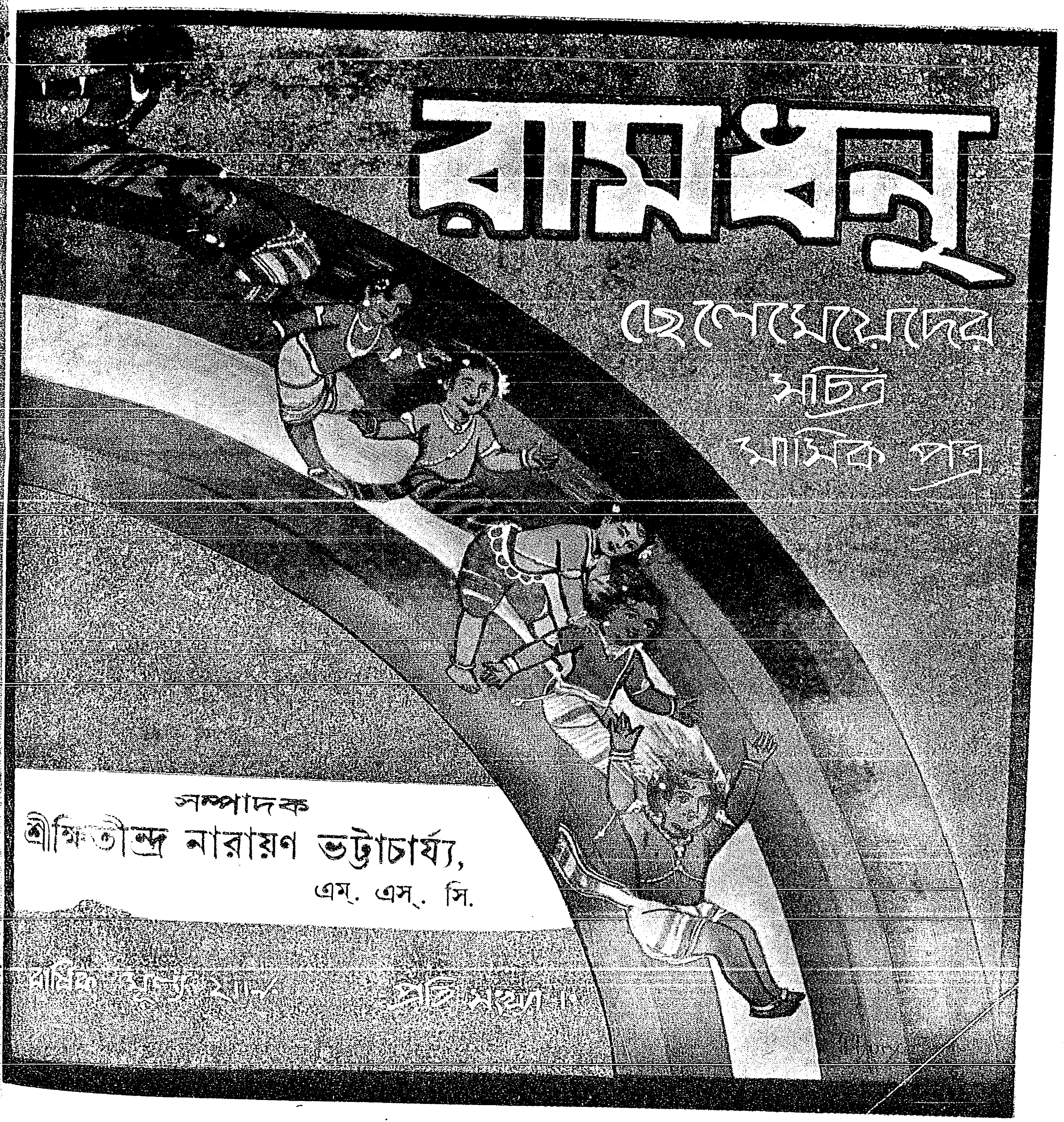

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০ ; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরলব্ধ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। যাঁহার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি-এস্-সি
প্রণীত

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ব্যাবহারিক রসায়নে (Applied Chemistry) সুপণ্ডিত
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য এমন অনেক রাসায়নিক জিনিষ আছে যাহা আমরা বেশ চড়া দামেই বাজার হইতে কিনিয়া আনি ; অথচ ইচ্ছা করিলে সেগুলি অতি অল্প খরচে ঘরেই তৈরী করা যায়। এই বইখানিতে সরল, সহজবোধ্য ভাষায় তাহারই উপায় বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে যাঁহারা অতি অল্প মূলধনে রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করিয়া ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদেরও বইখানি খুব কাজে আসিবে।

'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রশংসিত। বাঁধান মলাট। মূল্য এক টাকা।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

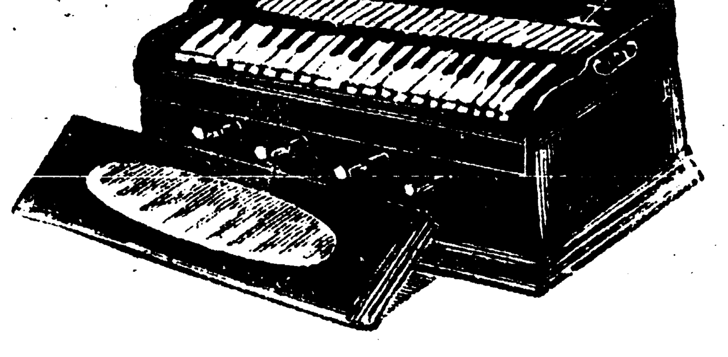

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং র

হারমোনিয়মই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং
৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা ; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের খুব ক'রে প্রাণ ভ'রে হাস্‌তে দিন্ !

ওদের দেহ-মন [illegible] হচ্ছে [illegible] এবং আপনি নিজেও [illegible] নেই।

হাসির ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য্য আর কী আছে ?

আমাদের প্রকাশিত অপর্য্যাপ্ত হাসির এই সব বই—

শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত

পথের রাত্রি ৷৷০

এক পেয়ালা চা ৷৵০

গল্প ঠাকুরদা ৷৵০

খাঁটি বাংলা শেখবার জন্যেই বুদ্ধদেবের বই পড়া দরকার—প্রত্যেক ছেলে-মেয়েরই। হাল্‌কা ঝরঝরে প্রাণবান্ ভাষা—তার ভেতর দিয়ে হাসির ফল্গুস্রোত ঝির্ ঝির্ ক'রে ব'য়ে চলেছে—আমাদের চারধারে, আমাদের জীবনেই, যে-সব মজার গল্প অহরহ ঘট্‌ছে তারই রসালো কাহিনী। জীবনকে এবং জগতকে নানা দিক থেকে, বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা ভাবে, নানান্ রূপে জানবার জন্যে, ছেলে-মেয়েরা যাতে পূরোপূরি মানুষ হ'তে পারে, তার জন্যেই, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে হাসির গল্প—বিশেষ ক'রে বুদ্ধদেবের, গল্প—পড়তে দেয়া উচিত্। বড়োরা পড়্‌লেও ক্ষতি নেই !

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু লিখিত

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ৷৵০

পরশুরাম, বুদ্ধদেব বসু এবং শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পরে গৌরাঙ্গপ্রসাদ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে এনেছেন। আন্‌কোরা নিজস্ব ষ্টাইল্, ইডিয়ম্-বহুল ভাষা, নতুন-ধরণের প্লট্—এই সব কিছুর ভেতর দিয়েই গৌরাঙ্গ-প্রসাদ যে আলাদা জাতের হাসির গল্প দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না, ছেলেরা-বুড়োরা তা সমভাবে উপভোগ করবেন। বুদ্ধদেবের পরেও যে আরও সহজ ভাষা, স্বচ্ছ ইডিয়ম্, এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী আনা যায়, এবং শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পরেও যে প্রাণখোলা প্রচণ্ড হাসি হাসানো সম্ভব—গৌরাঙ্গপ্রসাদের অসামান্য প্রতিভায় সেই বিস্ময়কর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্যে এ-বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই—এমন কি বাংলা সাহিত্যে বহুদিনের মধ্যে একখানি উপভোগ্য বই—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। সেই সঙ্গে শৈল চক্রবর্ত্তীর অসংখ্য অজস্র মজার ছবি।

—আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য নতুন বই এবং ভালো বই—

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
মণ্টুর মাষ্টার (২য় সং) ৷৵০
মানুষের উপকার করো (যন্ত্রস্থ) ৷৵০
শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী সহযোগে
এক রোমাঞ্চকর য়্যাডভেঞ্চার ৷৵০
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সহযোগে
জীবনের সাফল্য ৷৵০
শ্রীসুকুমার দে সরকার
অরণ্য রহস্য ৷৵০

আরতি (আমাদের সচিত্র বিরাট গল্পসঞ্চয়নী) ১৷০
শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
রাজার ছেলে ৷৷৵০
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়
বীরবাহুর বনিয়াদী চাল ৷৵০
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
আদিম দ্বীপে ৵০
গুজবের জন্ম ৷৵০
লালন ফকিরের ভিটে ৷৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
আজব দেশে অমলা ৷৷০
মানুষ পিশাচ ৸০
মড়ার মৃত্যু ৷৷০
ছায়া কায়ায় মায়াপুরে ৷৵০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
ব্যোমদাসের মাদুলি ৷৵০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দুর্গম পথে ৷৷৵০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আমাদের এ বছরের পূজা বার্ষিকী—

(প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল)

"মায়ামুকুর যে কোন বিলাতী বার্ষিকী অপেক্ষা রূপে, রংয়ে ও লেখায় যে নিকৃষ্ট নহে তাহা পুস্তকটি হাতে পড়িবা-মাত্রই মনে হয়।

অথচ দাম মাত্র—**দেড় টাকা**

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে এরূপ অল্প মূল্যে এমন সুন্দর একখানি পুস্তক যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ দেব সাহিত্য-কুটীরের শিশুদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। বাংলার খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা অগণিত রঙিন ও একরঙা চিত্র ও বিখ্যাত বহু সাহিত্যিকের মধুর রচনায় সমৃদ্ধ এই পুস্তকটি শিশুদের মনের খোরাক তো যোগাইবেই, বড়রাও না পড়িয়া পারিবে না।'—

আনন্দ বাজার

এ ছাড়া অমৃতবাজার পত্রিকা, আজাদ, মাতৃভূমি, এডভান্স, যুগান্তর, মৌচাক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাগজে উচ্চ প্রশংসিত।

বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত

"বলীদের গল্প"

দেশ-বিদেশের পালোয়ানদের সচিত্র কাহিনী অতি সরসভাবে লিখিত, বাংলা দেশে এরূপ বই এই প্রথম। রাশি রাশি হাফটোনচিত্রে শোভিত। মূল্য—১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত

"রঙিন-আকাশ"

রঙ ফলাইয়াছেন কারা জানো, তাঁরাই এখনও পর্য্যন্ত তোমাদের পড়িবার ঘরে আছে, সেই পরিচিত লেখকগণ। (নানা গল্পে, কবিতায় নাটিকায় ছবিতে ছাপাছাপি) দৈনিক কাগজে সমালোচনা বোধ হয় দেখছ। মূল্য—১৲ টাকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ

হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

হাস্য ও রহস্য

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙিন মলাট। দাম ॥৵০

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস। রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥০

নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৵০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)

বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ॥৵০

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—
প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

আবিষ্কারের গল্প

দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী।
পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—
পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—
চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই, চমৎকার ছবি। দাম—৸৴০

আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—
অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক্ টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া

দুর্ব্বল শিশুরা

অল্পদিনের মধ্যেই

পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৶০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—৷৶০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

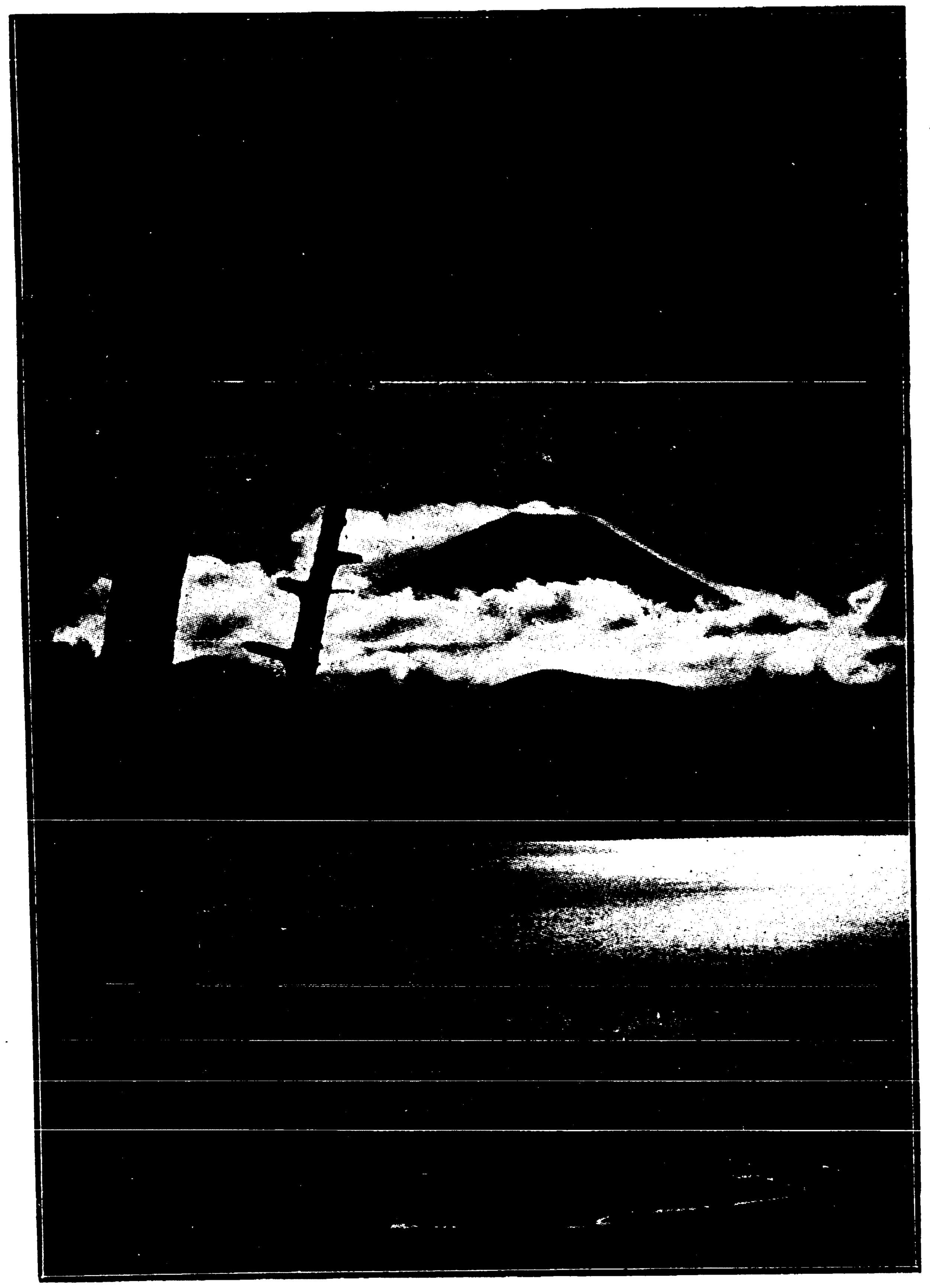

ফুজিয়ামা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪৭ { ৩য় সংখ্যা

মেনী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মেনীটাকে দেখছি না কই তো!
মাছ খায় হাঁড়ি থেকে, লাভ নাই কিছু রেখে,
রাখা দায় ঘরে দুধ দই তো!

সব বাড়ী সব ঠাঁই গতি যে,
নিত্য সবার করে ক্ষতি সে—
ছেলেদের বিছানায় আরামেতে ঘুম যায়
করে না ক' উৎপাত বই তো।

দোষ ছাড়া গুণ নাই ঝিন্দু,
তবু কি আকর্ষণ বুঝিতে পারে না মন,
ছেড়ে দিতে চায় না ক' কিন্তু।

চলে গেল গোটা দিন রাত রে,
আঁখি তারে ফিরিতেছে হাতড়ে;
কোথা গেল পথভুলো কাঁদিতেছে ছেলেগুলো,—
পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট ওই তো।*

হামবুর্গের পথে ও হামবুর্গে

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

দেশ থেকে তখন সবে ইউরোপে পৌঁছেছি। লণ্ডনে দিন কতক থেকে রওনা দিলাম হামবুর্গের উদ্দেশে। লণ্ডন থেকে ডোভার ট্রেনে গিয়ে ছোট এক খেয়া জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হ'য়ে পৌঁছলাম বেলজিয়ামের এক বড় বন্দর ফ্লাসিংএ। তার পর সেখান থেকে সোজা হামবুর্গ পর্য্যন্ত ট্রেনের পথ। পথে বেলজিয়ামের মুনষ্টার ষ্টেশনে আমার গাড়ীতে উঠল একজন খুব মোটা লোক।

* মেনী একটী পোষা বিড়ালের নাম।

লোকটি কোন্ দেশীয় জানি না, তবে বোধ করি আমার সঙ্গে আলাপ করবার উদ্দেশ্যেই এক বাক্স সিগারেট আমার সামনে ধরে জার্ম্মান্ ভাষায় বল্ল, 'Bitte' (অর্থাৎ, দয়া করে একটি নিন্)। আমি তখন সামান্য জার্ম্মান্ জানি, উত্তর দিলাম 'Nein, danke' (না, ধন্যবাদ)। লোকটি তার বড় বড় চোখ দুটি আরো বড় ক'রে বল্ল, 'Nicht youchen ?' (অর্থাৎ, খান না ?) তার পর সে কি জিজ্ঞাসা করল, আমি আন্দাজে বুঝলাম কোথায় যাচ্ছি সেটাই জিজ্ঞাস্য। বল্লাম, 'হামবার্গ'। কিন্তু লোকটি বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'Wo ?' (অর্থাৎ, কোথায় ?) হঠাৎ খেয়াল হ'ল যাকে 'হামবার্গ' ব'লে উচ্চারণ করছি জার্ম্মান্‌রা তাকে 'হামবুর্গ' ব'লে উচ্চারণ করে। সুতরাং ভুল শুদ্ধ ক'রে বল্লাম, 'হামবুর্গ'। শুনে লোকটি দাঁত বার ক'রে আমার চোখের সামনে আঙুল নেড়ে গলার সুর একটু নামিয়ে বল্ল, 'Hamburg !—Ah, gutes Bier !' (অর্থাৎ, হামবুর্গ !—সেখানে 'বিয়ার' পাওয়া যায়!) ব'লে নিজের রসিকতায় খুসী হ'য়ে নিজেই হাসতে লাগল। আমি সেটা ঠিক উপভোগ করতে পারলাম না।

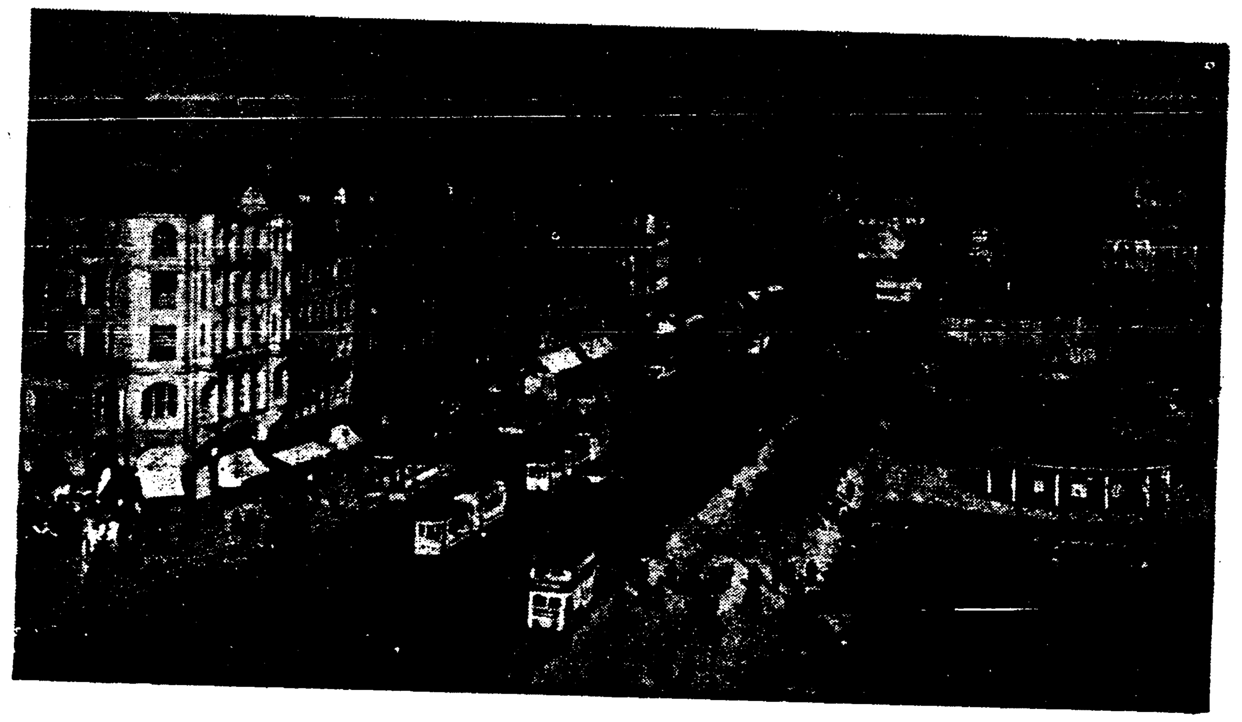
হামবুর্গ সহরের একটি সুন্দর অংশ

আমার অবস্থা বুঝে প্রসঙ্গটা সেই ঘুরিয়ে নিল। জিজ্ঞাসা করল আমার দেশ কোথায়। বল্লাম, 'ইণ্ডিয়া'। কিন্তু সে বুঝল না, আবার প্রশ্ন করল, 'Wo—Indiana ?' তার কথা আমি ঠিক ধরতে পারি নি দেখে সে মাথার উপর একটি আঙুল রেখে লম্বা কোন জিনিষের কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা

করল। তার ভুল বুঝতে পারলাম, সে মনে করেছে আমি দক্ষিণ আমেরিকার মাথায়-পালকের-টুপী-পরা ইণ্ডিয়ানদের দেশের লোক। ঝাঁ ক'রে পকেট থেকে ডিক্‌সনারী বের ক'রে দেখে নিলাম আমাদের ভারতবর্ষকে জার্ম্মান্ ভাষায় কি বলে। দেখে নিয়ে তাকে বল্‌লাম—'ইণ্ডিয়েন্'। কিন্তু এতে সে নতুন এক ফ্যাকরা তুল্‌ল, বল্‌ল—'Hollandische Indien ?' (অর্থাৎ, হল্যাণ্ডের ভারতবর্ষ ?) হল্যাণ্ডের ভারতবর্ষ মানে সে বুঝেছে সুমাত্রা, যাভা, বোর্নিও ইত্যাদি দ্বীপগুলি। বল্‌লাম 'না'। লোকটি কিন্তু ছাড়ে না, একটু ভেবে নিয়ে বলে 'Ah—Gandhi Indien !' (আ, গান্ধী-ইণ্ডিয়া!) এবার আমি হেসে ফেলেছি। একজন লোকের নামে যে এত বড় একটা দেশের পরিচয় হ'তে পারে এ কথা প্রথম শুনলাম এই বিদেশীর মুখে।

হামবুর্গ উত্তর জার্ম্মানীর সব চাইতে বড় সহর ও বন্দর। কত দেশের অধিবাসী যে রোজ সেখানে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে আসছে তার ঠিক নেই। ব্যবসার মারফৎ এখানে তাই অনেকেই ইংরাজী বলে এবং ইংরাজী বলতে পারলে বক্তা গর্ব্ব অনুভব করে।

সহরের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের সঙ্গে যোগ আছে একটি খালের। গ্রীষ্মে ছুটির দিনে বহু লোক ষ্টিমারে ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায় সেই হ্রদে, নয়তো খালের ভিতর দিয়ে যায় দূরের এক বাগানে। হ্রদটির চারিদিকে বড় বড় বাড়ী। হ্রদের পাড়ে বাঁধান রাস্তা দিয়ে অবসর সময়ে হামবুর্গবাসী বেড়িয়ে বেড়ায়। হ্রদের পাড়ে কোন কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় রাস্তার উপর বেঞ্চে বসে কেউ কেউ অগুণ্‌তি পায়রাকে রাশি রাশি দানা খাওয়াচ্ছে। এটি হচ্ছে এদের অবসর সময়ের একটি বিলাস। এ বিলাস লণ্ডনেও দেখেছি।

খালের দু'ধার বাঁধান। পাড়ে বাগানবাড়ী। বাঁধান দেয়াল বেয়ে নীচে জলের উপর এঁকে বেঁকে নেমে এসেছে লতার ঝোপ ও তাতে ছোট ছোট লাল ফুলও ফুটেছে বহু। ষ্টিমার যখন সে খাল দিয়ে যায় কোন কোন বাড়ী থেকে ছোট ছেলেমেয়ে রুমাল নেড়ে ষ্টিমারের যাত্রীদের বিদায়-সঙ্কেত জানায়। মানুষের সঙ্গে যে মানুষের তফাৎ নেই তা ছোট ছেলেমেয়ের ব্যবহার থেকে ধরা যায়

ছেলেমেয়ে যে দেশেরই হোক্ না কেন। ঐ যে বাগানবাড়ীর ছেলেমেয়ে ওরা আজ পরকেও আপনার মনে ক'রে খুসী হচ্ছে। দু'দিন পরে সংসারের চাপে এরাই নিজের লোককেও পর ভাববে, স্বার্থকেই বড় ব'লে ভাববে। বুড়োরা যদি কারো যাদুমন্ত্রে হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে যেত,—ওঃ, তা হ'লে মানুষের দুঃখই থাকত না! কিন্তু হাতীও পাঁঠা হয় না, গঙ্গার জলও সরবৎ হয় না।

খালের শেষপ্রান্তে যে প্রকাণ্ড বাগান আছে সেখানে একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। এত বড় বাগান আগে আমি কমই দেখেছি। ঘাসে ঢাকা বড় বড় ঘেরা যায়গা,—তাতে বহু রকমের ফুলগাছ লাগান আছে। বাগানের ভিতর দিয়ে চারদিকে বেরিয়ে গেছে বহু লাল সুরকী-ফেলা লম্বা লম্বা সরু রাস্তা। সে রাস্তার দু'পাশে আকাশের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা ঝাউগাছ। এরই আনাচে কানাচে গালিচা পেতে বসে গেছে ছোট ছোট পরিবার। তারা গল্প করছে, কেক আর চকোলেট খাচ্ছে, গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। তারা সকালবেলা ঐ বাগানে আসে, ঐখানেই খায় আর সারাদিন বেড়ায়, সন্ধ্যায় আবার হামবুর্গে ফিরে যায়।

হামবুর্গের বড় হ্রদটির এক কোণ দিয়ে আর একটি অপরিষ্কার খাল চলে গেছে সহরের ভিতরে—কোথাও রাস্তার নীচ দিয়ে আর কোথাও বা কোন কোন বাড়ীর গা ঘেঁসে। খালের জল নোংরা, কারণ প্রথমতঃ সেই বদ্ধ জলের উপর বোট মাল নিয়ে চলেছে সহরের এক অংশ থেকে অপর অংশে, আর দ্বিতীয়তঃ, রাস্তার বহু ময়লা অনবরত পড়ছে ঐ জলে। এতে অবশ্যি ব্যবসার সুবিধে হয়েছে অনেক, কারণ নৌকাতে গাড়ীর চেয়ে অনেক কম হাঙ্গামায় ও সস্তায় মাল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

সহরের একপ্রান্তে একটি পাহাড় আছে। সেদিন আমরা দু'জন ভারতীয় ঐ পাহাড়ে উঠছিলাম, পথে একজন লোকের সঙ্গে একটু আলাপ হ'ল। আমার বন্ধু ভাল জার্ম্মান্ জানতেন, তিনি ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন পাহাড়ে উঠবার সব চাইতে সোজা রাস্তা কোন্‌টা। কথায় কথায় তার সঙ্গে আমার বন্ধুর বেশ আলাপ জমে গেল। লোকটি, জানতে পারলাম, একজন কৃষক। সমস্ত দিন

মাঠে কাজ ক'রে বিকালে বাড়ী ফিরছিল। লোকটিকে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। সামান্য কৃষক হয়েও দেখলাম, সে তার নিজের কাজকে একটা গৌরবের কাজ বলে মনে করে। কাজের সময়ে সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, অবসর সময়ে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে গল্প-স্বল্প করে, খবরের কাগজ পড়ে ও কখনও কখনও আমোদ-প্রমোদে যোগ দেয়।

পাহাড়ের উপর উঠে দেখি এক মনোরম স্থান। নীচে এক দিকে দেখা যায় প্রকাণ্ড হামবুর্গ সহর, অপর দিকে বহু দূরবিস্তৃত বালির উপত্যকা ও তার ভেতর দিয়ে ব'য়ে-যাওয়া ছোট ছোট নদী। পাহাড়ের উপর একটি কাফে। উঠানে খানিকটা যায়গা জুড়ে পাতা হয়েছে বহু চেয়ার ও টেবিল। সেদিন ছিল রবিবার। তাই চেয়ারগুলি প্রায় সবই ভর্ত্তি ছিল। উঠানের একপাশে বসেছিল একটি ছোট বাজনার দল। দলে মাত্র পাঁচজন বাদক। একজন বাজাচ্ছিল পিয়ানো, একজন বেহালা, একজন স্যাক্সোফোন, একজন হারমোনিকা। বাকী লোকটি ছিল দলের সর্দ্দার,—সে শুধু তার ছড়ি দিয়ে তাল দিচ্ছিল। সন্ধ্যা হ'য়ে আসছিল। দূরে রঙিন আকাশের কোণে সূর্য্য আস্তে আস্তে ডুবে গেল। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় নদীর শাখাপ্রশাখাগুলি ক্রমশঃ ঝাপসা হ'য়ে আসছিল।

কাফেতে আলো জ্বলে উঠল। বাজনা তখন নতুন এক সুর ধরেছে। প্রতি টেবিলেই মৃদু গুঞ্জন, হাসি ও গল্প চলছিল। আমার বন্ধু বল্‌লেন, "দেখেছ এরা কি ভাবে জীবনকে উ.ভোগ করে! সমস্ত কাজ ক'রে সন্ধ্যায় এসে বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হাসি-গল্প করছে। বাজনা শুনছে, কাফি খাচ্ছে। এদের চোখমুখ দেখলে মনে হয় যেন এদের মনের ভিতর কোন অশান্তি নেই। জীবন ভরে এরা যেন আনন্দের ভিতরেই ডুবে আছে!" সত্যিই এ কথা মনে আসে এদের দেখলে। বিশেষতঃ এ অবস্থায়,—এত ফূর্ত্তির মাঝে। কিন্তু পরে কয়েক বছর এদের সঙ্গে থেকে দেখলাম এদের প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে কোন না কোন কষ্ট আছে। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ সুখী কেউই নয়। কিন্তু ইউরোপীয়রা জীবনে দুঃখ পেলে তখনই একটা আনন্দ দিয়ে সেটা ঢাকতে চেষ্টা করে। এটা তাদের জাতিগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ও এই অভ্যাসের গুণে দুঃখের লাঘবও তারা অনুভব করে

ব'লে আমার মনে হয়। আমরা কিন্তু সামান্য কষ্টেই কাতর হই, একটু দুঃখ পেলেই মুহ্যমান হ'য়ে প'ড়ি। ওদের দেশে শীতের আধিক্য আর আমাদের দেশে গ্রীষ্মের আধিক্য এর কারণ ব'লে অনেকে ধরেন। কিন্তু জীবন-পথে ব্যক্তিগত দান কি কিছুই নেই? দুঃখ না করলেই হয়তো দুঃখের কারণটা কিছু কমে। কথায় বলে—"বোল্‌তার বাসা ভেঙ্গে দিলেই বোল্‌তা তাড়ানো যায়।"

মিউনিখ্, জার্ম্মানী
১৯৩৫

[ভারতের বিস্মৃত যুগের একটি কাহিনী]

তিন

দু'জন অশ্বারোহীকে ছুটে আসতে দেখে হূনেরা বারেক চোখ তুলে তাকাল। যখন দেখলে তারা হিন্দু তখন তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরিয়ে তারা আবার নিজেদের কাজে মন দিলে। কাজ মানে চাষাদের ঠেঙান!

যে যুবকটিকে তারা ঠেঙাচ্ছিল তার পিঠের উপর এসে পড়ল আর এক ঘা বেত, তার পর সপাং ক'রে আবার এক ঘা। যুবক যাতনায় ছট্‌ফট্ ক'রে উঠল।

ইতিমধ্যে ধর্ম্মদেবের ঘোড়া একেবারে প্রহারকারীর পাশে এসে থামল। প্রহারকারী আবার আঘাত করার জন্য মাথার উপর বেতটি তুলেছে, ধর্ম্মদেব এক ঝট্‌কায় তার হাত থেকে বেতটি কেড়ে নিলে।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে হূনেরা হৈ-হৈ ক'রে উঠল, চীৎকার উঠল—মার্ মার্ মার্!

কাছাকাছি দু'-তিনজন তলোয়ার খুলে এগিয়ে এল, ধর্ম্মদেবও কোষ থেকে তলোয়ার টেনে

নিলে। তখনই একটা সংঘর্ষ বেধে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে বিষ্ণুবর্দ্ধন মাঝে এসে পড়ল, বল্‌লে—আহা-হা, ক'র কি, কর কি? এরা যে সম্রাট্ মিহিরকুলের লোক!

—সম্রাট্ মিহিরকুলের লোক ব'লেই তারা যা-খুসি-তা করবে এমন কোন কথা নেই—ধর্ম্মদেব রুখে জবাব দিলে।

—কী, আমাদের সম্রাটের অপমান!—হূনেরা এবার চীৎকার ক'রে উঠল—তোর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেব···হেঁটে কাঁটা উপর-কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেল্‌ব···কুকুর দিয়ে খাওয়াব···

তলোয়ারখানি সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ধর্ম্মদেব মৃদু হেসে বল্‌লে—সে জন্য আমি প্রস্তুত।

তাদের অত জনের সামনে একক হিন্দু যুবকের এতখানি স্পর্দ্ধা তারা আশা করে নি। সবাই এবার ভালো ক'রে একবার লোকটির পানে তাকাল, তার পর খোলা তলোয়ার হাতে তাকে ঘিরে ফেল্‌ল। ইতিমধ্যে বিষ্ণুবর্দ্ধন ধর্ম্মদেবের তলোয়ারশুদ্ধ হাতখানি চেপে ধরল, বল্‌লে—আরে ভাই, করছ কি! হাজার হোক্ ওরা, হূনেরা, রাজার জাত! তলোয়ারের জোরে এ দেশ দখল করেছে। কত রাজা-মহারাজা তলিয়ে গেল, আর তুমি একা যাচ্ছ ওদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে? তুমি একেবারে মাথা-পাগ্‌লা লোক দেখছি!

—তার মানে? রাজার জাত বলে হূনেরা যা করবে তাই সইতে হবে নাকি?

—তা একটু-আধটু হবে বই কি, ওরা রাজার লোক যে! নাও, আর বকাবকি ক'রো না, এখন তলোয়ার কোষে ভরে ফেল দিকি—ব'লে এক রকম জোর ক'রেই ধর্ম্মদেবের তলোয়ারখানি সে কোষে ভ'রে দিলে। তার পর হূনদের পানে তাকিয়ে বল্‌লে—আরে ভাই, তোমরাও একটা পাগলের সঙ্গে পাগল হ'লে নাকি! এটি আমার দূর সম্পর্কের ভাই, ছেলেবেলা থেকেই ওর মাথা একটু গরম, তার পর অতি-আদরে মানুষ হ'য়ে ওর মাথাটি এখন একদম বিগড়ে গেছে। ওর কথা অত ধর্‌লে কখনও চলে? তোমাদেরকে আমি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব'লে জানি···

—তা ব'লে আমাদের সম্রাটের অপমান আমরা সইব! আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের সম্রাট্‌কে যা খুসি তাই বল্‌বে?

—আহাহা, পাগলের কথা কেউ ধরে নাকি! তা হ'লে তো পাগলের সঙ্গে তোমাদেরকেও পাগল হ'তে হবে!

তার পর কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—তা ওই ছোকরাকে তোমরা অত ঠেঙাচ্ছিলে কেন? কি হ'য়েছে?

—ব্যাটা এ বছরের খাজনা দেয় নি।···

যুবকটী তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আজ্ঞে, আমি খাজনা দিয়েছি তবু—

হূনেরা রুখে উঠল—ফের মিছে কথা, দিস নি তবু বল্‌বি দিয়েছি?

—আহাহা, তোমরা একটু থাম না বাপু, ও কি বলে আগে শুনি না, তোমাদের কথা তো পরে শুনবই!

হূনেরা মনে মনে তর্জ্জন করতে থাকে, আর কেউ এমন ভাবে মাঝে পড়লে তারা তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করত, কিন্তু বিষ্ণুবর্দ্ধন সাধারণ লোক তো নয়, সে রাজবৈদ্য, তার পর মিহিরকুলের পালিতা কন্যার অসুস্থতা সারিয়ে সম্প্রতি সম্রাটের সঙ্গে সে বিশেষ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে।

তার পর বিষ্ণুবর্দ্ধন কিষাণ যুবকটির মুখের পানে তাকাল।

—আজ্ঞে, ওরা আমার ফসল কেটে নিতে এসেছে, বল্‌ছে—তোরা খাজনা দিস নি···

—শুধু ওর ক্ষেতেরই ফসল নয় বৈদ্যজী, আমাদের সকলের—এতক্ষণ যারা চারিপাশে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল এবার তারা সবাই কথা বল্‌ল।

হূনেরা আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না, সমস্বরে ব'লে উঠল—আলবৎ কেটে নেব, তোদের কারুর ক্ষেতে একটা গমের শীষ রাখব না। খাজনা দিয়েছিস তো হয়েছে কি? আমাদের দরকার আমরা কেটে নেব—

—বটে? বলে ধর্ম্মদেব তাদের মুখোমুখি এগিয়ে এল—দরকার ব'লেই কেটে নেবে, ন্যায়-নীতি ব'লে কোন কথা নেই?

—ন্যায়-নীতি?—হূন দলপতি উত্তর দিলে—আমাদের ন্যায়-নীতি হচ্ছে এই তলোয়ার। এই তলোয়ারের জোরে আমরা এই দেশ জয় করেছি, এই তলোয়ারের জোরেই আমরা এ দেশ শাসন করব এবং দরকার হ'লে তোমার মত দু'-পাঁচ-দশটাকে এই তলোয়ারের জোরেই আমরা শায়েস্তা করব।

—আমিও প্রস্তুত—ব'লে ধর্ম্মদেব আবার তলোয়ার কোষমুক্ত করতে যাচ্ছিল, বিষ্ণুবর্দ্ধন তার হাত চেপে ধরল, তার পর চাষাদের পানে ফিরে বল্‌লে—হূনেরা দেশের রাজা, দরকার হ'লে ওরা ফসল তো কেটে নেবেই, তা নিয়ে আবার কখনও হাঙ্গামা বাধাতে আছে? যাক্, যা হ'য়ে গেছে হ'য়ে গেছে, এখন ওদের দরকার, কিছু তো দিতেই হবে। তা তোরা তো আর দু'চার দিনের মধ্যে ফসল কাটবি, তখন সিকি ভাগ শস্য কাছারীতে দিয়ে আসবি, বুঝ্‌লি?

হূন দলপতি ব'লে উঠল—সিকি হ'লে চল্‌বে না, অর্দ্ধেক চাই।

—বেশ, বেশ, অর্দ্ধেক দিবি, বুঝ্‌লি?

—হাঁ জী—মলিন মুখে চাষারা জবাব দিলে,—কিন্তু অর্দ্ধেক দিলে আমাদের···

—আবার কথা বলে!—বিষ্ণুবর্দ্ধন ধমক দিয়ে উঠল—সবই চলে যাচ্ছিল, তবু ব'লে কয়ে অর্দ্ধেকে রফা!- যা—

চাষারা ধমক খেয়ে সেখানে আর দাঁড়াল না, তবে তাদের গুঞ্জন শুনে বোঝা গেল বিষ্ণুবর্দ্ধনের মধ্যস্থতায় তারা খুসি হ'তে পারে নি।

বিষ্ণুবর্দ্ধন এবার হূন দলপতির দিকে ফিরে বল্‌লে—যাক্ ভাই, তোমরা ওদের আর কিছু ব'লো না, যতই হোক্ ছোটলোক তো, বুদ্ধিশুদ্ধি ওদের চিরকালই কিছু কম। তা আমি যখন ব'লে দিয়েছি পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই তোমাদের কাছারীতে অর্দ্ধেক ফসল ওরা পৌঁছে দিয়ে আসবে, তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। আচ্ছা ভাই, নমস্তে!

—নমস্তে!

তার পর হূনদের শুনিয়েই বল্‌লে—চলো ধর্ম্মদেব। তোমাকে নিয়ে মহা-মুস্কিল হ'ল দেখছি। কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হ'বে তাও এখনও শেখো নি? নাও, এসো—

ঘোড়ার রাশ ধ'রে বিষ্ণুবর্দ্ধন ধর্ম্মদেবকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌ল।

হূন-সর্দ্দার তীক্ষ্ণ চোখে তাদের গতিপথের পানে তাকিয়ে রইল; কিছুক্ষণ পরে তারা খানিক দূরে একটা পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলে আপন মনে ব'লে উঠল—তোমাকে সহজে ছাড়ছি না ধর্ম্মদেব, আমি তোমাকে ভালো ক'রে একদিন সম্‌ঝে দেব।

পথ চল্‌তে চল্‌তে ধর্ম্মদেব বল্‌লে—তুমি বেশ লোক তো বৈদ্যজী, এক কথায় ওদেরকে অর্দ্ধেক ফসল কেটে দেবার জন্য ব'লে দিলে?

—ভালই কর্‌লাম বন্ধু! না হ'লে বেচারাদের শুধু ফসলই নয়, ঘর-দোর সব আজ রাত্রে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেত। কত জন যে পুড়ে মরত তার ঠিকানা নেই। তখন তুমি একা তলোয়ার ধ'রে তার কতটুকু প্রতিবিধান করতে পারতে, বল তো?

—তখন তো আর আমি একা নয়, তখন যে ওই সব চাষারাও থাকতো আমার পিছনে।

হা-হা করে বিষ্ণুবর্দ্ধন এবার হেসে উঠল, বল্‌লে—তুমি তোমার দেশকে এখনও ভালো করে চিনতে পার নি বন্ধু! এই দেশের নরনারীরা ধর্ম্মচর্চ্চা করতে করতে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, যে সংসারের শোক-দুঃখ এদের মনকে আর স্পর্শ করতে পারে না। জীবনকে এরা অদৃষ্ট আর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

—সেই জন্যই তো আজ এমন একটা আঘাত পাওয়া দরকার যাতে এদের এই ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে,—অদৃষ্ট আর কর্ম্মফলের চেয়ে বাহুর শক্তিতেই এরা বেশী বিশ্বাস করতে শেখে।

—তোরামাণ ও মিহিরকুল তো সমগ্র উত্তরাপথে সে আঘাত দিয়েছে কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্ত ছোট-খাটো একটাও বিদ্রোহ হয়েছে এমন সংবাদ তুমি শুনেছ?

—কারণ সেখানে যোগ্য নেতার অভাব।

—ওইখানেই আবার তোমার ভুল বন্ধু, নেতা দেশকে তৈরী করে না, দেশই দরকার মত নেতা সৃষ্টি করে।

—তা হ'লে তুমি কি বল্‌তে চাও, তোমাদের কালো-ঘোড়ার সওয়ার ভুল কর্‌ছে?

—ভুল সে বিশেষ কিছু করে নি, কিছু লোকের সে উপকার কর্‌বে সত্যি—তা'ও ওই পালিয়ে-পালিয়ে যেটুকু হয়। একটা বড়-কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হ'বে না।

—ওইখানেই তোমার সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারলাম না।

তার উত্তরে হা-হা ক'রে বিষ্ণুবর্দ্ধন হেসে উঠল। (ক্রমশঃ)

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩

যখনকার কথা বলিতেছি তখনকার দিনে, অর্থাৎ দেড়শ'-দু'শ' বছর আগে, পুলিসের ক্ষমতা ছিল প্রায় অসীম, প্রতাপ ছিল দোর্দ্দণ্ড। কোথাও ডাকাতি বা চুরি হইলে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর যাহারা বলিষ্ঠ ও খেলোয়াড় প্রকৃতির লোক তাহাদিগকে অনেক সময় অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। একবার এমনি একটা খেয়াল বশেই থানার পশ্চিমা জমাদার হরির পিতাকে লাঞ্ছিত করেন এবং

মাতাকে গালাগালি দেন। হরি তখন কিশোরবয়স্ক হইলেও সে অপমান ভুলিতে পারে নাই। সে সেই জমাদারকে একদিন শিক্ষা দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখনকার একজন জমাদারের মর্য্যাদা ছিল প্রায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মত।

উক্ত জমাদার ছিলেন খুব বলশালী ও কুস্তিগীর। বাড়ী ছাপ্‌রা জেলা। তিনি একাই ৫।৬ জনকে ঘায়েল করিতে পারিতেন, তাহার উপর সঙ্গে থাকিত দুইজন যমের মত পালোয়ান কনেষ্টবল। একদিন তিনি অজয়ের পারে কোন এক গ্রামে গিয়াছিলেন, ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে। উক্ত দুইজন সিপাহী ছাড়া গ্রাম্য চৌকীদারও ছিল। অজয়ের উপর ঠিক হড়গড়ানে নামিবার রাস্তাটির পাশে ছিল এক ঘন পল্লববিশিষ্ট প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ—সেখানে বহুকাল হইতেই ভূতের ডেরা আছে বলিয়া লোকে জানে। চৌকীদার ত' জানিতই।

সেই গাছ এবং ভূতের আকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য কথা বলিতে বলিতে চৌকীদার জমাদার বাবুকে 'লইয়া' চলিয়াছে। জমাদার যাইতেছিলেন ঘোড়ায়; চৌকীদারের কথায় জমাদার খুব হাসিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন—'আচ্ছা, আজ ভূতের সঙ্গে মোলাকাৎ করা যাবে।' কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, জমাট অন্ধকার। জমাদার বাবু খুব উল্লসিত হইয়া সদলবলে চলিয়াছেন। গাছটার নিকট পৌঁছিবা মাত্র ঊর্দ্ধ ডাল হইতে বিকটাকৃতি তিনটা মূর্ত্তি লাফাইয়া পড়িল। চৌকীদার ত' দেখিবা মাত্র—'বাবারে ভূত!' বলিয়াই প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সিপাহী দুইটাকে দুইটা ভূতে আছাড় দিয়া বালিতে ফেলিয়া মুখ রগড়াইয়া দিল। তাহাদের চক্ষু বালিতে ভরিয়া গেল, কিছুই দেখিতে না পাইয়া 'গোঁ-গোঁ' করিতে লাগিল। একটা ভূত জমাদারকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া অনুনাসিক স্বরে বলিল—'তুঁই বাঁমুন—তোঁকে মারবোঁ না, গোঁটা কঁত প্রঁণামী ঢুঁ দেঁবো, কাঁপিস্ নে।' জমাদার খুব শক্তিশালী বটেন কিন্তু ভূতের কাছে কি করিবেন? ভূতের হাতের দৃঢ়তা দেখিয়াই তিনি বাধা দেওয়া নিষ্ফল বুঝিয়াছিলেন। ভূত জমাদারের পেটে তিনটী ঢুঁ দিয়া ছাড়িয়া দিল। জমাদার যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ঘোড়া কোথায় ছুটিয়া চলিয়া গেল।

চৌকীদারের মুখে সংবাদ পাইয়া গ্রাম হইতে লোকজন দৌড়িয়া আসিল

এবং গাড়ী করিয়া ভূতাহতদিগকে গ্রামে লইয়া গেল। সে লোকজনের মধ্যে হরি ও দীনু-তিনু ছিল এবং শুশ্রূষা তাহারাই বেশী করিল।

জমাদার রাত্রি বারোটায় সংজ্ঞালাভ করিলেন। আঘাত অপেক্ষা ভয়ই অধিক হইয়াছিল। তিনি ভূতের দৈর্ঘ্য ও আকৃতি সম্বন্ধে এবং তার হস্তের শীতলতা ও পাঞ্জার কাঠিন্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিলেন তাহাতে অন্য লোকেরও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন—'হাঁ, ভূত ওখানে আছে সত্য, তাদিকে দেখেছেও অনেকে—কিন্তু এ তিনটা নূতন আগন্তুক ব'লে মনে হয়। এত দিন কারো বিশেষ অনিষ্ট করে নাই—আপনি ব্রাহ্মণ, গলায় পৈতা ছিল, তাই রক্ষা পেয়েছেন।'

ব্যাপারটা যে একান্ত ভৌতিক সে সম্বন্ধে জমাদার বা অন্য কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ঘটনাটী অতিরঞ্জিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিল। হাট-বারেও লোকে সে পথ ত্যাগ করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘটনার পর জমাদার বাবু ব্যবহারে বড়ই ভদ্র ও সংযত হইলেন।

হরি থানা-ঘাটের খেয়ারি। এক বৎসর ভাদ্র মাসে অজয়ের প্রলয় বন্যায় বহু গ্রাম ভাসিয়া গেল—কত মৃতদেহ, কত বাক্স-পেটরা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মাঝ নদী দিয়া একটা বাক্স ভাসিয়া যাইতেছিল—হরি সেটা ধরিল। রাত্রে বাড়ী আনিয়া খুলিয়া দেখে উহা সুবর্ণ মোহর ও স্বর্ণালঙ্কারে পূর্ণ। ভগবানের ও অজয়ের এই দানে হরির অবস্থা সচ্ছল হইল। লোকে বলিতে লাগিল—হরি যকের ধন পাইয়াছে—শাঁকচিরণী তাহাকে ডাকিয়া পাঁচ ঘড়া মোহর দিয়াছে। আর হিংসুক শ্রেণীর লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—হরি ডাকাতি করিয়া ঐ টাকা পাইয়াছে। হরির বহু শত্রু হইয়া উঠিল কিন্তু হরি তখন পর্য্যন্ত একেবারে নির্দ্দোষ—দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই এবং করিবার ইচ্ছাও পোষণ করে নাই। কেমন করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার পীড়নে সে দস্যু হইল তাহা পরে বলিব।

(ক্রমশঃ)

বিচিত্র ভারত

যন্ত্র-যুগে

একটি আধুনিক কারখানার দৃশ্য

বন্দী সুবর্ণরেখা

স্বাধীন হিন্দু রাজ্য

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীতে একটী মাত্র হিন্দু রাজ্য আছে যাহাকে বস্তুতঃ স্বাধীন বলিতে পারা যায়। হিমালয় পর্ব্বতের বুকের ও মাথার উপর অবস্থিত এই নেপাল রাজ্যের কথা 'রামধনু'র পাঠক-পাঠিকাগণকে একটু শুনাইব।

নেপালের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ। নেপালের উত্তর যুড়িয়া কত প্রধান প্রধান পর্ব্বতশৃঙ্গ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শৃঙ্গরাজ এভারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি এইখানেই।

আজকাল কেহ কেহ নেপালকে ভারতবর্ষের বাহির বলিয়া গণ্য করেন। অবশ্য ইহা ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের এবং ভারতের করদ ও মিত্র রাজ্যগুলির এলেকার বাহিরে। কিন্তু হিমালয়ের বুকের উপর থাকিয়া সিম্‌লা, মসৌরী ও দার্জ্জিলিং যদি ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইতে পারে, কাশ্মীরকে যদি ভারতবর্ষের মধ্যেই গণ্য করা হয়, তবে নেপালই বা কি অপরাধ করিল?

নিম্নভূমি তরাই হইতে উত্তরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত নানা প্রকার বিচিত্রতার আবাস এই নেপাল। পার্ব্বত্য নদনদীরও এ দেশে অভাব নাই। জলবায়ু, জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদি স্থানভেদে বিভিন্নপ্রকার।

নেপালের আয়তন মোটামুটী চুয়ান্ন হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৫৫ লক্ষের কিছু উপর বলিয়া আন্দাজ করা হয়। লোকবহুল বাংলা দেশের সহিত অবশ্য ইহার তুলনা হয় না—এক ময়মনসিংহ জেলার লোকসংখ্যাই ইহার কাছাকাছি। কিন্তু যে সকল দুর্দ্ধর্ষ জাতি লোকসংখ্যায় ক্ষুদ্র হইয়াও পৃথিবীতে একটা নাম করিয়াছে তাহাদের কাহারও কাহারও সহিত তুলনায় নেপালের লোকবল নগণ্য নহে। যে ফিন্‌ল্যাণ্ড্‌কে জয় করিতে বিরাট্‌ রুশশক্তিকে এতটা বিব্রত হইতে হইয়াছিল তাহার লোকসংখ্যা নেপালের তুলনায় অনেক কম। ইউরোপের একটী বিশিষ্ট রাষ্ট্র সুইজার্লণ্ডও জনসংখ্যায় নেপালের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। সিংহল দ্বীপের লোকসংখ্যা নেপালের অপেক্ষা কম—আয়র্লণ্ডের আরও কম।

মুসলমান রাজ্য ইরাকের জনসংখ্যা নেপালের অর্দ্ধেকের কাছাকাছি। মরুবহুল প্রকাণ্ড আরব দেশ প্রায় ৭০ লক্ষ মাত্র মনুষ্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি যে গ্রীস্ আজ ইটালীকে নাজেহাল করিয়া দিতেছে তাহার লোকসংখ্যাও নেপালের তুলনায় কিছু বেশী মাত্র।

পর্ব্বতরক্ষিত নেপাল স্বাভাবিক কারণেই তাহার স্বাতন্ত্র্য এত কাল বজায় রাখিয়াছে। তাই বলিয়া এরূপ বুঝিতে হইবে না যে নেপাল চিরদিনই বৈদেশিক আক্রমণের ঝঞ্চাট অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। বাস্তবিক যে গুর্খা জাতি আজ নেপালের মেরুদণ্ড সেও নেপালের আদি অধিবাসী নহে। এই বীর জাতির আধিপত্য নেপালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বহু অন্তর্বিপ্লব ও বহু রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের পর। গুর্খারা রাজপুতবংশীয় —মুসলমান আক্রমণে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নেপালের পশ্চিমে আসিয়া প্রথমে আড্ডা স্থাপন করে। ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া বহু চেষ্টার পর তাহারা নেপালে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। যে বীরপুরুষের অধিনায়কত্বে এই কার্য্য সুসম্পাদিত হয় তাঁহার নাম পৃথ্বীনারায়ণ। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে পূর্ব্বতন রাজবংশকে কায়েম রাখিবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু পৃথ্বীনারায়ণই বিজয়ী হ'ন।

নেপালের উত্তরে তুষার-সম্পদ্

গুর্খারা একবার তিব্বত আক্রমণ করিতে গিয়া চীন-সৈন্যের সম্মুখীন হয় ও পশ্চাৎপদ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। তাহাদের দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু ইহাতে নিবৃত্তি লাভ করে নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে গুর্খাসৈন্য কুমায়ুন ও গড়োয়াল জয় করে—তাহাদের রাজ্য পশ্চিমে কাশ্মীরের প্রান্ত হইতে পূর্ব্বে সিকিমের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাঙ্গারা উপত্যকা গুর্খাদের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সাহায্য না পাইলে কাঙ্গারার অদৃষ্টে আরও কত কি ঘটিত। পরে নেপাল রাজ্য যে সঙ্কুচিত হইয়াছে ইংরাজের সহিত বিবাদই তাহার প্রধান কারণ। ইংরাজের সহিত এখন নেপালের সম্পূর্ণ সদ্ভাব—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নেপালের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চিরকাল কিন্তু এই বন্ধুত্ব ছিল না। ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই যে এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নেপালের ঘোর সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছিল এবং নেপালীরা তাহাতে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ইংরাজের অনেক ক্ষতিও করিয়াছিল। ইংরাজের বিখ্যাত শৈলাবাস সিম্‌লা পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যে ছিল। যে বীরযোদ্ধা নেপালকে শেষ যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত করিয়া ভাল ভাল স্থান দখল করিয়া লন তাঁহার নাম জেনারাল অক্টর্লোনী। কলিকাতার ময়দানে ইঁহার নামে সুবিখ্যাত মনুমেণ্ট বা স্মৃতিস্তম্ভ আজও দণ্ডায়মান।

বর্ত্তমানে যিনি নামে নেপালের King বা মহারাজাধিরাজ তাঁহার নাম ত্রিভুবনবীর বিক্রম সা। প্রকৃত রাজক্ষমতা এখন প্রধানমন্ত্রীর হস্তে, তাঁহাকে "মহারাজা" বলা হয়। বর্ত্তমান মহারাজের নাম যোধা সমসের জঙ্গ বাহাদুর। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র সমসেরের সময়ে নেপালে বৈদ্যুতিক আলোক প্রচলিত ও দাসত্বপ্রথা রহিত হয়। যে প্রধান মন্ত্রী প্রথমে রাজক্ষমতা হস্তগত করেন তাঁহার নাম জঙ্গ বাহাদুর। সার্ জঙ্গ বাহাদুর নানা প্রকারে নেপালকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সময়ে তিব্বতের সহিত নেপালের আবার যুদ্ধ হয়, এবার নেপাল শেষ পর্য্যন্ত লাভবান্‌ই হইয়া পড়ে। ইংরাজের সহিত মৈত্রী তাঁহার জীবনে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি বিলাত গিয়াছিলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এখনও ইংরাজের বাহিনীতে গুর্খা সৈন্য বিখ্যাত।

যুদ্ধবিগ্রহের কতক কতক বলিলাম। অন্য একটা বড় রকমের কথা বলি। “আজিও যুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর” সেই বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত। নেপালীদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু আছে, বৌদ্ধ আছে, অনেকের ধর্ম্মেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম মিশিয়া গিয়াছে। নেপালের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ যুগের স্তূপ বিদ্যমান্। হিন্দুর এক মহাতীর্থ পশুপতিনাথের মন্দির নেপালে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক ক্রমেই নেপালে প্রবেশ করিতেছে। রাজধানী কাঠমণ্ডুতে কলেজ হইয়াছে—স্থানে স্থানে স্কুল চলিতেছে। সংস্কৃত ও বাংলা অনেক হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি কাঠমণ্ডুর লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে। নেপালে অনেক হাসপাতালও স্থাপিত হইয়াছে।

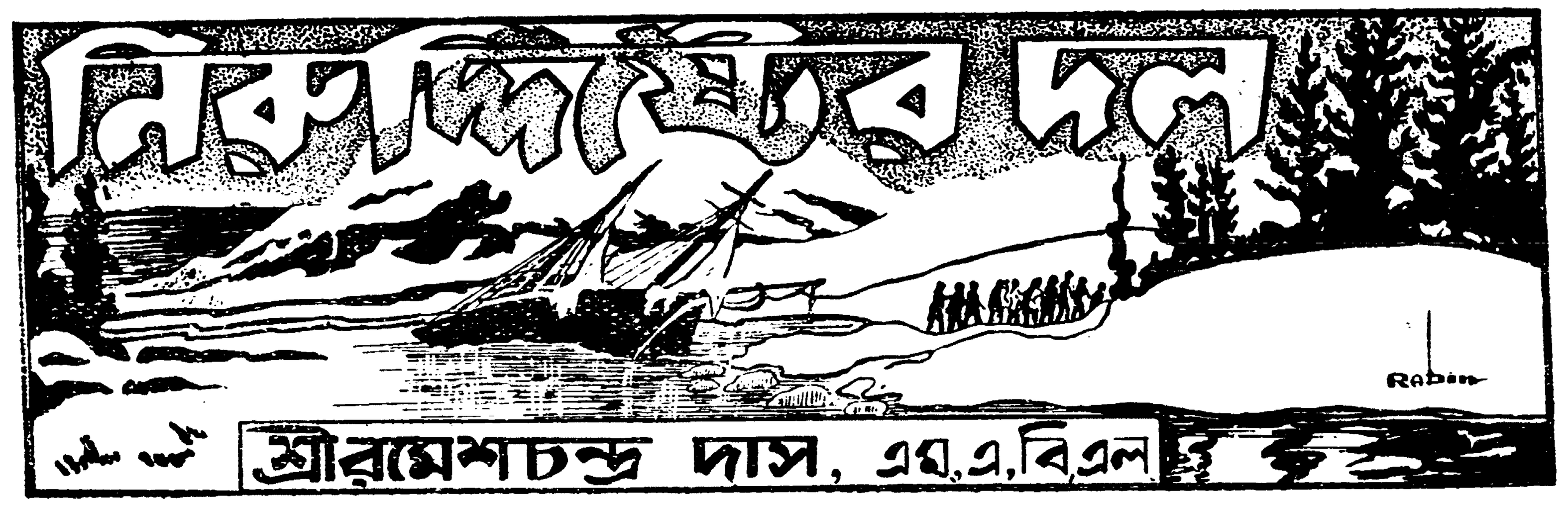

৫

সুশান্ত দূরবীণ দিয়া চারিদিক্ পরীক্ষা করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে নিষ্প্রভকণ্ঠে বলিল, “কোথাও যে ধোঁয়াও দেখা যায় না!” বুনো কহিল—“নদী রয়েছে, কিন্তু নদীতে নৌকাও নেই!” রঞ্জিৎ অবজ্ঞার সুরে কহিল—“লোক না থাক্‌লে ধোঁয়াই বা উঠবে কোথা থেকে, আর নৌকাই বা আস্‌বে কোন্ চুলো থেকে?”

এই সময়ে সমুদ্রজলে ধীরে ধীরে ভাটা দেখা দিল। তখন বেলা প্রায় সাতটা। সুশান্ত দেখিল এই ভাটার সুযোগেই ডাঙ্গায় যাইবার চেষ্টা দেখিতে হইবে। সে তখন কোমর বাঁধিয়া সঙ্গে অশোক, শঙ্খচূড় প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া জাহাজের তলাকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ডেকের উপরে লইয়া আসিতে লাগিল। জাহাজে জিনিষও কম ছিল না। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও

অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী একেবারে প্যাক্-করা বাক্সে বন্ধ ছিল। সেগুলিকে আগে বাঁচাইতে হইবে ও ডাঙ্গায় লইয়া যাইতে হইবে। তার পর অন্যান্য জিনিষপত্র পরে নিলেও চলিবে। তখন অল্প অল্প রোদও উঠিয়াছে, বাতাস ও ঢেউএর দাপটও ঢের কমিয়া গিয়াছে। শেষে জল এমন কমিয়া গেল ও প্রবাল-চূড়াগুলি এমনভাবে বাহির হইয়া পড়িল যে ভয় হইতে লাগিল জাহাজখানা এইবার একদিকে কাৎ হইয়া পড়িবে। নৌকা মাত্র একখানি ছিল, আর সবই ঢেউএ ভাসিয়া গিয়াছে। এখানিও বড় ছোট, একবারে পাঁচ-ছয় জনের বেশী লোক ধরিবে না। অথচ আর বেশী দেরী করা যায় না। আরো ভাটা পড়িলে হয়ত প্রবালশ্রেণীর জন্য নৌকা আগাইবে না।

নৌকাতে কিছু কিছু জিনিষ তুলিয়া তাহারা সেটাকে জলে নামাইল। তার পর কি জন্য সুশান্ত, অশোক প্রভৃতি একবার জাহাজের ভিতর নামিয়াছিল, উপরে আসিয়া দেখে, চমৎকার, নৌকাতে ততক্ষণ রঞ্জিৎ, কুণাল, কমলাক্ষ ও রোহিতাশ্ব চড়িয়া বসিয়াছে ও নৌকা ছাড়িবার আয়োজন করিতেছে! দেখিয়া সুশান্তর গা জ্বলিয়া উঠিল। রঞ্জিতের মতলব মোটেই ভালো নয়। তাহারা একবার ডাঙ্গায় উঠিতে পারিলে হয়, জাহাজের অবশিষ্ট প্রাণীর দিকে আর ফিরিয়াও চাহিবে না। সুশান্ত তীব্রকণ্ঠে কহিল—“ও কি হচ্ছে রঞ্জিৎ? সবাই পড়ে রইল, তোমরা আগে যাবে!” রঞ্জিৎ উত্তর দিল, “আমাদের যা খুসি কর্‌ব, তুমি বারণ করবার কে?”

“বটে? দেখি তোমরা কি করে যাও?”

এইবার কুণাল রুখিয়া উঠিল, জামার আস্তিন গুটাইয়া কহিল—“ওটার সঙ্গে কি এতক্ষণ ধরে বক্‌ছ? চল রঞ্জিৎ, আমরা বেরিয়ে পড়ি; তুমি উঠে যাও।” এই বলিয়া কুণাল সুশান্তকে এক ধাক্কা মারিল। সুশান্ত নৌকা হইতে পাশের একটা পাথরের উপর লাফাইয়া পড়িল। দলের মধ্যে সে-ই সব চেয়ে শক্তিমান্। পাথরের উপর পা চাপিয়া নৌকার গলুই দুই হাতে ধরিয়া বলিল—“যাও দেখি কেমন করে যাবে?”

কুণাল তখন একটা দাঁড় লইয়া সুশান্তর মাথার উপর মারিবার উপক্রম করিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া অশোক চোখের নিমেষে নৌকায় লাফাইয়া কুণালের দুই হাত চাপিয়া ধরিল। এদিকে ততক্ষণে শঙ্খচূড়, নীলাদ্রি, ধ্রুব, অসিত প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ বালকেরা নৌকায় উঠিয়া মারামারি করিবার উপক্রম করিয়াছে।

অশোক তখন মরিয়া হইয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুইদিকে দুই হাত বাড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিল—“কি হচ্ছে তোমাদের? এই কি ঝগড়া কর্‌বার সময়? এদিকে এই বিপদ্, কোথায় সবাই এক হয়ে পরস্পরের সাহায্য করবে, না এই সময় কর্‌ছ মারামারি!”

অশোকের মধ্যস্থতায় অবশেষে সকলে শান্ত হইল, এবং একে একে নৌকা হইতে নামিয়া

পড়িল। রঞ্জিৎও নামিল, তবে আর সকলের মত তার মুখের ভাব আবার স্বাভাবিক হইল না। গোম্‌ড়া মুখ লইয়া সে ডেকের উপর পায়চারী করিতে লাগিল।

জল এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পাহাড়ের আশেপাশে ভীষণ ঘূর্ণী। শেষে পাহাড়ের মাঝখান দিয়া নৌকা লইয়া যাইবার মত একটা বেশ সঙ্কীর্ণ প্রণালীও দেখা গেল। কিন্তু তখনও জলে ভীষণ টান। ভাটা শেষ হইয়া জল একেবারে স্থির হইতে বেলা দশটা এগারোটা বাজিবে। অশোক কহিল—"এস, আমরা খাওয়া সেরে নি।" এ প্রস্তাবে কারও আপত্তি ছিল না। সকলে মিলিয়া বিস্কুট, জ্যাম্ ও শুক্‌না মাংস খাইয়া লইল।

কিন্তু ভাটা যেন আর শেষ হয় না। অশোক চিন্তিত মুখে সুশান্তকে কহিল—"কি হবে এখন? ভাটা ত' এখনো কম্‌ল না!" সুশান্ত কহিল—"হুঁ, তাই ত' ভাবছি; আবার জোয়ার এসে পড়্‌লে আর আমাদের কোন আশা নেই!" অশোক কহিল—"নিশ্চয়, জোয়ার আসবার আগেই আমাদের জাহাজ ত্যাগ করতে হবে, কারণ এই নূতন জোয়ারে জাহাজ নিশ্চয় গুঁড়ো হয়ে যাবে।" সুশান্ত কহিল—"সে ত' বুঝি, কিন্তু এখন সবাই মিলে ডাঙ্গায় পৌঁছি কি করে? একটা ভেলা করারও উপায় নেই—জাহাজের ভাঙ্গা কাঠকুটো সব জলে ভেসে গেছে। আর হাতে সময়ও তো নেই!"

"তবে উপায়?"

"উপায় শুধু আমাদের এই নৌকাখানা। কিন্তু এতে ত' আর সবাই পার হতে পার্‌বে না! তাই ভাবছি আর একটা কাজ কর্‌লে হয়। জাহাজের এই মোটা দড়িগাছটা যদি কেউ একবার ঐ প্রবালগুলির একেবারে ওদিকে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে আসতে পারে তা হ'লে এই দড়ি ধরে আর কোমরে লাইফ-বেল্ট পরে আমরা সকলেই এইটুকু পথ পার হয়ে যেতে পারি। এখানকার ঢেউ ভীষণ হ'লেও জল বোধ করি এক বুকের বেশী হবে না। দড়ি ধরে যেতে পার্‌লে পাথরের উপর পড়ে মর্‌বারও ভয় থাক্‌বে না।"

"কিন্তু দড়ি ওদিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধবে কে? যে যাবে সে তো নাও ফিরতে পারে।"

সুশান্ত কহিল—"আমি যাব।"

অশোক অবাক্ হইয়া কহিল—"তুমি!" তার পর একটু থামিয়া কহিল, "তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

—"না, আমি একলাই যাব।"

আর সময় নষ্ট করা যায় না; একটা মোটাসোটা মজবুত দড়ি বাছিয়া লইয়া সুশান্ত নিজের কোমরের সঙ্গে বাঁধিল। তার পর অশোককে ডাকিয়া কহিল, "অশোক, আমি এই দড়ি নিয়ে সমুদ্রে নাম্‌লুম। আমি যেমন সাঁতার কেটে এগুতে থাক্‌ব, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছাড়্‌বে। দেখো, দড়ি

ছাড়্‌তে যেন দেরী ক'রো না, কারণ কি রকম প্রবল ঘূর্ণী ও জলমগ্ন পাথরের স্তূপের মধ্যে দিয়ে আমায় যেতে হবে তা তো বুঝ্‌তেই পার্‌ছ।" সুশান্তর সেই বীরোচিত কার্য্য দেখিবার জন্য ছেলেরা ডেকের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সমুদ্রের সঙ্গে সুশান্ত আজ প্রবল দ্বন্দ্ব করিতে অগ্রসর হইয়াছে। বড় বড় ঢেউ সেই নিবিড় শিলাখণ্ডের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চারিদিকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিতেছিল। মনন ত' দাদাকে কিছুতেই সমুদ্রে নামিতে দিবে না। শেষ পর্য্যন্ত সে কাঁদিয়াই ফেলিল। ছোট ভাইকে অনেক মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া আর দেরী না করিয়া সুশান্ত সমুদ্রের উপর লাফাইয়া পড়িল, তার পর ঢেউ কাটিয়া কাটিয়া প্রাণপণে তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জাহাজের অন্যান্য বালকেরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই অসমসাহসিক বীর বালকের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। এই বুঝি ছেলেটা পাথরে আছড়াইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়!

হঠাৎ দেখা গেল, সামনে একটা ঘূর্ণী, সুশান্ত সেটা পার হইবার জন্য প্রাণপণে লড়িতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। চোখের নিমেষে সুশান্ত সেই ঘূর্ণীর মধ্যে ডুবিয়া গেল—শুধু শোনা গেল একটা ক্ষীণ আর্ত্তস্বর—"অশোক!"

অশোক প্রস্তুত ছিল, চীৎকার করিয়া আর সকলকে ডাকিল। সকলে মিলিয়া তখন প্রাণপণে দড়ি টানিতে লাগিল। ভাগ্যে দড়ি বাঁধা ছিল! কোন রকমে অর্দ্ধচেতন সুশান্তকে জাহাজে টানিয়া তোলা হইল।

এখন উপায়? দড়ি ত' বাঁধা হইল না, এখন কেমন করিয়া তাহারা ডাঙ্গায় গিয়া উঠিবে? দেখিতে দেখিতে দুপুর গড়াইয়া বেলা বাড়িয়া চলিল। ভাটা শেষ হইয়া পুনরায় জোয়ার আসিয়া পড়িল। ডেকের উপর ছেলেরা জড় হইয়া নির্ব্বাক্ কণ্ঠে শূন্য দৃষ্টি লইয়া জোয়ারের বৃদ্ধি দেখিতে লাগিল। জোয়ারের সঙ্গে ঢেউএর জোরও বাড়িতে লাগিল। শেষে বেলা দুইটার সময় জোয়ারের টানে জাহাজ পুনবায় জলে ভাসিয়া উঠিল ও চারিদিকের পাথরের উপর ঠোকাঠুকি করিতে লাগিল।

হঠাৎ সকলে ভীষণ চীৎকার করিয়া পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। অদূরে এক পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ! ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে ঢেউটা একেবারে তাহাদের মাথার উপর আসিয়া পড়িল। জাহাজখানা সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি ফুট উচ্চে লাফাইয়া উঠিল ও এক মিনিটেই সেই সিকি মাইল-ব্যাপী শিলাস্তৃত প্রবালশ্রেণী অতিক্রম করিয়া একেবারে বালুময় উপকূলভাগে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িল।

ঢেউ সরিয়া যাইতে দেখা গেল জাহাজখানা শুষ্ক বেলাভূমির উপর কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেরা কেউ তেমন জখম হয় নাই। সামনেই সেই সুদূর-বিস্তৃত শুষ্ক ভূভাগ। (ক্রমশঃ)

ভারী একটা যুদ্ধের গল্প !

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

[বিলিতী ‘ওয়ার্-জার্ণাল্’ থেকে ছাঁকা নকল, তা ছাড়া যুদ্ধের গল্প পাব কোথায়, যুদ্ধ কি আর স্বচক্ষে দেখেছি ?]

“বুম্‌ম্ বুমুম্ বুম্—বুম্—বাম্—বোম্—!”

ঘন ঘন গর্জ্জন হ’তে থাকে।

আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই বোমারু প্লেন্‌দের কুচ্‌কাওয়াজে আকাশ ভ’রে যায়।

যেমনি না দেখা, যেই মাত্র না শোনা, গোবর্দ্ধন অম্‌নি চিৎপটাং হ’য়ে পড়েছে, এবং দাদাকেও ভূমিশয্যায় নিমন্ত্রণ করেছে।

“চট্‌পট্ শুয়ে পড় দাদা ! দেখছ কি ? শুয়ে না পড়লে ঘুমিয়ে দেবে, বুঝছ না ?”

হর্ষবর্দ্ধন অটল অবিচল—বড় বড় বিপদের সম্মুখে চিরদিনই তিনি চাঞ্চল্যহীন, গোবর্দ্ধনের কথাটা গেরাহ্যিই করেন নি।

“হ্যাঁ, শুয়ে থাক্‌বার জন্যেই যুদ্ধে আসা কিনা ? যুদ্ধে আসা চাট্টিখানি নয়। অমন কত বুম্ বুম্ হবে, কত কি না হবে, শুয়ে থাক্‌লেই চল্‌বে নাকি ? প্রাণ দিতেই আমি এসেছি, প্রাণ হাতে করেই বসে আছি, পকেটে ক’রে ফিরিয়ে নিয়ে যাব ব’লে আসি নি। তোর মত, শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়ার নাম যুদ্ধ করা নয়।”

“বুবুম বাবুম্—বাবুম্ বুবুম্—বুম্ বুমা বুম্ বুং !” তর্জ্জন-গর্জ্জনের তোড়-জোড় আরো বেড়েই চলে।

“শুলে না তো ? শুন্‌লে না তো ? আমাকেই ভুগতে হবে বেশ বুঝছি।” গোবর্দ্ধন আক্ষেপ কর্‌তে থাকে।

খানিকক্ষণ ধরে গর্জ্জন আর বর্ষণের পরে বোমারুরা বিদায় হয়। কিন্তু অম্‌নি দেখতে না দেখতে কোত্থেকে আবার এক ঝাঁক গোলা-গুলি এসে হাজির ! কোথায় যেন ওরা ওৎ পেতে ছিল !

দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতে গোবর্দ্ধনকে আবার চারিয়ে যেতে হয়।

“মাটি কর্‌লে ! মাটালে দেখছি ! দাদাটাই মাটালে !—” গোবর্দ্ধন শুয়ে শুয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে : “মাঠময় কর্‌লে একেবারে !”

“কেন বক্ বক্ কর্‌ছিস বল্ তো ?” হর্ষবর্দ্ধন ধম্‌কে উঠলেন।

“আর রক্ষে নেই দাদা ! বেশীক্ষণ বক্‌তে হবে না। যা গোলাগুলির তোড়্ ! অ রিভয়ার্, দাদা, অ রিভয়ার্ !”

“কি বল্‌ছিস্ ! য়্যাঁ ?”

“বিদায় নিচ্ছি দাদা, ফরাসী ভাষায় বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছে।” কাতরস্বরে গোবরা জানায় : “অ রিভয়ার্” ! মৃত্যুর মুখে শুয়ে থেকেও বিদ্যা জাহির করার সুযোগ সে ছাড়ে না।

“তার মানে ?” হর্ষবর্দ্ধন গজরান্।

“তার মানে হচ্ছে গুড্‌বাই ! ইংরিজি গুড্‌বাই,—ফরাসী ভাষায় গিয়ে অ রিভয়ার্ !”

গোলাগুলির খচ্‌খচানিতেও যতটা না হর্ষবর্দ্ধনের মেজাজ চড়েছিল, গোবর্দ্ধনের ব্যঞ্জনায় তার চেয়ে ঢের বেশী বিগড়ে যায়। খানিকক্ষণ তিনি গুম্ হয়ে থাকেন, তার পর বলেন, “পটাসিয়াম্ সায়ানাইড্।”

ভাষা-বিজ্ঞানে, জগতের বিভিন্ন ভাষা-জ্ঞানে, তিনিই বা কারু চেয়ে কম কিসে ? তিনি বলেন : “বেশ, তবে তাই হোক্, পটাসিয়াম্ সায়ানাইড্।”

“তার মানে ?” এবার গোব্‌রার জিজ্ঞাসার পালা।

“তার মানে গুড্‌বাই—যে কোন ভাষাতেই।”

হর্ষবর্দ্ধন, যদিও একবার যুদ্ধে গেছলেন, কিন্তু সেখান থেকে সশরীরে ফিরে এসে তাঁর ধারণা হয়েছিল আর তিনি ওধারে কখনো পা বাড়াবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রটা ভারী বিচ্ছিরি জায়গা—একেবারেই যাবার মত স্থান নয়। তিনি ভেবেছিলেন, এর পর থেকে দুধের সাধ ঘোলেই তিনি মেটাবেন, বাদ বাকী জীবনটা (এবং যুদ্ধে যখন আর যাচ্ছেন না, সে-সময়টাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হবে না) যুদ্ধের গল্প পড়েই কাটিয়ে দেবেন।

কিন্তু, এর-ওর-তার লেখা যুদ্ধের গল্প যত না পড়ে, তাঁর বিরক্তিই ধ’রে গেল বরং ! একটা গল্পে তিনি দেখ্‌লেন, একজন কম্যাণ্ডার্ (ইন্ চীফ্ কি ইন্ মিস্‌চীফ্ বলা যায় না) ভেউ ভেউ ক’রে কাঁদ্‌ছে ! দেখে তাঁর হাসি পেল, একটুও তাঁর সহানুভূতি জাগ্‌ল না,—না কম্যাণ্ডার না লেখক কারু ওপর। আর একটায় দেখ্‌লেন, একজন সৈনিক, গোলাগুলির ধাক্কা থেকে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে, আর কোন উপায় না পেয়ে অবশেষে একটা পিপের মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছে—কাছাকাছির মধ্যে সেইটাই খুব নিরাপদ ভেবেছিল হয়তো—তারপর দিন-সাতেক না পিপে-ফাই থেকে, খেতে না পেয়ে প্রাণের দায়ে বেচারী চিঁ চিঁ ডাক ছেড়েছে—এবং এইখানেই গল্প খতম্ ! এই কি পরে সেই কম্যাণ্ডার হয়েছিল না কি ? কে জানে ! এ দেখে তাঁর কান্না পেল, এই ভেবে

তিনি কেঁদে ফেল্‌লেন, এই সৈনিকই যদি সেই কম্যাণ্ডার না হয়ে থাকে তা হ'লে এককালে যা-একজন হবে ভাব্‌তেও ভয় করে। কে কি হবে বলা তো কঠিন। লেখক হ'লে হয়ত গাঁজার কল্‌কে ফিরি করে ফির্‌তে পার্‌ত; কিন্তু বলা যায় না, কম্যাণ্ডার হ'লে, এ চাই কি, কান্নাকাটি করেই কেবল ঠাণ্ডা হ'ত না, হয়তো কোমর বেঁকিয়ে, যুদ্ধের মহড়া দিতে দিতেই, বীরত্বের তাল ঠোকার সাথে সাথেই, নাচ-গানের তালও সাম্‌লাতে পার্‌ত! এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সে কী ভয়াবহ বিচ্ছিরি দৃশ্য, ভাবো দিকি!

যাই হোক্, গোবর্দ্ধনকে ডেকে তক্ষুণি তক্ষুণি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন: "বুঝ্‌লি রে গোব্‌রা, এই সব যুদ্ধ্-মার্কা গল্প কারা লেখে জানিস্? যত সব বুদ্ধ্-মার্কা লোক।"

"আবার তার চেয়েও যারা বোকা, তারাই সেই সব গল্প পড়ে।" গোবর্দ্ধন দাদার দিকে কটাক্ষ করেই কথাটা বলে। "কী বল দাদা?"

হর্ষবর্দ্ধন কথাটা গায়ে মাখেন না। গায়ে লাগান না কথাটা। মারটা খেতে হ'লে চারিয়েই খেতে হয়, তা হ'লে আর গায়ে লাগে না, তারিয়েও খাওয়া যায়।

তিনি বলেন: "হ্যাঁ, আবার তার চেয়েও যারা বোকা, তারাই কিনা যুদ্ধে যায়। যেমন—যেমন আমরা গেছ্‌লাম।"

কথাটা তিনি ভালো করেই গায়ে মাখেন। মেখে নেন্ এবার। গোব্‌রাকে, গোব্‌রার প্যাঁচেই ঘাল ক'রে তিনি পুলকে নাজেহাল্ হ'য়ে পড়েন।

কিন্তু তিনি—তিনিও ভাব্‌তে পারেন নি, যে, সেই তিনি—তিনিই আবার যুদ্ধের দিকে পা বাড়াবেন! গোবর্দ্ধনকে সঙ্গে নিয়ে আবার তাঁকে যুদ্ধযাত্রা কর্‌তে হবে, এ-তাঁর কল্পনার বাইরেই ছিল যে! খুব দুরন্ত দুস্বপ্নের বাইরেই ছিল!

তবু সেই দুর্ঘটনাই ঘটে গেল একদিন।

একটা সৈন্য-সংগ্রহের সভায় গিয়ে, কেবল মজা দেখ্‌তে গিয়েই, কি ক'রে কক্ষচ্যুত হয়ে, তিনি একেবারে ওয়াজীরিস্থানের সীমান্তে গিয়ে উপনীত হলেন, মিলিটারী সাজ-পোষাকে গুল্‌জার্ হয়েই হাজির হলেন, তার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক। এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে, কেবল হাজির হওয়াই না, হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, কি কেরামতি দেখিয়ে কে জানে, সামান্য যুদ্ধজীবীর বিপদ্ থেকে অসামান্য সেনানায়কের পদে তিনি সমুত্থিত হয়ে গেছেন!

কি ক'রে হলেন তা কী ক'রে বল্‌ব! যুদ্ধক্ষেত্রে স্বভাবতঃই এটা ঘটে থাকে, নিশ্চয়ই ঘটে, আক্‌চার্‌ই ঘট্‌ছে; তা নইলে যুদ্ধের গল্পে কি এ সব মিথ্যে লেখে নাকি? এই বেড়াল বনে গেলেই বনবেড়াল হয়, তাই নগণ্য হর্ষবর্দ্ধন, ওয়াজীরিস্থানে মজুৎ হওয়া মাত্রই, জিরতে না জিরতেই যে সেনানায়ক ব'নে যাবেন, সে আর বিচিত্র কী? না হলেই বরং বিস্ময়কর হ'ত!

যুদ্ধক্ষেত্রে তো গেছেন. তিনি এবং তাঁর ভাই গোব্‌রা, তাঁর লেফ্‌টেন্যাণ্ট্, বাঁদিকেই রয়েছে। তাঁরা দু'জনে মিলে সীমান্তের একটা ঘাঁটি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছেন, এমন সময়ে—

এমন সময়ে আর কি! একটু আগেই, এই গল্পের গোড়াতেই যা পড়েছ। যুদ্ধক্ষেত্রের যা রেওয়াজ, তোমাদের তো আর অজানা নেই, চারধার থেকেই জোর সোর-গোল পড়ে গেল: "বাবুম্ বুবুম্ বুম্!···বুম্ বুম্!···ব্যবম্ ব্যবম্—ব্যোম্।—"

আবার কি? বোমারু বিমানের হৈ-চৈ পড়ে গেল হঠাৎ।

গোবর্দ্ধনের ভারী খারাপ লাগছিল, পরিস্থিতি এবং দাদা—দু'জনকেই লক্ষ্য ক'রে না ব'লে সে পার্‌ল না: "যুদ্ধের গল্প পড়্‌ছিলে, পড়্‌ছিলে—বেশ ছিলে, এখন ঠেলা বোঝ!"

"দেশের জন্য প্রাণ দেব, তাই দিতেই এসেছি। ঠেলা বোঝাবুঝি আবার কি?" হর্ষবর্দ্ধন খাপ্পা হয়ে গেছেন।

"দেশের জন্যেই দাও আর বিদেশের জন্যেই দাও, প্রাণ তোমায় দিতেই হবে।" গোবর্দ্ধন ভালো ক'রে দাদাকে সম্‌ঝিয়ে দেয়: "না দিয়ে পরিত্রাণ নেই। দেখছ তো কি রকম বাবুম্ বুবুম্! চারধারেই কি রকম! বাব্‌বাঃ! ঠিক যে রকম বইয়ে-টইয়ে পড়া যায়।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁই পাঁই ক'রে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল। কেবল এরোপ্লেন আর এরোপ্লেন। বোমারু বিমান যত না! আর তাদের ভেতর থেকে ছিট্‌কে-ছট্‌কে, ওল্‌টাতে-পাল্‌টাতে, ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে, হর্‌দম্ আর ভর্‌দম, কেবলি বেরিয়ে আস্‌ছে, আর কিছু না, বুবুম্ বুবুম্ বুম্! বুমুম্ বুম্! একটানা বুমৎকার! 'ওয়ার্ বুম্' যাকে বলে!

হর্ষবর্দ্ধন ঘাড় কাৎ ক'রে একবার দেখেন: "আমার যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে রে! এগুলো শত্রুপক্ষের বিমান বটে তো? না, আমাদের দলেরই—ভুল ক'রে আমাদের কাছেই গুল্ ঝাড়ছে!"

"আমাদের দলের হ'লে কখনো এত বোমার ছড়াছড়ি করে? অন্ততঃ আমাদের দিকে ছড়ায় কখনো? তারা তো অন্য চালও দিতে পার্‌ত। পার্‌ত নাকি?"

"তা বটে! কিন্তু আমি ভাব্‌ছিলাম কি, আসল রণক্ষেত্র তো এখান থেকে অনেক—অঢেল্ দূরে! এ তো সবে মাত্র ওয়াজিরিস্থান—আমাদের নর্থ-ওয়েষ্টার্ন্ ফ্রন্‌টিয়ার্—এ তো আর সেই ওয়েষ্টার্ন্ ফ্রণ্ট্ নয় ভায়া!"

"নাই বা হ'ল! আর হ'লেই বা কি হয়? যুদ্ধ কি তোমার জিওগ্রাফি মানে? বলে, ইতিহাসকেই তোমার উল্‌টে পাল্‌টে দিচ্ছে!" গোবর্দ্ধন জানায়।

যাক্, খানিকক্ষণ পাখা ঝটাপটি ক'রে, যেমন ওদের দস্তুর, একটু মজা ক'রে বুমাবুম্ বাধিয়ে, বোমারুরা তো কেটে পড়্‌ল। হর্ষবর্দ্ধনও হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। গোবর্দ্ধন কপালের ঘাম মুছে ফেল্‌ল। মুছ্‌বার সুযোগ পেল।

হর্ষবর্দ্ধন তখন হাঁটু গেড়ে ব'সে ফিল্ড্-গ্ল্যাস্ চোখে লাগিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের তদারকে লাগ্‌লেন।

এই অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিরা বড় সুবিধের নয়। যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তেম্‌নি দূর-দর্শী। পুরু লতাগুল্মের আড়ালে দিব্যি ওরা আরামে লুকিয়ে থাকে, আর এ-ধারে উপত্যকায় এ-পক্ষের লোকজন দেখ্‌তে পেলেই, আর কথা নেই, লক্ষ্যভেদ ক'রে বসে আছে। ফাঁক পেলেই তাক্ করবে, আর তাক্ পেলেই ফাঁক ক'রে ছেড়ে দেবে। এ-বিষয়ে একেবারে ওরা অব্যর্থ!

এদের নিয়ে হর্ষবর্দ্ধন বেশ একটু মুস্কিলেই পড়েছিলেন।

কোথায় যে ওরা ঘাপ্‌টি মেরে চুপ্‌টি ক'রে রয়েছে বুঝ্‌বার যো নেই, অথচ, মাঝ্‌খান থেকে, দিব্যি দু'চার জন ক'রে মাঝে মাঝে ওঁদের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর সেনানীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতাহাতি লড়াই করতে প্রস্তুত, সম্মুখ-যুদ্ধে মজ্‌বুৎ ওরা, কিন্তু কাদের সঙ্গে লড়্‌বে? সাম্‌নে কাউকে পেলে তো! কোত্থেকে যে গুলি আসে আর কোন্‌খান দিয়ে কার যে মাথার খুলি ছিট্‌কে নিয়ে যায়, সেই এক সমস্যা!

তাই হর্ষবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধনকে লেজে বেঁধে, হন্তদন্ত হয়ে, নিজেই আজ তদন্ত করতে বেরিয়েছেন।

বুম্‌বাম্-ওয়ালাদের উপদ্রব অন্তর্হিত হ'লে মাটির ওপর নীল্ ডাউন্ হয়ে, ফিল্ড গ্ল্যাস্‌টি তিনি চোখে লাগিয়েছেন। হঠাৎ কোত্থেকে আবার এক ঝট্‌কা ছর্‌রা এসে হাজির। গুলির ছর্‌রা—দেখ্‌তে না দেখ্‌তে!

গোবর্দ্ধন পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তৎক্ষণাৎ চিৎপাৎ হ'য়ে পড়েছে: "দাদা, দাদা! শুয়ে পড়, গুলি দাগ্‌ছে, গুলি!"

হর্ষবর্দ্ধন কথাটা কানেই তোলেন না।

আবার আর এক চোট্ গুলিবর্ষণ হয়। বল্‌তে না বল্‌তেই হ'য়ে যায়।

"বল্‌ছি কি, শুন্‌ছ না? আফ্‌রিদিরা বন্দুক হাঁকড়াচ্ছে! হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কী?" গোবর্দ্ধন গর্জ্জন করে।

হর্ষবর্দ্ধন তথাপি নড়েন না। যেমন কর্‌ছিলেন তেম্‌নি এক দৃষ্টে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে চলেন।

সাঁই! সাঁই!! ওঁদের চার ধারেই বুলেট্‌রা শন্ শন্ ক'রে এসে শীষ্ দিতে দিতে চলে যায়। দম্ দম্ বুলেট্ যত! হর্ষবর্দ্ধন কিন্তু গ্রাহ্যই করেন না।

"ডোবালে দেখ্‌ছি!" গোবর্দ্ধন শুয়ে শুয়ে প্যাচাল্ পাড়ে।

হর্ষবর্দ্ধন, একবার মাত্র চোখ তুলে, গোবর্দ্ধনের দিকে চকিত এক কটাক্ষে বিরক্তিব্যঞ্জক একখানা দৃষ্টিবাণ হেনে, আবার নিজের কাজে মন দিয়েছেন।

এবারে ঝমাঝম্ ক'রে গুলিরা আসতে থাকে। শ্রাবণের ধারা-বর্ষণের মত এসে পড়ে।

"গেছিরে বাবা! গোল্লায় গেছি!" গোবর্দ্ধন বলে: "আমি না গেলেও তুমি তো গিয়েছ! কয়েক ইঞ্চির জন্যে ওদের ফস্‌কে যাচ্ছে কেবল! তোমার খুলিটা লোকেট্ করতে যা দেরি হচ্ছে।"

হর্ষবর্দ্ধন তথাপি নট্ নড়ন্-চড়ন্! তবুও কোন হুঁস্ নেই ওঁর।

"ধুত্তোর্!" গোবর্দ্ধনের মেজাজ চড়ে যায়: "কী ওই জাঁদ্‌রেল্‌পণা হচ্ছে? মিনিট্‌খানেকের মধ্যেই সাবাড় হয়ে যাবে যে! দেখতে পাচ্ছ না, ওরা প্রায়-তোমাকে বাগিয়ে এনেছে। পেলে ব'লে!"

"তবে তাই হোক্!" হর্ষবর্দ্ধন ফেরেন এবার: "তুই যা বল্‌ছিস্ তাই করি।"

বল্‌তে না বল্‌তে, কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে খসেছে কি খসে নি, বুলেটের ধাক্কায় তাঁর মাথার টুপি উড়ে যায়। এবং এর পর গোবর্দ্ধনকে আর কিছুই বল্‌তে হয় না, আর কোন উপদেশের প্রয়োজন হয় না; কারো কথার তোয়াক্কা না ক'রে তড়াক্ ক'রে হর্ষবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ কাৎ হয়ে গেছেন।

"এতক্ষণ কি বল্‌ছিলাম তবে?" গোবর্দ্ধন বাহাদুরি নেয়: "বল্‌ছিলাম না যে আর একটা গুলির ওয়াস্তা কেবল?"

হর্ষবর্দ্ধন বোকার মত একটু হাসেন: "ভ্রাতঃ, ভ্রাতঃ গোবর্দ্ধন! সত্যিই তুই আমাকে ভালোবাসিস্। আমার জন্যে প্রাণ দেওয়া তোর পক্ষে কিছু না, আমি জানি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তোর নিজের জন্যেই আমার প্রাণটা তুই রাখতে চাস্।"

"চাই না ছাই!" গোবর্দ্ধন গজ্ গজ্ করে: "কেন, তুমি ম'লে কি আমি অনাথ হয়ে যাবো, তুমি ভাবো? আমার তিন কুলে কেউ থাক্‌বে না আর?"

"না না, তা কেন? তা কি আমি বল্‌ছি?" হর্ষবর্দ্ধন বলেন: "তবু যে তুই আমার ভালো-মন্দ দেখ্‌ছিস্, এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেও, এটা কি বড় কম কথা? তোর পক্ষে কি কম প্রশংসনীয়?"

"ভালো-মন্দ না কচু! স্থানে-অস্থানে একটা গুলি এসে লাগলে কী হ'ত খেয়াল আছে?"

"বড় জোর মারা যেতাম, এই তো? তা ও রকম গুলি লাগেই, যুদ্ধ করতে গেলে লেগেই যায়, না লেগেই পারে না। তার জন্যে ভাবি না, কিন্তু তুই যে এতখানি আমার জন্যে ভেবেছিস্, এতেই আমি—"

"মারা গেলে তো বাঁচতুম!" গোবর্দ্ধন বাধা দিয়ে বলে: "সেই কথাই আমি ভাবছিলুম কিনা! কিন্তু খুন না হয়ে যদি জখম্ হ'তে, হয়ে যেতে দৈবাৎ, তা হ'লেই হয়েছিল আর কি!

গিয়েছিলাম আমি! তা হ'লেই তোমার ওই পাকা তিন মণ কাঁধে ক'রে সেই সাত মাইল্ দূরের হাসপাতালে বয়ে নিয়ে যেতে হ'ত আমায়। বাবা গো! আমাকে আর দেখ্তে হ'ত না! আমার হয়েছিল তা হ'লে, সুখ আর ধর্‌ত না আমার!"

হর্ষবর্দ্ধন একটুক্ষণ চুপ্ ক'রে থাকেন। গোব্‌রার বক্তব্যটা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তেই তাঁর সময় লাগে। অবশেষে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলেন: "ও রকম বইতেই হয়। যুদ্ধ তবে বলেছে কেন? ভারী ভারী যুদ্ধের বোঝা কি কম?"

তাঁর মুখ থেকে কেবল এই ক'টি কথা বার হয়, আর্ত্তনাদের সুরেই বেরিয়ে আসে।

"যুদ্ধ তো ভারী!" গোবর্দ্ধন জবাব দেয়: তুমি নিজে কেমন ভারী সেটা তো দেখছ না! যা একখানা লাশ বানিয়ে তুলেছ নিজেকে! ওই চেহারার ওপরও আরো চার বেলা রুটি-মাংস গিলে গিলে যা তুমি হ'তে চলেছ দিনকে দিন! বল্‌তে কি, তুমিই যুদ্ধটাকে আরো ভারী ক'রে তুলেছ, দাদা!" গোবর্দ্ধনও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দেয়।

"তা হ'লে—তুই যখন হাল্‌কা থাক্‌তেই চাস্—আমার বোঝা বইতে যখন তুই নারাজ তা হ'লে—তা হ'লে—" হর্ষবর্দ্ধন একটু থামেন।

"অ রিভয়ার্"—গোবর্দ্ধন ধরিয়ে দেয়।

'না না'—হর্ষবর্দ্ধন সংশোধন করেন; করুণ কণ্ঠে তাঁর শেষ বিদায়-বাণী উচ্চারিত হয়: "তা হ'লে পটাসিয়াম্—চিরদিনের জন্যই পটাসিয়াম্ সায়ানাইড্!"

ডাক্তারি প্রহসন

[সত্য ঘটনা]

শ্রীরেণুকণা শূর

আমার কাকাবাবু উত্তর বিহারের একটি ছোট সহরে ডাক্তারি করেন। ছুটীতে তাঁরই ওখানে বেড়াইতে আসিয়াছি। সেখানকারই দু'টি ঘটনার কথা বলিব।

একদিন ভিতর হইতে বাহিরে ডাক্তারখানায় বিষম গণ্ডগোল শুনিয়া কাকাবাবুর পিছন পিছন বাহিরে আসিয়া দেখি এক বিরাটমূর্ত্তি কাবুলির সহিত কম্পাউণ্ডার বাবুর বিষম বচসা বাধিয়া গিয়াছে। কাকাবাবুকে দেখিয়া কাবুলি উত্তেজিতভাবে বাজখাঁই গলায় যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে সে আগে অনেক বার

এই দোকান হইতে 'লাগাড্ডু' নামক ঔষধ লইয়া গিয়াছে, আর আজ 'কঁপোটার বাবু' বলিতেছেন যে ও নামে কোন ওষুধ নাই! "আপকো কঁপোটার কুচ্ছ্ নেই জান্‌তা।"

কাকাবাবু তার কথা ধীরভাবে শুনিয়া হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন সে কি অসুখের জন্য লাগাড্ডু চায়। কাবুলি জবাবে বলিল, "পিঁড়ুই হুয়া, পিঁড়ুই। জড়াইয়াকা সাথ হোতা হ্যায়।" কাকাবাবু কি ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাকে এক বোতল 'ডি.গুপ্ত' দিতে বলিলেন। ঔষধ পাইয়া কাবুলি মহাখুসি—"হ্যাঁ, ঠিক এহি হ্যায়।"

এতক্ষণে বুঝিলাম যে তাহার লাগাড্ডু অর্থে ডি.গুপ্ত, পিঁড়ুই অর্থে প্লীহা। জ্বরের সঙ্গে প্লীহা বাড়ে তাই ডি.গুপ্ত দরকার। মনে মনে ভাবিলাম, বাবাঃ, যেমন কাবুলি রোগী, তেমনি তার অভিনব রোগ 'পিঁড়ুই' আর তেমনি তার জবরদস্ত দাওয়াই 'লাগাড্ডু'।

* * *

আর একদিনের ঘটনা।

"বাবু, চার আনা কো দাওয়া দিজিয়ে"—বলিয়া একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটি দেহাতি, ভিন্ গাঁয়ের।

"কি ওষুধ দেব?"—কম্পাউণ্ডার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি অম্লানবদনে বলিল, "ভোর পড় গৈল", অর্থাৎ ওষুধের নাম সে ভুলিয়া গিয়াছে। এমন সময় কাকাবাবু আসিয়া পড়িলেন। তখনও তার দাওয়ার নাম 'ভোর পড় গৈল'। কাকাবাবু তাহাকে ভাবিতে সময় দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তার ঔষধের নাম মনে পড়িল বটে কিন্তু বলিতে বড় 'সরম' লাগিল, কহিল, "অত কঁ—হি—, সরম লাগতা।"

ওষুধের নাম বলিতে লজ্জাবোধ হওয়া নতুন বটে। কাকাবাবু এক ধমক দিলেন, তখন সে সলজ্জে জানাইল—"ফলটাঁশ"।

কাকাবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে 'পটাশ্ আয়োডাইড্' দিতে বলিলেন। আমাদের পরে বুঝাইয়া দিলেন—ফলটাঁশের 'ল' বাদ দিলে দাঁড়ায় 'ফটাঁশ' অর্থাৎ 'পটাশ'। এ অঞ্চলের লোকেরা এ ওষুধটি খুব ব্যবহার করে।

কাকাবাবুর কাছে শুনিলাম এ রকম নিছক ভুল বাদ দিলেও এ দেশের লোক কতকগুলি ওষুধের একটু 'বিশুদ্ধ' নামকরণ করিয়া লইয়াছে ; যেমন—'তিন চার আদমি' বা 'টিরিন টি' অর্থাৎ টিংচার আয়োডিন, 'আর্গান ফারাস' বা 'আদাম ফারাস' অর্থাৎ আয়োডোফর্ম্ম। 'আয়োডাইড্ অব্ পটাশ' ও 'ডি.গুপ্তের'ও আর একটি করিয়া নাম আছে—'আঁটা পরসাদ' এবং 'শ্রী দিগু পত্তর'।

লাল কোর্ত্তার দল

শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়, বি.এস্-সি

সহরে নতুন একটা সমিতি গঠিত হয়েছে ; কে জানে কি মতলব এদের ! ভাব-গতিক বেশ সন্দেহজনক। পুলিশের গোয়েন্দা জন্সন্ খুড়োর ওপর ভার পড়েছে আজই এদের খবর যোগাড় করতে হবে—আজই নাকি এদের একটা গোপন সভা বসবে।

সহরের উপকণ্ঠে এক পোড়ো বাড়ীতে সভা। জন্সন্ পৌঁছে দেখ্লেন সভার কাজ সুরু হয়ে গেছে। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক উপস্থিত। একজন সুদীর্ঘ গুম্ফবিশিষ্ট ভদ্রলোক তখন বক্তৃতা দিচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে জন্সন্ অস্ফুটস্বরে বল্লেন, "আরে, এ যে সেই ফিফ্‌টিফোর্থ্ ষ্ট্রীটের টড্‌হাণ্টার কোম্পানীর দোকানীটা! দোকানদারী ছেড়ে আবার রাজনীতি ধরলে কেন? এ সখ ত' ওর ছিল না!" ফিফ্‌টিফোর্থ্ ষ্ট্রীটে টড্‌হাণ্টারের পুরোনা কাপড়ের দোকান। পুরোনো জামা-কাপড় কেনাবেচার দোকান ও অঞ্চলে আরও কয়েকটা আছে।

লোকটি ততক্ষণে তার জ্বালাময়ী ভাষায় নানা রকম অনাচারের উল্লেখ ক'রে সভাশুদ্ধ লোককে উত্তেজিত করে তুলেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলকে নিজেদের জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে

সচেতন হ'তে অনুরোধ করছিল। এর পর সে ঘর কাঁপিয়ে ষ্টেট্ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ল। পৃথিবীর কোন দেশের কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার সুতীব্র আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না। পরিশেষে বক্তা বল্ল যে তাদের এই "লাল কোর্ত্তা বাহিনী" দেশকে এক সম্পূর্ণ নতুন পথে নিয়ে যাবে, আর লাল কোর্ত্তা বাহিনীর নিদর্শন হবে লাল কোট। এই লাল কোট দেখেই সভ্যেরা পরস্পরকে চিনে নেবেন। লোকটি আরও জানাল যে সভ্যদের সুবিধার জন্য সে চল্লিশটি লাল কোট আনিয়ে রেখেছে। সভ্যেরা ইচ্ছা করলে মাত্র চারটি ডলার খরচ করলেই একটা ক'রে কোট পাবেন। সভ্যদের আর কোন চাঁদা দিতে হবে না।

বলা বাহুল্য সকলেই একটা ক'রে কোট নিলে, জন্সন্ খুড়োকেও একটা নিতে হ'ল। অতঃপর সভাপতি ও বক্তাদের ধন্যবাদ আদান-প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হ'ল। জন্সন্ খুড়ো ফিরে এসে রিপোর্ট দিলেন—"লাল কোর্ত্তা বাহিনী একটা সাংঘাতিক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান।" পুলিশের বড় সাহেব সেই দিনই উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করবার অনুরোধ করে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিলেন।

* * *

ঠিক সেই সময়ে ফিফ্‌টিফোর্থ্ ষ্ট্রীটে টড্‌হাণ্টার তার সহকারী জিম্‌কে ধমকাচ্ছিল : "দেখ জিমি, তোমাকে এই শেষ বার বলে দিচ্ছি, ফের যদি তুমি আমাকে না ব'লে এক রাশ ঐ সব পুরোনো সেকেলে কোট কিনবে তা হ'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। জান, ঐ চল্লিশটা পচা কোট্ বিক্রী করতে আমাকে আজ কি মেহনৎটা করতে হয়েছে?" *

গবেষণা

[কুড়ান' গল্প]

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

সামন্তরাজ উদয়নের সভার পণ্ডিতদের বিদ্যা-বুদ্ধির ভারী খ্যাতি। এমন কি সম্রাট্ বহুবিক্রমের কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে। রাজা-রাজড়াদের যা স্বভাব, বহুবিক্রম ঠিক করিলেন,

* বিদেশী গল্প থেকে।

দাঁড়াও, উদয়নের সভাপণ্ডিতদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সম্রাট্ উদয়নের নিকট পত্রসহ দূত পাঠাইলেন।

পত্র পাইয়া উদয়ন, তাঁহার মন্ত্রীবর্গ ও সভাসদ্ পণ্ডিতগণ সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। চিঠিতে সম্রাট্ আদেশ দিয়াছেন আগামী ভাদ্র পূর্ণিমার মধ্যে উদয়ন রাজকে তাঁহার মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের সাহায্যে পৃথিবীর মধ্যস্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে। ঐ মীমাংসা শুনিবার জন্য সম্রাট্ সদলবলে উদয়নের রাজধানীতে হাজির হইবেন।

সবাই বিচলিত হইল, শুধু রাজবিদূষক দীর্ঘশিখের মুখের হাসি মলিন হইল না।

এক সপ্তাহ ধরিয়া সুদীর্ঘ বিতণ্ডা, গবেষণা ও অধ্যয়ন চলিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা সমস্যার কোনও সমাধান করিতে পারিলেন না। রাজা উদয়ন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

হঠাৎ একদিন বিদূষক আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিব।" রাজার নিকট হইতে প্রচুর পাথেয় গ্রহণ করিয়া বিদূষক পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল আবিষ্কারার্থ রাজসভা হইতে কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন প্রায় আসিয়া পড়িল। কিন্তু বিদূষকের খোঁজ নাই। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বয়ং বিদূষকের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তো তাঁহার চক্ষুস্থির। বিদূষকপ্রবর এই কয়দিন গবেষণা কার্য্যের পরিবর্ত্তে আহার ও নিদ্রার কার্য্যেই বিশেষভাবে মন দিয়াছেন। রাজাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বিদূষক কহিলেন, "মহারাজ, আমার সমস্যার সমাধান ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে।"

আজ রাজবাড়ীতে মহা সমারোহ। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বাহির হইবে। সম্রাট্ সদলবলে আসিয়াছেন। পাত্রমিত্রের দল, পণ্ডিতের দল এবং জনসাধারণ সমবেত হইয়াছে।

পথপ্রদর্শক বিদূষক আগে আগে চলিলেন। তাহার পরে সম্রাট্ ও রাজা উদয়ন। তাহার পর প্রতি শ্রেণীতে দুই জন করিয়া অমাত্য সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর মধ্যস্থল দেখিতে রওনা হইলেন।

ক্রমে সকলে বিদূষকের বাড়ীর খিড়কীর জঙ্গলে আসিয়া হাজির হইলেন। সামনেই দেখা গেল একটা লম্বা বাঁশ পোঁতা,—তাহার উপর পত পত করিয়া পতাকা উড়িতেছে। বিদূষক সহসা দৌড়িয়া গিয়া সেই বাঁশের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "রাজরাজেশ্বর, এই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল।"

সম্রাটের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। অলক্ষ্যে তলোয়ারে হাত পড়িল। বিদূষক পূর্ব্বেই ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া নিরাপদ জায়গায় সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার গলবস্ত্র হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাসম্রাট্, যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয় তাহা হইলে আপনার মন্ত্রীগণকে পৃথিবীর যে কোন দুই প্রান্ত হইতে এই স্থান মাপিতে আজ্ঞা দিন। তাহা হইলেই বুঝিবেন আমার কথা ঠিক

কিনা।" বিদূষকের এই প্রস্তাবে সম্রাটের মন্ত্রীগণের মুখের উপর কালো ছায়া নামিল। সম্রাট্ নিজেও ভারী বোকা বনিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি গুণীর আদর জানিতেন; "তোমারই জিৎ"—বলিয়া হাসিয়া নিজের গলা হইতে বহুমূল্য রত্নমালা খুলিয়া বিদূষকের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তিমির ব্যবসা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

যুদ্ধের সময় খাদ্য-সমস্যা একটা বড় সমস্যা। শুধু সৈন্যেরাই নয়, বেসামরিক লোকেরাও কি খাইয়া বাঁচিবে এই ভাবনায় দেশের গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতে হয়। সব দেশে সব রকম খাবার জোটে না—দরকার মত বিদেশ

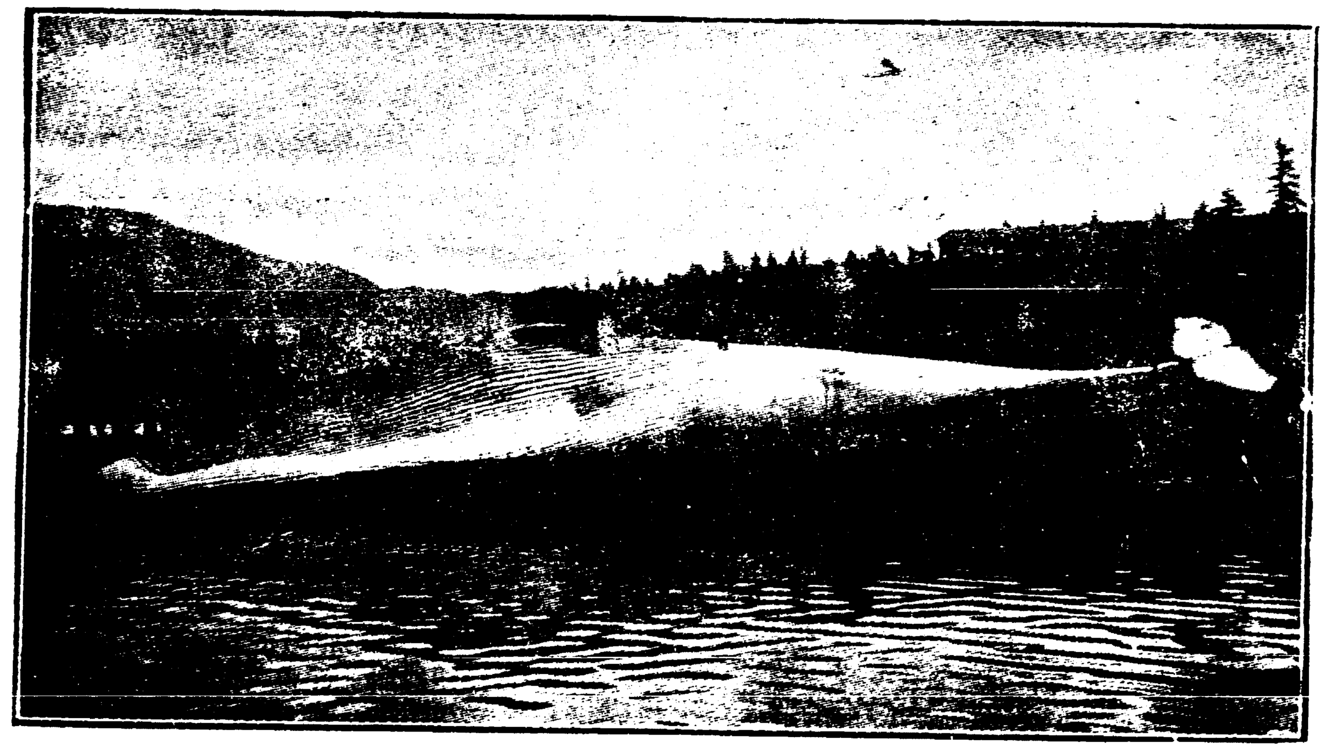

একটি বিরাট্ তিমি। এর মাংসে কয়েক হাজার লোককে তৃপ্তি করিয়া খাওয়ান যায়।

হইতে আমদানী করিতে হয়; আর এই আমদানী কাজটাও এই সময়ে বড় সহজ ব্যাপার নয়। শত্রুপক্ষ সর্ব্বদাই ওৎ পাতিয়া আছে, সুবিধা পাইলেই খাবার বোঝাই বিপক্ষের জাহাজগুলি ডুবাইয়া দিবে। ভাবখানা—দেখা যাক্, পেটে টান পড়িলে ওরা ক'দিন যুদ্ধ চালায়!

সাধারণ খাবার যোগাড় করা যখন নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে তখন দেশের কর্ত্তাদের অন্য রকমের অপ্রচলিত খাদ্যের (বা অখাদ্যের) শরণ লইতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে অখাদ্যকে খাদ্য করা যায় কিনা বৈজ্ঞানিকেরা তাই লইয়া মাথা ঘামাইতে সুরু করেন।

তোমরা গত বারে পড়িয়াছ, ১৮৭১ সনে যখন জার্ম্মান্‌রা প্যারিস সহর অবরোধ করে তখন ফ্রান্সের লোকেরা বাধ্য হইয়া ঘোড়ার মাংস খাইতে সুরু করিয়াছিল। এর আগে ওদেশে ঘোড়ার মাংস খাওয়ার মোটেই রেওয়াজ ছিল না,—কিন্তু পেটের দায়ে অনেক কিছুই করিতে হয়।

ইয়োরোপের লোকেরা ভয়ানক মাংসখোর। অন্য যত রকম খাবারই

তিমির নিঃশ্বাসে ফোয়ারার মত সমুদ্রের জল উপরে উঠিয়াছে।

দাও না কেন, মাংস না হইলে তাদের তেমন যুৎ হয় না। বৈজ্ঞানিক নানা রকম হাঙ্গামা পোহাইয়া নতুন নতুন খাদ্য উদ্ভাবন করেন—কিন্তু তবু লোকেরা 'হা মাংস হা মাংস' করিয়া অস্থির।

গত মহাযুদ্ধের সময়েও নানা ধরণের নতুন নতুন জন্তুর মাংস মানুষের খাদ্য-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিল। তার মধ্যে তিমি একটি।

তিমিকে চলতি কথায় আমরা তিমি মাছ বলি, কিন্তু আসলে যে তিমি মাছ

নয়, স্তন্যপায়ী জন্তু, তা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। মাছেদের মত তিমিরা জলের তলায় নিঃশ্বাসও লইতে পারে না, নিঃশ্বাস লইতে হইলে তাদের জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে হয়। নিঃশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিমির নাকের হাওয়ায় সমুদ্রের জল ফোয়ারার মত উপরের দিকে ছিটকাইয়া উঠে, তাই দেখিয়া বুঝা যায় ঐখানে তিমি আছে। তোমরা যখন বড় হইয়া কালিদাসের মহাকাব্য 'রঘুবংশ' পড়িবে তখন তার মধ্যে এই তিমির জল ছিটান'র একটা ভারী সুন্দর বর্ণনা পাইবে।

তিমি আকারে, পৃথিবীতে যত রকম জলজন্তু বা স্থলজন্তু আছে তাদের মধ্যে, সকলের চেয়ে বড়। ৩০।৪০ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ৭০।৮০ ফুট লম্বা তিমিও দেখা যায়। ওজনেও এক একটা হাজার—দু' হাজার—চার হাজার মণ পর্য্যন্ত হয়। ৬০০০ মণ ওজনের তিমির কথাও শোনা গিয়াছে। এমন একটি বিরাট্‌কায় জীবের মাংস যদি খাওয়ার উপযোগী হয় তবে তা দিয়া না জানি কত বুভুক্ষু মানব-সন্তানের মাংস-ক্ষুধা দূর করা যায়!

গত মহাযুদ্ধের সময় যখন ইয়োরোপে মাংসের চাহিদা ভীষণ রকম বাড়িয়া গেল তখন আমেরিকার একদল ব্যবসায়ী তিমির মাংস চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিমি কয়েক জাতের হয়। তাদের মধ্যে কতকগুলির দাঁত আছে; এগুলি আকারে ছোট কিন্তু বড় বদ্‌মেজাজী। আর এক রকম অতিকায় তিমি আছে—তাদের দাঁত নাই, আছে মুখের মধ্যে এক অতিকায় চিরুণীর মত হাড়ে বোনা ঝালর। ইংরাজীতে জিনিষটাকে বলা হয় 'হোয়েল বোন্'। মানুষের নানা সৌখীন জিনিষ গড়িতে এটি প্রচুর ব্যবহার করা হয়, এবং এরই জন্য বছর বছর বহু তিমি হত্যা করা হয়। আর এক জাতের তিমি আছে, তাদের বলে 'স্পার্ম্ হোয়েল'। এদের মাথার মধ্যে থাকে প্রচুর মোম। মোমবাতি তৈরীর কাজে এই মোমেরও খুব চাহিদা। সুতরাং মোমের দৌলতে এই জাতের তিমিগুলিকেও কম প্রাণ দিতে হয় না। তা ছাড়া সব জাতের তিমির গায়েই থাকে প্রচুর পরিমাণ চর্ব্বি। কোন কোনটার চামড়ার নীচে কুড়ি ইঞ্চি পুরু চর্ব্বির আস্তরও দেখা যায়। এত চর্ব্বির লোভ সামলানও মানুষের পক্ষে সহজ কথা নয়।

আমেরিকার ব্যবসায়ীরা দেখিলেন, হাড়ের ঝালর, মোম এবং চর্ব্বির জন্য

প্রতি বছর অসংখ্য তিমি বধ করা হইতেছে অথচ এত বড় একটা জন্তুর মাংসটা কোন কাজেই লাগিতেছে না—সমুদ্রে ফেলিয়া হাজার হাজার জলজন্তুর লোভ মিটান হইতেছে মাত্র। পরীক্ষা করিয়া তাঁরা দেখিলেন তিমির মাংস খাইতে বেশ সুস্বাদু—গরু-ভেড়ার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। আর না হইবার কথাও নয়, কারণ শরীর অমন তেলাল হইলে মাংসও নরম হইবার সম্ভাবনা। তাঁরা তখন তিমির মাংস মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য হিসাবে চালাইবার জন্য জোর প্রচার-কার্য্য সুরু করিয়া দিলেন। বক্তৃতা দিয়া, খবরের কাগজে লিখিয়া, সিনেমা দেখাইয়া জনসাধারণের মন তিমির মাংসের প্রতি লোলুপ করিয়া তুলিলেন। নিউইয়র্কের বাজারে প্রকাশ্যে তিমির মাংস বেশ চড়া দামেই বিক্রী হইতে লাগিল।

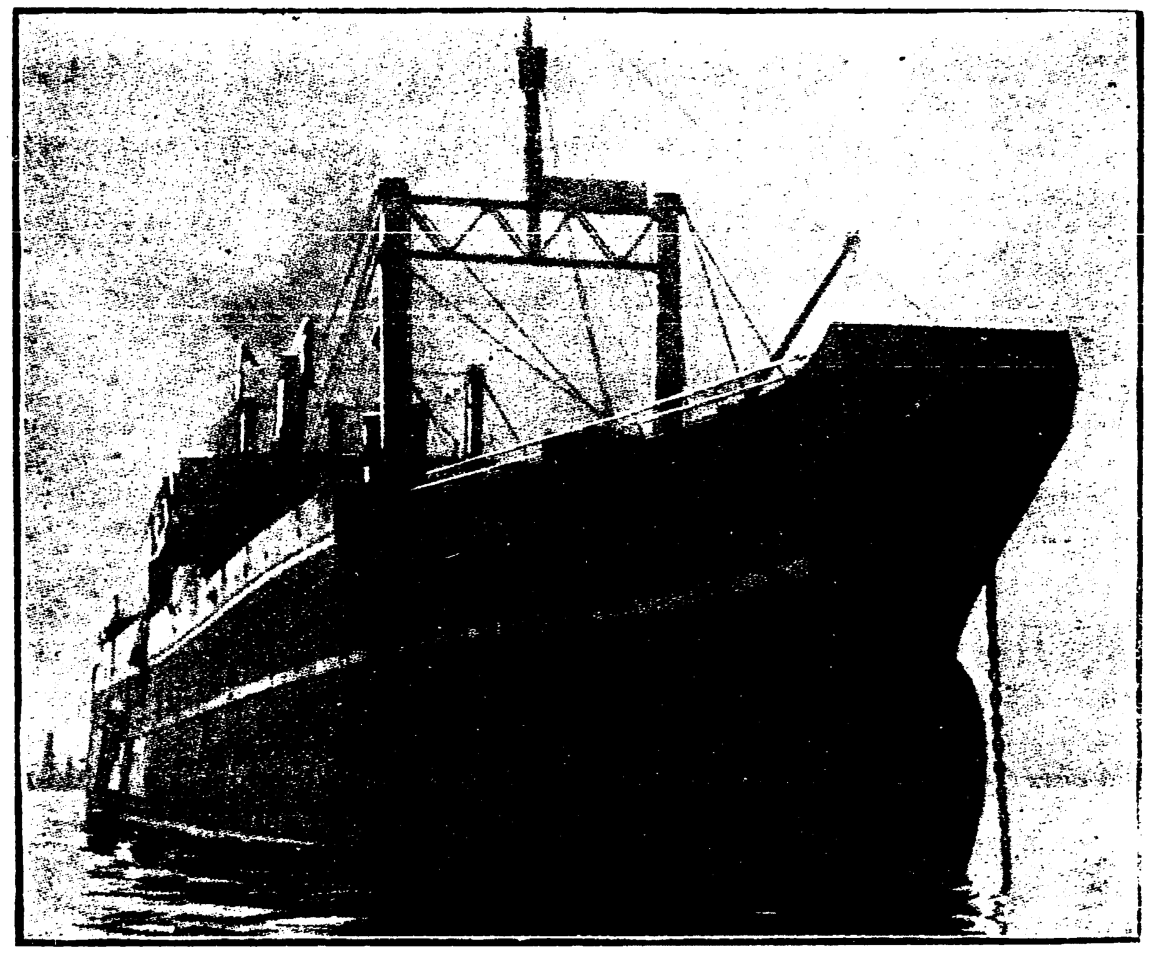

আধুনিক তিমি-ধরা বিরাট্ জাহাজ। জাহাজের খোলে ধৃত তিমিকে পূরিয়া নেওয়া হয়।

আর ইয়োরোপে তো তখন মাংসের দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে—'এয়ারটাইট্' টিনে ভরিয়া রাশি রাশি তিমি-মাংস জাহাজে চড়িয়া ইয়োরোপে চালান যাইতে লাগিল। এক একটি কারখানা হইতেই হাজার হাজার মণ তিমি-মাংস বিক্রী হইতে লাগিল। এ রকম বহু কারখানা বসিল। তিমির ব্যবসায়ীরা দেখিতে দেখিতে ফাঁপিয়া উঠিলেন।

যুদ্ধ থামিলে তিমির মাংসের চাহিদা কিছু কমিয়াছিল বটে কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় নাই। সম্প্রতি আবার মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় ব্যবসাদারদের কাজ বাড়িয়াছে। খাদ্যের টান পড়িবার পূর্ব্বেই যাতে যতটা সম্ভব তিমির মাংসের যোগাড় রাখা যায় সে জন্য তাঁরা তোড়জোড় করিতেছেন। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় তিমি ধরার এবং তিমির মাংসকে অধিক দিন টাটকা রাখার নানা নতুন নতুন উপায় বাহির হইয়াছে। মোট কথা, মাংসের ব্যবসা হিসাবে এটিকে এখন বেশ লাভজনক ব্যবসাই বলা চলে।

শুধু মাংসের ব্যবস্থা করিয়াই আজকালকার ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট নাই। তিমির শরীরের অন্যান্য অংশও তাঁরা ভাল ভাবেই কাজে লাগাইতেছেন। মোম-তিমির মোমে শুধু মোমবাতিই তৈরী হইতেছে না—সাবান, গ্রীজ্, স্নো, মলম ইত্যাদি হরেক রকম জিনিষ তৈরী হইতেছে। তিমির কঙ্কাল পোড়াইয়া তৈরী হইতেছে উৎকৃষ্ট জমির সার—আর নানা রাসায়নিক ওষুধপত্র। চামড়া হইতে কলের সাহায্যে তেল পিষিয়া লইয়া সেই চামড়া ভাল করিয়া ট্যান করিয়া নানা রকম চামড়ার আসবাব, জুতা, ব্যাগ্ ইত্যাদি তৈরী হইতেছে। তিমির জিভটা নাকি ভীষণ নরম—কাদার মত নরম, সেটিকে দিয়াও কোন নতুন কিছু করা যায় কিনা তার চেষ্টা চলিতেছে। তিমির কোন কিছুই তাঁরা ফেলিয়া দিতে নারাজ। এক-একটি সাধারণ মাপের তিমি হইতেও অন্ততঃ ১৫।২০ হাজার টাকার মাল সংগ্রহ করা হইতেছে।

তবে তিমি-ব্যবসায়ীদের এ দিন আর কত কাল চলিবে বলা যায় না। কারণ পৃথিবীতে তিমির সংখ্যা নাকি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কোন কোন জাতের তিমি পাওয়াই দুষ্কর।

নোটবুক

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্.এ

শ্রীপতিবাবুর কথা বলছি—বাণপুর ইস্কুলের সেকেণ্ড্ মাষ্টার, শ্রীপতিবাবু। প্রথম যেদিন তাঁকে আমরা পাই, সে আজ বছর বাইশেক আগেকার কথা। ক্লাসে এলেন; পরনে মুগবন্ধ জুতো আর ন' হাতি ধুতির ওপর গলাবন্ধ কোট। তার ডানদিকের পকেটটা বাঁদিকের চেয়ে অনেক বড়, প্রকাণ্ড একটা ঝোলার মত। তার ভেতরে ঝুলছে বিশাল একখানা বই। আমরা বলাবলি করছিলাম, ওটা বোধ হয় কাশীরাম দাসের মহাভারত; কেউ বল্‌লে গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা। বীরেন আমাদের ক্লাসে ইংরাজিতে ফার্ষ্ট হ'ত; গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, "না, ওটা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা।" এমনি সময়ে শ্রীপতিবাবু সেই আধমণি বইটাকে বের করলেন, এবং সকলের মুখের দিকে বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গে তাকিয়ে বললেন, "এটা আমার নোটবুক।"

এই ব্যাপার থেকে মনে পড়ল রাণাঘাট ষ্টেশনের একটা ঘটনা। সেবার মামাবাড়ী যাবার পথে গাড়ী বদল হ'বে। দু'নম্বর প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটি মহিলা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডেকে চল্‌লেন, "খোকন, খোকনরে, ও খোকন!" আমরাও ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম;—ছোট ছেলে কোথাও হারিয়ে গেল? পুলিশে খবর দেব কিনা ভাবছি, চমকে উঠলাম মেঘের মত আওয়াজ শুনে—"এই যে আমি।" তাকিয়ে দেখি খোকন দাঁড়িয়ে ঠিক আমারই পেছনে—৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, আর ২ ফুট ৪ ইঞ্চি চওড়া, তার ওপর কাইজারের মত গোঁফ!

সে যাক্। নোটবুকের বাইরেটা দেখেই আমাদের তাক লেগেছিল, ভেতরের পরিচয় পেয়ে প্রাণে আর জল রইল না। সেই মহাগ্রন্থের এক-একটা পাতা এক-একখানি বিদ্যার জাহাজ। তারি থেকে রোজ দশ পাতা করে আমাদের নোট লিখতে হয়। এস্কিমোদের মাথায় ক'সের ক'রে উকুন আছে, মঙ্গলগ্রহে মোটর-গাড়ী আছে কিনা, বক্তিয়ার খিলিজি ক'বার তামাক খেতেন, সান ইয়েটসেন বল্লাল সেনের বংশধর কিনা—ইত্যাদি ভয়ঙ্কর দরকারী তথ্য লিখে এবং মুখস্থ করে আমাদের প্রত্যেকের ওজন এক মাসে দশ পাউণ্ড্ করে কমে গেল। ফার্ষ্ট ক্লাশের অবস্থা শুনলাম আরো কাহিল। নোটবুকের ঘা খেয়ে গত. এক মাস ধরে তাদের আঠারো জনের মাথা ধরে আছে, রোজ ৬টা ক'রে কাফিয়াস্পিরিণ খেয়েও কোন উপকার হচ্ছে না। তার চেয়েও ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে আফিসের মধ্যে। হেড্ পণ্ডিতমশাই একসঙ্গে সাতটা হাঁচি দিয়েছিলেন। শ্রীপতিবাবু নোটবুক খুলে দেখালেন, পৃথিবীতে প্রথম হাঁচি হেঁচেছিল আফ্রিকা মহাদেশের

এক কাফ্রি। তার বংশের অনেকে বাংলাদেশেও এসেছিল। পণ্ডিতমশায়ের পূর্ব্বপুরুষ হয়তো তাদের মধ্যে কেউ।

কী! জাত তুলে কথা? পণ্ডিতমশাই রুখে উঠলেন ব্যাকরণ কৌমুদী নিয়ে। শ্রীপতিবাবু নিলেন তাঁর নোটবুক। অন্য সকলে মাঝে এসে না পড়লে একটা খুনোখুনি হ'য়ে যেত।

ক্রমে অবস্থা এমন হ'য়ে উঠল—সাধু ভাষায় যাকে বলা যায় "ভয়াবহ পরিস্থিতি"। শেষটায় ইস্কুলের পাণ্ডারা সব জড় হ'য়ে কমন্ রুমে এক সভার আয়োজন করলে। অনেক গরম গরম বক্তৃতার পর এক প্রস্তাব পাশ হ'ল—ঐ রাক্ষুসে নোটবুকটাকে চুরি ক'রে ইস্কুলের মাঠে "বন্ ফায়ার" হ'বে। সবাই একবাক্যে সায় দিলে। সমীর উৎসাহের আবেগে ঝনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিলে ঘি কিনবার জন্যে। "নোটবুক-সংহার-কমিটি" বলে একটা কমিটিও গড়ে ফেলা হ'ল। বলরাম দা' হ'লেন তার প্রেসিডেণ্ট্।

কিন্তু নোটবুকের কাছে ঘেঁষে কার সাধ্য? সারাদিন থাকে সে শ্রীপতিবাবুর কোটের ঝোলায়, আর রাত্রে থাকে তাঁর মাথার নীচে। অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে একা পাওয়া গেল না। নিরাশ হ'য়ে প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মত অবস্থা, এমন সময় একটা মস্ত বড় সুযোগ জুটে গেল।

হেডপণ্ডিত মশায়ের মেয়ের বিয়ে। সব মাষ্টারমশাইদের নেমন্তন্ন হ'ল। গোল বাধল শ্রীপতিবাবুকে নিয়ে। পণ্ডিতমশাই ভীষ্মের মত এক প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলেন। তার পর অনেক তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটির পর হেড্ মাষ্টার মশাই মাঝে পড়ে একটা মিটমাট ক'রে দিলেন—শ্রীপতিবাবুর নেমন্তন্ন হ'বে, তবে তিনি তাঁর ঐ অলক্ষুণে নোটবুকটাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। শ্রীপতিবাবু অগত্যা রাজী হ'লেন। আমরাও ঘি আর ছেঁড়া কাগজ জড় করতে লেগে গেলাম।

বিয়ের রাত। ১১টা বেজে গেছে। খবর পেলাম, ব্রাহ্মণ-ভোজনের পাত্তা প্রস্তুত। আমরাও প্রস্তুত হ'য়ে বোর্ডিংএর দোতলায় শ্রীপতিবাবুর ঘরের দিকে যাত্রা করলাম। "ক্লাস টেনের" শক্তিধ্বজ রোজ মুগুর ভাঁজত। তাকে সঙ্গে নিলাম। দরকার হ'লে চাকরটাকে চেপে ধরতে হ'বে। কিন্তু দরকার হ'ল না। গিয়ে দেখলাম ঘর অন্ধকার। চাকরটা খুব নাক ডাকাচ্ছে। আমি এবং সমীর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঢুকলাম এবং টর্চ্চের আলোতে সেই বিশাল আপদটাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

অত বড় আনন্দ আমাদের জীবনে আর আসে নি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলাম না উড়ে এসেছিলাম, জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরে এল সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে। সর্ব্বনাশ! পালাব যে সে পথও নেই,—একেবারে মুখোমুখী—আধ হাত দূরে দাঁড়িয়ে—সেকেণ্ড্ মাষ্টার শ্রীপতিবাবু! এক গাল হেসে বল্‌লেন, "এই যে, তোমরা কোত্থেকে?"

আমাদের জামা ভিজে যাচ্ছিল ঘামে, কিন্তু গলার ভিতরটা শুকনো কাঠ। ডানপিটে সমীর গোটা পাঁচেক ঢোঁক গিলে কোন রকমে বল্‌লে,—"আপনি!"

—"হ্যাঁ; চলে এলাম। আমি তো কোথাও যাই না। একটু দেখাশুনা করে—এ কি! ওটা আমার নোট্‌বুক নাকি? পড়তে নিয়ে যাচ্ছ বুঝি? বেশ! বেশ! হ্যাঁ; ওতেই পাবে—৫১৩ থেকে ৫৭৩ পাতা—স্বপাক-ভোজন সম্বন্ধে সব কথা লেখা আছে। তোমরা সবাই টুকে নিয়ে মুখস্থ ক'রে ফেল। আসছে সোমবারে জিজ্ঞেস করব।..." বলে তিনি ওপরে চলে গেলেন।

তার পর? তার পর আমরা, অর্থাৎ নোটবুক-সংহার-কমিটির পাণ্ডারা, সাতদিন ধরে রাত বারোটা পর্য্যন্ত জেগে মশার কামড় খেয়ে মুখস্থ করলাম,—যাজ্ঞবল্ক্য, প্লেটো, তাঞ্চুকু, মহাত্মা গান্ধী এবং হাজার খানেক অন্যান্য মনীষীরা স্বপাক-ভোজন সম্বন্ধে কোন্ যুগে কি বলেছেন, কোথায় এবং কেন?

* * *

এর পরের বছর আমাদের বাণপুর ইস্কুলের পড়া শেষ হ'ল। তার পর বাইশ বচ্ছর কেটে গেছে। কত দেশ ঘুরলাম! সরকারী আফিসের ফাইল ঘেঁটে আর সাত ঘাটের জল খেয়ে শেষটায় এসে পড়েছি বাংলার সীমান্তে এই চট্টগ্রাম! এ দেশের কবি বলেছেন—"সিন্ধু-মেখলা চট্টলা।" মন্দির-শীর্ষ পাহাড়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে বঙ্গোপসাগর—দেখে এলাম কক্সবাজার; দেখে দেখে আশ মেটে না। মুগ্ধ হ'য়ে দেখতে হয়, "ফেয়ারী হিল্" কিংবা "প্রসন্ন-ধামের" মাথার ওপর দাঁড়িয়ে গাছপালায় ঢাকা কর্ণফুলী; ভেসে-চলা, পাল-তোলা "সাম্পান", আর ওপারে ছোট ছোট পাহাড়ের কোলে শস্য-ভরা সবুজ ক্ষেত! শোভাময় দত্তের মনটা যে সত্যই শোভাময়, বুঝতে পারি তাঁর বাড়ী দেখে, "কৈবল্যধাম" আশ্রমের মাথার ওপর। চারদিকে বনভূমির গাম্ভীর্য্য, দূরে নীল সাগরের বুকে পড়ন্ত রৌদ্রের খেলা! "পাহাড়তলীটা" রেল-দেবতাদের বিহার। দেখলাম, এঞ্জিনের ধোঁয়া তাঁদের সৌন্দর্য্যবোধকে মলিন হ'তে দেয় নি। ছোট ছোট পাহাড়ের মেলা। তারি উপর ছবির মত বাগান-ঘেরা বাড়ী; আশে পাশে উঁচু-নীচু পিচ-ঢালা রাস্তা; নানা জাতের গাছের সারি; ফুলের গন্ধ, বনের ছায়া, আর তারি মধ্যে একটি ভায়োলেট্ রংএর জোরালো আলো। সবটাই আছে—শোভা, সম্পদ্ এবং রুচি!

কাজের ফাঁকে এই সব দেখি, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াই। এমনি সময়ে,—বাইশ বচ্ছর পরে—শ্রীপতিবাবুর এক চিঠি। বাণপুর ইস্কুল ছাড়বার পর আর তাঁর কোন খবর নিতে পারি নি। কিন্তু চিঠিতে সেজন্যে কোন অনুযোগ নেই, একটা "কেমন আছ" পর্য্যন্ত নেই; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কাজের কথা—"কাল যাচ্ছি; ষ্টেশনে থেকো।"

ষ্টেশনে পৌঁছতে একটু দেরি হ'য়ে গেল। গাড়ী তখন এসে পড়েছে। গার্ডের গাড়ী থেকে এঞ্জিন পর্য্যন্ত সব খুঁজে দেখলাম। কোথায় শ্রীপতিবাবু? ফিরে আসছি, হঠাৎ রেল-পুলিশের আফিসে একটা গোলমাল শুনে দাঁড়ালাম। আবগারী দারোগাবাবু হেঁকে বল্‌ছেন, "বের করুন মশাই, কি আছে আপনার ঝোলায়—গাঁজা, আফিম না চরস?"

উত্তরে একটি অত্যন্ত নিরীহ গলা শোনা গেল—"আজ্ঞে ও সব কিছু নয়; এটা আমার নোটবুক।"

দারোগাবাবু মুখ ভেংচে বল্‌লেন, "নোটবুক! কচি খোকা ভোলাচ্ছেন! একটা আধমণি বস্তা হ'ল ওঁর নোটবুক! বলদেও সিং, তালাসি লেও—।"

আমি গিয়ে পড়াতে ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হ'ল।

পথে আসতে আসতেই মাষ্টার মশাই তাঁর চট্টগ্রামে আসবার উদ্দেশ্যটা খুলে বল্‌লেন। দুনিয়ার সব যুগের এবং সব দেশের খবর তাঁর নোটবুক খুল্‌লে পাওয়া যাবে—বাকী পড়েছে শুধু একটি জাত—মগ। তাদেরই তথ্য যোগাড় করবার জন্য তিনি চলেছেন রাঙ্গামাটি, এবং সেখান থেকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে। শুনে চমকে উঠলাম—বিশেষ ক'রে তাঁর স্বাস্থ্য এবং বয়স দেখে। বোঝাতে চেষ্টা করলাম, পথ বড় দুর্গম; এক গাছের নৌকো করে চলতে হ'বে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত; রাস্তায় ভীষণ জঙ্গল, পাল পাল বুনো হাতী, শুঁটকি মাছ আর মগ-ডাকাত। একটি কথা বুঝবার উপায় নেই, একমুঠো ভাত মুখে দেওয়া চলবে না। জল খেলেই হবে পেটে গোলমাল, আর কি এক পোকা আছে, গায়ে বসলেই হ'বে জ্বর।

মাষ্টার মশাই মন দিয়ে শুনলেন, তার পর একটু হেসে বল্‌লেন, "তা হ'লে যাবার ব্যবস্থাটা কালই ক'রে দাও।"

তাই দিতে হ'ল। সঙ্গে গেল আমার বিশ্বাসী দ্বারোয়ান ছোট্টু সিং আর পুরোনো চাকর গণশা।

দিন পনেরো কোন খবরই পেলাম না। তার পর হঠাৎ এক টেলিগ্রাম—দ্বারোয়ান জানাচ্ছে, "ভয়ানক বিপদ্, আজই রওনা দিন।" বিপদ্ যে হ'বে সেটা আগেই জানা ছিল। সেই দিনই বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা রেলে, বাকীটা নৌকো, ঘোড়া এবং পায়ে হেঁটে তিন দিন পরে একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে মগ ছাড়া আর কিছুই নেই। তারি শেষ দিকে একটা ভাঙ্গা গোছের হাসপাতালে ছেঁড়া গদি-মোড়া লোহার খাটের উপর মাষ্টার মশায় পড়ে আছেন—হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কপালে পট্টি, গালে কালশিরে দাগ, ভ্রূর ওপরে কাটা। ছুটে গিয়ে বল্‌লাম, "কি হ'য়েছে মাষ্টার মশাই?" তিনি সে কথার কোন জবাব দিলেন না, হাঁটা ঘুরিয়ে অত্যন্ত সরু ভাঙ্গা গলায় বল্‌লেন, "আমার নোটবুক!" বোঝা গেল নোটবুক নেই।

তাঁর চোখের কোণ দু'টো বেয়ে হু-হু ক'রে জল বেরিয়ে এল। সেদিকে চেয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

খবর পেয়ে ডাক্তার এলেন—বাঙ্গালী ভদ্রলোক। বল্‌লেন, "দিন তিনেক অপেক্ষা করলে পাল্‌কী ক'রে আস্তে আস্তে নিয়ে যেতে পারবেন। এবারের মত কাটিয়ে উঠেছেন। তবে সাবধান ক'রে দেবেন, মগেদের সঙ্গে আর যেন কুস্তি লড়তে না যান।"

—"মগেদের সঙ্গে কুস্তি! মাষ্টার মশাই?"

—"হ্যাঁ। রীতিমত কুস্তি। ঝোলা বাঁচাতে গিয়ে প্রাণটাই দিচ্ছিলেন আর কি!"

ঘটনাটা জানা গেল দ্বারোয়ানের কাছে।

এখানে পৌঁছবার ১৪।১৫ দিন পরে, গভীর রাত্রে দশ-বারোজন মগ ডাক-বাংলোয় হানা দিয়ে মাষ্টার মশায়ের নোটবুক কেড়ে নিতে চায়। শ্রীপতিবাবু প্রাণপণে বাধা দিলেন। ডাকাতগুলো তখন বেপরোয়া কীল-ঘুষি চালিয়ে তাঁকে অজ্ঞান করে, বইটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। গণশা এবং ছোট্টু সিং ছিল একটু দূরে। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখে একমুঠো ছাই ছাড়া অত বড় নোটবুকের আর কিছুই বাকী নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, নোটবুকের ওপর ওদের এত আক্রোশ কেন?"

গণশা বল্‌লে, "আজ্ঞে হুজুর, কে ওদের বুঝিয়েছে, ঐ বইতে যে সব খবর লিখে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই থেকে ওদের ওপর ট্যাক্স্‌ বসান হ'বে।"

শ্রীপতিবাবুর নোটবুক আর নেই। বাইশ বচ্ছর আগে এ খবর পেলে খুবই আনন্দ হ'ত। কিন্তু আজ, কেন জানিনা, মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল।

মাঘ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "পুতুলের বিয়ে" নিয়ে কবিতা।

যাঁদের বয়স ১৫ বছরের বেশী তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন শ্রীআশা নন্দী (গৌহাটী)। যাঁদের বয়স ১৫র কম তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন শ্রীঅহিভূষণ মিত্র (মুঙ্গের)।

শ্রীঅনিলকুমার দাস, শ্রীরিণা রায়, শ্রীরবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের কবিতাও বেশ ভাল হয়েছে।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

বিষয়:—"তুমি সব চেয়ে কি খেতে ভালবাস" এই নিয়ে রামধনুর দু' পৃষ্ঠার মধ্যে একটি সরস রচনা। এবারেও ২টি পুরস্কার দেওয়া হবে। একটি—যাদের বয়স ১৫র নীচে তাদের জন্য, আর একটি যাদের বয়স ১৫র উপরে তাদের জন্য। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে গ্রাহক বা গ্রাহিকার নাম, নিজের গ্রাহক নং ও বয়স লিখে দিতে হবে। লেখা ১লা বৈশাখের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

দেওঘরের স্মৃতি

শ্রীমাধুরী ঘোষ

[দেওঘরে শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর করণীবাদ আশ্রম দর্শনে]

নগরের প্রান্তে এক পবিত্র আশ্রম, তাপদগ্ধ মানবের পরম আশ্রয়,
সংসার মরুর মাঝে স্নিগ্ধ বারিধারা, দেবতার আশীর্ব্বাদে যেন জেগে রয়।
সেথায় করেন বাস তরুণ তাপস, সৌম্য তাঁর দেবমূর্ত্তি পরম সুন্দর,
একদা দিবাবসানে চরণে তাঁহার প্রণমিতে গিয়াছিনু লুটায়ে অন্তর।
দিন-শেষে গোধূলির ম্লান আলোটুকু নিবেদিল আপনারে শুভ্র-জ্যোছনায়,
পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে রাত্রির আঁধার তন্দ্রায় পড়িল ঢলি' শান্ত বনচ্ছায়।

শান্তির আগার সেই পুণ্য পীঠস্থান, প্রাঙ্গণের সুবিশাল তরুছায়াতলে
দাঁড়ায়ে কুমার, যথা প্রফুল্ল কমল শোভা পায় সরসীর মৃদু নীল জলে।
চম্পক লাঞ্ছিত তাঁর অঙ্গের বরণ, ঘন কৃষ্ণ কেশভারে জটার সূচনা,
তরুপল্লবের ফাঁকে চতুর চাঁদিমা আঁকিছে সে বর-অঙ্গে বিচিত্র আল্পনা।
উন্নত সুদীর্ঘ দেহে গৈরিক বসন ধরিয়াছে অপরূপ স্বর্গীয় সুষমা,
চন্দনের রেখাঙ্কিত উজ্জ্বল ললাট, ত্রিভুবনে বুঝি তার নাহিক উপমা!
অনিন্দ্য সুন্দর মুখে চির প্রসন্নতা, রক্তিম অধরপুটে মৃদুমন্দ হাসি,
কোমল গম্ভীর কণ্ঠে সস্নেহ বচন, হৃদয়ের সর্ব্ব শোক বেদনা বিনাশি'।
প্রণাম করিনু তাঁর কমল চরণে, শ্রবণ জুড়াল শুনি শ্রীমুখের বাণী,
ভক্তির প্রবল উৎসে ভাসিল হৃদয়, দূরে গেল জীবনের যত দুঃখগ্লানি।
প্রণাম গ্রহণ করি স্মিত হাস্যমুখে, সম্ভাষিয়া মৃদুস্বরে, রহি ক্ষণকাল,
চলিয়া গেলেন ধীরে কুমার তাপস আশ্রম উদ্যান পথে, যেথা অন্তরাল
করিয়াছে বৃক্ষরাজি লোকচক্ষু হ'তে বিজন আবাস তাঁর, রহিলাম চাহি,
কভু স্নিগ্ধ ছায়াপথে, কভু চন্দ্রালোকে সুন্দর মূরতিখানি সেই পথ বাহি
দূরে মিলাইয়া গেল ধীর পদক্ষেপে। অপূর্ব্ব সুন্দর এক অব্যক্ত বেদনা
হিয়ার দু'কূল প্লাবি' উঠিল জাগিয়া, আচ্ছন্ন করিয়া মোর সমগ্র চেতনা।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বীরবাহুর বনিয়াদী চাল—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ইষ্টার্ণ ল হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার। দাম।৵০

বর্ত্তমান বাংলা শিশুসাহিত্যে যে ক' জন শক্তিশালী লেখক হাসির গল্প লিখে নাম করেছেন রবীন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী এবং রসসৃষ্টির মধ্যে একটা নিজস্ব জিনিষ আছে—যার জন্য ছেলেমহলে তাঁর ভারী খাতির। এ বইখানিও তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।

বইএর মলাটটি সম্বন্ধে কিন্তু একটু বক্তব্য আছে। সুপ্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক শ্রীশিবরাম

চক্রবর্ত্তীর বিখ্যাত বই "ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি"র মলাটের সঙ্গে এর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রয়েছে। অবশ্য লেখক ভূমিকায় এর জন্য একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমাদের মনে হয়, অপর বইটি যখন প্রথম প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে এবং লেখকের যখন তা জানা ছিল তখন ওটা বদলে দিলেই বোধ হয় অধিকতর শোভন হ'ত।

বইএর ছাপা, ছবি, বাঁধাই মনোজ্ঞ। দাম অত্যন্ত সস্তা।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

সাধ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চাঁদ যে আমায় ডাকে, মাগো, চাঁদ যে আমায় ডাকে,
নেবুর ঝোপে মুখ লুকিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।
বলে "আয় না খোকা ছুটে, আনব মোরা লুটে
রূপকথারই রাজকন্যে সাত সাগরের পারে;
হাসলে যে গো মুক্তা পড়ে, কাঁদলে মাণিক ঝরে।
গলে বিনিসুতার মালা, হাতে ফুলের বালা,
অশোক বকুল ঝরছে যাহার চরণ দু'টি ঘিরে,
ঘুমায় যেথায় রাজকন্যে দুধসাগরের তীরে।
হাসছ তুমি মাগো?
খোকা তোমার মিথ্যে কথা মোটেই বলে না গো।

ভাবছ বুঝি মনে
দুষ্টু খোকা দুষ্টুমি ফের করছে তোমার সনে ?
চাঁদকে না হয় ডেকে
কথাটা মোর পরখ করে নাও তার কাছ থেকে।
দে না মাগো, ছুটী,
চাঁদের সনে উধাও হয়ে তারার দেশে জুটি।
যাব মেঘের ভেলায় চড়ে অলস হাওয়ায় উড়ে
কাঁদছে যেথায় রাজকন্যে পাষাণ 'পরে লুটি' ;
লক্ষ্মী মাগো, একটুখানি দে না আমায় ছুটী।
আস্‌ব আবার ফিরে
কুমুদ যখন করবে আলো কাজলা দীঘিটিরে।
যখন খঞ্জনারি পালে নাচবে তমাল-ডালে,
ভোমরা যাবে গুণ্‌ গুণিয়ে ভূঁইচাঁপাটী ঘিরে,
তখন তোমার খোকা, মাগো, আসবে আবার ফিরে।

রামধনু

শ্রীঅনিলকুমার দাস

সাতটী রঙে রাঙা তুমি রামধনুরই মত,
তোমার বুকের লেখাগুলোয় মিষ্টি মধু কত !
স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তুমি, মায়ার তুমি জাল,
তোমার উপর স্নেহ মোদের
থাকবে চিরকাল।
তুমি মোদের ছোট্ট সাথী,
গোপন মনের আশা,
তোমার উপর তাই তো মোদের
এমন ভালবাসা !

যে বুকেরই আশা দিয়ে গড়া ছিলে ভাই,
সেই বুকেরই মান রাখিছ,
এই তো মোরা চাই।
তাঁর বুকেরই তন্ত্রীগুলি
তোমায় ঘিরে রাজে,
তাঁরই স্মৃতি বুকে আজি নূতন করে বাজে।
ভগবানের পদে মোরা এইটী আশা করি—
দেশের কিশোর-কিশোরীরা
তোমারে নিক্ বরি'।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহকদের দেওয়া প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর প্রকাশিত হয়। মতামতের জন্য কিন্তু সম্পাদক দায়ী ন'ন।]

নূতন প্রশ্ন

১। A. R. P. সম্বন্ধে ও 'ফাষ্ট্‌ এড্‌' সম্বন্ধে কোন বাংলা বই আছে কি ? কার লেখা ? —শ্রীমনীষকুমার বসু মল্লিক

২। আমরা হাই তুলি কেন ?
—শ্রীরণজিৎকুমার বসু।

৩। আমেরিকায় 'বেস্ বল্' খেলা খুব জনপ্রিয়। ঐ খেলার বিস্তৃত নিয়ম-প্রণালী কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ?
—শ্রীঅতুল রায় ও
শ্রীবিমল বসু

কয়েকখানি চিঠির সারাংশ :—

"পুরস্কার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। রামধনুতে একটি প্রশ্নোত্তর বিভাগ থাকিলে ভাল হইত।" —শ্রীচিন্ময়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

[রামধনু বিচার-সভা বিভাগেই এই ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগটির আর একটু ভাল একটা নামকরণ করার ভার তোমাদের হাতে দেওয়া গেল।" —রাঃ সঃ]

"রামধনু সৌন্দর্য্যে ও বিষয়সম্পদে সুন্দরতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রচ্ছদপট ও প্রথম পাতার ছবিটি ভারী সুন্দর লাগল।……আজ রামধনুর জন্মদিনে আনন্দের মধ্যেও পরলোকগত সম্পাদক মহাশয়ের অভাব তীব্র ভাবে জাগছে বুকে। দুঃখ ও বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেও মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই ভেবে যে তাঁর আত্মা আজ স্বর্গ হ'তে আশীর্ব্বাদ করছেন প্রতিনিয়তই তাঁর হাতে গড়া সাধের রামধনুকে এবং তার সাথীদের। রামধনু চলেছে এগিয়ে কালের স্রোতে। ভবিষ্যতে আর একদল কচি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে রামধনু। তখন হয়তো আজকের এই কিশোর-কিশোরী ভাইবোনেরা হয়ে যাবে মস্ত বড়—কেউ বা হয় তো হবে একজন

নেতা, কেউ বা হবে একজন রীতিমত গৃহিণী। তবুও তারা কখনই ভুলবে না কৈশোরের সাথীকে কোন দিন।" —শ্রীস্থাণুবালা কর।

নতুন বছরের মলাট সম্বন্ধে নানা ধরণের চিঠি এসেছে। শ্রীরণজিৎ বসু লিখেছেন—"যতই বলুন না কেন, এবারের মলাটের ছবি সবারকার চেয়ে ভাল হয়েছে; সত্য নয় কি?" শ্রীমতী শতদল দে লিখেছেন—"এবারের রামধনু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে; আরও সুন্দর হয়েছে উপরের প্রচ্ছদপটটি।" শ্রীরেবা সেন ও শ্রীঅজয় গুপ্ত লিখেছেন—"মলাটের আইডিয়াটি অপরূপ সুন্দর।" আবার শ্রীবেলা ব্যানার্জ্জি লিখেছেন—"কভারটা কিন্তু একটুও ভালো হয় নি। কোত্থেকে কি এক বাজে ছবি যোগাড় করেছেন বলুন তো! আসল জিনিষগুলো—মানে গল্প, প্রবন্ধগুলো অবশ্য ভাল হয়েছে।"

শ্রীরামপ্রসাদ কুশারী, গত বছরের উপন্যাস "মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্করের" প্রসঙ্গে শ্রীভবানীপ্রসাদ মাঘে যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে, লিখেছেন—"য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নায়ক বা নায়িকার সাহস ও বীরত্ব আমাদের ঝিমিয়ে-পড়া মেয়েলীপানা রস না দিয়ে ডানপিটে ও সাহসী হবার সুযোগ দেয়।" ফাঙ্গাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা তিনি জানতে চেয়েছেন। [উত্তর :—আছে। বড় হয়ে তোমরা যদি 'বটানী' বা উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান পড় তা হ'লে ফাঙ্গাসের নানা বিচিত্র কাহিনী জানতে পারবে। মানুষের শরীরেও ফাঙ্গাস্ গজাবার কথা শোনা গেছে। —রাঃ সঃ

এ মাসের রামধনু যখন ছাপা শেষ হয়ে এসেছে, তখন, গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিশু-সাহিত্য সংবাদ' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর একখানি দীর্ঘ চিঠি (ছাপবার অনুরোধ সহ) আমরা পেয়েছি। অত বড় চিঠি সম্পূর্ণ ছাপবার মত জায়গা আমাদের ছোট্ট কাগজে নেই (এ সংখ্যায় তো নেই-ই) তথাপি (এবং সমালোচনার প্রতিবাদ প্রকাশ রীতিবিরুদ্ধ হ'লেও) চিঠির ভাবার্থটা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল :—'গৌরাঙ্গপ্রসাদের গোড়াকার সব লেখাতেই শিবরাম বাবুর প্রভাব থাকার দরুণ উক্ত লেখক তা নিজের বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক—তাঁর একখানি বইএর ভূমিকায় এ কথা জানিয়েছেন। 'বাজার করা সোজা নয়' এর মত একটি চমৎকার গল্প এইভাবে বরখাস্ত হয়ে মাঠে মারা যাচ্ছে দেখে শিবরাম বাবু উক্ত লেখকের ঋণ স্বীকার করে ঐ গল্পটি তাঁর নতুন বইএর অঙ্গীভূত করেছেন, এবং তিনি মনে করেন, এতে কিছু অন্যায় করেন নি। তাঁর মতে, লেখায় পূর্ব্বগামী লেখকের প্রভাব থাকা এমন কিছু নয়, প্রভাব কাটিয়ে ওঠাই বড় কথা এবং শক্তির লক্ষণ, এবং উক্ত লেখকের অধুনাতন লেখায় নাকি তাই দেখা যাচ্ছে। সমালোচকের সংশয়ারোপ, তাঁর মতে, অহেতুক।

অপর গল্পটিতে অমৃত বাজারের 'উইট্ এণ্ড হিউমারের' চার লাইনকে বাড়িয়ে তিনি চারশ' লাইনে এনেছেন, তাই সেখানে ঋণ স্বীকারের বিশেষ কিছু ছিল না।' [এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

—রাঃ সঃ]

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল হয়ে গেল। মহারাষ্ট্র দল মাদ্রাজ দলকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে। এর ঠিক আগেই মহারাষ্ট্র দল উত্তর ভারতের সঙ্গে

প্রসিদ্ধ কুস্তীগীর গামা ও ইমাম বক্স

প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। এই খেলায় তাদের রান্ হয়েছিল ১ম ইনিংসএই ৭৯৮। রানের দিক্ দিয়ে এটাই ভারতের রেকর্ড্। মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়ক প্রফেসর দেওধর ১৯৬ রান্ করেন। উত্তর ভারত দলও যে খারাপ খেলেছিল তা মনে ক'র না। তাদের রান্ হয়েছিল ১ম ইনিংসএ ৪৪২। তাদের অধিনায়ক রামপ্রকাশ একাই নট্ আউট্ থেকে ২০৯ রান্ করেন।

* * *

ই।তমধ্যে যুদ্ধভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতায় কয়েকটা ক্রীড়া-কৌতুকের আয়োজন হয়েছিল। প্রথমে হ'ল কুস্তী-প্রতিযোগিতা। ভারতের নানা জায়গা থেকে বড় বড় মল্লবীরেরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। গামা, ইমাম বক্স, ছোট গামা, গুংগা, হামিদা প্রভৃতি পালোয়ানরা সকলেই এসেছিলেন। কয়েকজন বিদেশী পালোয়ানও ছিলেন। কথা ছিল, এই প্রতিযোগিতার ফল দেখে ভারতের "চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্" ঠিক করা হবে। প্রথম ক'দিন বেশ দর্শনীয় খেলাই হ'ল, কিন্তু শেষ দিনে ব্যাপারটা একটু 'ভজকট' হয়ে পড়্‌ল। কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত যাঁদের বেছে নিলেন তাঁরা কেউই প্রতিযোগিতা করতে রাজী হ'লেন

না—এক গুংগা (ইনি বোবা এবং কালা) ছাড়া। ফলে কর্ত্তৃপক্ষ গুংগাকেই বিজয়ী ঘোষণা ক'রে পুরস্কৃত করলেন।

* * *

তার পর হ'ল হকি। বাংলা দেশের বাছাই-করা দলের সঙ্গে নিখিল ভারতের বাছাই-করা দলের হকি-প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। নিখিল ভারত দলের অধিনায়ক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ হকি-যাদুকর ধ্যানচাঁদ। তাঁর ভাই রূপসিংও ঐ দলে ছিলেন। বাংলা দলের অধিনায়ক ছিলেন বি.এন্.আর দলের কার। খেলায় বাংলা দলই ২-১ গোলে জয়লাভ করেছে। বাংলার হয়ে কার ও চিরঞ্জিৎ রায় গোল দেন। ধ্যানচাঁদের খেলা যেন অনেকটা পড়ে এসেছে—যদিও তাঁর দলের গোলটা তিনিই দিয়েছেন।

* * *

এ বছর রণজি ট্রফীতে বোম্বাইএর বিরুদ্ধে খেলে মহারাষ্ট্র দল তাদের পূর্ব্ব রেকর্ড্ (৬৫০) ভঙ্গ করে—৬৭৫ রান্ ক'রে। অধ্যাপক দেওধর ২৪৪ করেন। এ বছরই আবার তারা পরবর্ত্তী খেলায় নিজেদের রেকর্ড্ ভেঙ্গে ৭৯৮ করল। এটা তাদের কম গৌরবের কথা নয়।

* * *

সম্প্রতি কাগজে বেরিয়েছে আসাম প্রদেশের এক পল্লীগ্রামে একটি লোক ১৪০ বছর বয়সে মারা গেছেন। এই দীর্ঘায়ু লোকটির স্ত্রী এখনও জীবিত। তাঁর বয়স ১২৫ বছর।

* * *

যুদ্ধের খবর একটু বলি। ইংলণ্ডে ও জার্ম্মেনীতে পাল্টাপাল্টি বিমান আক্রমণ একই রকম ভাবে চলেছে। এদিকে আফ্রিকায় ইংরেজদের হাতে ইটালিয়ান্‌রা ক্রমাগত কাবু হয়ে পড়ছে। ইটালিয়ান্ সোমালীল্যাণ্ডের রাজধানী মোগাডিসু ইংরেজরা দখল করেছে; এখন তারা আবিসিনিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ইতিমধ্যে জার্ম্মেনী আবার একটু একটু ক'রে বল্‌কানে তোড়জোড় সুরু করেছে। বুলগেরিয়াকে তার হাতে ধরা দিতে হয়েছে। ইংরেজ সরকার বুলগেরিয়াকে শত্রুরাজ্য বলে ঘোষণা করেছেন। জার্ম্মান্ সৈন্য তুরস্ক-বুলগেরিয়ার সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। জার্ম্মেনী যুগোস্লাভিয়াকেও দলে টানবার চেষ্টা করছে, এবং শীঘ্রই গ্রীস্ আক্রমণ করবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। ইটালিয়ান্‌দের সঙ্গে গ্রীক্‌দের যুদ্ধের ফল অবশ্য এখনও গ্রীক্‌দেরই অনুকূলে।

* * *

সম্প্রতি ৯০ বছর বয়সে প্রসিদ্ধ ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্যর্ জর্জ্জ্ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের মৃত্যু হয়েছে। জীবনের অধিকাংশ সময়ই ইনি ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে কাটিয়েছেন। ভারতবর্ষের হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মাদ্রাজ বাদে ২৯ কোটি অধিবাসীর মধ্য ৫৪৪টি কথ্য ভাষা এবং ১৭৯টি লেখ্য ভাষার বিবরণ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। (ব্রহ্মদেশকে অবশ্য এর মধ্যে ধরা হয় নি)।

* * *

সিন্ধুর মন্ত্রিসভা আবার বদলাতে হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী মীর বন্দে আলি পদত্যাগ করেছেন। খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স আবার প্রধান মন্ত্রীর আসন নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) পদ (২) ধান (৩) জামা (৪) নাই (৫) রাজ।

উত্তরদাতাদের নাম

সন্তোষ ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); প্রভাত, অমিয়, অমিতাভ (ভবানীপুর); রথীন্দ্র, গোপাল, সতী মৈত্র প্রভৃতি (রাজসাহী); সৌরীন্দ্রনারায়ণ সরকার, গোপাল, শোভা প্রভৃতি (খড়গ্‌পুর); ছাত্রবৃন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদন (শালখিয়া); শ্যামসুন্দর মাইতি (কোলাঘাট); সত্যনারায়ণ ও শঙ্করনারায়ণ লাহিড়ী (ময়মনসিংহ); অশোক, বিজন, বিকাশ প্রভৃতি (শ্রীহট্ট); ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ (ভিরিঙ্গী), ভিরিঙ্গী হোষ্টেলের ছাত্রগণ (ভিরিঙ্গী); কুশল বাগ্‌চী, কল্যাণ, মীত্‌ফিল্ প্রভৃতি (বালিগঞ্জ); সেবা দত্ত, ছোটকু, মঞ্জু প্রভৃতি (করিমগঞ্জ); দীপকরঞ্জন দেব (কুমিল্লা); সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর); অরুণা সেন (কলিকাতা); সুপ্রভা সেনগুপ্তা (কানপুর); স্নেহলতা লাইব্রেরীর সভ্যগণ (ধপ্‌ধপী); কালিদাস পাল (বালুভরা); মণি, মীরা, মঞ্জু প্রভৃতি (গৌহাটী); সুনন্দা সেন (বরিশাল); নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় পুতুল, মিনু (কালীঘাট); রণ, রমাপতি, জ্ঞানরঞ্জন, (মুড়াগাছা); ছবি রায় (নিউ দিল্লী); শুভাশীষ সরকার (পাবনা); সুশীল সেন, অশোক বাগচী (দিনাজপুর); তৃপ্তি সেন (ভবানীপুর); রেণুবালা চক্রবর্ত্তী, উমারাণী চঃদার (নওগাঁ); নিরঞ্জন মজুমদার (নাটোর); রণজিৎকুমার বসু (ধুবড়ী); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); মায়া, ধীরা, লক্ষ্মী প্রভৃতি (ফয়জাবাদ); রেবা সেন, (নয়া দিল্লী); প্রণতি (মুজাফরপুর); স্থাণুবালা কর (কলিকাতা); আভা দেবী (বিরোল); ছোড়দা, অনিল ও কল্যাণী ঘোষ (দিনাজপুর); বাণী বসু, কিকি, অধীর প্রভৃতি (চাইবাসা); অরুণ, সুখু অনিল (জামসেদপুর); দীপু, অপুরেখা, বেবীপুতুল (জামসেদপুর) ঝরণা চট্টোপাধ্যায় (নিমকাথানা—জয়পুর ষ্টেট্); পানু মামা, ছোটু, রাণু (নূতন দিল্লী); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে ও বীণাপাণি দে (জামালপুর); রামপ্রসাদ কুশারী (কুমিল্লা); ছাত্রসঙ্ঘ, হীরাপুর শ্রীমন্ত এম্. ই. স্কুল (ফোর্ট্ গ্লষ্টার); রাজবলী সিং (কলিকাতা); রীণা রায় (টালিগঞ্জ); পঞ্চানন দাস (ত্রিবেণী); অশোককুমার দত্ত (গোরা বাজার); মনীষকুমার বসুমল্লিক (ফুলেশ্বর); অনিমা, রেবা, ছবি প্রভৃতি (করিমগঞ্জ);

অমরনাথ ভট্টাচার্য্য (বহিরগাছি); অজিতা ব্যানার্জ্জি (আরামবাগ); মদন, নৃপেন, চুনী (গোপালগঞ্জ); নলচিড়া বালক সমিতির সভ্যবৃন্দ (বরিশাল); প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা); দিদা, দাদা, বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় (চাইবাসা); জব্বার, তাইফু, অছিম (লাথপুর শিমুলিয়া); রাঙ্গামাটী গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম); মণিরাম আগরওয়ালা (সুজানগর); চিত্ত বিশ্বাস (চট্টগ্রাম); রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আলোক চট্টোপাধ্যায় ও ধূলি (রামকৃষ্ণপুর); জাহ্নবী মধ্য-ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, কেষ্টলাল, সোনা প্রভৃতি (মথুরা); শিশুসাহিত্য কুটীরের সদস্যগণ (আজমীর); অজয়কুমার দত্ত (পাটনা); নীলিমা দত্ত ও অমলকুমার দত্ত (কলিকাতা); লতিকা, শুকদেব ও যূথিকা চন্দ্র (মাদ্রাজ); গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভাগলপুর); শ্যামল, গীতা মুখার্জ্জি (বেনিয়াডা); মনীষা সেন, নান্নু, অনু প্রভৃতি (গৌহাটী); সোমেন, প্রবীর, পুলক প্রভৃতি (রাজসাহী); রণেন্দ্রচন্দ্র রায় (হাওড়া)।

নূতন ধাঁধা

উইএর জ্বালায় আর কিছু রাখা গেল না! যদুবাবু একে একে পুরানো আমলের বাক্স-পেটরা টেনে টেনে উঠোনে নামালেন। একটা বহুদিনের পুরোনো সিন্ধুক খুলতেই তার ভিতর থেকে বেরুল একটা কাগজ—দেখে মনে হয় খুব দরকারী কাগজ। যদুবাবু পড়তে গিয়ে দেখেন, প্রায় প্রত্যেকটি লেখাই উইএর কল্যাণে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে কোথায় কোথায় অক্ষর ছিল তা এখনও বোঝা যাচ্ছে। কাগজের লেখাটা এখানে হুবহু তুলে দিলাম। প্রত্যেকটি উইএ খাওয়া অক্ষর একটা ক'রে × চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়েছে। তোমরা দেখ ত' লেখাটা পড়ে দিতে পার কিনা :—

×কু×ঘ×র ×কটে ে× পু×র আছে ে×ই ××রের ×ক্ষি× ×ড়ে ×কাণ্ড ঝু×-×মা ×টগা×। ত× ××তে বার ×ত ×ত্তরে যাও; নয় ×ত ×টী× ×চে ক×× ×ড়া বা×শা× ××লে× ×হর পা××।

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্.এ, বি.এল্
প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে All Bengal Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য) বলেন :—
"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা।

দাম ৯।।০ মাত্র

=নতুন বই=

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সম্বন্ধে মৌচাক বলেন :—

"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

—অফুরন্ত ছবি—অফুরন্ত হাসি—
—অফুরন্ত মজা—

দাম আট আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ।।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কল্‌কাতার হালচাল ৸৵০
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ।।০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হাল্‌কা হাসির খাতা ।।০
নতুন কিছু ... ।।৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর (আলেকজান্দার-জীবনী) ।।০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম) ।।০
ঐ ২য় খণ্ড ।।০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং ... ।।০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প ... ৶১০
ছুটীর গল্প ... ৶১০

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার
আজব গল্প ... ।০
অনেক গল্প ... ।০

পুরাতন বার্ষিক রামধনু
১ম, ৩য়—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ৯।।০
৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২।।৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রমা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C–1641

আবার এল দোল!

দোলের দিনে শুধু রং মাখালেই চলবে না,—

মিষ্টিমুখেরও ব্যবস্থা করতে হবে ;

এবং তার জন্যে আগে চাই

লক্ষ্মী ঘি

উৎসব-আয়োজনে, পূজা-পার্ব্বণে, নিত্য প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি অপরিহার্য্য।

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি'এর তুলনা নেই।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

৪র্থ বর্ষ বৈশাখ, ১৩৪৮ চতুর্থ সংখ্যা

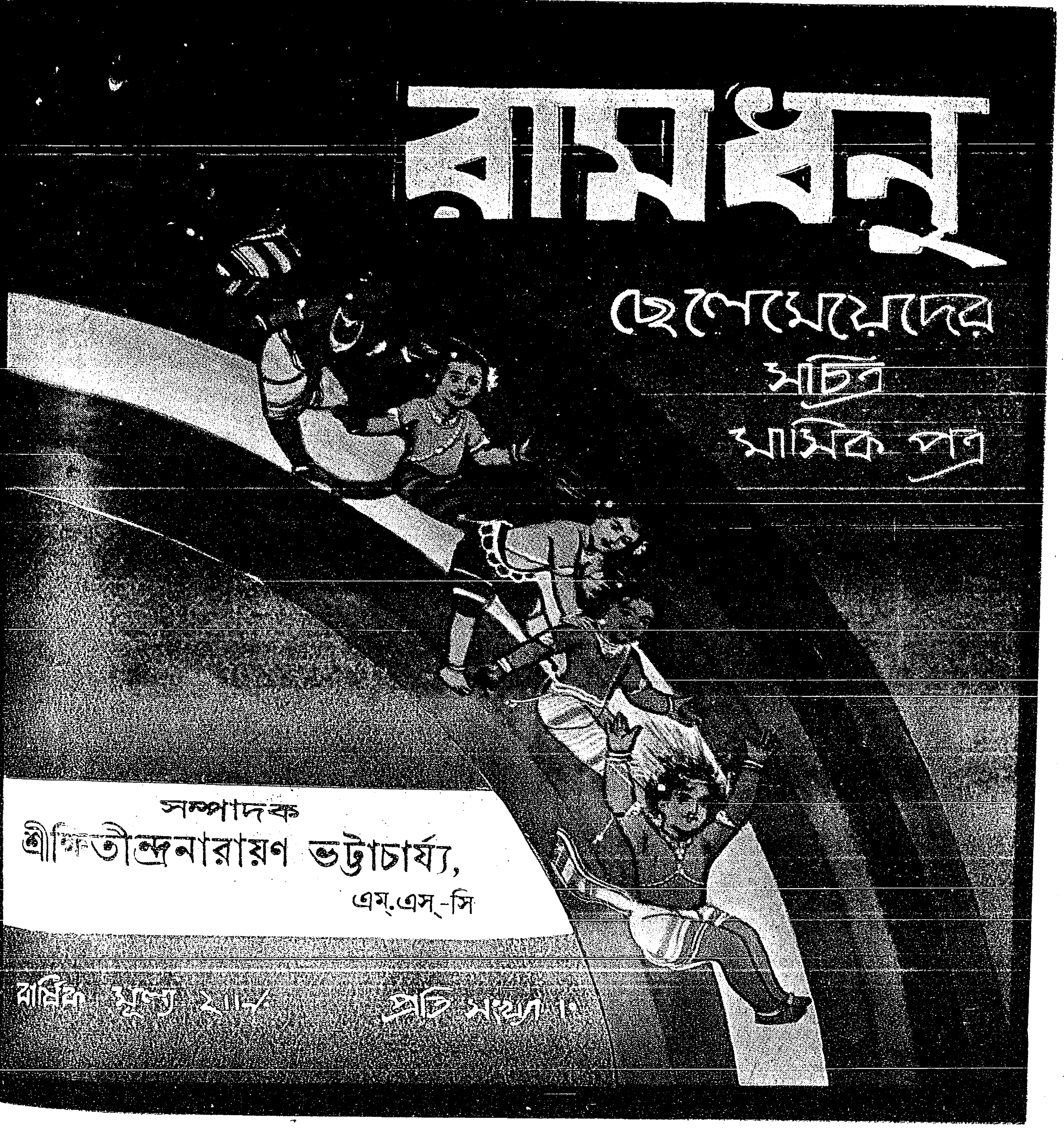

কার্য্যালয়

১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C-1641

আবার এল দোল!

দোলের দিনে শুধু রং মাখালেই চলবে না,—

মিষ্টিমুখেরও ব্যবস্থা করতে হবে;

এবং তার জন্যে আগে চাই

লক্ষ্মী ঘি

উৎসব-আয়োজনে, পূজা-পার্ব্বণে, নিত্য প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি অপরিহার্য্য।

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি'এর তুলনা নেই।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

৪র্থ বর্ষ　　বৈশাখ, ১৩৪৮　　চতুর্থ সংখ্যা

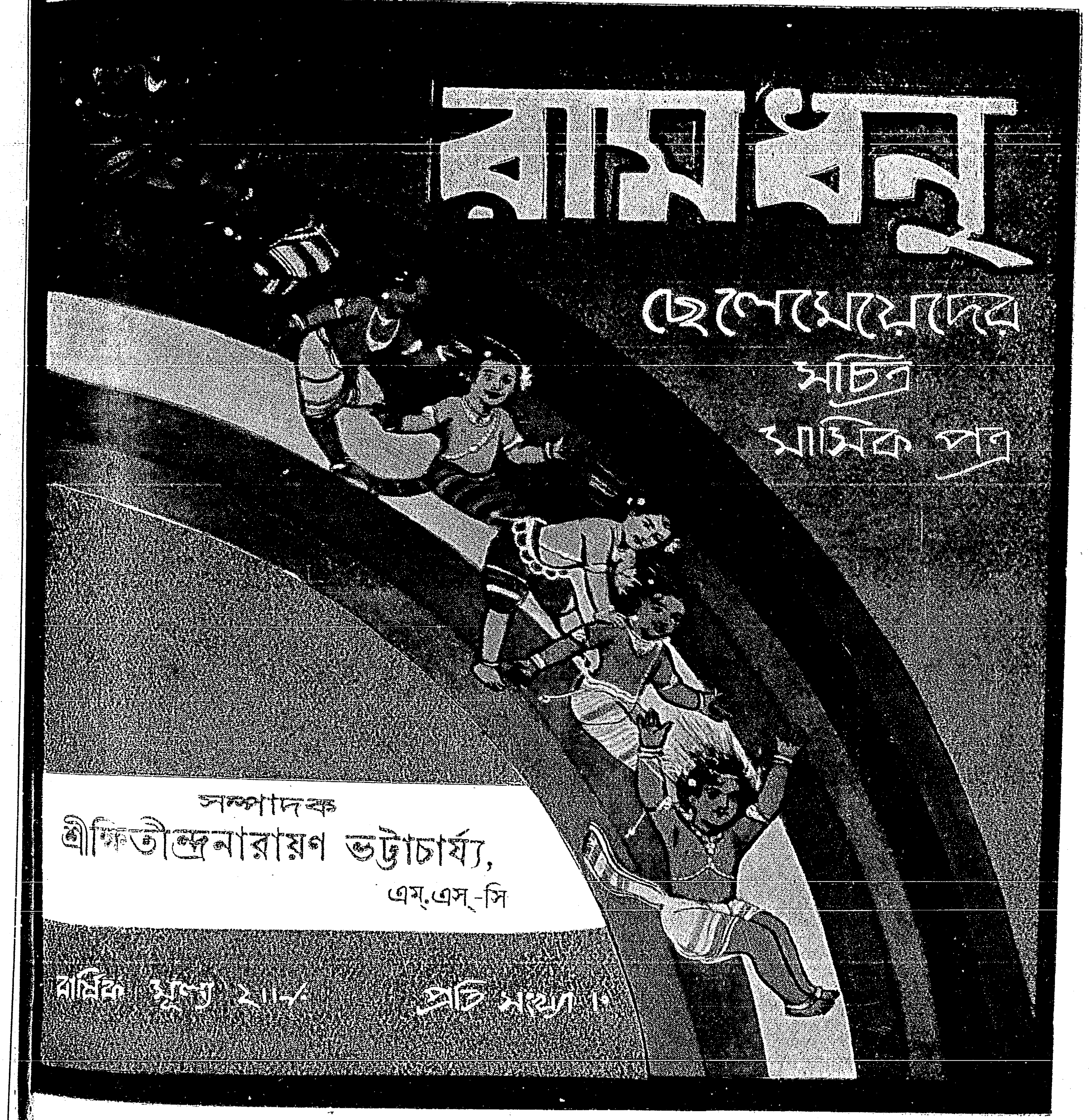

কার্য্যালয়

১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড়, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৶০, ষাণ্মাসিক ১৶০ ; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি
প্রণীত

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ব্যাবহারিক রসায়নে (Applied Chemistry) সুপণ্ডিত
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য এমন অনেক রাসায়নিক জিনিষ আছে যাহা আমরা বেশ চড়া দামেই বাজার হইতে কিনিয়া আনি; অথচ ইচ্ছা করিলে সেগুলি অতি অল্প খরচে ঘরেই তৈরী করা যায়। এই বইখানিতে সরল, সহজবোধ্য ভাষায় তাহারই উপায় বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে যাঁহারা অতি অল্প মূলধনে রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করিয়া ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদেরও বইখানি খুব কাজে আসিবে।

'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রশংসিত। বাঁধান মলাট। মূল্য এক টাকা।

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

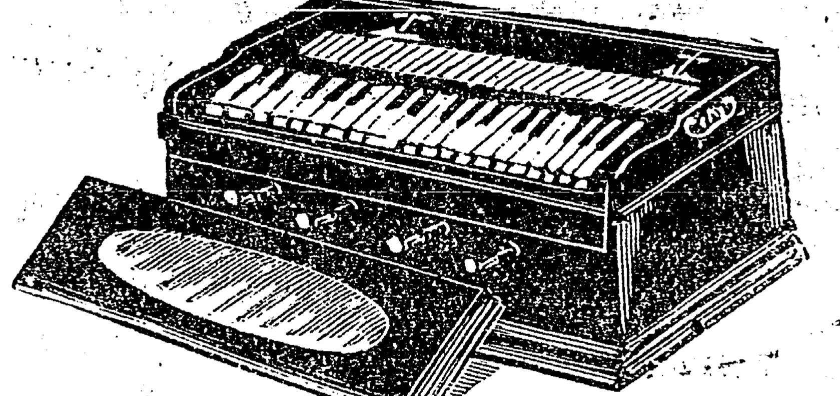

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং'র

হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং
৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা ; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

আমাদের এ বছরের পূজা বার্ষিকী—

(প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল)

'**মায়ামুকুর** যে কোন বিলাতী বার্ষিকী অপেক্ষা রূপে, রংয়ে ও লেখায় যে নিকৃষ্ট নহে তাহা পুস্তকটি হাতে পড়িবা-মাত্রই মনে হয়।

অথচ দাম মাত্র – **দেড় টাকা**

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে এরূপ অল্প মূল্যে এমন সুন্দর একখানি পুস্তক যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ দেব সাহিত্য-কুটীরের শিশুদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা। বাংলার খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা অগণিত রঙিন ও একরঙা চিত্র ও বিখ্যাত বহু সাহিত্যিকের মধুর রচনায় সমৃদ্ধ এই পুস্তকটি শিশুদের মনের খোরাক তো যোগাইবেই, বড়রাও না পড়িয়া পারিবে না।'—

আনন্দ বাজার

এ ছাড়া অমৃতবাজার পত্রিকা, আজাদ, মাতৃভূমি, এডভান্স, যুগান্তর, মৌচাক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাগজে উচ্চ প্রশংসিত।

বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত

"বলীদের গল্প"

দেশ-বিদেশের পালোয়ানদের সচিত্র কাহিনী অতি সরসভাবে লিখিত, বাংলা দেশে এরূপ বই এই প্রথম। রাশি রাশি হাফটোনচিত্রে শোভিত। মূল্য—১৲ টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত

"রঙিন-আকাশ"

রঙ ফলাইয়াছেন কারা জানো, তাঁরাই এখনও পর্য্যন্ত তোমাদের পড়িবার ঘরে আছে, সেই পরিচিত লেখকগণ। (নানা গল্পে, কবিতায় নাটিকায় ছবিতে ছাপাছাপি) দৈনিক কাগজে সমালোচনা বোধ হয় দেখছ। মূল্য—১৲ টাকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ

হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস

২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

হাস্য ও রহস্য

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।

সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ॥৵০

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস। রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥০

নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প

সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৵০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)

বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ॥৵০

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

আবিষ্কারের গল্প

দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী।

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই, চমৎকার ছবি। দাম—॥/০

আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক্ টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্, কলিকাতা)

ছেলেমেয়েদের খুব ক'রে প্রাণ ভ'রে হাস্‌তে দিন্‌ !

ওদের দেহমন সারাদিন স্বাস্থ্যে ভালো রাখবার ওই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায় এবং আপনি নিজেও খুব ক'সে হেসে নিন্‌—পরমায়ু বাড়াবার ওর চেয়ে মহৌষধ আর নেই। হাসির ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য্য আর কী আছে ?

—আমাদের প্রকাশিত অপর্য্যাপ্ত হাসির এই সব বই—

শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত

পথের রাত্রি	॥০
এক পেয়ালা চা	।৵০
গল্প ঠাকুরদা	।৵০

খাঁটি বাংলা শেখবার জন্যেই বুদ্ধদেবের বই পড়া দরকার—প্রত্যেক ছেলে-মেয়েরই। হাল্‌কা ঝর্‌ঝরে প্রাণবান্‌ ভাষা—তার ভেতর দিয়ে হাসির ফল্গুস্রোত ঝির্‌ ঝির্‌ ক'রে বয়ে চলেছে—আমাদের চারধারে, আমাদের জীবনেই, যে-সব মজার গল্প অহরহ ঘট্‌ছে তারই রসালো কাহিনী। জীবনকে এবং জগতকে নানা দিক থেকে, বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা ভাবে, নানান্‌ রূপে জানবার জন্যে, ছেলে-মেয়েরা যাতে পূরোপূরি মানুষ হতে পারে তার জন্যেই, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে হাসির গল্প—বিশেষ ক'রে বুদ্ধদেবের গল্প—পড়তে দেয়া উচিত। বড়োরা পড়্‌লেও ক্ষতি নেই !

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু লিখিত

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি	।৵০

পরশুরাম, বুদ্ধদেব বসু এবং শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পরে গৌরাঙ্গপ্রসাদ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে এনেছেন। আন্‌কোরা নিজস্ব ষ্টাইল্‌, ইডিয়ম্‌-বহুল ভাষা, নতুন ধরণের প্লট্‌—এই সব কিছুর ভেতর দিয়েই গৌরাঙ্গ-প্রসাদ যে আলাদা জাতের হাসির গল্প দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না, ছেলেরা-বুড়োরা তা সমভাবে উপভোগ করবেন। বুদ্ধদেবের পরেও যে আরও সহজ ভাষা, স্বচ্ছ ইডিয়ম্‌, এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী আনা যায়, এবং শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পরেও যে প্রাণখোলা প্রচণ্ড হাসি হাসানো সম্ভব—গৌরাঙ্গপ্রসাদের অসামান্য প্রতিভায় সেই বিস্ময়কর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। শিশু-সাহিত্যে এ-বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই—এমন কি বাংলা সাহিত্যে বহুদিনের মধ্যে একখানি উপভোগ্য বই—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। সেই সঙ্গে শৈল চক্রবর্ত্তীর অসংখ্য অজস্র মজার ছবি।

—আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য নতুন বই এবং ভালো বই—

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
- মণ্টুর মাষ্টার (২য় সং) ।৵০
- মানুষের উপকার করো (যন্ত্রস্থ) ।৵০

শ্রীধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী সহযোগে
- এক রোমাঞ্চকর য়্যাড্‌ভেঞ্চার ।৵০

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সহযোগে
- জীবনের সাফল্য ।৵০

শ্রীসুকুমার দে সরকার
- অরণ্য রহস্য ।৵০

- আরতি (আমাদের সচিত্র বিরাট গল্পসঞ্চয়নী) ১৲০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু
- রাজার ছেলে ॥৵০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়
- বীরবাহুর বনিয়াদী চাল ।৵০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
- আদিম দ্বীপে ।৵০
- গুজবের জন্ম ।৵০
- লালন ফকিরের ভিটে ।৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
- আজব দেশে অমলা ॥০
- মানুষ পিশাচ ৸০
- মড়ার মৃত্যু ॥০
- ছায়া কায়ায় মায়াপুরে ।৵০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
- ব্যোমদাসের মাদুলি ।৵০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
- দুর্গম পথে ॥৵০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া

দুর্ব্বল শিশুরা

অল্পদিনের মধ্যেই

পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন— (Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—॥৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

নববর্ষের প্রার্থনা

"ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা।"

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৮ | ৪র্থ সংখ্যা

নববর্ষ

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্

এস এস নবীন অতিথি,
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিয়া সচঞ্চল গীতি।
ধরার যা কিছু আছে অপ্রমত্ত সৌন্দর্য্য সুষমা,
সমুদ্রের শ্যামাশোভা, হিমাদ্রির রজত সিতিমা,
একত্র করিয়া সবে একবার এস গো নামিয়া ;
চাহি না স্বর্গের শোভা, তৃপ্ত রব সেইটুকু নিয়া।
এবার এনো না সাথে পুরাতন রিক্ত আবিলতা,
অতিপক্ক, নতশির, কর্ম্মভীরু, শুষ্ক প্রবীণতা,

মূঢ়তার জয়নাদ, বাঙ্গালীর গৃহদ্বারে আর,
আলস্যের ঐকতানে ধরা মাঝে ক'র না প্রচার।
এবার দেখিতে চাই চিদানন্দ কল্যাণের বেশে
পল্লবিয়া শুষ্ক হিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইবে এসে,
শক্তিপুষ্ট দু'টি হাত তুলি উচ্চে বাঙ্গালীর মাথে,
আশীর্ব্বাদ করি তব জীবনের প্রথম প্রভাতে।

ছুটির ক'দিন

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌ এস্‌-সি (ক্যাল্), পি-এইচ্‌ ডি (ক্যান্টাব্)

এর আগে পায়ে হেঁটে বেড়াবার কথা তোমাদের কিছু কিছু জানিয়েছিলাম আর ঘুরতে ঘুরতে ইংলণ্ডের সব চেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কাউন্টি কর্ণওয়ালের শেষ সহর পেনজান্সে গিয়ে আড্ডা গেড়েছিলাম, সে কথা যারা আমার আগের লেখাগুলি পড়েছ তাদের হয়ত মনে থাকতে পারে। সেখান থেকে কিছু দূরে য়্যাটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে আছে শিলি দ্বীপপুঞ্জ। শুনেছিলাম এ দ্বীপগুলি নাকি খুব সুন্দর দেখতে, কাজেই পেনজান্সে আলাপ-হওয়া জয়শেখর ব'লে একটি সিংহলী ছাত্রের সঙ্গে একদিন ঠিক করলাম যে এই দ্বীপগুলি দেখতে যেতে হবে। কাছাকাছি দেখবার মতন জায়গা সব দেখা

হয়ে গিয়েছিল, কাজেই পেনজান্স ছাড়ার আগের দিন "শিলি"তে যাওয়া ঠিক হয়েছিল।

যাবার দিন সকালে উঠতে কিন্তু আমার দেরী হয়ে গেল। শিলিতে যাবার দু'টি ষ্টীমার আছে। একটি ছাড়ে সকাল আটটায়, আর দ্বিতীয়টি ন'টায় ছাড়ে। অনেক কষ্টে দৌড়তে দৌড়তে যখন ষ্টীমার-ঘাটে হাজির হওয়া গেল তখন আটটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে। প্রথম ষ্টীমার ছেড়ে ত' গিয়েছেই, দ্বিতীয় ষ্টীমারটিও প্রায় অর্দ্ধেক ভর্ত্তি হয়ে এসেছিল। টিকিট কেটে ষ্টীমারের এদিক্ থেকে ওদিক্ পর্য্যন্ত টহল মেরে দেখে এলাম, যদি জয়শেখরের দেখা মেলে, কিন্তু তার সেই ঘোরতর কৃষ্ণমূর্ত্তি কোথাও খুঁজে পেলাম না। বুঝলাম, বন্ধু প্রথম বোটেই চলে গেছেন। হতাশ হয়ে জাহাজের সামনের দিকে একটি বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়লাম।

ষ্টীমারটি ছোটই। কলকাতার গঙ্গায় বোটানিক্যাল গার্ডেন যাবার যে দোতলা ষ্টীমার দু'-একখানা আছে, অনেকটা তারই মতন, কি তার চেয়ে একটু বড় হবে। তবে ফার্ষ্ট ক্লাস, থার্ড ক্লাস কিছু নেই, সবই এক ক্লাস, যে যেখানে খুসী বসে যেতে পারে। জাহাজের যাত্রীরা সবাই আমারই মতন ছুটি কাটাতে বার হয়েছে আর কথাবার্ত্তার টান শুনে মনে হ'ল শতকরা নব্বই জন এসেছে খাস লণ্ডন থেকে। এই এত সাদা চামড়ার মধ্যে একটি কালা আদমীর দিকে সকলেই একটু অবাক্ হয়ে তাকাচ্ছিল। আমিও পাল্টা সবার দিকে খুব প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। আমার কাছেই আমার বয়সী একটী ছেলে বসে ছিল। তার দিকে চোখ পড়তে সে একটু মুচকে হাস্‌ল, ইচ্ছাটা আলাপ করার। ও দেশে আলাপের এক প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে দৈনিক আবহাওয়ার আলোচনা করা। কাজেই আমি বললাম, "দিনটা চমৎকার, নয় কি?" ছেলেটি এরই যেন অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করতেই উত্তর দিল, "চমৎকার। বেড়াবার জন্য এর চেয়ে সুন্দর দিনের কথা আর ভাবা যায় না।" এই থেকে আলাপ জমে গেল। ছেলেটির নাম টেড্ কিরবী। বাড়ী সমারসেট্। লণ্ডনে এন্‌জিনীয়ারিং পড়ছে। মোটরে ক'রে এই কাউন্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছুটির ক'দিন কাটাবার জন্য। কথায় কথায় তাকে

জিজ্ঞেস করলাম, "ভায়া, সমুদ্র-যাত্রাটা তোমার আসে কি রকম? ঐ কি বলে, গা-টা গুলায় না ত'? সমুদ্র এখানে নাকি একটু রুদ্রপ্রকৃতির, নাড়ীভুড়ি নিয়ে শোনা যায় নাকি বড় বিশ্রী রকম নাড়া-চাড়া করে থাকে। আর তার উপর যে কলার ভেলার মতন ষ্টীমার!" কির্বী বল্লে, "আরে ছোঃ! আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু পেলে? এই কাঠ ছুঁয়ে বলছি, এ পর্য্যন্ত কখনও ত' শরীর খারাপ হয় নি আর নিদেন পক্ষে বছরে ত' বার কতক মামার বাড়ী আয়ার্ল্যাণ্ডে যেতে হয়. সে সমুদ্রকেও ত' আর এঁদোপুকুর বলা যেতে পারে না।" আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, "যাক্, তোমার মতন একজন ওস্তাদ নাবিক পাশে থাকলেও ভরসা। নিশ্চিন্ত হয়ে য়্যাট্‌লান্টিককে কলা দেখান যেতে পারবে।" এই সব খোসগল্পের মধ্যে ষ্টীমার ছাড়ল। প্রথম মাইল দুয়েক তীরের গা ঘেঁষেই চলল। কির্বী পেনজ্যান্সে এক জেলের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিল, অবশ্য পয়সা দিয়ে। সেই জেলে আশ্রয়-দাতার কাছ থেকে সে এ তল্লাটের বহু স্থানীয় ইতিহাস যোগাড় করেছিল। সেই সব ইতিহাস শুনতে শুনতে যেতে লাগলাম। পেনজ্যান্স ছাড়িয়ে মাউস্ হোল (Mouse hole) ব'লে একটি পাড়াগাঁ দেখা গেল। গাঁটি নাকি এককালে ভীষণ চোরের আড্ডা ছিল। ঐ গাঁয়ের আশ-পাশে সমুদ্রের উপর থেকে উঠে-যাওয়া পাহাড়ের গা গর্ত্তে গর্ত্তে ভর্ত্তি, চোরের দলের আড্ডা ছিল নাকি এই সব গর্ত্তের ভিতর! তাদের কাজ ছিল ফ্রান্স থেকে মদ, রেশম প্রভৃতি জিনিষ ছোট ছোট জাহাজে নিয়ে এসে এই সব গর্ত্তের মধ্যে রেখে দেওয়া আর সুবিধা মতন সেগুলি ইংলণ্ডের ভিতর চালান দেওয়া। এই সব জিনিষের উপর শুল্ক খুবই বেশী, কাজেই শুল্ক-বিভাগ এই সব চোরেদের ধরার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের লুকাবার জায়গাগুলি কিছুতেই খুঁজে পায় নি। শেষে শুল্ক-বিভাগের এক কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে এই চোরেদের দলে ঢুকে এদের গুপ্তস্থান দেখে যায়; তখন এই দল ধরা পড়ে। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, এই রকম চুরি-করা আমদানী এখনও অনেক চলছে, শুল্ক-বিভাগ তার ক'টাকেই বা ধরতে পেরেছে!

এই সব গল্প হ'তে হ'তে ষ্টীমার ইংলণ্ডের শেষ প্রান্ত ল্যাণ্ডস্ এণ্ড ছাড়িয়ে গেল। এইবার আরম্ভ হ'ল য়্যাটলান্টিক মহাসাগর। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারও বেশ

দোদুল দোলায় দুলতে আরম্ভ করল। কির্বী এতক্ষণ বেশ গল্প করছিল, হঠাৎ দেখি তার গল্পের স্রোত থেমে গেছে, সে যেন সমুদ্রের শোভা দেখতে একেবারে মশ্‌গুল হয়ে গেছে! ক্রমে ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল। একটু পরেই 'আসছি' ব'লে ভেতরে চলে গেল। জাহাজের একটি ষ্টুয়ার্ড কিছুক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন সে একটি খালাসীকে ডেকে কি বলল, খালাসীটি গিয়ে চট্ ক'রে গোটাকতক ছোট ছোট বালতী এনে হাজির করল। ষ্টুয়ার্ডটি এসে প্রত্যেকটি আরোহীর মুখ দেখে যেতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে খালাসীটিও এক এক জনের সামনে এক একটি বালতী রেখে যেতে আরম্ভ করল। বালতী রাখার তাৎপর্য্য একটু পরেই বোঝা গেল। কাছেই একটি মহিলা এতক্ষণ রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ছিলেন, বালতী রাখা মাত্রই দু'হাতে পেট চেপে "ওয়াক"! এই সিগ্‌ন্যালের সঙ্গে সঙ্গে চারি পাশে একঘেয়ে 'ওয়াক-ওয়াক' ধ্বনি সুরু হয়ে গেল। আমারও পেটের ভিতরটা এক রকম মোচড় দিতে আরম্ভ করল। কোন দিকে না চেয়ে এক দৌড়ে জাহাজের একেবারে সামনে খোলা জায়গায় এসে হাজির হ'লাম। সমুদ্রের দমকা হাওয়ায় গা গুলান ভাবটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমারই মতন আরও দু' একজন বুদ্ধিমান্ এর আগেই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদেরই একজন হেসে বল্‌লেন, "মশায়, এর আগেই আপনার এখানে আসা উচিত ছিল।" ঘাড় নাড়া ছাড়া বেশী কথাবার্ত্তা বলার শক্তি তখনও ছিল না, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে ফেরবার সময় এই জায়গাটাতেই আড্ডা গাড়ব। বৃষ্টিই হোক আর জলপ্লাবনই হোক, জাহাজের ভিতর আর যাওয়া নয়।

আর আধঘণ্টা যাবার পর দূরে জমী দেখা গেল। তার কিছুক্ষণ পরে জাহাজ শিলি দ্বীপপুঞ্জের সব চেয়ে বড় দ্বীপ "সেণ্ট মেরী"তে এসে থামল। কির্বীর খোঁজে গিয়ে দেখি বেচারার চোখ জলে ভর্ত্তি, মুখ ফ্যাঁকাসে। আমাকে দেখে বেচারা বল্‌লে, "বড়ই নাকাল করেছে, দাদা!" বেচারার চেহারা দেখে ঠাট্টা করার আর প্রবৃত্তি হ'ল না, বল্‌লাম, "ডাঙ্গায় নেমে হাঁটা চলা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ষ্টীমার-ঘাটে নেমে ঠিক করা গেল যে ট্রেসকো বলে আর একটী দ্বীপ দেখে এখানে ফিরে আসা যাবে। এখানে ঘুরে ফিরে তার পর ট্রেসকো গেলে যদি

দেরী হয়ে যায় তবে এইখানেই পড়ে থাকতে হবে কারণ জাহাজ চারটার সময় ছেড়ে চলে যাবে।

ষ্টীমার-ঘাটেই একটি নৌকা ঠিক করা গেল। নৌকা করেই ট্রেসকো যেতে হবে, ষ্টীমার সেখানে যাবে না। নৌকায় উঠে এক কাণ্ড! কির্‌বী ত' প্রথমে নৌকায় চড়বে না। চড়ে, নৌকা চলতেই আবার ওয়াক্ ক'রে করল বমি। সৌভাগ্যের বিষয় ঐ একবারই সে বমি করেছিল, নইলে হয়ত আর সকলেরও ও রোগের ছোঁয়াচ লেগে যেত। অবশ্য পথও খুব দূরের নয়, মিনিট কুড়ি পঁচিশের হবে।

শিলির দ্বীপগুলির মধ্যে সেণ্ট মেরী আর ট্রেসকো এই দুটিই যা বড়। সেণ্ট মেরী লম্বায় মাইল পাঁচেক ও চওড়ায় মাইল দুয়েক এই রকম হবে। ট্রেসকো ওর চেয়ে কিছু ছোট। আর সব দ্বীপগুলি একেবারেই নগণ্য। সব চেয়ে ছোটটি বোধ হয় হাত কুড়িক লম্বা আর হাত পাঁচেক চওড়া হবে। সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে তখন অনেক এ রকম বাচ্চা দ্বীপ জলের তলায় মিলিয়ে যায়।

ট্রেসকোয় একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। ইংলণ্ডের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটি সব চেয়ে গরম, তার চেয়ে আবার শিলি দ্বীপগুলি আরও গরম। এর নমুনা পেলাম প্রথমে নেমে নারকেল গাছ দেখে। বহুদিনের পরিচিত গাছটিকে এ বিদেশে দেখে মনে হ'ল কত কালের হারানো সঙ্গীকে যেন দেখতে পেলাম। বাগানের মধ্যে এ ছাড়া কলা গাছ, আনারস প্রভৃতি হয়েছে দেখলাম। ইংলণ্ডে এ সব গাছ ত' দেখা যায় না, এখানেও এগুলি অনেক যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ট্রেসকোর বাগানের একধারে রয়েছে একটি বাড়ী, এর নাম হচ্ছে "নেপচুনের ধনাগার।" ঝড়ে ভেঙ্গে-যাওয়া, ডুবে-যাওয়া অনেক জাহাজের মাস্তুল, হাল, এমন কি অনেক খোল পর্য্যন্ত ভেসে এসে এই ডাঙ্গার উপর আছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সব অংশই কুড়িয়ে এখানে রাখা হয়েছে। এই বাড়ীর উঠানেই গত যুদ্ধে জার্ম্মান্‌দের ব্যবহার করা একটি "মাইন" (জলের বোমা) রয়েছে। এটিও ভাসতে ভাসতে চড়ায় এসে লেগেছিল, ভেতরের বিস্ফোরক বার করে নিয়ে শুধু খোলটি রেখে দেওয়া হয়েছে। প্রকাণ্ড খোল, একজন লম্বা মানুষ অনায়াসেই

তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বিস্ফোরক ভরা থাকলে এ যে অনায়াসেই হাতী হাতী জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারবে তা খুবই বোঝা যায়।

ট্রেসকো বাগানের এক ধারে একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর বসে লাঞ্চ খাওয়া গেল। আমি সঙ্গে কিছুই খাবার নিয়ে যাই নি। কির্‌বীর সঙ্গের অন্য লোকেরাই আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের নিয়ে-যাওয়া খাবার-দাবার খাইয়ে দিল। তিন ধারে য়্যাট্‌লাণ্টিক, মধ্যে পাহাড়ের উপর বসে স্যাণ্ডউইচ্ চিবাবার কথা কখনই ভুলব না।

ট্রেসকো থেকে ফিরে এলাম সেণ্ট মেরী। এই জায়গাটা ইংরাজদের দখলে হ'লেও লোকগুলিকে দেখতে অনেকটা ফরাসীদের মতন, বিস্তর ফরাসী বোধ হয় এখানে এককালে বাস করে থাকবে। সেণ্ট মেরী গাঁ-টি খুবই ছোট্ট। এখানে একটি মাত্র মোটর-গাড়ী আছে, অবশ্য তার যে দরকারও আছে তা নয়, ভারী ত' পাঁচ মাইল × দু' মাইল জায়গা! এখানে গাধায় টানা ছোট ছোট যে গাড়ীগুলি দেখা গেল সেগুলিই এ জায়গার উপযুক্ত ব'লে মনে হ'ল। ঘুরে ফিরে সব দেখতে দেখতে ফেরবার সময় হয়ে গেল। সেণ্ট মেরীর এক মাত্র হোটেলে (দু'খানি ঘর, নাম কিন্তু 'হোটেল য়্যাট্‌লাণ্টিক') চা খেয়ে ষ্টীমারে এসে দেখি শ্রীমান্ জয়শেখর ষ্টীমার আলো ক'রে—থুড়ি, কালো ক'রে—বসে আছেন। আমাকে দেখেই একগাল হাসি। শ্রীমান্‌কে আর কির্‌বীকে নিয়ে জাহাজের সামনে সেই খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে কাঠের উপর রুমাল বিছিয়ে বসা গেল। ফেরার সময় হাওয়া আমাদের অনুকূলেই থাক কি বাইরে বসার জন্যই হোক কির্‌বী সুস্থ শরীরেই সারা রাস্তাটা কাটিয়ে দিল। ফুরফুরে হাওয়ায় সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করতে করতে সমস্ত পথটা বেশ স্ফূর্ত্তিতে চলে এলাম। সকালের কথাটা মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন!

যুদ্ধে যাবেন খুড়ো

শ্রীসমর সরকার

বর্দ্ধমানের নন্দ খুড়ো—নাম শুনেছ তাঁর ?
যুদ্ধে যাবেন—তাই দিয়েছেন পাৎলুনের অর্ডার।
বঙ্গবাসী ভীষণ ভীতু—এ অপবাদ জানা,
তা বলে ত' নেইক' তাদের যুদ্ধে যেতে মানা ?
নন্দ খুড়ো এই যুদ্ধে দেবেন পরিচয়
বঙ্গদেশীর যুদ্ধ করা শক্ত কিছুই নয়।
চোদ্দ সালের মহাযুদ্ধেও যেতেন তিনি ঠিক,
যুদ্ধ-খাতায় নাম লেখাতে ধর্‌লো পথে ফিক্‌।
তার পরেতে পঁচিশ বছর আকুল প্রতীক্ষায়—
নন্দ খুড়োর যুদ্ধে যাবার সুযোগ মিলে যায়।
নন্দ খুড়ো এইবারেতে সকল বাধা দ'লে।
পাৎলুনেতে বেল্ট্‌ আঁটিয়া যুদ্ধে যাবেন চ'লে।

ইয়োরোপ আর আফ্রিকাতে—মিশর দেশের পাশে
জার্ম্মান্‌ বা ইতালীয়ান্‌ হুম্‌কি দিতে আসে।

নন্দ খুড়ো তাগ বুঝিয়া দেবেন গুলি ছুঁড়ে,
ছুটবে গুলি মেঘের মাঝে সবার ভুঁড়ি ফুঁড়ে।
আবার যদি লড়তে আসে নাৎসী-বিমান, হায়,
য়্যান্টি-এয়ার-ক্যারাফ্‌ট্‌ মেরে নামিয়ে দেবেন তায়।
জলের নীচে সাবমেরিনে কর্‌লে জ্বালাতন
'ডেপ্‌থ্‌ চার্জে'র ব্যাপারখানা বুঝ্‌বে বাছাধন।
তার পরেতে যুদ্ধ জিতে নন্দ খুড়ো ফির্‌বেন,
আউট্‌রামের ঘাটের ধারে সায়েবসুবো ঘির্‌বেন।
দেশের লোকে গর্ব্ব ক'রে গলায় দেবে মালা,—
"থ্রী চিয়ার্‌স্‌ ফর্‌ নন্দ খুড়ো"—কর্ণ ঝালাপালা।

নন্দ খুড়ো বন্ধ ঘরের লৌহ আগড় খুলে
যুদ্ধে যাবেন সন্দেহ নেই, বর্দ্ধমানকে ভুলে।
এখন যেন দিও না কেউ যাত্রাকালে হেঁচে,
কিংবা যেন 'কূর্ম্ম' ব'লে টিক্‌টিকি নাচ নেচে।
তবে হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা—উচিত কথাই বটে,
নন্দ খুড়ো যুদ্ধে যাবেন, খুড়ী না যান চ'টে!
তার ওপরে রইল ঘরে পুত্রকন্যাগণ,
ফেলে যেতে, ঠিক বলেছ, সর্‌বে কি আর মন ?
এই রে দেখ, তোমরা সবাই বাজে লোকে মিলে
নন্দ খুড়োর যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করে দিলে!
নন্দ খুড়োর যুদ্ধে যাবার কত দিনের সাধ—
এমনি করেই, হায়, তোমরা সাধ্‌লে তা'তে বাদ ?

আমাদের অস্পৃশ্য বন্ধু

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ

পক্ষিজগতে যদি কোনও সমাজ থাকে তবে নিশ্চয় তাহারা শকুনীকে 'এক ঘরে' করিয়াছে বলিতে হইবে। শকুনী তাহাদের নিকট 'হরিজন' পাখী। পক্ষী-মহলে শকুনীর জল অচল—তাহাদের সহিত অন্য পাখীর উঠা-বসা এবং সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্ম কিছুই চলে না। অবশ্য বাদুড়ের মত শকুনীকে সকলেই যে 'বয়কট' করিয়াছে তাহা নয়। পক্ষিজগতে যাহাদের সম্মান নাই, রবাহূত বা অনাহূত হইয়াই যাহারা ভোজ-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়—যাহাদের লোকে দেখিলেই 'দূর ছাই' করে সেই কাক একমাত্র স্বার্থসিদ্ধির সময়ে শকুনীর সাহচর্য্য গ্রহণ করে।

একটি অল্পবয়স্ক শকুনী

শকুনীর ধোপা-নাপিত বন্ধ—মজলিশ-বৈঠকে তাহারা 'হুঁকো' পায় না। শকুনীও নিজেকে অস্পৃশ্য জানিয়া বাসা বাঁধে গিয়া গ্রামপ্রান্তের কোনও শিমুল গাছে অথবা পত্রবিহীন ছন্নছাড়া কোনও অশথ গাছের ডালে। শকুনীর বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা আদৌ মনোরম নয়।

কেবল পক্ষিকুল কেন, মনুষ্যসমাজও শকুনীকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। অথচ আশ্চর্য্য, শকুনী কিন্তু নিঃশব্দে সকলের সেবা করিয়া যায়! শকুনী না থাকিলে মানুষকে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া কবে বনবাস গ্রহণ করিতে হইত! শকুনীর এত যে গুরুতর কাজ—সেজন্য কিন্তু তার একদিনের জন্যও হরতাল নাই বা মাহিনা বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মঘট নাই।

শকুনী রাত্রি বেলায় তাহার বাসায় থাকে আবার ভোর হইতেই সে তাহার আবর্জ্জনা পরিষ্কারের কাজে বাহির হইয়া যায়—আকাশের বহু ঊর্দ্ধে। এখান হইতে শকুনী পর্য্যবেক্ষণ করে কোথাও কোনও মৃত প্রাণী পড়িয়া আছে কিনা।

প্রায় এক মাইল দেড় মাইল উপর হইতে শকুনী কিরূপে দেখিতে পায়—কোন্ ভাগাড়ে তাহার খাদ্য পড়িয়া আছে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

কেহ কেহ অনুমান করেন, উহাদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর; কিন্তু অত দূর হইতে ঘ্রাণশক্তি দ্বারা বিশেষ কোনও কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না। উহাদের দৃষ্টি-শক্তি দূরবীণের মত প্রখর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে কাক, শৃগাল এবং কুকুর প্রভৃতি প্রাণিগণও উহাদের আহার্য্য সংগ্রহের যথেষ্ট সাহায্য করে বলিয়া অনুমান করা যায়।

পত্রবিহীন গাছে শকুনীর বাসা

কোনও গ্রামে একটি গরু বা মহিষ মরিলে কুকুরগণ অনায়াসেই সেই সংবাদ পাইয়া থাকে। তার পর কাকের দলও ক্রমে ক্রমে খবর পায়। মৃতদেহটি যখন কোনও ভাগাড়ে কি নদীর মধ্যে ফেলা হয়, কাক, শৃগাল বা কুকুরের দল তখন তাহা লইয়া জটলা আরম্ভ করে। দূর নীল আকাশের কোল হইতে শকুনী বুঝিতে পারে নিশ্চয় কোনও ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখন তাহারা একে একে নীচে নামিয়া আসে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই রকমের শকুনী দেখিতে পাওয়া যায়—শকুনী ও গৃধিনী। গৃধিনীকে কোনও কোনও অঞ্চলে চলতি কথায় 'গিন্নী শকুন'ও বলা হয়। ইহাদের কাণের দুই পাশে দুইটি লাল কাণ-পাশার মত থাকে।

শকুনীর আকৃতি দেখিয়া সহজেই মনে হয়, ইহারা বেশ শক্ত এবং অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে। কোনও ভাগাড়ে বা নদীর ধারে যখন 'মড়ি' লইয়া শকুনীর দল বসে, তখন তাহাদের ঢিল মারিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদের অদ্ভুত আত্ম-রক্ষার কৌশল! কেহ ঢিল ছুড়িয়া তাড়া করিলে ইহারা মোটেই ভয় পায় না। ঢিলটির দিকে ইহাদের তীব্র দৃষ্টি থাকে। ঢিলটি মাথায় লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলে সুকৌশলে অমনি ঘাড়টি নীচু করিয়া মাটির সহিত সমান্তরাল করিয়া ফেলে। গায়ে ঢিলটি লাগিবার সম্ভাবনা থাকিলে উহারা শক্ত পা খা খা নি একটু উঁচু করিয়া ধরে অথবা একদিকে একটু সরিয়া বসে।

মৃত পশুর উপর শকুনীর পাল

কত প্রাণীই নিত্য মরিতেছে। তাহাদের সকলেরই যে চামড়া তুলিয়া লওয়া হয় এমন নয়। যে সকল প্রাণীর চামড়া শক্ত, কাক বা শৃগালে তাহা ছিঁড়িতে পারে না। শকুনী আসিয়া তাহার তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়া ঐ চামড়া তুলিয়া দেয়। তার পর অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ প্রাণীর মৃতদেহ অদৃশ্য হইয়া পড়ে—কেবল কঙ্কালটি মাত্র পড়িয়া থাকে।

শকুনী যদি না থাকিত তবে প্রত্যহ বহু প্রাণী পচিয়া যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিত মনুষ্যবাসের পক্ষে তাহা আদৌ উপযোগী নয়। শকুনীর আকৃতি যত কুৎসিৎই হউক, উহারা মানুষের যে উপকার করে তাহা মানুষ মাত্রেরই মনে রাখা উচিত।

দুলাল নং ১

[কাহিনী]

(রুণু, মণ্টু ও তাদের বন্ধুবান্ধবীদের জন্য লেখা)

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

শীলাদের গারাজ-ঘরের একটা কোণ এমন ভাবে তৈরী যে সেখানে শুধু মোটার নয়, মানুষও মাথা গলাতে পারে না। সেখানে জমা হয় থাকে থাকে বাড়ীর যত অদরকারী, গড়িয়ে-বেড়ানো জিনিষ, ঘিয়ের খালি টিন, ভাঙ্গা লণ্ঠন, তে-পায়ার একখানা পা, ৺নেকড়ে-কুকুরের খাবার গাম্‌লা, ছেঁড়া আইস্‌-ব্যাগ, আরো কী কী সব! একটা একটা ক'রে জড় হ'য়ে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তারই ওপর কয়েক মাস ধ'রে প'ড়ে আছে একটা ছেঁড়া তুলো-বেরুনো তাকিয়া, লাল টকটকে মখ্‌মলের কাপড়ে ঢাকা।

শীলা ক'দিন ধ'রে ভাব্‌ছে ঐ তাকিয়াটা কেটে কত কীই না করতে পারে! তার পোত্‌লা-পুত্‌লীর দু'দুটো বালিশ, দু'টো তাকিয়া, দু'টো পাশ-বালিশ, একটা ফরাস, এবং তার পরও বেশ খানিকটা মখ্‌মল হাতে থাকে। তুলোটা সব কাজে না এলেও তা নির্ব্বিবাদে তেলের কানেস্তারার মধ্যে গাপ ক'রে ফেলা যাবে। সেদিন দুপুরে শীলা ঠিক করলে আজই কাজটা হাসিল করে ফেল্‌তে হবে।

শিবরাত্রির উপোস ক'রে আর রাত জেগে বাড়ীসুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে পড়বার ভয়ে তিন তিনটে তাসের আসর বসিয়েছিল। কিন্তু শিবঠাকুর এসে তাঁর ভক্তদের একটু একটু ক'রে গা টিপে দিতে দিতেই সবাই পাটির ওপর অচেতনে ঘুমিয়ে পড়েছে, এ ওর গায়ে মাথা রেখে। এমন সুযোগ শীলার জীবনে মেলে নি। যেমন বেহুঁস হ'য়ে সবাই ঘুমুচ্ছে, তাতে তাদের কাণের কাছে সেলাই-কল চালালেও তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা নেই। শীলা ভাবে, শিবঠাকুরের দয়ায় তারা কী আর সারা দুপুরটা ঘুমোবে না!

ওপর থেকে টুলখানা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে শীলা নীচে নেমে আসে, তার পর বাড়ীর ভেতর থেকে গারাজ-ঘরের শেকলটা খোলে খুব সন্তর্পণে। ও মা, চাকরটা ত দুষ্টু কম নয়! এ তারই কাজ! তার প্যাক্‌-পেঁকী পুতুলটার আন্‌কোরা নতুন প্রথম ভাগ খানা কে অমন ক'রে ঘুস্‌টে রেখেছে গো? আর এই যে তার ছবি-ছকের ঘোড়ার মুণ্ডু, ভেড়ার ঠ্যাং, গরুর বাঁট,

মোরগের ঝুঁটি এবং আরো কি কি আঁকা কাঠের টুক্‌রোটা এখানে আন্‌লে কে? এ নিশ্চয়ই ভজনটার কাজ। দেখ না, তার এবার কী শাস্তিটা হয়!

শীলা আপন মনে বক্‌তে বক্‌তে গারাজ-ঘরের লুকোনো কোণটার কাছে টুল পেতে তার ওপর উঠে দাঁড়ায়। দেখে, লাল টক্‌টকে মখ্‌মলের তাকিয়াটার ওপর দিব্যি আরামে তার দিকে পেছন ক'রে শুয়ে আছে পাশের বাড়ীর মেনী বেড়ালটা, যাকে সে দু'টি চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। সে-ই ত ক'মাস আগে তাদের অমন হল্‌ফলে মোচার মত টিয়াটাকে দাঁড়ের ওপর থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল। অলবড্ডে বেড়াল-জাতটার ওপর শীলার সেই থেকে রাগ। পোড়া বেড়ালের লজ্জা নেই, হায়া নেই, ছোড়দা'র হাতে সে কি কম মারটা খেয়েছিল! আবার দেখ না, চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকে, মখ্‌মলের তাকিয়াটির ওপর আরামসে দিবানিদ্রা দিচ্ছেন! ওঠ্‌, শীগ্‌গির। শীলার হেঁচ্‌কানি খেয়ে বেড়ালটা মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু তাকিয়ার ওপর থেকে শীলার চোখ সরে না। ও মা, ও মা, কী সুন্দর গো! শাদা ধব্‌ধবে, পাঁশকুটে আর বাঘা-হল্‌দে রঙের তিনটে ছানা থাবা-গেড়ে ব'সে শীলার দিকে চেয়ে মিউ মিউ করে ডাক্‌তে লাগল। ধব্‌ধবেটা একটা থাবা দিয়ে তার নাকের ডগা থেকে এক ফুল্‌কি শিমুল তুলো ঝেড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করছে। তাকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! বাঘা-হল্‌দেটাও রূপে কম যায় না। শীলার ছবির বইয়ে, গলায় সবুজ ফিতে বাঁধা যে বেড়ালছানাটা তার দিকে ডব্‌ডবিয়ে চেয়ে থাকে, এটা যেন ঠিক সেই ছবি থেকে নেমে এসেছে। পাঁশকুটে একেবারে যেন পুতুলটি। সবে তাদের চোখ ফুটেছে। শীলার মত জীবকে তারা জন্মে দেখে নি। তাই তারা অবাক্ হয়ে শীলার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘুপ্‌টি অন্ধকারে ছ'টা চোখ চক্‌চক্ করছে অনেকক্ষণ-চোষা গুলি লজেঞ্চুসের মত।

শীলার মনে বেড়াল জাত সম্বন্ধে যত কিছু খারাপ ধারণা জমে ছিল সব এক নিমেষে উড়ে গেল। লাল টক্‌টকে মখ্‌মলের ওপর অমন তিনটে জ্যান্ত পুতুলকে দেখ্‌লে কার মন না গলে! শীলা ভাব্‌লে, এদের মা যে কীর্ত্তি করেছিলেন, তা সাত জন্মে ভোলা যায় না। অমন টিয়াটা, সকাল হ'লেই বল্‌ত, "মা, খুকুকে দুধ দাও।" বাড়ীর দরজা খোলার শব্দ পেলেই বল্‌ত, "চোর, চোর, চোর!" একদিন রাত্তির বেলা, হঠাৎ টিয়াটা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "চোর, চোর, চোর, চোর!" বাড়ীসুদ্ধ সবাই ছুটে এসে আলো জ্বেলে দেখে, পাশের বাড়ীর বেড়ালটা তা'কে ধ'রে দাঁড় থেকে ঝুল্‌ছে। চোখের নিমেষে টিয়াটাকে দাঁড় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বেড়ালটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে বাগানের পাঁচীল টপ্‌কে পালিয়ে গেল। শীলার মনে পড়্‌ল টিয়াটার করুণ স্বর—"ক্যাঁ, ক্যাঁ, ক্যাঁ, চোর, চোর, চোর।" রাবণের সীতা হরণের দৃশ্য আর এ দৃশ্য, একেবারে হুবহু এক। এ দু'টো দৃশ্যের কথা মনে ক'রে শীলা কত দিন লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। কিন্তু—এই

দুধের বাচ্চাগুলো তার কী জানে বাপু? তারা তখন হয়ও নি। শীলার ভারী ইচ্ছে হ'ল, বাচ্চা তিনটেকে পোষে। কিন্তু কথাটা সে কাউকে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দেবে না। ও মা, এই যে নেক্‌ড়ের খাবার ছোট কাচের গাম্‌লাটা এখানে পড়ে রয়েছে! সে এইতে চুপি চুপি দুধ এনে দেবে একটু ক'রে, তার নিজের ভাগ থেকে। আর তাদের মা'টাকে দেবে ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'রে। তা না হ'লে, যত সব অশিক্ষা-কুশিক্ষা তাদের শেখাবে চুপি চুপি, কী করে হাঁড়ি খেতে হয়, কী করে ওবাড়ীর ময়নাটাকে খাঁচা ভেঙ্গে চুরি করতে হয়, কী ক'রে বাগানের চারা গাছগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করতে হয়, এই সব।

অমন সুন্দর টিয়াটা যাবার পর থেকে শীলাদের বাড়ীতে কোনো বেড়ালের লেজটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। চাকর-বাকর সবাইকে হুকুম দেওয়া আছে, যেন বেড়াল দেখ্‌লেই তারা দেখ্‌মার করে। কিন্তু শীলার এই বাচ্চা তিনটেকে পোষবার জন্যে এমন লোভ হচ্ছে! থাক্ না তারা এই গারাজ-ঘরে, বাড়ীর কাউকে না বল্‌লেই হ'ল। শীলা বাচ্চা তিনটেকে একবার ক'রে তার বুকে চেপে ধ'রে টুল থেকে নেমে পড়্‌ল। তার পর মেনী বেড়ালটাকে ঘর থেকে বার ক'রে ঘরে শেকল তুলে দিলে।

লাল টক্‌টকে মখ্‌মলের ওপর তিনটে জ্যান্ত পুতুল, সকাল হ'লেই ডাকে মিউ, মিউ, মিউ। সে ডাক শীলা ছাড়া আর কেউ শুন্‌তে পায় না। বেড়িয়ে বেড়িয়ে দুধ খাবার ছল ক'রে শীলা দুধের বাটি নিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসে, তার পর চুপি চুপি একটা ভাঙ্গা চেয়ার লাগিয়ে গারাজ-ঘরের শেকল খুলে সে সুট্ ক'রে ঢুকে পড়ে। ও মা, কী সুন্দর গো! আহা বেচারীদের কত ক্ষিদেই না পেয়েছে, সারাটি দিন, সারাটি রাত মা-ছাড়া। শীলা তাদের অনেক ক'রে বোঝায়, এখন থেকে সেই তাদের মা; তারা সবাই তার ছেলে-পুলে, যেমন পুতুল-ভাল্লুক, পোত্‌লা; পুত্‌লীর অবশ্য সে সম্পর্কে শাশুড়ী, তা সে ত মা'ই, প্যাঁক্-পেঁকী-পুতুল, এরা সব।

বেড়ালের বাচ্চারা হয়তো তা বুঝ্‌তে পারে। শীলাকে দেখে তারা এক সঙ্গে কাতরভাবে ডাক্‌তে থাকে মিউ, মিউ, মিউ। কাচের গাম্‌লাটায় বাটির সব দুধটুকু শীলা ঢেলে দেয়, দিয়ে তাদের মুখের কাছে ধরে। বাচ্চা তিনটে গোঁফ্ কুঁচ্‌কে কুঁচ্‌কে গামলার দুধ শোঁকে। বুঝতে পারে না, এটা তাদের খাওয়া উচিত কিনা। তাদের মায়ের কাছে এখনও তারা জেনে নেয় নি শাদা জল মাত্রই মুখে দেওয়া যায় কিনা। বিরক্ত হ'য়ে শীলা বাঘা-হল্‌দেটার মুখ দুধের ওপর চেপে ধ'রে বলে, "খা না রে বোকা! চুরি ক'রে না গিল্‌লে বুঝি মিষ্টি লাগে না?" বাঘা-হল্‌দের মুখ দুধে ভিজে যায়। তুলোর মত হাত দিয়ে সে মুখ মোছে, আর ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ ক'রে হাঁচে। ধব্‌ধবে আর পাঁশকুটে, কেউই দুধ খেতে চায় না। তারা সবাই একসঙ্গে সুর মিলিয়ে ডাকে আর ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ ক'রে হাঁচির তাল দেয়। শীলা ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে ধম্‌কে বলে,

"এই গাম্‌লায় দুধ রইল, ইস্কুল থেকে এসে যদি দেখি তোমরা কেউ দুধ খাও নি, তা হ'লে একটা রসাতল কাণ্ড করব।" শীলা ইস্কুলে যায়। বেড়াল-বাচ্চারা সারাদিন ধ'রে তাদের মাকে ডাকে, মিউ, মিউ, মিউ।

ইস্কুল থেকে ফিরে শীলা আবার দুধের বাটি নিয়ে ঢোকে গারাজ-ঘরে। মখ্‌মলের তাকিয়া থেকে দু'টো বাচ্চা উধাও হয়েছে। তাকিয়ার এক কোণে থাবা গেড়ে ব'সে আছে শুধু ধব্‌ধবে। এ যে মেনী বেড়ালের কীর্ত্তি তা বুঝতে শীলার দেরী লাগল না। কোথা দিয়ে ঢুকল কে জানে? বেড়ালরা যেন যাদু-বিদ্যে জানে, হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে তারা রান্নঘরের জান্‌লার ফুটো দিয়ে ঢুকে হাঁড়ি খেয়ে যায়, এ ত' জানা কথা। মাছ, দুধ, ডিম, মাংস, ঘি, চিনি, পাঁপড়, লুচি, আলুর দম, পাঁউরুটির টোষ্ট্‌, যখনই যা কিছু কম পড়ে, তখনই ত ঠাকুর বলে, "বেড়ালে নিয়ে গেছে।" মেনী বেড়ালের অসাধ্য কিছু নেই। শীলা বেশ বুঝতে পারলে, মেনী হাওয়ার সঙ্গে মিশে এসে ঘরে ঢুকেছিল, তার পর বাঘা-হল্‌দে আর পাঁশকুটেটার ঘাড়টা কাম্‌ড়ে ধ'রে একে একে হাওয়ার সঙ্গে উধাও হয়েছে। ধব্‌ধবেটাকে নেয় নি কেন, কে জানে? হয়তো ধব্‌ধবে নিজেই যেতে চায় নি। শীলা ধব্‌ধবেকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে শুধায়, "হ্যাঁ রে, তাই নাকি? ঠিক ত? যেতে চাস নি বুঝি? তা বেশ থাকবি আমার কাছে, কেমন?"

ধব্‌ধবে চুপি চুপি কথার মত আস্তে আস্তে বলে, "মিউ, মিউ—মা, মা।" শীলা তাকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে আদর ক'রে বলে—"খোকন আমার, গোপাল আমার, থাকবি আমার কাছে, কেমন?" তার পর খানিক ভেবে বলে, "মনে থাকে যেন আমি তোর শাশুড়ীও নই, সৎমাও নই, সত্যিকারের মা।" ধব্‌ধবে আদুরে আদুরে গলায় উত্তর দেয়, "মিউ, হ্যাঁ মা।" শীলা ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবে, ধব্‌ধবের কী নাম রাখা যাবে। হঠাৎ তার ওস্তাদজীর একটা গানের একটা কথা মনে পড়ে, "নন্দ-দুলারা"। দুলারা, দুলারা, শিশু কৃষ্ণের কথা গাইতে গাইতে ভালোবাসার আনন্দে ওস্তাদজীর চোখে জল দেখা দেয়। ওস্তাদজীর সঙ্গে গাইতে গাইতে শীলারও মনে হয় যেন সে সবাইকে ভালোবাসে। ধব্‌ধবে যেন সেই দুলালটি। ধব্‌ধবের সাম্‌নের দুটো পা ধ'রে তাকে দোলাতে দোলাতে শীলা বলে, "দুলাল, দুলাল—দুলাল, দুলাল, দোল, দোল।"

দুলাল থাকে গারাজ-ঘরে, সে কথা বাড়ীর কেউ জানেও না। আশ্চর্য্যের বিষয়, মেনী বেড়ালের সেই থেকে আর লেজের আগাটি পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। শীলার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে দুলাল নিজেই তার মা'র সঙ্গে যেতে চায় নি। একটু একটু ক'রে সে এখন বেশ দুধ খেতে শিখেছে গাম্‌লা থেকে চকচক ক'রে। প্রথমটা অবশ্য তাকে খাওয়ানো নিয়ে শীলাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যত বার তাকে হাঁ করিয়ে তার গলায় দুধ ঢেলে দেয়,

তত বারই তার গালের দু' পাশ দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দুধ মাটিতে পড়ে টপটপিয়ে। তার পর দু' এক দিন যেতে না যেতেই যখন দুলাল তার ছোট্ট ফুলের পাপড়ির মত জিভখানি দিয়ে দুধ-মাখা গা চেটে চেটে পরিষ্কার করতে করতে দুধের স্বাদ পেলে, তখন সে নিজেই চুক্ চুক্ ক'রে দুধ খেতে শিখে ফেল্‌লে। এখন সে দূর থেকে দুধের গাম্‌লাখানা দেখ্‌লেই লেজটি তুলে ছুটে আসে শীলার কাছে।

শীলার আদরে আর বাড়ীতে-দোয়া খাঁটি, বটের আঠার মত দুধের জোরে দুলাল দেখতে দেখতে দিব্যি ডাগরটি হ'য়ে উঠলো। শীলা মেপে দেখলে, তার হাতের এক বিঘৎ, দু' আঙুল। নখ দিয়ে ধ'রে ধ'রে এখন সে বেশ নীচে নেমে আসতে পারে। শীলার ভয় হ'ল, যদি সে কোন রকমে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে তা হ'লে একটা অনর্থ কাণ্ড হবে। দুলালকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে দিলে যেন সে বাড়ীর চৌকাঠটি পর্য্যন্ত না মাড়ায়। যদি তার বাবা দেখে ফেলেন ত তক্ষুণি রামলালকে দিয়ে তাকে থলেয় পূরে টালার পুল পার ক'রে দিয়ে আস্‌তে বল্‌বেন। দুলাল হয়তো বুঝতে পারে। সে গারাজ-ঘর ছেড়ে বাইরে পা'টি দেয় না। গাম্‌লা থেকে খায় দুধ আর মখ্‌মলের তাকিয়াটার ওপর হাত পা ছড়িয়ে সারাটা দিন দিবানিদ্রা দেয়।

কিন্তু এম্‌নি ক'রে বেশী দিন চললো না। একদিন শীলার বাবার এক মক্কেলের বাড়ী থেকে ভেট এল এক প্রকাণ্ড ভেট্‌কী মাছ, যেন একখানা আস্ত পান্‌সী। গারাজ-ঘরের জান্‌লার পেছনে উঠোনটায় ইন্দু ঝি আর সিন্ধু চাকর বঁটি, কাটারী নিয়ে মাছ কুট্‌তে বস্‌লো। টুক্‌রো টুক্‌রো মাছ জমা হ'তে লাগ্‌ল একটা প্রকাণ্ড ঝোড়াতে। আর তারই পাশে জমা হ'ল মাছের পট্‌কা আর তেল। বাগানের পাঁচীলের ওপর সারি দিয়ে কাক ব'সে গেল, যেন কাকের কাঙালী-ভোজন হবে। তারা পশ্চিমী ভাষায়, "কেয়া, কেয়া, এ কা-কা, আও কা-কা", ব'লে যত রাজ্যের কাকদের ডেকে জড় করতে লাগলো। দুলাল ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ কাকদের চিল্লা-চিল্লীতে উঠে পড়ে সে একটু আড়ামোড়া ভেঙে নিচ্ছে এমন সময়ে গারাজ-ঘরে ভেসে এলো ভেট্‌কী মাছের আঁশটে গন্ধ। এমন গন্ধ সে জীবনে পায় নি। গন্ধটাকে যেন চাট্‌তে ইচ্ছে করে। গন্ধ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাদ পাবার জন্যে তার ক্ষুদে জিভখানা আকুল হ'য়ে উঠলো। নখ দিয়ে ধরে ধরে সে মেঝের ওপর নেমে পড়লো, তার পর গন্ধ লক্ষ্য করে গারাজ-ঘরের নর্দ্দামা দিয়ে বাগানে এসে হাজির হ'ল। তার পর যা সে দেখলে তাতে তার মনে হ'ল হয়তো সে স্বপ্ন দেখছে। চাপ্‌ বাঁধা, জমাট জমাট গন্ধের টুক্‌রো ঢিপি হ'য়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সে ইন্দু-ঝি আর সিন্ধু-চাকরের মাঝখানটিতে বসে ডাক্‌লে, "মিউ, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

শীলাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় "মিউ" করাও যা আর কাশীরাম দাসের অষ্টাদশ পর্ব্ব

মহাভারতখানা চোখের নিমেষে অশুদ্ধ হয়ে যাওয়া, একই কথা। দুলাল যেমনি বলেছে "মিউ", অমনি বাড়ীর ছাদ থেকে আরম্ভ ক'রে ভিত পর্য্যন্ত যে যেখানে ছিল, সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠলো, "দে দে আপদটাকে বের ক'রে, আ মরণ, ঝাঁটা মার, নিত্যি হাঁড়ি খেয়ে যাওয়া!" দুলালকে ঘাড় ধরে বের ক'রে দিতে ছুটে এলো শক্ত সিং, ভক্ত পাঁড়ে, সত্তু কাহার আর লট্টু গোয়ালা। রোয়াকের রোদে পিঠটি দিয়ে শীলার ঠাকুরমা জপ করছিলেন। শুধু তিনি বল্লেন, "আহা, কেন তোরা ঐ একরত্তি বাচ্চাটাকে অমন নির্য্যাতন করছিস্? শীলু নিয়ে খেলা করবে'খন। অ শীলু, শীলু-উ। এই দেখে যা রে, কেমন ধব্‌ধবে সুন্দর বেড়ালের ছানাটা!"

ঠাকুরমার কথার ওপর কারো কথাটি কইবার জো নেই। শীলার বাবা নামজাদা ডাক্তার। তাঁর ধারণা এক একটি বেড়াল এক একটি ডিপ্‌থিরিয়া আর যক্ষ্মার জাহাজ। বাড়ীতে বেড়াল রাখা সম্বন্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন কি, ঠাকুরমা দিলেন এক ধমক, "হ্যাঁ গুপে, তুই আর কতা ক'স নে। তোর ছিল তিনটে বেড়াল। বেড়ালছানা তিনটেকে নিয়ে না শুলে তোর রাতে ঘুম হ'ত না। আমরা আর ছেলে-পুলে মানুষ করি নি! এখনকার কালে যত সব নতুন ধুয়ো! দেখ না, ছেলে-মেয়েদের পাঁচ বছর যেতে না যেতেই নাকের ওপর চশমা, আর আমি এই পঁচাত্তর বছর বয়েসে একটানে ছুঁচে সুতো পরিয়ে দিই!" ঠাকুরমার দৌলতে দুলালকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেওয়া হ'ল না বটে, কিন্তু ওপরতলার সিঁড়িটি পর্য্যন্ত মাড়াতে তার বারণ রইল।

দুলালকে কাছে পেয়ে শীলার বুকখানা যেন ভরে উঠলো। একঘর তার পুতুল, কত রকমের, কত আকারের। কিন্তু তারা হয় কাচের, নয় কাঁচকড়ার, আর না হয় তুষ-ঠেসা, সেলাই-করা, বালিশের মত। যেখানে শোয়াও সেইখানেই শুয়ে থাকে, বসিয়ে দিলে বসে, দুষ্টুমীর নাম জানে না। ঠাকুরমাই ত যখন তখন মাকে বলেন, "ছেলেপুলে দুষ্টুমী না করলে কি আর মায়ের প্রাণ খুসী হয়?" সত্যিই ত, ঐ দেখ না প্যাঁক-পেঁকী, ওর পেটটা টেপো, তবে বল্‌বে, "প্যাঁক্"! ব্যস্! হাত পা ছুঁড়ে যদি ও দু'দণ্ড কাঁদে তা হ'লেও প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়! বাদ বাকীগুলোর কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্, তাদের পেটে বোমা মারলেও "ক" অক্ষর বেরুবে না। আর দুলাল! সকাল থেকে সে ঘোরে শীলার পায়ে পায়ে, ডাকে, "মিউ, মিউ, মিউ, মিউ, ক্ষিদে পেয়েছে, দে দুধ, খেলা পেয়েছে, কর্ খেলা, বেড়ানো পেয়েছে, চল্ বেড়াতে বাগানে।"

শীলা যতটুকু পড়ে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে, আর ইস্কুলে যায়, ততটুকুই তার ছুটি, বাদ বাকী সময় সারাটিক্ষণ সঙ্গে থাকে দুলাল। তার দুষ্টুমীর আর অন্ত নেই। শীলার ছবির বইখানার ওপর কালীর দোয়াত উল্‌টে দিয়েছে কে? ছবি আঁক্‌বার রঙের বাক্স থেকে রঙের চাক্‌তিগুলো থাবা দিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছে কে? সরল পাটীগণিতের পাতা চিবিয়েছে কে? খেলা-ঘরের

কাঁচকড়ার টেলিফোনটার কাণা ভেঙেছে কে? সেলাইয়ের বাক্স তছ্‌নছ্ ক'রে ঘরময় ছুঁচ ছড়িয়েছে কে? পুতুলদের ঘরকন্না, হাঁড়ি-কুঁড়ি, আস্‌বাব-পত্তর ছত্রাকার করেছে কে? এ সবের একটিমাত্র উত্তর বড় বড় অক্ষরে—দু-লা-ল। তার দুষ্টুমী যত বাড়ে শীলার কাছে তার আদর বাড়ে তত বেশী।

দুলালের ওপরে উঠ্‌তে মানা, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে এক পা এক পা ক'রে বাড়ীসুদ্ধ সবারই মন যুড়ে বস্‌লো। একদিন রাতে শীলা যখন শুতে যাবে, সেই সময় দুলাল এসে দাঁড়াল তা'র শোবার ঘরের দরজার কাছে। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকালে। শীলা ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বল্‌লে, "চুপ্!" দুলাল ছোট ছোট পুতুল-বালিশের মত পা ফেলে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো শীলার ঘরে। মতি ঝি যখন গল্প ব'লে শীলাকে ঘুম পাড়াতে এল, তখন দুলালকে বুকের তলায় চেপে ধ'রে সে চোখ বুজে পড়ে আছে। পরের দিনও দুলাল ঠিক সময় মত এসে হাজির হ'ল, এবং তার পরের দিনও। সেদিন অবশ্য মতির চোখ এড়াতে পারলে না সে। কিন্তু, আহা, অমন ধব্‌ধবে দুধের মত বাচ্চাটি, মতির মায়া হ'ল তাকে দূর দূর ক'রে নীচে তাড়িয়ে দিতে। দুলাল এবার থেকে নিয়ম মত শীলার ঘরে রাত কাটাতে লাগল। সে কথা মতি ঝির কল্যাণে ঠাকুরমারও জান্‌তে বাকী রইল না। একদিন রাতে শীলার মা শুতে যাবার আগে যখন তাকে ঘুমের চুমো দিতে এলেন, তখন তিনিও দেখে গেলেন দুলাল শীলার কোলের কাছটিতে শুয়ে ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে ফের্‌বার সময় শীলাও কত দিন মোটারে তাঁর কোলে এম্‌নি ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে, অবশ্য যখন সে আরও অনেক ছোট ছিল। শীলার মার যখন সে কথা মনে হ'ল, তখন তিনি শীলা আর দুলালকে একটি একটি ক'রে চুমু দিয়ে তাদের গায়ে চাদরখানা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এমনি ক'রে দু'-এক দিন যেতে যেতে, একদিন দুলাল এসে হাজির হ'ল শীলার বাবার খাবার ঘরে। ডাক্তার বাবুর বাড়ী ফিরতে প্রায়ই রাত হ'য়ে যায়। তাই সবার সঙ্গে একত্র খাবার তাঁর কোনোদিনই সুযোগ হয় না। সেদিন তিনি ছোট্ট শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর খাবারের ঢাকনাটি খুলেছেন কি, পায়ের নীচে শুন্‌তে পেলেন, আদুরে আদুরে ডাক, "মি-উ-উ।" কালো আর শাদা পাথরের চৌকো-কাটা মেঝে। একটা কুচ্‌কুচে কালো চৌকোর ওপর বসে আছে ধব্‌ধবে শাদা ছোট্ট বেড়ালছানাটি। ডাক্তার বাবুর অস্তর-করা কড়া প্রাণ এক নিমেষে গলে গেল। তিনি সব চেয়ে বড় ভাজা মাছের দাগাখানা দুলালের সাম্‌নে ফেলে দিলেন। পোনা মাছের দাগা, কাঁটা নেই বল্‌লেই হয়। এক মিনিটের মধ্যেই দুলাল তা নানা রকম মুখভঙ্গী ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে শেষ ক'রে ফেল্‌লে। খাবার সময় তার ভঙ্গীটা দেখ্‌তে

ডাক্তার বাবুর ভারী মজা লাগল। তিনি আর একখানা মাছের টুক্‌রো তার কাছে ফেলে দিলেন। এম্‌নি ক'রে সব ক'খানি মাছ দুলাল তার কচি কচি দাঁতগুলো দিয়ে, তার ছোট্ট মাথাটি হেলিয়ে দুলিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে শেষ করলে। খেয়ে উঠবার সময় ডাক্তার বাবু প্রায় সবটুকু দুধসুদ্ধ বাটিটা দুলালের মুখে ধরে দিলেন।

পরের দিন থেকে দুলালের সর্ব্বত্র অবাধ গতি। শক্তু সিং আর ভক্ত পাঁড়ে, সন্তু কাহার আর লট্টু গোয়ালা, এরা সবাই এখন দুলালকে পথ ছেড়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না তিনি গজেন্দ্র-গমনে গোঁফ ফুলিয়ে, লেজ দুলিয়ে না চলে যান। শীলার যখন দুধ আসে সেই সঙ্গে সঙ্গে দুলালের জন্যেও বেড়ালের ছবি-আঁকা একটা পেয়ালায় আসে দুধ, চিনি দেওয়া, ঠিক শীলার জন্যে যেমন। শীলা যখন ইস্কুলে যাবার আগে খেতে বসে সেই সঙ্গে সঙ্গে দুলালের জন্যেও কাচের থালায় খাবার আসে, দুধমাখা ভাত, মাছ আরো কী কী সব।

এমনি ক'রে হেসে খেলে, দুষ্টুমী ক'রে দুলালের দিন কাটে। ফাগুন গিয়ে চৈত এল। চৈত গেল, এল বোশেখ, তার পর বোশেখ, জ্যষ্টিও একে একে শিমুল, আকন্দর তূলো উড়িয়ে, আম-জামের পসরা মাথায় নিয়ে, ধূ-ধূ করা তেপান্তরের মাঠ পার হ'য়ে, উধাও হ'য়ে গেল। এল আষাঢ় মাহেশের রথে চড়ে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশ যুড়ে সুরু হ'ল বরুণদেবের হুড়োহুড়ি আর দুপোদুপি। সারাটি দিন, সারাটি রাত্তির তাঁর মাতামাতির বিরাম নেই। দুদ্দাড় ক'রে দোর-জান্‌লা ঠেঙিয়ে, ঝন্‌ঝনিয়ে শার্শী ভেঙে, ঘর-দালানে কুলকুচিয়ে জল ছড়িয়ে তাঁর দৌরাত্ম্যির জ্বালায় মানুষ অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। শীলাদের ইস্কুলে প্রায়ই হয় রেনি-ডে'র ছুটি। বৃষ্টি ছাপিয়ে বাসের ধক্‌ধকানি শোনা যায়। ভিজে জুতো, ভিজে জামা নিয়ে শীলা বাস্ থেকে নামে। আসবার সময় শীলা কত কল্পনা করতে করতে আসে, কী মজাতেই না কাটবে সারা দুপুরটা দুলালের সঙ্গে! এখন ত আর গরমের ছুটি নয়, যে রোজ খাওয়ার পর সারাটি দিন ধ'রে ঘুমুতে হবে! বৃষ্টি-বাদলের দিনে, দুপুরে ঘুমুতে এমন কি তার বারণ। শীলা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আসে, সে মাঠের দিক্‌কার জান্‌লাটা দেবে খুলে হাট ক'রে। সাম্‌নের মাঠটায় কত রকমের গাছই না গজিয়েছে। কচুপাতা ছাড়া সে একটারও নাম জানে না। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার তালে তালে যখন তাদের সবুজ সবুজ, নধর নধর পাতাগুলি নাচতে থাকে, তখন কী সুন্দরই না দেখায়! শীলা ভাবে, দুলালকে নিয়ে সে দোর বন্ধ ক'রে দেবে, আর সারাটি দুপুর ধ'রে কত রকমের খেলা! বাইরে বৃষ্টি পড়বে, ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে; পাশের অশথ গাছটার ডালের ওপর কাক আর শালিখরা, বসে বসে ভিজছে, আর দূরের পুকুরপাড়ের তালগাছগুলো বৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে।

শীলার কল্পনা কল্পনাই থেকে যায়। দুলাল, আর সেই গলায় সবুজ রেশমের ফিতে-বাঁধা

দুলালটি নেই। লম্বায় সে লেজ বাদ দিয়ে শীলার হাতের প্রায় দেড় হাত। এখন দেখতে তাকে অনেকটা মেনী বেড়ালের মত। কোথায় গেল তার অমন ধব্‌ধবে রূপ, আর খুসী-ভরা চোখ! খাবার সময়টিতে সে ঠিক নিয়ম মত এসে হাজির হয়, আর বাদ-বাকী সময় সে যে কোথায় যায়, কী করে সে খবর কেউ জানে না। তার দুধের মত শাদা রঙ্ ধূলোয় কাদায় একেবারে ভক্ত পাঁড়ের বিছানার মত ময়লা হ'য়ে গেছে। হাজার ডাকাডাকি করলেও তার সাড়া পাওয়া যায় না। এমন কি ধরতে গেলে সে লেজ তুলে ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার বেড়া ডিঙানোর মত চেয়ার টপ্‌কে চোখের নিমেষে উধাও হয়। দুলাল! দুলাল! আর দুলাল! দুলাল তখন পাশের বাড়ীর রান্নাঘরের কথা ভাবতে ভাবতে বাগানের নর্দ্দামার পথ ধরেছে। জান্‌লা খুলে শীলার কোলের ওপর শুয়ে বৃষ্টি দেখ্‌বার তার সখ নেই। শীলা অনেক চেষ্টা করেও বুঝ্‌তে পারে না, দুলাল হঠাৎ এমন পর হ'য়ে গেল কেন। ভাবে হয়তো এ সব মেনী বেড়ালের কু-পরামর্শ, আর না হয় ময়ূর-ওয়ালা বাড়ীর কালো বেড়ালটার ভাংচি।

অনেক চেষ্টা করেও শীলা বুঝ্‌তে পারে না যে দুলাল আর ছোটটি নেই, সে বেড়ালদের বয়সের হিসেবে দস্তুরমত মানুষ হ'য়ে গেছে। একটা ছোট্ট মেয়ের পুতুলগিরি করা তার আর সাজে না। তা ছাড়া দুলাল একটু একটু ক'রে বুঝ্‌তে পারছে যে মানুষ জাতের সঙ্গে তার শুধু রেষারেষির সম্পর্ক, যেমন কুকুরদের সঙ্গে। রান্নাঘরের দিকে গেলে ঠাকুরটা হৈ হৈ ক'রে ওঠে, মাছ কোটার জায়গাটায় থাবা গেড়ে বসেছে কি অমনি ইন্দু ঝি 'দূর' 'দূর' ক'রে তাড়িয়ে দেয়। তাই যতটুকু খোলাখুলি ভাবে পাওয়া যায় দুলাল সেটুকু অম্লানবদনে হাত পেতে নেয়, আর যেটুকু না পাওয়া যায় তার জন্যে রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘর কখন খোলা থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। শুধু বাড়ীর নয়, পাড়ারও। দুলালের ওপর অনেকেরই সন্দেহ হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ তাকে সাম্‌না-সাম্‌নি ধরতে পারে নি।

ক্রমে দুলালের হাত যখন দিব্যি পেকে উঠ্‌ল, তখন তার কার্য্যকলাপ নিয়ে ডাক্তার বাবুদের বাড়ীর বেড়ালটার সম্বন্ধে পাঁচ জনে কানাঘুষো করতে সুরু করলে। পাড়ার লোকের রান্নাঘরে মেনী বেড়াল ঢুক্‌ত হাওয়ার সঙ্গে মিশে। কিন্তু দুলাল ঢোকে স্বপ্নের মত। স্বপ্নে যেমন দু'টি ছোট্ট চোখের পাতার ভেতর এসে ঢোকে, কত বড় বড় বাড়ী, পাহাড়-পর্ব্বত, মানুষ, গাড়ী-ঘোড়া, তেমনি ক'রে।

দুলালের নামে পাড়ার লোকে বদ্‌নাম রটায়, এই ছিল শীলার ধারণা। কিন্তু একদিন শীলা স্বচক্ষে যা দেখ্‌লে তাতে দুলালের ওপর তার সর্ব্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠ্‌ল। বাগানের এক কোণে বেঁটে বেঁটে কাবুলী-কলাগাছের ছায়া-করা পাতার নীচে থাবা গেড়ে বসে দুলাল কাদের বাড়ীর একটা চন্দনাকে তারিয়ে তারিয়ে চিবোচ্ছে। সবুজ পাতার নীচে তার সবুজ দেহখানি নেতিয়ে

পড়েছে, রক্ত-চন্দনের মত তার মাথাটি মাটিতে লোটানো। শীলা আর থাক্‌তে পারলে না। ছুটে গেল কলাগাছটার দিকে, ভাব্‌লে হয়তো পাখীটা এখনও বেঁচে আছে। "দুলাল! দুলাল! দে ফেলে! মেরে তোর হাড় গুঁড়িয়ে দেব, দে ফেলে!" শীলা দুলালকে ধমক দিয়ে তেড়ে গেল। আর দুলাল! দুলাল পাখীটাকে মুখে তুলে নিয়ে, এক লাফে পাঁচীলের ওপর উঠে পড়ে সর্ সর্ করে পেয়ারা গাছের প্রায় মগডালে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে বসে আবার পাখীটাকে চিবোতে সুরু করলে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শীলা কেঁদে কেঁদে কত মিনতি করতে লাগ্‌ল—"দে দুলাল, তোর দু'টি পায়ে পড়ি। খোকন আমার, মাণিক আমার, খাস নে পাখীটাকে। তুই যা খেতে চাস্ তাই তোকে কিনে দেব।" দুলাল সে কথা কানেও তোলে না, মুখ ভেংচে ভেংচে পাখীটাকে খেয়ে শেষ করে।

শীলা ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল শক্ত সিং আর ভক্ত পাঁড়েকে। এল সত্তু কাহার আর লট্টু গোয়ালা। তারা সবাই মিলে তাড়া দিয়ে, তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে, আঁকুশির খোঁচা দিয়ে যতক্ষণে দুলালকে গাছ থেকে নামালে তার আগেই সে পাখীটার চন্দনের ছিটে দেওয়া শেষ ডানাখানা চিবিয়ে খতম করেছে। পেয়ারা গাছের তলাটা সবুজ আর রক্তচন্দন রঙের পালকে ছেয়ে গেল। শীলা সেদিকে তাকাতে পারে না, মুখে হাত চাপা দিয়ে ছুটে ওপরে উঠে আসে। জান্‌লার ধারে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদে। দুলালের সে মুখ দেখ্‌বে না, ককৃখনো না, ককৃখনো না, মরে গেলেও না। সে আসুক না একবার তার কাছে! শীলা মনে মনে একটা কঠোর শাস্তি ঠিক করে। থলেয় পুরে, গাড়ীতে চাপিয়ে টালার পুল পার ক'রে দিয়ে আসা। হ্যাঁ, তাই ঠিক। যেমন কুকুর, তেম্‌নি তার মুগুর। ঠিক হবে তখন।

হ'লও তাই। সারাদিন ধরে শক্ত সিং আর ভক্ত পাঁড়ে, সত্তু কাহার আর লট্টু গোয়ালা ছাদ থেকে ভিত পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীটায় ছুটোছুটি করতে লাগ্‌ল দুলালকে পাকৃড়াও করবার জন্তে। কিন্তু তাকে ধরে কার সাধ্যি! সে পরমানন্দে সবার সাম্‌নে দিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘর ক'রে বেড়ায়, লেজ দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে। লাঠির চোট খেয়ে ঝন্‌ঝনিয়ে ভাঙে কাচের বাসন, সারি সারি কাচের পুতুল, বাহারে ফুলদানি। রান্নাঘরের মেঝেয় ভাত ডাল তরকারি ছত্রাকার হ'য়ে ছড়ায়। ভাঙে লট্টু গোয়ালার নাক, ভক্ত পাঁড়ের কড়ে আঙুল। শেষকালে শক্ত সিং আর সত্তু কাহার চুপি চুপি পেছন দিক থেকে এসে দুলালের মাথার ওপর ঝপ্ ক'রে ফেলে একখানা প্রকাণ্ড কম্বল। তার পর আর যায় কোথা? থলেয় পুরে টালার পুল পার!

শীলার কিন্তু ভারী দুঃখ হয়। সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মোছে কেবল। ঠাকুরমা শীলার দুঃখ বুঝ্‌তে পারেন। বাড়ীময় চুপি চুপি কিসের পরামর্শ চলে। তার পর শীলা যখন শুতে যায় দুলালের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে, তখন ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে তার নিজের চোখকে

বিশ্বাস হয় না। ধব্‌ধবে দুধের মত শাদা বালিশের ওপর বসে আছে তুলোর মত কী একটা জীব, করমচার মত টুকটুকে চোখ দু'টি, গোলাপফুলের মত মুখটি, আর পদ্মর পাপ্‌ড়ির মত লম্বা দু'টি কান। শীলা ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়। কান দু'টো আর লেজটা ছাড়া দুলাল ছেলেবেলায় যেমনটি ছিল, এ যেন ঠিক সেই রকমটি। তবে এ আরো শাদা, একেবারে শরৎকালের মেঘের মত শাদা। শীলার মনে হয়, সে যেন আবার তার দুলালকে ফিরে পেয়েছে। তাকে বুকে চেপে ধ'রে বলে, "দুলাল আমার, মাণিক আমার।"

অনেক ঘোরাঘুরির পর দুলাল নং ১ কিন্তু একদিন ফিরে এল শীলাদের পাড়ায়। এ পাড়ার যত বখা বেড়াল তার ইয়ার বন্ধু, তাদের ছেড়ে সে বেশীদিন থাকৃতে পারবে কেন? শীলাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাবার সময় সে দেখ্‌তে পেলে শীলা জান্‌লার ধারে বসে ইঁদুরের মত কী একটা জন্তুর সাম্‌নের পা' দুটো ধরে দোলাচ্ছে আর বল্‌ছে—"দুলাল, দুলাল, দোল, দোল।" দুলাল নং ১ এর ভারী হাসি পেল। একটা ইঁদুরের মত জানোয়ারকে নিয়ে বোকা মানুষগুলো কী কাণ্ডটাই না করে! মানুষের মত বোকা জাত আর জগতে নেই। ঘরে ঘরে পাখী, আর যত রাজ্যের ইঁদুরের মত জন্তু! শীলাদের বাড়ীর জন্তুর কথাটা সে মনে মনে টুকে রাখ্‌লে। পাড়ার অন্য অন্য খাবার শেষ ক'রে এ বাড়ীতে ছাদ ডিঙিয়ে একবার এলেই হবে। পথঘাট ত তার সবই জানা।

[ভারতের বিস্মৃত যুগের একটি কাহিনী]

চার

ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিক্।

সমগ্র উত্তরাপথে মিহিরকুলের বিজয়পতাকা উড়ছে। হূন সওয়ারদের অস্ত্রের আঘাতে ভারতভূমির মাটি রক্তাক্ত, ঘোড়ার পায়ের ধূলোয় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ভারতের সভ্যতা ও কর্ষণার গৌরব-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়।

পড়েছে, রক্ত-চন্দনের মত তার মাথাটি মাটিতে লোটানো। শীলা আর থাক্‌তে পারলে না। ছুটে গেল কলাগাছটার দিকে, ভাব্‌লে হয়তো পাখীটা এখনও বেঁচে আছে। "দুলাল! দুলাল! দে ফেলে! মেরে তোর হাড় গুঁড়িয়ে দেব, দে ফেলে!" শীলা দুলালকে ধমক দিয়ে তেড়ে গেল। আর দুলাল! দুলাল পাখীটাকে মুখে তুলে নিয়ে, এককলাফে পাঁচীলের ওপর উঠে পড়ে সর্‌ সর্‌ করে পেয়ারা গাছের প্রায় মগডালে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে বসে আবার পাখীটাকে চিবোতে সুরু করলে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শীলা কেঁদে কেঁদে কত মিনতি করতে লাগ্‌ল—"দে দুলাল, তোর দু'টি পায়ে পড়ি। খোকন আমার, মাণিক আমার, খাস নে পাখীটাকে। তুই যা খেতে চাস্‌ তাই তোকে কিনে দেব।" দুলাল সে কথা কানেও তোলে না, মুখ ভেংচে ভেংচে পাখীটাকে খেয়ে শেষ করে।

শীলা ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে এল শক্ত সিং আর ভক্ত পাঁড়েকে। এল সত্তু কাহার আর লট্টু গোয়ালা। তারা সবাই মিলে তাড়া দিয়ে, তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে, আঁকশির খোঁচা দিয়ে যতক্ষণে দুলালকে গাছ থেকে নামালে তার আগেই সে পাখীটার চন্দনের ছিটে দেওয়া শেষ ডানাখানা চিবিয়ে খতম করেছে। পেয়ারা গাছের তলাটা সবুজ আর রক্তচন্দন রঙের পালকে ছেয়ে গেল। শীলা সেদিকে তাকাতে পারে না, মুখে হাত চাপা দিয়ে ছুটে ওপরে উঠে আসে। জান্‌লার ধারে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদে। দুলালের সে মুখ দেখ্‌বে না, কক্‌খনো না, কক্‌খনো না, মরে গেলেও না। সে আসুক না একবার তার কাছে! শীলা মনে মনে একটা কঠোর শাস্তি ঠিক করে। থলেয় পুরে, গাড়ীতে চাপিয়ে টালার পুল পার ক'রে দিয়ে আসা। হ্যাঁ, তাই ঠিক। যেমন কুকুর, তেম্‌নি তার মুগুর। ঠিক হবে তখন।

হ'লও তাই। সারাদিন ধরে শক্ত সিং আর ভক্ত পাঁড়ে, সত্তু কাহার আর লট্টু গোয়ালা ছাদ থেকে ভিত পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীটায় ছুটোছুটি করতে লাগ্‌ল দুলালকে পাক্‌ড়াও করবার জন্যে। কিন্তু তাকে ধরে কার সাধ্যি! সে পরমানন্দে সবার সাম্‌নে দিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘর ক'রে বেড়ায়, লেজ দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে। লাঠির চোট খেয়ে ঝন্‌ঝনিয়ে ভাঙে কাচের বাসন, সারি সারি কাচের পুতুল, বাহারে ফুলদানি। রান্নাঘরের মেঝেয় ভাত ডাল তরকারি ছত্রাকার হ'য়ে ছড়ায়। ভাঙে লট্টু গোয়ালার নাক, ভক্ত পাঁড়ের কড়ে আঙুল। শেষকালে শক্ত সিং আর সত্তু কাহার চুপি চুপি পেছন দিক্ থেকে এসে দুলালের মাথার ওপর ঝপ্‌ ক'রে ফেলে একখানা প্রকাণ্ড কম্বল। তার পর আর যায় কোথা? থলেয় পুরে টালার পুল পার!

শীলার কিন্তু ভারী দুঃখ হয়। সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মোছে কেবল। ঠাকুরমা শীলার দুঃখ বুঝ্‌তে পারেন। বাড়ীময় চুপি চুপি কিসের পরামর্শ চলে। তার পর শীলা যখন শুতে যায় দুলালের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে, তখন ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে তার নিজের চোখকে

বিশ্বাস হয় না। ধব্‌ধবে দুধের মত শাদা বালিশের ওপর বসে আছে তুলোর মত কী একটা জীব, করমচার মত টুকটুকে চোখ দু'টি, গোলাপফুলের মত মুখটি, আর পদ্মর পাপ্‌ড়ির মত লম্বা দু'টি কান। শীলা ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়। কান দু'টো আর লেজটা ছাড়া দুলাল ছেলেবেলায় যেমনটি ছিল, এ যেন ঠিক সেই রকমটি। তবে এ আরো শাদা, একেবারে শরৎকালের মেঘের মত শাদা। শীলার মনে হয়, সে যেন আবার তার দুলালকে ফিরে পেয়েছে। তাকে বুকে চেপে ধ'রে বলে, "দুলাল আমার, মাণিক আমার।"

অনেক ঘোরাঘুরির পর দুলাল নং ১ কিন্তু একদিন ফিরে এল শীলাদের পাড়ায়। এ পাড়ার যত বখা বেড়াল তার ইয়ার বন্ধু, তাদের ছেড়ে সে বেশীদিন থাক্‌তে পারবে কেন? শীলাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাবার সময় সে দেখ্‌তে পেলে শীলা জান্‌লার ধারে বসে ইঁদুরের মত কী একটা জন্তুর সাম্‌নের পা' দুটো ধরে দোলাচ্ছে আর বল্‌ছে—"দুলাল, দুলাল, দোল, দোল।" দুলাল নং ১ এর ভারী হাসি পেল। একটা ইঁদুরের মত জানোয়ারকে নিয়ে বোকা মানুষগুলো কী কাণ্ডটাই না করে! মানুষের মত বোকা জাত আর জগতে নেই। ঘরে ঘরে পাখী, আর যত রাজ্যের ইঁদুরের মত জন্তু! শীলাদের বাড়ীর জন্তুর কথাটা সে মনে মনে টুকে রাখ্‌লে! পাড়ার অন্ন অন্ন খাবার শেষ ক'রে এ বাড়ীতে ছাদ ডিঙিয়ে একবার এলেই হবে। পথঘাট ত তার সবই জানা।

[ভারতের বিস্মৃত যুগের একটি কাহিনী]

চার

ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিক্।

সমগ্র উত্তরাপথে মিহিরকুলের বিজয়পতাকা উড়ছে। হূন সওয়ারদের অস্ত্রের আঘাতে ভারতভূমির মাটি রক্তাক্ত, ঘোড়ার পায়ের ধূলোয় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ভারতের সভ্যতা ও কর্ষণার গৌরব-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়।

শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দুস্থানের খণ্ড খণ্ড রাজ্যের ছোট ছোট রাজারা দুর্ব্বল হাতে তলোয়ার ধরেছিলেন বটে, কিন্তু হূনদের উদ্দাম গতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। ঝড়ের মুখে সামান্য তৃণখণ্ডের মত তারা হারিয়ে গেছে। পারস্য থেকে মহাচীন পর্য্যন্ত দুর্নিবার গতিতে যারা করতলগত করেছে, তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখা দু'-একজন ছোট খাটো রাজা, বা দু'-দশ হাজার হিন্দু সেনার কাজ নয়।

উত্তর ভারত দখল করে হূনেরা 'শকালা'য় (শিয়ালকোটে) সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করেছে; সেখান থেকে আবার তারা অগ্রসর হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের দিকে। এই অভিযান নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং মিহিরকুল।

গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত তারা এসেছে। পথে বিশেষ কোন বাধা তাদের পেতে হয় নি। মিহিরকুলকে মুখোমুখি বাধা দেবার মত দুঃসাহস তখন কারুর ছিল না। মিহিরকুল ও তার হূন সওয়ারদের নামে তখন হিন্দুরা সন্ত্রস্ত। পুরুষপুরের পশ্চিমে পার্ব্বত্য অঞ্চলের কিরাত-রাজ দুর্দ্দান্ত হূনদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন পরাজিত হলেন তখন নিষ্ঠুর মিহিরকুল সমগ্র কিরাতভূমি—পুরুষপুর থেকে গান্ধার পর্য্যন্ত জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিলে; মৃতের কঙ্কাল ছাড়া সেখানে আজ আর জীবন্ত মানুষ দেখা যায় না * সেই থেকেই ভারতভূমির ছোট ছোট রাজারা মিহিরকুলের সম্মুখীন হ'তে আর সাহস পায় না—নিজের জন্য নয়, নিরীহ প্রজাদের অমঙ্গল আশঙ্কায়।

নিষ্ঠুর অত্যাচার মানুষকে সন্ত্রস্ত করতে পারে, কিন্তু তার মনে শ্রদ্ধা জাগাতে পারে না। সামান্য রক্তপাত মানুষকে ভয় দেখায়, কিন্তু শত সহস্রের শোণিত মানুষকে রক্তপাতে অভ্যস্ত করে তোলে, তখন আতঙ্ককে ছাপিয়ে ওঠে রুদ্ধ আক্রোশের আগুন। অত্যাচারিত ভারতের বুকেও তখন সেই আগুন ছাই-চাপা ধিকি ধিকি জ্বলছে। ভারতবাসী আর সইতে পারছে না। সকলেই প্রস্তুত হয়ে আছে, আহ্বান এলেই তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। বনে-জঙ্গলে, পর্ব্বত-কন্দরে ছোট ছোট আলোচনা সভা বসছে, লোক-চোখের অন্তরালে গড়ে উঠছে বিদ্রোহী সঙ্ঘ।

হূন-নায়ক মিহিরকুলের অনুসরণ করে নির্য্যাতিতের কান্না মালবে এসেও পৌঁছেছে। মহাকাল ও মহাদেও পাহাড়ের জনপদে-জনপদে আজ শুধু এক কথা—'সাজো, সাজো, সাজো!' চোখের ইসারায়, হাতের ইঙ্গিতে শুধু এক সঙ্কেত—"প্রস্তুত হও!"

* The Valley of the Kabul and Swat rivers, was so completely devastated that the greater part of it has ever remained outside the pale of civilization."—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত Ancient Indian History পঠিতব্য।

নিত্য নতুন নতুন অত্যাচারের কাহিনী ভেসে আসছে: রামনগরের সব প্রজার ফসল লুটে নিয়ে গেছে···জয়পুরের বাড়ী বাড়ী আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, প্রজাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে সেই আগুনে···ধীরোয়াড়ায় ছোট ছেলের একটা তুচ্ছ কথার জন্য বাড়ী বাড়ী মেয়েদের অপমান করেছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চাবুক মেরে সংজ্ঞাহীন করেছে, যারা প্রতিবাদ তুলেছিল তাদের বর্শা-ফলকে গেঁথে উল্লাস করেছে।

এমনি শত শত খবরের ঢেউ আসছে, তরুণদের ধৈর্য্যের বাঁধে ধাক্কা মারছে, স্তব্ধ আগ্নেয়-গিরির বুকে উষ্ণ 'লাভা'-স্রোতের মত পুঞ্জে পুঞ্জে প্রতিহিংসার আগুন জমা হচ্ছে। কোন একদিন সেই লাভা-স্রোত সমগ্র হূনবাহিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ভারতের জনগণ সেই শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় পল, অনুপল, বিপল, দণ্ড ও প্রহর গুণে চলেছে। ঠিক সেই সময় কালো ঘোড়ার কালো সওয়ারের অবির্ভাব।

কালো ঘোড়ার পিঠে কালো বর্ম্ম-পরা লোকটি, কেউ কোন দিন তার মুখ দেখতে পায় নি, কোথা থেকে সে এসেছে তাও কেউ জানে না।

হূনদের অনাচার যেখানে আর্ত্তনাদ তুলেছে, সেখানেই কালপুরুষের মত এই কালো সওয়ারের ছায়া দেখা গেছে, শোনা গেছে তার বজ্রনির্ঘোষ বাণী—"অত্যাচারী, সাবধান!"

হূনেরা একে আঘাত করতে চেয়েছে কিন্তু পারে নি।

নির্য্যাতিত তরুণদল স্বেচ্ছায় এই রহস্যময় অদেখা মানুষটির নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছে।

ইতিমধ্যে একদিন গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেল—"শেষ রাতে মহাদেও পাহাড়ে মহাদেব-মন্দিরের সামনে সভা হবে, কালো সওয়ার আহ্বান করেছেন প্রত্যেক যুবককে, অস্ত্র ধরার শক্তি যারা রাখে তাদের প্রত্যেককে।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগামী ঘোড়ার পিঠে যুবকের দল মন্দিরের পথে বেরিয়ে পড়ল।

অমাবস্যার অন্ধকার পাহাড়ী পথে জমাট বেঁধেছে, কিন্তু এই মন্দিরের পথ তাদের বহু-পরিচিত, চলতে কোথাও কোন বাধা পায় না।

শেষ রাতের অনেক আগেই মন্দিরের সামনে বুড়ো বেলগাছটার নীচে অশ্ব ও আরোহীর ভীড় জমতে থাকে। দু'জন পাঁচজন করে দেখতে দেখতে যুবকের সংখ্যা ক্রমশঃ কয়েক শতে গিয়ে পৌঁছালো। সকলেরই মুখে বিরাট-কিছু-একটা করার আগ্রহ, চোখে উৎসাহের দীপ্তি। কারুর মুখে কোন কথা নেই, ঘোড়ার পিঠে সবাই স্থির হয়ে বসে আছে। অল্প-তফাৎ

থেকেও এতটুকু গুঞ্জন শোনা যায় না, বোঝা যায় না যে এতগুলি মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছে।

অমাবস্যার রাত অন্ধকারের মায়া সৃষ্টি করেছে চারিপাশে। সামনে দিকে আর দৃষ্টি চলে না, অন্ধকারের কালো পর্দা চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। ঝিঁঝিঁ পোকারা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে হাসে, গাছের পাতাগুলি শিরশির করে বাতাসকে ভয় দেখায়। মন্দিরের মাথায় আকাশ-প্রদীপটি সচল তারার মত দোল খেতে থাকে। মূক যুবকসঙ্ঘকে ঘিরে মহাকাল অনন্ত অন্ধকারের পথে এগিয়ে চলে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে হঠাৎ মৃদু গুঞ্জন উঠল—"ওই এসেছে! এসেছে!!"

ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল, একটা অস্ফুট ছায়া মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ব'লে মনে হ'ল, অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা গেল না। একজন একটা মশাল নিয়ে অপেক্ষা করছিল, দপ্ করে মশালটি জ্বেলে সে মাথার উপর তুলে ধরল। দেখা গেল, কালো ঘোড়ার পিঠে এক দীর্ঘ পুরুষ, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কালো বর্ম্মে ঢাকা। মিশ্ কালো পালিশ করা বর্ম্মের উপর মশালের আলো জ্বলন্ত লোহার আভা প্রতিফলিত করছে। মনে হয় যেন কোন ভাস্কর কালো পাথরের একটি মূর্ত্তি তৈরী করে এইমাত্র পলিশ করে গেছে।

কালো সওয়ার স্তব্ধ অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সমবেত যুবকদের পানে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তার পর জনতাকে সম্বোধন করে বলতে সুরু করল—"বন্ধুগণ, আজ আমি তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি নতুন কিছু বলতে নয়। তা পুরানো কথা, প্রতিদিন যা চোখের সামনে দেখতে দেখতে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছ। সে কথা আমার কথা নয়, সে কথা সমগ্র নির্য্যাতিত হিন্দুস্থানের দুঃখের ইতিহাস—অত্যাচারিত জনগণের চোখের জল। যাদের শান্তির নীড় হূনেরা ভেঙে দিয়েছে, হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাদের কান্নার রেশ শোনা যাচ্ছে, যাদের রক্তাক্ত দেহের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে মিহিরকুলের বিজয় অভিযান আজ আমাদের দ্বারে এসে হানা দিয়েছে, তাদের আজ প্রতিহত করতে হবে, জীবন পণ করে আজ অত্যাচারীর সম্মুখীন হ'তে হবে। সারা হিন্দুস্থানের বুকে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে, জনগণের মুখে আবার ফুটিয়ে তুলতে হবে হাসি। একদিন যেখানে শস্যশ্যামল জনপদ ছিল আজ সেখানে রুক্ষ প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে, একদিন যেখানে শান্তিপূর্ণ নগর ছিল আজ সেখানে চিতা-ভরা ছাই ছাড়া আর কিছু নেই। নিষ্ঠুর অত্যাচার আজ উত্তরাপথের শ্যামলিমাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে, অত্যাচারী আজ হিন্দুস্থানের সম্রাটের আসনে আসীন। তাকে আজ আঘাত করতে হবে, এমন আঘাত করতে হবে যাতে হূনেরা ভারতের বুক থেকে চিরদিনের মত অন্তর্হিত হয়ে যায়। মাতৃভূমিকে বন্ধনমুক্ত করার জন্য আজ

থেকে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে—যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্ত্তে আহ্বান আসতে পারে, আহ্বান এলেই যেন আমরা আঘাত করতে পারি। তোমরা পারবে সে আঘাত করতে? পারবে দুর্দ্দান্ত হূনদের সম্মুখীন হ'তে? পারবে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে? পারবে প্রয়োজন হ'লে নিজেকে মৃত্যুর অন্ধকারে সমাহিত করতে? পারবে নিঃস্বার্থভাবে জাতির জন্য, সমগ্র ভারতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে?"

কালো-সওয়ার থামলো। জনতা চীৎকার করে উঠ্‌ল—"পারবো! পারবো!! পারবো!!!"

—"অতি উত্তম! তোমরা তা হ'লে আজ থেকে অসি, বল্লম ও তীরধনু প্রস্তুত রেখো, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে জানা-চেনা প্রত্যেক লোকটিকে বলবে প্রস্তুত হবার জন্য। কালই হয়তো তাদের সকলের ডাক পড়বে, কালই হয়তো মিহিরকুলের বিজয়-বাহিনীর সম্মুখীন হবার প্রয়োজন হবে। তখন যেন আমরা পশ্চাদ্‌পদ না হই, তখন যেন সত্যিকারের বীরের মত শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে আমরা বুক পেতে দিতে পারি, স্বাধীন ভারতবাসী ব'লে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি।"

অন্ধকারে কালো সওয়ারের কণ্ঠস্বর গম্-গম্ করতে থাকে—"মানুষের মত মানুষ হ'য়ে বাঁচতে না পারলে সে বাঁচার মূল্য কি? ওরা আমাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ফসল কেটে নিচ্ছে, আমাদের উপর যা-খুসি-তাই অত্যাচার করছে, মানুষ কুকুর-বেড়ালকেও যেটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয় তাও আজ আমরা পাই না। আমাদের দেশে মানুষের মত বাস করার অধিকারও আজ আমাদের নেই। আর আমরা এই বৈষম্য সইতে পারছি না, আমাদের জীবন দিয়েও আজ এর প্রতিবিধান করতে হবে। স্বজাতি ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের অনেকেরই জীবনান্ত হবে। কে বাঁচবে, কে মরবে কেউ তা জানে না, কিন্তু মাতৃভূমির জন্য মৃত্যু বরণ করতে কি আমরা পিছিয়ে আসব? আমরা কি যুগ-যুগান্ত ধরে কুকুরের মত এইভাবে বেঁচে থাকব?"

—"না না, কখনই নয়।"—সমবেত তরুণ দল উদ্বেল হ'য়ে উঠল।

—"বেশ, তা হ'লে তোমাদের জাতির জন্য, তোমাদের দেশের জন্য, তোমাদের স্বাধীনতার জন্য তোমরা মরতে প্রস্তুত?"

—"প্রস্তুত! প্রস্তুত!!"

—"উত্তম, আজ তা হ'লে এইখানেই সভা ভাঙল। তোমরা এখন ফিরে যাও। যথা সময় সংবাদ পাবে। নমস্তে।" কালো সওয়ার দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে জনতাকে নমস্কার জানাল, তার পর ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বিস্মিত, মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত জনতা প্রতি-নমস্কার করতে ভুলে গেল, তাদের চোখে তখন

নতুন দীপ্তি, মনে নতুন উৎসাহ, দুর্দ্দান্ত হূনদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার উন্মাদনায় তখন তারা আচ্ছন্ন।

রেওয়া নগরীর উপকণ্ঠে হূনদের তাঁবু পড়েছে। শত শত তাঁবুতে প্রান্তর ছেয়ে গেছে। কতক সৈন্য আবার খুসি-মত নগরের বাড়ী-ঘরও দখল করে বসেছে। নগরী প্রায় জনশূন্য। মিহিরকুল আসছে শুনেই নাগরিকেরা যার যেদিকে সুবিধা পালিয়েছে।

সকাল বেলা তাঁবুর বাইরে মিহিরকুল পদচারণা করছিল, এমন সময় গুপ্তচর এসে খবর দিলে—"সম্রাট্, কাল রাত্রে মহাদেও পাহাড়ের উপর কালো সওয়ার এক সভা করেছিল। ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

মিহিরকুল বল্‌লে—"আক্রমণ নয়, বিদ্রোহ। প্রজারা সম্রাট্‌কে আক্রমণ করে না, করে বিদ্রোহ। যাক্, কত জন সে সভায় উপস্থিত ছিল?"

—"আজ্ঞে, প্রায় দু'-তিন হাজার।"

সম্রাট্ মিহিরকুল এবার হো হো ক'রে হেসে উঠল, বল্‌লে—"দু'-তিন হাজার যুবক নিয়ে সম্রাট্ মিহিরকুলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে! সে 'কালো-কুত্তার' মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।"

—"আজ্ঞে, সমগ্র দেশকে প্রস্তুত করার জন্য সে আদেশ দিয়েছে।"

হূন সম্রাটের ভ্রূ দু'টি কুঁচকে উঠল, ছোট ছোট চোখ দু'টি আরো ছোট হয়ে গেল, বজ্রকঠিন স্বরে সে বল্‌তে সুরু করলে—"হূন সম্রাট্ একটা কালো কুকুরকে ভয় করে না। বিদ্রোহের একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলে, আমার একজন অনুচরের জীবনান্ত ঘটলে, সমগ্র মহাদেও পাহাড়ের বুকে একজন হিন্দুস্থানীও থাকবে না, জনপদ অরণ্যে রূপান্তরিত হবে। নগরের পর নগর জ্বালিয়ে দেব, মানুষগুলোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবো, দেখবো তারা কি করে! আমি জানি কি ক'রে কুকুরদের শায়েস্তা করতে হয়, কি করে পরাধীন জাতকে পায়ের নীচে রাখা যায়। কিন্তু তার আগে এই কালো সওয়ারটি কে আমায় জানতে হবে, ওদের সকলের সামনে তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব, তার পর ওদের ব্যবস্থা।"

পরদিন হূন ঘোড়-সওয়ারদল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে দিলে—"কালো সওয়ারকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় যদি কেউ সম্রাটের সামনে উপস্থিত করতে পারে, অথবা তাকে ধরিয়ে দেবার মত যথাযথ সংবাদ যদি কেউ সরবরাহ করতে পারে, মহামান্য সম্রাট্ মিহিরকুল তাকে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।"

(ক্রমশঃ)

সাধুর অদ্ভুত ধূমপান

[ম্যাজিকের কৌশল]

শ্রীদেবকুমার ঘোষাল (বালক যাদুকর)

বছর তিনেক আগেকার কথা, আমি তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। গরমের ছুটিতে দেশের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছি। বহুদিন পরে বাল্যবন্ধুদের পাইয়া বড়ই আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলাম গ্রামে একজন সাধু আসিয়াছেন; শ্মশানের ধারে বটগাছের তলায় ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। বহু শিষ্য-সামন্ত জুটিয়াছে। সাধু কাহারও সহিত কোন কথা বলেন না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ইসারাতেই কাজ সারেন কিংবা বড় জোর হাঁ কিংবা না বলিয়া থাকেন। সাধুর সুদীর্ঘ জটা এবং দাড়ির বহর দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সাধুর প্রতি অসীম ভক্তির উদয় হইয়াছে। দলে দলে লোক ছুটিতেছে। ভক্তির আরও কারণ, সাধু নানারূপ অসাধ্য সাধন করিতেছেন। কেহ গিয়া প্রসাদের আশায় সাধুর সম্মুখে ভক্তি করিয়া হাত পাতিলে সাধু অমনি হাতে কিছু খড়ের কুচি তুলিয়া দেন এবং হাত খুলিলে দেখা যায় যে খড়ের পরিবর্ত্তে উহা কিস্‌মিসে পরিণত হইয়াছে। আবার সাধু এক প্রকার তামাক খান সেইটীই নাকি আরও অদ্ভুত! সাধুর শিষ্য কলিকাতে তামাক সাজিয়া হুঁকাটী সাধুর হাতে তুলিয়া দিলে সাধু হুঁকাটী মুখে একটীবার লাগাইবা মাত্র হুঁকা মুখের সঙ্গে লাগিয়া থাকে এবং সাধু হাত ছাড়িয়া দিয়া হুঁকা টানিয়া তামাক খাইতে থাকেন। এইরূপ সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া আমাদেরও সাধু দেখিবার জন্য ভক্তির মাত্রা না হোক্ কৌতূহলের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, এবং একদিন বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া হল্লা করিয়া সাধুদর্শনে বাহির হইলাম।

সাধুর আশ্রমে পৌঁছান গেল। কিন্তু পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমাদের সমস্ত রকম দুষ্টামি বুদ্ধি নিমেষে উড়িয়া গেল। দেখিলাম লোকে লোকারণ্য—সাধু কোথায় তার খোঁজ পাওয়াই ভার। ভিড় ঠেলিয়া বহু কষ্টে সকলে মিলিয়া একটু অগ্রসর হইয়া দেখি ধুনীর একধারে সাধু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে; চারিদিকে অসংখ্য ফল, দুধ ও মিষ্ট দ্রব্যাদি মজুত রহিয়াছে। সাধুকে, চেলাদিগকে এবং ভক্তিমান্ জনমণ্ডলী দেখিয়া আমাদেরও ভক্তির উদয় হইল এবং সাধুর কার্য্যকলাপ শ্রদ্ধার সহিতই দেখিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম, যাহা শুনিয়াছিলাম সত্যই তাই। সাধুর একপাশে কতকগুলি কুচান খড় রহিয়াছে। এক ব্যক্তি সাধুর নিকট প্রসাদ চাহিলে সাধু অমনি পাত্র হইতে কিছু খড় তুলিয়া লইয়া উক্ত ব্যক্তির হাতে দিয়া হাত মুঠো করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সাধু হাত সরাইয়া লইলে ঐ ব্যক্তি হাত খুলিয়াই দেখে যে উহার হাতের মধ্যে ৭৮টী কিস্‌মিস্—একটুক্‌রা খড়ও নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে সবাই আমরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম এবং সাধুর এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বন্ধুরা একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। আমি অল্প বিস্মিত হইলেও একেবারে অবাক্ হই নাই। এক, দুই, তিনবার এই কীর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াই আসল ব্যাপারটী ধরিয়া ফেলিলাম। কিন্তু বন্ধুদিগকে কিছু বলিলাম না। তার পর ধূমপানের পালা। দেখিলাম, সত্য সত্যই সাধুর এক শিষ্য তামাক সাজিয়া একটা হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া সাধুর সম্মুখে ধরিল। সাধু হুঁকার ফুটাটি মুখে একবার মাত্র লাগাইয়া দু'হাত ছাড়িয়া দিয়া দিব্যি আরামে ধূমপান করিতে লাগিলেন। এইবার কিন্তু আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হইলাম, কেননা ভাবিয়াছিলাম কিস্‌মিসের ন্যায় ইহারও রহস্য বাহির হইবে কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে ঘুরিয়াও কোন কিনারাই করিতে পারিলাম না। প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম সাধু সুদীর্ঘ জটা ও দাড়ির সাহায্যেই কোন কৌশলে হুঁকাটীকে ঐরূপ আট্‌কাইয়া রাখেন কিন্তু বহু লক্ষ্য করিয়াও সেরূপ কিছু দেখিতে পাইলাম না।

আমার বন্ধুগণ তখন আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, "কি রে, তুই ত' মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান্ হয়েছিস্—সাধুর মত বিদ্যা দেখাতে পারিস্ তবে ত' বুঝি!" আমি বন্ধুদের কথায় কিছু মাত্র কান না দিয়া একমনে সাধুর তামাক খাওয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। ঘুরিয়া সাধুর পিছন দিকে গিয়াছি, দৈবক্রমে হঠাৎ একটী সুযোগ মিলিল। সাধু ধূমপান করিতে করিতে হঠাৎ একবার কাসিয়া ফেলিলেন এবং একটু হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গে সাধুর ধূমপানের সকল রহস্য মুহূর্ত্তে

আমার নিকট ধরা পড়িল। তখন আর আমার সাধুর বুজরুকী বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। ইতিপূর্ব্বে কিস্‌মিসের ব্যাপার সবই বুঝিয়াছি, এখন আবার ধূমপানের বিদ্যা দেখিয়া সাধুর প্রতি ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠিল। হায় হায়! এমনি করিয়া ভণ্ড প্রতারকের দল দু'টা ম্যাজিকের কৌশল শিখিয়া আসিয়া দেশের ধর্ম্মভীরু সরলপ্রাণ নরনারীদিগকে ঠকাইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না! অথচ এদের দৃষ্টান্তে আমরা এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশের সত্যিকার সাধু মহাত্মাদের প্রতিও দিন দিন শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠিতেছি! যাহা হউক বন্ধুদের এ সম্বন্ধেও কিছু জানাইলাম না, শুধু ফিরিবার পথে বলিলাম, "তোরা কাল আমাদের বাড়ীতে এসে সাধু দেখিস। অবশ্য অবশ্য আস্‌বি—পরে অন্য সব কথা হবে।" বন্ধুরা ত' পরের দিন সকালেই আসিয়া উপস্থিত। তার পর সাধুর বদলে আমাকে সাধুর বেশে দেখিয়া এবং আমার হাত হইতে কিস্‌মিস্ খাইয়া এবং আমার অদ্ভুত হুঁকায় তামাকু খাওয়া দেখিয়া সকলেই আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

কিস্‌মিসের ব্যাপারটী আজ আর ভাঙ্গিব না, হুঁকায় তামাক খাওয়া ব্যাপারটির রহস্য বলিয়া দিতেছি। জিনিষটী দেখিতে ও শুনিতে যেমন অদ্ভুত, কার্য্যতঃ কিছুই নহে; ইহার কৌশল অতি সহজ—শুধু একটু অভ্যাস ও সাবধানতার প্রয়োজন।

আসল ব্যাপার এই—সাধুর মুখের ভিতরে পূর্ব্ব হইতে একটী ছোট নল—যাহা ঠিকমত হুঁকার ফুটাতে লাগিতে পারে—জিভের আড়ালে লুকান ছিল। সাধু বেশী কথা বলেন না এই জন্য সুবিধাই হইয়াছিল, নলটী যে মুখে আছে তাহা কোনক্রমেই বুঝিবার উপায় ছিল না। এখন, শিষ্য যেই হুঁকাটী আগাইয়া দিল অমনি সাধু হুঁকাতে মুখ দিয়াই কৌশলে নলটী হুঁকার ফুটার ভিতরে আট্‌কাইয়া নিয়া দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া হাতের সাহায্য বিনাই ধূমপান করিতে আরম্ভ করিল। এইখানে বলা আবশ্যক, এক প্রকার স্প্রিংয়ের চাবি কিনিতে পাওয়া যায় (উহা ঠিক ছোট গোলাকার টর্চ্চলাইটের চাবির মত—অর্থাৎ যাহা টিপিয়া টর্চ্চের মুখটী খুলিয়া ফেলা যায়) চাবিটী ঐ নলের মাথায় পূর্ব্ব হইতে ফিট করা থাকিবে এবং উহা হুঁকার ফুটার ভিতরে প্রবেশ করাইতে কোনই কষ্ট

হইবে না—আর ছুঁকাটী সহজেই মুখে লাগিয়া থাকিবে। এইরূপ চাবি দুর্লভ হইলে স্প্রিংয়ের সাহায্যে ম্যাজিসিয়ান্ উহা তৈরী করিয়াও লইতে পারেন।

আমার বন্ধুরা এই ম্যাজিকটী না শিখিয়া ছাড়িল না, এবং বলা বাহুল্য তার পর দিনই সাধুকে অন্য আস্তানার সন্ধানে বাহির হইতে হইল।

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪

শালোওায় যে ডাকাতি হয় তাহাতে ডাকাতদের সংখ্যা প্রায় দুই শত। তাহারা বাদ্যভাণ্ড লইয়া খুব সমারোহের সহিত আসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা প্রথমে ভাবিয়াছিল কোন ধূমধামের বিবাহের শোভাযাত্রা আসিতেছে। গ্রামের চারিদিকে চারিটা ঘাঁটিতে ষোল জন করিয়া বাছাই খেলোয়াড় নিযুক্ত ছিল। তাহারা নূপুর পায়ে দিয়া সড়কি হস্তে মণ্ডলী করিয়া বাদ্যের তালে তালে নাচিয়া ঘাঁটি রক্ষা করিতেছিল। কালীর পাকদের মুখে মুখোস ছিল এবং তাহারা বীভৎস চীৎকার করিয়া ও দীর্ঘ লম্ফ দিয়া বাড়ীর চৌদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল।

এই ডাকাতির আয়োজন চলিয়াছিল প্রায় বৎসর ধরিয়া। ডাকাতদের লোক মিস্ত্রি, দর্জ্জি ছাতাওয়ালা, ভিখারী, ফেরিদার প্রভৃতির বেশে গ্রামে আড্ডা লইয়াছিল। জমিদারের বাড়ীতে পর্য্যন্ত ভৃত্য ও নগ্‌দীর পদ অধিকার করিয়াছিল। দলের স্ত্রী-গোয়েন্দা চাকরাণী বৃত্তি লইয়া অন্দরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আয়োজন ও সংবাদ আদান-প্রদানের পর তবে এ ডাকাতি হয়।

অনেক দিন অতিবাহিত হইল। পুলিশের যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও এত বড় ডাকাতির কোন কিনারা হইল না।

পাঁচ ছয় মাস পরে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল ঐ ডাকাতির সহিত ঠগীদলের যোগ আছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এবং সেইজন্য সরকারের ঠগী দমনের প্রধান কর্ত্তা মেজর স্লিম্যানের দক্ষিণ হস্ত দুর্দ্দান্ত ঠগী-কমিশনার চন্দ্রশেখর রায় স্বয়ং তদন্ত করিতেছেন। তাঁহার সুদক্ষ গোয়েন্দারা ইহার মধ্যে দুইজন ডাকাতকে ধরিয়াছে। তাহারা একরারও করিয়াছে, ফলে বহু ডাকাত গ্রেপ্তার হইতেছে।

চন্দ্রশেখর বাবু কোগ্রামে আসিতেছেন এবং তাঁহার এজ্‌লাসে হরে মাঝি সহ হাজির হইবার জন্য গ্রামের প্রধান বক্সী ও গাঙ্গুলী মহাশয়দ্বয়ের উপর পরোয়ানা জারি হইয়াছে। সংবাদে গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রদেশের লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, হরে মাঝির ফাঁসি ত হইবেই, কর্ত্তাদেরও দ্বীপান্তর অনিবার্য্য। চন্দ্রশেখর বাবু কঠোর হস্তে ঠগীদের দমন করিতেন। ফাঁসি ও দ্বীপান্তর ভিন্ন অন্য শাস্তিতে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না, কাজেই এ গুজব ভিত্তিহীন নহে। দুইটী সম্ভ্রান্ত পরিবারে হাহাকার উঠিল। বাড়ীতে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ বন্ধ। শান্তিস্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, মধুসূদন নাম যপ আরম্ভ হইল। সকলেই আতঙ্কে দিশাহারা। আর কয় দিন বা তাঁহারা দেশে আছেন—শেষ দেখা করিবার জন্য আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব আসিতে লাগিল। গভীর শোক ও দুঃখের কালিমা তাঁহাদিগকে কাতর করিল। ব্রহ্মশাপের পর রাজা পরীক্ষিতের যেমন অবস্থা হইয়াছিল ইহাদিগেরও কতকটা তাহাই হইল। দ্বীপান্তরকে দ্বীপচালনা বা ডিপ্‌চালান বলে। অজ্ঞাত কথাটার এতই প্রচলন হইল যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে 'ডিপ্‌চালান কি মা? সে কি আমাদিকে কামড়াবে?' অন্য লোকে বুঝিত কর্ত্তাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রের একটা জনশূন্য চরে ছাড়িয়া দিবে, অনাহারে মারা যাইবেন, অন্যথা বাঘে খাইবে।

এক হরে মাঝির জন্য তাঁদের এই বিপদ্। হরিকে ডাকাইয়া কত ভয়, কত প্রলোভন দেখাইলেন। সে বলিল, 'আমি নির্দ্দোষ, বিনা দোষে ফাঁসি হয় ত হবে! মা মঙ্গলচণ্ডী ত আছেন। আর আমার যদি ফাঁসি হয়, আমার জমিদার ও মনিব বলে কি আপনাদের দ্বীপান্তর হবে? এ কি সম্ভব!' কর্ত্তারা যুক্তির মূল্য বুঝিতেন কিন্তু দ্বীপ চালান কি যুক্তি শুনিবে?

হরি মনে ভয় পাইল, তবে ভগবানের উপর তার অনন্ত নির্ভর। পত্নীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। সেখানে পত্নী দেবদ্বারে ধন্না দিয়া রহিল। হরি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। সে প্রাণ ভরিয়া গাহিত—

"সে দিন তোমায় বুঝবো হরি,
কেমন দীনের বন্ধু তুমি !"

অশ্রুজলে সে নামগানকে অভিসিক্ত করিত।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কোগ্রামে উজানির মেলার মাঠে ছাউনি পড়িল। তাম্বুর বড় বড় খুঁটা ও মোটা দড়ি দেখিয়া হরির যে ফাঁসি হইবে সে বিষয়ে লোকের আর সন্দেহ রহিল না। লাল পাগড়ী ও বন্দুকধারীতে মাঠ ভরিয়া গেল। প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ায় বিজয়ী বীরের ন্যায়—চার জন ঘোড়-সওয়ার সঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবু গ্রামে প্রবেশ করিলেন। মাঠে মেলার ন্যায় লোকের ভিড়। কেহ হাকিম দেখিতে, কেহ বা ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছে।

হরিকে সঙ্গে লইয়া, পাল্‌কী করিয়া বক্সী ও গাঙ্গুলী মহাশয় হাজির হইলেন। হাকিম উভয়কে বসিবার জন্য চেয়ার দিবার হুকুম দিলেন। তাঁহাদিগকে পিছ্‌মোড়া করিয়া না বাঁধিয়া চেয়ার দেওয়ায় আতঙ্কের একটু উপশম হইল। চন্দ্রশেখর বাবু হরির উন্নত সবল দেহ এবং সরল বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। তার পর একটা ঘাড়-বাঁকা ভিখারী বন্দীকে দেখাইয়া বলিলেন—"তুমি একে সনাক্ত করতে পার ?"

হরি অভিবাদন করিয়া বলিল—"হুজুর, এর নাম জানি নে, তবে গ্রামে গ্রামে একে ভিক্ষা করতে দেখেছি। এ বলে 'বনের বুড়া'র দেয়াসী তাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিতে এলে অবজ্ঞায় মুখ বাঁকানোতে মুখ একেবারে বেঁকে গিয়েছে। ভাল হবে না। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য সে বৈরাগী হয়েছে।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"তুমি শালোণ্ডার ডাকাতির সময় একটা ডাকাতের ঘাড় বেঁকিয়ে দিয়েছিলে কি ?"

হরি—"হাঁ হুজুর, দিয়েছিলাম।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"তুমি ডাকাতির দলে ছিলে ?"

হরি—"না হুজুর।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"তবে কি জান বল ?"

হরি—"আমি ঘোষালদের মা ঠাকুরুণের কন্যার কাপড় সন্দেশ নিয়ে তত্ত্ব করতে শালোণ্ডা যাই। রায়েদের বাড়ী তাঁর বিয়ে হয়েছে। রাত্রিতে যখন ডাকাত পড়ে তখন আমি বাবুদের গোমস্তার কাছে শুয়ে ছিলাম। তিনি ছিলেন খাটে আর আমি মেজেতে। ভয়ে দুয়ার খোলা হয় নাই। জানলা দিয়ে দেখ্‌ছিলাম। হুজুর, অমন কুৎসিত চীৎকার আমি জন্মে শুনি নাই। গোমস্তা ভয়ে মূর্চ্ছা যান। একটা ডাকাত দিদিমণির শিশু ছেলের কচি আঙ্গুলগুলি এক প্রকাণ্ড ধারালো জাঁতির ভিতর দিয়ে চেপে ধরে তাঁকে গায়ের অলঙ্কার সব খুলে দিতে বল্‌লে। তিনি

তাই দিলেন। তার পর ডাকাতটা সিন্দুকের চাবি চাইলে—না দিলে ছেলের হাত ও গলা কেটে দেবার ভয় দেখিয়ে ছেলের আঙুলে জাঁতির চাপ দিল, ছোট ছেলে যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করতে লাগলো—মানুষে তা সহ্য করতে পারে না। দিদিমণি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। আমি আর ঘরে থাক্‌তে পারলাম না। দুয়ার খুলে ছুটে গিয়ে সেই ডাকাতটার ঘাড় সজোরে বেঁকিয়ে দিলাম এবং জাঁতি কেড়ে নিলাম।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"এই কি সেই ডাকাত ?"

হরি—"তখন এর মুখে কালি মাখানো ছিল চিনতে পারবো না, তবে এম্‌নি প্রকাণ্ড চেহারা বটে।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"তার পর ?"

হরি—"তার পর দু'জন ডাকাত আমাকে আক্রমণ করে, আমি হটিয়ে দিই আর চীৎকার করে বলি—যারা ডাকাতি করতে এসেছিস তার মধ্যে যদি আমার কেউ সাকৃরেদ থাকিস, আমার দিদিমণির বাড়ীর জিনিষ স্পর্শ করিস্‌নে—যদি করিস জলে মরবি।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"তোমার সাকৃরেদরা ছিল কি ?"

হরি—"হুজুর, থাকতে পারে, তবে আমি জানি নে—আমার সাকৃরেদ অনেক, লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা, কুস্তি, নৌকা বাচ সব শিখে তারা এখন নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তারা এমন নিষ্ঠুর নয়।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"হাঁ, তোমার বীরত্বেই সে দিন ডাকাত দলকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে। একটা সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ইজ্জত রক্ষা হয়েছে। তুমি নিজে বড়াই কর না কিন্তু আমি সমস্ত সংবাদ পেয়েছি।" তার পর একজন চলৎ-শক্তিহীন পঙ্গুকে দেখাইয়া বলিলেন, "একে সনাক্ত করতে পার ?"

হরি—"কখনো দেখেছি মনে হয় না।"

চন্দ্রশেখর বাবু—"তুমি যে বীভৎস চীৎকার সে দিন শুনেছিলে সেটা এরই ? এ একা এমন ভীষণ চীৎকার করতে পারে যে আতঙ্কে দুই তিন মাইলের লোক ভয়ে কাঁপবে। ডাকাতরা একে ডুলি করে নিয়ে যায় এবং এক নিরাপদ স্থানে বসিয়ে রাখে। সেখান থেকে সে ঐ রকম শব্দে দলকে উৎসাহিত এবং গ্রামবাসীকে হতভম্ব করে। এই দু'জন ডাকাত বহু লোকের নাম দিয়েছে, তারাও গ্রেপ্তার হয়েছে। তুমি সে রাত্রিতে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, মোগল যুগে তুমি মনসবদারের উপযুক্ত। তোমার বীরত্বের ও ব্যক্তিত্বের পুরস্কার স্বরূপ সরকার তোমাকে এই এক শ' টাকার তোড়া উপহার দিয়েছেন।" এই বলিয়া তিনি টাকার থলি হরির হস্তে অর্পণ করিলেন।

হরি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে বারবার প্রণাম করিল। জনসাধারণ উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল। বকসী ও গাঙ্গুলী মহাশয় ভগবানের কৃপা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর বাবু বকসী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার পূর্ব্বপুরুষ বর্গীদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। হরি আপনার উপযুক্ত প্রজা—সরকার আপনাকে এই সনন্দ ও বন্দুক উপহার দিচ্ছেন।"

বকসী মহাশয় কহিলেন, "আমি সামান্য লোক, আপনার ও সরকারের এ অনুগ্রহ আমি বংশানুক্রমে স্মরণ রাখ্‌ব। আমি এই বন্দুককে একটা জায়গীর মনে কর্‌ব। সরকারের ন্যায় বিচারে দেশ সুখী হয়েছে।"

তার পর চন্দ্রশেখর বাবু গাঙ্গুলী মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি ধনী জমিদার, আপনার ভৃত্য হরিকে সুশিক্ষাই দিয়েছেন। পুলিশ আপনার প্রচুর সাহায্য পেয়েছে। আপনাকে এই সনন্দ ও ছড়ি সরকার উপহার দিলেন।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "পুলিশকে অকুণ্ঠিতচিত্তে সকল সংবাদ জানিয়েছি মাত্র, যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি নি। আপনার ও সরকারের প্রদত্ত সম্মান ও উপহার আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করলাম।"

ফাঁসি ও ডিপ্‌চালানের পরিবর্ত্তে এমন অভাবনীয় সৌভাগ্য মা মঙ্গলচণ্ডীর একান্ত করুণা ইহাই গ্রামবাসী বুঝিল। সরকারের ন্যায়বিচারের উপর জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল। লোকচক্ষে হরির সম্মান বৃদ্ধি পাইল। তাহার পত্নী ভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। আনন্দাশ্রুতে তাহার গণ্ড প্লাবিত হইল। (ক্রমশঃ)

সামান্য একটা বিরোধ

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

কিছুদিন আগের কথা।

দুই গ্রামের দুই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার—নকীপুরের মাঠের মাঝখানে দুই জমিদারের জমিদারীর সীমানা এসে মিশেছে।

কিছুকাল ধ'রে এ দুই জমিদার বংশের মধ্যে বিরাজ কর্‌ছিল একটা প্রীতির সম্বন্ধ। অতীতে কবে কোন্ দিন দুই বংশের মধ্যে বিরোধ বেধেছিল সে কথা জমিদারেরা এবং জমিদারের লোকেরা প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু মানুষের রক্তে নাকি বিদ্বেষের বিষ মিশে থাকে—তাই ত চাপা-পড়া ব্যাধির মত সে বিদ্বেষ হঠাৎ একদিন সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

সেদিনও ঠিক ঘট্‌ল ঐ রকম একটা ঘটনা।

দুই জমিদারেব মাঝে যে প্রগাঢ় প্রীতির বাঁধন বিরাজ কর্‌ছিল সে বাঁধন হঠাৎ ছিন্ন হ'য়ে গেল সামান্য একটা স্বার্থের সংঘাতের ফলে। ব্যাপারটা কিছুই নয়—সামান্য একটা আমগাছ নিয়ে সূচনা হ'ল সেদিনকার দ্বন্দ্বের। আমগাছটা বহুদিন ধরেই দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই জায়গায় যে জায়গায় দুই জমিদারীর সীমানা এসে মিশেছে।

দু'টী ব্যক্তি দু'টী পরিবার বা দু'টী জাতির মাঝে মিলন ঘটাবার লোকের সত্যিই বড় অভাব এ সংসারে, কিন্তু তাদের মাঝে বিরোধ ঘটাবার লোকের কোনও দিন অভাব হয় না।

এক গ্রামের জমিদারের কি কারণে প্রয়োজন হ'ল ঐ আমগাছটার। তা'র লোকেরা এসে আম গাছের গোড়ায় দিল কুঠারের ঘা। সে ঘায়ের শব্দ না পৌঁছাক কিন্তু সংবাদ পৌঁছাল ঠিক ও গ্রামের জমিদারের কানে। তিনি একটু হেসে বল্‌লেন—"দরকার পড়েছে তাই কাট্‌ছে, তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে?"

শুভাকাঙ্ক্ষীরা বল্‌লে—"তা বল্‌লে কি চলে? ওটা ত আপনার জমিদারীর এলাকার মধ্যেও বটে! আপনার একটু অনুমতি অন্ততঃপক্ষে নেওয়া উচিত ছিল ওঁর।"

জমিদার বাবু আবার একটু হেসে বল্‌লেন—"ভারী ত আমগাছ একটা, তার জন্য আবার অনুমতি!"

শুভাকাঙ্ক্ষীরা বাধা দিয়ে বল্‌লে—"আমগাছটা প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা আপনার সম্মান। আমগাছ কেন, একটা ধানের চারাই হ'ক না—তবুও আপনার যখন তাতে সমান অধিকার রয়েছে তখন আপনার একটা অনুমতি নেওয়া ওঁর অবশ্যই কর্ত্তব্য। তা যদি না নেন তা হ'লে বুঝতে হবে আপনার মতামতের যে একটা দাম আছে এ কথাটা উনি স্বীকারই করেন না; এতে আপনার সম্মানের যথেষ্ট হানি হয়। আপনার মত না নিয়ে আমগাছে ঘা দিয়ে উনি ঘা দিয়েছেন আপনার আত্মসম্মানে—"

জমিদারের কপালে এবার যেন সামান্য একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠ্‌ল মনে হ'ল। তিনি অবশ্য ভাল ভাবেই ব'লে পাঠালেন—"একটা অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল।" ও জমিদারের মুখে প্রথমটায় হাসি ফুটে উঠ্‌ল। বল্‌লেন তিনি—"অনুমতি! আমগাছের জন্য? কেন? ওঃ,

অর্দ্ধেকটা আমগাছ ত ও সীমানায় পড়ে। ঠিকই, অনুমতি একটা নেওয়া উচিত ছিল বৈ কি।"—তিনি লোক পাঠাচ্ছিলেন—"ভুল হ'য়ে গেছে, অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল"—এই কথাটা বল্‌বার জন্য।

কিন্তু এ পক্ষেও তাঁকে উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। তারা এসে বল্‌ল—"করছেন কি আপনি? এতে যে আপনার মহা-অপমান স্বীকার করা হ'বে।"

এ জমিদার মশায় বল্‌লেন—"ভুল স্বীকার করার মধ্যে অপমান আসে কোথা থেকে, মহত্ত্বই ত প্রকাশ পায়।"

উপদেষ্টারা সঙ্গে সঙ্গে বলে—"আহা, সে ত আমরাও জানি। তবে এ ত ভুল স্বীকার নয় শুধু—ও জমিদারের কাছে এ যে আপনার ক্ষুদ্রতা স্বীকার করা। নইলে একটা সামান্য আমগাছের জন্য—বুঝ্‌ছেন না? ও পক্ষের লোকে মজা দেখ্‌তে চায়।"

জমিদারের ভ্রূটা একটু যেন কুঞ্চিত হ'য়ে উঠে।

এমনি ক'রে দু'পক্ষের মনের ভাবটাই ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে আসে এবং নানা কথা কথান্তরের পর একেবারে বিষিয়ে ওঠে দু'পক্ষেরই মন। শেষ পর্য্যন্ত দু'পক্ষই রুখে দাঁড়ায়। এক পক্ষ গাছ কাট্‌বেই, আর এক পক্ষ কিছুতেই কাট্‌তে দেবে না।

দুই জমিদারের অন্তরের মাঝে যে পশুটা ঘুমিয়ে ছিল এত দিন, খোঁচা খেয়ে খেয়ে সেটা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল জেগে—তাদের রক্তে যে বিদ্বেষের পোকাগুলো নির্জীব হয়ে ছিল সেগুলো উঠ্‌ল কিল্‌বিল্‌ করে।

দু'পক্ষের লাঠিয়ালদের পড়ল ডাক।

লাঠিয়াল প্রজারা তাদের জমিদারের আদেশ শুনে চম্‌কে উঠ্‌ল। সে কি করে হয়! এ জমিদারীর প্রজাদের সঙ্গে ও জমিদারীর প্রজাদের কি নিগূঢ় স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে দিনের পর দিন ধরে! একজনেদের বিপদে আর একজনেরা যে বুক দিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—একজনেদের সুখ-সম্পদে আর একজনেদের আনন্দ-কোলাহলে যে চতুর্দ্দিক্‌ মুখরিত হ'য়ে উঠেছে! তার উপর এ জমিদারীর অনেকের সঙ্গে যে সত্যিকারের আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছে ও জমিদারীর অনেক প্রজার! কি ক'রে একজনেরা আর একজনেদের মাথায় লাঠি তুল্‌বে—তাদের রক্তে মাটী তুল্‌বে লাল ক'রে?"

কোন পক্ষের লাঠিয়াল প্রজাই রাজি হ'ল না লাঠি ধরতে। প্রচেষ্টা চল্‌ল দু' পক্ষতেই তাদের উত্তেজিত কর্‌বার জন্য।

প্রথমে নানা প্রকার প্রলোভন দেখান হ'ল; কোনও প্রলোভনই কাজে এল না। ভয় দেখিয়ে চেষ্টা করা হ'ল; তাতেও কাজ হ'ল না।

তখন মানুষের যা সব চেয়ে দুর্ব্বল স্থান সেইখানে দিল এরা আঘাত,—ঘা দিল তাদের অহঙ্কারে। বল্‌লে, "তোদের বাপ-পিতামহের রক্ত তোদের শরীরে এসেছে শুকিয়ে, লাঠি ধর্‌বার শক্তি নেই আর তোদের কব্‌জিতে, সাহস নেই আর তোদের কলিজায়—তাই বল্?"

হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল দু'পক্ষের লাঠিয়াল প্রজারা। দানবীয় শক্তি উঠ্‌ল জেগে তাদের মধ্যে। দু'পক্ষের লাঠিয়ালই বহুকাল পরে ধরল লাঠি মানুষের রক্তে মাটী রাঙ্গা কর্‌বার জন্য।

আগুন উঠ্‌ল জ্বলে।

ননীপুরের মাঠে একটা আমগাছকে মাঝখানে রেখে বাধল দাঙ্গা। প্রথমটায় জমছিল না সে রকম মোটেই। কয়েক ঘণ্টা আগে যাকে 'ভাই' বলে ডেকেছে তার মাথায় এখন বিনা কারণে বিনা আক্রোশে কি ক'রে মারবে লাঠি!

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই রক্তে তাদের নেশা জমে গেল। চল্‌ল লাঠি সজোরে।

কিছুক্ষণ পরে শুধু শোনা যেতে লাগ্‌ল হুঙ্কার আর আর্ত্তনাদ। কারো মাথা ফাট্‌ছে, কেউ মাথা ফাটাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ননীপুরের মাঠ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে। কোন পক্ষই হার মানে না। দু' পক্ষেই বহু লাঠিয়াল ধরাশায়ী হয়েছে; তবুও চলেছে লড়াই যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাঝে। প্রত্যেকের ধমনীতেই তখন উষ্ণ রক্তস্রোত বইছে—তারা যেন আর মানুষ নেই, যেন ক্ষিপ্ত বন্যপশু, লড়ছে রক্তপানের আশায়!

এ জমিদারের বৃদ্ধ লাঠিয়াল হীরু গয়লা এতক্ষণ শুধু বাঁচিয়ে আস্‌ছিল নিজেকে কোনও রকমে। বুকটার মাঝে তখনও তার কেঁদে উঠ্‌ছিল অন্যের মাথায় লাঠি তুল্‌তে। হীরু গয়লার লাঠির ভয়ে দু' দশ খান গ্রাম একদিন থর্‌ থর্‌ করে কাঁপত। হীরু এক কালে লাঠি ধরলে তার সামনে অগ্রসর হ'বার সাহস হ'ত না কোনও লাঠিয়ালের। শত্রুপক্ষের কত লাঠিয়ালের এক সঙ্গে মাথা ফেটেছে একা হীরুর লাঠিতে—সে কথা এখনও লোকের মনে আছে।

হীরু আজ কত বৎসর পরে ধরেছে লাঠি—কিন্তু কোনও উত্তেজনাই আস্‌ছে না তার শরীরে; জমিদারের হুকুম, লড়তে হয় তাই লড়ছে।

ও পক্ষের যুবক লাঠিয়ালের দল হীরুর এই আত্মরক্ষাকে ভুল কর্‌ল তার অক্ষমতা ব'লে। হীরুকে কর্‌লে আক্রমণ সকলে একসঙ্গে। হীরু একটু হেসে লড়তে লাগ্‌ল তাদের সঙ্গে—যেমন ক'রে বাঘ খেলা করে তার বাচ্চাদের সঙ্গে।

হঠাৎ অতর্কিত মুহূর্ত্তে কার একটা লাঠি এসে পড়ল হীরুর বাঁ দিকের কাঁধটায়। হীরু প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গেল যেন—এ তার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা। আজ পর্য্যন্ত কারো লাঠি তাকে এমনি করে স্পর্শ কর্‌তে পারে নি। মুহূর্ত্তের মাঝে সে আঘাত সে সাম্‌লে নিল।

মাথায় তার রক্ত গেল উঠে। বহুকাল পরে হীরুর হাতে আবার নেচে উঠ্‌ল তার লাঠি। আজ তার হাত কাঁপে, তবুও সে লাঠির সামনে দাঁড়ায় এমন সাধ্য রইল না কারো আজ। হীরু লাঠি চালাচ্ছে উন্মত্তের মত—কোনও খেয়াল নেই, রক্তে তখন তার আগুন লেগেছে। নিমেষের মধ্যে তার লাঠির আঘাতে জনে জনে লুটিয়ে পড়্‌ছে মাটীর উপর। রক্তনদীর উপর তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে হীরু আবার আজ নতুন ক'রে। আর্ত্তনাদে ভরিয়ে তুলেছে সে চতুর্দ্দিক্‌।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হঠাৎ আদেশ হ'ল দু' পক্ষেরই লাঠিয়ালদের প্রতি, "লাঠি থামাও—আর দরকার নেই, আপোষ হ'য়ে গেছে দু' পক্ষেব মাঝে।"

* * *

রাত্রি গভীব।

দুই জমিদারীর গয়লা ও বাগ্‌দী-পাড়ায় তখন করুণ ক্রন্দনের রোল উঠে হাহাকার ক'রে বাতাসে মিশে যাচ্ছে। শ্মশানের পথে চলেছে শবযাত্রীর দল আত্মীয়-স্বজনের শব কাঁধে করে।

বৃদ্ধ হীরুর কুঁড়ের মাঝে সব চেয়ে করুণ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য চলেছে। হীরু তার লাঠির আঘাতে শেষ করেছে ও জমিদারীর বামনদাসকে—তার চোখের মণি একমাত্র কন্যা রাধার স্বামীকে। স্বামী-হারা রাধা বৃদ্ধ জ্ঞানহারা পিতার বুকে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদ্‌ছে।

ওদিকে এক জমিদারের বাড়ীতে আর এক জমিদার আর তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা এসেছেন নিমন্ত্রিত হ'য়ে। সাময়িক বিরোধ মিটে যাওয়ার ফলে বিরাট ভোজের ব্যাপার চলেছে। দু' পক্ষের আনন্দ-কোলাহলে গয়লা ও বাগ্‌দী-পাড়ার করুণ আর্ত্তনাদ চাপা পড়ে যাচ্ছে।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহকদের দেওয়া প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর প্রকাশিত হয়। মতামতের জন্য কিন্তু সম্পাদক দায়ী ন'ন।]

উত্তর

বৈশাখের ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

আমরা শ্বাস লইবার সময় যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তাহা যদি কোন সময়ে অধিক পরিমাণে শরীরের ভিতর থাকে তাহা হইলে শরীরের মধ্যে অবসাদ আসে এবং হাই উঠে। হাই উঠার সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন খানিকটা বাহির হইয়া যায়।

—শ্রীঅরুণা সেন

বৈশাখের ৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

বেসবল্‌ খেলার নিয়ম-প্রণালী Pears' Cyclopaediaতে C. B. Fry লিখিত Sports বিভাগে আছে।

—শ্রীশম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য

Pears' Cyclopaediaর ক্রীড়া-বিভাগে মোটামুটি ভাল ভাবেই আছে। এই খেলায় প্রায় ৮৬টি নিয়ম পালনীয়। বিস্তৃত বিবরণ

Spalding and Bros, High Holborn W. C. I. এই ঠিকানায় পাইতে পারেন।

—শ্রীরামপ্রসাদ ও
—শ্রীহরপ্রসাদ কুশারী

নতুন প্রশ্ন

(১) এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে একজন আর একজনকে 'ফুল্‌' করে কেন?

—শ্রীমদনলাল সরাওগী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌.এস্‌-সি

কামান আর গোলার কথা

মাস কয়েক আগে তোমাদের কাছে আধুনিক আকাশ-যুদ্ধ আর সাবমেরিন্‌-যুদ্ধ নিয়ে অল্পস্বল্প আলোচনা করেছিলাম। এবারে স্থলযুদ্ধ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে ২।১টা কথা বল্‌ব।

স্থলযুদ্ধের কথা উঠতেই কামানের কথা আগে মনে পড়ে। আকাশ-যুদ্ধে যেমন ফেলা হয় নানা ধরণের বোমা, জলে যেমন ছোঁড়া হয় টর্পেডো আর ডেপ্‌থ্‌ চার্জ্জ, তেমনি ডাঙ্গায় ব্যবহার করা হয় কামানের গোলা। অবশ্য আকাশে এবং জলে যুদ্ধের সময়েও কামানকে বাদ দেওয়া চলে না—জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কামানের সমান প্রয়োজন, তবুও কামান বলতে প্রথমটা স্থলযুদ্ধের কথাই মনে আসে।

আধুনিক যুদ্ধের কামানকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম—বড় আকারের ভারী কামান। ১০ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি কামানগুলিকে এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে। এদের কোন কোনটা থেকে ২০।২৫ মাইল দূরে গোলা ফেলা যায়। দু' নম্বর কামানগুলি আকারে মাঝামাঝি—১০।১২ মাইল্‌

দূর পর্য্যন্ত গোলা ফেলবার এদের ক্ষমতা। এর চেয়ে ছোটগুলির পাল্লা বড় জোর ৭।৮ মাইল। সেগুলিকে বলে 'ফিল্ড্ গান্'।

গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মান্‌রা এক রকম অতিদূর পাল্লার কামান বার করেছিল। এই অতিকায় কামান দিয়ে ৭৬ মাইল্ দূর থেকে ফ্রান্সের প্যারিস্ সহরের উপর তারা গোলা ফেলেছিল। সে গোলাও যেমন তেমন নয়, এক-একটার ওজন কম ক'রে ২৫০ পাউণ্ড। এবারকার যুদ্ধে কিন্তু আর ও ধরণের অতিকায় এবং অতিদূর পাল্লার কামান ব্যবহার করা হচ্ছে না। তার কারণ আজকাল বোমারু বিমানের এমন উন্নতি হয়েছে যে তাদের দ্বারাই অনেক সহজে, অনেক অল্প খরচে এবং অধিকতর নিশ্চয়তার সঙ্গে ঐ ধরণের আক্রমণ করা যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ অতিকায় কামানগুলিতে, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হ'লেও, অসুবিধাও বড় কম নয়। প্রথমতঃ, ঐ রকম এক-একটা বিরাট্ বিরাট্ গোলাকে অতখানি রাস্তা ঐ রকম প্রচণ্ড বেগে (মিনিটে প্রায় ৩ লক্ষ ফুট) ঠেলে পাঠাতে যে পরিমাণ বারুদ খরচ হ'ত তার দাম অন্ততঃ ১৩।১৪ হাজার টাকা। তা ছাড়া অত অসম্ভব শক্তির বারুদ ব্যবহার করায় কামানের উপর এমন জোর পড়ত যে বার ত্রিশ-চল্লিশ গোলা ছুঁড়বার পরই সে কামান অকেজো হয়ে পড়ত,

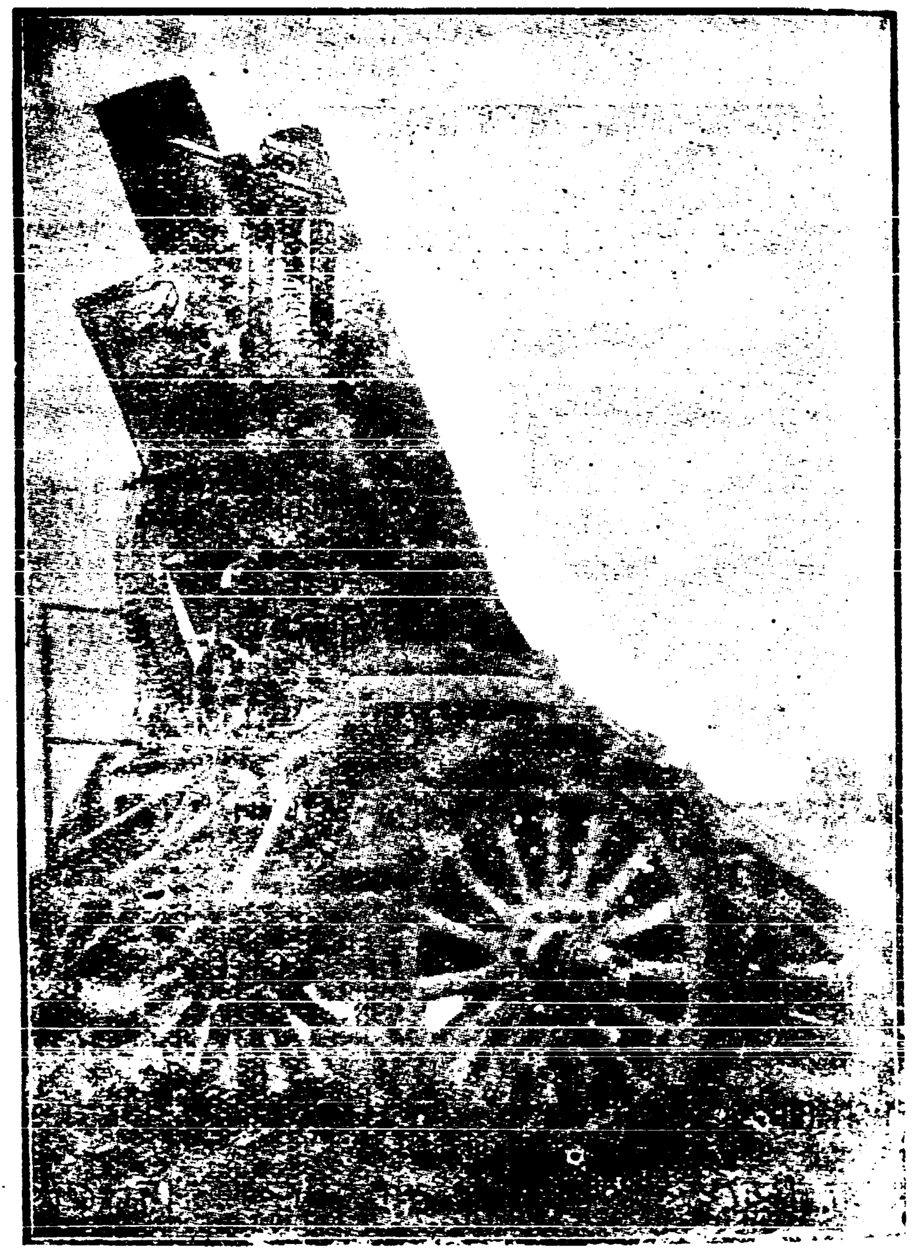

হাউইট্‌জার

আর বলা বাহুল্য অত দামী কামান অত সহজে অকেজো হয়ে পড়লে কি ক'রে চলে? তা ছাড়া লক্ষ্যও যে সব সময় ঠিক হ'ত এ কথা বলা চলে না। তবুও ও কামান গত বারের যুদ্ধে কম ত্রাসের সৃষ্টি করে নি।

তোমরা ভয়াবহ হাউইট্‌জারের কথা সবাই হয়তো শুনেছ। আগেকার আমলের হাউইট্‌জার থেকে গোলা বেরিয়ে প্রথমে যেত ওপরের দিকে, তার পর লক্ষ্যস্থলে নেমে আসত, অন্য কামানের গোলার মত সোজাসুজি যেত না। অন্য কামানের তুলনায় হাউইট্‌জার ছুঁড়তে খরচ কম পড়ত, টিকতও সেগুলো বেশী। কিন্তু আজকালকার সব কামানই ইচ্ছা মত উঁচু করে গোলা ছোঁড়া যায়, তা'তে বারুদের খরচ অনেক কম পড়ে, ফলও পাওয়া যায় বেশী। আধুনিক বিমান-বিধ্বংসী কামানের ছবি তো বোধ হয় তোমরা সকলেই দেখেছ?

এই সব কামানে যে গোলা ছোঁড়া হয় তা কিন্তু এক রকম নয়। অবস্থা বিশেষে নানা জাতের গোলার ব্যবস্থা আছে। গোলাকে ইংরেজীতে বলে শেল্। শেল্‌গুলির কোনটার মধ্যে ভরা থাকে প্রচণ্ড বিস্ফোরক, মাথায় থাকে ইস্পাতের টুপি। ঐ শেল্ গিয়ে যখন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তখন সঙ্গে সঙ্গে হয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আবার এক ধরণের গোলা আছে—সেগুলোর মধ্যে ভরা থাকে ছর্‌রার মত গুলি, ফাটবার সঙ্গে সঙ্গে তা চারদিকে ঝাঁক বেঁধে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলি ছাড়া ধোঁয়া-ছড়ান গোলা, শক্ত বর্ম্মভেদ-কারী গোলা, আগুনে-বোমার মত আগুন-ছড়ান গোলা ইত্যাদি আরও নানা রকম গোলা ব্যবহারের রেওয়াজ হয়েছে।

আকাশ থেকে যেমন বিষাক্ত গ্যাস-ভরা বোমা ছাড়া হয় তেমনি বিষাক্ত গ্যাসে-ভরা কামানের গোলাও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই গোলা যখন ফাটে তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তীব্র বিষাক্ত গ্যাস, তার খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই। রাত্রে ব্যবহারের জন্য নক্ষত্র-গোলা নামে এক রকম গোলাও আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্ধকারে এই গোলা ছুঁড়লে সঙ্গে সঙ্গে এগুলি জ্বলে ওঠে, আর চারদিক্ আলোকিত ক'রে শত্রুবাহিনীর উপর গিয়ে পড়ে। অন্ধকারে যেখানে

কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, গোলার কল্যাণে পর মুহূর্ত্তেই সে জায়গার সব কিছুই চোখে ধরা পড়ে যায়।

স্থলযুদ্ধের আর আর ব্যাপার সম্বন্ধে আর একদিন বলা যাবে।

ছোটখাট ব্যাপার

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপারেও কেমন ক'রে তাঁদের বৈজ্ঞানিক কৌশল খাটিয়ে থাকেন তার কিছু কিছু বিবরণ এর আগে তোমরা কয়েক বার শুনেছ। এ বিষয়ে আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিকদের কথাই বেশী ক'রে বলতে হয়।

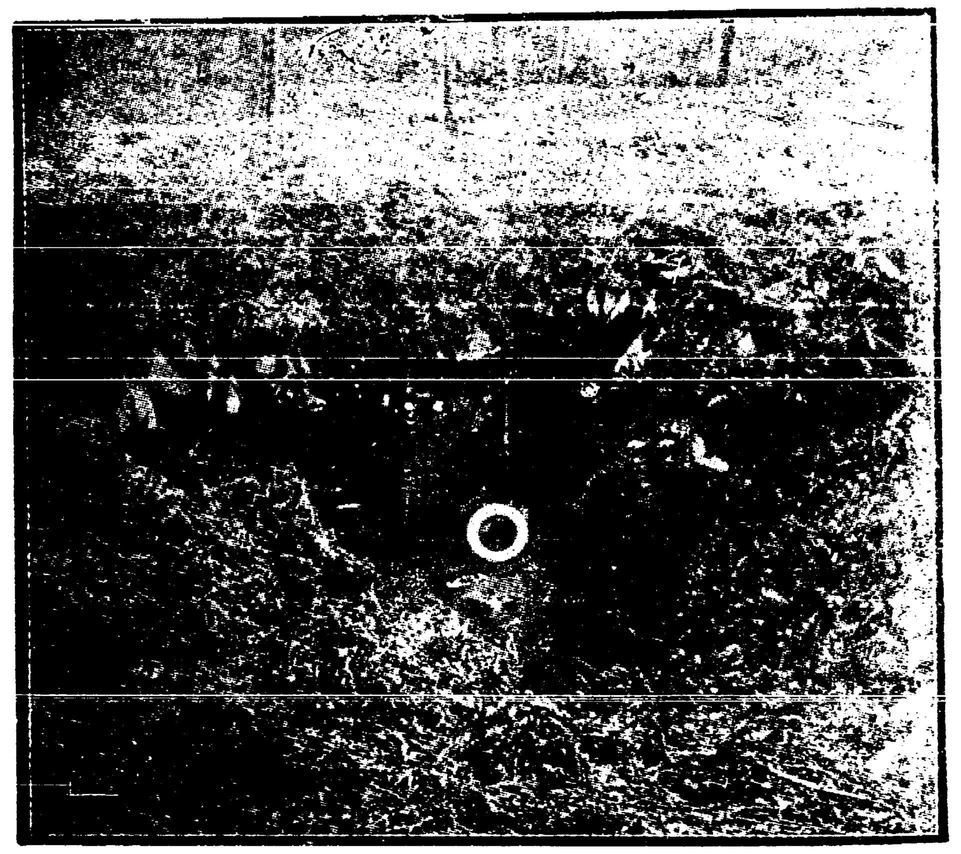

যুদ্ধক্ষেত্রে ডালপালার আড়ালে লুকান' কামান

মানুষের যা কিছু রোগ সবই আসে জীবাণু থেকে। কোথা দিয়ে অলক্ষ্যে এই সব জীবাণু আমাদের শরীরে ঢোকে তা বলা যায় না। টাকা-পয়সা, কাগজপত্র নানা লোকের হাত ঘেঁটে আমাদের কাছে এল, আমরা নির্ব্বিবাদে তা পকেটে পূরলাম, একবার মনেও হ'ল না এগুলোর ভিতর দিয়ে কত কি জীবাণু আমাদের পকেটে আশ্রয় নিতে পারে! আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি তাই এক রকম ছোট্ট যন্ত্র বার করেছেন—তার নাম দিয়েছেন "ভেষ্ট্ পকেট্ জার্ম্ম্-কিলার"। ছোট্ট 'শেভিং ষ্টিকের' মত যন্ত্রটি, পকেটে রেখে দিলে তার থেকে বিন্দু বিন্দু জীবাণুনাশক ওষুধ বেরিয়ে পকেটের টাকা-পয়সা বা কাগজ-পত্র শোধন করে নেবে, অথচ সেগুলিতে দাগ-টাগ লাগবারও কোন ভয় নেই।

আর একটা উদাহরণ দেই। দাঁত মাজবার জন্য টুথ্ব্রাশের ব্যবহার

আজকাল খুব বেড়েছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে ব্রাশ্ দিয়ে দাঁত মাজবার সময় যদি দাঁতের উপর অল্প অল্প জলের ছিটা দেওয়া যায় তবে দাঁত পরিষ্কার করা অনেক সহজসাধ্য হয়। তাই আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক এক রকম নতুন ধরণের টুথ্ব্রাশ্ বার করেছেন। এই ব্রাশের সঙ্গে থাকে একটা লম্বা নল। ঐ নল জলের কলের গায়ে লাগিয়ে দিলে কল থেকে জল খুব সরু ধারায় এসে ব্রাশের কুচির ভিতর দিয়ে বার হ'তে থাকে। তখন সে ব্রাশ্ দিয়ে দাঁত ঘষলেই হ'ল।

৬

এতগুলি ভারতীয় বালক কেমন করিয়া সেই সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের উপর গিয়া পড়িল তাহা জানিবার জন্য এতক্ষণে পাঠকের নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হইতেছে। এইবার সেই কথা বলি।

ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের ভয়ানক নাম। ইংলণ্ডের সঙ্গে টেষ্ট্ খেলায় তারা অনেক বার ইংলণ্ডকে কাবু করিয়াছে। এই খেলাটিতে ভারতীয়েরাও নেহাৎ কম যায় না। ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদেরও মাঝে মাঝে শক্তি পরীক্ষা হয়। এই রকম একটা বাছাই-করা ভারতীয় খেলোয়াড়ের দল সেবার গিয়াছিল অষ্ট্রেলিয়ায় খেলিতে। বাঙ্গালা, বোম্বাই, পাতিয়ালা, পাঞ্জাব প্রভৃতি সব জায়গা হইতেই বিখ্যাত বিখ্যাত খেলোয়াড়েরা এই দলে যোগ দিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় খেলা সাঙ্গ হইলে তাহারা গেল নিউজিল্যাণ্ডে।

খবরের কাগজে প্রত্যহ বড় বড় শিরোনামা দিয়া এই সব খেলার বিবরণ বাহির হইত। পৃথিবীর সকল দেশের লোক আগ্রহ সহকারে তা পড়িত; বিভিন্ন দেশের ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে এ ব্যাপার লইয়া উত্তেজনাও বড় কম হইত না।

যখন জগৎ জুড়িয়া এই সব হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার চলিতেছে তখন কেহই এই ছেলেগুলির সংবাদ রাখিত না। এই পনেরোটি ছেলেও ভারতীয় দলের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডে গিয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকেই প্রায় লক্ষপতি-কোটিপতির সন্তান। কেহ বা পিতার সঙ্গে, কেহ বা দাদার সঙ্গে, কেহ বা কাকা-মামার সহিত খেলা দেখিতে আসিয়াছিল।

ছেলেগুলির কিছু পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে রঞ্জিৎ জাতিতে সিন্ধী; কুণাল ও রোহিতাশ্বের বাড়ী পাতিয়ালা, কমলাক্ষ পাঞ্জাবী আর বাকি ক'টিই বাঙালী সন্তান। রঞ্জিতের পিতা কোটিপতি ব্যাঙ্কার; কমলাক্ষ এক মহাধনশালী জমিদারের ছেলে—তু'জনকারই বয়স চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে। রঞ্জিৎ ছেলেটি একটু দাম্ভিক এবং আত্মম্ভরী, কিন্তু গুণও তাহার অশেষ; অমন বুদ্ধিমান্, চালাক-চতুর ছেলে প্রায়ই দেখা যায় না। পড়াশুনায় সে যেমন ছিল স্কুলের অগ্রগামী ছাত্র, খেলাধূলায়ও ছিল অপরাজেয়। এদিকে আবার সুশান্ত ছেলেটিও বিদ্যায় বুদ্ধিতে রঞ্জিতের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তাই সুশান্তকে রঞ্জিৎ খুব সুনজরে দেখিত না। কুণাল আর রোহিতাশ্ব ছিল রঞ্জিতের ভক্ত।

অশোকের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এখনো পনেরো বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সুশান্তর চেয়ে সে কয়েক মাসের ছোট; কিন্তু দলের মধ্যে এই অশোকই ছিল সব চেয়ে শান্ত ও স্থিরবুদ্ধি। গায়ের জোরেও সে কারো চেয়ে কম যাইত না। সেইজন্য সকলেই অশোককে খাতির করিয়া চলিত।

শঙ্খচূড় ছিল একজন ধনী ব্যারিষ্টারের ছেলে। বয়স তাহার তেরো বৎসর মাত্র; সুন্দর ছিপ্ছিপে গড়ন; তার উপর এক অপূর্ব্ব ধী ও শ্রী তাহার মুখে সদাই ভাসিয়া থাকিত। নীলাদ্রিও বাঙালীর ছেলে—ধনীর সন্তান। বারো বৎসর বয়স কিন্তু সেই অল্প বয়সেই কত রাজ্যের বই যে পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। 'রবিনসন্ ক্রুশো' বইখানা এক রকম তাহার কণ্ঠস্থ। আশীষ ও ধ্রুবর বয়স নয় বৎসর এবং রাজীব ও বাবলুর বয়স আট বৎসর মাত্র। দলের মধ্যে ইহারা চারিজন সর্ব্বকনিষ্ঠ। ছোট হইলেও ইহারা সকলেই বেশ চৌখস। তবে আশীষ ছেলেটি একটু পেটুক, এবং বাবলু একটু একগুঁয়ে। দলের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই সুশান্তর পরিচয় তোমরা আগেই পাইয়াছ। রূপে-গুণে সে যেন একটি কিশোর এপোলো। ধনী ব্যারিষ্টারের তুলাল সে; সেই অল্প বয়সেই তু' তু'বার ইউরোপে গিয়াছে। তাই দেশবিদেশের অনেক প্রত্যক্ষ খবরই সে জানে। বাকী রহিল মনন। সে সুশান্তরই ছোট ভাই, বয়স মাত্র দশ বৎসর। স্কুলে সে ছিল সব চেয়ে আমুদে ও আনন্দময়। তাহার হাসির গল্প ও নিত্য নূতন তুষ্টামির ফন্দীর জ্বালায় সকলেই ছিল অস্থির। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে সেই সদানন্দময় মনন এখন হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা নিরানন্দ। মুখে তাহার হাসি নাই, কথা নাই। জাহাজে চড়িয়া যেন সে একেবারে অন্য রকম হইয়া গিয়াছে!

এই পনেরোটি ছেলে কেমন করিয়া এই সুদূর সমুদ্রে আসিয়া পড়িল তাহাই এইবার বলিব। ক্রিকেট্ ম্যাচ্ শেষ হইলে যখন সকলে দেশে ফিরিবার আয়োজন করিতেছে, তখন এই পনেরোটি ছেলে তাহাদের অভিভাবকদের ধরিয়া বসিল যে দেশে যাইবার পূর্ব্বে তাহারা একবার নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপের চতুর্দ্দিক্‌টা একটা ছোট জাহাজে করিয়া ঘুরিয়া দেখিবে। নিউজিল্যাণ্ডের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অমন সুন্দর সুন্দর চিরতুহিনাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী, মায়ালোকের মত অমন সব অপূর্ব্ব হ্রদ, অতীত হিম-যুগের সব বরফের নদী, সর্ব্বরোগহারী অত উষ্ণজল-প্রস্রবণ পৃথিবীর ক'টা দেশেই বা আছে? এখনো এই দেশের এক তৃতীয়াংশ জমি তুর্গম অরণ্যে আবৃত। এই দ্বীপের নামটাও ভারী সুন্দর, 'নব-জিল্যাণ্ড'। জিল্যাণ্ড অর্থ কি জান? সিন্ধু-সৈকত। ডাচ্ নাবিকেরা যখন প্রথম এই দ্বীপের সন্ধান লয় তখন তাহারা এই সুন্দর নামটি ব্যবহার করে। সেই সিন্ধু-সৈকতের চারিদিকে ছোট্ট জাহাজে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর মত মজার ব্যাপার আর কি হইতে পারে? দ্বীপের চারিদিকে আরো কত ছোট ছোট দ্বীপ!

অভিভাবকেরা রাজী হইলেন। কিন্তু এই ভ্রমণের জন্য যে জাহাজটি ঠিক করা হইল সেটি কিন্তু কোন আধুনিক যুগের জাহাজ নয়—একখানি পাল-তোলা 'স্কুনার' জাতীয় জাহাজ। এক সময়ে অবশ্য এ জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ট্যাসমেনিয়া দ্বীপের চারদিকে অনেক টহল দিয়াছে—এমন কি টরেস প্রণালীও ঘুরিয়া আসিয়াছে—কিন্তু এখন আর এ জাহাজের চল নাই, বন্দরের শোভাবর্দ্ধন ছাড়া এখন আর ইহার বড় একটা কিছু করিবার নাই। কিন্তু ছেলেদের তরুণ রক্ত, সখও আজগুবি। তাহারা ঠিক করিল, এই জাহাজে করিয়াই তাহারা প্রমোদ-ভ্রমণে বাহির হইবে। তাহারা তো আর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতেছে না! সামান্য একটু ঘুরিয়া আসিবে—তা এ জাহাজে খুব চলিবে, আর এই নতুনত্বের মধ্যে 'মজা'ও কম হইবে না। তা ছাড়া সেকেলে হইলেও জাহাজটি ছিল ভারী মজবুত।

টাকা থাকিলে সব বন্দোবস্তই হয়, এক্ষেত্রেও তাহাতে বাধা হইল না। জাহাজের জন্য একজন ক্যাপ্‌টেন, তু'জন মেট্, ছ'জন নাবিক, একজন খানসামা ঠিক হইল। আর রহিল আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বুনো চাকরটি।

সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া যাত্রার দিন নির্দ্ধারিত হইল ফেব্রুয়ারী মাসের পনেরোই তারিখে। ছেলেরা তখন উত্তর দ্বীপের প্রসিদ্ধ অক্‌ল্যাণ্ড সহরে বাস করিতেছিল। এই সহর হইতেই জাহাজ ছাড়া হইবে। পনেরোই ফেব্রুয়ারী ভোরবেলা জাহাজ ছাড়া হইবে; তাই আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় জাহাজের ক্যাপ্‌টেন, মেট্ ও নাবিকেরা বিশ্বস্ত বুনোর হাতে জাহাজের ভার রাখিয়া সহরে গেল একটু আমোদ-প্রমোদ করিতে। পরদিন ভোর বেলায় তাহারা জাহাজে আসিয়া জাহাজ ছাড়িবে। এদিকে ক্যাপ্‌টেনের অনুমতি লইয়া চৌদ্দটি ছেলে আগের দিন সন্ধ্যার আগেই

জাহাজে আসিয়া চড়িল। ঠিক হইল, তাহাদের অভিভাবকেরা পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া জাহাজে চড়িবে।

সঙ্গে অভিভাবকের দলও নাই, ক্যাপটেনও নাই, তাই ছেলের দল প্রাণ ভরিয়া জাহাজের উপর হল্লা করিতে লাগিল। বুনো জাহাজের লোক হইলে কি হইবে, সেও চৌদ্দ বছরের কিশোর মাত্র। সেও শেষে তাহাদের হল্লাতে যোগ দিতে ছাড়িল না। জাহাজখানা একটা বয়ার সঙ্গে খুব মজবুত করিয়া বাঁধা আছে; তাই ভয়ের কারণও কিছু নাই। রাত্রি দশটা অবধি ছেলেরা জাহাজের উপর লাফালাফি ও চীৎকার করিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া সেলুনের আলো নিভাইয়া যে যাহার বিছানায় শুইয়া পড়িল। বুনো একবার বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া শেষে সেও শুইতে গেল। তখন বেশ একটা ঝোড়ো বাতাস বহিতেছিল।

তার পর যে কি হইল তাহা আমরা জানি না। কোন রকমে জাহাজের দড়ি ছিঁড়িয়া জাহাজ বাতাসের টানে সেই বন্দরের বাহিরে আসিয়া পড়ে। গভীর অন্ধকার রজনী। তার উপর অমন তীব্র ঝোড়ো বাতাস। জোয়ারও তখন হু-হু করিয়া কমিয়া যাইতেছে। এমন অনুকূল অবস্থার আবেষ্টনে পড়িয়া জাহাজ যে সমস্ত রাত সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল তাহা তাহার নিদ্রামগ্ন আরোহীর দল জানিতে পারিল না।

প্রথম ঘুম ভাঙিল বুনোর। ব্যাপার দেখিয়া তাহার ত চক্ষুস্থির। কোথায়, কত দূরে যে তাহারা আসিয়াছে তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে সে জাহাজের বালকদিগকে ডাকিয়া তুলিল। কিন্তু তাহারাই বা কি করিবে? সেই অন্ধকার রাত্রে সেই মাঝদরিয়ায় কোথায় কে আছে যে সাহায্য করিবে! তখন তাহারা নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে বহু—বহু মাইল দূরে! জাহাজ সোজা পূর্ব্বদিকে ভূতের মত ভাসিয়া চলিল।

ওদিকে আকাশেও বেশ ঘনঘটা হইয়া আসিয়াছে। ঝোড়ো বাতাস ক্রমে প্রবল ঝটিকায় পরিণত হইয়া চারিদিকে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। দিবাভাগেও চারিদিক্ ঘোর অন্ধকার। ঘন মেঘের আবরণে আকাশের মুখও দেখা যায় না। সবাই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, শুধু সুশান্ত বসিয়া রহিল না,—বুনোর সাহায্যে মাস্তলে পাল টানাইয়া সে জাহাজের গতি ঠিক রাখিতে লাগিল। সুশান্ত না থাকিলে বহু আগেই জাহাজখানা সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হইত। শুধু ঐ করিয়াই সুশান্ত স্থির হইল না, কাগজে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া অনেকগুলি বোতলের মধ্যে তাহা পুরিয়া সে জলে ভাসাইয়া দিল। যদি একটা বোতল কাহারও হাতে গিয়া পড়ে, যদি সেই খবর পাইয়া কোন জাহাজ তাহাদের উদ্ধারের জন্য আগাইয়া আসে! কিন্তু সেই অথই অপার মহাসমুদ্রের উপর ক্ষুদ্র

বোতল আর কাহার চোখে পড়িবে? এইভাবে সেই সীমাহীন সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাহাদের কাটিয়া চলিল। তার পর কেমন করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে এক অজ্ঞাত দ্বীপ বা অজ্ঞাত দেশের উপর তাহাদের জাহাজ আসিয়া লাগিল, সে বর্ণনা তো পূর্ব্বেই দিয়াছি।

ওদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে যখন জানা গেল যে জাহাজখানা অকল্যাণ্ড ছাড়িয়া কেমন করিয়া সমুদ্রের উপর গিয়া পড়িয়াছে তখন সেখানকার সকলের মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। চারিদিকে ওয়্যারলেসে সংবাদ ছুটিল, কত জাহাজ নিরুদ্দিষ্ট বালকদের সন্ধানে সমুদ্র তোলপাড় করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কেহই সেই নিরুদ্দিষ্ট বালকদের খবর আনিতে পারিল না। ছেলেদের অভিভাবকদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সমুদ্ররাক্ষসী ততদিনে বালকগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, তবুও কোন দিক্ হইতে তাহাদের কোন সংবাদ আসিল না। শেষে সকলেই তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নাবলী

“রত্নাবলী” প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত নাটক। এর রচয়িতা হচ্ছেন শ্রীহর্ষ। নাটকটির গল্পাংশ এই রকম :—

রামায়ণে যাকে বলে লঙ্কা, আর একটু ভারী গলায় যাকে আমরা বলি সিংহল, সেখানে ছিলেন এক রাজা, আর রাজকুমারী রত্নাবলী। রত্নাবলীর জন্মের কিছুদিন পরেই এক গণৎকার গুণে বল্লেন যে রাজকুমারী হবেন সব চেয়ে সৌভাগ্যবতী স্ত্রী, আর তাঁর বিয়ে হবে এমন এক রাজার সঙ্গে যিনি হবেন সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্।

বৎসরাজ উদয়নের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধনারায়ণ এই গণনা জেনেছিলেন, কাজেই তিনি চেষ্টা করলেন রত্নাবলীকে তাঁদের রাণী করবার। সিংহলের রাজা নারাজ, কারণ রাণী বাসবদত্তা (সম্পর্কে আবার রত্নাবলীর এক রকম বোনও) রত্নাবলীকে হয়ত সুখী হ'তে

জেনেন না। তাই প্রধান মন্ত্রী কঞ্চুকীকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে বাসবদত্তা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কাজেই রত্নাবলীকে পাঠান হ'ল ভারতের দিকে কঞ্চুকী আর মন্ত্রী বসুভূতি সহ। কিন্তু পথে জাহাজ গেল ডুবে—কে যে কোথায় ছিট্‌কে পড়ল।

রত্নাবলীকে ভগবান্ বাঁচালেন, ঢেউয়ের তোড়ে তিনি পৌঁছে গেলেন সমুদ্রের ধারে। ঠিক সেই সময়েই কৌশাম্বীর একটি লোক তাঁকে দেখতে পেয়ে নিয়ে এলেন প্রধান মন্ত্রীর কাছে। যৌগন্ধনারায়ণের প্রাণে আশা জেগে উঠ্‌ল। এবার সুরু হ'ল মন্ত্রীর চালবাজী। সবার চোখে ধূলো দিয়ে তিনি রত্নাবলীকে বাসবদত্তার পরিচারিকার পদে বাহাল কর্‌লেন আর নাম কর্‌লেন নতুন করে—সাগরিকা। উদ্দেশ্যটা এই যে রাজাও বিয়ের আগে সাগরিকাকে ভাল করে জেনে নিন আর বাসবদত্তা ভাঙ্গন না দেন। বাসবদত্তা কিন্তু সাগরিকাকে খুব সাবধানে সবার অন্তরালে রাখবার চেষ্টা করলেন। বাসবদত্তার মদনপূজার দিন হঠাৎ সাগরিকা দেখে ফেল্‌লেন রাজাকে, আর একটা ছবি এঁকে ফেল্‌লেন রাজার। হঠাৎ এক বানরের উৎপাতে ছবি হাতছাড়া হওয়ায় পৌঁছল রাজার হাতে। রাজা তাঁর বিদূষকের সাথে সুরু কর্‌লেন আলোচনা।

সুসঙ্গতা ছিলেন সাগরিকার বান্ধবী। বিদূষক আর সুসঙ্গতার তৈরি ফন্দী অনুসারে সাগরিকার আর রাজার বাগানে দেখা হবার কথা হ'ল। বাসবদত্তার সখী কাঞ্চনমালাও কম যান না, তিনি এ সব শুনতে পেয়ে বাসবদত্তাকে সাগরিকার মত সাজিয়ে ছেড়ে দিলেন বাগানে ঠিক সেই দেখা হবার সময়টাতে। রাজা বাসবদত্তাকে সাগরিকা ভেবে, সাগরিকার প্রশংসা আর বাসবদত্তার দুর্নাম কর্‌লেন; ফলে বাসবদত্তা গেলেন চটে। পরে যখন সাগরিকা আবার এলেন, বিদূষক, রাজা আর সাগরিকা বাসবদত্তার হাতে পড়লেন ধরা। বসবদত্তা সাগরিকাকে শুধু ধমকালেনই না, বন্দী ক'রে অন্দরমহলে পাঠালেন, আর বিদূষককেও বেঁধে বন্দীশালায় পাঠালেন। রাজা ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, লজ্জাও পেলেন খুব।

তার পর যৌগন্ধনারায়ণের "ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে"। বসুভূতি আর কঞ্চুকী জুট্‌লেন এসে রাজপ্রাসাদে,—তাঁরাও ভাগ্যজোরে বেঁচে গিয়েছিলেন। সম্বর্ষিদ্ধী এক যাদুকর। তাঁকে যৌগন্ধনারায়ণ পাঠালেন সবার সামনে তাঁর যাদুবিদ্যা দেখাতে। যাদু চলছে। বিজয়বর্ম্মণ কোশল বিজয়ের গল্প বল্‌ছেন,—হঠাৎ প্রাসাদের একধারে জ্বলে উঠল হু-হু করে আগুন, সবাই পেয়ে গেলেন ভয়। রাণী বাসবদত্তা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন—সাগরিকা যে বন্দী অবস্থায় সেখানে পড়ে রয়েছেন! শুনে রাজা গেলেন ছুটে সেদিকে, পেছন পেছন রাণী ও আরও অনেকে। সাগরিকার উদ্ধার হ'ল। আগুনও গেল নিভে। সিংহলের মন্ত্রী ও কঞ্চুকী সাগরিকাকে দেখেই চিন্‌তে পার্‌লেন। বাসবদত্তা তাঁর পরিচয় জেনে তাঁকে আনন্দের সঙ্গে রাজার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে দিলেন।

যৌগন্ধনারায়ণ সলজ্জ মুখে এবার সভায় এলেন আর ক্ষমা চাইলেন—এই সব ফন্দী ও চক্রান্ত নিজেই করার জন্য। আগুন ত আর সত্যি আগুন নয়, আসলে ওটা যাদুকরের যাদু। আর যাদুকরকেও বাহাল করেছিলেন এ জন্য মন্ত্রীবরই।

তার পর আর কি? একচ্ছত্র সম্রাট্ উদয়ন মহাসুখে রাজত্ব কর্‌তে লাগলেন। তবে সব চেয়ে সুখী হয়েছিলেন কে বলতে পার কি?

ইতিহাসের পাতায় যে স্থান পায় নি

শ্রীঅসীম রাহা

বহু—বহুদিন আগেকার কথা। রাজপুতানার স্বাধীনতা নিয়ে বেধেছে জীবন-মরণ সংগ্রাম। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সবাই অস্ত্র ধরেছে। আবার এরই মধ্যে একদল দেশদ্রোহী যোগ দিয়েছে বিপক্ষ দলে—ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার আর লোভের প্রবৃত্তি মেটাতে।

* * *

গভীর রাত। চারিদিক্ নিঝুম। সেই রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে একজন অশ্বারোহী নিঃশব্দে এগিয়ে চলছিল শত্রু-শিবিরের দিকে। অন্ধকারে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে একটা আবছা মূর্ত্তির মতন; কিন্তু দিনের আলোতে হ'লে দেখা যেত লোকটা বৃদ্ধ, কিন্তু তা'র মুখে চোখে লেগে আছে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি। সামান্য রাজপুত সৈনিক হ'লেও লোকটার চেহারা সুপুরুষের মত।

আরও কিছুদূর এগিয়ে লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলে! তার পর আবার এগিয়ে চ'ল্‌ল—নিঃশব্দে, পা টিপে টিপে।

হ্যাঁ, এই-ই সেই শিবির। লোকটা সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। সৈনিকের দল তখন নিদ্রায় অচেতন। লোকটা চট্ করে একটা আলো জ্বালিয়ে আবার তক্ষুনি সেটা নিবিয়ে ফেল্‌লে। সেই ক্ষণিকের অস্পষ্ট আলোকেও তা'র মুখ চিনে নিতে একটুও কষ্ট হ'ল না। দাঁতে দাঁত চেপে লোকটা বিড়্ বিড়্ ক'রে বল্‌ল, "বিশ্বাসঘাতক! কুপুত্র! স্বদেশের শত্রু হ'য়ে তোমাকে আমি বেঁচে থাকৃতে দেব না।"

নিমেষের মধ্যে একখানা ধারাল ছোরা সজোরে ঢুকে গেল একজন ঘুমন্ত সৈনিকের বুকে। একটা তীব্র আর্ত্তনাদে বাতাস কেঁপে উঠল। বৃদ্ধের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়্‌ল দু' ফোঁটা জল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে জেগে উঠল বিকট হৈ-চৈ। জ্বলে উঠল অসংখ্য আলো। সেই আলোর

তীব্রদ্যুতিতে দেখা গেল একজন যুবক রাজপুত সৈনিক মরে পড়ে আছে, আর পাশে শুয়ে আছে একজন বৃদ্ধ রাজপুত। রক্তমাখা ছুরিখানা তা'রই বুকে বেঁধা।

কে কি পারে!

জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পার?

পাশের সাহেবটিকে দেখ। কেমন পায়ে বাতাস-ভরা জুতো পরে বাতাস-ভরা লাঠি হাতে হেঁটে নদী পার হচ্ছেন!

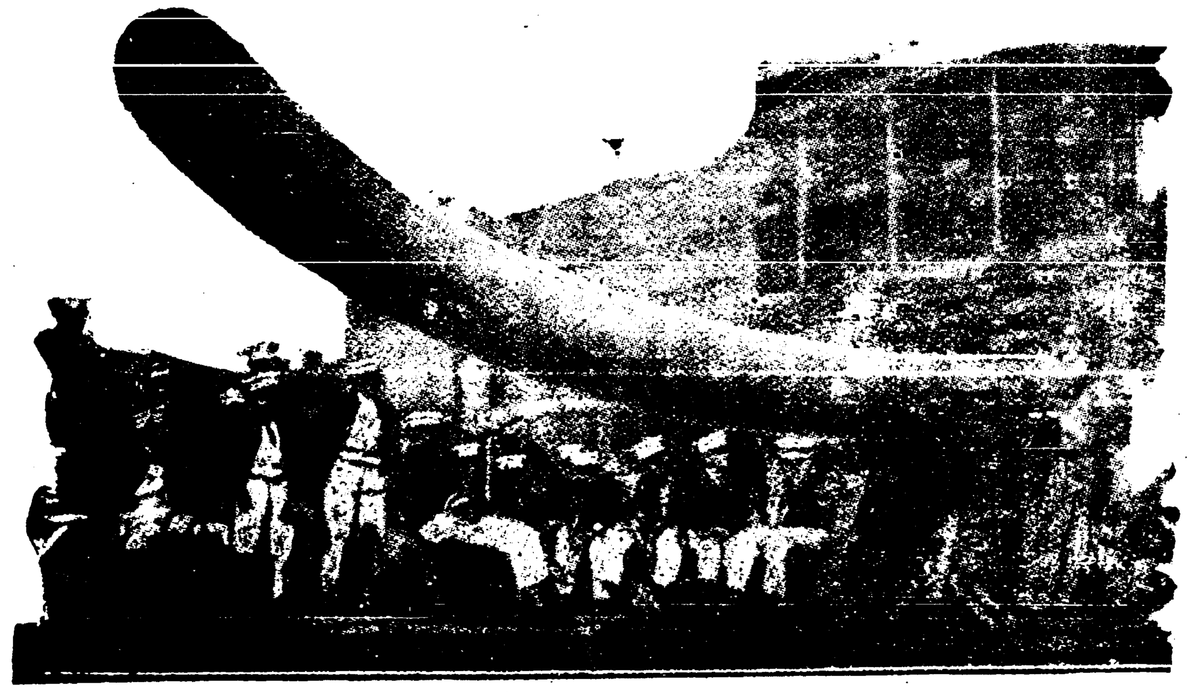

পাশের অতিকায় জিনিষটি হচ্ছে একটি রবারের বেলুন। এক ভদ্রলোক মুখের ফুঁ দিয়েই ওটাকে এত বড় ক রছেন!

দেখতে দেখতে নানা সুখ-দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত একটি বছর শেষ হয়ে গেল। আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আর একটি নতুন বছর। আজ এই বিশেষ দিনটিতে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ শুভেচ্ছা গ্রহণ ক'র।

এ সংখ্যার প্রথমেই তোমাদের পরলোকগত সম্পাদক মশাই-এর লেখা 'নববর্ষ' নামে একটি কবিতা দেওয়া হ'ল। কবিতাটি অনেক দিন আগে—তাঁর অল্প বয়সে লেখা, কিন্তু এর মধ্যে যে চিরনূতন আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে তা আজকের দিনে তোমরা নিশ্চয়ই মনে রাখবে।

তোমাদের শুভেচ্ছাসূচক অনেক চিঠি আমরা পেয়েছি। রামধনু তোমাদের ভাল লাগে, রামধনুকে তোমরা স্নেহ কর, নানাভাবে এ কথা আমাদের জানিয়েছ। স্থানাভাবে সে সব চিঠি এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল না কিন্তু সে কথা আমাদের মনে রইল। এই সব চিঠির মধ্যে বিশেষ ক'রে শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশুক্লা সেন, শ্রীতৃপ্তি সেন, শ্রীমহেন্দ্র রায়, শ্রীপঞ্চানন দাস, শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবেলা চ্যাটার্জ্জি এবং জাহানারা বেগম—এঁদের চিঠিগুলি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরাজবলী সিং লিখেছেন গতবারের 'মেনী' কবিতাটি তাঁর বড় ভাল লেগেছে, কারণ তাঁরও ঐ রকম একটা 'মেনী' ছিল এবং সেও অমনি ভাবে না জানি কোথায় চলে গেছে। "ছুটীর ক'দিন"এর জন্য তিনি অনেক তাগিদ দিয়েছিলেন, এবারে সেটা বার হ'ল।

শ্রীকণ্বমোহন সেন বিচার-সভা সম্বন্ধে বিবরণ চেয়েছেন। এই বিভাগে গ্রাহকরা নানা প্রশ্ন পাঠাতে পারেন—সম্পাদকের নামে। সম্পাদক যেগুলো উপযুক্ত মনে করবেন সেগুলো প্রকাশ করবেন এবং সে প্রশ্নের সমাধান গ্রাহকরাই ক'রে সম্পাদকের কাছে প্রকাশের জন্য পাঠাবেন। উপযুক্ত বোধ করলে সে 'উত্তর' ছাপা হবে। তবে উত্তর সঠিক কিনা সম্পাদক সব সময়ে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারেন না! এই বিভাগের জন্য নতুন নাম কেউ কেউ পাঠিয়েছেন—কিন্তু তেমন সুবিধামত নাম এখনও পাওয়া যায় নি।

'হরে মাঝি' এবার বেশী ক'রে দেওয়া গেল,—শ্রীদীপালি রায়, তপতী, চিত্রা এবং শুক্লা দেবীকে জানাচ্ছি।

গত বারের প্রতিযোগিতার বিষয়টি নিয়ে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যে নানা ভাবের সঞ্চার হয়েছে—তাঁদের চিঠিপত্রে সেই রকম আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

—রাঃ সঃ

কলকাতায় হকি লীগ্ শেষ হয়ে এল। প্রথম বিভাগে লীগ্ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে এবার 'পুলিশ' দল ; ২য় বিভাগে কালীঘাট দল। গত বারের ১ম বিভাগে বিজয়ী বি. জি. প্রেস্ এবারে তেমন সুবিধা করতে পারে নি। ১ম বিভাগে রানার্স আপ হয়েছে 'রেঞ্জার্স' দল।

কালীঘাট দল বোম্বাইএ আগা খাঁ হকি-প্রতিযোগিতায়ও খেলতে গিয়েছিল। ঐ খেলায় তারা বিখ্যাত মানাভাদার দলের কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে—অবশ্য একদিন ড্র রেখে।

*　　*　　*

যুদ্ধের নতুন খবর—জার্ম্মেনী এবার যুগোশ্লাভিয়াকে নিয়ে পড়েছে। জার্ম্মান্-বাহিনী যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস্ আক্রমণ করেছে। ৮ই এপ্রিলের খবর,—জার্ম্মান্ বাহিনী উক্ত দুই দেশের সীমান্ত ভেদ করে ২৫ মাইল অগ্রসর হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার উপর বিমান আক্রমণ সুরু হয়েছে। বিমান আক্রমণে সেখানকার মন্ত্রী মঃ কুলোভেটস্ নিহত হয়েছেন। যুগোশ্লাভিয়াও পাল্টা জার্ম্মেনীর অধিকৃত নানা জায়গায়—যেমন হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি স্থানে বোমা ফেলছে। তাদের রাজধানী বেলগ্রেড থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর চাপে পড়ে যুগোশ্লাভিয়ার তৎকালীন মন্ত্রিসভা 'ত্রিশক্তি চুক্তি'তে স্বাক্ষর করেছিল। এই ব্যাপার যুগোশ্লাভিয়াবাসীর মনঃপূত হয় নি। তার পর পর পর অনেক কাণ্ড ঘটে যায়। যুগোশ্লাভিয়ার বালক রাজা পিটার সিংহাসন গ্রহণ করেন, তাঁর কাকা রিজেণ্ট প্রিন্স পল্ দেশ ছেড়ে চলে যান, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, এবং ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী মন্ত্রীদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। কাজেই জার্ম্মেনী যে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে লাগবে এ অনুমান লোকে আগেই করেছিল।

ওদিকে আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটীশ বাহিনী এরিট্রিয়া, বৃটীশ সোমালীল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়ায় ঘাঁটির পর ঘাঁটি দখল করছে। সম্প্রতি বিনা প্রতিরোধে তারা আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবাও দখল করেছে। ইটালিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট্ আদ্দিস আবাবা ত্যাগ করে গেছে। গত ১৯৩৬ সনের ৫ই মে ইটালিয়ান্‌রা এই সহর দখল করেছিল।

লিবিয়া অঞ্চলে ইটালিয়ান্ ও জার্ম্মান্‌রা আবার কিছু কিছু চাপ দিতে সুরু করেছে, বেন্‌গাজী ঘাঁটিটা আবার তাদের দখলে গেছে। বৃটীশ বাহিনী তাদের নতুন করে আক্রমণ করবার জন্য কিছু দূরে নতুন ঘাঁটি বসাচ্ছে। সম্প্রতি হিসাব পাওয়া যাচ্ছে যে আফ্রিকা আর আলবেনিয়ায় লড়াইএ এ পর্য্যন্ত নাকি মোট ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ইটালিয়ান্ সৈন্য হতাহত বা বন্দী হয়েছে।

রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

চৈত্রের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১লা বৈশাখ, কাজেই তার ফল বেরোবে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়।

জ্যৈষ্ঠে আবার নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা দেওয়া হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কাগজের লেখাটি এই রকম হবে :—

ঠাকুরঘরের নিকটে যে পুকুর আছে সেই পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে প্রকাণ্ড ঝুরি-নামা বটগাছ। তথা হইতে বার হাত উত্তরে যাও ; নয় হাত মাটীর নীচে কয়েক ঘড়া বাদশাহী আমলের মোহর পাইবে।

উত্তরদাতাদের নাম

নৃসিংহমুরারি দত্ত (কলিকাতা) ; জ্ঞান, পাঁচু, পতিত প্রভৃতি (মুড়াগাছা) ; অমরনাথ ও অসিতকুমার ভট্টাচার্য্য (বহিরগাছি) ; অরুণ, সুখু, অনিল (জামসেদপুর) ; বেবী, দীপু, অপু প্রভৃতি (জামসেদপুর) ; গৌরী দেবী ও মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ; রমেশচন্দ্র ও রণেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত—ছাত্রবৃন্দ—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদন (শালিখা) ; রণেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুনীল, পরেশ প্রভৃতি পট্টনায়ক, রবীন্দ্র কবিরাজ (ভিরিঙ্গী) ; প্রীতি সেন, দুলাল, জগু ; (হাওড়া) ; সোমেন, প্রবীর, সুখেন বাকছি (রাজসাহী) ; শীলা, অশোক, অমিয় (ভবানীপুর) ; রামেন্দু দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা সেন, রাণু সেন (ভবানীপুর) ; অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (মুঙ্গের) ; নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, বিভূতি, দুলাল প্রভৃতি (পাটনা) ; সন্তোষ ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ; প্রভাত আবুল ফজল গোলাম ও ছমানী (শিলচর) ; পূর্ণিমা রায় (বারাকপুর) ; প্রবীর, বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) ; রীণা রায় (টালীগঞ্জ) ; রাজবলী সিং (কলিকাতা) ; মণি, খোকন, মীরু প্রশান্ত, আরতি প্রভৃতি (পাতিহাল) ; সেবা, বাপ্পা, বলডন্ প্রভৃতি (গৌহাটী) ; অঞ্জলি, মঞ্জুলী ও ইন্দ্রাণী ব্যানার্জ্জি (জলপাইগুড়ি) ; কল্পনা, খোকন, পুতুল প্রভৃতি (করণ্ডা) ; (করিমগঞ্জ) ; শ্যামানন্দ রায় (ধপধপি) ; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক ও অঞ্জলি চৌধুরী, হুলুমাসী, দাদামণি প্রভৃতি (কলিকাতা) ; রেণু, বেবী, সতী মৈত্র সভ্যবৃন্দ (শালিখা) ; মায়ালক্ষ্মী ও চিত্রা দেবী (ফয়জাবাদ) ; রঞ্জন সোম (রাজসাহী) ; অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ) ; অরুণা সেন (কলিকাতা) ;

ও নীলোৎপল শ্যাম (শিলচর); অণিমা, সীমা, মাসিমা (করিমগঞ্জ); অজয় ও ধনঞ্জয় (রামকৃষ্ণ মিশন—সরিষা); কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); মুকুল ভট্টাচার্য্য (মালসিরা); আভা আচার্য্য (বিরল); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমশেদপুর); গৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা); চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে ও বীণাপাণি দে (জামালপুর); গীতা মুখার্জ্জি, শ্যামলকুমার মুখার্জ্জি (বেনিয়াডী); রেণুবালা চক্রবর্ত্তী, রণজিৎ সান্যাল, ধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নওগাঁ); ঝরণা চট্টোপাধ্যায় (মিমকাথানা—রাজপুতানা); লতিকা, শুকদেব ও যূথিকা চন্দ্র (মাদ্রাজ); সুপ্রভা সেনগুপ্তা (কানপুর); ছবি রায় (নিউ দিল্লী); সুধাংশুরঞ্জন বক্সী (ভবানীপুর); দেবরঞ্জন, সুনীলরঞ্জন ও রামজীবন ভট্টাচার্য্য (ভাটপাড়া); শৈলেশ, অনিল, নিখিল (জলপাইগুড়ী); সুধাংশু, নিরুপ্রভা, বিভা (জলপাইগুড়ী); মঞ্জিলকুমার সেন (মুর্শিদাবাদ); রেবা সেন, বুড্ড, মিঠু প্রভৃতি (নিউ দিল্লী); মালু, মাধু, মতু প্রভৃতি (চাটখিল); নীলিমা দত্ত, অমলকুমার দত্ত (কলিকাতা); বাবু বোস (বালীগঞ্জ); মণিরাম আগরওয়ালা ও সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী (সুজানগর); শোভনা দেবী (মধুবনী); অরবিন্দ, বাণী, পিণ্টু প্রভৃতি (রামপুরহাট); বীণা, মাণিক, হেনা প্রভৃতি (হবিগঞ্জ); শ্যামসুন্দর মাইতি (কোলাঘাট); আশালতা গুহ, মঞ্জু, খোকন প্রভৃতি (ঢাকা); সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র (সন্তোষ); মণিলাল সাহা (মাথাভাঙ্গা); প্রশান্ত ও স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (রাইপুর); সত্যপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); শুভাশীষ সরকার (সরিষা); দীপালি রায়, তপতী, চিত্রা (জলপাইগুড়ি); কল্যাণী ঘোষ, অনিল, সুধাংশু প্রভৃতি (বোলপুর); স্বাণুবালা কর (কলিকাতা); কণ্বমোহন সেন (চট্টগ্রাম); পঞ্চানন দাস (ত্রিবেণী); তৃপ্তি সেন (ভবানীপুর); মদনমোহন সরাওগী (গোপালগঞ্জ); রামপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ কুশারী (কুমিল্লা); গীতা, বুবুল ও শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য (মথুরা); অর্চ্চনা দেবী, উমা ও শচীন (নীলফামারী); সুপ্রিয়া, সুবীর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি (ছাপরা); কালিদাস পাল (বালুভরা); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভবা); ছায়া সেন (মূলঘর)।

নূতন ধাঁধা

নীচের খালি স্থানগুলি কোন পশুপক্ষী, মাছ ইত্যাদির নাম দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে :—

তিন মাস কা— যায়, — দিবার নাম — ? — । কত — করিলেন, ও ভাবে কি — ? শুধু হাঁটিয়া —তলা যাইবে। ও — বস্থ, কমল —, সব সমান। আর যদু — তো আট — কাপড় পরে, ওর কথা ছাড়। বুঝিতাম নিজেরটা বাঁ—, তবু কথা ছিল; শেষটা যে —রে সে —রে।

(কেবল মাত্র নির্ভুল উত্তরদাতাদের এবং গ্রাহক-গ্রাহিকার নামই ছাপা হইবে।)

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্.এ, বি.এল্

প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে All Bengal Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য) বলেন :—

"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা

দাম ১৷৷০ মাত্র

ইহুদী ফ্রীডম্ ষ্টেশন্ কলিং—

হার অটো ভাসারম্যান্ স্পীকিং—

হার অটো ভাসারম্যান্ বলছেন তাঁর জীবনের দুরন্ত এডভেঞ্চারের কথা···হিট্‌লারের রথের চাকার নীচে একটি জীবনের সুখশান্তি কেমন করে নষ্ট হোল, কেন হার অটো হিট্‌লারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো তারই কাহিনী। না শুনে থাকলে পড়—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা উপন্যাস

হিটলারের শত্রু

দাম—এক টাকা

দেশপ্রিয় লাইব্রেরী—১৯২।২ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

=নতুন বই=

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্ এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

[illegible] মৌচাক বলেন :—

"[illegible] ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ [illegible] করে লেখা যায় তা লেখিকার [illegible] ফুটে উঠেছে। এই রকম নতুন [illegible] গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল [illegible] বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

[illegible] ছবি—অফুরন্ত হাসি—

—অফুরন্ত মজা—

দাম আট আনা

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং ··· ৷৷০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প ··· ৵১০

ছুটীর গল্প ··· ৵১০

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প ··· ।০

অনেক গল্প ··· ।০

পুরাতন বার্ষিক রামধনু

১ম, ৩য়—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১৷৷০

৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড, কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

শুভ নববর্ষে

আমাদের সাদর-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

নতুন বছরের উৎসব-আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

করতে হ'লে

লক্ষ্মী ঘি'এর

প্রয়োজন হবেই।

শুভ হালখাতায়, বিবাহ-উৎসবে এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি অপরিহার্য্য।

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি অতুলনীয়।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন: কলিঃ ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

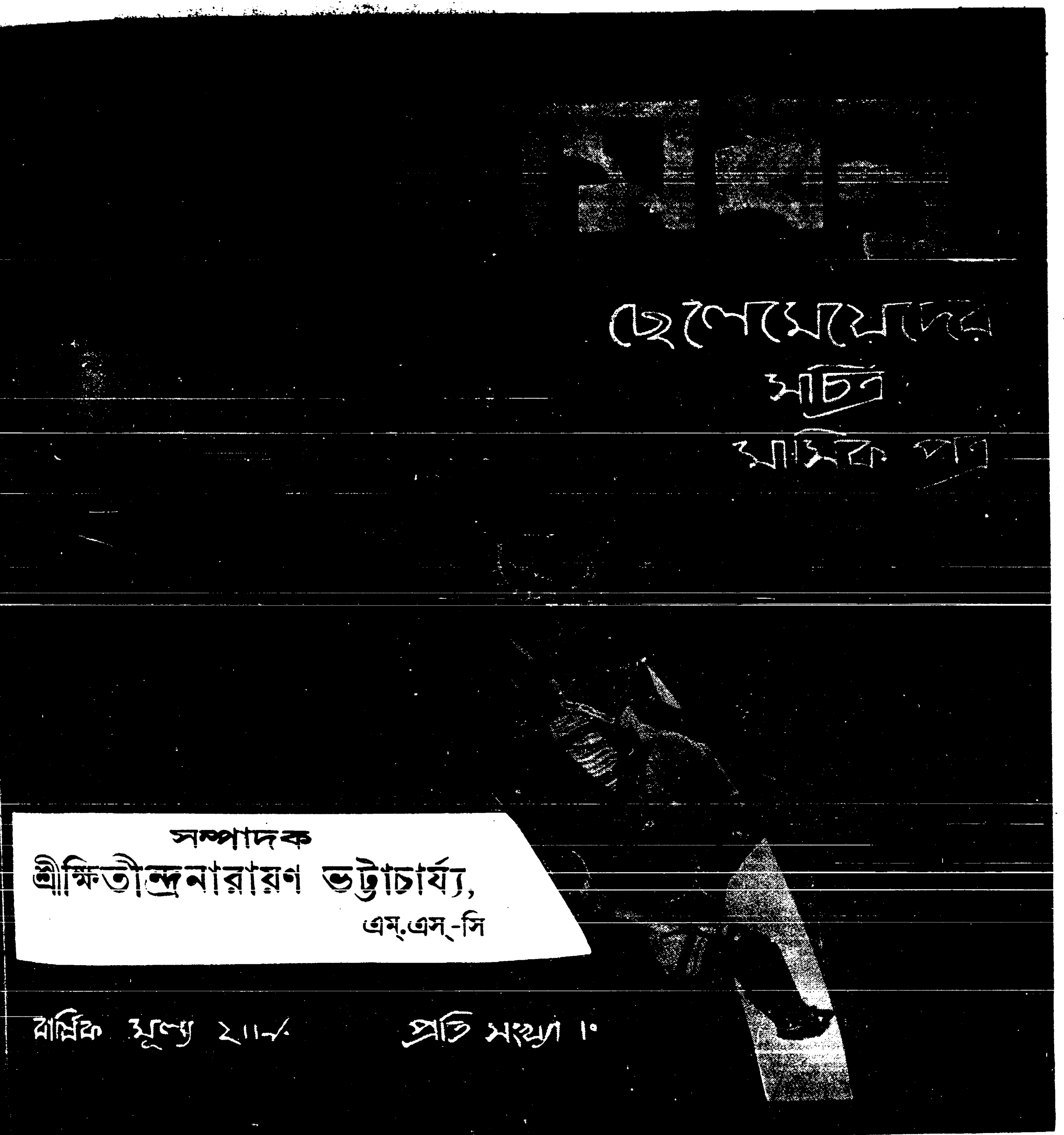

কার্য্যালয়

১৬, টাউন্সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C—1641

শুভ নববর্ষে

আমাদের সাদর-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

নতুন বছরের উৎসব-আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

করতে হ'লে

লক্ষ্মী ঘি'এর

প্রয়োজন হবেই।

শুভ হালখাতায়, বিবাহ উৎসবে এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনে

লক্ষ্মী ঘি অপরিহার্য্য।

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি অতুলনীয়।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৮৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

১৪শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ পঞ্চম সংখ্যা

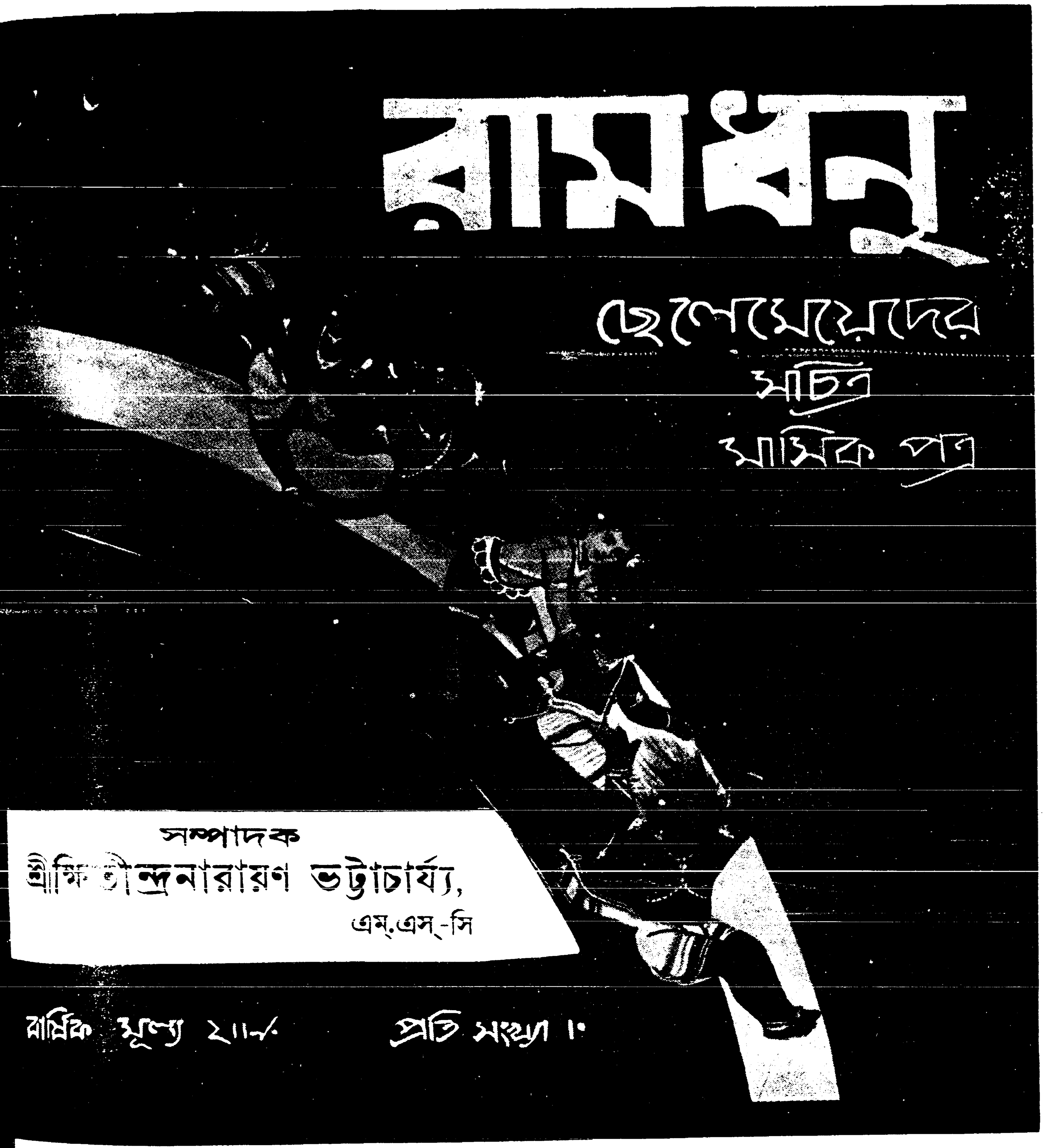

কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০; প্রতিসংখ্যা।৹ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা
} ... 'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ
হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস। রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

নূতন পুরাণ
একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৷৵০

হাস্য ও রহস্য
একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ৷৵০

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ৷৵০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

সুর সাধনায় অরগ্যান কোংর
হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।
অরগ্যান কোং
৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গল্প-লহরী
সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।
কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

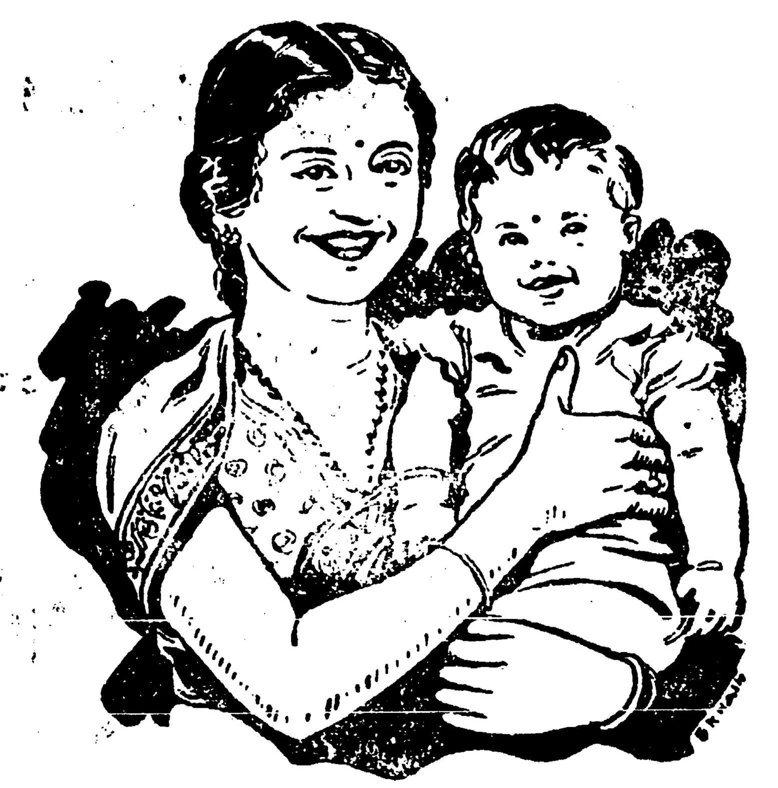

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া
দুর্ব্বল শিশুরা
অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—৷৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত এ বছরের নূতন বই—

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত

ভূতুড়ে গল্পের অপূর্ব্ব সঞ্চয়ন

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প

—এতে যাঁদের লেখা আছে—

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রভাত মুখোপাধ্যায়
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হেমেন্দ্রকুমার রায়
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বুদ্ধদেব বসু
সুকুমার দে সরকার
সরোজকুমার রায় চৌধুরী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবরাম চক্রবর্ত্তী
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ভূতের নামে কে না ভয় পায়, অথচ তাদের গল্প পড়তে সবারই অসীম আগ্রহ
ভূত যে কিছুই নয়, মনের একটা নিছক কল্পনা মাত্র—অধিকাংশ
গল্পেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রং বেরঙ্গের ষোলোখানি ছবি ও বিচিত্র
প্রচ্ছদ, এ ছাড়া শিল্পী শ্রীযুক্ত সমর দের অঙ্কিত অসংখ্য রেখা চিত্রে শোভিত।
প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার বিরাট বই।

দাম মাত্র **পাঁচ সিকা**

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
দেড়-শো খোকার কাণ্ড ১৲

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ৸০

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
তাতারের বন্দী ৸০

শ্রীযুক্ত নিখিলেশ সেনের
রোমাঞ্চকর কাহিনী ৷০

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

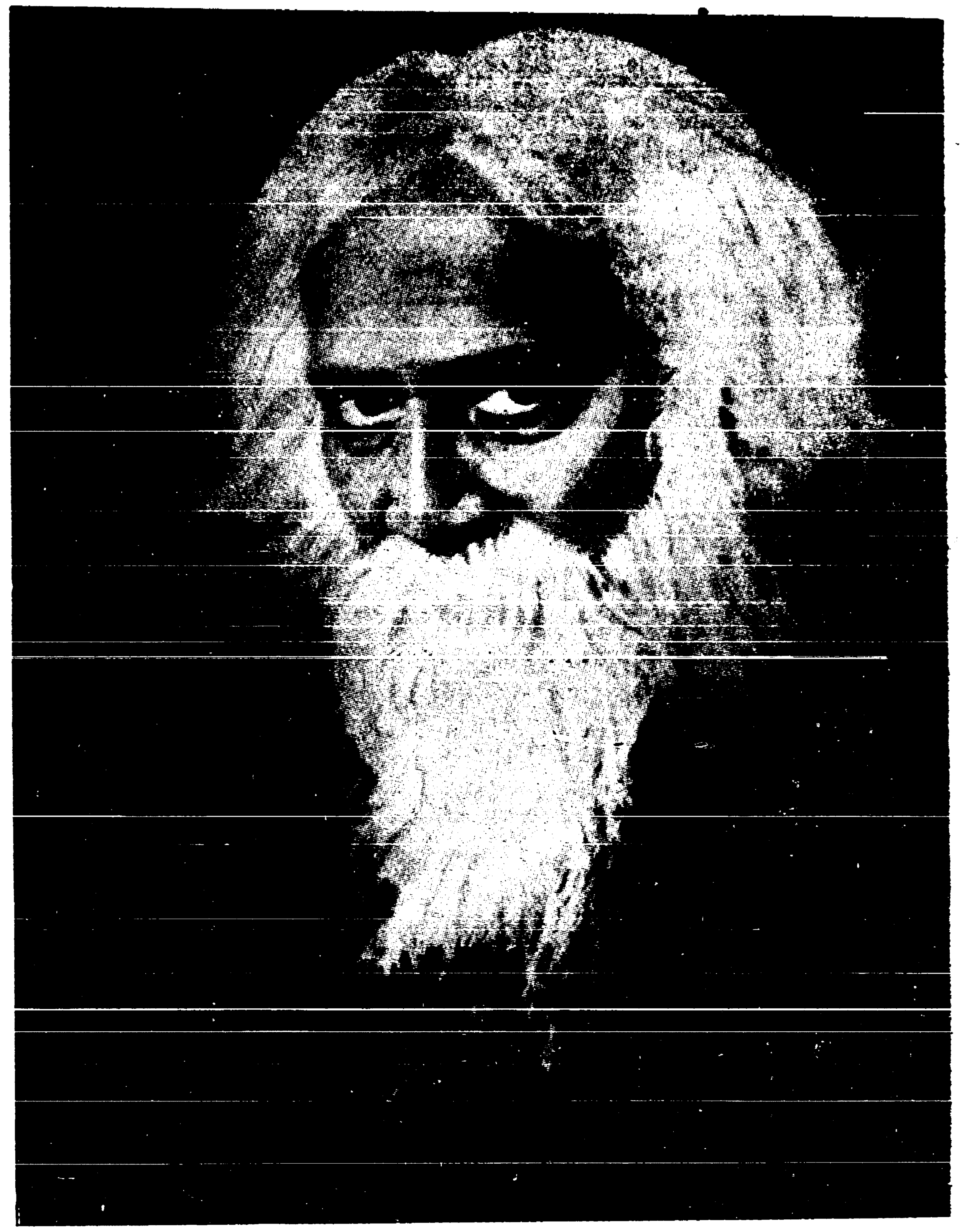

— আমাদের রবীন্দ্রনাথ —

২৫শে বৈশাখ কবির বয়স আশী বছর পূর্ণ হ'ল।
এই উপলক্ষ্যে বাংলার ছেলেমেয়েদের উদ্যোগে কবির এক
জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন হচ্ছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ { ৫ম সংখ্যা

বাগান

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ওরা বলে : সে কী, এ কেমন কথা, বাগান বাস না ভালো ?
ফুলের হাসিতে, ফুলের খুসীতে সে যে স্বর্গের আলো !
অপরাজিতার কথা মনে করো,
দোলন-চাঁপার কথা মনে করো :
চামেলী, গোলাপ আর সে মালতী,
গন্ধ ছড়াবে মল্লিকা, যূথী—
আরো কত ফুল মিষ্টি মধুর—টগর, বেল্ ও হেনা,
রূপের, রঙের এত সমারোহ তোমার ভালো লাগে না ?

ফুল ভালোবাসি. ভালোবাসি নাকো
ফুলের কেয়ারী করা,
ভালো লাগে নাকো তৈরী বাগান
তীক্ষ্ণ রেলিঙ্ ঘেরা।
মালী এসে চারা ছেঁটে দিয়ে যাবে,
মলিন দেখ্‌লে কেটে দিয়ে যাবে,
রঙ্ বেছে বেছে সারি বেঁধে দেবে,
রূপ দেখে দেখে আগে পিছে দেবে,
সাজানো গোছানো নিখুঁত-বাঁধানো
সারিতে ফুট্‌বে ফুল,
ওরা যেন সব বন্দীর দল—
ওই বাগানের ফুল !

আমার বাগান ছড়িয়ে রয়েছে —
দূর প্রান্তর পারে,
আমার বাগান ওখানেও আছে—
পোড়ো বাড়িটার ধারে।
কত ফুল চাও, কত ফুল চাও.
বাগানের ফুল ? পাবে তুমি তাও ;
আরো কত পাবে. জানো নাকো নাম.
দেখ্‌বে সেখানে ফুলের কী দাম ;
আপনি যেখানে ফুল ফোটে আর
আপ নি যেখানে ঝরে,
সত্যি বাগান সেখানেই আছে—
প্রকৃতির খেলাঘরে।

হয়ত কোথাও মাধবী-লতার
মৃত্যু-মলিন বেশ,
হয়ত কোথাও ফুলবধূদের
মধু হ'য়ে গেছে শেষ।
কত মল্লিকা, চামেলী, মালতী,
গোলাপ-বীথিকা, হেনা ও সে যূথী
অনাবৃষ্টিতে অকালে শুকায়,
বৈশাখী-ঝড়ে মরণে লুকায়,
তবু সে মরণ সহজ, সরল,
সুন্দর হয়ে ওঠে ;
যে বনেতে ফুল ঝ'রে যায় সেই
বনেতেই ফুল ফোটে !

ওই নদীপারে ওম্‌নি বাগানে
আজকে বেড়িয়ে আসি,
অপরাজিতার নীল ফুলে বন —
ছেয়ে আছে দেখে আসি।
নাগকেশর সে শত ফুলে ভরা,
অজস্র লালে শিমুলের চারা,
দেখ্‌বে কোথাও রক্তকরবী
যেন ফুটে আছে রক্তের ছবি.
রজনী-গন্ধা মুখটি লুকায়ে
কোথাও অন্ধকারে
মৃদু-মন্থর কর্‌ছে হাওয়ায়
কোমল গন্ধ-ভারে।

ওখানেতে চলো—নিভৃত শান্ত
ছাতিমের ঘন ছায়া,
নির্জ্জন কোন বকুল-বীথির
স্নিগ্ধ শ্যামল মায়া।

ওই দেখো বনকলমীর পাতা,
ওরি পাশাপাশি গুলঞ্চ-লতা,
দুল্‌ছে হাওয়াতে দোদুল-দুল
এলোমেলো যত বনের ফুল।

তোমার আমার সাজানো বাগান
এম্‌নি কি হ'তে পারে ?
এই অগোছালো ফুল থোলোথোলো—
কোথা এর তুলনা রে ?

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫

হরি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তার বাড়ীতে শিউলি, রজনীগন্ধা, বেলী, যূঁই অজস্র ফুটিত আর সম্ভ্রান্ত ঘরের বালক-বালিকারা তাহা অবাধে তুলিয়া আনিত। তাহাদের কত হুকুম হরি তামিল করিত তার ইয়ত্তা নাই। ঘূর্ণী ঘুড়ি তৈয়ার করিয়া দিত, নৌকায় লইয়া বাচ খেলিত, পদ্মফুল, পদ্মচাকী সংগ্রহ করিয়া আনিত। ছেলেদের প্রতি তার একটা স্বভাবজ গভীর স্নেহ ছিল। ছেলেরাও তাঁহাকে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসিত।

অজয়ের খেয়া ঘাটে কত ছেলে খেয়া পারে যাতায়াত করিত, হরি তাহাদিগকে দারুণ বন্যাতে এত যত্নের সহিত পার করিয়া দিত যে তাহারা ভয় পাইত না। ছেলেমেয়েদের মা বাবা হরির স্নিগ্ধ ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

হরি একবার কাটোয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। সে যখন ফিরিয়া আসিল লোকে চিনিতে পারে না, তার মাথার বাব্‌রি চুলগুলি অর্দ্ধেক পুড়িয়া গিয়াছে, গা-ময় ফোস্কা আর পোড়ার দাগ—যেন চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। জমিদার মহাশয় হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরি,

গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলে, গঙ্গার জল কি এত গরম যে সব গা পুড়ে গিয়েছে, মায় মাথার চুল?" হরি বলিল—"হুজুর, পথে আসতে একটা বাড়ীতে বেড়া আগুন লেগেছিল, চালা ঘরে একটা ছেলে শুয়ে ছিল, বাড়ীর লোকের হুঁস ছিল না। ছেলের মা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, লোকে ধরলে কিন্তু সে আগুনে কেউ ঢুকতে সাহস করলে না। কি করি, তাদের আকুলি-বিকুলি দেখে ছুটে গিয়ে দুয়ারটা খুলে ছেলেটাকে বুকে করে বা'র করে আন্‌লাম। আমার গায়ে আঁচ লেগেছে, ছেলেটার কিছু হয় নি। ভগবান্ যাকে রাখে, মারে কে?"

জমিদার হরির স্বভাব জানিতেন, হাসিয়া বলিলেন—"'হরি রাখে ত মারে কে'? তুমি তাদের পক্ষে হরিই হয়েছিলে।" হরি লজ্জা ও বিনয়ে যেন মাটিতে মিশাইয়া গেল।

হরির একটী ভাগিনেয় ছিল তার নাম 'কটা'; রং খুব ফর্সা ছিল বলিয়া ঐ ডাক নাম—তার মা দিয়াছিল। ভদ্রলোকের ছেলের ন্যায় গৌরবর্ণ বলিতে যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিত। ভাগিনেয়টী হরির অতিশয় প্রিয় ছিল, সে খেয়ার ঘাটে বসিয়া মামার তামাক সাজিয়া দিত, মাছ ধরিত, সময় সময় দাঁড় টানিত এবং এক এক দিন অলস বৈকালে বসিয়া দুই জনে কত কথা হইত।

একবার অজয়ে একটা বড় কুমীর আসিয়াছিল, মাঝে মাঝে দু' একটা ছাগল, ভেড়াও ধরিতেছিল। কটা বড় ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মামা, কুমীর কি করে?"

হরি—"ছেলেপুলে জলে নাম্‌লে সটান টেনে ডুবিয়ে নিয়ে যায়।"

কটা—"কোথায় নিয়ে যায়?"

হরি—"জলের তলায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে।"

কটার মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল; সে বলিল, "কেউ ছাড়িয়ে আস্‌তে পারে না?"

হরি—"কত বলবান্ ছেলে কুমীরের চোখে আঙুল টিপে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। কুমীর ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

কটা—"কুমীর যদি অনেক দূর বিদেশে নিয়ে গিয়ে এম্‌নি বালির চরে ছেড়ে দেয় ছেলে কি করবে?"

হরি—"সেখানকার লোকে তাকে যত্ন করে লোক সঙ্গে দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেবে।"

কটা—"যদি সে বহু বহু দিন পরে আসে লোকে চিন্‌বে কি করে?"

হরি—"হাঁ, একবার হয়েছিল বটে—একটা লোক বিশ বৎসর পরে ফিরেছিল। তাকে লোকে ভূত মনে করে ঢুক্‌তে দেয় নাই।"

কটা—"তার পর কি হলো?"

হরি—"কটা, আমি আর বক্‌তে পারি নে, তাকে তার মামা রসগোল্লার ঠোঙা হাতে দিয়ে কোলে করে ঘরে নিয়ে এলো।"

কটা—"বাবারে, কুমীর ত বড় বজ্জাত—উধাও করে কোথায় নিয়ে যায়—লোক আর ফিরে আস্‌তে পারে না।"

হরি—"তা বলে তোর ভয় নেই। তোকে নিতে পারবে না, নিতে এলে এই সড়কি করে তাকে বিঁধে মারবো।" কটার ম্লান মুখে হাসি ফুটিল।

কটার বাপ নাই। মা ভাইএর আশ্রয়ে থাকে, হরি তার পৃথক্ ঘর করিয়া দিয়াছে। কটা কত ফুল গাছ লাগাইয়াছে। ৪।৫ রকম পাখী পুষিয়াছে, দুইটা কুকুর আছে, এক ঝাঁক হাঁস ও পায়রা আছে। কটার মাও সেগুলিকে ভালবাসিত। নিজের ছেলেকে দেখিতে দেখিতে কটার মা যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করিত। বাগ্দীর ঘরে এমন ছেলে বিরল—ঠিক তাদের বাগানের টগরের ন্যায় সে যেন বাড়ী আলো করিয়া থাকিত।

দেশে এক বৎসর ছেলেধরার খুব হুজুগ হইল। 'ধূলাপড়া' দিয়া ছেলেদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। ছেলেরা কোন বাধা মানিতেছে না। এ যেন Pied Piper of Hamelin দল বাঁধিয়া আসিয়াছে! ভেঁপু বাজাইতে হইতেছে না, ছেলের গায়ে কোন রকমে ধূলাপড়া দিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। তাদের কাছে ছেলে যাইবেই। কাহার ছেলে কে ভুলাইয়া লইয়া গেল এ খবর কেহ রাখিত না। কেবল নূতন নূতন ভীতিময় হুজুগ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিল।

কেহ রটাইল নীলকুঠির এক সাহেবের পিঠে অদ্ভুত রকম ঘা হইয়াছে—তাহার ভীষণ যন্ত্রণা। কেবল ছোট ছেলের রক্তে সে ঘা ধোয়াইলে তবে যাতনার উপশম হয়। কাজেই প্রত্যহ একটী করিয়া ছেলে চাই-ই। এই সব বীভৎস জঘন্য গুজবে দেশ ভরিয়া গেল। জননী সন্তানকে কোল-ছাড়া করেন না, বাড়ীর বাহিরে আসিতে দেন না।

কিন্তু এই সকলের মূলে কিছু সত্য ছিল। দেশে 'আড়াকাটি' দল প্রলোভন দেখাইয়া কুলি সংগ্রহ করিতেছিল। দূর মরিশাস্, জাভা প্রভৃতি দেশে ঐ সকল কুলি চালান যাইত। ইহা তখন খুব লাভজনক ব্যবসায় ছিল। আড়াকাটি গ্রামে গ্রামে সবল যুবক ও কিশোর বয়স্ক বালক বাছিয়া বাছিয়া প্রলুব্ধ করিত এবং বহু মূল্যে ওলন্দাজ জলদস্যুদিগকেও বিক্রয় করিত। তাহারা এইরূপে নাবিক সংগ্রহ করিত।

হুজুগ ক্রমে থামিয়া গেল। লোকে নির্ভয়ে যখন ছেলেদের বাহিরে যাইতে দিতে লাগিল এইরূপ সময়ে 'কটা'কে হঠাৎ একদিন পাওয়া গেল না। গ্রাম গ্রামান্তর, নদী, মাঠঘাট কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। 'কটা'র মা শাবকহারা হরিণীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হরি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। দিনের পর দিন যায় কোন খবর নাই, অনুসন্ধানের কোন সূত্র পর্য্যন্ত মিলিল না। কটার পাগলিনী মাতা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে তিন দিন তিন রাত্রি

অনাহারে ধর্না দিয়া রহিল। শেষ রাত্রে দেবীর আদেশ হইল, "তোর ছেলে বাঁচিয়া আছে, ফিরিয়া পাইবি।"

অভাগিনী আশায় বুক বাঁধিল। ছেলের রোপিত গাছগুলি সে জল দিয়া জিয়াইয়া রাখে, তার পোষা পাখীগুলিকে খাইতে দেয়, তার মাছ ধরা ছিপ ডগী যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখে। দেবী বলিয়াছেন তাহার ছেলে ফিরিয়া আসিবে—এ দৈববাণী মিথ্যা হইবার নয়। সে তার দুয়ারে সারা রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখে, ছেলে আসিয়া পাছে বাড়ী চিনিতে না পারে। সেই প্রদীপের আলোটি অজয়ের জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুদূর হইতে নয়নগোচর হয়। উহা লক্ষ্য করিয়াই একটী গাথা কবিতায় আছে—

"জ্বলিচে এবং জ্বলিবে এখনো
কত নিশা নাহি জানি,
ভাবনা-জড়িত জননী-হিয়ার
স্নেহের প্রদীপ খানি।"

প্রিয় ভাগিনেয়ের এই অপ্রত্যাশিত অদর্শনে হরির প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া গেল। সে ইহাকে প্রবলের অত্যাচার মনে করিল। তাহার চক্ষু হিংস্র জন্তুর ন্যায় এক ভীতিময় ঔজ্জ্বল্য লাভ করিল। তাহার সুকোমল প্রবৃত্তিগুলি লোপ পাইল। তার ভাষা কর্কশ হইয়া উঠিল। যেন সমস্ত মানুষ ও মনুষ্যসমাজ তাহার শত্রু এবং সে তাহাদের শত্রু।

প্রখর মধ্যাহ্নে উদাস মাঠে এক এক দিন তাহার কণ্ঠ শোনা যাইত—

"মা মা বলে আর ডাকবো না।"

মধুরতা ও কারুণ্য অপেক্ষা সে সুরে রোষ ও প্রতিহিংসাই ফুটিয়া উঠিত।

'কটা' বলিত—'কুমীর ত বড় বজ্জাত, উধাও করে নিয়ে যায়—আর লোক ফিরে আসতে পারে না।' এই কথা মনে করিত আর হরির চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। মুখে একটা তীব্র যন্ত্রণার ছায়া পড়িত। হরি বলিত—"আমি বলেছিলাম 'কুমীরকে সড়কি দিয়ে মারবো', কই পারলাম না ত! ছেলেটাকে ডাঙ্গার কুমীরে কোন্ দেশে টেনে নিয়ে গেল তার সন্ধান করতে পারলাম না!" সমস্ত পৃথিবী তার নিকট তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তার ভগিনীর সর্ব্বহারা মূর্ত্তির পানে চায় আর তার বুক ফাটিয়া যায়।

"এই ডাঙ্গার কুমীরের কিনারা না করে আমি আর দেশে ফিরবো না"—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এক রাত্রিতে হরি চিরদিনের জন্য বড় প্রিয় গ্রামের নিকট বিদায় লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল।

(ক্রমশঃ)

বাসিখেকো বাঘ

[শিকার-কাহিনী]

বন্দে আলি মিয়া

রাজসাহী জেলার ক্ষেতরের মেলায় যত বৈষ্ণবদের ভীড় হয় এমন আর কোনখানে নয়। প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে এই মেলা থাকে—তাই দূর দূরান্ত থেকে বহু লোক এইখানে এসে জমা হয়।

ঈশান বৈরাগী তার বোষ্টমীকে সঙ্গে নিয়ে মেলার শেষে দেশে ফির্ছিল। কিছু জিনিষপত্র কিনেছিল—ফের্বার পথে মেয়ে জামাইকে খানিকটা দিয়ে যাবার ওদের ইচ্ছা হ'ল। সুতরাং রেলগাড়ীতে না চেপে ওরা হাঁটাপথে রওনা হ'ল।

পল্লীগ্রামের পথ—চারদিকে ঝোপ আর জঙ্গল। রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় বারো মাইল গেলে তবে জামাই-বাড়ী গিয়ে পৌঁছুতে পারা যাবে। দোকান থেকে চিঁড়ে মুড়্কি কিনে আঁচলে বেঁধে নিলে—পথে ক্ষিধে পেলে খাবে।

তু' তিনখানা গ্রাম পার হ'য়ে ওরা মাঠে এসে পড়্ল। শীতের বেলা—এর মধ্যেই পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। এই মাঠটা পার হ'য়ে আরো তিন চারটা গ্রাম পার হ'য়ে গেলে তবে জামাইএর বাড়ী।

দীর্ঘ মাঠ। 'আলের' পথ ধরে ওরা তু'জনে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চল্তে লাগ্ল। মাঠ পার হ'য়ে ওরা যখন গ্রামে এসে পৌঁছাল তখন বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। পল্লী-গ্রামের সরু পথ—পথের তু'ধারে ঝোপজঙ্গল। শহরের মত ঘন বসতি তো নয়ই, এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী অনেকটা দূরে।

বোষ্টমী বল্লে: সন্ধ্যে তো হয়ে এল—কোথাও আশ্রয়ের খোঁজ দেখ।

বৈরাগী হাস্লে, বল্লে: এর মধ্যেই ভয়? আর মাত্র ক্রোশ তিনেক পথ—এইটুকু গেলেই জামাই-বাড়ী। কষ্ট ক'রে এটুকু চল।

বোষ্টমী বল্লে: তিন ক্রোশ রাস্তা কিছু কম নয়—আর এই রাত্তির বেলায়—পাড়াগাঁয়ের পথ।

বৈরাগী বল্লে: আচ্ছা, পা চালিয়ে চল—যত দূর যেতে পারি।

দুই জনে নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগ্‌ল।

খানিকক্ষণ পরে বোষ্টমী বল্‌লে: এ গ্রামে পা দিয়ে কোন লোককে দেখতে পেয়েছ ?

বৈরাগী তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলে: লোকেরা আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে নাকি !

বোষ্টমী বল্‌লে: সে আমি বল্‌ছি না—কিন্তু সারা গাঁয়ে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব, এদিকে সন্ধ্যাও গড়িয়ে গেল—

বৈরাগী একটা ধমক দিয়ে বল্‌লে: অত শত বুঝি না আমি, মুখ বুজে সোজা পথ চল।

বোষ্টমী আর কিছু বলতে সাহস কর্‌লে না। ভয়ে ভয়ে বৈরাগীর পিছু পিছু চল্‌তে লাগ্‌ল।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই চারদিক্ অন্ধকারে ঢেকে গেল। সত্য সত্যই পথ হাঁটা এবারে কষ্টকর হ'য়ে উঠ্‌ল।

বৈরাগী এইবার আশ্রয়ের সন্ধান কর্‌তে সুরু কর্‌লে।

পাড়াগাঁয়ের অজানা অচেনা জায়গা, কোথায় বাড়ী আর কোথায় জঙ্গল অন্ধকারে কোন কিছুই ঠাহর কর্‌তে পারা যায় না। বোষ্টমীর কথাটা না শুনে অন্যায় করেছে বৈরাগী এখন সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লে।

খানিকটা চল্‌বার পরে সাম্‌নে একটা গৃহস্থ-বাড়ী দেখে বৈরাগীর মনে ভরসা হ'ল, এই বাড়ীতে তারা রাতটা কাটাবে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে বৈরাগী ডাকলে: কে আছ গো, একটু আশ্রয় আমাদের দাও।

পিছন থেকে বোষ্টমী হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠ্‌লে: ও বাবা গো, মলুম গো—!

মুখের কথা তার মুখেই রইল—বৈরাগী পেছনে চেয়ে দেখলে, ভীষণ আকারের একটা বাঘ বোষ্টমীকে কাম্‌ড়ে ধরে চক্ষের পলকে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

বৈরাগী হতভম্বের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তার পর সাহায্যের আশায়

চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু এ সকল তার অরণ্যে রোদনের মত হ'ল, কেউ তার আহ্বানে সাড়া দিল না—কেউ-ই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না। বৈরাগী বুঝ্‌তে পার্‌লে সেই অন্ধকারের রাজ্যে একমাত্র সে-ই সুধু মানুষ, আর কেউ নাই। চীৎকার ক'রে ক'রে তার গলা ভেঙে যাবার মত হয়েছে, সাহায্য করা দূরে থাকুক—মাত্র মুখের কথায় সহানুভূতি দেখাতেও কেউ এল না। তবে কী এ কোন পরিত্যক্ত গ্রাম, না, কোন বন্‌বাদাড় !

বৈরাগী একা একা কী আর কর্‌বে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লে, জামাই-বাড়ীতে আর সে যাবে না। এইখানে কোন গাছে উঠে রাত কাটিয়ে ভোর বেলায় দেশের দিকে রওনা হবে।

পর দিন সকাল বেলায় গাছ থেকে নামতেই একজন কৃষকের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। হাল আর গরু নিয়ে সে মাঠে লাঙল চষতে চলেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা

নরখাদক বাঘ

করে জান্‌তে পার্‌লে, কিছুদিন থেকে গ্রামে একটা নরখাদক ব্যাঘ্রের উপদ্রব সুরু হয়েছে। আজ হয় তো এ গ্রামে শিকার কর্‌ল—কাল হয় তো দু' ক্রোশ দূরে। কোথায় যে কখন থাকে বুঝতে পারা যায় না। তবে বাঘটার নিয়ম এই—যে শিকার আজ ধরে বাসি না হ'লে তাকে খায় না।

বৈরাগীর গাঁট্টা-গোঁট্টা ষণ্ডা চেহারা। চাষার কথা শুনে খানিকক্ষণ কী ভাব্‌লে, তার পরে বল্‌লে : ভাই, আমায় একটা কুড়ুল দিতে পার ?

কথা শুনে কৃষক চম্‌কে উঠলে। প্রশ্ন কর্‌লে : কেন, কুড়ুলে কি হবে ?

বৈরাগী জবাব দিলে : গত রাত্রে আমার পরিবারকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে, যদি তাকে উদ্ধার কর্‌তে পারি ভালোই, আর যদি না পারি, দেশে ফিরে আমি যাব না—প্রাণের ওপরে মমতা আমার নেই।

কৃষক বল্‌লে : দেশেই ফিরে যাও তুমি, এমন পাগলামী ক'র না।

কিন্তু বৈরাগী না-ছোড়—একটা কুড়ুল তাকে দিতেই হবে।

পথ দিয়ে দু' চারজন লোক গ্রামান্তরে যাচ্ছিল। তারা বৈরাগীর কথা শুনে উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌ল : চল, আমরাও যাব। আমাদের বুড়ো বাপকে সেদিন খেয়েছে।

আর একজন বল্‌লে : আমিও যাবো, আমার মেয়েকে খেয়েছে।

সুতরাং কৃষকের আপত্তি টি'কল না।

খানিকক্ষণের মধ্যে ছ' সাতজন ষণ্ডা প্রকৃতির লোক কুড়ুল, বল্লম, শড়্‌কী, রাম দা ইত্যাদি অস্ত্রেশস্ত্রে তৈরী হ'য়ে এল। দলের আগে আগে কুড়ুল নিয়ে চল্‌লে বৈরাগী।

গত রাত্রিতে যে জায়গা থেকে বোষ্টমীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেইখানে এসে রক্তের দাগ লক্ষ্য করে ঘন পাতার ঝোপ সরিয়ে সরিয়ে ওরা অগ্রসর হ'তে লাগল। কোন রকম শব্দ না হয় এমনি সতর্কতায় পা ফেলে ফেলে—চোখ আর কান রীতিমত সজাগ রেখে ওরা চল্‌তে লাগল। স্থানে স্থানে বড় বড় উলুঘাস আর লতাপাতা—ওপরে ডালপালা এত নিবিড় যে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে না। খানিকটা দূরে কি আছে না আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ঘন বনের এক জায়গায় গিয়ে রক্তের দাগ অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ জঙ্গল—সে ঝোপ—নাঃ, কোথাও নাই।

যেতে যেতে বন খানিকটা পাৎলা হ'য়ে এল। একজন ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে : গাছের ওপরে উঠে দেখবো কি ?

বৈরাগী বল্‌লে : তাই কর, খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে পড়লুম।

মস্ত বড় একটা দেবদারু গাছ। সঙ্গের লোকটি গাছের ওপরে তড়্‌তড়্‌ করে উঠে গেল। মাঝামাঝি উঠে চারদিকে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে চাপা গলায় বল্‌লে : দূরে ছোট গাছপালার মধ্যে বাঘটা শুয়ে আছে, তার লেজ আর পিছনের দু'খানা পা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বৈরাগী তাকে গাছ থেকে নেমে অনুসরণ করবার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

পা টিপে টিপে সকলে চল্‌তে লাগল। একটা পুরানো মাদার গাছের পাশ দিয়ে যেতেই ফোঁস্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। বৈরাগী দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দেখলে একটা মস্ত বড় গোখ্‌রো সাপ চক্র মেলে দুল্‌ছে আর রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ কর্‌ছে। সকলে শিউরে উঠলে। আর একটু হলেই প্রাণ যেত আর কি !

দলের মধ্যে থেকে একজন শড়কী ছুঁড়ে দিলে। লক্ষ্য অব্যর্থ—সাপের পিঠটা ফুঁড়ে মাটির মধ্যে গেঁথে গেল। আহত সাপটা গর্জ্জে উঠে শড়কীর ওপরে ছোবল মার্‌তে লাগল। বল্লমধারী এগিয়ে গিয়ে এক আঘাতে তার মাথাটা দু'খানা করে ফেল্‌লে।

মৃত সাপটাকে ফেলে রেখে ওরা পুনরায় এগিয়ে চল্‌ল।

কাছাকাছি গিয়ে ওরা বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌তে পেলে বোষ্টমীর হাঁটুর ওপরে মাথা রেখে বাঘটা হাত পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে অভিভূত। একজন মানুষ যেমন ক'রে কাৎ হয়ে শোয় বাঘটার শয়নের ভঙ্গী ঠিক সেই রকম। কৃষকটা তবে ঠিক কথাই বলেছে, বাঘ শিকারটাকে বাসি ক'রে খায়।

বোষ্টমী এদের দেখতে পেয়ে অসহায় দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার পর নিজেকে সম্বরণ ক'রে হাতের ইঙ্গিতে তাদের ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করলে। ইসারায় জানালে, সে তো মরতেই বসেছে—তার জন্যে যেন তারা প্রাণ না দেয়।

বৈরাগী ইসারা করে জানালে যে তার গায়ে যে চাদরখানা আছে ঐটা ধীরে ধীরে বাঘের মাথার নীচে দিয়ে হাঁটুটাকে বের করে নেবার সে চেষ্টা করুক।

হাজার হোক—প্রাণের মায়া সবাইকার-ই আছে। বৈরাগী এবং তার

সঙ্গের লোকজনদের দেখে বোষ্টমীরও বাঁচবার আশা মনে জাগল। ক্ষণকালের জন্য সাক্ষাৎ যমের মত নরখাদক বিশাল বাঘটার কথাও সে বিস্মৃত হ'ল। বৈরাগীর নির্দ্দেশ মত গায়ের চাদরখানা অতি সন্তর্পণে গোল পাকিয়ে বালিশের মতো ক'রে বাঘের মাথার নীচে দিতে লাগ্‌ল।

হাঁটুটাকে ধীরে ধীরে বের ক'রে নেবার মৃদু সর্ সর্ শব্দে বাঘটা চোখ মেলে চাইলে। সুমুখে কয়েক জন লোককে দেখতে পেয়েই বিদ্যুৎ-গতিতে উঠে বসে গর্জ্জন কর্‌তে লাগলে। দলের মধ্যে থেকে একজন ওর বুক লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ কর্‌লে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে বর্শাটা তার গলা ফুঁড়ে আমূল আট্‌কে রইল। বোষ্টমী সেই অবসরে দৌড়ে গাছের আড়ালে গিয়ে লুকাল। আহত বাঘটা হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—তার আর্ত্ত গর্জ্জনে সারা বনভূমির স্তব্ধতা যেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগ্‌ল! গাছের শাখাপাতাগুলো থর্ থর্ করে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। হুঙ্কার ছেড়ে বাঘটা সুমুখের দিকে একটা প্রচণ্ড লাফ দিলে। মট্ করে বর্শার ডাটটা ভেঙে গেল বটে কিন্তু উল্টোদিক্ থেকে আঘাত পেয়ে ফলাটা ওর গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। বৈরাগীর দল প্রস্তুত হয়েই ছিল—তারা একযোগে দা, বল্লম, শড়্‌কী, কুড়্‌ল ইত্যাদি নিয়ে তাকে আক্রমণ কর্‌লে। বাঘটা ভীষণ শক্তিশালী—তার গর্জ্জনে, চীৎকারে বনভূমি সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, আঁচড়ে কামড়ে সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌ল। হঠাৎ বৈরাগীর ধারাল কুড়ুলের এক কোপে বাঘের মাথাটা দূরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়্‌ল। ধড়টা মাটিতে পড়ে কাঁপতে লাগ্‌ল—সুমুখের দু'পা এবং পেছনের দু'পা বার বার সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হ'তে লাগ্‌ল। বৈরাগীর সারা দেহ বাঘের আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা হ'য়ে গেছিল। অত্যধিক রক্তপাতে সে অতিশয় দুর্ব্বল হ'য়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ল। সকলে ধরাধরি ক'রে তাকে বনের বাইরে এনে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সুস্থ কর্‌বার চেষ্টা করতে লাগল।

হাঁসা ও হাঁসী

শ্রীআরতি ঘোষাল

সকাল হ'তে না হ'তেই মুখুজ্জে-বাড়ীর হাঁসাটা তিনটে হাঁসী নিয়ে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ কর্‌তে কর্‌তে এসে জলে পড়ে। তার পর সারাটা দিন ধরে চলে তাদের গাঁএর ঐ সরু সুতোর মত খালটার ওপর লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি আর দাপাদাপি। কুচকুচে কাল হাঁসাটার গলা আর পিঠের কাছে সাদা—মনে হয় সাদা কাগজের ওপর কে এক বোতল কালো কালি ঢেলে দিয়েছে। হাঁসীগুলোর একটা একেবারে সাদা ধবধবে, একটা পাঁশুটে রঙের, আর একটার রঙ মেটে।

হাঁসা ভিজে জল-মাখা গাটা ঝেড়ে নিয়ে জলের ওপর একবার ডিগ্‌বাজি খেয়ে নেয়, তার পর গলা বাড়িয়ে দেখে সব ঠিক আছে কিনা। হিসেব ঠিক মত বুঝে আর একবার ডিগ্‌বাজি খায়। পা'দুটো ছেড়ে দিয়ে হাঁসা ভাসতে থাকে। দলের অন্যগুলোও তার দেখাদেখি ভাসে। এমন সময় দূর থেকে শোনা যায় মুখুজ্জে-বাড়ীর ঝি'র গলা—"আয় আয় চৈচৈ, চৈচৈ, খাবি আয়!" দলবল নিয়ে হাঁসা ছুটে চলে স্বর লক্ষ্য ক'রে। নিঃশেষে কতকগুলো মাছের কাঁটা, পাতকুড়নি ভাত আর ধান খেয়ে হাঁসা সদলবলে যাত্রা করে খালের মাঝখানে। ছোট্ট একটা চিঙড়ি হঠাৎ ভেসে ওঠে; সাদাটা ঠোঁট দিয়ে টুপ ক'রে ধরেই তাকে চালান ক'রে দেয় মুখের ভেতর, চোখটা আরামে উল্‌টে তাকে একেবারে হজম ক'রে ফেলে। অন্যগুলোর চোখ টাটিয়ে ওঠে—"ভারি মজা, না? একলা একলা খুব খাওয়া হ'চ্ছে!" সাদার ও সব দিকে নজর দিতে গেলে চলে না, চিঙড়ির মুণ্ডুটা তখনও তাকে বিব্রত ক'রে তুলছে। পাঁশুটে মেটের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে প্যাঁক্ প্যাঁক্। হাঁসা অকারণে ভয় পেয়ে যায়; সেও ডাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়—ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্। খালের ওপর দিয়ে একখানা ডিঙ্গি নৌকা পাল তুলে দিয়ে ভেসে যায়, ঢেউএর তালে

তালে চারজনেই দুলে দুলে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। গ্রাম থেকে যে পায়ে-চলা পথটা এসে জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে সেই পথ ধরে কাদের বাড়ীর একটা রাজহাঁস জলে এসে নামে।

একটু একটু ক'রে গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে আসে, চারিদিক্ আব্‌ছা অন্ধকারে ঢেকে যায়, হাঁসাও দলবল নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। পেছন দিক্‌কার খিড়কির দোর দিয়ে হেল্‌তে দুল্‌তে আমিরী চালে ঢোকে বাড়ীতে, তার পর আস্তাকুঁড় পার হ'য়ে একেবারে উঠানে। খয়েরী রামছাগল, ভুলো কুকুর আর পুষি বেড়ালটা একসঙ্গে তেড়ে আসে। এদের তিনজনের মধ্যে ভারি ভাব। অন্য কেউ হ'লে হ'য়ত তারা এতটা চটত না, কিন্তু হাঁসগুলো ক্ষান্ত ঝির ঘড়ি যেন, অর্থাৎ ঠিক এই সময়ে ক্ষান্ত বুঝতে পারে রামছাগলটাকে চ্যাঁচাড়ির ঘুপ্‌সি ঘরটার ভেতর তুলতে হ'বে, আর ভুলোটাকে শেকল দিয়ে বেঁধে সদর দরজায় রাখতে হ'বে। পুষি একলা পড়ে যায়।

উঠানের ওপর রোয়াকের নীচে বড় একটা কাঠের বাক্স। ক্ষান্ত গলা ধরে একটার পর একটা হাঁসকে বাক্সের ভেতরে নামিয়ে মস্ত বড় একটা টিন ঢাকা দিয়ে তার ওপর গোটাকতক ইট চাপিয়ে দেয়। ঘুপ্‌সি বাক্সটার ভেতর প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। বাবাঃ, রাতটা কাটলে বাঁচি। ভোর হ'তে না হ'তেই আবার সবাই ছোটে নদীর দিকে।

সেদিন বিকেলে নেহাৎ ভারিক্কি মেজাজে চারজনে বাড়ী ফেরে। চারিদিক্ অন্ধকার হ'য়ে আসে তবুও ত কেউ তাদের তুলতে আসে না! রাত্রি গভীরতর হয়, গাটা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করে। বিশ্রী কাঠের বাক্সটাই আজ তাদের কাম্য হ'য়ে উঠেছে। অগত্যা নিজেরাই তারা একে একে গিয়ে ঢোকে বাক্সর ভেতরে।

ঘন অন্ধকারের ভেতর ও দুটো কি? অমন চক্‌চক্ করছে কেন? পাঁশুটে রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। ও কি! তার দিকেই যে পা টিপে টিপে এগিয়ে আস্‌ছে! চেঁচাবে নাকি? নাঃ, গলাটা শুকিয়ে আস্‌ছে যে! নিশ্চয় ভাম। টুক করে পাঁশুটের গলা টিপে ধরে ভাম টেনে নিয়ে চলে। তার ডানার ঝটপটানির শব্দে অন্য সকলের তন্দ্রা টুটে যায়, সকলেই একসঙ্গে পাখা ঝাপ্‌টা দিয়ে ওঠে। ক্ষান্ত কেরোসিনের একটা ডিবে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। কিন্তু ভাম ততক্ষণে অনেক দূরে।

রোজকার নিয়ম মত সকলে হেলতে দুলতে যায় খালের দিকে। আজও জলের সঙ্গে সারাদিন ধরে খেলা চলে কিন্তু তেমন প্রাণ খুলে আর পারে না। ট্যাঙ্‌রা মাছ পাশ দিয়ে যেতে দেখেও কারো হুঁস হয় না।

দিন কয়েক এমনি করে কাটে, পাঁশুটের স্মৃতি আব্‌ছা হ'য়ে আসে তাদের কাছে। ক্রমে তারা আবার আগের মত মাতামাতি সুরু করে। এমন সময় দলে আসে নতুন একটা

হাঁসী; এর রঙও পাঁশুটে কিন্তু এ তার মত তেমন মিশতে পারে না। সাদা তার সঙ্গে ভাব করতে গিয়ে একটা ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসে। মেটেকে আর সেধে ভাব করতে যেতে হ'য় না, নতুনটা নিজেই এসে তার পাখা ধরে দেয় একটা হেঁচকা টান। হাঁসা চোখ রাঙিয়ে ওঠে—"এই, খবরদার!"

ক্ষান্ত নতুনকে, হাঁসা, সাদা আর মেটের সঙ্গে একে একে বাক্সর ভেতর নামিয়ে দেয়। তিনজনে একসঙ্গে তেড়ে আসে নতুনের দিকে। সারারাত তিনজনের ঠোকরাঠুকরিতে নতুনের অবস্থা কাহিল হ'য়ে আসে। সকালে দেখা যায় নতুন অতি কষ্টে একপায়ে খুঁড়িয়ে চলছে। চোখ দুটো তার হ'য়ে এসেছে ঘোলা, পাখ্‌না দুটো ছড়িয়ে পড়েছে। হাঁসার তাকে দেখে একটু দুঃখ হয়। খালের পথে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়ায়, তার পরে ফিরে আসে যেখানে নতুন চোখ উল্‌টে ঠোঁটটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ছড়িয়ে-পড়া পাখ্‌নার ভেতরে। সন্ধ্যার কিছু আগে খালে ক্ষান্তর ডাকে সাদা আর মেটে যখন ছুটে আসে ঘাটের দিকে, হাঁসা তখন ঝিমিয়ে-পড়া মুমূর্ষু নতুনের মাথাটা আস্তে আস্তে তুলে ধর্‌ছে।

একদিন নদীতে বান ডাকে—স্রোতের টানে মেটে যায় কোথায় ভেসে! তার কয়েক দিন পরে এক সকালে দেখা যায় সাদার সুন্দর ধব্‌ধবে পালকগুলো ঝাঁকড়া পাতি লেবু গাছটার তলায় ছড়িয়ে আছে।

হাঁসা এখন একা। চেয়ে থাকে পথের দিকে, ভাবে আসবে এখুনি। ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়ে লেবু গাছটার তলায় যেখানে একটা দুটো সাদা পালক তখনও ছড়ান। রামছাগল শিঙ্ বাগিয়ে তেড়ে এলেও সে প্রতিবাদ করে না, ভুলো তার পাখায় টান দিলেও ফিরে তাকায় না। এরা তার দুঃখ বোঝে না, বোঝে কেবল ক্ষান্ত। বাড়ীর শত কাজের মাঝখানেও সে ভাঙ্গা কলাই-করা বাটীতে একমুঠো ধান আর জল দিয়ে যায়। মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "আহা, বাগ্দী বৌএর কাছ থেকে কালই আর দুটো কিনে আনব!"

আসে আরও দুটো বাচ্চা হাঁস। ভারী সুন্দর দেখতে, ছোট্ট ছোট্ট পালক সবে গজাচ্ছে। প্যাক্ প্যাকের বদলে সরু মিহি সুরে ডাকে, পিক্ পিক্। তাদের দেখেই হাঁসার পিত্তি জ্বলে ওঠে, ঠুক্‌রে তাদের বিদেয় করতে যায়। কিন্তু বাচ্চা দুটো যখন নিতান্ত অসহায় কণ্ঠে ডেকে ওঠে, ভয়ে ভয়ে তার কাছটিতে ঘেঁষে এসে বসে, হাঁসার সব রাগ তখন উধাও হয়; ভাবে, এদেরই বড় করে তুলতে হবে, এরাই হবে তার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী।

খোকার পাখী

শ্রীমতী করুণা দেবী

খোকা আব্দার ধর্‌ল, "বাবা, পাখী !" বাবা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "পাখী কেন বাবা, মেলায় ত আরও অনেক জিনিষ আছে, নাও না।" ছেলে কিন্তু ভোলে না, আরও জোরে বলে, "বাবা, সুন্দর পাখী।" চারিধারে নানা রংএর সুন্দর সুন্দর পাখী নিয়ে বসে ছিল পাখীওয়ালা। সুযোগ বুঝে মিহি গলায় তাড়াতাড়ি বলে, "খোকাবাবু, পাখী নেবে ? কোন্ পাখীটা ? সব ভাল পাখী।" শেষে বাধ্য হয়ে খোকাকে পাখী কিনে দেওয়া হ'ল।

পাখীটা একটা ছোট্ট ময়না, কিন্তু একেবারে বুনো, মানুষের একটু সাড়া পেলেই ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তবু তাকেই খোকার পছন্দ হ'ল, আর বাড়ীতে আনা হ'ল। পাখীটাকে এনে খোকার আদর-যত্নের আর সীমা নেই, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল বাড়ীর লোকেরও। লোকের আদর-যত্ন দেখলেই ও কিন্তু ভয়ে আরও ছট্‌ফট্ করে উঠ্‌ত। খাবার দিলে বেচারা খেত না, শুধু চুপ করে যেন উদাস হয়ে বসে থাকত। ডালে ডালে যখন অন্য পাখীরা গান গেয়ে উঠ্‌ত, ও তখন অস্থির হয়ে ডানা ঝট্‌ফট্ করত, কখনও বা খাঁচার তারগুলো কাট্‌বার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করত।

ফল কিন্তু কিছুই হ'ল না। তারে ঘেরা খাঁচার দরজা ওকে মুক্তি দিল না। দিনে দিনে সকলেরই সব সয়ে যায়, কাজেই পাখীরও ক্রমে এটা অভ্যাস হয়ে এল। ও ভুলে যেতে লাগল মুক্ত বায়ু, গাছের সবুজ পাতা আর পাকা ফলের কথা। আস্তে আস্তে সুরু কর্‌ল খোকার হাতের খাবার খেতে, ভাঁড়ের জল খেতে। বুনো পাখী বশ হয়েছে দেখে সকলের আনন্দ আর ধরে না,—বিশেষ যেদিন পাখী খোকার নাম ধরে ডাকতে শিখল। ক্রমে সে খোকার মত সকালে খোকার মাকে দেখলেই বল্‌ত, "মা মণি, খাবার !" আবার কখনও খোকার মত গলা ক'রে চাকরকে বকৃত, "বংশী দুষ্টু, ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব না।"

এমনি সব নানা রকম কথা শিখল পাখী। বাড়ীর লোক তার গর্ব্বে অস্থির। পাড়ার ছোট বড় সকলেই ছুটে আসত পাখীর কথা শুনতে। এমনি ভাবে বেশ দিন কাটতে লাগল।

হঠাৎ একদিন হ'ল খোকার অসুখ। ডাক্তার বল্‌লেন, ব্যারাম কঠিন। বাড়ীর লোক মহা ব্যস্ত, চিন্তিত। খোকার অসুখের চিন্তায় সকলেই ভুলে যেতে বসেছে খোকার পাখীর কথা, শুধু খোকাই জ্বরের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাবা, পাখী !'

এত চেষ্টা যত্নেও খোকাকে কেউ রাখতে পারল না। খোকার সবই রইল পড়ে, শুধু খোকাই সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। সেদিন মার মনে বড় আঘাত লাগল, কেঁদে উঠে বল্‌লেন, "কেন তোমরা ওই বনের মুক্ত পাখীকে খাঁচায় পুরে রেখেছ ? ওর মা বোধ হয় ওর ছানাকে হারিয়ে এমনি ভাবে ব্যথা পেয়েছিল, তাই আমি আজ আমার বাছাকে হারালাম।"

এই ব'লে চোখ মুছে উঠে এসে তিনি নিজের হাতে খাঁচার দরজা খুলে দিলেন। হঠাৎ এ রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে মুক্তি পেয়ে প্রথমে পাখীটা একটু দিশাহারা হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। তার পর যেন, আবার ধরে পড়ার ভয়ে, তাড়াতাড়ি উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসল। বাড়ীর সকলে আর একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল, যেন আর একটি খোকারও আজ শেষ হয়ে গেল।

সারারাত মনের কষ্টে ছট্‌ফট্ ক'রে ভোর বেলায় মা এসে দালানে চুপ ক'রে শুয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন যেন খোকা বলছে, 'মা মণি, খাবার।' চম্‌কে উঠে মা চারিদিক্ চাইলেন, ভাবলেন বুঝি বা স্বপ্ন। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন আবার চারিধার, তাতে যা দেখলেন একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। মাথার গোড়ায় খোকার পাখী ফিরে এসে খাবার চাইছে, অর্থাৎ খোকার শেখান বুলি আবার ফিরে এসে বলছে। আজ মার মনে হ'ল তাঁর ছেলে তিনি হারান নি, সবার মধ্যেই সে ছড়ান আছে। ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলেন খোকার পাখীর জন্য খাবার আনতে।

ইউরোপে গ্রীষ্মের মোহ

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

শীতের মায়া কাটিয়ে ওঠার পর বসন্তে ফুলের কুঁড়ি দেখে ইউরোপের মানুষ নতুন এক আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির গায়ে রূপ যেন ধরে না। সবুজ বন, নানা রংএর ফুল-ফল, পরিষ্কার নীল আকাশ, সূর্য্যের আলো সবই অপরূপ সুন্দর হয়ে দেখা দেয়।

ফুল গাছে কত ফুল ! প্রকৃতি যেন এখন এক ফুলরাণী। আমাদের দেশে ফুল বছরে সব দিনই প্রচুর ফোটে, তাই ফুল আমাদের কাছে আনন্দের জিনিষ হ'লেও হঠাৎ নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয় না। ইউরোপে,—যেখানে বছরের বেশীর ভাগ দিনই ফুলগাছগুলি শীতে আড়ষ্ট হয়ে থাকে সেখানে একটু গরমের আমেজ

পেলেই তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কাজেই ওখানে ফুলের এত আদর হবে এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? অনেক বাড়ীতেই হয় বাইরে বসবার ঘরে, নয় খাবার ঘরে ছোট ছোট টবে দু'চারটি ফুলগাছ থাকে। কোন গাছে একটি ফুল ধরল তো ঐ নিয়ে বাড়ীর লোক হৈ চৈ সুরু করে দিল। কেউ কেউ আবার হয়তো বন্ধু-বান্ধব ডেকে তাদের সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে দিল।

ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতে পাঠ্যাবস্থায় গ্রীষ্মের মোহ প্রায়ই আমাকে গ্রামে টেনে নিয়ে যেত। প্রকৃতিকে আমি সব চেয়ে বেশী উপভোগ করেছি সেখানে যেখানে পাহাড় ও জল মেশামেশি করেছে। পাহাড় আর জলের অলঙ্কার হয়ে দেখা দিয়েছে বন, বাগান, ছোট ছোট বাড়ী। সব মিলে এক একটি জায়গা যেন মায়া-কাননের রূপ ধরে।

ইংলণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি গ্রামের রাস্তায় গ্রীষ্মের সৌন্দর্য্য।

কিন্তু প্রকৃতির এ মোহে পড়ে সহরকে কোন দিন একেবারে ভুলতে পারি নি। কারণ কাজের ভীড় সহরেই টেনেছে আমাকে। সহরে কাজের ভেতর নতুন কিছু খুঁজে পাবার নেশা মানুষকে ভূতের মত খাটায়। আর গ্রামে, সৌন্দর্য্যের ভেতর গা ঢেলে দিয়ে মানুষ চেখে নেয় অবসাদকে। তাই সভ্য জগতে গ্রাম ও সহর দুইএরই প্রয়োজন আছে। কবি রবার্ট ব্রাউনিং গ্রাম ও সহর দুটিকেই সমান ভালবাসতেন।

যে দিন বেশী গরম পড়ল সে দিন অনেকে ছুটল সাঁতার কাটতে—উন্মুক্ত আকাশের নীচে পুকুরে। শীতের দিনে তারা সাঁতার দেয় দেয়াল-ঘেরা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায়। অনেক পুকুর দেখেছি শীতে স্কেট্ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

অনেক পুকুরে খানিকটা জায়গায় কম জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ছোট ছেলেমেয়েরা সাঁতার দেবে বলে। সকলেই সাঁতারে ওস্তাদ, খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে অনেকে পাড়ে উঠে ঘাসের ওপর বসছে, গল্প করছে, নয় তো রোদে শুয়ে আছে। তা ছাড়া ব্যাডমিণ্টন খেলারও আয়োজন আছে, পিং পং টেবিলও আছে। কেউ কেউ তাস, দাবা এ সব নিয়েও মসগুল হয়ে বসে আছে। অনেকের দাঁড় বাওয়ার নেশা আছে। তারা ছোট্ট একটি ডিঙ্গি নৌকো নিয়ে বেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ডিঙ্গি থেকে নেমে সাঁতার কেটে বা জিরিয়ে নিয়ে আবার দাঁড় বাইছে।

যাদের সাঁতারে ঝোঁক কম তারা হয়তো চার কি ছ'জন মিলে সাইকেলে বেরিয়ে পড়ল। গরমের আরামটুকু সবাই তো উপভোগ করবে। কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। ব্যাগে ভরে নিল রুটী, মাংস, ডিম, কেক ও ফ্লাস্কে নিল জল। এই রকম বেড়ানর জন্য রাস্তাও সরকার থেকে তৈরী করে দিয়েছে কয়েকটি। এ সব রাস্তায় গিয়ে, ধর, সন্ধ্যায় কোন গ্রামে পৌঁছল। খুঁজে খুঁজে হয় একটা হোটেলে উঠল, নয় তো কারো বাড়ীতে হোটেলের আন্দাজে ভাড়া দিয়ে এক রাত কাটিয়ে দিল। পরদিন আবার নতুন উদ্যম নিয়ে ছুটল সাইকেলে করে।

ইংলণ্ডের একটি দৃশ্য: ছাত্রেরা নদীতে দাঁড় বাইছে।

ইংলণ্ডের লোকদের পক্ষে বেড়ানর জন্য বিদেশে যেতে হ'লে পাশপোর্ট পাওয়া সোজা। জার্ম্মানী ও ইটালীর লোকদের পক্ষে দুষ্কর। তাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা নয় যে তারা বিদেশে গিয়ে দেশের টাকা খরচ করে আসে। অথচ

আমি দেখেছি, জার্ম্মানীর লোকদের বিদেশ ভ্রমণে ভয়ানক ঝোঁক। বিদেশ সম্বন্ধে তাদের চেয়ে বেশী কৌতূহল বোধ হয় ইউরোপের আর কোন জাতের নেই। তাদের মন ঘুরছে সারা পৃথিবীময়। পাশপোর্ট সম্বন্ধে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতেও ইংলণ্ডের মত স্বাধীনতা নেই। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি এ বিষয়ে উদার।

গ্রীষ্মে ইংলণ্ডের লোকদের বড় ঝোঁক সমুদ্রের পাড়ে ছুটি কাটান। যদিও তাদের চারদিকে অফুরন্ত জল তবু জলে তাদের বিরক্তি নেই। সমুদ্রের পাড়ের সহরগুলিতে হোটেল কত! হোটেলের তেতালা থেকে দেখা যায় অগাধ জলের প্রচণ্ড মাতামাতি। জলের সে দাপাদাপি ভুলবার নয়। দূরবীণে দূরের জাহাজ ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে দেখা যায়। সমুদ্রের পাড়ে বালির ওপর সারি সারি ছোটখাট ঘর—এগুলির ভেতর বহু লোক সাঁতারের জন্য পোষাক পরতে আসছে। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্ফূর্ত্তির সীমা নেই, বালির ওপর কত মজার খেলাই তারা খেলে চলেছে—বালির বাড়ী বানাচ্ছে, পুকুর কাটছে, ভাঙ্গছে, গড়ছে। এ সব খেলায় তাদের একাগ্রতা কত!

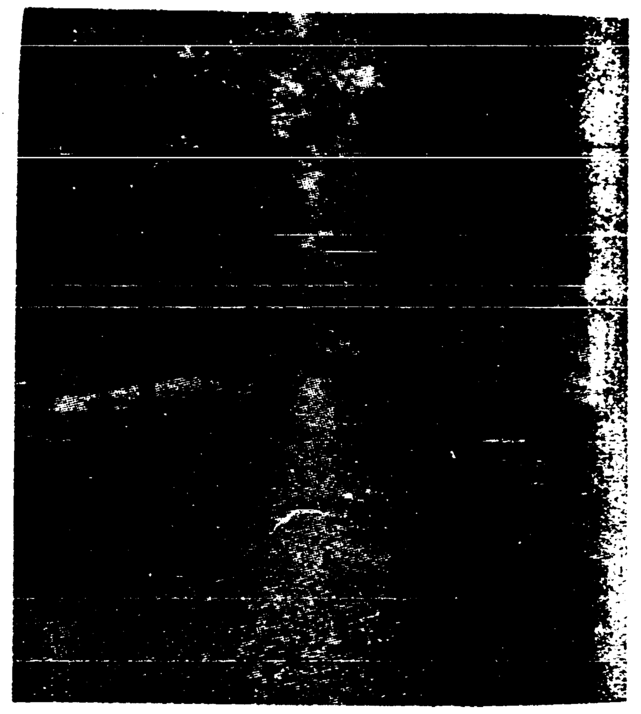

গ্রীষ্মে হল্যাণ্ডের একটি দৃশ্য

এমনি বালির পাড়ে দু'এক সহরে মেলাও বসে গেছে। কত লোক, কত খেলনা এসেছে মেলায়! নানা রকম খেলাও হচ্ছে এর ভেতর। খেলার আকর্ষণও রয়েছে বহু লোকের। খেলায় সাধ মেটান কোন লোকরই হচ্ছে না, তৃপ্তির অভাব রয়ে যাচ্ছে। এমনি এক গ্রীষ্মের দিনে স্কেগনেসে বেড়াতে গিয়ে চোখে পড়েছিল কৃষ্ণবর্ণ একটি লোক। গালভরা দাড়ী, পরনে নানা রংএর কাপড় দিয়ে তালি মারা একটি প্যাণ্ট, মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগ্‌ড়ী। সে আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে, "খাঁটি ভারতবর্ষের ম্যাজিক! একবার দেখলে ভুলতে পারবেন না। অতি আশ্চর্য্য

সব কাণ্ড! আসুন, আসুন..." ইত্যাদি। ম্যাজিক দেখতে ক'জন লোক ভেতরে গেছে জানি না কিন্তু তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে বহু লোক। হাঁ করে দেখছে ঐ অপরূপ মানুষটিকে। এক জায়গায় শুনতে পেলাম, একজন আর একজনকে বলছে, "ঐ দেখ্ একজন ভারতীয় ফকীর। ওরা অলৌকিক সব ম্যাজিক দেখাতে জানে।" যে শ্রোতা সে জবাব দিল, "শুনেছি ওরা নাকি হিংস্র বাঘকেও বশ করতে পারে!" ছোট একটি ছেলে ওদের সঙ্গে ছিল, সে খুব মন দিয়ে কথাগুলি শুনছিল। বড় বড় চোখ করে সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, "ওরা সাপও খেলাতে পারে, না বাবা?" কথা বলতে বলতে এরা ভীড়ের সঙ্গে মিশে গেল।

এমনি সব সমুদ্রের পাড়ে বেড়ান'র জায়গা ইংলণ্ডে অনেক আছে। তাদের মধ্যে স্কেগ্‌নেস্, ব্ল্যাকপুল, স্কারবরো, ক্ল্যাকটন-অন্-সি-এর নাম খুব শুনেছি। এ ছাড়া যারা অপেক্ষাকৃত ধনী তারা খানিকটা জল পার হয়ে গিয়ে আইল্-অফ্-ম্যান্ ও আইল্-অফ্-হোয়াইট্এ যায়। ইউরোপের ম্যাপ দেখলে চোখে পড়বে যে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, সুইট্জারল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমুদ্রের মুখ দেখবার কোন পথই নেই। তাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে যারা অর্থের অভাবে দূরে গিয়ে সমুদ্র দেখে আসতে পারে না। সমুদ্রের আকার ও রূপ তাই তারা মনে মনে স্বপ্ন দেখে ও সমুদ্রের গল্প শুনতে সর্ব্বদাই আগ্রহ দেখায়।

১৯৩৮, নটিংহাম, ইংলণ্ড।

জান কি?

শ্রীরণেন্দ্রচন্দ্র রায়

হাওয়াই দ্বীপের লোকেদের ভাষায় মাত্র ১২টি অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

কফি খাওয়ার প্রচলন হয় ১৬২৫ সন থেকে। তখন কফি ও চিনি মিশিয়ে খাওয়া হ'ত, কফির সঙ্গে দুধের ব্যবহার সুরু হয় আরও পরে—১৬৬০ সনে।

আলো এক সেকেণ্ডে যত দূর যায় শব্দের সেই পথটুকু পার হতে লাগে প্রায় ১১ দিন।

[ভারতের বিস্মৃত যুগের একটি কাহিনী]

পাঁচ

সম্রাট্ মিহিরকুল * দক্ষিণ ভারতে দিগ্বিজয়ের জন্য তৈরী হচ্ছেন। চারিদিক্ থেকে হূন সেনা এসে সমবেত হচ্ছে। শত সহস্র হূন সেনার পদভারে নগরটী টলমল করছে। চারিপাশে ছাউনি পড়েছে। পথঘাট গিস গিস্ করছে। বিপন্ন হিন্দু নাগরিকেরা সন্ত্রস্ত মনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে বসে আছে। ক্বচিৎ দু-একজন হিন্দু চোখে পড়ে। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে আজ আর কেউ পথে বের হয় নি। হূন সেনার সমারোহে সারা নগর গম্‌গম্ করছে।

রাজসভা থেকে রাজবৈদ্য বিষ্ণুবর্দ্ধনের আহ্বান এসেছে, সম্রাট্-নন্দিনী অসুস্থা হয়ে পড়েছেন, তাঁকে একবার দেখা প্রয়োজন।

বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—ধর্ম্মদেব, তুমিও চলো, সম্রাট্ মিহিরকুলের সঙ্গে একবার মুখোমুখি পরিচয় করে আসবে।

ধর্ম্মদেব বল্‌লে—দরকার নেই। প্রতিদিন পথে-ঘাটে তার যে পরিচয় পাচ্ছি, তাই যথেষ্ট।

—যার বিরুদ্ধে তোমার এত অভিযোগ সেই মানুষটীর সঙ্গে মুখোমুখি একটু আলাপ করে আসতে ক্ষতি কি?

—প্রয়োজন দেখি না।

—মৃদু হেসে বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—ভয় পাচ্ছ বুঝি?

* "ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ" তাঁর 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে' লিখেছেন—"The name Mihirgulo (Sun flower) also appears in the Sanskritized form of Mihirkula." আমি সংস্কৃত অনুযায়ী মিহিরকুল নামটীই ব্যবহার করার পক্ষপাতী। —লেখক

—ভয়! ধর্ম্মদেব বিষ্ণুবর্দ্ধনের মুখের পানে তাকালো। সে চোখে চকিতের জন্য একটা বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা গেল। বল্‌লে, চলো আমি প্রস্তুত।

সম্রাট্ মিহিরকুল পারিষদদের নিয়ে বসেছিলেন। মধু ও তালরসের গন্ধে সারা কক্ষ আমোদিত। প্রত্যেকেরই চোখে মাদকতার রঙীনতা।

বিষ্ণুবর্দ্ধন সামনে এসে প্রণাম করলো। সম্রাট্ বল্‌লেন—বসো। তার পর পিছনে ধর্ম্মদেবকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার পিছনে ওটি কে, রাজবৈদ্য?

—আমার ভাই।

—তোমার ভাই? তা এত দিন তো দেখি নি!

—আজ্ঞে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন পড়াশুনা করছিল, দু'দিন হ'ল ফিরেছে।

বিষ্ণুবর্দ্ধনের ইঙ্গিতে ধর্ম্মদেব সামনে এসে প্রণাম করল।

—নালন্দায় এত দিন তুমি কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করছিলে যুবক?—সম্রাট্ জিজ্ঞেস করলেন।

—রাজনীতি ও অর্থনীতি।

—বেশ। যাদের রাজ্য নেই নিভৃতে বসে বসে তারাই রাজনীতি চর্চ্চা করে। তা তোমাকে তো বেশ শক্তিমান্ বলে মনে হচ্ছে, ধনুর্বেদ কিছু আলোচনা করেছ?

—সামান্য।

—তোমাকে আমি রাজকার্য্যে নিযুক্ত করব।

—আপনার অশেষ অনুগ্রহ সম্রাট্!

—বসো। বলে সম্রাট্ ইঙ্গিত করলেন, একজন পরিচারিকা এক পাত্র মধু এনে ধরলে ধর্ম্মদেবের সামনে। সম্রাট্ বল্‌লেন—পড়াশুনা তো অনেক দিন করলে; নীরস পুঁথির মধ্যে এত দিনে তোমার মনটা নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে উঠেছে, একটু মধুপান করে সরস হয়ে নাও।

ধর্ম্মদেব হাত যোড় করে জানাল সে মধুপান করে না।

—মধুপান কর না, য়্যাঁ!—সম্রাট্ বিস্ময় প্রকাশ কর্‌লেন। এমন সুদৃঢ় দেহে একপাত্র মধুপানের সাহস নেই! মধু খাও না বলেই তোমাদের শক্তিও বাড়ছে না, সাহসও বাড়ছে না, আমাদের সঙ্গেও পেরে উঠছ না। যাক্ গে, মধু না খেলে না-ই খেলে, সঙ্গীত রচনা করতে পার? নর্ত্তকীরা নাচবে আর তাদের নূপুরের ছন্দে তুমি সঙ্গীত রচনা করে আমায় শোনাবে। তোমাকে আমি সভাকবি করে রাখব।

—সঙ্গীত রচনা করতেও আমি অভ্যস্ত নই সম্রাট্।

—তা হ'লে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন কি লেখাপড়া শিখলে ?

ধর্ম্মদেব চুপ করে রইল।

কথার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—সম্রাট্, শুনলাম কন্যাকুমারী অসুস্থা ?

—আহা, সে তো আছেই ;—সম্রাট্ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁকে দু'দণ্ড পরে দেখলেও চলবে। এখন খানিক বসো, একটু নৃত্যগীতের আয়োজন করা যাক্। মহাবলাধ্যক্ষ জেতমানা মালব থেকে কি এনেছে দেখাবো, বসো—

এই কথার পর আর না বসে উপায় নেই। বিষ্ণুবর্দ্ধন আসন গ্রহণ করলো, ধর্ম্মদেবকেও বসাল নিজের পাশে।

সম্রাট্ দৌবারিককে ইঙ্গিত করলেন, দৌবারিক প্রস্থান করলো এবং অনতিবিলম্বে দু'জন বলিষ্ঠ হূন এক তরুণীকে টেনে আনলো সভার মাঝে। দু'হাতে তরুণীর মুখ ঢাকা, দুঃখে ও শঙ্কায় তার সারা দেহ কাঁপছে। সম্রাট্ আদেশ করলেন—মুখ থেকে হাত নামাও।

তরুণী হাত নামালো না।

—হাত নামাও মুখ থেকে !

তরুণী বারেক থর থর করে কেঁপে উঠল শুধু, কিন্তু আদেশ মানল না। সম্রাটের ইঙ্গিতে শাস্ত্রী দু'জন জোর করে হাত নামিয়ে ধরলো।

মেয়েটীর অশ্রুসজল মুখখানি চোখে পড়তেই ধর্ম্মদেব চমকে উঠল, অসহিষ্ণুর মত বিষ্ণুবর্দ্ধনের একখানি হাত চেপে ধরলো, ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে—এঁকে আমি চিনি, ইনি যে উজ্জয়িনীর রাজকন্যা মল্লিকা !

অচঞ্চল কণ্ঠে বিষ্ণুবর্দ্ধন বল্‌লে—চুপ কর, সম্রাট্ কি বলছেন শোন।

সম্রাট্ তখন মেয়েটীকে বল্‌ছেন—নাম না বল্‌তে চাও না-ই বল্‌লে, তোমার সুকণ্ঠের একখানি সঙ্গীত শুনিয়ে দাও, আর তারই সঙ্গে দেখিয়ে দাও একখানি নৃত্য, আমরা পরিতৃপ্ত হই।

—নাচ-গান আমি জানি না।

—জান না ? মিথ্যা কথা। তোমার মত মেয়ে নাচ-গান জানে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা, সম্রাট্।

—কিন্তু আমি জানি তুমি নাচতে গাইতে জান।

তরুণী এবার দৃপ্ত হয়ে উঠল ; তীক্ষ্ণস্বরে বল্‌লে—তা হ'লে এও জেনে রাখুন সম্রাট্, যে বিজাতীয় অসভ্য দস্যুসর্দ্দারের সামনে নৃত্যগীত প্রদর্শনের ইচ্ছা আমার নেই।

—কী !—মুহূর্ত্তে মিহিরকুল সোজা হয়ে বসলেন, বজ্রকণ্ঠে আদেশ করলেন—জেতমানা, এই তরুণীর অসংযত ভাষণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা কর।

মহাবলাধ্যক্ষ জেতমানা পাশে বসেছিল, এবার উঠে দাঁড়াল। জনৈক পার্শ্বচরের কাছ থেকে একটি বেত চেয়ে নিয়ে মল্লিকার সামনে এগিয়ে এল, আদেশের স্বরে বল্‌লে—অশিষ্ট ভাষণের জন্য অবিলম্বে সম্রাটের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর !

মল্লিকা কোনও উত্তর দিলে না।

—বটে !—সপাৎ করে জেতমানার হাতের চাবুক মল্লিকার পিঠের উপর এসে পড়ল, অনাবৃত পিঠে কালশিরার রক্তিম রেখা ফুটে উঠল। বেদনায় ক্ষণেকের জন্য মল্লিকা সরীসৃপের মত ছট্ ফট্ করে উঠল, দু'চোখে আগুন ঠিকরে পড়ল, নিরুদ্ধ আক্রোশে সিংহিনীর মত সে তর্জ্জন করে উঠল—নরাধম ! পশু !

জেতমানার হাতের বেত আবার মাথার উপর নেচে উঠল, কিন্তু এবার তার আঘাত মল্লিকার পিঠের উপর নেমে আসার আগেই চকিতে ছুটে গিয়ে ধর্ম্মদেব তার হাতের চাবুকটা ছিনিয়ে নিলে।

মুহূর্ত্তের জন্য উপস্থিত সকলে হতচকিত হয়ে গেল।

তারপরেই জেতমানা খস করে তলোয়ার কোষমুক্ত করলে। ধর্ম্মদেবও তলোয়ার খুলে দাঁড়াল। সভার মাঝে হৈ-চৈ পড়ে গেল, সভাসদ্‌দের অনেকেই নিজ নিজ অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘিরে ধরল ধর্ম্মদেবকে।

তাদের সমবেত আক্রমণে তখনই ধর্ম্মদেবের জীবনের উপর মৃত্যুর যবনিকা পড়ে যেত, আমাদের কাহিনীও শেষ হ'ত কিন্তু তা হ'ল না। অসহিষ্ণুভাবে মাটিতে একবার পদাঘাত করে সম্রাট্ মিহিরকুল উঠে দাঁড়ালেন। সকলের হাতের উদ্যত অস্ত্র স্থির হয়ে গেল। সম্রাট্ বল্‌লেন—তোমার দুঃসাহসের প্রশংসা করি যুবক, ভারতের অসংখ্য মেষপালের মধ্যে তুমি এক সিংহশিশু। কিন্তু পরাধীন জাতির পক্ষে ভারতসম্রাট্ মিহিরকুলের সামনে এত দূর হঠকারিতা প্রকাশ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সেই অপরাধে আমি তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান দিলাম। জেতমানা, তুমি এঁকে বন্দী করে নগরের কেন্দ্রে সর্ব্বজনসমক্ষে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে।

ধর্ম্মদেবের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বল্‌লে,—আমার হাতে অস্ত্র থাকতে আমায় জীবিত বন্দী করতে পারবেন না, সম্রাট্ !

জেতমানা সদম্ভে বলে উঠল—উত্তম, দেখা যাক্ !

ধর্ম্মদেব বল্‌লে—এক শ' জনে মিলে একটি লোককে আক্রমণ করায় কোন বীরত্ব নেই

জেতমানা। তুমি যদি সত্যিকারের বীর হও তো এস, একা একা লড়ি—দেখি কার বাহু কত শক্তি ধরে!

রাগে জেতমানার চোখ দু'টি লাল হয়ে উঠল, বল্লে—উত্তম, তাই আমি লড়ব, তোমার মত একটা হিন্দু কুত্তাকে হারাতে আমার এক মুহূর্ত্তের বেশী লাগবে না।

—আর যদি তুমি হেরে যাও?

মধুমত্ত সম্রাট্ এবার হাঃহাঃ করে হেসে উঠলেন। তাঁর মনের কঠোরতা মধুপানের মাদকতায় প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল, হাসতে হাসতে বল্লেন—আমার পার্শ্বরক্ষী মহানায়ক জেতমানাকে পরাস্ত করার আশা রাখ? যে আজ পর্য্যন্ত কোথাও হারে নি তাকে তুমি হারাবে! তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে যুবক।

—এখনই আমি ওর ভুল শুধরে দিচ্ছি সম্রাট্,—জেতমানা বল্লে—তার পর ওকে আমি জীবন্ত ঝল্‌সে মারব।

জেতমানার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ধর্ম্মদেব সম্রাটের উদ্দেশ্যে বল্লে—তবু যদি আমি জয়ী হই, সম্রাট্?

আবার সম্রাট্ হেসে উঠলেন, বল্লেন,—বেশ, যদি সত্যি তুমি জয়ী হও, তোমার কোন প্রার্থনা আমি অপূর্ণ রাখব না।

জেতমানা আর সইতে পারল না, লাফিয়ে পড়ল ধর্ম্মদেবের উপর; পরস্পরের তলোয়ারে সংঘর্ষ বাধল—

ঝন্-ঝন্ ঝনাঝন্ ঝস্!
ঝস্ ঝনাৎ: ঝন্!!
ঝনা-ঝন্ ঝনাৎ-ঝন্!!!

(ক্রমশঃ)

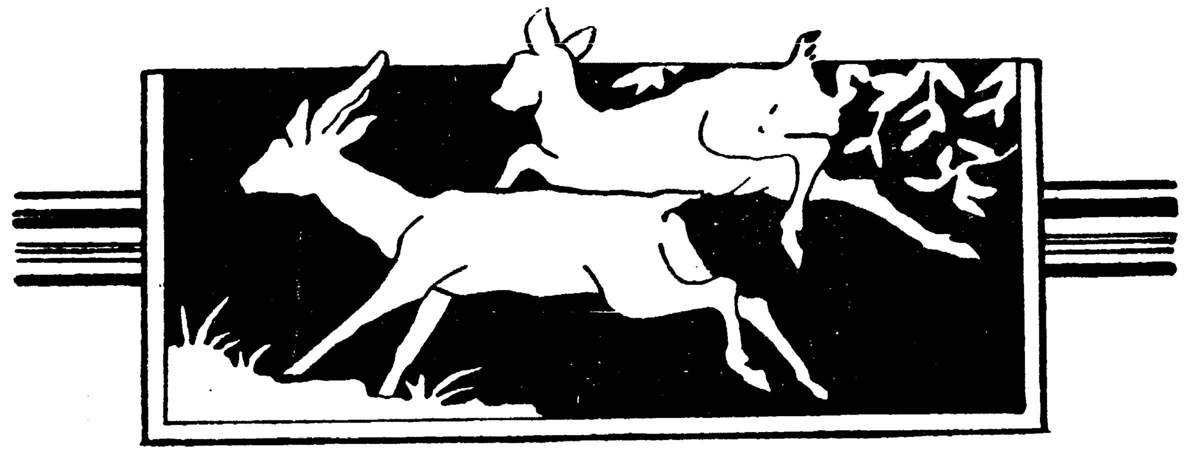

চালাকির জয়

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ছাগল ছাগলী নিয়ে দুটি মোটা বাচ্চা
শহরেতে বাস করে আনন্দে সাঁচ্চা;
হেনকালে এসে গেল পূজা
ধনীর প্রাসাদে দশভুজা।

ছাগ্‌লীকে ডেকে ছাগ ভারি মুখে ব'ল্লে
"ছানা দুটো এইবারে প্রাণে বুঝি ম'ল্লে।
কোন কথা কারু নাহি মেনে
বলি দিতে নিয়ে যাবে টেনে।"

অতএব গেল তারা বনে বাস ক'র্‌তে
ছানাদের পার্‌বে না যেথা কেউ ধ'র্‌তে।
গর্ত্তের মাঝে বেঁধে বাসা
রইল তাহারা বেশ খাসা।

পশুরাজ ভাবে, এটা এল কোন্ জন্তু!
দাড়ি, শিঙ্ দেখে খাড়া কেশরের তন্তু।
ধীরে ধীরে এগিয়ে সে যায়
মতলব ছাগ ঠাওরায়।

গর্ত্তের মুখ থেকে হেঁকে বলে, "ছাগ্‌লী!
ছানাদের কেবল যে কাঁদাতেই লাগ্‌লি?"
ছাগী কয়, "ছানাদের রাগ
পেট ভরে খেয়ে দুটো বাঘ!"

শুনেই তো চম্পট দিল সেই সিঙ্গী
ও রে বাবা! বাঘ খায় কি প্রাণী এ ধিঙ্গী!
মাড়াবে না আর ওই দিক্
প্রাণ নিয়ে পালানোই ঠিক্।

হঠাৎ শিয়াল এল তাহারি যে সাম্‌নে
বলে মামা "ছুট্ দিয়ে চল তুমি কম্‌নে?"
সব কথা শুনে কয় হেসে
"ছাগলটা ঠকাইল শেষে!

“ফিরে চল মোর সাথে নেই কোন চিন্তা
তোমার এ ভয়-ডর, ভাবো কত হীন তা।
লেজে লেজে গিঁট দিনু দিয়া
পালাবো না তোমাকে ফেলিয়া।”

ও ভাবে আসিছে দেখি শৃগালটা ধূর্ত্ত
ছাগল গরজি ওঠে ক্রোধ যেন মূর্ত্ত,—
“ছুটো সিংহের তরে গেলি
কি সাহসে একটা আনিলি ?”

সিংহ বুঝিল, শিবা ছাগলেরি বাধ্য
ধরিয়া এনেছে তার করিবারে শ্রাদ্ধ ;
মনে মনে যেই তাই বোঝা
ছুট্ দিল পিছু দিকে সোজা।

“থাম মামা, থাম মামা” শিবা কহে উচ্চে,
ঘষ টাতে ঘষ টাতে মাথা তার ঘু’চ্চে।
লেজে লেজে বাঁধবার মজা
বেশ যে জানিয়ে দিলে অজা।

সে অবধি ছাগ-ছাগী মহাসুখে নিত্য
সারা বনে বিচরিত ভয়হীন চিত্ত।
সিংহ বা বাঘ নয় মোটে
ক্ষিদে পেলে ঘাস খেতে চোটে।

সুমেরিয় সভ্যতার গোড়ার কথা

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ.

বর্ত্তমান এসিয়া মাইনরের পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে যে দু’টি নদী পারস্য উপসাগরে মিশেছে তাদের একটির নাম টাইগ্রীস ও অপরটির নাম ইউফ্রেটিস। এই নদী দু’টির দু’পাশের সহরগুলিকে কেন্দ্র করে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর সভ্যতা ও নীল নদের সভ্যতা প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু মিশরের ও পশ্চিম এসিয়ার প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কারণে এই দুই জায়গায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার নিয়েছিল। পশ্চিম এসিয়ার বেশীর ভাগ ভূমিই অত্যন্ত অনুর্ব্বর। এই অঞ্চলকে পাহাড়, পর্ব্বত ও মরুভূমির দেশ বলতে পার। কিন্তু বর্ত্তমান এসিয়া মাইনর ও আরবের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রের মত খানিকটা খুব উর্ব্বর জায়গা আছে। পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন সভ্যতা এই উর্ব্বর ভূমিতে গড়ে উঠেছিল। মিশরের সভ্যতার মত এখানকার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি ক্রমে ক্রমে মাটির নীচে চাপা পড়েছিল। মাত্র কিছুদিন হ’ল কয়েক জন ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান্ প্রত্নতাত্ত্বিকের অধ্যবসায়ের ফলে এই সব নগরগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

বহু প্রাচীনকালে এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি উর্ব্বর ভূমিতে পর পর কয়েকটি যাযাবর উপজাতি এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল। এদের মধ্যে একদল চলে গেল বর্ত্তমান প্যালেস্তাইনে। সেখানে তারা যে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করল তা হিব্রু সভ্যতা নামে পরিচিত। এই হিব্রু সভ্যতার কথা তোমাদের পরে বলব। আবার অন্য কয়েক দল টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের ধার দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল এবং এই সময় তারা পর পর কয়েকটি নগরের প্রতিষ্ঠা করে গেল। এইখানে তারা যে দুটি সভ্যতার সৃষ্টি করল তা সুমেরিয় ও সেমিটিক সভ্যতা নামে পরিচিত। কেননা যে দুটি উপজাতি এখানে এসে বসবাস করতে লাগল তাদের সুমেরিয় ও সেমিটিক বলা হয়।

বিখ্যাত ব্যাবিলন নগরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ—কেননা ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান নাকি পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি ছিল। সুমেরিয় জাতি ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলন নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন কালের এক বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এই সভ্যতাকে সুমেরিয় অথবা ব্যাবিলনের সভ্যতা বলা হয়। ব্যাবিলনের উত্তরে ছিল আসিরিয়া। এখানে কয়েকটি বড় বড় নগরকে কেন্দ্র করে সেমিটিক জাতি যে বিরাট সভ্যতার পত্তন করেছিল তা ইতিহাসে আসিরিয় অথবা সেমিটিক সভ্যতা

নামে পরিচিত। সুমেরিয়, সেমিটিক ও হিব্রু সভ্যতার মধ্যে বোধ হয় সুমেরিয় সভ্যতাই সব চাইতে পুরানো। আজ তোমাদের এই সুমেরিয় সভ্যতার কথা বলব।

নীচের মানচিত্র থেকে বুঝতে পারবে কেমন করে পারস্য উপসাগরের প্রায় দেড়শ' মাইল দূরে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। সেখান থেকে সাগর পর্য্যন্ত যে ভূমিভাগ তা সিনারের উপত্যকা অথবা ব্যাবিলনিয়া নামে প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস আমরা যতখানি জেনেছি তাতে মনে হয় যে প্রথম হাজার বৎসর পর্য্যন্তও ব্যাবিলন নগরের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তখন এই উপত্যকাকে সিনার বলা হ'ত। দুই নদীর মাঝের ভূমিভাগ কোনও জায়গাতেই চল্লিশ মাইলের বেশী চওড়া নয় এবং তা আয়তনে আমাদের ঢাকা জেলার সমান ছিল বলা যেতে পারে। এখানে খুব সামান্য বৃষ্টি হ'ত। দুটি নদী থেকে অসংখ্য খাল কেটে ক্ষেতে জল নিয়ে চাষের ব্যবস্থা হ'ত। আজকালও ব্যাবিলনিয়ার প্রাকৃতিক অবস্থা এক রকমই আছে। এই উপত্যকা খুব উর্ব্বর ও এখানকার প্রধান সম্পদ্ কৃষি। চারিদিকের মধ্যে এই জায়গাটুকুই ছিল সব চাইতে সম্পদ্শালী। সেইজন্য এখানকার স্থায়ী অধিবাসীদের সঙ্গে উত্তরের যাযাবর উপজাতিগুলির প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হ'ত। প্রায় হাজার বৎসর ধরে

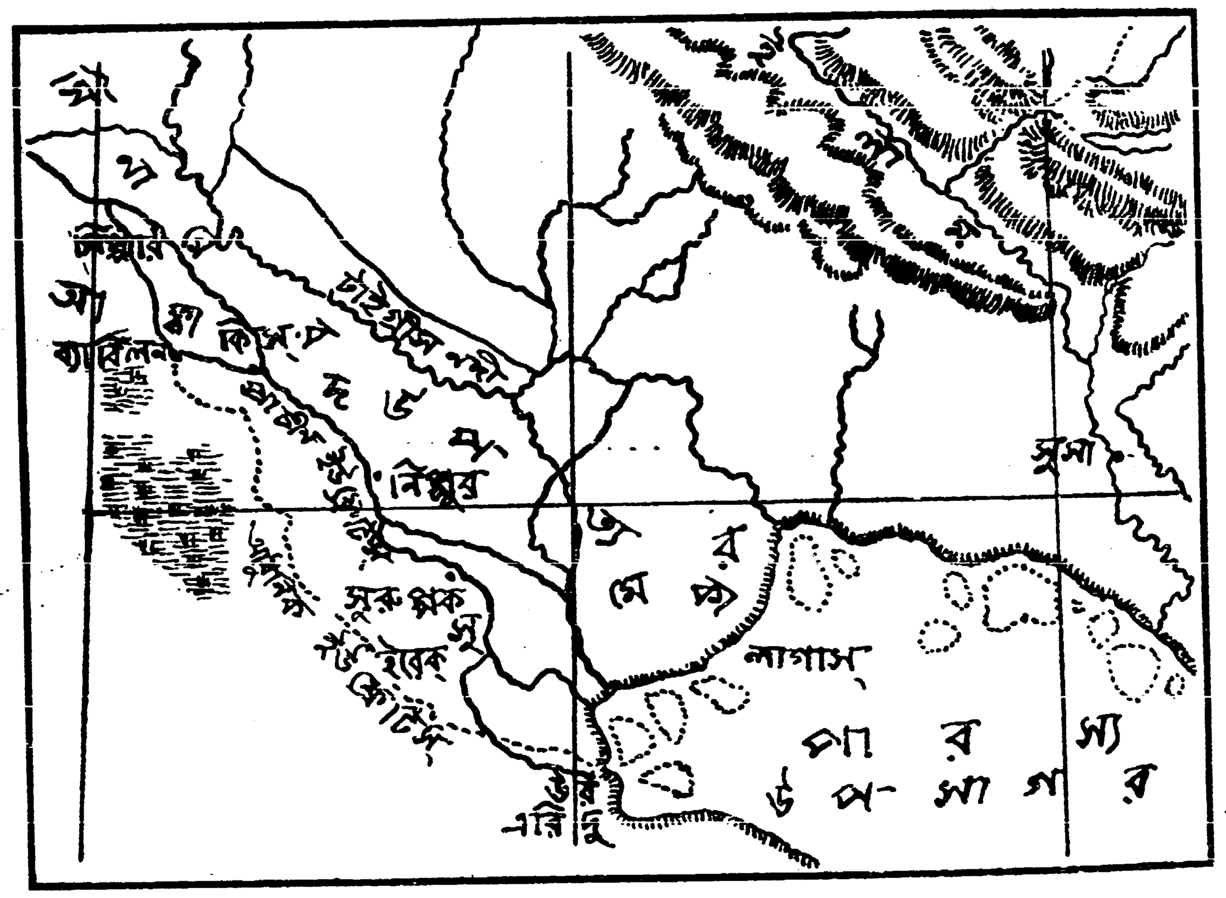

সুমের ও আক্কাদের মানচিত্র

এই যুদ্ধ চলেছিল। সিনারের প্রথম হাজার বৎসরের ইতিহাস এই দুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘর্ষের ইতিহাস।

সুমেরিয়রা পার্ব্বত্য জাতি। পর্ব্বত থেকে এসে তারা সমভূমিতে বাসা বেঁধেছিল। প্রস্তরে উৎকীর্ণ লেখা ও ছবি থেকে জানতে পারা যায় যে প্রাচীন সুমেরিয়রা মাথা কামাত। তখন পর্য্যন্ত তারা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। পাঁচ হাজার বৎসরেরও আগে পার্ব্বত্য সুমেরিয়দের একদল পর্ব্বত থেকে নীচে নেমে এসে নদীর মোহনার কাছের জায়গা অধিকার করে জলাভূমি পরিষ্কার করে চাষবাস আরম্ভ করল। এদের বংশধররাই কালে প্রসিদ্ধ সুমেরিয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তখন পর্য্যন্ত তারা বাড়ী-ঘরের জন্য পাথরের ব্যবহার জানত না বটে, কিন্তু নদীর ধারে মাটির ইট দিয়ে বাড়ী তৈরী করত। এইভাবে প্রত্যেকটি নগরই নদীর ধার দিয়ে গড়ে উঠেছিল। নদী ও ঝর্ণাতে বাঁধ দিয়ে সে জল ক্ষেতে চালান ক'রে চাষবাস করা হ'ত। চাষবাসের জন্য গৃহপালিত পশুর ব্যবহার তারা জানত। দেয়ালের গায়ে আঁকা ছবিতে দেখা যায় যে চাষের জন্য বলদের এবং গাড়ী টানবার জন্য গাধার ব্যবহার ছিল। মানুষ নিজের ব্যবহারের জন্য ঘোড়াকে তখন পর্য্যন্ত পোষ মানাতে পারে নি। মালপত্র টানার জন্য গাড়ীর ব্যবহার এখানকার লোকরাই প্রথম আবিষ্কার করে। ক্রমে ক্রমে ধাতুর ব্যবহারও তারা শিখল। মিশরের লোকদের মত ব্যবসা ও নগরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটা লিখনপদ্ধতির প্রয়োজন তারা অনুভব করেছিল।

প্রাচীন মিশরের চিত্রলিখন পদ্ধতির সঙ্গে এখানকার প্রাথমিক লিখনের অনেক মিল ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ এই দুই দেশের লেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করে। মনে কর, মাছ বোঝাবার জন্য প্রাথমিক যুগে একটা মাছের ছবি আঁকা হ'ত। কিন্তু নানা কারণে এক একটি কথা বোঝাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছবি আঁকবার অসুবিধা হওয়াতে কতকগুলি চিহ্নের আবিষ্কার হ'ল। এই লিখনের বিভিন্নতার জন্য দায়ী প্রধানতঃ লিখনের উপাদান। মিশরীয়দের মত সুমেরিয়রা প্যাপিরাসের ব্যবহার জানত না। নরম কাদার চাকতির ওপর নলখাগড়ার কলম

দিয়ে আঁচড় কেটে তারা এক রকমের লিখনের আবিষ্কার করে। এই লেখা "কুনেইফরম" নামে পরিচিত। কাদার ওপর সরু কলম দিয়ে লেখার জন্য অক্ষরগুলো হ'ত তীরের ফলার মত কোণাচে ও আগের দিকে মোটা, শেষের দিকে সরু। তা'তে ক'রে এই লিখনপদ্ধতি থেকে ক্রমশঃ ছবির ভাগ কমে গিয়ে বিভিন্ন চিহ্নের প্রচলন হ'ল। তবুও এক একটি চিহ্নই এক একটি কথা বোঝাত। আবার বিভিন্ন কথা বোঝাবার জন্য একটা চিহ্নই ব্যবহার করা হ'ত; যেমন পা ও জুতো—এক চিহ্নেই দুটো শব্দ বোঝাত।

ব্যাবিলনে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হবার আগেই সুমেরিয়দের সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্ম্মজীবন একটা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছিল। সে সম্বন্ধে সব কথা এই ছোট প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। পরের বারে আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

৭

সুবিস্তৃত বালুচরের উপর জাহাজ গিয়া উঠিতেই জাহাজের ক্ষুদ্র আরোহীগণ মাটীর উপর নামিয়া চারিদিক্ ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। কোন দিকে একটা জঙ্‌লী লোকও তাহাদের চোখে পড়িল না। পাহাড়ের তলায় বা গাছের নীচে একটা কুটীরও দেখা যায় না। অদূরস্থিত নদীর মোহানা তখন জোয়ারের জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সেখানেও না আছে একটা নৌকা বা ডিঙ্গি! এমন কি বালুময় বেলাভূমির উপর একটা পদচিহ্নও দেখা গেল না। আকাশে বাতাসে কোথাও একটু ধোঁয়ার চিহ্ন মাত্র নাই।

সুশান্ত ও অশোক দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল এখন তাহারা প্রথমে কি করিবে। সামনের গাছপালার ভিতর দিয়া গিয়া ওদিকের পাহাড়টা অতিক্রম করিলে মন্দ হয় না।

অশোক কহিল—"ডাঙ্গায় ত' আসা গেল, কিন্তু এমন জনমানবহীন দেশে কি ক'রে থাকা যাবে?"

সুশান্ত কহিল—"তা'তে হয়েছে কি? সঙ্গে এখনো আমাদের প্রচুর খাদ্য ও গুলি-বারুদ আছে, অতএব ভাবনার কোন কারণ নেই। এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে মাথা গোঁজবার মত একটা আশ্রয় ঠিক করে নেওয়া। তার পর ধীরেসুস্থে দেখা যাবে আমরা পৃথিবীর কোন্ জায়গায় এসে উঠেছি। যদি এটা একটা মহাদেশের অংশ হয় তা হ'লে আমাদের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা আছে; আর যদি এটা বাস্তবিক একটা দ্বীপই হয়—যে দ্বীপে জনমনুষ্যের বসতি নেই, তা হ'লেও এখন ভববার কিছু নেই। ভগবান্ যা হোক্ একটা উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেবেন।" দুইজনে তখন বন্দুক হাতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাহাড়ের কিছু দূরেই সেই নদীটা বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের নীচে নিবিড় জঙ্গল। কিন্তু চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন গহ্বর বা অন্য আশ্রয়স্থল পাওয়া গেল না। একেবারে খাড়াই মসৃণ পাহাড়। দ্বীপেব ওদিকে যাইবার এখন একমাত্র পথ সমুদ্র-উপকূল ধরিয়া গমন করা। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল হাঁটিয়া তাহারা সেই নদীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া পৌঁছিল। নদীর এ পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্য বৃক্ষ; নদীর ও পাড়ে কিন্তু বৃক্ষের চিহ্নমাত্র নাই। প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে এক নিম্ন অনুর্ব্বর জমি, তারপরই দেখা যায় এক সুপরিসর জলাভূমি। দক্ষিণ দিকে সেই জলাভূমি যে কোথায় শেষ হইয়াছে তাহা ভগবান্ই জানেন। সুশান্ত ও অশোকের ইচ্ছা ছিল পাহাড়ের উপর উঠিয়া দ্বীপের চারিদিক্‌টা একবার ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। কিন্তু সে বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাহারা ক্ষুণ্নমনে জাহাজে ফিরিয়া আসিল।

সমুদ্র-উপকূলের কিছু দূরেই বড় বড় শিলাখণ্ড পড়িয়া ছিল। রঞ্জিৎ ও তাহার দলবল তখন সেই পাথরগুলির উপর বসিয়া আরাম করিতেছে। সুশান্ত ও অশোকের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া সকলে পরামর্শ করিতে বসিল; স্থির হইল যত দিন না দ্বীপের উপর একটা ভালো আশ্রয় মিলিতেছে তত দিন তাহারা জাহাজের উপরই বাস করিবে।

জাহাজটা অল্প কাৎ হইয়া পড়িলেও তাহার উপর থাকিতে কোন অসুবিধা ছিল না। ডেকের সামনের দিক্‌টা উড়িয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সেলুনের ভিতরটা তখনো বেশ মজবুত ছিল। জাহাজের জিনিষপত্রও আর কষ্ট করিয়া দ্বীপে বহিয়া আনিতে হইল না। জাহাজে জিনিষ নেহাৎ কম ছিল না। প্রমোদ-ভ্রমণের জন্য যা কিছু দরকার হইতে পারে সবই

তাহাতে বোঝাই করা ছিল। কত খাবার—টিনে-ভরা মাংস, বিস্কুট, জামা-কাপড়, আসবাবপত্র, বাসনকোসন, বিছানাপত্র, অস্ত্রশস্ত্র—বন্দুক, বারুদ, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র প্রভৃতি কোন জিনিষেরই অভাব ছিল না। জাহাজটাকে সমুদ্রে আর ভাসানো যাইবে না সত্য, কিন্তু বাসের উপযোগী ইহা বহুদিন থাকিবে। একটা দড়ির মই তাহারা জাহাজ হইতে নীচে ফেলিয়া রাখিল, যাহাতে নামিতে বা উঠিতে কোন কষ্ট না হয়। বুনো লইল রান্নার ভার। নীলাদ্রি কহিল, বুনোকে সে রান্নার বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে; বাড়ীতে সে দিদির নিকট নানা রকম মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। তখন সকলেই বেশ খুসি হইল। কেবল একজনের মুখে তেমন হাসি দেখা দিল না; সে মনন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ কত দিন তাহারা নির্ভাবনায় ঘুমাইতে পারে নাই। সন্ধ্যা হইতেই যে যাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সকলে একসঙ্গে ঘুমাইতে সাহস করিল না। ছোটরা শুইতে গেলে পর সুশান্ত, অশোক ও রঞ্জিৎ পালা করিয়া জাগিয়া পাহারা দিতে লাগিল। কি জানি, অজানা জায়গায় কখন কি বিপদ্ আসে!

সমস্ত রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। ভোরের আলো দেখা দিতেই সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের এখন কাজের অন্ত নাই। প্রথমে তাহারা জাহাজের নানা দ্রব্যের একটা তালিকা প্রস্তুত করিল। জাহাজে কত রকমের সামগ্রী—কত বিচিত্র যন্ত্রপাতি! কোন কিছুরই সহজে অভাব হইবে না। অভাব হইবে শুধু খাদ্যদ্রব্যের। যতই জমা থাকুক, বেশী দিন উহাতে চলিবে না। টাটকা খাবার তো নাই-ই। দ্বীপটাও মনে হয় নিতান্ত অনুৎপাদক; শিকার বোধ করি তেমন কিছুই নাই। এখন তাহাদের একমাত্র খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে নদীতে মাছ ধরিয়া আর আকাশের পাখী মারিয়া। আর পাখীই বা তেমন কি আছে? পেলিকান্, সি-গাল, শঙ্খচিল প্রভৃতি সামুদ্রিক পাখী খাইয়া মানুষ কত দিন থাকিতে পারে?

অশোক জাহাজের খাদ্যসম্ভার দেখিয়া কহিল—"এ সব খাবারে এখন আমাদের হাত দিয়ে কাজ নেই। আমি বলি কি, পাহাড়ের ফাটলে একবার পাখীর ডিমের সন্ধান করলে মন্দ হয় না।" অশোকের কথায় বাব্লু একেবারে নাচিয়া উঠিল, কহিল—"ঠিক কথা অশোক-দা, চল এখনই আমরা পাহাড়ে যাই।" কুণাল কহিল—"নদীতে মাছ ধরলে কেমন হয়? জাহাজে তিন-চার গাছা ছিপ আছে আমি জানি। তোমাদের মধ্যে কে কে আমার সঙ্গে মাছ ধর্‌তে যাবে বল?" কুণালের কথায় ধ্রুব, আশীষ প্রভৃতি কয়েকজন একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল, "আমি যাব। আমি যাব।"

সুশান্ত সকলকে থামাইয়া দিয়া কহিল—"এখন অমন খেলা কর্‌তে গেলে চল্‌বে না; যারা প্রকৃত মাছ ধর্‌তে পার্‌বে তারাই শুধু মাছ ধর্‌তে যাবে। আপাততঃ এখন সমুদ্রতীর হ'তে

কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে আনা যাক্। এই দ্বীপে ঝিনুকই আমাদের প্রথম খাদ্য হোক্।" তখন ছোটরা হল্লা করিয়া সমুদ্রতীরে ঝিনুক কুড়াইতে ছুটিল।

ইতিমধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বালকেরা জাহাজের জিনিষপত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল—দরকার হইলে যাহাতে চট্‌পট্ খুঁজিয়া পাইতে পারে। ব্যারোমিটার, কম্পাস, টেম্‌ গ্ল্যাস প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছাড়া জাহাজে ছোটবড় পাল ছিল অনেকগুলি; তা ছাড়া রসি ও দড়িরও অভাব ছিল না। লোহার কাঁটাতার ছিল, নদীতে মাছ ধরিবার জন্য দু'তিনটা ছিপ এবং সমুদ্রের গভীর জলে মাছ ধরিবার জন্য সরু তারও ছিল। আগ্নেয় অস্ত্রের মধ্যে পাখী মারিবার জন্য আটটা বন্দুক, বন্য জন্তু মারিবার জন্য একটা লম্বা রাইফেল এবং বারোটা রিভল্‌ভার ছিল। টোটা ছিল তিনশতেরও বেশী; বারুদ ছিল দুই পিপা; আর শিশার গুলি ছিল অসংখ্য। ইহা ব্যতীত রাত্রির অন্ধকারে নিশানা দিবার জন্য কিছু হাউই-বাজী ছিল।

আর দুটি দ্রব্য ছিল, যাহার প্রয়োজন বোধ করি এখন হইবে না। দুইটি সুন্দর পিতলের কামান ও তাহাদের উপযোগী গোলাও জাহাজে ছিল। যদি ভবিষ্যতে জঙ্‌লীর দল তাহাদের আক্রমণ করে তবে হয়তো কামানের গোলা মারিয়া তাহাদের সহজে পরাভূত করা যাইবে। এ ছাড়া নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের কথা তো আগেই বলিয়াছি। সচরাচর সংসারের কাজে যা কিছু লাগে সবই কিছু না কিছু ছিল। কিছু নোটের তাড়াও ছিল। এখন তাহার মূল্য না থাকিলেও পরে যদি দেশে ফিরিবার কখনও সুযোগ আসে তখন কাজে লাগিবে।

দুপুর বেলা আশীষ, ধ্রুব, রাজীব ও বাব্‌লু প্রচুর ঝিনুক কুড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। ঝিনুক কুড়াইতে গিয়া তারা ওদিকে অনেক পাহাড়ী কবুতর দেখিয়া আসিয়াছে।

তাহাদের কথা শুনিয়া সুশান্ত কহিল—"বেশ, একদিন গিয়ে দেখে আসা যাবে। এই সব পাহাড়ী কবুতরের ডিম খেতে মন্দ হবে না।" রঞ্জিৎ কহিল—"আর দু' চারটে কবুতর গুলি করে মারলেই হবে।" অশোক কহিল—"কিন্তু তাদের বাসা হতে ডিম আনা কি কষ্টকর ভেবে দেখেছ? পাহাড়ে উঠে উপর থেকে দড়ি ফেলে তাই ধরে নেমে পাহাড়ের ফাটল থেকে ডিম আন্‌তে হবে। এই সব পাখী ডিম পাড়ে পাহাড়ের মাঝ গায়ে।"

রঞ্জিৎ কহিল—"তা আমি জানি; আমি দড়ি নিয়ে ডিম আন্‌তে যাব; কুণাল, কমলাক্ষ, রোহিতাশ্ব, তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?"

সুশান্ত কহিল—"রঞ্জিৎ, বেশী গুলি নষ্ট কোরো না যেন; গোটা চারেক পাখী মার্‌লেই হবে।" এই সময় বুনো আসিয়া কহিল—"রান্না প্রস্তুত, তোমরা সবাই খাবে এস।" তখন অগত্যা পাখী মারার কথা ভুলিয়া সকলে খাইতে চলিল। জাহাজের ডেকের উপর বসিয়া সকলে পরমানন্দে সেই ঝিনুকের পোঁট্‌কা সিদ্ধ খাইল।

বিকালটা জাহাজের জিনিষপত্র ঠিক করিয়া গুছাইয়া রাখিতে কাটিয়া গেল। আশীষ, ধ্রুব, বাব্‌লু ও রাজীব ছিপ লইয়া নদীতে মাছ ধরিতে গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা বড় বড় তিনটা মাছ লইয়া জাহাজে ফিরিল ও সকলে সেই টাট্‌কা মাছ ভাজা পেট ভরিয়া খাইয়া বিছানায় শুইতে গেল। সেদিন শঙ্খচূড় ও রোহিতাশ্ব দুইজনে পালা করিয়া সমস্ত রাত পাহারা দিল। (ক্রমশঃ)

বজ্রদেবতার কাহিনী

[প্রবন্ধ]

শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী, বি.এ.

বর্ষাকালে আকাশ-যোড়া ঘন কালো মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকৃতি যখন মুখর হয়ে ওঠে আমরা বলি মেঘ ডাকছে! এই মেঘ যে ডাকে কেন তা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। তবে মোটামুটি এটুকু জেনে রাখ যে বিদ্যুৎবাহী একটা মেঘের সঙ্গে অন্য একটা মেঘের সংঘর্ষেই ঐ শব্দ জাগে। আর সময় সময় ঐ সংঘর্ষের ফলে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হবার সময়ে কিয়দংশ তার মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়; উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে এসে তার অগ্নিময় স্পর্শে সমস্ত জ্বালিয়ে খাক করে দেয়। এটাই হচ্ছে বজ্র বা চলতি কথায় যাকে আমরা বাজ বলি তাই।

এই বজ্র নিয়ে পৃথিবীর আদি যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত যে কত রকমের কিংবদন্তী ও উপকথার প্রচলন আছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই রামায়ণ মহাভারতের কাল থেকেই আমরা শিখেছি যে দেবরাজ ইন্দ্র হচ্ছেন এই বজ্রের অধীশ্বর; বজ্র তাঁর অস্ত্র, এরই সাহায্যে তিনি শত্রু বিনাশ করে থাকেন। গ্রীক্ পুরাণেও এই ধরণের অনেক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। এমন কি আজকালকার দিনেও আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত চাষাভূষোদের মধ্যে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে বজ্রটা হচ্ছে লাঙলের ফলার মত কঠিন ও ক্ষুরধার একটা ইস্পাতের তৈরী গজাল মাত্র। গাছে বজ্রপাত হ'লে সেই গাছের মধ্যে নাকি ঐ ধরণের একটা গজালের সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকার আদিম

অধিবাসীদের ধারণা—বজ্র হচ্ছে ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বোর্ণিওর লোকেরা ভাবে বজ্র হচ্ছে একমুঠো জ্বলন্ত আগুন। আদিম যুগ থেকে মানুষ এই ভাবে কল্পনা করে আসছে। আর এই কল্পনা ব'লে যে প্রবৃত্তিটা মানুষের মধ্যে আছে সেটাই যে জগতের ছোট বড় সমস্ত আবিষ্কারের মূলসূত্র এ কথা কে না জানে?

বজ্রদেবতা "রেডেন" ও তাঁর অনুচরদের নিয়ে বানানো অনেক প্রাচীন কাহিনী চীন ও জাপানে আজও প্রচলিত আছে। বজ্রদেবতা 'রেডেনে'র আকৃতি সম্বন্ধে বেশীর ভাগ গল্পেই বলা হয়েছে যে তাঁর গায়ের চামড়ার রং লাল, মুখাবয়ব অত্যন্ত বিশ্রী ও বীভৎস, পায়ের তালুতে শিম্পাঞ্জীর মত শক্তিশালী থাবা আর পিঠে এক প্রকাণ্ড ঢাক।

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে চীনের উত্তরভাগে সুবিস্তীর্ণ মঙ্গোলিয়া দেশের অধিবাসী দুর্দ্ধর্ষ মঙ্গোলরা যখন দুস্তর সমুদ্র ডিঙিয়ে জাপান আক্রমণ করবার উপক্রম করেছিল সেই সময়ে বজ্রদেবতা রেডেনই নাকি জাপানকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন প্রচণ্ড এক তুফান পাঠিয়ে। সেই তুফানে আক্রমণকারী মঙ্গোলদের রণতরীগুলি কোথায় ছারখার হয়ে গেল—শত্রুবাহিনীর মাত্র তিনটী প্রাণী ভিন্ন বেঁচে ফিরল না কেউ।

জাপানী চিত্রকরেরা আজও তাদের বজ্রদেবতার অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা নিয়ে নানা রকম ছবি আঁকে। এই ধরণের বহু জাপানী ছবিতে দেখা যায় যে বজ্রদেবতা তাঁর রামধনু রঙের বিচিত্রবর্ণ মেঘের সিংহাসনে বসে অভিযানকারী মঙ্গোলদের উপর বজ্রপাত ক'রে তাদের নিধন করছেন।

চীনের প্রাচীন কাহিনীগুলোতে তাদের বজ্রদেবতাকে সব সময়েই দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের সন্ধান করে ফিরতে দেখা যায়। আর যখন তিনি তেমন কারো সন্ধান পান বিদ্যুৎ দেবী তৎক্ষণাৎ তাঁর রূপালী আলোর এক ঝিলিক তুলে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত করে দেন, আর সেই আলোর সাহায্যে বজ্রদেবতাও নির্দ্দিষ্ট লোকের উপর লক্ষ্য স্থির ক'রে তাঁর নির্ম্মম বজ্রের আঘাতে তার প্রাণ সংহার করেন।

চীন-জাপানের পুরাণে এক-এক রকম বজ্রপ্রাণীরও উল্লেখ আছে। বজ্রপ্রাণী ও

বজ্রদেবতাকে নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী সে দেশে প্রচলিত আছে। সে গল্প আর একদিন বলা যাবে।

হরিবিলাস বাবুর উপাখ্যান

শ্রীসমর সরকার, এম্.এ., বি.টি., বি.এল্

আমাদের হরিবিলাস বাবুকে পাড়ায় চেনে না এমন লোক ক'জন আছে? যদিও এ পাড়ায় মাত্র মাস ছয়েক হ'ল তিনি ভাড়া এসেছেন কিন্তু তা হ'লেও তিনি এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পাড়াতে 'পপুলার' কিংবা 'আন্‌পপুলার' যা হ'ক্ কিছু একটা হয়েছেন, কারণ হরিবিলাস বাবুর নাম সকলেই জানে। মিশ কালো ভদ্রলোক, ওজনে হবেন সাড়ে তিন্ মণ, তিনি হাঁটবার আগে ভুঁড়িটি হাঁটে, আর কণ্ঠস্বর 'বজ্রাদপি কঠোর';—কখনও 'মৃদুনি কুসুমাদপি' ছিল কিনা জানি না। তিনি বিপত্নীক, কিন্তু পত্নী তাঁর জন্য সম্পত্তি কিছু কম রেখে যান নি—বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন আকারের গুটি আষ্টেক ছেলেমেয়ে তাঁর হাতে দিয়ে গেছেন। বাড়ীতে আছেন তাঁর এক বিধবা বোন, সুতরাং সংসারটা কোন রকমে গড়িয়ে-সড়িয়ে চলে যায়। পিসীমাকে সাহায্য করে হরিবিলাস বাবুর বড় মেয়ে—বয়স তার সতের-আঠার। মেয়েটির পরে দুটি ছেলে, তার পরে একটি মেয়ে, এইভাবে সবশুদ্ধ আটটি—বয়সের খুব তফাৎ নেই কারো মধ্যে।

হরিবিলাস বাবু লোকটি খুব হিসাবী, কখনও একটি পয়সা বাজে খরচ করেন না। বাড়ীতে তাঁর একটি রেডিও আছে দেখেছি (কি করে তার আগমন হ'ল জানি না) কিন্তু তিনি কখনো ছেলেদের রেডিও শুন্‌তে দেন না, চাবি লাগিয়ে রেখে দেন। বলেন—"বাঁ পাশে রেডিও, ডান পাশে রেডিও, সামনে রেডিও, পেছনে রেডিও, আবার নিজের বাড়ী রেডিও? হুঁঃ!"—গম্ভীর এক হুঙ্কার ছাড়েন তিনি—ছেলেমেয়েরা সসম্মানে সরে যায়। বাড়ীতে তিনি পরে থাকেন আট হাতি একখানা কাপড়। একে প্রমাণ দশ হাত কাপড়ই তাঁর ভুঁড়িতে সঙ্কুলান হয় না, তার ওপর আট হাত কাপড়! বাড়ীতে তাঁর মহাদেব আছেন, তিনি প্রতিদিন ভোরে মহাদেব পূজা করেন ও পূজার শেষে সুর ক'রে গীতাপাঠ করেন কিন্তু বড় বড় পূজাকে (যেগুলোর সার্ব্বজনীন পূজা হয়) তিনি ভয় করেন। বলেন—"বাব্বাঃ, সার্ব্বজনীন পূজার ঠেলায় অস্থির,—এখানে গলি, সেখানে

গলি, ওখানে পার্ক, আটচালা বাঁধো আর পূজো করো—আর লোকের দোরে দোরে চাঁদার খাতা নিয়ে লোকজনকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলো। আমাদের কালে ত' এত সার্ব্বজনীন পূজো ছিল নারে বাপু! তখন কি ভক্তি ছিল না? আর এখন কি একদম সবার মনে ভক্তি উথ্‌লে উঠ্‌ছে? যত্তো সব..."

বিজয়ার নমস্কারকে তাঁর ভীষণ ভয়। বিজয়ার নমস্কার নেওয়া অর্থে পয়সা জলে ফেলে দেওয়া। "এমন বাজে একটা রীতি হিন্দুসমাজে চলিত হয়ে গেছে—নমস্কার কর্‌লেই তাকে মিষ্টিমুখ করাতে হবে। আবে বাপু, মিষ্টিমুখ এমনি হয়? পয়সা লাগে না? রাজ্যির যে যেখানে আছে দলে দলে আস্‌বে নমস্কার কর্‌তে আর ব্যাগটি হয়ে যাবে খালি। তাও বাপু, বিজয়া দশমীর রাতে এসো, তবু বেশী লোক আসতে পার্‌বে না—তা নয়, নমস্কার কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর দিন পর্য্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। এ সব স্রেফ বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়।" হরিবিলাস বাবু এবার বিজয়ার নমস্কার এড়াবার জন্য এক ফন্দী আঁটলেন। বিশেষ করে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর রেজিমেণ্ট্‌কে তিনি দস্তুরমত সমীহ করে চলেন। পাঁচজন শ্যালক ও ছ'জন শ্যালিকা তাঁদের শাখা-প্রশাখা সমেত এক বিরাট ব্যাপার—তার চেয়ে পাড়াশুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করা ঢের ভালো।

সুতরাং হরিবিলাস বাবু স্থির কর্‌লেন এবার পূজায় বাইরে যাবেন। ছেলেমেয়েরা উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল—কখনও কল্‌কাতার বাইরে কোন জায়গার মুখ তারা দেখে নি। হরিবিলাস বাবু বল্‌লেন—"আরে তা' কেন, সত্যিই কি আমরা যাচ্ছি না কি,—লোককে জানিয়ে দেব যে আমরা যাচ্ছি।" তার পরেই তাঁর ঘোষণা—"দশমীর দিন সকাল থেকে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজো পর্য্যন্ত কেউ বাড়ী থেকে বেরোবে না—আর রাস্তার দিকে জানালা দরজাগুলো সব সময়ে বন্ধ থাক্‌বে। রাত্তিরে হবে 'ব্ল্যাক্ আউট্'—আলো জ্বালাবে কম—যেন রাস্তা থেকে একটুও আলো দেখা না যায়। মোট কথা, কেউ যেন বুঝ্‌তে না পারে যে আমরা বাড়ীতে আছি।"

বিজয়ার দিন দুপুর থেকেই হরিবিলাস বাবুর সদর দরজায় প্রকাণ্ড এক তালা ঝুল্‌তে দেখা গেল আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকের জানালা খড়্‌খড়ি ইত্যাদি বন্ধ হ'ল। পাড়ার সকলে একটু অবাক্ হ'ল—ভদ্রলোক হঠাৎ গেলেন কোথায়? কিন্তু সকলেই বিস্ময়ের চরম সীমায় এল যখন দেখা গেল যে হরিবিলাস বাবু বাড়ীতেই সশরীরে বিরাজ কর্‌ছেন এবং যাতায়াতের জন্য শুধু খিড়্‌কীর দরজা ব্যবহার করছেন। তবে কি হরিবিলাস বাবু কাবুলীওয়ালার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই ফন্দী করেছেন? কিন্তু তাদের ঐ অমূলক সন্দেহ দূর হ'ল যখন সকলে দেখলে দলে দলে ছেলেরা, যুবকেরা ইত্যাদি এসে হরিবিলাস বাবুর দরজায় তালা বন্ধ দেখে ফিরে যাচ্ছে। তখন সবাই তাঁর উর্ব্বর মস্তিষ্কের তারিফ্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

ছেলেমেয়েদের এদিকে একদিনেই জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে গেছে। তাদের যেন দম বন্ধ হ'য়ে

আস্‌ছে। একটা কিছু করবার জন্য সবাই ব্যস্ত। শেষে ঠিক হ'ল তারা থিয়েটার কর্‌বে। বড় ছেলে এই সবে কলেজে ঢুকেচে—তার একটু আধটু সাহিত্যিক হবার ঝোঁক আছে—সে একদিনের মধ্যেই পরিশ্রম করে নিজেদের উপযোগী একটা ছোটখাট নাটক লিখে ফেল্‌লে। তাতে প্রত্যেক ভাইবোনই উপযুক্ত পার্ট্‌ পেলে। তার পর চল্‌ল তাদের রিহার্সাল। হরিবিলাস বাবু তাঁর ঘরে বিছানায় অর্দ্ধশয়ান হয়ে বড় ছেলের যোগাড় ক'রে আনা একখানা গত বৎসরের পুরোনো 'আনন্দবাজার' বার্ষিকীর পাতা উল্টোন। ছেলেদের আমোদে তিনি বাধা দেন না; আহা, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত'। তবে তাদের কণ্ঠস্বর বাইরে থেকে শুন্‌তে পাওয়ার মত পর্দ্দায় চড়্‌লে তিনি দু' একটা ধমক দেন।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার আর একদিন বাকী আছে। হরিবিলাস বাবু তাঁর 'স্কিম্‌' প্রায় সফল ক'রে এনেছেন বলে বেশ গর্ব্ব অনুভব কর্‌ছেন, এখন কোন রকমে সেদিনটা কাটাতে পার্‌লেই বাজীমাৎ হ'য়ে যায়। ইতিমধ্যে ঘট্‌ল এক অঘটন।

অঘটনটা ঘট্‌ল ছেলেদের রিহার্সাল থেকে। নাটকের মধ্যে এক জায়গায় আছে—"রাজকুমারী চম্পা দৈত্যের প্রাসাদে বন্দিনী—রাজকুমারী জানে দৈত্যের জীবন কোথায় কোন্‌ গভীর হ্রদের জলের তলায় সোনার কৌটার মধ্যে ভ্রমর হ'য়ে রয়েছে। দৈত্য চায় তারই সন্ধান—সে সেই কৌটা হস্তগত ক'রে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখ্‌বে যাতে কেউ না তার সন্ধান পায় আর দৈত্য হ'য়ে উঠ্‌তে পারে অমর। রাজকুমারী তার সন্ধান বল্‌বে না—তাই চলে তার ওপর নির্ম্মম অত্যাচার। তার পরে সাদা পক্ষিরাজে চেপে আস্‌বে রাজকুমার, দৈত্যের কবল থেকে উদ্ধার কর্‌বে রাজকুমারীকে।" এই দৃশ্যটা লেখা হয়েছে অসম্ভব রকম ভালো—নাট্যকার নিজেই ভাব্‌তে পারে নি যে এমন লেখা তার সেই কবেকার পুরোনো কলমের ভোঁতা নিব দিয়ে কোন দিন বেরোতে পারে। এইখানেই নাটকের, ইংরেজীতে যাকে বলে, "ক্লাইম্যাক্স"! জোর রিহার্সাল চলে এই দৃশ্যের—এরই উপর নাটকের সাফল্য নির্ভর কর্‌ছে। হরিবিলাস বাবুর সেজ মেয়ে নন্দরাণী ওরফে খেঁদি রাজকুমারী চম্পার ভূমিকায় নেমেছে। সত্যিই সে পার্ট্‌ করে ভালো। সেদিনও বিকালের দিকে চলেছে রিহার্সাল। রাজকুমারী চম্পা ওরফে খেঁদি করুণস্বরে আকুল হয়ে দৈত্যের কাছে আবেদন কর্‌ছে—"উঃ, আর মেরো না, আমায় ছেড়ে দাও— ছেড়ে দাও—উঃ, উঃ···" দৈত্য তবু তার উৎপীড়ন কমায় না। রাজকুমারী চেঁচিয়ে ওঠে একটু সাহায্যের আশায়—"কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, আমায় বাঁচাও···উঃ, আর যে সইতে পার্‌ছি না—আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও···" এর পরই রাজকুমারী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে।

এমনি সময়ে তার আর্ত্তস্বর বাতাসের ডানায় চেপে পাড়ার রাজপুত্রদের কানে গিয়ে পৌঁছায়—দলে দলে পাড়ার লোকে—ছেলে থেকে বুড়োরা পর্য্যন্ত ছুটে আসেন—হরিবিলাস বাবুর

দরজায় এসে ধাক্কা মারেন। হরিবিলাস বাবু ভীত হ'য়ে দোতালার খড়খড়ি তুলে দেখেন নীচের ক্ষিপ্ত জনতার ক্রমেই কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে ও কয়েকজন চেঁচাচ্ছে—"কি, দরজা বন্ধ ক'রে মেয়েকে মারা—এমন চামারও দেখি নি! ছিঃ, ভদ্রলোকের পাড়ায় এসে···"

হরিবিলাস বাবু ঠিক বুঝ্‌তে পারেন না প্রথমে ব্যাপার কি, শেষে বুঝ্‌তে পেরে তিনি নীচে নেমে আসেন জনতাকে শান্ত কর্‌বার জন্য। কিন্তু জনতা একবার ক্ষেপলে তাকে শান্ত করা বড় কঠিন। একজন ছোক্‌রা বল্‌লে—"যান্‌ যান্‌ মশাই, আপনার মত ভদ্রলোক ঢের দেখেছি। বাড়ীতে বসে দরজা-জানালা বন্ধ করে মেয়েকে মারা···আপনার শাস্তি পুলিশ।" আর একজন বল্‌লে—"আমাদের তখনই সন্দেহ হয়েছিল এমন করার মানে কি! এখন গুণকীর্ত্তন সব বেরিয়ে পড়্‌ল।" গোলমালে পথচারী এক লালপাগড়ী হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে জনতার মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌তে সচেষ্ট হ'ল। হরিবিলাস বাবু ভাব্‌লেন এমন বিপদেও মানুষে পড়ে—কেউ তাঁকে বিশ্বাস পর্য্যন্ত কর্‌তে চায় না! তিনি তখন পাড়ার একজন গণ্যমান্যস্থানীয় প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বুঝিয়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা মশাই, আমি ডাক্‌ছি আমার ছেলেমেয়েদের, আপনিই না হয় তাদের জিজ্ঞাসা করুন।" তিনি তখন একে একে তাঁর রেজিমেণ্টের প্রত্যেকটি মেম্বারকে ভোঁদা, গোবরা, খেঁদি, ঘেঁাতা, ক্যাবলা, নেড়ী ইত্যাদি হরেক রকম নাম ধরে ডাকতে সুরু কর্‌লেন। তারা তখন তাদের কৃত কর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কে কোথায় সরে পড়েছে। অনেক ডাকাডাকি করার পর কয়েকজন হাজির হ'ল। ব্যাপার তখন ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে—জনতা লজ্জায় পাৎলা হ'য়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে দু'খানি ট্যাক্সি হরিবিলাস বাবুর বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল—আর তাই থেকে জলপ্রবাহের মত নেমে এল তাঁর শ্বশুরবাড়ীর লোক। হরিবিলাস বাবুর চক্ষুস্থির—এক বিপদ্‌ কাট্‌তে না কাট্‌তেই আর এক বিপদ্‌! এ বিপদ্‌ থেকে আর উদ্ধার নেই। সকালে উঠে তিনি যার মুখ দেখেছিলেন মনে মনে তাকে সশরীরে নরকে পাঠালেন। তাঁর মেজ ভায়রা ভাই হাসিমুখে এগিয়ে এসে বল্‌লেন—"এই যে দাদা, তা হ'লে ফিরেছেন—আমাদের সৌভাগ্য। সেদিন নিতাই এসেছিল, বল্‌লে আপনার বাড়ীতে তালা লাগানো। তা' কোথায় গিয়েছিলেন পূজোয়—আমরা খবরই পাই নি?" হরিবিলাস বাবু তাঁদের সৌভাগ্যকে মনে মনে অভিসম্পাত করে মুখে কাষ্ঠহাসি টেনে এনে অভ্যর্থনা কর্‌লেন—"আরে এসো এসো, ভাব্‌ছিলুম তোমাদের খবর পাঠাবো যে আমরা ফিরে এসেছি।" ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে হরিবিলাস বাবুর পায়ের কাছে প্রণাম পড়তে লাগল—এক-দুই-চার-ছয়-দশ—উঃ গোণা যায় না! হরিবিলাস বাবু তখন জল্‌ছেন। ভাব্‌ছেন—"বিজয়ার প্রণাম! গুষ্ঠিশুদ্ধ নিয়ে বিজয়ার প্রণাম!"

ছোট শ্যালিকা বল্‌লেন—"বউদিরা, যারা আস্‌তে পারে নি, সন্ধ্যাবেলা আস্‌বে। আপনাকে বাড়ীতে থাকতে বলেছে।"

হরিবিলাস বাবুর গা জল হ'য়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তে হরিবিলাস বাবু ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন পরের বছর সত্যিই বাইরে যাবেন—এত লোককে আপ্যায়িত করতে যা খরচ পড়্‌বে তাতে সপরিবারে অনায়াসে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ঘুরে আসা যাবে।

নানা প্রসঙ্গ

ট্যাঙ্কের কথা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

খবরের কাগজে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর কথা তোমরা হামেশাই পড়—কারণ আজকালকার স্থলযুদ্ধে ট্যাঙ্ক-বাহিনী একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলা যাইতে পারে। ট্যাঙ্কের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও ট্যাঙ্কের ছবি তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই খুব পরিচিত।

ট্যাঙ্ককে এক কথায় একটি ছোটখাট চলন্ত লোহার দুর্গ বলা যাইতে পারে। যেমন শক্ত ইস্পাতের বর্ম্মে আঁটা তার দেহ, তেমনি কামান, গোলা প্রভৃতি অস্ত্রে-শস্ত্রেও সেগুলি সজ্জিত। গতিবেগও ইহাদের নেহাৎ কম নয়, আর সব চেয়ে সুবিধা—এই অদ্ভুত চলন্ত দুর্গ চালাইবার জন্য পথঘাটের দরকার করে না,—বন-জঙ্গল, মাঠ, উঁচু-নীচু অসমতল জমি সবেরই উপর দিয়া ইহারা অনায়াসে গড়াইয়া চলিতে পারে। এ দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানে ট্যাঙ্ককে একটা অভাবনীয় ব্যাপার বলা চলে।

গত ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধেই ট্যাঙ্কের আবিষ্কার হইয়াছিল, এবং সেবারকার যুদ্ধে ট্যাঙ্কের ব্যবহারও কম হয় নাই। কিন্তু তার পর ট্যাঙ্কের নানা দিক্ দিয়া

আরও নানা রকম উন্নতি হইয়াছে। তখনকার ট্যাঙ্ক চলিত ঘণ্টায় বড় জোর ৮।১০ মাইল, এখনকার অনেক ট্যাঙ্ক ঘণ্টায় ৩০ মাইলেরও বেশী ছুটিতে পারে। তখনকার দিনে ট্যাঙ্কে একবার তেল পূরিলে ১২।১৪ মাইল গিয়াই সে তেল যাইত ফুরাইয়া, আবার তেল না ভরিলে ট্যাঙ্ক অচল। কিন্তু আজকালকার ট্যাঙ্কে একবার তেল ভরিয়া এক সঙ্গে ১৫০ মাইল রাস্তা পার হইয়া যাওয়া যায়। তখনকার ট্যাঙ্কে আধ ইঞ্চি পুরু লোহার বর্ম্ম আঁটিয়াই তাকে খুব দুর্ভেদ্য করা হইল বলিয়া মনে করা হইত, কিন্তু এখনকার প্রায় ট্যাঙ্কই দেড় কি দুই ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতে মোড়া থাকে। ওজন, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রসজ্জা—এ সব দিয়াও এখনকার ট্যাঙ্কে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে খুব ভারী ট্যাঙ্কগুলির চেয়ে হাল্কা এবং মাঝারি আকারের ট্যাঙ্কগুলিই যেন বেশী সুবিধাজনক। ভারী ট্যাঙ্ক মজবুত হইলেও তাদের বিশাল বপুর দরুণ চলে আস্তে আস্তে, শত্রুপক্ষের নজর এড়ানও তাদের পক্ষে একটু কষ্টকর। এগুলি ওজনে ৬০।৭০ টন (এক টন _ প্রায় ২৮ মণ) পর্য্যন্ত হয়। হাল্কা ট্যাঙ্কগুলি ৭।৮ টন্‌ও হয়। কিছুদিন আগে জার্ম্মান্‌রা ৪ টন্ ওজনের ট্যাঙ্কও তৈরী করিয়াছিল কিন্তু সেগুলি নাকি তেমন কার্য্যকরী হয় নাই।

ট্যাঙ্ক এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়া কি করিয়া অত জোরে চলে ভাবিয়া হয়তো আশ্চর্য্য হইতেছ? ট্যাঙ্কের চাকায় পরান থাকে এক রকম খাঁজ-কাটা লোহার বেল্ট্—ইংরাজীতে উহাকে বলে "ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর্" দেখিতে অনেকটা শুঁয়োপোকার মত কিনা, তাই ঐ নাম। ইহারই সাহায্যে মাটী কামড়াইয়া কামড়াইয়া ট্যাঙ্ক চলে, তাই অসমান পথঘাটের দরুণ তাদের বেগ পাইতে হয় না। শুধু অসমান পথ নয় ঢালু পাহাড়ের (এমন কি ৪০ ডিগ্রী কোণ পর্য্যন্ত) গা বাহিয়াও ট্যাঙ্ক দিব্যি চলে এবং কোন কোনটা ১০।১৫।২০ ফুট চওড়া খালও লাফাইয়া পার হইয়া যাইতে পারে। লাফাইয়া খাল পার হইবার পূর্ব্বে ট্যাঙ্ককে খুব জোরে চালাইয়া দেওয়া হয়, তার পর খালের মুখে আসিলেই হঠাৎ এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, ট্যাঙ্ক পবন-নন্দনের মত এক লম্ফে খাল পার হইয়া আসে। ট্যাঙ্কগুলি এমন

শক্ত ভাবে এবং এমন কায়দায় তৈরী যে এই লাফ-ঝাঁপে তাদের কলকব্জার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না।

আজকালকার স্থলযুদ্ধে শত্রুঘাঁটী আক্রমণের জন্য ট্যাঙ্ক-বাহিনী বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য ট্যাঙ্কের ভিতর কামান, মেশিন গান্, গোলা-বারুদ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন ট্যাঙ্কে ৮ জন পর্য্যন্ত লোক বসিবার জায়গা থাকে—চালক, গোলন্দাজ, বেতার-কর্ম্মচারী ইত্যাদি। আক্রমণের সময় সাধারণতঃ একদল ট্যাঙ্ক রাখা হয় আগে—শুধু আক্রমণের জন্য, তার পিছনে আর এক দল, ইহারা ধোঁয়া ছড়াইয়া পিছনের সৈন্য-বাহিনীকে আড়াল করিয়া চলে।

ট্যাঙ্ক দিয়া যেমন আক্রমণ চলে তেমনি ট্যাঙ্ককে জব্দ করার নানা কৌশলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ট্যাঙ্ক যে পথে আসিতে পারে সেই পথে কংক্রিট্ দিয়া তৈরী পিরামিডের আকারে ছোট ছোট অসংখ্য স্তম্ভ সার বাঁধিয়া বসাইয়া রাখা হয়—সেগুলি এড়াইয়া সহজে ট্যাঙ্কের পথ চলা সম্ভব নয়। তার পর থাকে লোহার বেড়া, কাঁটা-তারের জাল। এই জালগুলি এমন ভাবে ট্যাঙ্কের চাকায় জড়াইয়া যায় যে তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য। তা ছাড়া ট্যাঙ্ক জব্দ করিবার আর এক রকম ফাঁদের আবিষ্কার হইয়াছে। ট্যাঙ্কের চলার পথে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেগুলি ডালপালা দিয়া এমন করিয়া ঢাকিয়া রাখা হয় যে বাহির হইতে দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু একবার যদি ট্যাঙ্ক তার উপর গিয়া হাজির হইল তবে আর রক্ষা নাই, হুড়মুড় করিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে তাকে গিয়া পড়িতে হইবে—সেখান হইতে তাকে টানিয়া তোলা সহজ নয়। এ ছাড়া জলে যেমন জাহাজ ঘায়েল করিবার জন্য মাইন পাতা হয়, ট্যাঙ্ক ঘায়েল করিবার জন্য তেমনি ধারা স্থলের মাইন পাতারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আর বিশেষ ভাবে তৈরী ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান-বন্দুক তো আছেই।

ট্যাঙ্কের নামকরণ কি ভাবে হইল সে সম্বন্ধে একটা মজার গল্প শোনা যায়। গত মহাযুদ্ধে যখন ইংরাজরা ট্যাঙ্ক তৈরী করিয়া ফ্রান্সে চালান দিত তখন পাছে শত্রুপক্ষের কোন গুপ্তচর উহা টের পায় সেজন্য নাকি প্যাকিং বাক্সের উপর লিখিয়া দিত—"রাশিয়ার জন্য ট্যাঙ্ক।" সাধারণ ট্যাঙ্ক বলিতে কি বুঝায় তোমরা নিশ্চয়ই

জান। আসলে শত্রুদের ঠকাইবার জন্যই ঐরূপ করা হইত, কিন্তু ঐ হইতেই নাকি শেষ পর্য্যন্ত এই চলন্ত দুর্গগুলির নামও হইয়া দাঁড়াইল 'ট্যাঙ্ক'।

পঁচিশে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ বাঙ্গালীর বড় আদরের দিন। আজ থেকে আশী বছর আগে এই দিনটিতে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এবারে এই দিনটিতে তাঁর বয়স আশী বছর পূর্ণ হ'ল। তোমরা প্রার্থনা ক'র কবি যেন দীর্ঘায়ু হ'ন। তাঁর অমর লেখনীর নিত্য-নূতন সুধাস্রোত থেকে আমরা, গৌড়জনেরা, যেন বঞ্চিত না হই।

কবির বয়স আশী বছর পূর্ণ হওয়ায় ভারতের নানা জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। তোমরা শুনে সুখী হবে, বাংলার ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকেও 'কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্র-জয়ন্তী' নাম দিয়ে এই রকম একটি জয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা হচ্ছে—মে মাসের শেষ সপ্তাহে। এর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যিনি রাজার মত সম্মান পেয়ে এসেছেন, ছোটদের এ অভিনন্দন তাঁর কাছে সামান্য হ'লেও আমরা জানি, চিরকিশোর রবীন্দ্রনাথ স্নেহের চোখেই একে গ্রহণ করবেন।

বাংলার বিভিন্ন শিশুপত্রিকা ও শিশুসাহিত্যিকরা একত্র হয়ে এই উৎসবের ভার নিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে 'রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা' নিয়ে লেখা একটি নাটক অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে, এর ভূমিকায় ছেলেদের সঙ্গে কয়েকজন নাম-করা শিশুসাহিত্যিকও নামতে রাজী হয়েছেন এবং অভিনয়টি বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। রামধনুর পাঠকপাঠিকারাও এই উৎসবে যোগ দেবে আশা করি। অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হবে। তোমাদের

সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। যারা যোগ দিতে ইচ্ছুক তারা "শ্রীবিমল ঘোষ, সম্পাদক, কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্র-জয়ন্তী, ভারতী সাহিত্য সভা, ৮৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা" এই ঠিকানায় লিখ।

এ সংখ্যার মুখপত্রে কবির একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। আগামী বারে তাঁর সম্বন্ধে গল্প শোনাবার ব্যবস্থা করা যাবে।

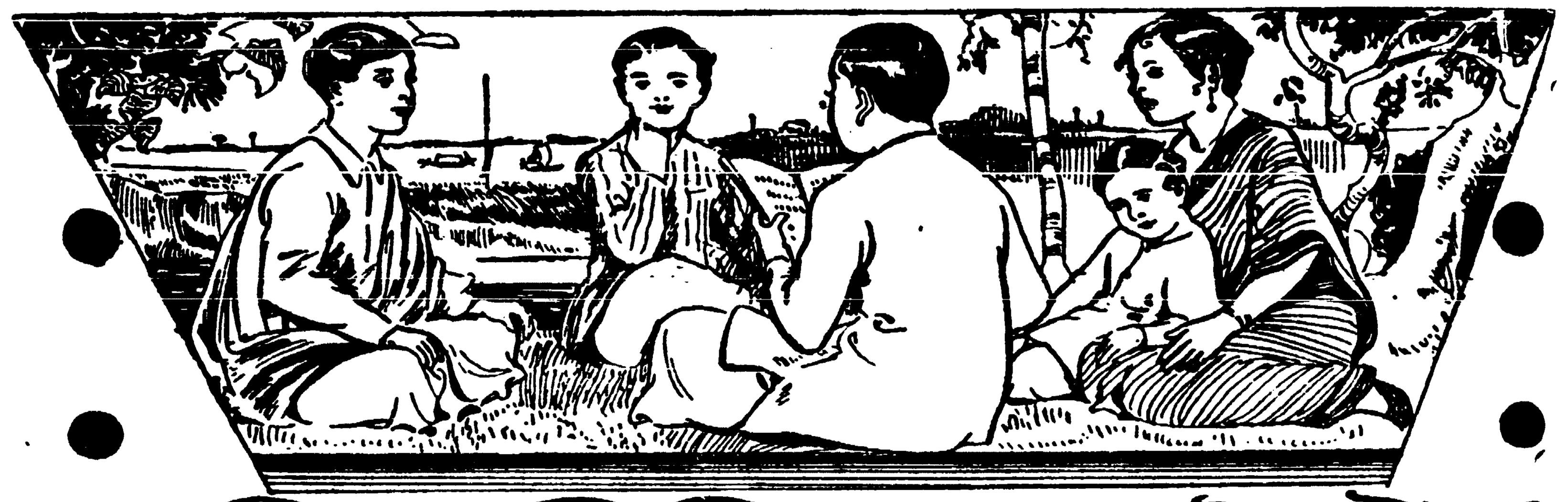

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

তূলো

শ্রীঅজানা গুহ (বাবুই)

তূলো উড়ে যায়
ফুরফুরে বায়—
কোথা উড়ে যায় তারা?

চাঁদের মা বুড়ী
বুড়ী থুরথুরি
তূলো কেটে হ'ল সারা!

আকাশের তূলো
ঘুমে ঢুলো ঢুলো
অলসেতে যায় উড়ে,

বাতাসের তূলো
হ'ল পথভুলো
তারি পিছে ঘুরে ঘুরে।

একটি তাসের ম্যাজিক

শ্রীপুণ্যব্রত ঘোষ

রামধনুর ভাইবোনেরা, আজ তোমাদের একটা তাসের খেলা শিখিয়ে দেব। আজকালকার প্রায় ম্যাজিসিয়ান্‌ই আগে তাসের খেলা দেখিয়ে থাকেন। তাসের খেলা একেবারে পুরোনো হয়ে গেছে, এটা ঠিক। কিন্তু এমন এক একটা খেলা আছে যা দেখলে সত্যিই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। ৫২টা তাসে ৫২ রকম খেলা দেখান যায়, ভাবতে পার? তার মধ্যে অনেকগুলি দেখাবার আগে তাসগুলিকে বিশেষ ভাবে তৈরী করে রাখতে হয়। আবার অনেকগুলি যখন তখন যেখানে সেখানে দেখান যায়, কিন্তু তাতে প্রচুর চতুরতার ও নিপুণতার দরকার হয়। তবে আমি যে খেলাটার কথা বলতে চাই সেটা অতি সহজ। চতুরতার ও নিপুণতার কোনটারই বিশেষ দরকার হয় না।

এ খেলায় চারটে তাসের দরকার হবে। তোমরা সবাই তাস চেন তো? যদি না চেন তবে কাউকে জিজ্ঞেস করে নিও।

ইস্কাবন রঙ্গের টেক্কা, সাহেব, বিবি আর গোলাম এই চারটে তাস নাও। শেষের তিনখানা তাসের এক কোণার দিকে ফোঁটা ধারাল ব্লেড, ছুরি অথবা শিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে উঠিয়ে ফেলে একখানাতে রুহিতনের, একখানাতে হরতনের আর একখানাতে চিরেতনের ফোঁটা আঠা দিয়ে যুড়ে দাও। তার পর খেলাটা দেখাবার সময় একটু সাবধান থাকবে।

টেক্কাটা সামনের দিকে সব তাসের ওপর রেখে নীচের ফোঁটাগুলো ঢেকে তাসগুলো দর্শকদের দেখাবে। সবাই দেখবে চারখানাই এক রংএর তাস। কেউ ভুলেও সন্দেহ করতে পারবে না (অবশ্য খেলাটা না জানলে) যে তুমি যেখানে তাসগুলোকে চেপে ধরেছ সেখানে অন্যান্য রংএর ফোঁটা আছে।

এবার তুমি তাসগুলো দিয়ে কি করতে চাও এই নিয়ে কিছু কথাবার্ত্তার পর তাসগুলোকে একসাথে করে ঘুরিয়ে নাও। কথাবার্ত্তার ফাঁকে কৌশলে ঘুরিয়ে নিতে হবে। তা হ'লেই বুঝতে পারছ নীচের ফোঁটাগুলো ওপরের দিকে চলে গেল।

এখন ঠিক আগের মত নীচের কোঁটাগুলো চেপে ধরে চারটে তাস পর পর দেখাও। সবাই দেখবে চার রংএর চারটে তাস।

বিচার-সভা

[এই বিভাগে গ্রাহকদের দেওয়া প্রশ্ন ও তাদেরই দেওয়া উত্তর প্রকাশিত হয়। মতামতের জন্য কিন্তু সম্পাদক দায়ী ন'ন।]

বৈশাখের প্রশ্নের উত্তর

যত দূর জানা যায়, পূর্ব্বে ১লা এপ্রিল হ'তে বছর গোণা হ'ত। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা চার্ল্‌স ১৫৬৪ সালে ঘোষণা করলেন, ১লা জানুয়ারী থেকে বছর গোণা হ'বে। এতে দেশের লোক সবাই খাপ্পা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু পরে যখন তারা শুন্‌ল, রাজাকে ১লা এপ্রিলে যে ভেট দেওয়া হ'ত তাও তিনি এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছেন তখন তারা খুব খুসী হ'ল এবং নিজেদের বোকামির জন্য লজ্জিত হ'ল। সেই জন্যই বোধ হয় ১লা এপ্রিলকে বলা হয় 'বোকাদের দিন', এবং ঐ দিনে লোকে বুদ্ধিমান্ লোককেও ঠকিয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করে।

শ্রীরণজিৎকুমার বসু এবং শ্রীরেণুকা দত্ত
(এঁরা পৃথক্ ভাবে একই উত্তর পাঠিয়েছেন)

এপ্রিল সম্ভবতঃ ল্যাটিন কথা 'এপরায়ার' (APERIRE) হইতে নেওয়া। এপরায়ার অর্থাৎ 'খোলা', কারণ ফুলের কুঁড়ি এই সময়েই ফোটে। 'এঙ্গলো-সেক্সনরা' ইহাকে ইষ্টারের মাস বলে। 'এপ্রেল ফুল্‌স্ ডে' মানিয়া চলার অদ্ভুত রীতি সারা ইউরোপে প্রচলিত। ইংল্যাণ্ড বা জার্ম্মানী অপেক্ষা ফ্রান্সে ইহা বহু পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। এর একটি ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ এই :—

মধ্য শতাব্দীতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের ইতিহাস হইতে প্রায়ই সৎ উদ্দেশ্যে শুধু আমোদের জন্য নানা দৃশ্যের বর্ণনা করা হইত। যীশুর জীবনীর একটি দৃশ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহাকে এপ্রিল মাসে পিলেটের (Pilate) নিকট হইতে পাঠান হয় এবং দেখা যায় যে তখন হইতেই মিছামিছি কৌশল করিয়া খবর পাঠাইয়া আনন্দ উপভোগ করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। মিছামিছি খবর পাঠানর জন্য জার্ম্মানীতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই—'পিলেটের নিকট হইতে হেরোডের নিকট লোক পাঠান।' পয়লা এপ্রিলে এই দৃশ্য প্রদর্শিত হইবার কারণ এই যে, ইষ্টারের উৎসব প্রায়ই এই মাসে পড়ে।

পয়লা এপ্রিলের এই সব কৌশল রোমান্‌দের নিকট হইতে পাওয়াও অসম্ভব নয়। হয়ত অন্যান্য রীতির ন্যায় এটিও বিজয়ীদের কল্যাণে সারা ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দুরাও হোলীর উৎসবে সময় সময় এইরূপ কৌশল ইত্যাদি অভ্যাস করে।

ফ্রান্সে যে দুর্ভাগ্য দলকে বোকা বানান হইবে তাদের 'উপেসোঁ ডি এভরিল' বলা হইত অর্থাৎ 'একটি এপ্রিলের মাছ'। স্কটল্যাণ্ডে ইহাকে 'গোক' (Gowk) বলে। উহার অর্থ (স্কচ্ ভাষায়) একটি কোকিল ও একটি বোকা।

—কুমারী দুর্গা মুখার্জ্জি

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বিচিত্র দেশ—শ্রীবিনয় দত্ত প্রণীত। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ। দাম ॥৵০।

পৃথিবীর নানা বিচিত্র দেশ ও তাদের বিচিত্র অধিবাসীদের কাহিনী। গল্পের মত সরস অথচ পড়লে কত কথাই না জানা যায়! লেখকের ঝরঝরে ভাষা ও সুন্দর বর্ণনাভঙ্গী বইখানাকে আরও সরস করেছে। অসংখ্য ছবি দিয়ে বইখানিকে বেশ লোভনীয়ও করা হয়েছে। শিশু-সাহিত্যে এ বইএর বিশেষ মূল্য আছে।

হালখাতা—শ্রীঅসীম দত্ত ও শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত। আলো সাহিত্য সংঘ। ১৲

ছোটদের বার্ষিকী। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে ৬৪ জন লেখকের (এঁদের অধিকাংশই বাংলা সাহিত্যের নাম-করা লেখক) নানা বৈচিত্র্যময় লেখা নিয়ে এই বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট কবিতাটি অনবদ্য। তার আরম্ভটা এই রকম—

"আমি অতি পুরাতন, এ খাতা হালের, হিসাব রাখিতে চাহে নূতন কালের।
তবুও ভরসা পাই আছে কোন গুণ, ভিতরে নবীন থাকে অমর ফাগুন।" ইত্যাদি।

অন্যান্য লেখাগুলোরও বেশীর ভাগই সুন্দর। ছেলেমহলে এ বইএর আদর হবেই।

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারে একটি ফটো-প্রতিযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম পুরস্কার "অতনু স্মৃতিপদক" নামে একটি রৌপ্য পদক। এই পদক দেবেন শ্রীমতী গীতা সেন, তাঁর ছোট ভাই ৺অতনুকুমারের স্মৃতিরক্ষার জন্য। প্রতিযোগিতার বিষয় :—একটি ছোট ছেলে কিংবা মেয়ের ফটো তুলে পাঠাতে হবে। ফটো ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। প্রত্যেক ফটোর পিছন দিকে প্রেরকের নাম ও নিজের গ্রাহক নং দিয়ে দিতে হবে। কেবল মাত্র রামধনুর গ্রাহক-গ্রাহিকারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন, এবং আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। ফটো ফেরৎ নিতে হ'লে সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকেট থাকা চাই।

৺অতনুকুমার

চৈত্রের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

যাঁদের বয়স ১৫র উপরে তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন—শ্রীশচীতুলাল সেন (বেনারস)।
যাঁদের বয়স ১৫র নীচে তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন—শ্রীশ্রীলেখা দেবী (কলিকাতা)।

এবারকার প্রতিযোগিতায় অনেকের লেখাই বেশ ভাল হয়েছে। যে সব খাদ্য "সর্ব্বপ্রিয়" বলে উল্লিখিত হয়েছে তার কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া গেল :—রসগোল্লা (এটির উপরই ভোট এসেছে বেশী), রাজভোগ, জিলিপি, বুঁদে, আম, কলা, তরমুজ, চপ্, কাটলেট্, ডিম ভাজা, কচুরী, সিঙ্গাড়া, কেক্, স্যাণ্ডউইচ্, চকোলেট্, রাবড়ী, খিচুড়ী, ভাত, দুধ, চা, সরবৎ, আইস্ক্রীম, ডালমুঠ্‌, চীনে বাদাম, আলু ভাজা, ইলিশ মাছ, জল, নুন, হাওয়া, সুপারী, ভাজা মশলা, মায়ের চুমা ইত্যাদি। সন্দেশের নাম কিন্তু কেউ উল্লেখ করেন নি।

কলকাতার হকি সীজন্ শেষ হ'ল। হকিতে বড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে বেইটন্ কাপ্ প্রতিযোগিতা। এবার এ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে গিয়েছিল ভগবন্ত ক্লাব্ ও ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স্ দল। অতিরিক্ত সময় খেলেও শেষ পর্য্যন্ত কোন দল অপরকে পরাজিত করতে না পারায় নতুন নিয়মানুযায়ী ঠিক হয়েছে যে দু' দলকেই বিজয়ী বলে ধরা হবে এবং কাপ্‌টি উভয় দলের কাছেই ৬ মাস করে থাকবে। গত বারেও এই দুই দল ফাইনালে গিয়েছিল, জয়ী হয়েছিল ভূপাল দল। সেমিফাইনালে ভূপাল দল বি. এন্. আরকে ১ গোলে পরাজিত করে। অপর দিকে ভগবন্ত ক্লাবের সঙ্গে খেলা হয় দিল্লী ইয়ংস্ ক্লাবের। প্রথমে দিল্লী দলই ৩ গোলে জয়লাভ করে, কিন্তু তাদের দলের ২ জন খেলোয়াড় ইতিপূর্ব্বে অন্য দলের হয়ে আগা খাঁ কাপে খেলায়, ভগবন্ত দলের অভিযোগে নতুন করে খেলা হয়। এই খেলার ফল হয় উল্টো—ভগবন্ত দলই ৩ গোলে জয়লাভ করে।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ্ ফাইনালে লক্ষ্নৌ বি. ওয়াই দল দিল্লী ইয়ংস্ দলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

ইতিমধ্যে মহামেডান্ স্পোর্টিং দিল্লীতে গিয়ে ডি. এফ্.এ শীল্ড (ফুটবলে) নিয়ে এসেছে। এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে তারা দিল্লী ইউনিয়ন্ (সেখানকার লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্) দলকে ৩ গোলে হারিয়েছে। কলকাতায় ফুটবল লীগ্ সুরু হয়েছে।

সম্প্রতি ওরগন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লেস ষ্টীট হাই জাম্পে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন—৬ ফুট ১০$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লাফিয়ে। এর আগের রেকর্ড ছিল ৬ ফুট ৯$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি,—১৯৩৬ সনে কর্ণেলিয়াস্ জনসন্ ও ডেভ ব্রিটন করেছিলেন।

* * *

কলকাতার নতুন মেয়র নির্ব্বাচিত হয়েছেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম (কংগ্রেসের দলের)। ইনি গত বছর ডেপুটি মেয়র ছিলেন। ১৯২৭ সনে ইনি কর্পোরেশনে কাউন্সিলার হিসাবে যোগ দেন; এঁর অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার গুণে সহরের নানা উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। ডেপুটি মেয়র হয়েছেন মিঃ ইস্পাহানী (মুসলিম লীগ্ দলের)।

* * *

গত বারে যে যুদ্ধের খবর দিয়েছিলাম তার পরে অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে—খবরের কাগজ মারফৎ তা তোমাদের নিশ্চয়ই অজানা নেই। যুগোশ্লাভিয়া জার্ম্মান্দের হাতে গেছে, তার পর গেছে গ্রীস্। যুগোশ্লাভিয়ার রাজা পিটার এবং গ্রীসের রাজা জর্জ্জ অবশ্য আত্মসমর্পণ করেন নি। গ্রীক্ গভর্ণমেণ্ট ক্রীট্ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। এথেন্সে জেনারেল সোলাকিগ্লুর কর্ত্তৃত্বে একটা জার্ম্মান্ তাঁবেদারী গভর্ণমেণ্ট খাড়া করা হয়েছে।

জার্ম্মান্ সৈন্য এখন মিশর সীমান্তে এসে হানা দিয়েছে। আফ্রিকায় ইংরেজদের সঙ্গে তাদের লড়াই চলেছে। গ্রীস্ থেকে ইংরেজদের সৈন্য সরিয়ে এখানে আনা হয়েছে। ওদিকে আবিসিনিয়ায় ইটালীয় আধিপত্য যেতে বসেছে। ভূতপূর্ব্ব হাবসী সম্রাট্ হাইলে সেলাসি আবার নিজের রাজধানী আদ্দিস আবাবায় প্রবেশ করেছেন। তিনি তাঁর সাধ্যমত ইংরেজের সাহায্য করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

সম্রাট্ হাইলে সেলাসি

ওদিকে ইরাকীদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ বেধেছে। ইরাকের ভিতর দিয়ে ইংরেজ সৈন্য নেওয়া নিয়ে মতবিরোধের ফলে ইরাকের রসিদ আলি জার্ম্মান্দের সাহায্য চেয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করেছে, ইংরেজরাও প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। ইরাকের সঙ্গে তাদের এত দিন বেশ সদ্ভাবই ছিল। রসিদ আলি ইরাকের ভূতপূর্ব্ব রিজেণ্ট আমীর আবদুল ইলাহ্‌র জায়গায় জোর করে কর্ত্তৃত্ব করছেন। আমীর আবদুল ইলাহ্ রসিদ আলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ইরাকের রাজা ২য় ফৈজলের বয়স মাত্র ৬ বছর তা বোধ হয় তোমরা জান। ৮ই মে পর্য্যন্ত খবর এখানে দিচ্ছি। এর পরে কি হবে বলা কঠিন। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটীল হয়ে পড়ছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

টিয়া, চাঁদা, কই, কাক্, বারণ, হয়, শুক, ফণী, নাগ, সিংহ, হাতী, চিল, তিমি, তিমি।

উত্তরদাতাদের নাম

ছায়া ও মিনু সেন (মূলঘর); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); রণেন রায় (হাওড়া); রিণা রায় (টালীগঞ্জ); রমেশচন্দ্র ও রণেশচন্দ্র সেনগুপ্ত-পট্টনায়ক (ভিরিঙ্গী); মণিরাম (মোহনলাল) আগরওয়ালা (সুজানগর—পাবনা); কালিদাস পাল (ইনাতপুর); মঞ্জিলকুমার সেন (বহরমপুর); অণিমা ও বন্ধু (করিমগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

ধাঁধা-মেনু

শ্রীবিশ্বজিৎ বিশ্বাস (গ্রাহক)

সেদিন মা আলমারি গুছাইতেছিলেন, একখানি পুরানো ছাপা কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার বিমল কাকার বৌভাতের 'মেনু'।" কাগজে এইরূপ লেখা ছিল :—

আকণ্ঠভূষণের তাপ্লিকা

(১) মস্তকাপহরণ (২) পুষ্প মর্কটের তিন কাকা (৩) সওগাদ কির ফ্রাই (৪) কতক বাদ লুব্ধচিত্ত (৫) পুত্রেবং (৬) নিগুর্ণ ভজ সাকারে (৭) বিরাট-দেশের পট্টি (৮) শাখা শ্রীক্ষেত্র (৯ গড্ডল কোম্পানীর গর্ভধারিণী (১০) অম্লশাখা (১১) লক্ষ্মী জম্বীর (১২) মুগ্ধকর নৈবেদ্য (১৩) বাগান দোকান শ্রেণীর সমাচার (১৪) পারদ গোলক (১৫) বাক্ বটীকা (১৬) ধূমবিহীন ধূমপান।

ইহা ছাড়া আরও নাম ছিল কিন্তু স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় পড়া গেল না। যাহা হউক্ এই রহস্যময় কাগজের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সুবিধা করিতে না পারিয়া গেলাম বাবার নিকট। শুনিলাম 'মেনু'টি আমার জ্যাঠামণি ৺সতীশচন্দ্র বিশ্বাস এটর্নী মহাশয়ের তৈয়ারী। বাবা বলিলেন, "অভিধান দেখিয়া আগে নিজে মানে করিবার চেষ্টা কর।" কেমন করিয়া করিতে হইবে ২।১টা উদাহরণ দিয়া দেখাইলেন। যেমন—আদি ব্যঞ্জন বর্ণ চুরি = কচুরি। (আদি ব্যঞ্জন বর্ণ = ক)। মূঢ় শাখামৃগ = ফুলকপি। (মূঢ় = Fool, বাংলায় ফুল, শাখামৃগ = কপি)। ইত্যাদি। আমি চেষ্টা করিতেছি, তোমরাও কর। সবগুলির পাঠোদ্ধার করিতে পারিলে সম্পাদক মশাইএর কাছে পাঠাইয়া দিও।

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্.এ, বি.এল্ প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে All Bengal Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য) বলেন :—
"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা

দাম ১৷৷০ মাত্র

=নতুন বই=

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্ এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সম্বন্ধে মৌচাক বলেন :—
"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

অফুরন্ত ছবি—অফুরন্ত হাসি—
—অফুরন্ত মজা—

দাম আট আনা

ইহুদী ফ্রীডম্ ষ্টেশন্ কলিং—
হার অটো ভাসারম্যান্ স্পীকিং—

হার অটো ভাসারম্যান্ বলছেন তাঁর জীবনের দুরন্ত এডভেঞ্চারের কথা। হিট্লারের রথের চাকার নীচে একটি জীবনের সুখশান্তি কেমন করে নষ্ট হোল, কেন হার অটো হিট্লারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো তারই কাহিনী। না শুনে থাকলে পড়—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা উপন্যাস

হিটলারের শত্রু

দাম—এক টাকা

দেশপ্রিয় লাইব্রেরী—১৯২।২ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং … ৷৷০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প … ৶১০

ছুটীর গল্প … ৶১০

শ্রীমাঠবা ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প … ।০

অনেক গল্প … ।০

পুরাতন বার্ষিক রামধনু

১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১৷৷০

৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২৷৷৶০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

দেহের স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ এবং রসনার তৃপ্তি

এই তিনটিই বড় কথা।

লক্ষ্মী ঘি দিয়ে তৈরী খাবার ব্যবহার করলে
এর সব ক'টি সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা — সকল ঋতুতেই লক্ষ্মী ঘিএর খাবার
সমান উপাদেয়।

উৎসব-আয়োজনে, পূজাপার্ব্বণে এবং নিত্য ব্যবহারে

লক্ষ্মী ঘি

অপরিহার্য্য

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি অতুলনীয়।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

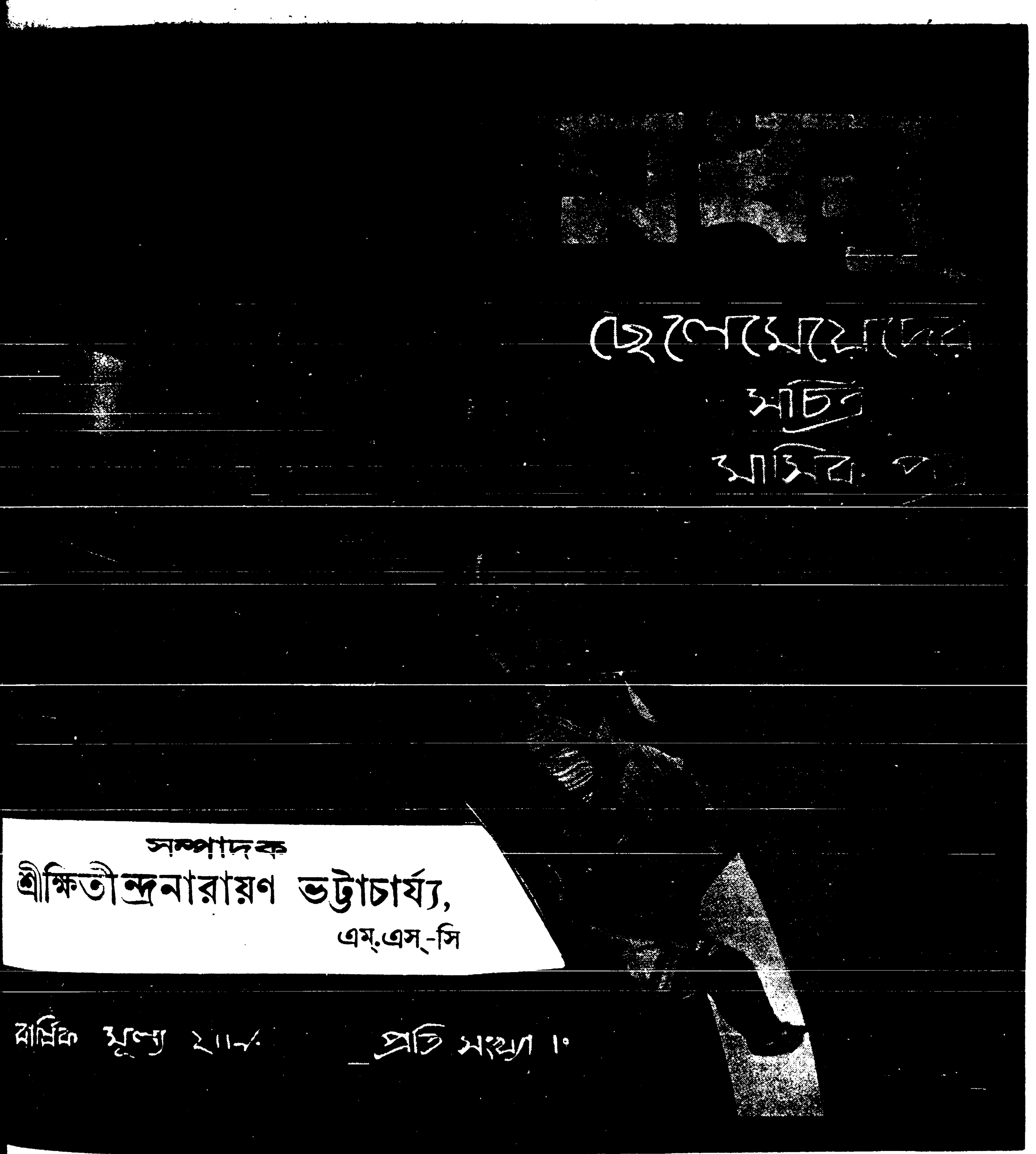

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C—1641

দেহের স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ এবং রসনার তৃপ্তি

এই তিনটিই বড় কথা।

লক্ষ্মী ঘি দিয়ে তৈরী খাবার ব্যবহার করলে
এর সব ক'টি সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা — সকল ঋতুতেই লক্ষ্মী ঘিএর খাবার
সমান উপাদেয়।

উৎসব-আয়োজনে, পূজাপার্ব্বণে এবং নিত্য ব্যবহারে

লক্ষ্মী ঘি

অপরিহার্য্য

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি অতুলনীয়।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

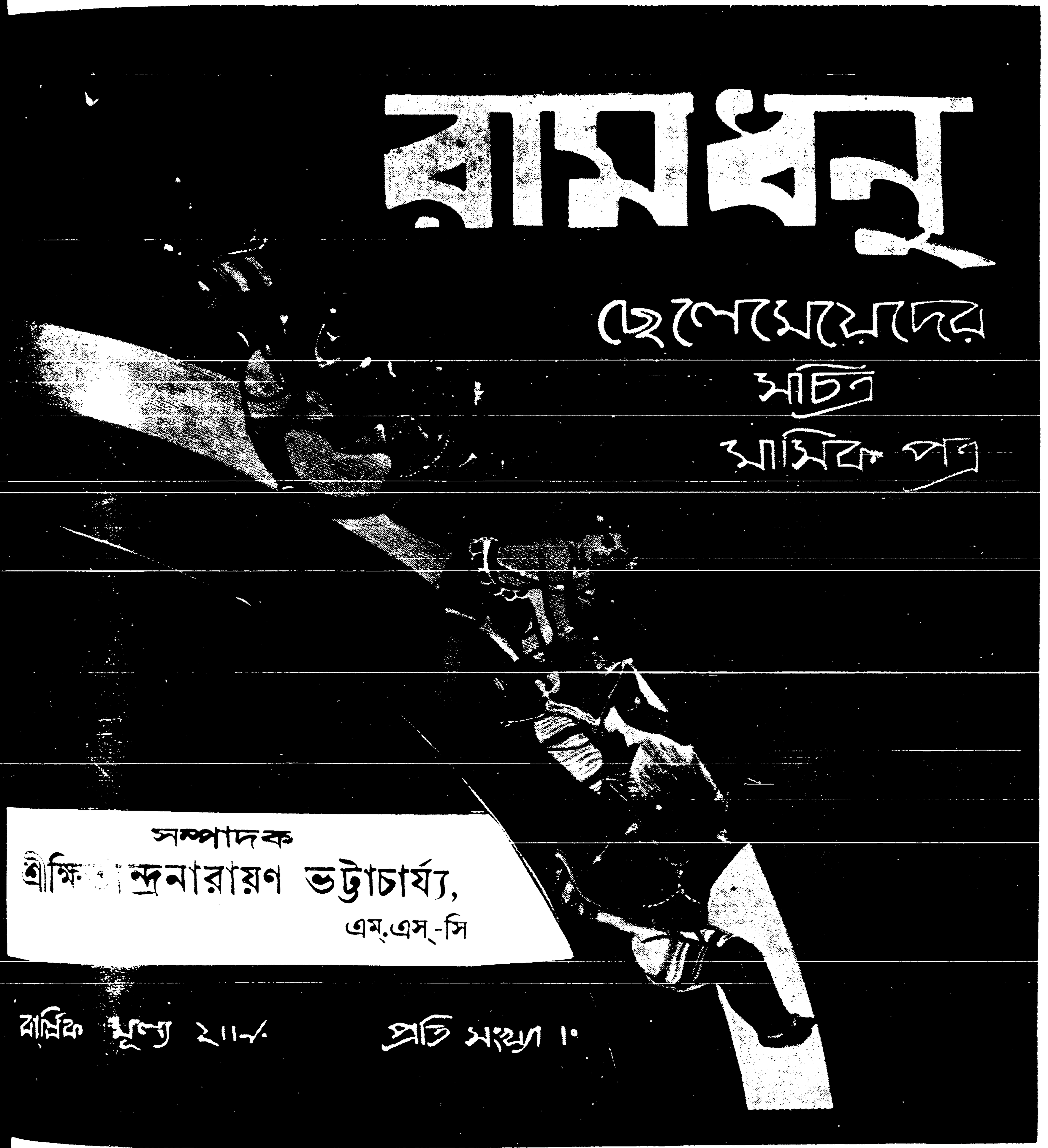

কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০ ; প্রতিসংখ্যা ।, ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তর মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ১০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ
হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

নূতন পুরাণ
একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৵০

হাস্য ও রহস্য
একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ॥৵০

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ॥৵০

প্রাপ্তিস্থান:—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

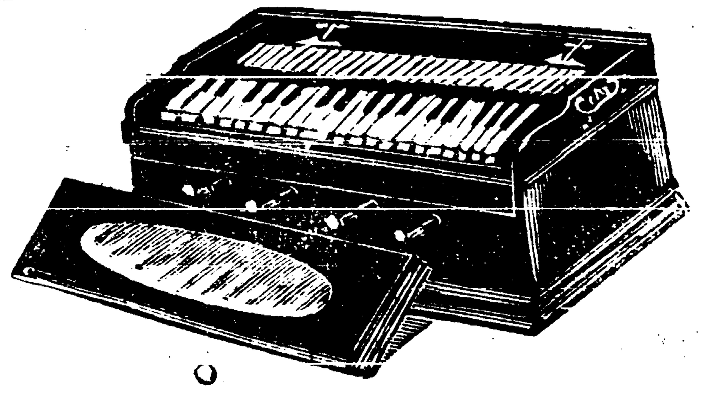

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং'র
হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।
অরগ্যান কোং
৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গল্প-লহরী
সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা ; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।
কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

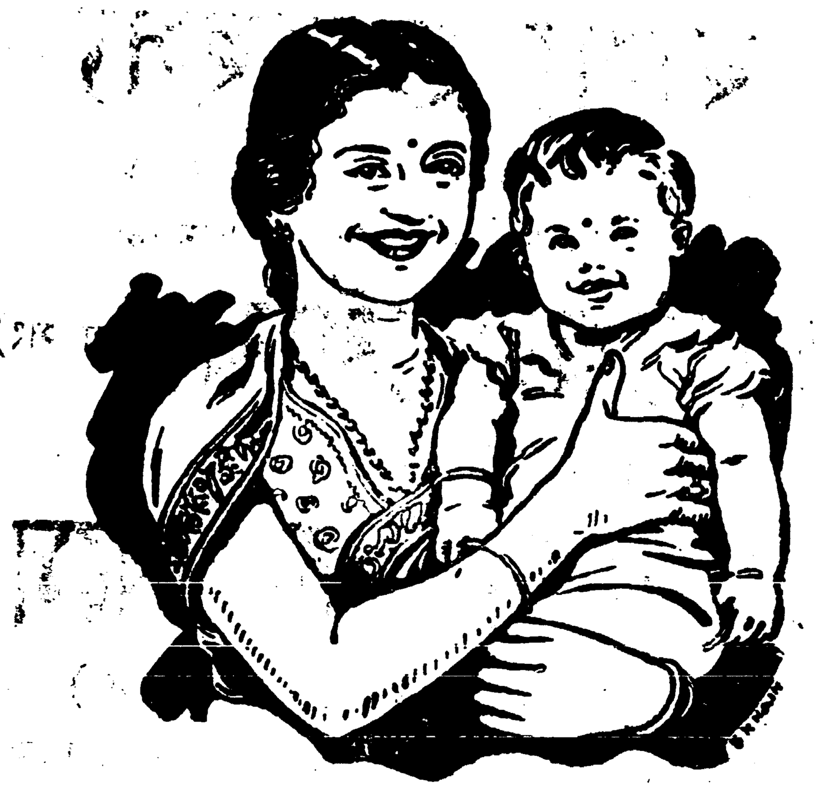

ডোঙ্গরের

বালামৃত

ব্যবহার করিয়া

দুর্ব্বল শিশুরা

অল্পদিনের মধ্যেই

পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। • সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন— (Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—॥৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

জাতিকে গ'ড়ে তুলতে হ'লে বহুমুখী প্রতিভার প্রেরণা দিয়ে আগে জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদের শিশু-দেবতাদের!

আজ এই বিজ্ঞানের যুগে তাই

ছোটদের জন্য

দেব সাহিত্য-কুটীরের

নূতন পরিকল্পনা

কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ

গল্পের ভিতর দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার-কল্পে এই সিরিজে নারী-চরিত্র-বর্জ্জিত একখানি ক'রে উপন্যাস প্রতিমাসে প্রকাশিত হবে। রোমাঞ্চকর, য়্যাড্‌ভেঞ্চার ও ভয়াবহ ডিটেকটিভ কাহিনী-ভরা এই বইগুলি এমন বিচিত্র ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে যে, 'প্রাইজ-বুক' হিসেবে এই সিরিজের বইগুলিই গ্রাহকদের সব-আগে নজরে পড়বে।

কাঞ্চন-জঙ্ঘা সিরিজের প্রথম বই

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

অন্ধকারের বন্ধু

উদ্বেগ-আশঙ্কায় ভরপুর এই বইখানি পড়বার সময় মনে হয় গ্রন্থকার যেন ছায়া-মূর্ত্তিতে চরিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে থেকে মনের ক্যামেরায় তাদের ফটো তুলে তাদের প্রাণদান করেছেন—একেবারে বাস্তব! জীবন্ত! প্রত্যক্ষ!

প্রত্যেক খানি

আট আনা

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জ্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

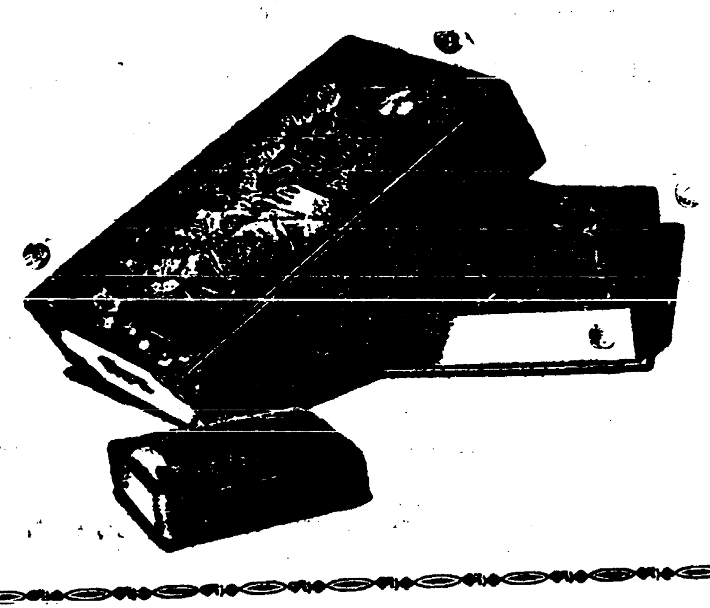

- প্রচুর ফেন
- স্নেহময় স্পর্শ
- মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্‌
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

শীঘ্রই বাহির হইবে

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৷৵৹

আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

আবিষ্কারের গল্প

দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী
অভিযান-কাহিনী।

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৷৹

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই,
চমৎকার ছবি। দাম—৷৷৵৹

ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের"
মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

═ নতুন বই ═

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সম্বন্ধে **মৌচাক** বলেন :—

"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

—অফুরন্ত ছবি—অফুরন্ত হাসি—
—অফুরন্ত মজা—

দাম আট আনা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

বন্দে আলী মিয়ার লেখা

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—।৵০

যেমন হাসির গল্প তেমনি ছড়া আর তেমনি ছবি।

চোর জামাই—।৵০

চোর কি ক'রে জামাই হলো না, জামাই কি ক'রে চোর হলো জান্তে যদি চাও—আজই একখানা পড়ে দেখ।

জঙ্গলের খবর—৶০

চারটি বালকের এ্যাড্ভেঞ্চারের কথা। লেখা পড়ে আর ছবি দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্বে।

রূপরাণী—৷৷০

চমৎকার গল্পের বই।

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের একটী দৃশ্য—লিদার উপত্যকার তুষার-নদী

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসম্প্লিত

১৪শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৫৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বরষায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গগনে উঠেছে মেঘ অঞ্জনাভ,
তোমাদিকে আজি নব গীত শুনাবো।
বহে জোরে জলো হাওয়া,
বাহিরে যায় না যাওয়া,
ঘরে বসে বরষার পরশ পাবো।

দোল খায় তরুলতা, দোলে বেণুবন,
জলধারা ধরা-গায়ে আঁকে আলিপন।

ফিঙে ও শালিখ দল
উড়ে ফিরে অবিরল,
আল্ পথে আজি আর নাহি লোকজন।

ছাপালো দুকূল নদী, গ্রামে ঢোকে জল,
দিনরাত ঝরে বারি, উঠে কলকল।
এত শোভা কার দান
দেখিয়া জুড়ায় প্রাণ!
স্নেহ কার ফুটে উঠে হয়ে শতদল!

স্নিগ্ধ শীতল ধারা নভো গঙ্গার,
ধরাতলে নেমে আসে তপঃ বলে কার?
কার লাগি দেশ যুড়ি
ফুটিছে ফুলের কুঁড়ি?
অভিষেক হবে কোন্ রাজার রাজার?

[ভারতের বিস্মৃত যুগের একটি কাহিনী]

ছয়

তলোয়ারের গায়ে তলোয়ার ঝলক দেয়, আগুনের ফুল্‌কি ছিটকে যায়, শাণিত ইস্পাতের ঔজ্জ্বল্য ঝিল্‌মিল্ করে ওঠে, চিকিমিকি শিহরণ খেলে।

জেতমানা আঘাতের পর আঘাত হানছিল, ধর্ম্মদেব আত্মরক্ষা করছিল মাত্র। জেতমানার চোখের উপর নিবদ্ধ ছিল তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সেই চোখের চাঞ্চল্যে জেতমানার তরবারির ক্ষিপ্রতা প্রতিভাত হচ্ছিল, আঘাত প্রতিহত করার সুবিধাও হচ্ছিল ধর্ম্মদেবের। জেতমানার তলোয়ার বার বার চেষ্টা করেও তাই ধর্ম্মদেবের দেহ স্পর্শ করতে পারল না।

ইতিমধ্যে ক্রমশঃ ধর্ম্মদেব জেতমানার অসি চালনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল। তার ক্ষিপ্রতা ও কৌশল যেমন ভাবে বুঝতে পারল, তেমনই সেই কৌশলের গলদ কোথায় তাও ধরা পড়ে গেল তার তীক্ষ্ণ চোখে।

এদিকে যতই মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যাচ্ছে, জেতমানা ততই অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠছে, উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে। ধর্ম্মদেবের মাথার উপর বার বার তার তলোয়ার ঝল্‌মল্ করে উঠছিল, কিন্তু প্রতিবারেই পিছ্‌লে পড়ছিল তার দেহের পাশ দিয়ে।

সহসা কোন এক সময় দু'জনের মাথার উপর কব্‌জিতে কব্‌জিতে তলোয়ার বেধে গেল। দু'জনের হাত থরথর করে কেঁপে উঠল। নিজ নিজ তলোয়ার মুক্ত করে নেবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। দেহের সব শক্তি কেন্দ্রীভূত হ'ল দু'জনের বাহুতে। কিন্তু দু'জনেই সম-শক্তিমান, কেউ কাউকেই পেরে উঠল না।

লহমার পর লহমা যেন আর কাটে না। পল, অনুপল যেন সব স্থির হ'য়ে গেছে। থর থর করে যোদ্ধা দু'জন কেঁপে কেঁপে উঠছে, দেখলে মনে হয় ক্ষণে ক্ষণে তাদের দেহের ভিতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ বহে যাচ্ছে। মুখ হয়ে উঠেছে রক্তিম, কপালের ঘাম গড়িয়ে আসছে চিবুকে!

কিন্তু জেতমানা আর বিলম্ব সইতে পারল না। তলোয়ার ফেলে দিয়ে একলাফে ধর্ম্মদেবকে জড়িয়ে ধরল। ধর্ম্মদেব এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অসিযুদ্ধের নীতি এ নয়। অতর্কিত এক কৌশলে তার অসি হস্তচ্যুত হ'ল। সম্রাট্ মিহিরকুল এবার খুসি হ'লেন, বলে উঠলেন—'ঠিক হচ্ছে!' হূনদের মধ্যে উল্লাস দেখা দিল।

এক ঝটকায় ধর্ম্মদেবকে নীচে টেনে এনে জেতমানা তার কোমর ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। ধর্ম্মদেব ক্ষিপ্রহস্তে জেতমানার গলা জড়িয়ে ধরল। তার বাহু-বেষ্টনী ক্রমশঃ এমন কঠিন হয়ে উঠল যে জেতমানার আর আছাড় মারা হ'ল না, শ্বাসরোধ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আপ্রাণ শক্তিতে ধর্ম্মদেবের বন্ধন থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিলে।

তার পর ধর্ম্মদেবকে আবার আক্রমণ করার আগে ধর্ম্মদেব জেতমানাকে আক্রমণ করল, সাপ্‌টে ধরে পায়ের কৌশলে তাকে ফেলে দিলে মাটির উপর। মধুপানের আধিক্যে জেতমানার দেহে কিছু শৈথিল্য এসেছিল, মাটিতে সে পড়ল সটান্ চিৎ হয়ে, তখনই উঠতে পারল না। হূনরা স্তব্ধ হয়ে গেল, অমন শক্তিমান্ নায়ককে পরাজিত হ'তে দেখে তাদের মুখে সহসা কোন কথা জোগাল না। তার পর বিস্ময়ের বেগটা প্রশমিত হ'তেই তারা মার মার রবে লাফিয়ে উঠল, ছোট ছোট চোখগুলি আরো ছোট হ'য়ে উঠল, চ্যাপ্‌টা নাক কুঁচ্‌কে উঠল যেন।*

* হূনদের চেহারা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক "গিবন্" লিখেছেন—"They were distinguished from the rest of the human species by their broad shoulders, flat noses and small black eyes deeply buried in their heads, and as they were almost destitute of beards, they never enjoyed the manly graces of the youth or the venerable aspect of age." ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "পাষাণের কথা"তে এ উক্তি সমর্থন করেছেন।—লেখক

শট্ ক'রে একখানি ছোরা ধর্ম্মদেবের কাণের পাশ দিয়ে ছিটকে গেল। আর একখানি ছোরা তখনই তার গলায় এসে বিঁধত, যথা সময় দেখতে পেয়ে ধর্ম্মদেব একলাফে সরে গেল। বিষ্ণুবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি বলে উঠল—সম্রাট্, এ নীতিবিরুদ্ধ...

সম্রাট্ সে কথা কানে তুললেন না, হূনদের উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন—ঠিক হচ্ছে!

ধর্ম্মদেব ক্ষিপ্রহস্তে মেঝের উপর থেকে একখানি তলোয়ার কুড়িয়ে নিলে। কিন্তু একখানি তলোয়ারে সে রুখবে কাকে? তার চারি পাশে তখন শত শত তলোয়ার উদ্যত হয়ে উঠেছে। রক্তের নেশায় তখন হূনেরা উদগ্র।

—থামো!

আঘাত হানার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এক নারীর কণ্ঠ সকলের উদ্যত অস্ত্রকে থম্‌কে দিলে। শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হিংস্র পশুকে কে যেন গুলিবিদ্ধ করল। সবার চোখের সামনে দৃপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে এল একটি সুন্দরী মেয়ে, সমবেত হূনদের উদ্দেশ করে বল্‌লে—সম্রাট্ মিহিরকুলের সামনে কাপুরুষের মত বীরত্বের অসম্মান ক'রো না। সবাই মিলে একটি লোককে খুন করায় বিশেষ কোন গৌরব নেই, তাতে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের রাজসভা কলঙ্কিত হবে শুধু।

জেতমানা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে; বল্‌লে—তুমি এখানে কেন কন্যাকুমারী? ভিতরে যাও।

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বারেক ভ্রূ দু'টি কুঁচ্‌কে ঘৃণাভরে জেতমানার মুখের পানে একবার তাকিয়ে কন্যাকুমারী সম্রাট্‌কে বল্‌লে—যুবককে মুক্ত করে দিন পিতা!

—তা হতেই পারে না,—জেতমানা প্রতিবাদ জানাল। এখন মুক্তি দিলে ভবিষ্যতে এই যুবক আমাদের জয়যাত্রার পথে বহু বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

—তুমি ওকে ভয় পেতে পার জেতমানা, কিন্তু একজন অজ্ঞাতকুলশীল হিন্দু যুবকের তলোয়ারকে ভারতের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ মিহিরকুল ভয় করেন না। এত দিন জানতাম সম্রাট্ মিহিরকুলের পার্শ্বরক্ষী মহানায়ক জেতমানা বীর, কিন্তু সে যে এত ভীরু, এমন কাপুরুষ তা আমার জানা ছিল না!—তার পর ধর্ম্মদেবের পানে ফিরে কন্যাকুমারী বল্‌লে—যুবক, তুমি যাও, সম্রাট্ মিহিরকুলের নামে আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

—অসম্ভব!—জেতমানা রুখে উঠল।

—চুপ্ কর! বেতনভুক সেনাপতি সম্রাট্-কন্যার সম্মান রেখে কথা বল্‌তে শেখ! কন্যাকুমারী ধম্‌কে উঠল। হূনজাতির কলঙ্ক! এক অখ্যাত হিন্দু যুবক অনায়াসে তোমাকে পরাজিত করল, আবার তুমি মুখ তুলে কথা বল্‌ছ?......কি যুবক, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে রইলে যে?

ধর্ম্মদেব বল্‌লে—আমার পুরস্কার?

—প্রাণ রক্ষা হ'ল, এর পরেও আবার পুরস্কার?

—সম্রাট্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

—সম্রাট্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?—বেশ, কি পুরস্কার তুমি আশা কর?

—এই মেয়েটীর মুক্তি।

—বেশ, নিয়ে যাও ওকে।

ধর্ম্মদেব তলোয়ার দিয়ে মল্লিকার বন্ধন কেটে ফেল্‌লে, হাত ধরে বল্‌লে—এসো।

মল্লিকার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল, মৃদুকণ্ঠে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল—তুমি এখানে!

মৃদু হেসে ধর্ম্মদেব বল্‌লে—হ্যাঁ, আমিই এসো—

সম্রাট্ ও সম্রাট্‌নন্দিনীকে অভিবাদন করে মল্লিকার হাত ধরে ধর্ম্মদেব বাহির হয়ে গেল।

জেতমানা এতক্ষণ রাগে ফুলছিল, এবার কথা বল্‌লে, সম্রাট্‌কে উদ্দেশ করে বল্‌লে—পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটি মেয়েকে আপনি অত্যধিক প্রশ্রয় দিয়েছেন সম্রাট্!

—তার মানে?—কন্যাকুমারী ফিরে দাঁড়াল।

—মানে?—নীচের ঠোঁট উল্টে ব্যঙ্গের স্বরে জেতমানা বল্‌লে—ভারতের প্রবেশপথে এক অজ্ঞাতকুলশীলা শিশুকে ভারতসম্রাট্ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে সেই শিশুই সম্রাট্-নন্দিনী কন্যাকুমারী নামে ভারতের বুকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কে যেন এক ঘা বিদ্যুতের চাবুক মারল, কন্যাকুমারী চমকে উঠল; সম্রাট্‌কে জিজ্ঞেস করল—পিতা, একি সত্যি?

মাতাল সম্রাট্ বিড় বিড় করে কি বল্‌লেন, ঠিক বোঝা গেল না, তবে সম্মতিসূচক ভাবে তিনি যে বার কয় বাতাসে মাথা ঠুকলেন, তা দেখা গেল।

সর্পদংশিতার মত কন্যাকুমারীর সুন্দর মুখখানি মুহূর্ত্ত-মধ্যে নীল হয়ে গেল। এত বড় আঘাত সইবার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এক নিমেষে সারা পৃথিবীর রূপ তার চোখের সামনে বদলে গেল। মনে হ'ল পা যেন টলছে, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।—আপনি আমায় এ কথা আগে বলেন নি কেন সম্রাট্?—বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে টলতে টলতে সে ভিতরে চলে গেল।

জেতমানার মুখে ফুটে উঠল ক্রূর বাঁকা হাসি।

(ক্রমশঃ)

সুমেরিয় সমাজ ও ধর্ম্ম

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ.

মিশরীয়দের মত সুমেরিয়রাও পঞ্জিকা তৈবী করেছিল। এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ছিল এক মাস। কিন্তু এতে অসুবিধা এই যে পূর্ণ বৎসরের হিসাব এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য তারা সুবিধে পেলেই পঞ্জিকাতে আর এক মাস যোগ করে দিত। পরবর্ত্তী কালের প্যালেস্তাইনের অধিবাসীরা ও পারসীকরা এই পঞ্জিকাই গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের মাস গণনা এখনও এই পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। মিশরের মত এখানেও বৎসর গণনার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কোনও স্মরণীয় ঘটনার নামে বৎসরের নামকরণ হ'ত।

সুমেরিয় সংখ্যাগণনার পদ্ধতিও অন্য দেশ হ'তে ভিন্ন ছিল। লক্ষ্য করে দেখো যে ধোপা যখন তোমার বাড়ীর কাপড় নিয়ে যায় তখন সে কুড়ি হিসাবে গণে। মনে কর, তোমার বাড়ী থেকে সপ্তাহে কাপড় যায় ১০০টা। তোমার ধোপা কিন্তু তাকে গুণে বলবে যে পাঁচ কুড়ি কাপড় যাচ্ছে। সুমেরিয়দের গণবার পদ্ধতি ছিল ষাটের হিসাবে। মনে কর, ধোপার কাছে কাপড় গেল ১২০টা। কোনও প্রাচীন সুমেরিয় তোমার বাড়ীতে এখন থাকলে সে বল্‌ত যে দুই ষাট কাপড় যাচ্ছে। এই ষাটের হিসাব থেকেই আজকালকার ঘণ্টা ও মিনিট ষাট

ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের যেমন ওজন করবার প্রধান পরিমাপ সের—সুমেরিয়দের ছিল মিনা। এক মিনাতে আমাদের ওজনের প্রায় আধ সের হ'ত।

সিনারের উপত্যকার কথা তোমরা গত মাসের প্রবন্ধে জেনেছ। এই উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় রৌদ্রে শুকান ইট দিয়ে ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা এনলিলের উদ্দেশ্যে একটি প্রকাণ্ড পিরামিডের আকারে তৈরী মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। এই মন্দিরের চারদিকে ব্যাবিলনের প্রধান নগর নিপ্পুর গড়ে উঠেছিল। নিপ্পুরের অনুকরণে ব্যাবিলনের প্রত্যেক নগরই কোনও না কোনও দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পরবর্ত্তী যুগে ব্যাবিলন নগরের পত্তনও এই ভাবে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পিরামিড-আকৃতি মন্দির দেবতার প্রধান মন্দির ছিল না। পিরামিডের নীচে আর একটি ছোট মন্দির থাকত, সেখানেই দেবতার প্রধান মূর্ত্তি স্থাপিত হ'ত। কালক্রমে সেই সব মন্দির মাটির সঙ্গে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—কিন্তু পিরামিডগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলিও মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল। সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে এগুলিকে বার করা হয়েছে।

বুঝতেই পারছ যে যখন এক একটি মন্দির কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠত তখন সেই মন্দিরগুলি নিশ্চয়ই ধনরত্নে খুব সমৃদ্ধ ছিল। মন্দিরের হিসাব রাখবার জন্য অনেক কর্ম্মচারীর দরকার হ'ত। তারা মন্দিরের চারপাশে বাড়ী তৈরী করে থাকত। মন্দির ও এই কর্ম্মচারীদের বাড়ীর মাঝখানে থাকতেন মন্দিরের পুরোহিতরা। তাঁদের বাড়ীগুলি খুব বড় বড় হ'ত। এই সব মন্দির ও বাড়ী বেষ্টন করে একটা উঁচু প্রাচীর তৈরী করা হ'ত। এই প্রাচীর ছিল মন্দিরের সীমারেখা। প্রাচীরের বাইরে গড়ে উঠত আসল নগর। প্রধান পুরোহিতের পদ পূরণ করতেন দেশের রাজা। তাঁকে বলা হ'ত "প্যাটেসি"। তাঁর বাসস্থানও তৈরী হ'ত মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে। বলতে গেলে মন্দির-প্রাঙ্গণই ছিল নগরের প্রধান অংশ। এইখানেই রাজপাট বসত, এইখানেই দেশ-বিদেশের রাজদূতরা এসে তাঁদের দেশের রাজার কাছ হ'তে উপঢৌকন দিয়ে ব্যাবিলন-রাজের সন্তুষ্টি

সুমেরিয় সমাজ ও ধর্ম্ম

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ.

মিশরীয়দের মত সুমেরিয়রাও পঞ্জিকা তৈরী করেছিল। এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ছিল এক মাস। কিন্তু এতে অসুবিধা এই যে পূর্ণ বৎসরের হিসাব এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য তারা সুবিধে পেলেই পঞ্জিকাতে আর এক মাস যোগ করে দিত। পরবর্ত্তী কালের প্যালেস্তাইনের অধিবাসীরা ও পারসীকরা এই পঞ্জিকাই গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের মাস গণনা এখনও এই পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। মিশরের মত এখানেও বৎসর গণনার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কোনও স্মরণীয় ঘটনার নামে বৎসরের নামকরণ হ'ত।

সুমেরিয় সংখ্যাগণনার পদ্ধতিও অন্য দেশ হ'তে ভিন্ন ছিল। লক্ষ্য করে দেখো যে ধোপা যখন তোমার বাড়ীর কাপড় নিয়ে যায় তখন সে কুড়ি হিসাবে গণে। মনে কর, তোমার বাড়ী থেকে সপ্তাহে কাপড় যায় ১০০টা। তোমার ধোপা কিন্তু তাকে গুণে বলবে যে পাঁচ কুড়ি কাপড় যাচ্ছে। সুমেরিয়দের গণবার পদ্ধতি ছিল ষাটের হিসাবে। মনে কর, ধোপার কাছে কাপড় গেল ১২০টা। কোনও প্রাচীন সুমেরিয় তোমার বাড়ীতে এখন থাকলে সে বল্‌ত যে দুই ষাট কাপড় যাচ্ছে। এই ষাটের হিসাব থেকেই আজকালকার ঘণ্টা ও মিনিট ষাট

ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের যেমন ওজন করবার প্রধান পরিমাপ সের—সুমেরিয়দের ছিল মিনা। এক মিনাতে আমাদের ওজনের প্রায় আধ সের হ'ত।

সিনারের উপত্যকার কথা তোমরা গত মাসের প্রবন্ধে জেনেছ। এই উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় রৌদ্রে শুকান ইট দিয়ে ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা এনলিলের উদ্দেশ্যে একটি প্রকাণ্ড পিরামিডের আকারে তৈরী মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। এই মন্দিরের চারদিকে ব্যাবিলনের প্রধান নগর নিপ্পুর গড়ে উঠেছিল। নিপ্পুরের অনুকরণে ব্যাবিলনের প্রত্যেক নগরই কোনও না কোনও দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পরবর্ত্তী যুগে ব্যাবিলন নগরের পত্তনও এই ভাবে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই পিরামিড-আকৃতি মন্দির দেবতার প্রধান মন্দির ছিল না। পিরামিডের নীচে আর একটি ছোট মন্দির থাকত, সেখানেই দেবতার প্রধান মূর্ত্তি স্থাপিত হ'ত। কালক্রমে সেই সব মন্দির মাটির সঙ্গে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—কিন্তু পিরামিডগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলিও মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল। সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে এগুলিকে বার করা হয়েছে।

বুঝতেই পারছ যে যখন এক একটি মন্দির কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠত তখন সেই মন্দিরগুলি নিশ্চয়ই ধনরত্নে খুব সমৃদ্ধ ছিল। মন্দিরের হিসাব রাখবার জন্য অনেক কর্ম্মচারীর দরকার হ'ত। তারা মন্দিরের চারপাশে বাড়ী তৈরী করে থাকত। মন্দির ও এই কর্ম্মচারীদের বাড়ীর মাঝখানে থাকতেন মন্দিরের পুরোহিতরা। তাঁদের বাড়ীগুলি খুব বড় বড় হ'ত। এই সব মন্দির ও বাড়ী বেষ্টন করে একটা উঁচু প্রাচীর তৈরী করা হ'ত। এই প্রাচীর ছিল মন্দিরের সীমারেখা। প্রাচীরের বাইরে গড়ে উঠত আসল নগর। প্রধান পুরোহিতের পদ পূরণ করতেন দেশের রাজা। তাঁকে বলা হ'ত "প্যাটেসি"। তাঁর বাসস্থানও তৈরী হ'ত মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে। বলতে গেলে মন্দির-প্রাঙ্গণই ছিল নগরের প্রধান অংশ। এইখানেই রাজপাট বসত, এইখানেই দেশ-বিদেশের রাজদূতরা এসে তাঁদের দেশের রাজার কাছ হ'তে উপঢৌকন দিয়ে ব্যাবিলন-রাজের সন্তুষ্টি

বিধানের চেষ্টা করতেন। চারদিক্ হ'তে বণিকরা এসে মহারাজের দর্শন লাভের জন্য ভীড় করতেন ও বাণিজ্যের দ্বারা দেশকে সমৃদ্ধ করতেন। এইখানেই ব্যাবিলনের প্রজাবৃন্দ দেবদর্শন ও রাজদর্শন লাভের জন্য দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত ও মন্দির ও রাজকোষাগার নিয়ত নূতন নূতন উপহার ও দক্ষিণাতে ফেঁপে উঠত।

প্রত্যেক প্রাচীন জাতির মত সুমেরিয়রাও প্রকৃতির উপাসক ছিল। সূর্য্য, বাতাস, জল, আকাশ এই সব ছিল সুমেরিয়দের দেবদেবী এবং এদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তারা মন্দিরে শস্য, জল ও গাছের পাতা দিয়ে পূজা করত। এই সব ছিল জীবনের প্রতীক। মৃতের কবরের জন্য তারা মিশরের মত পিরামিড নির্ম্মাণ করত না। বাড়ীর অঙ্গনে অথবা গৃহের মেঝের নীচে তারা মৃতকে কবর দিত। স্বর্গ অথবা নরক সম্বন্ধে তাদের কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তারা মনে করত যে মরবার পর ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে সব লোক পৃথিবীর নীচে একটা অন্ধকার জায়গায় গিয়ে জমা হয়। অতএব সেখানে আরামে থাকবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সেইজন্য তারা মৃতের সঙ্গে পরবর্ত্তী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেওয়া দরকার মনে করত না। তাই প্রাচীন মিশরের মত সুমেরিয় কবরগুলি দেশের প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কারে আমাদের কোনও সহায়তায় আসে না। দু'টি বড় বড় মাটির জালা একত্র করে মৃতের জন্য কফিন তৈরী হ'ত। এই কফিনে মৃতকে পূরে দিয়ে তাকে গোর দেওয়া হ'ত।

কাঁচা ইটে তৈরী হ'ত বলে এই সব বাড়ী বহু কাল হ'ল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন এই সব বিখ্যাত নগরের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিরাট মাটির স্তূপ। এই সব স্তূপ খনন করে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার সুমেরিয় কারিকরের তৈরী মাটির বাসনপত্র পাওয়া গিয়েছে। এমন কি ধাতুর ও পাথরের সুন্দর সুন্দর ফুলদানি, বাসনপত্র ও শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। এই সব থেকে মনে হয় যে প্রাচীন সুমেরিয় কারিকররা এইসব সূক্ষ্ম কাযে খুব সুদক্ষ ছিল।

এই সময় এক একটি নগরের ওপর প্রভুত্ব করতেন এক একজন রাজা। এই সময়কে নগর-রাজদের যুগ বলা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৫০ থেকে ২৭৫০ পর্য্যন্ত

এই প্রায় এক হাজার বৎসর ধরে ব্যাবিলনের ইতিহাসে এই নগর-রাজরা রাজত্ব করেছিলেন। তার বিবরণ তোমাদের আর একটি প্রবন্ধে দেবার ইচ্ছে রইল।

সান্ত্বনা-পুরস্কার

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

স্কুলের অ-ভাল ছেলেদের মাঝে মাঝে এক রকম পুরস্কার দেওয়া হয়—ইংরাজীতে উহাকে বলে 'কন্‌সোলেশন্ প্রাইজ্'—অর্থাৎ সান্ত্বনা পুরস্কার।

এই সান্ত্বনা-পুরস্কার সম্বন্ধে আমার একটা বই লিখিবার ইচ্ছা ছিল। সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের আত্মজীবনী পড়িয়া সে ইচ্ছা আবার নতুন করিয়া জাগ্রত হইয়াছে।

জর্জ্জ্ বার্নার্ড্ শ'

চার্চিলের স্কুল-জীবন একবারেই বৈশিষ্ট্যময় নহে, না পড়াশুনায়, না খেলায়। স্কুলে গ্রীক্, লাটিন ভাষা পড়ান হইত, সেগুলি ছিল চার্চিলের কাছে বাঘের মত। মাতৃভাষা ইংরাজী কিন্তু তাঁহার বেশ ভাল লাগিত। কিন্তু শুধু তাহাতেই ত আর স্কুলের ভাল ছেলে হওয়া যায় না। চার্চিলের স্কুলের 'প্রগ্রেস্ রিপোর্ট্'এ প্রায়ই লেখা থাকিত "নট্ গুড্", "ব্যাড্" ইত্যাদি।

চার্চিলের কলেজে পড়া হয় নাই। তিনি সৈন্য-বিভাগে চাকরী পাইয়া

(সেও বোধ হয় তিনি ইংলণ্ডের খুব বড় অভিজাত বংশের ছেলে বলিয়াই সহজে পাইয়াছিলেন) সৈন্য-স্কুলে কিছুকাল শিক্ষার পর ভারতবর্ষে আসেন। এখানে বাঙ্গালোরে অবস্থান করার সময় অশ্বারোহণে তিনি বিশেষ পটুতা লাভ করেন। তাঁহাদের দল পোলো খেলায় বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে অবস্থান কালে চার্চিলের জ্ঞানলাভের জন্য এক উগ্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তিনি তাঁহার শিক্ষার হীনতা অনুভব করেন। তিনি তাঁহার মাকে ইতিহাস, ধর্ম্ম, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের পুস্তক পাঠাইতে লিখেন এবং দ্বিপ্রহরে যখন অপর সঙ্গীরা বিশ্রাম, নিদ্রা বা খেলায় সময় অতিবাহিত করিত—চার্চিল তখন পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সাহিত্যসাধনার ফল শীঘ্র ফলিল।

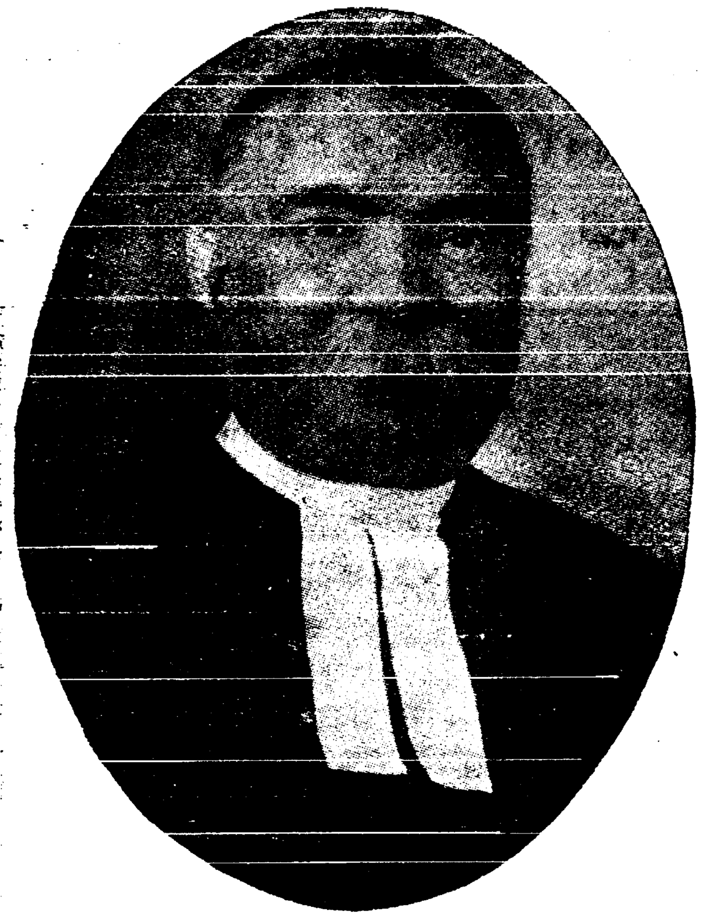

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এই সময়ে সীমান্তপ্রদেশে এক যুদ্ধ বাধিল; চার্চিল এই যুদ্ধে যোগদানকারী সৈন্য দলের মধ্যে নিজেকে বদলী করাইয়া স্থান গ্রহণ করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এক বিলাতী সংবাদপত্রের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া নিজেকে উক্ত সংবাদপত্রের সংবাদদাতার কার্য্যেও নিযুক্ত করাইয়া লইলেন। চার্চিলের প্রেরিত সংবাদ-কাহিনী লোকে বেশ আগ্রহের সঙ্গে পড়িত। তাঁহার সাহিত্যে স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার কয়েক বছর পরেই তিনি সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য সামরিক কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার লেখা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার কৃতকার্য্যতার কথার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট সময়ে তিনি সর্ব্বদলের সম্মতিক্রমে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চার্চিলের জীবনের অপর অংশ আমাদের প্রবন্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে।

আয়ারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাটককার জর্জ্জ্ বার্নার্ড্ শ' অতি বিখ্যাত লেখক। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি তাঁহার খ্যাতির সামান্য অংশ মাত্র। অনেকে ভাবেন সেক্স-পিয়ারের পর তিনিই গ্রেট্ ব্রিটেনের সর্ব্বপ্রধান লেখক। তিনি নিজ স্কুল-জীবনের কথা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্কুলে তাঁহার কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ হয় নাই, সকল শিক্ষাই তিনি বাহির হইতে অর্জ্জন করেন। তিনি পরিণত বয়স পর্য্যন্তও বিশেষ কিছু উপায় করিতে পারেন নাই—আত্মীয়দিগের গলগ্রহ স্বরূপ ছিলেন। তিনি ওদেশের শুধু যে শ্রেষ্ঠ লেখক তাই নন, লেখেনও বোধ হয় সব চেয়ে বেশী। লেখা দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে এক শোকসভায় জষ্টিস্ গ্রীভস্ সভাপতি ছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার এক অংশের মর্ম্ম এই: "বাঙ্গালা দেশের তিন জন বড়লোক অতি অল্পকালের মধ্যে পরলোকে গমন করিয়াছেন—চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আশুতোষ চৌধুরী। এই তিন জনের প্রথম জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ কলেজের প্রাইজপ্রাপ্ত ছাত্রদলের মধ্যে ছিলেন না। অতি সাদামাঠা ভাবেই তাঁহার প্রথম ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাঁহার পরজীবন অতি উজ্জ্বল। ব্যবহারজ্ঞ হিসাবে এবং দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আশুতোষের ছাত্রজীবন—এন্ট্রান্স পরীক্ষা হইতে এম্.এ ও ডি.এল্ পর্য্যন্ত অতি উজ্জ্বল। কর্ম্মজীবনে—

ব্যবহারজ্ঞ হিসাবে, বিচারক হিসাবে, শিক্ষা ব্যাপার দক্ষতায় এবং স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। আশুতোষ চৌধুরীর ছাত্রজীবন খুব উজ্জ্বল বলা যায় না। কিন্তু তিনি পরবর্ত্তীকালে ব্যারিষ্টার হিসাবে, বিচারক হিসাবে এবং বক্তা হিসাবে খুব নাম করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে কিছুকাল হইল আমার এক পুরান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়; দু'জনেই এক স্কুলে ছিলাম। কথাবার্ত্তার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আচ্ছা আমাদের সময়ে আমাদের স্কুলে বল্ডুইনও (ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী) ছিল, নয়? কিন্তু তাহার ত সে সময়ে কোনও রূপ যোগ্যতার কথা শুনি নাই! তোমার কি তার সম্বন্ধে কিছু মনে আছে?' তিনি বলিলেন, 'স্কুলের বল্ডুইন সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি পড়াশুনা করিয়া বক্তা, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক হিসাবে নাম করিয়াছেন'।"

স্কুল কলেজে নাম করিতে পারেন নাই কিন্তু পরবর্ত্তীকালে খুব বড়লোক হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও অনেক আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহার আত্মজীবনী পাঠে জানা যায় যে যখন দুই তিন স্কুল বদল করিয়াও কোন স্কুলেই তাঁহার পড়াশুনার উন্নতি হইল না তখন তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে বাড়ীতে পড়াইবারই ব্যবস্থা করেন। স্কুল-কলেজের দ্বার তাঁহার বন্ধ হইয়া গেল। বিখ্যাত বক্তা বিপিনচন্দ্র পালেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন একেবারেই উজ্জ্বল ছিল না। কিন্তু বক্তৃতা ও লেখা দ্বারা তিনি দেশমধ্যে অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না।

বর্ত্তমান যুগের ছাত্ররা জন্‌সনের লেখা কেহ পড়ে না, অনেকে তাঁহার নামও জানে না। আমাদের সময়ের ছাত্ররা বস্‌ওয়েলের লিখিত জন্‌সনের জীবন-চরিত পাঠ করিত। গোল্ড্‌স্মিথের কাব্য, গল্প ও নাটক তখনও চলিত ছিল, এখনও আছে। জন্‌সন্ তাঁহার সময়ের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশমধ্যে প্রভূতমাত্রায় স্থাপিত ছিল। গোল্ড্‌স্মিথের ছাত্রজীবন অত্যন্ত সাদামাঠা। তিনি জন্‌সনের প্রসাদ পাইবার জন্য অনেক উমেদারী করিয়াছিলেন।

জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব সেনানায়ক এবং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের জীবন আমাদের

আলোচ্য বিষয়ের আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে পণ্ডিত ও ঋষি এই দুই নাম ব্যবহৃত হইত। পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা, স্মৃতিশক্তি দ্বারা এবং প্রচুর পরিশ্রম দ্বারা প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন। ঋষিরা এক অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি দ্বারা (Intuition) দু' একটি সত্য আবিষ্কার করিতেন বা দু' একটি বিদিত সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিতেন। রামকৃষ্ণদেবের সময়ে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, বেদ-বেদান্তে তাঁহাদের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। রামকৃষ্ণ পণ্ডিত ছিলেন না—স্কুল-কলেজ বা টোলের শিক্ষা তাঁহার আদৌ হয় নাই কিন্তু তিনি অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি দ্বারা বেদবেদান্ত বর্ণিত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক জগতেও এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেক বড় পণ্ডিত কিছুই মৌলিক গবেষণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বল্পবিদ্যাযুক্ত ব্যক্তি অনেক বড় বড় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

হিণ্ডেনবার্গ অনেকটা এই ঋষি শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সামরিক জীবনের প্রথমভাগে কিছুই বৈচিত্র্য ছিল না। প্রথম বয়সে কিছু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তার পর জার্ম্মানীতে বহুকাল গভীর শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। নিয়ম মত তাঁহার পদোন্নতি হইয়া তিনি জেনেরেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে কিছু অসময়েই অবসর গ্রহণ করিতে হয়।

হিণ্ডেনবার্গ যোদ্ধা ছিলেন, সভাসদ্ একেবারেই ছিলেন না অর্থাৎ উপর-ওয়ালাদের মনস্তুষ্টির জন্য সত্যকে চাপা দিয়া এবং মিথ্যাটাকে সত্যের আবরণ দিয়া কথা কহিতে জানিতেন না। একটা কৃত্রিম যুদ্ধের কুচকাওয়াজে এক পক্ষে হিণ্ডেনবার্গ ছিলেন, অপর পক্ষে জার্ম্মান্ সম্রাট্ ছিলেন। প্রধান সেনাপতির ব্যবস্থা-গুণে হিণ্ডেনবার্গের পরাজয় হইল। এই পরাজয় উপলক্ষে কাইজার (সম্রাট্) একটু ঠাট্টা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে হিণ্ডেনবার্গ কাইজারকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি (কাইজার) যে প্রণালীতে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন আসল রণক্ষেত্রে সে প্রণালীতে সৈন্য চালনা করিলে সমগ্র সৈন্য বিনষ্ট হইত। কাইজার তাহা বুঝিতে পারিলেন। বড়লোকের ভুল দেখাইয়া দিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতে পারেন কিন্তু সন্তুষ্ট হন না। অচিরকাল মধ্যে হিণ্ডেনবার্গের অবসর প্রাপ্তি হইল।

অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি নিজের সহরে গমন করিয়া নিভৃত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে একটা তথ্য idea তাঁহার মনোমধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল সেটা অপসৃত হইল না। হিণ্ডেনবার্গ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন জার্ম্মানীর এক বিশেষ বিপদ্ আছে রাশিয়ার আক্রমণ হইতে; সে আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা যাইতে পারে মাস্থুরিনা লেকে রাশিয়ান্দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া। এই ভাব তাঁহার মনোমধ্যে থাকায় তিনি যখনই সময় পাইতেন তখনই মাস্থুরিনা লেক ও তাহার যুদ্ধ সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও সামরিক গবেষণা করিতেন। বহু বার ভ্রমণ করিয়া ও মানচিত্র অধ্যয়ন করিয়া সমগ্র হ্রদের ভূগোল এবং ভূ-প্রকৃতি (Topography) তাহার নখদর্পণে ছিল। অবসরপ্রাপ্ত হিণ্ডেনবার্গ মাঝে মাঝে তাঁহার বন্ধু সেনাপতিদিগের নিকট হইতে সৈন্য এবং কামানাদি লইয়া গিয়া হ্রদে নানারূপ মাপ ও হিসাব করিতেন। তলতলে জমির উপর দিয়া কামান টানিতে কত লোক লাগে, কামান কাদায় বসিয়া গেলে উহাকে উদ্ধার করিতে কত লোক লাগে ইত্যাদি রকমের গবেষণা। অনেক সেনাপতি ও অন্য লোক হিণ্ডেনবার্গের মাথা খারাপ হইয়াছে ভাবিত। কিন্তু দু'একজন বিচক্ষণ সেনাপতি—তার মধ্যে জেনেরেল লুডেনডর্ফ একজন, হিণ্ডেনবার্গকে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতেন,—তাঁহার কথার মধ্যে গূঢ় সত্য নিহিত আছে ভাবিতেন।

অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সেনাপতিকে লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এমন সময় তাঁহার কাছে দেশের ডাক পৌঁছিল। গত মহাসমরে যখন ইংরাজ ও ফরাসী-বাহিনীর সমবেত চেষ্টায় ফ্রান্সে জার্ম্মান্-বাহিনীর গতিরোধ হইল এমন সময়ে রাশিয়া ভীমবিক্রমে পূর্ব্বদিক্ হইতে জার্ম্মানীকে আক্রমণ করিল। রাশিয়ান্ সৈন্য জার্ম্মান্-বাহিনী ভেদ করিয়া ইষ্ট প্রুশিয়ায় প্রবেশ করিল। দলে দলে লোক জার্ম্মানীর মধ্যে পলায়ন করিয়া লোকের মনে গুরুতর আতঙ্কের সৃষ্টি করিল।

জেনেরেল লুডেনডর্ফ সেই সময়ে সমরবিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কাইজারকে পরামর্শ দিলেন এ বিপদে হিণ্ডেনবার্গের সহায়তা লওয়াই সঙ্গত। লেকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে এমন উপযুক্ত ব্যক্তি অন্য কেহ নাই।

রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য হিণ্ডেনবার্গ জার্ম্মানীর পূর্ব্বদিকের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। লুডেনডর্ফ তাঁহার সহকারী সেনাপতি হইলেন। মাস্থুরিনা লেকে যুদ্ধে রাশিয়ান্রা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ জগতে কমই হইয়াছে। জলে বিতাড়িত সৈনিকদিগের ভীষণ দুর্দ্দশা দেখিয়া কয়েক জন রুশ সেনাপতি আত্মহত্যা করেন, দুই-একজন পাগল হইয়া যান। বহুসংখ্যক রুশীয় সৈন্য নিহত ও বন্দী হইল। জার্ম্মানী রক্ষা পাইল।

এদিকে পশ্চিম রণক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে জার্ম্মানী সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের নৌবহর জার্ম্মানীর নৌবাণিজ্য বন্ধ করিয়া জার্ম্মানীকে ক্রমশঃ অবসন্ন করিতেছিল। সেখানে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অনটন ঘটিতেছিল। বিপন্ন হইয়া কাইজার নিজের প্রিয় সেনাপতির পরিবর্ত্তে হিণ্ডেনবার্গকে প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। হিণ্ডেনবার্গ রণনৈপুণ্য দেখাইলেন কিন্তু অনটনবশতঃ অন্তর্বিপ্লবগ্রস্ত দেশের পরাজয় রোধ করিতে পারিলেন না। পরাভূত জার্ম্মানী সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল। কাইজার পলায়ন করিলেন। জার্ম্মানীতে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল।

পরাভূত জার্ম্মানীর বিপুল বাহিনীকে দেশমধ্যে সুশৃঙ্খল ভাবে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করা ঐতিহাসিকদিগের মতে হিণ্ডেনবার্গের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের বিষয়। ঐরূপ সৈন্যদল প্রায়ই দেশমধ্যে লুঠ-তরাজ করিয়া বিপ্লব সৃষ্টি করে। হিণ্ডেনবার্গের নাম ও সুশৃঙ্খলার গুণেই জার্ম্মান্ সৈন্যের এই প্রত্যাবর্ত্তন কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল।

গত মহাযুদ্ধে সমরলিপ্ত দেশসমূহের কোনও নেতাই হিণ্ডেনবার্গের মত সম্মান পান নাই। ইংলণ্ডের সমর ব্যবস্থা রচনার প্রধান কর্ত্তা লয়েড জর্জ্জ্কে ইংরাজ জাতি পরিত্যাগ করিয়াছিল; যুদ্ধের পরেই লয়েড্ জর্জ্জের প্রধান মন্ত্রিত্ব যায়। ফ্রান্সের সমরবিজয়ী বীর ফস্কে ফরাসীরা ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদ দেয় নাই। পরাভূত জার্ম্মানীর শাসক সম্প্রদায় সোসিয়ালিষ্ট রাজনীতি দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা হিণ্ডেনবার্গের রাজনীতিকে পছন্দ করিতেন না; কিন্তু তাঁহারাও শেষে হিণ্ডেনবার্গকেই জার্ম্মানীর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ

তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা অনেকটা দূর হওয়া সত্বেও জার্ম্মান্ জাতি হিণ্ডেনবার্গকে আমরণ নিজেদের রাষ্ট্রের সভাপতি রাখিয়াছিল।

প্রথম জীবনে অকৃতকার্য্য কিন্তু পরে সাফল্যমণ্ডিত জীবন—এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ বড়লোকের চরিতলেখকগণ নিজ নিজ নায়কের কোনও অকৃতকার্য্যতার জবাবদিহি করিতে গিয়া অনেক সময় কৌতুক উৎপাদন করেন। মতিলাল নেহেরুর এক চরিতকার লিখিতেছেন, মতিলাল বি.এ. পরীক্ষা দিয়া একটা কাগজে খারাপ করেন বলিয়া তাঁহার ধারণা হয়; তিনি আর পরীক্ষা দিলেনই না। চরিতকার লিখিতেছেন, তাঁহার এক প্রফেসার বলিয়াছিলেন, তিনি সন্দিহান কাগজে মন্দ করেন নাই, পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই পাশ হইতেন। বালগঙ্গাধর তিলকের জীবনকার লিখিয়াছেন, তিলক পরীক্ষার ঘরে বসিয়া দ্বিতীয় বিভাগে পাশের মত প্রশ্ন উত্তর করা হইলেই চলিয়া আসিতেন। জানা থাকিলেও অন্য প্রশ্ন চেষ্টা করিতেন না; এ জন্যই তাঁহার প্রথম পরীক্ষাগুলির ফল ভাল হয় নাই। মতিলাল ও তিলক এত বড় হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের প্রথম শিক্ষার অসম্পূর্ণতার জন্য কোনও জাবাবদিহি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজন।

"সর্ব্বনেশে মাদুলী"

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ

পূজোর ছুটির পর যখন স্কুল খুল্‌ল, অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে দেখ্‌লাম গুপে ডান হাতে মাদুলী বেঁধে এসেছে। কনুইয়ের একটু উপরে ময়লা লাল সূতো দিয়ে বাঁধা চক্‌চকে এক মাদুলী। আমি ভাব্‌লাম সোনার বুঝি, কিন্তু গুপে পরে বল্‌ল নাকি পেতলের। ঘাম লেগে লেগে সোনার মতন হ'য়ে গেছে।

টিফিনের সময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কেন রে?" তা'তে সে এক আশ্চর্য্য কথা বল্‌ল। তার দাদামশাইএর নাকি যখন অল্প বয়স, একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের তলায়

চক্‌চকে এক কুচ্‌কুচে কাগের পালক। প্রথমটা খুব খুসি হ'লেন। ভাব্‌লেন দিব্যি এক খাগের কলম বানিয়ে বন্ধুদের লম্বা লম্বা চিঠি লেখা যাবে। পরে শিউরে উঠ্‌লেন। কি সর্ব্বনাশ! কাগ যে ছুঁতে নেই, ইয়ে টিয়ে খায়, তা'র পালক বালিশের তলায় এল কোত্থেকে? আর কেউ দেখ্‌বার আগেই সেটাকে জান্‌লার শিকের ফাঁক দিয়ে উঠোনে ফেলে দিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তার পরদিনও ঘুম থেকে উঠে দেখেন বালিশের নীচে আবার আর একটা কাগের পালক। এবার আর কোন সন্দেহই নেই; দস্তুর মতন কাগ কাগ গন্ধ পর্য্যন্ত পেলেন। দাদামশাই সেই দিনই মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন, চুল ন্যাড়া করলেন, পাশের বাড়ীর লোকদের তাদের গাছছাঁটা কাঁচিটা ছ' মাস বাদে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন, গঙ্গাস্নান করলেন।

স্নান ক'রে উঠে, ঘাটের উপর দেখেন দিব্যি ফোঁটা কাটা, তিলক আঁকা, জটাওয়ালা, গেরুয়া পরা এক সন্ন্যাসী বাবা হাসি-হাসি মুখ ক'রে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন। দাদামশাই তাঁকে ঢিপ করে এক প্রণাম করলেন। অম্‌নি সন্ন্যাসী তাঁর ডান হাতের কনুইয়ের উপর ঐ লাল সুতো দিয়ে মাদুলীটা বেঁধে দিয়ে, দাদামশাইয়ের ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন, "কুচ্ ডর নেই বেটা। শাঁপখোঁপ সব কেটিয়ে যাবেন।"

দাদামশাইএর ঘাড়ে খুব সুড়সুড়ি লাগা সত্বেও তিনি শুধু একটু কিল্‌বিল্ করে বল্লেন—"ঠিক বল্‌ছ তো ঠাকুর?"

গলার আওয়াজ শুনেই চম্‌কে উঠে সন্ন্যাসী ঠাকুর ঝুলির মধ্যে থেকে সুতো বাঁধা এক চশমা বের ক'রে নাকে পরেই আঁৎকে উঠে বল্‌লেন—"য়্যাঁ! ই কি আছে রে? আরে হামি তো তোমাকে চিন্‌তে পারে নি, উ মাদুলী পল্টু জমাদার কো আস্তে বনায়া, দে দেও রেঁ বেটা, উ তোমারা নেহি!"

কিন্তু কে শোনে? দৈবাৎ অমন মাদুলী মানুষের জীবনে এক আধবার ঘটে যায়। তা'কে কি অম্‌নি অম্‌নি দিয়ে দেওয়া যায়? দাদামশাই ছপাৎ ক'রে এক মালকোঁচা মেরে দে দৌড়।

বাড়ী এসে অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লেন পাশের বাড়ীর আমগাছের ডাল যে পাকা পাকা আমশুদ্ধ তাঁদের উঠোনের উপর ঝুল্‌ছিল, অথচ পাছে নেপাল বাবু পুঁতে ফেলেন সেই ভয়ে কিছু করা যাচ্ছিল না, সে সব আম আপনি আপনি দাদামশাইদের উঠোনে পড়ে গেছে। দেখা গেল নতুন কূয়োতেও ভোর থেকে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল আসছে। রাত্রে ফেলাদা পুকুরে যে ছিপ ফেলে রেখেছিল তা'তে মস্ত এক কাৎলা মাছ পড়েছে। বেলা না হ'তেই দাদামশাইয়ের শালা, গত বছর যে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিল, নিজে থেকে ফেরৎ দিয়ে গেল। উপরন্তু রবিবার দুপুরে নেমন্তন্ন ক'রে গেল। বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখ্‌লেন এমন কি দিদিমার পর্য্যন্ত হাসিমুখ।

মাদুলীর গুণ দেখে দাদামশাই অবাক্। মনে মনে সন্ন্যাসী বাবার ময়লা পায়ে শত শত প্রণাম করলেন।

সেই থেকে বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী ফিরে গেল। টাকা-পয়সা হ'ল; গোরু-ভেড়া হ'ল, ছেলেরা বড় বড় চাকরী পেল, মেয়েদের ভালো ভালো বিয়ে হ'ল। এমন কি মামার বাড়ীর গোরুর দুধের ক্ষীর, গাছের আম, আর পুকুরের মাছের কথা বল্‌তে গিয়ে, উত্তেজনার চোটে গুপে লোমহর্ষণ-সিরীজের ২০নং বইএর পাঁচ ছ'টা পাতার কোণা কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলল।

আরও বল্‌ল—"এই সেই মাদুলী। একচল্লিশ বছর এক মাস দাদামশাইএর হাতে বাঁধা ছিল, এক দিনের জন্যও খোলা হয় নি, দাদামশাইএর হাতে সূতো বাঁধা মাদুলীর সাদা দাগ পড়ে গেছে, গায়ে লেগে লেগে শেষটা এমন হ'য়েছিল যে মাঝে মাঝে নাকি মাদুলীটার উপরও চুল্‌কোত!"

সেই মাদুলী দাদামশাই এক কথায় গুপের হাতে বেঁধে দিয়েছেন কারণ গুপে বায়না ধরেছিল যে মাদুলী না দিলে নাকি সে তেলও মাখ্‌বে না, চানও করবে না, ভাতও খাবে না। আর নেহাৎ যদি খায়ও তা হ'লে এত কম খাবে যে কিছুদিন বাদে পেট না ভরে ভরে হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্‌ করবে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠ্‌বে, চোখ উল্‌টে যাবে—এই অবধি শুনেই দাদামশাই কানে হাত দিলেন ও তখুনি পট্‌ ক'রে মাদুলীর সূতো ছিঁড়ে সেটাকে গুপের হাতে বেঁধে দিলেন।

গুপে দেখ্‌ল মাদুলীর গুণ একটুও কমে নি। আধ ঘণ্টার ভিতরে ছোট মামার ফাউণ্টেন পেনের নিব খারাপ হ'য়ে গেল, ছোটমামা সেটা গুপেকে দিয়ে দিল। পরে অবিশ্যি আবার চেয়েছিল, তাইতেই তো গুপে ছুটির দু'দিন বাকী থাকতেই মামাবাড়ী থেকে চলে এসেছিল।

বাঁড়ী এসেই শোনে মাষ্টারমশাইএর মাম্প্‌স্‌ হ'য়েছে, গাল ফুলে চালকুম্‌ড়ো, সেরে যদি বা ওঠেনও তবু একটি মাসের ধাক্কা!

এর পর গুপে যা' তা' বল্‌তে আরম্ভ করল। নাকি মাদুলী হাতে পরা থাক্‌লে গুপে যখন যা বল্‌বে তাই ঘট্‌তে বাধ্য।

এ কথা শুনে আমরা সবাই ভীষণ আপত্তি করলাম, তা কি কখনও হয়? নগা বল্‌ল—

"এক যীশু ছাড়া আর যে কেউ—"

গুপে ভীষণ রেগে সরু লম্বা ময়লা নখওয়ালা একটা আঙুল নগার দিকে বাগিয়ে বল্‌ল—

"আজ বলে দিলাম তুই ভূগোল ক্লাশে দাঁড় খাবি!"

ওমা, সত্যি সত্যি ভূগোল ক্লাশে নগা দাঁড় তো খেলই, তার উপর কান-মলাও খেল! এর পর আর কারু কিছু বলবার যো নেই। গুপে একবার মাদুলীর দিকে তাকালেই হ'ল, সে যখন যা' বলে সবাই তাই মেনে নেয়। যখন যা' চায় সবাই তাই দিয়ে ফেলে।

তিন সপ্তাহ ক্লাশ শুদ্ধ সবাই গুপের দৌরাত্ম্যে খাবি খেলাম। সে যা' খুসি তাই করতে আরম্ভ করল। এমন কি কালীপদর চুল ছাঁটা পছন্দ হচ্ছিল না ব'লে সে বেচারাকে ন্যাড়া করিয়ে ছাড়ল। সবাই দিন দিন রোগা হ'য়ে যেতে লাগলাম। নগার তো পেণ্টেলুন এমন ঢিলে হ'য়ে গেল যে শেষে তার দাদা ভাই নিয়ে টানাটানি! বলে কি না—"দেখ্‌ছিস না, ও আমার, তোর গায়ে বড় হচ্ছে। হয় আমার, নয় বাবার!"

এদিকে যার যা' ভালো জিনিষ সব গুপে গাপ্‌ করতে লাগল। পেন্সিল, রবার, পেন্সিলকাটা, রঙ্গিন খড়ির বোঝায় গুপের পকেট ঝুলে ঝুলে ছেঁড়ে আর কি! শেষে কি না সে সব রাখ্‌বার জন্য আমার নতুন টিফিনের বাক্সটা একদিন চেয়ে বসল। তখন আমি বেজায় চটে গেলাম। একটু তোৎলামি এসে গেল। মাথাটাথা নেড়ে বল্‌লাম—

"দ্যা—দ্যাখ গুপে, দিন দিন তোর বাড় বাড়ছে। কাল তোর সব অঙ্ক ক'ষে দিয়েছি। আমার টিফিনের অর্দ্ধেকের বেশী খেয়ে ফেলেছিস্‌। ইংরিজি ক্লাশে ছুরী ফট্‌ ফট্‌ করেছিস্‌ আর তার জন্য আমি বকুনি খেয়েছি। বেশী বাড়াবাড়ি করিস্‌ নে বলে দিলাম!"

এক নিঃশ্বাসে রাগের মাথায় এতগুলো কথা ব'লে দেখি গুপে আমাকে শাপ দেবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। তার চোখ দুটো ছোট হয়ে হয়ে আল্‌পিনের ডগার মতন হ'য়ে গেল; ঢোক্‌ গিলে, গলা হাঁকড়ে, আঙ্গুল বাগিয়ে, খন্‌খনে গলায় বল্‌ল—

"আজ তোর জীবনের শেষ দিন। দিনটা কাট্‌লেও রাত কাট্‌বে না।"

ক্লাশময় একটা থম্‌থমে চুপচাপ! তার মধ্যে নরেন বাবু এসে গেলেন, আর কিছু হ'ল না।

একটু পরেই আমার গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসতে লাগল, নিঃশ্বাসটা কি রকম জোরে জোরে পড়তে লাগল, চুলের গোড়াগুলো শির শির করতে লাগল, পেটের ভিতর কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'তে লাগল।

বুঝ্‌লাম মাদুলীর শাপ আমার লেগেছে। কিছু পড়া-টড়া শুন্‌লাম না; হোমটাস্ক্‌ টুক্‌লাম না; ড্রইং ক্লাশে বেয়াদবি করলাম। যার দিন কাট্‌লেও রাত কাট্‌বে না তার আবার ভাবনা কি?

টিফিন-বাক্সটা ক্লাশের মধ্যেই নগার হাতে ঠুশে দিলাম; আমি মরি, আর গুপে সেটা ভোগ করুক্‌ আর কি!

ছুটির ঘণ্টা পড়লে পর মনে হ'ল, আমি তো গেলাম, যাবার আগে ঐ সর্ব্বনেশে মাদুলীটাকে শেষ ক'রে তবে যাব।

দেখি গুপেদের পুরোনো চাকর ভদ্দু গুপের বই গুছিয়ে নিচ্ছে, আর গুপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

তাই দেখ্‌ছে। হঠাৎ খুন চড়ে গেল, ছুটে গিয়ে এক সেকেণ্ডে মাদুলীটাকে কেড়ে, মাড়িয়ে ভেঙ্গে একাকার!

তার থেকে অন্ততঃ একটু ধোঁয়াও বেরোন উচিত ছিল, কিন্তু কিছু হ'ল না। গুপে অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ওদের চাকরটা হাঁই হাঁই ক'রে ছুটে এসে হাত-পা ছুঁড়ে বল্‌লে—

"য়্যাঁ, কি করলে! আমার পেট ব্যথার অব্যর্থ মাদুলী, আমি কালীঘাট থেকে দু' পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি। আগেই জানি গুপীদাদাকে যা দেওয়া যাবে তাই আর কিছু থাক্‌বে না!"

আমরা সবাই হাঁ ক'রে গুপের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার নিশ্চয় কিছু বলা উচিত ছিল, কিন্তু সে অম্লানবদনে পকেট থেকে দু'টো পয়সা বের ক'রে ভদ্দুকে ছুঁড়ে দিয়ে একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বাড়ী চলে গেল।

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬

হরি উদাসীনের মত কত গ্রাম কত নগর পর্য্যটন করে, সর্ব্বত্র 'কটার' সন্ধান করে কিন্তু কোন সংবাদই পায় না। দস্যুদলের গোয়েন্দারা হরিকে দলে টানিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। হরির প্রচুর শারীরিক সামর্থ্য, অসীম সাহস ও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা দস্যুদলের অবিদিত ছিল না। হরি কিন্তু এ সব দলে যোগদান করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। কত প্রলোভনই যে নিত্য তাহার নিকট উপস্থিত হইত, কিন্তু হরি অটল।

হরি গঙ্গাতীরে একটী কুটীরে থাকিত আর সকালে সন্ধ্যায় গাহিত—

'আয় রে, জীবন যায় রে,—মাকে
দেখা দে রে মাখন চোরা।'

একদিন একটী লোক হরিকে বলিল, নিকট গ্রামে এক সন্ন্যাসী আছেন—তিনি তাহার ভাগিনেয়ের সন্ধান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এক অঘটন ঘটাইয়াছেন। এক জমিদার-পত্নী তাঁহার হারানো পুত্রের সন্ধানের জন্য সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হ'ন। গঙ্গা-সাগরের পথে জলদস্যু কর্ত্তৃক তাঁহাদের নৌকা লুণ্ঠিত হয়, তিনি কোন প্রকারে রক্ষা পান কিন্তু পুত্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। শোকাতুরা জননী নানা তীর্থে, নানা দেবমন্দিরে ধন্না দেন—উক্ত সর্ব্বকেশী সাধুর কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য দৈবাদেশ হয়। সাধু প্রথমে কোন ক্রমেই আমল দেন না, সরাইয়া দেন; পরে জননীর একান্ত কাতরতায় তাঁহার দয়া হয়। এক অমাবস্যার রাত্রিতে সন্ন্যাসী যোগবলে সম-আকৃতি পাঁচটী বালককে জননীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! জননী নিজের সন্তানকে চিনিতে পারিয়া পাগলিনীর ন্যায় বার বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং কোলে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি সাধুকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দেন, সাধু তাহা দরিদ্রগণকে বিলাইয়া দিয়াছেন। সাধুর অলৌকিক বিভূতির কথা আজ সর্ব্বত্র।

হরি লোকটীর কথায় যেন হাতে স্বর্গ পাইল; বলিল—"আমিও এক শত স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিব যদি সাধু 'কটা'কে ফিরাইয়া দেন—তাহার জননীও জীবন্মৃত হইয়া আছে।"

সাধু মৌনী, ক্বচিৎ সন্ধ্যার পর কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন। হরি উৎগ্রীব হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই লোকের সঙ্গে সাধু সন্দর্শনে যাত্রা করিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু একপদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—তাই ধরিয়া তাহারা সাধুর পর্ণকুটীরে পৌঁছিল। অতি ক্ষুদ্র কুটীর, সম্মুখে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড। সাধুর আকৃতি ভীষণ-দর্শন। মাথায় জটাজুট, লম্বিত দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, গায়ে ভস্ম বিলেপন, কণ্ঠে হাড়মালা, পরিধানে গৈরিক, আসন ব্যাঘ্রচর্ম্মের, কপালে লাল ত্রিপুণ্ড্রক, পার্শ্বে সিন্দূরাক্ত ত্রিশূল। হরি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড বাঘ দীর্ঘ লোহার শিকলে লোহার খুঁটায় বাঁধা—ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে; হরি দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল।

সাধু হরিকে দেখিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহা বিশেষ কৃপা, সাধারণতঃ তিনি এরূপ করেন না। পরে হরির নিবেদন শান্তভাবে শুনিলেন—ইহাও কৃপার পরিচায়ক। তার পর প্রসাদী দুইখানি ফুল-বাতাসা সাধু হরিকে নিজহস্তে পরিবেশন করিলেন—ইহাও দয়ার চিহ্ন। সঙ্গের লোকটী হরিকে বলিল—সাধু মাত্র চারিখানি বাতাসা ও এক লোটা জল খাইয়া জীবন

যাপন করেন। একটী রাজহস্তী এক তোলা আতপ চাউল ও দুইটী তুলসী পাতা আহার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে—ইহা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ সাধুর আকৃতি দেখিয়া এত লঘু আহারের কথায় অতিমাত্র ভক্তেরও সন্দেহ হইবার কথা; কিন্তু হরি ভক্তিভরে তাহাও বিশ্বাস করিল। সাধুর চরণে মাথা লুটাইয়া হরি কাঁদিল, তাহার ভগিনীর অবস্থা জ্ঞাপন করিল এবং ভাগিনেয়ের উদ্ধার প্রার্থনা করিল। সাধু কোন উত্তর দিলেন না।

সঙ্গের লোকটী বলিল, "তোমার ভাগ্যোদয় হইয়াছে—প্রতিদিন সাধুর পদ বন্দনা করিবে। কৃপা তাঁর হইবেই—তবে কবে হইবে তার স্থিরতা নাই। ইনি ত্রিকালজ্ঞ ও অসাধ্যসাধনে সমর্থ—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবেই।"

হরি প্রতি সন্ধ্যায় বনের আঁকাবাঁকা একপদী ধরিয়া সাধুর আশ্রমে যায়, আর গভীর রাত্রিতে ফিরিয়া আসে; কোন আদেশই পায় না তবু তাহার আশা ও বিশ্বাস অটুট।

সাধুচরিত্র রহস্যময়, এক রাত্রিতে হঠাৎ হরির প্রতি তাঁর কৃপা হইল। তিনি হরিকে বলিলেন—"তুমি পারবে?" হরি বলিল—"প্রভুর কি আদেশ?" সাধু বলিলেন—"আমি যাহা বলিব নির্ব্বিচারে তাহা করিতে হইবে। প্রশ্ন করিতে পারিবে না, যোগের যে সব নিগূঢ় রহস্য তোমাকে জানাইব তাহার ভাল-মন্দ বিচার করিবার অধিকার তোমার নাই। অন্ধভাবে আমার উপদেশ ও আদেশ পালন করিতে হইবে। গোপন কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না। অগ্নি সাক্ষী করিয়া এই শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে চলিয়া যাও—এখনো সময় আছে, ভাবিয়া দেখ। মন্ত্র দানের পর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির কথা আলোচনা করিব।"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর হরি বলিল, "প্রভু, আমি আপনার দাস—প্রতি আদেশ পালন করিব, গোপন কথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করিব না—আমি অগ্নি সমক্ষে শপথ করিতেছি।" সন্ন্যাসী হাসিয়া ত্রিশূলের সিন্দূর হরির কপালে লেপিয়া দিলেন। হোমকুণ্ডের ভস্মে তাহার অভিষেক করিলেন, তার পর তাহার কর্ণে কি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। হরির মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, সে বলিল—

"যদি সে আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়
তবু সে আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

সাধু বলিলেন—"জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

সাধুর কাপালিকের ন্যায় বেশ আর এই বৈষ্ণব ভাব হরিকে বিমুগ্ধ করিল।

তার পর এক ক্ষীণ মশালের আলোকে বন্য পথে সাধু হরিকে লইয়া রওনা হইলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক উন্মুক্ত প্রান্তর পাওয়া গেল—পার্শ্বে বিশাল এক দীর্ঘিকা, জল যেমন গভীর তেমনি কাকচক্ষুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন কুটীরের সারি, মধ্যে দুইটী

ছোট সুন্দর মন্দির দেখিয়া আশ্রম বলিয়া মনে হইল। বাহির হইতে ইহার কোন চিহ্নই জানিবার উপায় নাই। সাধুর কুটীরটী এই আশ্রমের গণ্ডীর বাহিরে—যেন দ্বারপালের ঘাঁটি। আশ্রমে শতাধিক ব্রহ্মচারী, কেহ শাস্ত্রপাঠ, কেহ ভজন গান, কেহ বাদ্য শিক্ষা, কেহ ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছে। শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে শিক্ষা দানে নিযুক্ত। ব্রহ্মচারিগণ দৈহিক সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব, তাহাদের মানসিক সৌন্দর্য্য নাকি আরও দর্শনীয়। সাধু হরিকে বলিলেন—"দেখ, ইহাদের নিবেদিত জীবন—ভগবানের ও জনসেবায় ইহারা আত্মোৎসর্গ করিবে, তাহারই উপযুক্ত সাধনা ও শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই ঝরা মুকুলের পূজাই ভগবানের গ্রাহ্য হইবে।

"তুমি আমার শিষ্য, এখন তোমার কাছে কিছুই গোপন নাই। ইহারা কে জান? ইহাদের জননীরা ভ্রান্ত সংস্কার বশে ইহাদিগকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছিলেন—আমরা সেই সব বজ্‌রা লুণ্ঠন করিয়া এই কোরক পারিজাত হরণ করিয়া আনিয়াছি। ইহাদের দেহে ও মুখে দেখ আভিজাত্যের চিহ্ন—এই সব বালগোপালের আমরা সেবা করি। আমরা সাগর হইতে এই সব মুক্তা লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছি, ইহাতে শ্রীভগবানের গলার মুক্তা-মালা গাঁথিব।"

সাধু হরির হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "এসো এই মন্দিরে।" মন্দিরে পাষাণের বালগোপাল মূর্ত্তি। সাধু গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিলেন—

"'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।'

এই গোপালের আর তাঁর সঙ্গীদের আমরা উপাসক।"

তার পর সাধু হরিকে লইয়া অদূরে আর এক মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কমলে কামিনী মূর্ত্তি—চারিদিকে উত্তাল সমুদ্র, মধ্যে কমল কানন, গণেশজননী গণেশকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতেছেন। অপরূপ মূর্ত্তি, হরি বিভোর হইয়া সেই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। সাধু তাহার বাড়ী উজানি—এ মূর্ত্তি তাহার দেবীর মূর্ত্তি—বড় পরিচিত, বড় আপনার। সাধু বলিলেন—"দেখ মাতৃত্বের গৌরব। জননীর ক্রোড়ে সন্তানকে দেখিয়া সাগর স্তব্ধ! তার দুর্দ্দমনীয়তা লোপ পাইয়াছে, শান্ত সিংহের ন্যায় জননীর পদপ্রান্তে লুটাইতেছে—সম্ভ্রমে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছে।

"আমরা এই সব শিশুগণকে লুণ্ঠন করিয়া আনি। জননীর কোল যাহাদের পক্ষে নিরাপদ নয়, জগন্মাতা কমলে কামিনী তাহাদের আশ্রয়। পাপ দেশাচার যখন কংসের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে—কৃষ্ণ কেশব ভিন্ন, গোপাল ভিন্ন ইহাদের কে সহায় হইবে?

'জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।'

"আমরা ওলন্দাজ আরাকাটী ও সাগরযাত্রীর নৌকাই লুট করি। তুমি অকুণ্ঠিতচিত্তে এই দলে যোগদান কর।"

হরি সাধুর যুক্তিতর্ক, ততোধিক তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকট মাথা নত করিল এবং ধীরে ধীরে সেই জলদস্যুর দলেই মিশিল। (ক্রমশঃ)

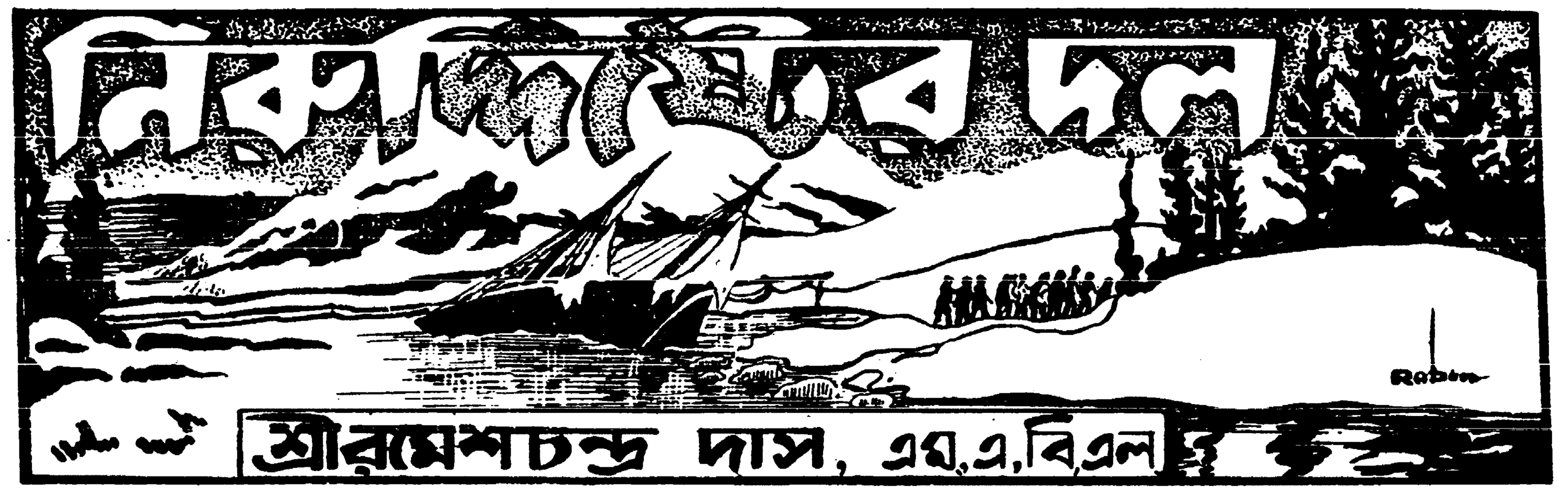

৮

সুশান্ত, রঞ্জিৎ ও অশোকের মনে এখন দিবারাত্র একটি প্রশ্ন—এটা দ্বীপ না মহাদেশ! বুদ্ধি ও বয়সে এই তিনজনই এখন দলের মধ্যে যা একটু বড। আর সকলে যখন তাহাদের বর্ত্তমানের সুখদুঃখ লইয়া মত্ত, তখন এই তিনজনই শুধু ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিত। গাছপালার আকৃতি ও প্রাকৃতিক আবহাওয়া হইতে তাহারা এটা বুঝিয়াছিল যে দ্বীপই হউক আর মহাদেশই হউক ইহা যে গ্রীষ্ম-মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। খুব সম্ভব ইহা নিউজিল্যাণ্ডের চেয়ে আরো নীচে দক্ষিণ মেরুর নিকট অবস্থিত। দক্ষিণ মেরুর প্রচণ্ড শীতের কথা মনে করিয়া তিনজনে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইল। আর ওদিকে শীতেরও বেশী দেরী নাই। বাতাসে বেশ শুষ্ক শাণিত ধার দেখা দিয়াছে। গাছপালার শুকান ঝরা পাতায় মাটী ক্রমে আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণ মেরুর ভয়ঙ্কর মৃত্যুঘাতী শীতের মধ্যে বাঁচিতে হইলে শীঘ্রই তাহাদের একটা পাহাড়ের গহ্বর বা আর কোন রকমের আশ্রয় সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। রঞ্জিতের ইচ্ছা—পাহাড়ের গহ্বরে বাস না করিয়া তাহারা শীত আসিবার পূর্ব্বেই দেশটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার লোকালয়ের সন্ধান করে। না হয়, শত শত মাইল তাহাদের হাঁটিতে হইবে। কিন্তু সুশান্ত ও অশোকের নিকট তাহার মন্তব্য মঞ্জুর হইল না। দেশের অভ্যন্তরে যাইবার রাস্তা কোথায়? অজানা পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে এতগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া যাওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত

নয়। রঞ্জিৎ কহিল—"কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমাগত চল্‌লে একদিন না একদিন আমরা লোকালয়ে এসে পৌঁছুব।"

সুশান্ত কহিল—"এটা যদি মহাদেশ হয় তবেই তা সম্ভব, কিন্তু মনে কর এটা একটা দ্বীপ এবং নিতান্ত জনশূন্য দ্বীপ—তা হ'লে কি হবে?"

অশোক কহিল—"হাঁ, সেটাই এখন আমাদের জানা দরকার। আমরা এই দেশের পশ্চিম দিকে এসে উঠেছি, এখন দেখতে হবে পূর্ব্ব দিকে কোন সমুদ্র আছে কি না। যদি পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র থাকে তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে যে এটা একটা দ্বীপ। চল, আমরা দু'জনে একদিন ও দিক্‌টা দেখে আসি।"

রঞ্জিৎ কহিল—"তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।" সুশান্ত কহিল—"বেশ। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—কাছে পিঠে কোথাও একটা বড় পাহাড় নেই যার উপর উঠে দ্বীপের চারিদিক্‌টা বেশ দেখা যায়। সামনের ওই পাহাড়টাই যা একটু উঁচু কিন্তু তাও ওর উপর ওঠ্‌বার পথ পাওয়া গেল না। আশপাশের জমিও খুব নীচু।"

অশোক কহিল—"নদীর ধার ধরে গেলেও হয়ত পাহাড় পাওয়া যাবে না; আরো গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ব।"

সুশান্ত কহিল—"চল, একদিন আমরা তিনজনে পাহাড়ের উত্তর ধারটা ঘুরে আসি। ওদিকে একটা অন্তরীপের মত আছে; জাহাজ থেকে তা আমি দেখতে পেয়েছিলুম। অন্তরীপের পাহাড়টা ত অন্ততঃ তিনশ' ফুট উঁচু হবে!"

সুশান্ত ও অশোকের অনুমানই যথার্থ। তাহাদের সম্মুখস্থিত উপসাগরটি ওদিকে কতকগুলি পাহাড়ের ধারে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখানটা অন্তরীপই বটে। একটা তিনশত ফুট উচ্চ পর্ব্বতশিখরও সেই স্থলে বর্ত্তমান। সেখান হইতে তাহা প্রায় দশ বারো মাইল দূরে। সেই পর্ব্বতচূড়ার উপর উঠিতে পারিলে হয়ত সমস্ত দ্বীপটার একটা ধারণা করা যাইতে পারিবে। তাহারা ঠিক করিল খুব শীঘ্রই একদিন তাহারা ঐ পাহাড়ে গিয়া উঠিবে। এটা বাস্তবিক দ্বীপ না মহাদেশ তাহা যতক্ষণ না জানা যাইতেছে তত দিন তাহাদের ভাঙা জাহাজটিকে ত্যাগ করিলে চলিবে না। আর যদি এটা প্রকৃতপক্ষে মহাদেশই হয় তাহা হইলে এক আমেরিকা মহাদেশ ছাড়া আর কি হইবে?

কিন্তু উগ্র জলবায়ুর দরুণ তাহারা প্রায় পাঁচ-ছয় দিন বাহির হইতে পারিল না। এ কয় দিন কেবল বৃষ্টি ও কুয়াশায় আকাশের মুখ ছিল ঢাকা। যাত্রা করিতে না পারিলেও অবশ্য এদিকে তাহাদের এটা-ওটা কাজের অন্ত ছিল না। রঞ্জিৎ, কুণাল, রোহিতাশ্ব ও কমলাক্ষ দুই বেলা বন্দুক লইয়া বন্য পাখী মারিতে যাইত। দ্বীপের উপর প্রচুর বন্য কবুতরের বাস। খাইতেও ভারী মিষ্ট।

কিন্তু ভাল শিকারী হইলে কি হইবে, এই ছেলে ক'টি বড় বেয়াড়া—তাহারা ভিতরে ভিতরে একটা দল পাকাইবার মতলবে ছিল। অশোক বুঝিতে পারিল অদূরভবিষ্যতে হয়তো ইহাদের দরুণ একটা ভয়ঙ্কর কলহের সৃষ্টি হইবে। হয়ত কাহারও জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। তাই সে মধ্যে মধ্যে রঞ্জিংকে একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু রঞ্জিতের মত তেজস্বী সাহসী ছেলে অশোককে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তার সমস্ত চেহারায় এমন একটা উগ্র চোখ-ঝল্সানো আভিজাত্যের ছাপ ছিল যে কখনো সে কাহারও অন্তরঙ্গ হইতে পারে না। তার পর তাহার মত অব্যর্থ গুলি ছুঁড়িতেও আর কেহই ছিল না। আকাশের উড়ন্ত পাখীও তাহার লক্ষ্য এড়াইতে পারিত না। গুলি খাইয়া যদি কোন পাখী উড়িয়া কোন ঝোপের মধ্যে বা জলার উপর গিয়া পড়িত তাহাতেও তাহাদের অসুবিধা ছিল না। সঙ্গে থাকিত তাহাদের প্রিয় কুকুর বিয়্যার। বিয়্যার তৎক্ষণাৎ ঝোপ বা জলার মধ্যে লাফাইয়া গিয়া শিকার মুখে করিয়া তুলিয়া আনিত। দ্বীপের উপর বন্য পায়রা ছাড়া অন্যান্য সুখাদ্য পাখীও অনেক ছিল। জল-পিপি, গাঙ-শালিখ, বন-হাঁস, ঘুঘু, পেকারী ইত্যাদি।

সেদিন পনেরোই মার্চ্চ। আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। অন্তরীপের সেই পর্ব্বত-শিখরটি আজ রোদে বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সুশান্ত মনে মনে স্থির করিল আগামী কল্য প্রভাতে সে সেই অন্তরীপ অভিমুখে গমন করিবে। প্রথমে ভাবিয়াছিল সঙ্গে সে অশোককে লইবে। কিন্তু ছোট ছেলেদের দেখিবে কে? রঞ্জিৎ ও তাহার বন্ধুত্রয় তো বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হইবে। শেষে একটা ছেলে কি সমুদ্রে গিয়া ডুবিয়া মরিবে? শেষে সে একাই যাইবে স্থির করিল। আর পথ তো মোটে দশ বারো মাইল। যাওয়া-আসা কুড়ি মাইল পথ সে একদিনেই অক্লেশে অতিক্রম করিতে পারিবে। তবে বিদেশ বিভূঁই—এই যা। তা সময় বিশেষে সাহস না করিলে চলিবে কেন?

পরদিন অতি প্রত্যূষে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগেই সুশান্ত অন্তরীপ অভিমুখে যাত্রা করিল। সঙ্গে সে কেবল এক গাছা মোটা লাঠি ও একটি রিভলভার লইল, অবশ্য একটা ভালো দূরবীণ লইতেও ভুলিল না। পিঠের উপর একটা ব্যাগের মধ্যে কিছু নোনা মাংস, বিস্কুট ও এক বোতল পান করিবার জলও সঙ্গে লইল।

সমুদ্রতীর ধরিয়া হন্‌হন্ করিয়া সে চলিতে লাগিল। প্রথম ঘণ্টায় সে খুব দ্রুতগতিতে যাইতেছিল কিন্তু এখন রাস্তা বড় খারাপ পড়িতে লাগিল। পাহাড়ের শ্রেণী এখানে একেবারে সমুদ্রকূল ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। বড় বড় পাথর-খণ্ড ডিঙ্গাইতে ডিঙ্গাইতে সে হাঁপাইয়া উঠিল। জোয়ারের সময় এই সব পাথর জলে সম্পূর্ণ ডুবিয়া যায়। ঘন শ্যাওলায় পাথরগুলি আবৃত। প্রতি পদেই সে পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ডোবাও পড়িতে

লাগিল। নোণা সমুদ্রজলে এই ডোবাগুলি পরিপূর্ণ। পথের চেহারা দেখিয়া সুশান্তর বড়ই দুর্ভাবনা হইল। জোয়ারের সময় এ পথে আর ফেরা যাইবে না। তখন এখানে গভীর সমুদ্র গর্জ্জন করিবে। তাই সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে চলিবার চেষ্টা করিল, যাহাতে জোয়ারের পূর্ব্বেই ফিরিতে পারে।

দুই ঘণ্টা একটানা পথ চলিয়া সুশান্ত একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এক জায়গায় সমুদ্রের নিকট একটা পাথরের আড়ালে দুইটা সীলের দর্শন মিলিল। তাহারা মানুষ দেখিয়া ভয়ে জলের মধ্যে পলাইল না। সুশান্ত বুঝিল ইহারা পূর্ব্বে কখনো মানুষ দেখে নাই। আরো কিছুদূর গিয়া সে কতকগুলি পেঙ্গুইন পাখী দেখিতে পাইল। পেঙ্গুইন দেখিয়া সুশান্তর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহারা যে একেবারে দক্ষিণ মেরুর নিকট কোন দ্বীপে আসিয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। য়্যান্‌টার্ক্‌টিক্ মহাসাগরের নিকটেই তো পেঙ্গুইন পাখীর সাক্ষাৎ মেলে!

বেলা দশটার সময় সুশান্ত অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। সামনেই তিনশত ফুট উচ্চ এক পাহাড়। তখন আর পাহাড়ে উঠিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে সেইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। সমুদ্রে জোয়ার আসিয়া গিয়াছে, ভাটার সময় ছাড়া ত আর ফেরা যাইবে না।

অনেকক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া সুশান্ত শঙ্কিতচিত্তে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল এবং বহুক্ষণের চেষ্টায় অতিকষ্টে একেবারে চূড়ার উপর গিয়া উঠিল। দুই চোখে দূরবীণ লাগাইয়া সে চারিদিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। পূর্ব্বদিকে বহুদূরবিস্তৃত এক সমতল ভূমি। এই পাহাড়টাই সেখানকার মধ্যে সব চেয়ে বড়। ভিতরের জমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যাইতেছে, দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে জঙ্গলের সংখ্যাই বেশী। জঙ্গলের মধ্য দিয়া অসংখ্য নদী-নালা সমুদ্র-উপকূলে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব দিকে সে সমুদ্রের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। উত্তর দিকে উন্মুক্ত মরুভূমি সদৃশ এক বালুময় প্রান্তরভূমি চোখে পড়িল, দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে একটি দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমি। আর পশ্চিম দিকে ত' সেই মহাসমুদ্র, যাহার উপর দিয়া তাহাদের জাহাজ ভাসিয়া আসিয়াছে। পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখে সেই মহাসাগর নীলকান্ত মণির মত সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। চোখে দূরবীণ লাগাইয়া সে সেই মহাসাগরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ কি এক দৃশ্য দেখিয়া সে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ যে তাহার বিশ্বাসই হয় না!

(ক্রমশঃ)

বৃষ্টিতে ভেজা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

বর্ষা আসিতেছে ; এখন অনেককেই নানা কারণে বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। অবশ্য বৃষ্টিতে না ভিজিলেই সব চেয়ে ভাল। কিন্তু অনেকে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কোন বাড়ীর বারান্দায় বা কোন আনাচে কানাচেতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাই সব চেয়ে খারাপ। ভিজিয়া গেলে কখনও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও না। ঐ সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ জ্বর প্রভৃতি অনেক পীড়াই হইতে পারে।

ভিজিবার পর বেশ জোরে হাঁটিয়া নিজের বাড়ীতে বা অন্য আত্মীয়-বন্ধুর আশ্রয়ে যাও। জোরে হাঁটিবার সময় শরীরে তাপ উৎপন্ন হয়, এ জন্য ঠাণ্ডা লাগে না ; যেমন সাঁতারের সময় অনেকক্ষণ জলে থাকিলেও ঠাণ্ডা লাগে না।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া ভিজা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া শুকনা গামছা বা তোয়ালে দিয়া ভাল করিয়া গা মুছিবে—যেন গায়ে বেশ একটু গরম ভাব অনুভব হয়। কাপড় ছাড়িয়া, ঠাণ্ডার দিন হইলে কিছু অতিরিক্ত গাত্রবস্ত্র বা জামা দিয়া শরীর আবৃত করিবে। অতঃপর এক পেয়ালা গরম চা বা দুধ খাইলে শরীর বেশ গরম হইয়া উঠিবে এবং কোনও রকম অসুখ হইবার সম্ভাবনা প্রায় লোপ পাইবে।

খুব বেশী ভিজিলে আগুন জ্বালিয়া শরীরকে গরম করিতে পার।

আদা, পেঁয়াজ, লঙ্কা ও গোলমরিচ প্রভৃতি ঝাল জিনিষ খাইলেও শরীর বেশ গরম হইয়া উঠে। তবে ঐগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় খাইলে অন্য উপসর্গ হইতে পারে। সকলই পরিমিত মাত্রায় ভাল।

ধূমপানের 'পাইপ'

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ

এর আগে 'শিশুসাথী'তে আমি যখন 'হুকো-কল্কের জন্মকথা' লিখেছিলাম তখন অনেক সহৃদয় পাঠক এবং আমার কয়েক জন 'পাইপ-টানা' বন্ধু আমায় ব'লেছিলেন, হুকো-কল্কে, গড়গড়া-সিগারেট, এমন কি বিড়ির কথাও আমি ব'লেছি কিন্তু বলি নি কিছু 'পাইপ' সম্বন্ধে। এটা ভয়ানক অবিচার।

অবিচার সন্দেহ নেই। কিন্তু তখন আমি 'পাইপ' সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। তবে কথাটা আমার মনে ছিল। কয়েক মাস অনুসন্ধানে যা জানতে পেরেছি তাই-ই এখানে ব'লব।

আমাদের দেশে সাহেবরা এবং সাহেব-ভাবাপন্ন বাঙ্গালীরা 'পাইপ' টানেন। এই 'পাইপ' কিন্তু একদিনের আবিষ্কার নয়। অনেক রকমারির ভিতর দিয়ে তবে বর্ত্তমান পাইপের উদ্ভব হ'য়েছে।

ইংলণ্ডে দু'শ' বছরের উপরে তামাক প্রচলিত হ'য়েছে। প্রথমে কিন্তু নস্যিরই চল ছিল। মেয়েরা পর্য্যন্ত তখন নস্য ব্যবহার করতেন! প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি কাউপার এক যায়গায় লিখেছেন :—

"Says the pipe to the snuff-box, I cannot understand
What the ladies and gentlemen see in your face,
That you are in fashion all over the land,
And I am so much fallen into disgrace!"

(পাইপ নস্যির ডিবেকে বল্‌ছে, "আমি বুঝি না, ভদ্রমহিলা এবং মহোদয়রা তোমার মধ্যে এমন কি খুঁজে পান যে তুমিই সর্ব্বত্র 'ফ্যাশন' হয়ে আছ, আর আমি সইছি এত অপমান!)

এখন কিন্তু হ'য়েছে ঠিক উল্টো। এখন মেয়েরাও সেখানে পাইপ এবং সিগারেট টানছে, আর নস্যির কথা ভুলেই গেছে বল্‌লে হয়! অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বৃষ্টলএ প্রায় বারটা নস্য-তৈরীর কারখানা ছিল। উপরের

কবিতা থেকেই বোঝা যায় এই সময়ে পাইপ-যোগে ধূমপান আবিষ্কার হ'য়ে গেছে; কিন্তু ভদ্র-সমাজে তা' চলত না—'ফল্‌ন্ ইন্‌টু ডিস্‌গ্রেস্' !

স্যর্ রবার্ট্ পয়ণ্ট্‌জ্‌এর উদ্যানে স্যর্ ওয়াল্‌টার র‍্যালে সর্ব্বপ্রথম ধূমপান করেন পাইপে—'ব্লোইং এ ক্লাউড্' !

কথিত আছে, এই সময়ে তাঁর চাকর তাড়াতাড়ি প্রভুর বিপদ্ বুঝে এক বালতি জল ঢেলে দেয় তাঁর মাথায়।

কিন্তু এর পর থেকেই পাইপ যোগে ধূমপান ভয়ানক ভাবে বাধা পায়। কেউ কেউ এই ধূমপানের বিরুদ্ধে বই লিখলেন—কেউ আঁকলেন—কার্টুন ছবি !

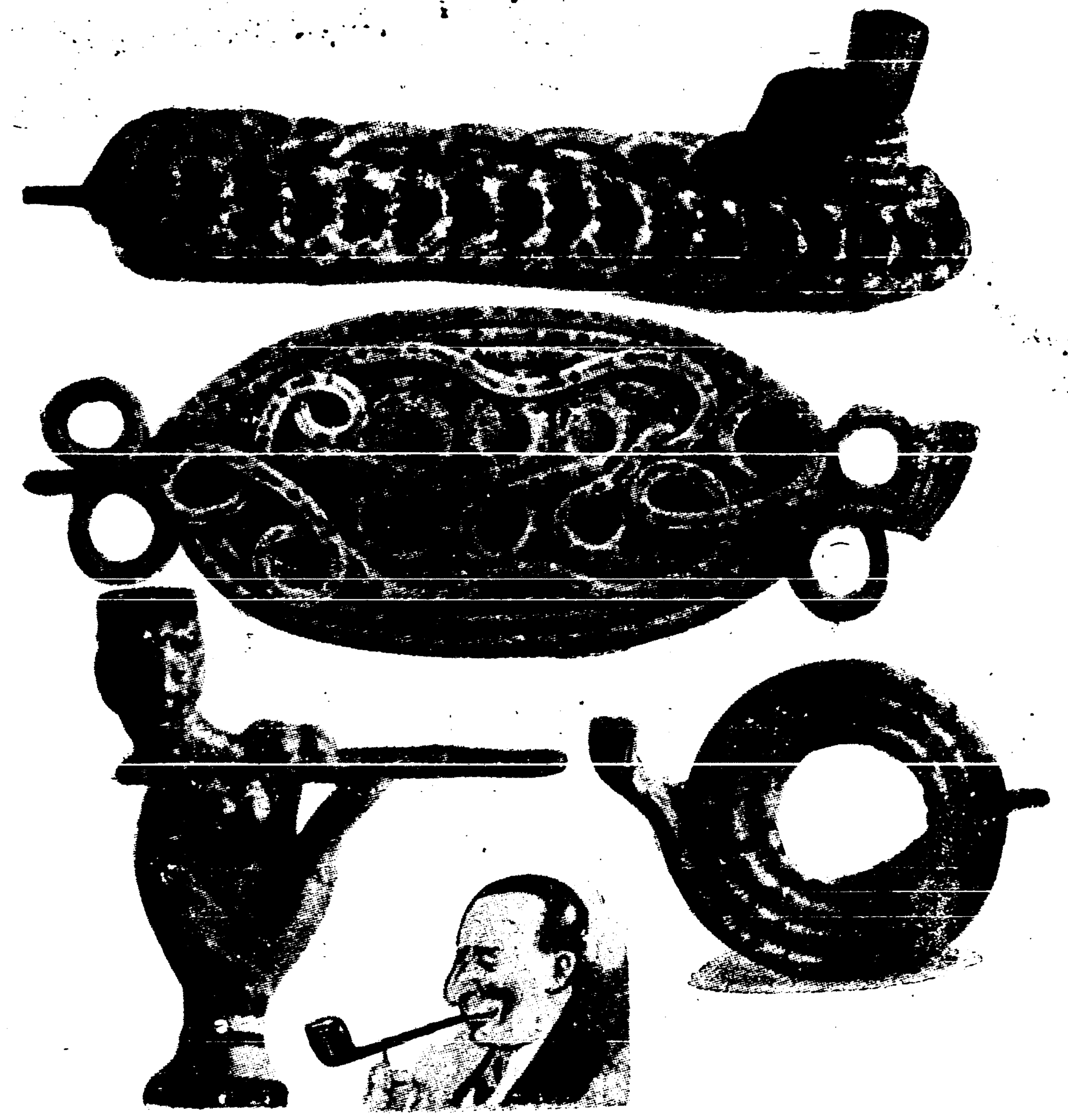

সকলের উপরে—অষ্টাদশ শতাব্দীর পাইপ; তার নীচে জটিল পাইপ; তৃতীয় সারিতে—বাঁ দিকে 'হার্ট্ ইন্ হাণ্ড' পাইপ ও ডানদিকে সাপ পাইপ। নীচে—আধুনিক পাইপ।

কিন্তু কিছুতেই বাধা মানল না। এর পর মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা ওয়াল্‌নাট্ নামক ফলের আঁঠিতে ছিদ্র ক'রে তাতে ফাঁপা কাঠি লাগিয়ে ধূমপান করতেন। ধনবানেরা মজলিশে ধূমপান করতেন রূপার কাঠিতে। ঐ পাইপ একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে ফিরত। বলা বাহুল্য এই সময়ে রূপার ওজনে বিক্রী হ'ত তামাক !

আগেকার দিনে লোকে সমস্ত বিষয়েই কারুকার্য্য ও জটিলতা পছন্দ করতেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে পাইপের বেলাতেও তাই। প্রথম যুগের পাইপ

খুব জটিল—তার পর Snake অর্থাৎ সাপের প্যাঁচ, তার পর হ'ল 'হার্ট্-ইন্-হ্যাণ্ড্' এবং সর্ব্বশেষে আধুনিক পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে পাইপ।

কিশোর বঙ্গ রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত বারের 'রামধনু'তে তোমরা পড়েছিলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বয়স আশী বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বাংলার ছেলেমেয়েদের পক্ষ থেকে তাঁর একটি জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন হচ্ছিল। বাংলার যত নাম-করা শিশুসাহিত্যিক ও কিশোরপাঠ্য মাসিক পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষরা এর ভার নিয়েছিলেন। গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ কলকাতার বিখ্যাত এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে মহা সমারোহের সঙ্গে এই জয়ন্তী-উৎসব হয়ে গেছে।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

তোমাদের মধ্যে যাদের এই সভায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের কাছে নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই। যারা সশরীরে উপস্থিত হ'তে পার নি তারাও অনেকে হয়তো এর কিছুটা অংশ উপভোগ করেছ বেতারের মধ্যে দিয়ে—কারণ পূরো ত্ব' ঘণ্টা সময় এই অনুষ্ঠানটিকে বেতারে শোনান হয়েছিল—যদিও সমস্ত অনুষ্ঠানটি সময় নিয়েছিল তিন ঘণ্টারও বেশী। কবির বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় তাঁর পক্ষে সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নি। তাঁকে শোনাবার জন্যই বিশেষ করে এই বেতারের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজেও তোমরা নিশ্চয়ই এর বিবরণ পড়েছ, এখানে সংক্ষেপে শোনাচ্ছি।

এম্পায়ারের প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চ—কিন্তু সেদিন তাতে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বিশ্বকবির প্রতি বাংলার ছেলেমেয়েদের এই ভালবাসা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় নি।—

টিকেট না পেয়েও শুনেছি অনেককে হতাশ হ'তে হয়েছে। প্রায় ৬টার সময়েই অনুষ্ঠান সুরু হয়। প্রথমেই কবির "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটি গাওয়া হয়। তার পর আনন্দবাজার-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। এর পর অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ভারতী সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর উৎসবের সভাপতি ডক্টর কালিদাস নাগ একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন, এবং উৎসবের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ কবিকে এই উৎসব-প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব উপহার দেওয়া হচ্ছে সেগুলির কথা ঘোষণা করেন। তার পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি, নৃত্য ইত্যাদি বিচিত্র অনুষ্ঠানের পর বেতার প্রোগ্রাম সুরু হয়। শ্রীমতী লীলা দেবীর একটি গানের পর কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি কবিতা শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী পড়ে শোনান। কবিতাটির কয়েকটি লাইন এই রকম :—

"হে চিরকিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন্ রসলোক হ'তে
আনন্দ-বেণু হাতে লয়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে ?
কোন্ সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি ক'রে
বিলাইয়া দিলে রসতৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে!

* * *

তোমার এ রস পান করিবার অধিকার পেল যারা
তারাই কিশোর, তোমাতে দেখেছে নিত্য কিশোরে তারা।"

এর পর কবি শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু 'শিশু কবির প্রতি বাঙ্গালী শিশুমহল নামে একটি অতি সুন্দর কবিতা পড়েন। এটিরও কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিলাম :—

"বন্ধু রবি, তোমার নাকি বয়স হ'ল আশি ?
মোদের কাছে শিশু তুমি রইলে বার মাসই।
বুড়ো বলে তোমায় মোরা ভাবতে পারি না যে,
তোমার আসন রইল স্থায়ী মোদের আসর মাঝে।
তুমি শিশু, চির-কিশোর, বন্ধু তুমি জানি,
শিশু বুড়ো সবাই করে তোমায় টানাটানি।

* * *

বন্ধু রবি, তোমার বয়স আশি বছর নাকি ?
আমরা জানি আটের পিঠে শূন্যটি যে ফাঁকি।

আশির থেকে অনায়াসে শূন্যটি বাদ দিয়ে
আট বছরের সঙ্গী মোরা করব তোমায় নিয়ে।"

এর পর সুবিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার শিশুসাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দন করেন এবং বিভিন্ন কিশোর-পত্রিকার পক্ষ থেকে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তোমাদের, রামধনুর কিশোর বন্ধুদের, হয়ে তোমাদের সম্পাদক মশাইও কবিকে শ্রদ্ধা জানান। বিভিন্ন কিশোর-পত্রিকার পক্ষ থেকে বলেন—পাঠশালার হয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, রামধনুর হয়ে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, মৌচাকের হয়ে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, মাসপয়লার হয়ে শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, ভাইবোনের হয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু, কৈশোরকের হয়ে শ্রীযুক্ত সুধাংশু গুপ্ত, রূপকথার হয়ে শ্রীযুক্ত রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার, রংমশালের হয়ে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন, কিশোর বাংলার হয়ে 'অরূপ' ও আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দ মেলার হয়ে 'মৌমাছি'। রেডিওর ছোটদের আসরের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কবিকে শ্রদ্ধা জানান।

সব শেষে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকটি অভিনীত হয়। এতে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকদের কয়েক জন—যেমন শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু (ঠাকুরদা), শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু (কবিরাজ), শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় (রাজ-কবিরাজ), শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব (প্রহরী), শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী (মোড়ল), শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ (মাধব দত্ত), শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (রাজদূত), শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চৌধুরী (দইওয়ালা) ইত্যাদি। এই অভিনয়টি অনবদ্য হয়েছিল ; বিশেষতঃ নায়ক অমলের ভূমিকায় শ্রীমান্ নিখিল ঘোষের চমৎকার অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। সুধার ভূমিকায় শ্রীমতী বাণী দেবী ও ছেলের দলে অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়ও সুন্দর হয়েছিল।

অভিনয়ের পর "রবির আলো ছড়িয়ে প'ল" গানটি ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে মিলে গেয়ে কবিকে প্রণাম জানাবার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

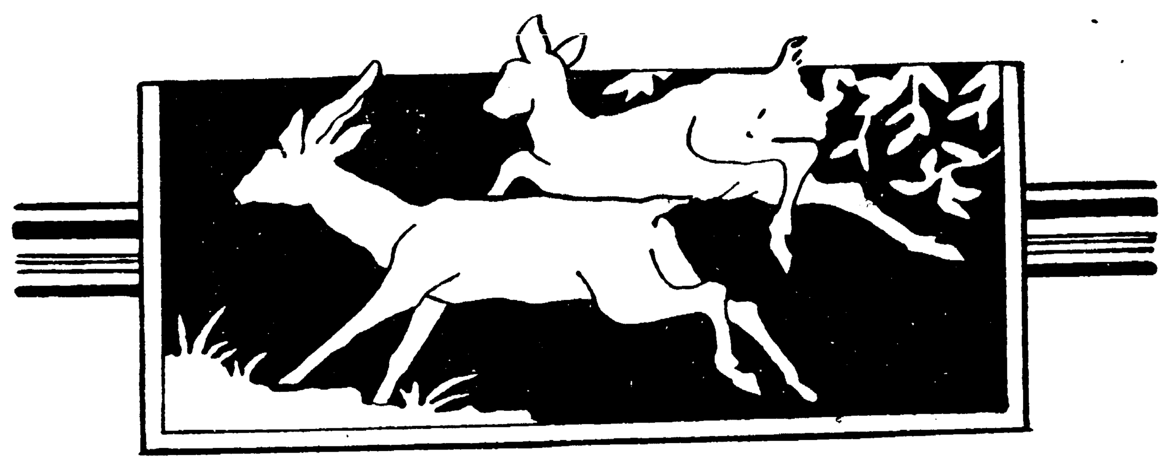

রবীন্দ্রনাথ

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ. বি.এল্

বিভিন্ন অন্তর মাঝে যে তরঙ্গ ধার
ক্ষণতরে অতি ঘন আলোড়নে তার
দেয় চিত্ত আন্দোলিয়া, হে কবীন্দ্র রবি,
বিশ্বের সে মনোভাব পুঞ্জিত কি সবি
নিরন্তর বক্ষে তব ? তাই কি গো হেরি
বিষম মানবচিত্তে তুলিছ লহরী ?
উদাত্ত গম্ভীর বাণী, তারি এক পাশে
লঘু হাস্য কলকণ্ঠে আপনা প্রকাশে।

এ বিশ্বের প্রতি দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের সুর,
অবিমিশ্র আনন্দের গন্ধে ভরপূর
দেবের নিখিল সৃষ্টি ; মোরা দেখি না তো
অপূর্ণের অত্যাচারে সতত আহত
আমরা ধরার জীব। ওগো বন্ধু, তাই
আস্বাদিয়া সে আনন্দ তৃপ্তি তব নাই।
দিতেছে বাঁটিয়া তাই সবারে ধরার
তোমার মুখর বীণা সে আনন্দ ভার।

রবীন্দ্রনাথের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বড় বড় লোকের জীবনী পড়লে অনেক সময় অনেক মজার মজার কাহিনীর কথা জানা যায়। নেহাৎ তুচ্ছ ছোটখাট সব ঘটনা—কিন্তু গল্প-উপন্যাসের চেয়ে সেগুলি কম লোভনীয় নয়। শুধু সত্য ঘটনা বলে নয়, বিখ্যাত বিখ্যাত লোকেদের

সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ থাকাতেই বোধ হয় এগুলি মনকে এত আকৃষ্ট করে। এ রকম কিছু কিছু গল্প তোমরা রামধনুর মারফৎ শুনেছ, আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ২।৪টি গল্প শোনাব। এর কোন কোনটা তাঁর আত্মজীবনী "জীবনস্মৃতি" বা "ছেলেবেলা" থেকে সংগৃহীত, কোন কোনটা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত লোকের কাছ থেকে শোনা।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা সম্বন্ধে যারা একটু আধটু খবর রাখ তারা বোধ হয় জান যে তখনকার দিনের বড়লোকদের বাড়ীর নিয়ম মাফিক তাঁর ছেলেবেলাটা কেটেছিল চাকরদের তত্ত্বাবধানে। বলা বাহুল্য এই চাকরদের শাসনে তাঁর জীবনটা খুব মধুময় হয়ে ওঠে নি। বড় হয়ে কবি এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন : "ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাস রাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না, আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসন কালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না।"

চাকরেরা শুধু তাঁদের জলখাবারের লুচি, দুধ ইত্যাদির ওপর ভাগ বসাত না, তাঁদের জন্য যে নির্দ্দিষ্ট জলখাবারের পয়সা বরাদ্দ ছিল তা থেকেও সুবিধা পেলে কিছুটা সঞ্চয় করত। এ জন্যে তারা চাইত ছেলেরা যাতে সস্তা জলখাবার ফরমাস করে—যেমন মুড়ি, চীনেবাদাম, ছোলা সিদ্ধ ইত্যাদি। শিশু রবীন্দ্রনাথ তা বুঝতেন এবং ভৃত্যের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে দ্বিধা করতেন না।

শ্যাম নামে তাঁদের বাড়ী একটী চাকর ছিল। সে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথকে ঘরের একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে তাঁর, চারদিকে খড়ি দিয়ে একটা গণ্ডী এঁকে দিয়ে যেত, আর বল্‌ত, খবর্দ্দার, গণ্ডীর বাইরে গেলেই সর্ব্বনাশ হবে। শিশু রবীন্দ্রনাথের সীতাহরণের ভয়াবহ কাহিনী জানা ছিল—কাজেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে সেই গণ্ডীর মধ্যে বসে থাকতে হ'ত। শ্যামচন্দ্র ইচ্ছামত বেরিয়ে বেড়াতেন।

রবীন্দ্রনাথদের বাড়ীতে একটা পুরোনো সেকেলে আমলের ভাঙ্গা পাল্‌কী ছিল, তার রং গিয়েছিল চটে, গদীর ছোবড়া গিয়েছিল বেরিয়ে, বাড়ীর নানা অদরকারী বরখাস্ত জিনিষের সঙ্গে সেটাও এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথ সুবিধে পেলেই নির্জ্জন দুপুরে গিয়ে তার মধ্যে বসে থাকতেন, আর

খুলে দিতেন তাঁর কল্পনার ঘোড়ার রাশ। কখনও তাঁর মনে হ'ত ওটা যেন গভীর সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ, আর তিনি হচ্ছেন রবিন্সন ক্রুসো। কখনও ভাবতেন ওটা বুঝি একটা ময়ূরপঙ্খী নৌকো—ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। আবার কখনও মনে করতেন সত্যি সত্যি পাল্‌কী চড়ে তিনি চলেছেন, বেহারার দল 'হাঁই হুঁই' ক'রে জঙ্গলী পথ বেয়ে চলছে, সঙ্গে আছে বন্দুকধারী বরকন্দাজ। পথে হয়তো দেখা হ'ল একটা হিংস্র বাঘের সঙ্গে কিংবা একদল ডাকাতের সাথে—হা রে রে রে রে রে করে তারা তেড়ে এল। ভীষণ লড়াই হ'ল তাদের সঙ্গে—কত লোক জখম হ'ল, কত লোকের মাথা কাটা গেল! শেষে ডাকাতরা হেরে পালাল। এই রকম উদ্ভট কল্পনার আনন্দে তাঁর কল্পনাপ্রবণ শিশুমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত সেই ভাঙ্গা পাল্‌কীর মধ্যে।

ইস্কুলে মাষ্টার মশাইরা রবীন্দ্রনাথকে শাসন করতেন, শিশু রবীন্দ্রনাথ তার শোধ নিতেন বাড়ীতে বারান্দার কাঠের রেলিংগুলির উপর। একটা লাঠি হাতে ক'রে চৌকি পেতে তিনি সেই রেলিংগুলির সামনে বসতেন, রেলিংগুলি হ'ত ছাত্র, আর তিনি মাষ্টার মশাই। রেলিংগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভাল ছেলে, কোন্‌টি মন্দ তা আগেই ঠিক করা থাক্‌ত। দুষ্টু রেলিংগুলিকে ক্রমাগত তাঁর হাতের বেত্রাঘাত সইতে হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শনও চল্‌ত—"বড় হ'লে কুলিগিরি করে খেতে হবে।"—ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের শরীর ছেলেবেলা থেকেই খুব শক্তপোক্ত ছিল, অসুখ-বিসুখের ধার ধারতেন না। শীতের দিনে অন্ধকার থাকতে উঠে পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি লড়তেন। তাঁদের বাড়ীতে মাটী কুপিয়ে তার মধ্যে সর্ষের তেল ঢেলে কুস্তির আখড়া তৈরী করা হয়েছিল। ছেলের অত কাদামাটী মাখা কিন্তু তাঁর মায়ের পছন্দ হ'ত না—ভয় হ'ত পাছে ছেলের গায়ের রং ময়লা হয়ে যায়। তার প্রতিকারের জন্যও বেচারাকে কম দুর্ভোগ সইতে হ'ত না। রবিবার সকালে চল্‌ত ছেলের গা সাফ করার পালা—বাদাম-বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা ইত্যাদি মিশিয়ে তাই দিয়ে খুব কষে দলাই-মলাই করা হ'ত—রবীন্দ্রনাথের তো প্রাণ অস্থির! কুস্তির মত সাঁতারও শিখতে হ'ত। সাঁতারে তিনি ওস্তাদ্ কম ছিলেন না। অপেক্ষাকৃত

বড় বয়সে একবার সাঁৎরে পদ্মা পার হয়েছিলেন। যদিও সে পদ্মা ছিল চর-পড়া, এবং তার স্রোতও তেমন কিছু নয়—তবুও পদ্মা তো বটে!

রবীন্দ্রনাথের একটি ভাগ্নে ছিলেন, প্রায় তাঁরই সমবয়সী—তাঁর নাম সত্যপ্রকাশ। ইনি রবীন্দ্রনাথের পেছনে প্রায়ই লাগতেন। রবীন্দ্রনাথ রেলগাড়ী চড়বার আগে সত্যপ্রকাশের রেলগাড়ী চড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বার প্রথম রেলগাড়ী চড়েন তখন এই ভাগ্নেটি তাঁকে এই ব'লে সাবধান করে দেয় যে রেলগাড়ীতে চড়া ভয়ঙ্কর সঙ্কট। পা ফস্‌কালে আর রক্ষা নেই। তার পর গাড়ী যখন চলতে থাকে তখন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আশ্রয় করে বসা চাই, নইলে এমন ভীষণ ধাক্কা দেয় যে আরোহী কোথায় ছিটকে পড়ে তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য এর ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রেলগাড়ী আরোহণ দস্তুর মত ভীতিজনক হয়ে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের যখন পৈতে হ'ল তখন তাঁর সঙ্গে আরও দু'টি সমবয়সীরও পৈতে হ'ল। তিনজন নেড়া মাথায় তেতালার ঘরে আশ্রয় নিলেন। ব্রহ্মচারীর দল সুবিধা পেলেই পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরে টানাটানি করতেন। ঘরের কোণে একটা বাঁয়া ছিল, নীচের তলা দিয়ে কোন চাকর গেলেই তিন জনে ধপ্ ধপ্ ক'রে তা'তে আওয়াজ করতেন। ব্রহ্মচারীদের মুখ নাকি শূদ্রদের দেখাতে নেই—ভীষণ অপরাধ হয় নাকি তাতে শূদ্রদের! চাকররা আচমকা আওয়াজ শুনে ওপরের দিকে চাইত, তার পর তিন 'বটু'র মুখ দেখেই অপরাধের ভয়ে ছুটে পালাত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা সুরু হয় ৭।৮ বছর বয়সের সময়। তাঁর এক ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ (তাঁর চেয়ে বয়সে বড়) তাঁকে কি করে কবিতা লিখতে হয় তাই শিখিয়ে দিলেন। এই ভাগ্নেটির কাছে বঙ্গভাষার চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা উচিত। বাংলা সাহিত্যে বাস্তবিকই এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। নতুন কবিতা লিখতে শিখে শিশু রবীন্দ্রনাথ একখানা নীল খাতা যোগাড় করলেন, তার পর প্রচণ্ড উদ্যমে বড় বড় কাঁচা অক্ষরে কবিতা লিখতে সুরু করলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন: "হরিণ-শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত

আরম্ভ করিলাম।" বাড়ীর কর্ম্মচারী, কাছারী-বাড়ীর আমলাবৃন্দ হ'ল তাঁর শ্রোতা। কবি লিখেছেন: "কাব্য গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই। কবিকীর্ত্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে এক একে তিন হইয়াছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন।"

সেই নীল খাতাটি আজ পর্য্যন্ত টিকে থাকলে যে কোন মিউজিয়ামের পক্ষে একটি অমূল্য সম্পদ্ হ'ত, কিন্তু সেটি অল্প কিছুদিন পরেই কোথায় হারিয়ে যায়, তার স্থান নেয় একটি বাঁধান লেট্স্ ডায়রী। এই ডায়রীটি নিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে এক শিশু নারকেল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে কবিতা লিখে যেতেন। এ খাতাটিও নাকি বহু দিন হ'ল হারিয়ে গেছে।

সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পড়াশুনা করবার জন্য বিলেত যান। সেখানে একবার একটি মজার কাণ্ড ঘটেছিল। ভারতের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তিনি লণ্ডন সহর থেকে কিছু দূরে থাকতেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে আদর করে 'রুবি' বলে ডাকতেন। তাঁর ওখানে যাবার জন্য প্রায়ই তিনি 'রুবি'কে চিঠি লিখতেন, রবীন্দ্রনাথ যাই যাই করে সঙ্কোচ বোধ করতেন। অবশেষে একদিন এক টেলিগ্রাফে নেমন্তন্ন এল—যাওয়া চাই-ই। টেলিগ্রাম পেয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই লজ্জিত হ'লেন, এবং কলেজ থেকে বাড়ী না এসে সটান গেলেন ষ্টেশনে। সেদিনটা ছিল বড় দুর্য্যোগ, ট্রেন-বিভ্রাট প্রভৃতি নানা গণ্ডগোলে রবীন্দ্রনাথের যথাস্থানে পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গেল—৭টার জায়গায় ৯॥টা। সারাদিন উপবাসের পর রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন, এইবার যা হোক্ ক্ষুধাটার শান্তি হবে, কিন্তু ও হরি, বাড়ীর গিন্নী সমস্ত ব্যাপার শুনেও তাঁকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার নামও করলেন না, কারণ তিনি ঠিক ডিনারের সময় পৌঁছতে পারেন নি। গিন্নী শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "কি রুবি, এক পেয়ালা চা খাবে?" এতেই নিস্তার নেই, সেই অভুক্ত পরিশ্রান্ত কিশোরকে সেই অবস্থায় কয়েকজন প্রাচীনার সঙ্গে বিলিতী কায়দায় নৃত্য করতে হ'ল। শেষে গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, "রুবি, রাত্রে কোথায় থাকবে?" বলা বাহুল্য ঐ শীতের রাত্রে এত ব্যাপারের

পর এ প্রশ্নটিও কম সাংঘাতিক নয়। অবশেষে খাদ্যদানের মত শোবার জায়গা দিতেও যে মহিলাটি কার্পণ্য করবেন, রবীন্দ্রনাথ তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। সে রাত তাঁকে একটা হোটেলে গিয়ে কাটাতে হ'ল—গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে ঠাঁই মিল্‌ল না। তবে তিনি দয়া করে সঙ্গে একটি পথপ্রদর্শক চাকর ও লণ্ঠন দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী জীবনের ২।১টি কথা এবার বলি। তিনি লোকটি চিরকালই খুব পরিশ্রমী—আলস্যের ধার ধারেন না। খুব ভোরে ওঠেন, তার পর নিজের কাজ নিয়ে বসেন। পড়াশুনাও করেন অসম্ভব রকম। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বই এত খুঁটিনাটি ক'রে দাগ দিয়ে পড়েন যে ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। যখন লিখবার নেশা চাপে তখনও নাকি সে একটা দেখবার জিনিষ—ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে বসে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে লিখে চলেছেন, একটু আরামের কথাও মনে আসে না। গ্রীষ্মের দুপুর বেলা তপ্ত রৌদ্রে বাইরে তাকান যায় না। আশে-পাশে সবাই হয়তো ঘুমুচ্ছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই গরমেও জানলা খুলে দিয়ে এক মনে পড়ে চলেছেন—ঘরে পাখা নেই, দিবানিদ্রারও ধার ধারেন না তিনি।

অনেক দিন আগেকার কথা। শান্তিনিকেতনের ইস্কুল তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। কর্ম্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। একটি মাত্র চাকর—সেই সব কাজ করে, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া পর্য্যন্ত।

চাকরটি ছিল জাতে নাপিত। হঠাৎ একদিন তার খেয়াল হ'ল—ঘর ঝাঁট দেওয়া কাজটা তার আত্মসম্মানের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর—সে করে বস্‌ল ধর্ম্মঘট।

রবীন্দ্রনাথ খানিকটা করে সময় রোজ আপিস-ঘরে এসে কাজকর্ম্ম করেন, সেদিনও এসেছেন। এসে দেখেন ঘরময় জঞ্জাল—ঘরে ঝাঁটা পড়ে নি। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা ভদ্রলোকের ছেলে, তাঁরা তো আর নিজের হাতে ঝাঁটা ধরতে পারেন না। কবি কাউকে কিছু না বলে আস্তে আস্তে ঘরের কোণা থেকে ঝাঁটা তুলে আনলেন, তার পর নির্ব্বিকারচিত্তে নিজের হাতে ঝাঁট দিতে সুরু করে দিলেন। বলা বাহুল্য এর পর চাকরের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গতে দেরী হয় নি।

শুনেছি রবীন্দ্রনাথ খেতে খুব ভালবাসেন, খাওয়াতেও। প্রথম জীবনে খাওয়া নিয়ে তিনি নাকি নানা রকম পরীক্ষা করতেন। একবার এই রকম

নিম নিয়ে পরীক্ষা চলেছিল। সব খাবারের মধ্যেই সুরু হ'ল নিমের ব্যবহার। নিম সিদ্ধ, নিম ভাজা, নিমের তরকারী, নিম পাতার সরবৎ তিনি অম্লানবদনে দিনের পর দিন খেয়ে যেতেন। খাবার নিয়ে এই ধরণের আরও মজার মজার গবেষণা নাকি তিনি করেছেন।

যোগী

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি,এ, এস্‌-টি-সি

প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কল্যাণে 'মোহেঞ্জোদড়ো' নামটার সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয়ই বেশ পরিচয় আছে। অখ্যাত, অজ্ঞাতনামা এই জায়গাটি এ যাবৎকাল লোকচক্ষুর এক রকম আড়ালেই পড়িয়াছিল, এমন সময় প্রত্নতাত্ত্বিকের দল এখানে এক প্রাগৈতিহাসিক লুপ্ত নগরীর খোঁজ পাইলেন। সুরু হইল মাটী খোঁড়া। হাজার হাজার শ্রমিকের কোদালীর ঘায়ে মাটীর তলা হইতে যা বাহির হইল তাহার কথা লোকে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের পরিশ্রমের ফলে জানা গেল সিন্ধুতীরে এক প্রাচীন সুসভ্য জাতি বাস করিত। মেসোপটেমিয়ার সুমের জাতির সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ ছিল। তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, ইট দিয়া বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করিত, সোনা-রূপার ব্যবহার জানিত, উন্নত প্রণালীর সেচের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিত, গরু-ছাগল প্রভৃতি পশু পালন করিত ইত্যাদি। তাহাদের বিরাট্‌ স্নানাগার ও নর্দ্দামাগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে অবাক্‌ না হইয়া পারা যায় না। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এ পর্য্যন্ত সেখানে কোন নরকঙ্কাল আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

পারিলে তাহারা কোন্‌ জাতীয় লোক সে বিষয়ে হয়তো কিছু সন্ধান মিলিত। বোধ হয় নদী সরিয়া যাওয়ার ফলে নগরে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়; সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য অধিবাসীরা নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লয় এবং অচিরে সমস্ত নগরটী বালির নীচে চাপা পড়িয়া যায়। যাই হোক, ঐতিহাসিকেরা 'সিন্ধুতীরের সভ্যতা' বলিয়া ইহার পরিচয় দিলেন।

আমাদের এ গল্পের ঘটনাস্থল এই মোহেঞ্জোদড়োরই কাছাকাছি একটি গ্রাম—গিরিভট। গ্রাম বলিলে ঠিক বলা হয় না—কারণ জায়গাটার অধিকাংশই ছোট ছোট অনুচ্চ টিলা আর জংলী আগাছায় ঘেরা। সভ্যসমাজে পরিচয় দিবার মত তার কিছুই ছিল না—কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কখন কি ঘটে বলা কঠিন।

মোহেঞ্জোদড়োর খনন-কার্য্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাঁদের লোকজন, সরঞ্জাম লইয়া অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছেন, এমন সময় একদল পণ্ডিত এই গিরিভটটাও খুঁড়িয়া দেখিবার জন্য আয়োজন সুরু করিলেন। বড় বড় বিশেষজ্ঞ আসিল, আবার পূর্ণোদ্যমে মাটী কাটা সুরু হইল।

চেষ্টা বিফল হইল না। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা বিশাল অট্টালিকার ভিত্তি ও তৎসহ দুই একটা কোঠা বাহির হইয়া পড়িল। উহার বিশালত্ব ও কারুকার্য্য দেখিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিলেন হয়তো এটিও ঐ নগরীরই কোন রাজবাড়ী হইবে। দ্বিগুণ উৎসাহে খনন-কার্য্য চলিল। উহা যে রাজবাড়ী সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ মিলিল বটে, কিন্তু দুই একটী সাধারণ জিনিষ ছাড়া ধনরত্ন কিছুই পাওয়া গেল না; তবে আর একটি অদ্ভুত জিনিষ পাওয়া গেল—সেটি যোগাসনে উপবিষ্ট এক মনুষ্যমূর্ত্তি। তাহার পদদ্বয় হাঁটুর উপর স্থাপিত, মেরুদণ্ড সরল ও চোখ দু'টি নাসাগ্রবদ্ধ।

প্রথমটা সকলে তাহাকে মাটির পুতুল বলিয়াই মনে করে। দেখিতে ও আকারে মানুষের দেহের মত হইলেও তাহাতে জীবনের কোন লক্ষণই ছিল না। তাহার শরীর নিস্পন্দ—নিঃশ্বাস রুদ্ধ। কিন্তু তবুও তাহার আকৃতি সম্পূর্ণ সজীব ছিল। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে কেবল শ্বাসরুদ্ধ আছে, তা ছাড়া মৃতের কোন লক্ষণই নাই। এইরূপ রোগীকে বাঁচান সম্ভবপর। তখনই দেশে দেশে তারে সংবাদ ছুটিল। বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক জগতে সাড়া পড়িয়া গেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ! ইহাকে বাঁচাইতে পারিলে প্রত্নতত্ত্বের বহু খবর পাওয়া যাইবে। আমেরিকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আপনা হইতেই একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক পাঠাইলেন। ভারতের নানা প্রান্ত হইতে দলে দলে লোক "সত্যযুগের মানুষ"কে দর্শন করিতে আসিল। কেহ বলিল 'দেবতা', কেহ বলিল 'অবতার', কেহ বলিল 'যোগী,—কুম্ভক করিয়া আছেন'।

আমেরিকান্ চিকিৎসক প্রথমে যোগীকে ঈষৎ গরম জলে স্নান করাইয়া দিলেন, নাক ও মুখে সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করিয়া একটা তেল সর্ব্বশরীরে মালিশ করিয়া দিলেন এবং দুই একটী উত্তেজক ইঞ্জেক্সন দিলেন। পরে তাঁহার পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিবর্ত্তন করাইয়া নরম পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইয়া মৃদু সূর্য্যকিরণে রাখিলেন,—লোকজনের ভিড় সরাইয়া দিয়া খোলা বাতাসে রোগীকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল, রোগী এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অজ্ঞাত ভাষায় কি বলিয়া উঠিলেন, তার পর আবার যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তবে এখন সরল ভাবে তাঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল—যদিও অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইল। চিকিৎসকের মুখে হাসি ফুটিল।

ক্রমশঃ রোগীর দেহে জীবনের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকটিত হইল। তিনি কে, কবেকার লোক, কিরূপেই বা এত কাল মাটির নীচে বাস করিলেন এ বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হইতে লাগিল। এক ব্যক্তি তাঁহার প্রথম উচ্চারিত কথা কয়টী নোট্ করিয়া লইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহার অর্থোদ্ধারের জন্য, কি জানি যদি আর তাঁহাকে জীবিত না পাওয়া যায়! বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করিলেন যে এই ভাষার সহিত প্রাচীন ব্যাবিলনের ভাষার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ব্যাবিলনীয় ভাষা সম্পূর্ণ লুপ্ত ভাষা। জগতে অতি অল্প ৪।৫ জন মাত্র এ ভাষা জানেন। তাঁহারাও বহু পরিশ্রমে প্রাচীন মৃৎফলকাদি দেখিয়া এই বিস্মৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু পণ্ডিতেরা সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র ন'ন। ইরাকের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের (আসিরিওলজির) সভাপতি মহাশয়ের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল। ইনি, মহাপণ্ডিত—বিশেষতঃ সুমেরীয় ভাষায় একজন বিশেষজ্ঞ। তিনিও এ ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন; খবর পাইবা মাত্র পরবর্ত্তী বাগ্দাদ হইতে করাচীগামী এরোপ্লেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নোট করা উক্তিটুকু দেওয়া হইলে তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন যে এই ভাষা হইতে সুমেরীয় ভাষার পার্থক্য অতি সামান্য। একটী জানিলে অনায়াসে অপরটীর অর্থ বুঝা যায়। ঐ উক্তিটুকুর তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন—"হে রাজন্, দিন দিন, আপনার প্রতিশ্রুত সহস্র গাভী ও একশত গ্রাম দিন।" যোগীকে দর্শন করিবার জন্য রাজপুতানা অঞ্চলের কয়েকজন রাজা-মহারাজা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কেহ বলিলেন, "ভগবান্ আমার রাজধানীতে চলুন, আমি ওঁকে দশ হাজার গাভী ও একসহস্র গ্রাম দান করব।" এমন সময়ে যোগীর পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল, তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও বিস্মিতনেত্রে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক তাঁহাকে কিছু ফলের রস ও ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিলেন। তিনিও সাগ্রহে তাহা পান করিলেন। কিছু সুস্থ হইলে ইরাক হইতে আগত পণ্ডিত সুমেরীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি এ কথা বল্লেন কেন,—'হে রাজন্, আপনার প্রতিশ্রুত গাভী ও গ্রাম দিন্'?"

"রাজা কোথায় গেলেন? তাঁর পারিষদেরাই বা কোথায়?"

"আপনি কোন্ রাজার কথা বল্ছেন?"

"এই নগরের রাজা, যিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন।"

"এই নগর বহুকাল ধ্বংসমুখে পতিত হয়েছে। আপনার রাজাকে আমরা কেউ চিনি না। এই জনপদ এত দিন বিস্মৃতির গর্ভে ছিল। বহুকাল পরে আমরা মাটী খুঁড়ে এর পুনরুদ্ধার করেছি।"

যোগীর মুখে গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তিনি বলিলেন—"তাই চারিদিকে ধ্বংসের চিহ্ন দেখ্ছি! কত দিন হয় এই ধ্বংস সাধন হয়েছে?"

"ঠিক সময় আমরা কেউ বলতে পারি না; তবে আন্দাজ ৬০০০ বছর এই প্রাসাদ ও নগর বালির নীচে সমাহিত ছিল, এ রকম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।"

এবারে বিস্ময়ের ধাক্কায় যোগী পুনরায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। চিকিৎসক তাঁর কথাবার্ত্তা বলা বন্ধ করিয়া দিলেন।

পরদিন যোগী উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলে আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি এ নগরে কি ক'রে এলেন?"

"রাজা আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি পার্ব্বত্য অঞ্চলে যোগাভ্যাস করতাম। রাজা যোগীদের যোগবল দেখতে ভালবাসতেন, তাই আমাকে ডাকান।"

"আপনি রাজাকে কি কি যৌগিক ক্রিয়া দেখিয়েছেন?"

"প্রথমে একদিন একরাত্রি মাটির নীচে সমাহিত ছিলাম। বৎসরাবধি এ ভাবে থাকবার আমার ক্ষমতা জন্মেছিল, কিন্তু দীর্ঘকালের সমাধি ভঙ্গ করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার কেউ ছিল না বলে আমি এক দিনের বেশী থাকি নি। পরে যোগবলে শূন্যে অবস্থান দেখবার জন্য রাজা বড়ই উৎসুক হলেন। তদনুসারে আমি যোগাসনে বসে অধিক পরিমাণে বায়ু আকর্ষণ করে নিই। তার পর আমার আর কিছু মনে নেই।"

এই বলিয়া যোগী কিঞ্চিৎ অবসন্ন হইয়া শয়ন করিলেন। চিকিৎসক খাদ্যাদির ব্যবস্থার জন্য আবার তখনকার মত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিলেন। অনুমান হইল যে অধিক বায়ু আকর্ষণের ফলে হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যোগী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। ভয়ে কেহই যোগীর দেহ স্পর্শ করে নাই, সকলেই আশা করিয়াছিল যে কিছুকাল পরে তিনি সংজ্ঞালাভ করিবেন। এদিকে প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হওয়ার ফলে যোগীর প্রাণবিয়োগ হয় নাই। সম্ভবতঃ লোকে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে দর্শন করিতে আসিত। পরে একদিন মরুভূমি হইতে বিষম

বালুকাঝড় আরম্ভ হইলে একে একে সকলে নগর ছাড়িয়া মথুরার দিকে পলায়ন করে এবং নগরটী ধীরে ধীরে বালির নীচে চাপা পড়িয়া যায়।

যোগী এখন একটু একটু চলিতে পারেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা এক ইরাকের পণ্ডিত ছাড়া কেহই বোঝেন না। একদিন তাঁহার সহিত যোগীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। যোগী বলিলেন—"আমাকে আপনারা এখানে কয়েদ ক'রে রেখেছেন কেন?"

"আপনাকে কয়েদ করি নি। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'লে যেখানে খুসী চলে যাবেন। দেশের অনেক রাজা-মহারাজা আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।"

"না, আমি আর লোকালয়ে যাব না, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থও হয়েছি। আমাকে এখন বিদায় দিন।"

"আপনি এখন কোথায় যাবেন? আমরা ঐতিহাসিক। বহু পরিশ্রম ও গবেষণার ফলেও আমরা যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য জান্তে পারি নি তা আপনার কাছে জান্তে পারব, কারণ আপনি প্রত্যক্ষদর্শী। সুতরাং আপনাকে কিছুদিন এখানে-থাকতে হ'বে।"

যোগী ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "না, আমি ভেবে দেখলাম একবার লোভে পড়ে আমার এই দুর্দ্দশা হ'য়েছে। আমার গুরুদেব মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আমাকে এই যোগবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োগ না ক'রে সাংসারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করেছিলাম। ফলে ৬০০০ বছর আমার বৃথা নষ্ট হ'ল। এতটা কাল বিনা যোগাভ্যাসেও মোক্ষলাভ সম্ভব, কারণ এ সময়ের মধ্যে কত বার জন্মগ্রহণ করতাম কে জানে! প্রতি জন্মেই জীব মোক্ষের নিকটবর্ত্তী হয়। আমার আর এক মুহূর্ত্তও লোকালয়ে থাকার প্রবৃত্তি নেই। আমি আবার পাহাড়ে গিয়ে মোক্ষলাভের জন্য যোগশক্তি প্রয়োগ করব।"

"কিন্তু কয়েকটী বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য আপনার কাছে জান্তে হ'বে। সুতরাং আমার অনুরোধ যে আপনি আর দু'ই-একটা দিন এখানে থাকুন। তার পর যেখানে ইচ্ছা চলে যাবেন।"

পর দিন সকালে যোগীকে আর বিছানায় পাওয়া গেল না। সাহেব চাপরাশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইলেন না। চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল, কিন্তু সাধুর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ঐতিহাসিকগণ বড়ই নিরাশ হইলেন; তাঁর কাছে সিন্ধুতীরের ইতিহাসের কত তথ্যলাভের আশা ছিল, কিছুই হইল না। লোকে কিন্তু বলিতে লাগিল, "সত্য যুগের মহর্ষিকে ধরে রাখা কি এ যুগের মানুষের সাধ্য? তিনি হয়ত শূন্যপথেই হিমালয়ে প্রস্থান করেছেন কিংবা সূক্ষ্ম শরীর ধরে এখানেই বসে আছেন!"

বিচিত্র ভারত

"আবার আসিল আষাঢ় আকাশ ছেয়ে!"

আলোকচিত্র—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শাকের আঁটি

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্.এস্-সি

সোণা জেলে সেই যে তার ছোট্ট ডিঙ্গিটি লইয়া বাহির হইয়াছে, তখন হইতে কি দুর্য্যোগটাই না সুরু হইয়াছে! ঘরে বসিয়া সোণার স্ত্রীর দুর্ভাবনার অন্ত নাই। একে শীতকাল, তায় এই দুর্য্যোগ। এখন ভালয় ভালয় ফিরিলে হয়। গরীবের ঘর, এমন দিনেও তাই বাহিরে যাইতে হয়। ঐ মাছ বেচিয়া তবে সংসার চলিবে। মাছ না পাওয়া গেলে পেট চালাইবার আর কোন উপায় নাই। বড় গরীব তারা।

সোণার ঘরে খাইবার লোক তারা দু'জন—স্বামীস্ত্রী, আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে।

ছেলেমেয়েগুলি সন্ধ্যা না হইতেই শুইয়া পড়িয়াছে,—পরস্পরের গা ঘেঁষিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে। আহা, ইহারা একটু বড় হইলেও বাপের তবু দু'-একটি সাথী জুটিত!

ঠুক্ করিয়া একটু শব্দ হয় আর জেলেবৌ দরজায় ছুটিয়া যায়—ঐ বুঝি জেলে আসিল! কিন্তু দরজা খুলিতে শুধু এক ঝাপটা জল আর বাতাস আসিয়া ঢোকে। জেলেবৌ আবার খাটের ধারে আসিয়া বসে। আবার সমানে তার বুক দুরু দুরু করিতে থাকে।

শেষে জেলেবৌ আর থাকিতে পারিল না। ছোট লণ্ঠনটি টোকার নীচে ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল—গাঙ্-এর ধারে একটু আগাইয়া দেখিবে। বাতাসে, জলে তাহাকে কাঁপাইয়া দিতে লাগিল। আহা, কখন হইতে জেলে এমনি ঝড়-জলে ভিজিতেছে!

সোণার ঘর একটু একান্তে ও নির্জ্জনে। আশেপাশে কাছাকাছি আর বসতি নাই। গাঙ্-এর দিকে একটু তফাতে নলিনের ঘর। তা নলিন আর নাই। মাস আষ্টেক হইল হঠাৎ জ্বরে মারা গিয়াছে। তার বিধবা স্ত্রী কচি দু'টি ছেলেমেয়ে লইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। এদের বড় কষ্ট। কে বা রোজগার করে, কে বা খাইতে দেয়? জেলেবৌ কয়দিন আর এদিকে আসিতে পারে নাই। ভাবিল একবার নলিনের বৌর খোঁজ লইয়া যাই।

ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরে সব নিঝুম। বার বার ডাকাডাকিতে কেউ সাড়া দিল না দেখিয়া জেলেবৌ দরজা ঠেলিল। দরজায় খিল ছিল না, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। হাতের আলো ঘরে পড়িতেই জেলেবৌ দেখিল, ছেলেমেয়ে দু'টি একটি খাটিয়ায় ঘুমাইতেছে, আর তাদের মা ঘরের মেঝেতে এলাইয়া পড়িয়া আছে। চোখে কেমন এক চাহনী, মুখে যেন সজীবতার কোন চিহ্ন নাই। জেলেবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে আর একটু আগাইয়া আসিল, দেখিল—সে দেহ সত্যই প্রাণহীন।

কয়েক মুহূর্ত্ত বিমূঢ়ের মত থাকিয়া জেলেবৌ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। জেলের খোঁজে আর তার যাওয়া হইল না।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। সোণার ঘরের দরজায় এবার সত্যই করাঘাত পড়িল—বেশ জোরে জোরেই। জেলেবৌ দরজা খুলিয়া দিল। সোণা ফিরিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে মাছ বিশেষ কিছুই নাই। সোণা স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড় ভয় পেয়েছ দেখছি। আজ বড় হয়রানি গেছে। মাছ মোটে পাই নি। কি করে যে কালকের খোরাক জোটাব ভগবান্ জানেন। যাক্, একটু আগুন কর।"

আগুন করিতে করিতে জেলেবৌ ধীরে ধীরে নলিনের বৌএর মৃত্যুসংবাদ শুনাইল। ঘরে দু'টি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে—একটি সবে হামা দেয়, অপরটি আধ আধ কথা বলিতে শিখিয়াছে। এ অবস্থায় কে তাদের দেখে?

জেলে বিমর্ষ মুখে বলিল, "এমনি বিচার বটে ভাগ্যের! বাপটা গেল সেদিন। মা'টা ছিল, তাও সইল না। তা তুমি ওদের নিয়ে এলে না কেন তুলে? ঘুম ভেঙ্গে ভয় পাবে যে। একে এই রাত, তার ওপর মায়ের ঐ দশা। আমাদের অবস্থার কথা ভাবছ? পাঁচটি আমাদের আছে, না হয় এবার থেকে সাতটি হবে। তার আর কি করা যাবে? এখন নুন-ভাত খাই, তখন না হয় শুধু ভাত খাব।" জেলে জল-ভরা চোখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া আবার বলিল, "আর দেরী করা ঠিক না। শেষে হয়তো ভয়েই মারা যাবে। আমি আলো ধরি, তুমি চল।"

জেলেবৌ উঠিল না। জেলে চাহিয়া দেখে তাহারও চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে।

একটু পরে জেলেবৌ চোখ মুছিয়া গিয়া ছেলেদের গায়ের কাঁথাখানি টানিয়া সরাইয়া দিল। জেলে অবাক্ হইয়া দেখিল তার পাঁচ ছেলের সঙ্গে আরও দু'টি কচি মুখ ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া ঘুমাইতেছে। 'শাকের আঁটি' জেলেবৌ আগেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

ঠাণ্ডা লাগাতে ছেলেটি শব্দ করিয়া উঠিল—'উঃ!' জেলেবৌ সস্নেহে কাঁথাটি আবার ভাল করিয়া টানিয়া দিল।*

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

গল্পসল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲

ছোটদের জন্য কবির নূতনতম বই। বইখানিতে সব শুদ্ধ ৩২টি গল্প বা রচনা আছে, প্রত্যেকটির শেষে একটি ক'রে ছোট কবিতা। প্রায় সব ক'টিই গত বছরের মার্চ থেকে এ বছরের মার্চ মাসের মধ্যে লেখা।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা থেকে শিশুসাহিত্যও বঞ্চিত হয় নি। ছোটদের জন্য রচিত তাঁর বিভিন্ন বই ছেলে-বুড়ো সমান আগ্রহে পড়ে এসেছে। এ বইখানি নিয়েও, নিঃসন্দেহ, ছেলেমহলে তেমনি কাড়াকাড়ি পড়বে।

গল্পসল্প খুললে প্রথমেই নজরে আসে পাতায় পাতায় এর নূতনত্ব। তা ছাড়া প্রত্যেকটি গল্পের রচনাভঙ্গী যেমন সরস, বিষয়বস্তুও তেমনি লোভনীয়। ছোটদের জন্য হ'লেও চিন্তার খোরাক এতে যথেষ্ট আছে। কয়েকটি কাহিনীর সঙ্গে কবির বাল্যস্মৃতি জড়ান রয়েছে।

* ভিক্টর হুগোর একটি গল্পের ভাবাবলম্বনে।

"যদি বলো পুরাতন এই কথাগুলো
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো।"

ব'লে কবি ভূমিকা শেষ করেছেন।

গল্পের শেষের কবিতাগুলিও এক কথায় 'অনবদ্য'। জরাজীর্ণ অসুস্থ দেহেও রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যা দিয়ে গেলেন বাংলার ছেলেমেয়েরা তা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে। তোমরা, যারা বইখানা এখনও পড় নি, যত শীঘ্র পার পড়ে দেখবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এ বইখানি পড়া উচিত।

মোটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা। প্রচ্ছদপটও বেশ সুরুচিসম্মত।

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত আকাশগঙ্গা ও শিকারী শশী; শ্রীবিমল ঘোষ প্রণীত শিশুরবি; শ্রীনিখিলেশ সেন প্রণীত রোমাঞ্চকর-কাহিনী।

এ বই ক'খানার সমালোচনা আগামী বারে প্রকাশিত হবে।

অবাক্

ছোট মেয়ে—টুটু নাম
পড়লো ধরা,
ক্যামেরার কেরামতে—
অবাক্-করা।

কথা ও আলোকচিত্র—
শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

নতুন দিনের গান

শ্রীমতী সুজাতা সেনগুপ্তা

নীল আকাশের সাথে যে আজ
সাদা মেঘের খেলা,
গাঁদার বনে ঝিলিক ওঠায়
প্রজাপতির মেলা।
ও ভাই খুকু, ও ভাই খোকা,
থাকবো না আজ একা একা
আয় আজি রে নদীর ধারে
আমরা ভাসাই ভেলা।
ভয়-ভাবনা আজ কোন না,
আজ যে নূতন বেলা!

হলুদ বরণ পিরান নূতন
পরবো মোরা আজ,
হলদে গাঁদার গাঁথবো মালা—
গড়বো মাথার তাজ।
চলবো মোরা নূতন পালে,
বসবো বা কেউ নৌকা-হালে,
নিরুদ্দেশের যাত্রী মোরা
করবো নূতন কাজ;
কালো যত হারিয়ে যাবে
আজ নূতনের মাঝ।

নদীর ধারে শুনি যে রে
আজকে নূতন সুর,
শিমুল-গাছে ফিঙে নাচে
খুসীতে ভরপুর।
মাঠে মাঠে নূতন ধানে
কত কথা মনে মনে—
রাখাল ছেলে বাঁশী বাজায়
তু তুর তুরা তুর;
তারই সাথে মন যেতে চায়
কোন সে অচিন্ পুর!

টুটিয়ে দিয়ে মনের আগল
আজকে ছুটে চল্;
তুফান স্রোতে ভয় করি না
আমরা কুঁড়ির দল।
বিলিয়ে দেব বিশ্বকাজে
চলবো ভেসে নূতন-মাঝে,
বিশ্বপতির আশীষ-ধারা
আনবে মনে বল;
নূতন বাঁশীর তালে তালে
চল্ এগিয়ে চল্।

নানা দিক্ দিয়ে আমাদের ওপর দেবতার রুদ্ররোষের যেন আর শেষ নেই। ঢাকার হাঙ্গামা মিটতে না মিটতে দেখা দিল প্রকৃতির দুর্জ্জয় লীলা। বরিশাল, নোয়াখালি, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার ওপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড় বয়ে গেছে তারই কথা বলছি। এ রকম ভয়াবহ ঘূর্ণি-ঝড় নাকি এ দেশে কমই হয়েছে। শুধু ঘূর্ণি-ঝড়ই নয়—সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল বান। কত লোক প্রাণে মারা গেছে, বানের জলে কত লোকের ঘরবাড়ী, যথাসর্ব্বস্ব ভেসে গেছে, গরু-ভেড়া-মহিষ তলিয়ে গেছে তার বিবরণ শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শোনা যাচ্ছে বরিশাল জেলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নাকি এই ঝড়ে কিছু-না-কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকের এক বেলা আহার জুটছে না—ঘড়বাড়ী না থাকায় গাছতলায় দিন কাটছে। এদের সাহায্যের জন্য নানা জায়গায় সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। যারা সক্ষম তাদের প্রত্যেকেরই এতে সাধ্যমত কিছু-না-কিছু সাহায্য করা উচিত।

* * *

সম্প্রতি ৮২ বছর বয়সে জার্ম্মেনীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌মের মৃত্যু হয়েছে। ১৯১৪ সনের পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের কথা যাদের মনে আছে কাইজারের কথা তারা ভুলতে পারবে না। সেবারকার যুদ্ধে ইনিই ছিলেন প্রধান নায়ক ; লোকের মুখে মুখে এঁরই নাম ফিরত—কেউ বা নিন্দা করত, কেউ খাতির করত। সেবারকার যুদ্ধে জার্ম্মেনী পরাজিত হ'লে কাইজার সিংহাসন ত্যাগ ক'রে হল্যাণ্ডে চলে যান, জার্ম্মেনীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর দীর্ঘ ২৩ বছর সেই হল্যাণ্ডেই নিতান্ত সাধারণ ভদ্রলোকের মত তাঁর জীবন কেটেছে। অবসর সময় তিনি বই পড়ে আর নিজের আত্মচরিত লিখে কাটিয়েছেন। কাইজার ছিলেন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র, অর্থাৎ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের পিসতুত ভাই।

* * *

যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করছে। গেল বারে তোমরা পড়েছিলে গ্রীস্ জার্ম্মান্‌দের হাতে যাবার পর গ্রীসের রাজা তাঁর গভর্ণমেণ্ট - নিয়ে ক্রীটে আশ্রয় নেন। তার পর জার্ম্মান্‌রা ক্রীট্ আক্রমণ করে। প্রবল বাধা দিয়েও তাদের সেখানে ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। এদিকে ভিসি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে জার্ম্মান্‌দের যা চুক্তি হয়েছে তার ফলে জার্ম্মান্‌রা আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত দেশগুলির বিমান ঘাঁটি ও অস্ত্রসজ্জা নিজেদের কাজে লাগাবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। ফরাসী অধিকৃত সিরিয়ার হালচাল দেখে ইংরেজদের বাধ্য হয়ে ঐ দেশ আক্রমণ করতে হয়েছে, যাতে ওই দেশ জার্ম্মান্‌দের তাঁবেদার না হয়ে

পড়ে। জেনারেল দ্য গলের অধীনস্থ স্বাধীন ফরাসী বাহিনীও ইংরেজদের পক্ষে এই আক্রমণে যোগ দিয়েছে। ৯ই জুনের খবর, সিরিয়ার কর্ত্তৃপক্ষও এ আক্রমণে বাধা দেবেন ঠিক করেছেন। ফলে অবস্থা বড় জটিল হয়ে পড়েছে—কারণ যুদ্ধ বাধবার প্রথম দিকে ফরাসীরা ছিল ইংরেজদের মিত্রপক্ষ, ঘটনাচক্রে সে সদ্ভাব নষ্ট হ'লে তা বড়ই দুঃখের বিষয় হবে।

ইরাকে ইংরেজ ও ইরাকীদের সংঘর্ষের অবসান হয়েছে। রসিদ আলি ইরাণে পালিয়ে গেছেন। আমীর আবদুল ইলাহ্ আবার ইরাকে ফিরে এসেছেন।

কলকাতায় ফুটবল লীগ্ সুরু হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত (৯ই জুন) মহামেডান স্পোর্টিংই প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। তারা ১১টা ম্যাচ্ খেলেছে, কিন্তু একটাতেও হারে নি, শুধু রেঞ্জার্সের সঙ্গে ড্র করেছে। দ্বিতীয় যাচ্ছে মোহনবাগান। তারাও এত দিন অপরাজিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইষ্টবেঙ্গলের কাছে ২ গোলে পরাজিত হওয়ায় মহামেডান্ স্পোর্টিংএর সঙ্গে তাদের ব্যবধান হয়ে গেছে ৩ পয়েণ্ট। তৃতীয় স্থান এখন পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গলের দখলে। গত বারের শীল্ড-বিজয়ী এরিয়ান্‌স এখনও তেমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি।

গত মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত মাসের ফটো-প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন শ্রীমতী রেণুকা দত্ত (ধুবড়ী)। ইনি শ্রীমতী গীতা দেবী প্রদত্ত 'অতনু-স্মৃতিপদক' পুরস্কার পাবেন, এবং এঁর প্রেরিত ফটোটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। শ্রীশুক্লা সেন ও শ্রীনিখিল মণ্ডল প্রেরিত ফটো দু'টিও ভাল হয়েছে।

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে তোমার কোন্‌টা সব চেয়ে ভাল লাগে, কোন্‌টা তার পর এই রকম ক্রমিক নম্বর দিয়ে পাঠাও। সকলের উত্তর পেলে সেই ভোট অনুযায়ী আমরা একটা তালিকা তৈরী করব। যার উত্তর সে তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে সেই প্রথম পুরস্কার পাবে, তার পরের জন ২য় পুরস্কার পাবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু এই কুপনে ছাড়া অন্য কিছুতে উত্তর পাঠালে চলবে না—সকলকেই কুপন কেটে পাঠাতে হবে। ১লা শ্রাবণের মধ্যে উত্তর আমাদের কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

বিষয়ের নাম : ________________________ এইখানে কাট

হাসির গল্প	পৌরাণিক গল্প	য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস	দেশবিদেশের কথা
য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প	কবিতা	হাসির উপন্যাস	ভ্রমণ-কাহিনী
করুণ গল্প	ছড়া	বিজ্ঞান	প্রবন্ধ
ভূতের গল্প	ব্যঙ্গ কবিতা	ইতিহাস	সংবাদ

নাম..বয়স..................

ঠিকানা..

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

আহারের তালিকা

(১) বড় কচুরি (২) ফুলকপির ছ'কা (৩) ভেটকির ফ্রাই (৪) লুচি (৫) পোলাও (৬) বেগুণ ভাজা (৭) মৎস্যের দম (৮) ডালপুরী (৯) ভেড়ার কোরমা (১০) টক ডাল (১১) কমলা লেবু (১২) মোহনভোগ (১৩) বাগবাজারের সন্দেশ (১৪) রসগোল্লা (১৫) রাবড়ী (১৬) পান।

নূতন ধাঁধা

নীচের শব্দগুলির প্রত্যেকটি থেকে একটি ক'রে অক্ষর বেছে নিয়ে আগে পিছে সুবিধামত যুড়তে পারলে একজন ক'রে বিখ্যাত ব্যক্তির নাম পাবে। চেষ্টা কর :—

(১) রাবণ মোহিত চরম সাহসে বিরাট নয়নে কয়লা।

(২) পবিত্র মহর্ষি অপরের অহংকারে দেবতা বিশ্বাস বনবাসী।

(৩) স্বর্ণ কুমার বর্ণ মাসীমা বৈদেহীর শরীর বীণা।

(৪) আরব মহাশয় জেব্রা বিষম সঙ্কট কলিকাতায় জননী।

(৫) টম্যাটোর বাস জামাই আলয় ভালবাসা বিল একটি আসন ডিম ঝন্ ঝন্।

জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন :—

চিত্রলেখা গ্রন্থাগারের সভ্যবৃন্দ; নিগমকুমার চক্রবর্ত্তী, রমা দেবী, মাসিমা, সুনকা, সেজ কাকীমা প্রভৃতি (গয়া); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); সন্ধ্যাতারা দেবী (লক্ষ্ণৌ); অনিল ও গায়ত্রী রাও (দিল্লী)।

আংশিক উত্তর দিয়েছেন :—

দিদা, দাদা, বেলা, বাদল ও বর্ষা ব্যানার্জ্জি (চাইবাসা); হাসি, লিলি, গোরা (ডাল্টনগঞ্জ); রিণা রায় (টালীগঞ্জ); নবেন্দু সেন (বালীগঞ্জ); বাণী, কিকি, খোকা, অধীরদা, উমা (চাইবাসা); ছায়া ও নিমু সেন (মূলঘর); রমেশচন্দ্র, মুক্তি ও রথীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত পট্টনায়ক (শ্রীপাঠ পুরুনীয়া); এ, ডব্লিউ, মণিরাম (সুজানগর); কপিল সিংহ ও উষা দেবী (কলিকাতা); শিউলি বসু (বালীগঞ্জ); বিন্দুবাসিনী চ্যাটার্জ্জি (এলাহাবাদ)।

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্.এ, বি.এল্
প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে All Bengal Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য) বলেন :—
"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা

দাম ১॥০ মাত্র

ইহুদী ফ্রীডম্ ষ্টেশন্ কলিং—
হার অটো ভাসারম্যান্ স্পীকিং—

হার অটো ভাসারম্যান্ বলছেন তাঁর জীবনের দুরন্ত এডভেঞ্চারের কথা… হিট্‌লারের রথের চাকার নীচে একটি জীবনের সুখশান্তি কেমন করে নষ্ট হোল, কেন হার অটো হিট্‌লারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো তারই কাহিনী। না শুনে থাকলে পড়—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা উপন্যাস

হিটলারের শত্রু

দাম—এক টাকা

দেশপ্রিয় লাইব্রেরী—১৯২।২ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট্,
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড,
কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কল্‌কাতার হালচাল ৸৵০
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হাল্‌কা হাসির খাতা ॥০
নতুন কিছু … ॥৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম) ॥০
ঐ ২য় খণ্ড ॥০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং … ॥০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প (২য় সং) … ৶১০
ছুটীর গল্প … ৶১০

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার
আজব গল্প … ।০
অনেক গল্প … ।০

পুরাতন
বাঁধান রামধনু
১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১।।০
৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২।।৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

আহারের তালিকা

(১) বড় কচুরি (২) ফুলকপির ছ'কা (৩) ভেটকির ফ্রাই (৪) লুচি (৫) পোলাও (৬) বেগুণ ভাজা (৭) মৎস্যের দম (৮) ডালপুরী (৯) ভেড়ার কোরমা (১০) টক ডাল (১১) কমলা লেবু (১২) মোহনভোগ (১৩) বাগবাজারের সন্দেশ (১৪) রসগোল্লা (১৫) রাবড়ী (১৬) পান।

নূতন ধাঁধা

নীচের শব্দগুলির প্রত্যেকটি থেকে একটি ক'রে অক্ষর বেছে নিয়ে আগে পিছে সুবিধামত যুড়তে পারলে একজন ক'রে বিখ্যাত ব্যক্তির নাম পাবে। চেষ্টা কর :—

(১) রাবণ মোহিত চরম সাহসে বিরাট নয়নে কয়লা।

(২) পবিত্র মহর্ষি অপরের অহংকারে দেবতা বিশ্বাস বনবাসী।

(৩) স্বর্ণ কুমার বর্ণ মাসীমা বৈদেহীর শরীর বীণা।

(৪) আরব মহাশয় জেব্রা বিষম সঙ্কট কলিকাতায় জননী।

(৫) টম্যাটোর বাস জামাই আলয় ভালবাসা বিল একটি আসন ডিম ঝন্ ঝন্।

জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন :—

চিত্রলেখা গ্রন্থাগারের সভ্যবৃন্দ; নিগমকুমার চক্রবর্ত্তী, রমা দেবী, মাসিমা, সুনকা, সেজ কাকীমা প্রভৃতি (গয়া); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); সন্ধ্যাতারা দেবী (লক্ষ্ণৌ); অনিল ও গায়ত্রী রাও (দিল্লী)।

আংশিক উত্তর দিয়েছেন :—

দিদা, দাদা, বেলা, বাদল ও বর্ষা ব্যানার্জ্জি (চাইবাসা); হাসি, লিলি, গোরা (ডাল্টনগঞ্জ); রিণা রায় (টালীগঞ্জ); নবেন্দু সেন (বালীগঞ্জ); বাণী, কিকি, খোকা, অধীরদা, উমা (চাইবাসা); ছায়া ও নিমু সেন (মূলঘর); রমেশচন্দ্র, মুক্তি ও রথীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত পট্টনায়ক (শ্রীপাঠ পুরুনীয়া); এ, ডব্লিউ, মণিরাম (সুজানগর); কপিল সিংহ ও উষা দেবী (কলিকাতা); শিউলি বসু (বালীগঞ্জ); বিন্দুবাসিনী চ্যাটার্জ্জি (এলাহাবাদ)।

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

শ্রীঅমলেন্দু সেন এম্.এ, বি.এল্
প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে All Bengal Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য) বলেন :—
"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা

দাম ১৷৷০ মাত্র

ইহুদী ফ্রীডম্ ষ্টেশন্ কলিং—
হার অটো ভাসারম্যান্ স্পীকিং—

হার অটো ভাসারম্যান্ বলছেন তাঁর জীবনের দুরন্ত এডভেঞ্চারের কথা… হিট্‌লারের রথের চাকার নীচে একটি জীবনের সুখশান্তি কেমন করে নষ্ট হোল, কেন হার অটো হিট্‌লারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো তারই কাহিনী। না শুনে থাকলে পড়—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা উপন্যাস

হিটলারের শত্রু

দাম—এক টাকা

দেশপ্রিয় লাইব্রেরী—১৯২।২ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা ও অন্যান্য বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ৷৷৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কল্‌কাতার হালচাল ৸৵০
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৷৷০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হাল্‌কা হাসির খাতা ৷৷০
নতুন কিছু … ৷৷৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম) ৷৷০
ঐ ২য় খণ্ড ৷৷০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং … ৷৷০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প (২য় সং) … ৶১০
ছুটীর গল্প … ৶১০

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার
আজব গল্প … ।০
অনেক গল্প … ।০

পুরাতন
বাঁধান রামধনু
১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১৷৷০
৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

দেহের স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ এবং রসনার তৃপ্তি

এই তিনটিই বড় কথা।

লক্ষ্মী ঘি দিয়ে তৈরী খাবার ব্যবহার করলে
এর সব ক'টি সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সকল ঋতুতেই লক্ষ্মী ঘিএর খাবার
সমান উপাদেয়।

উৎসব-আয়োজনে, পূজাপার্ব্বণে এবং নিত্য ব্যবহারে

লক্ষ্মী ঘি

অপরিহার্য্য

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি অতুলনীয়।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

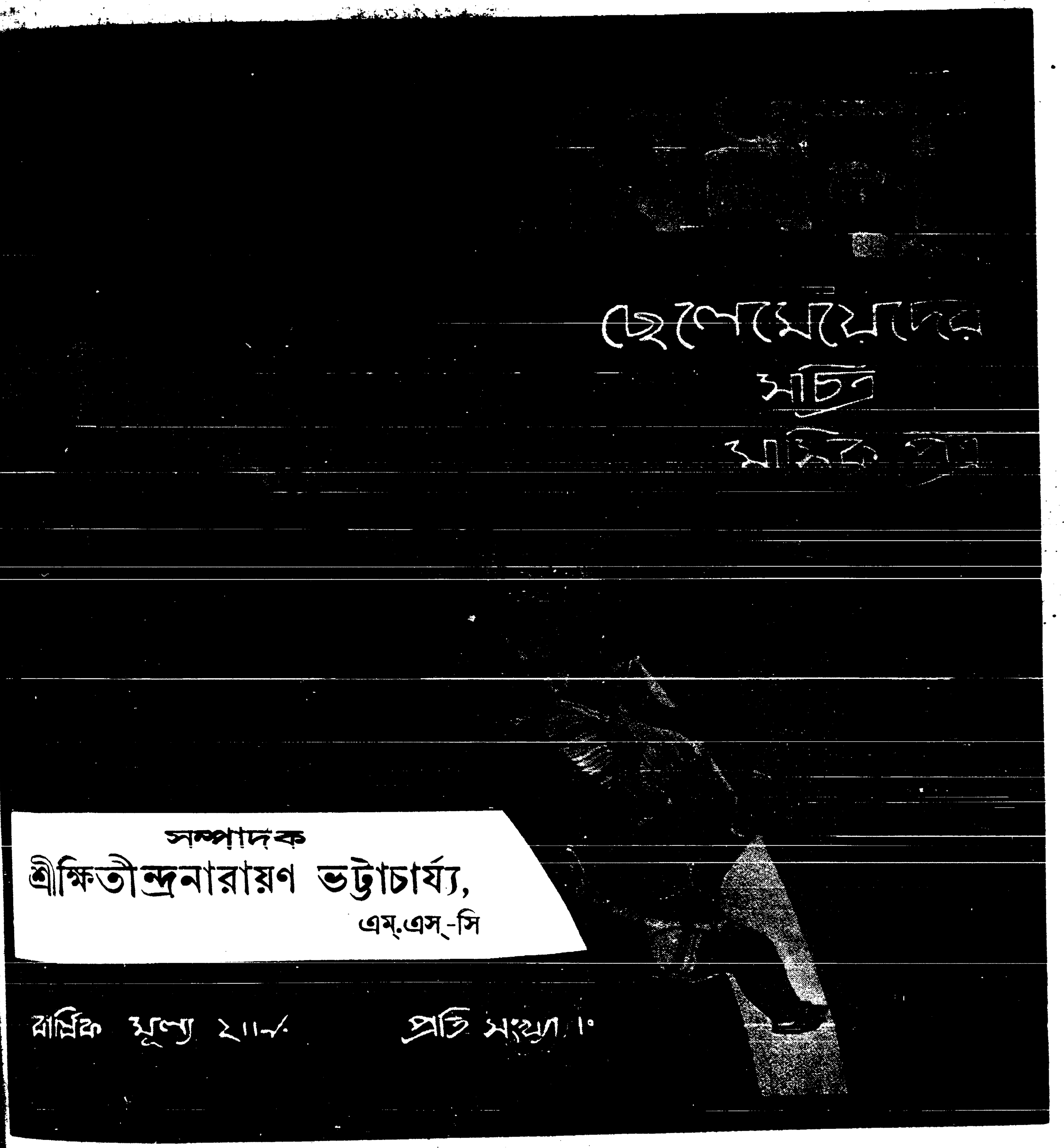

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C—1641

দেহের স্বাস্থ্য, মনের আনন্দ এবং রসনার তৃপ্তি

এই তিনটিই বড় কথা।

লক্ষ্মী ঘি দিয়ে তৈরী খাবার ব্যবহার করলে এর সব ক'টি সম্বন্ধেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সকল ঋতুতেই লক্ষ্মী ঘিএর খাবার
সমান উপাদেয়।

উৎসব-আয়োজনে, পূজাপার্ব্বণে এবং নিত্য ব্যবহারে

লক্ষ্মী ঘি

অপরিহার্য্য

স্বাদে, গন্ধে, গুণে লক্ষ্মী ঘি অতুলনীয়।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

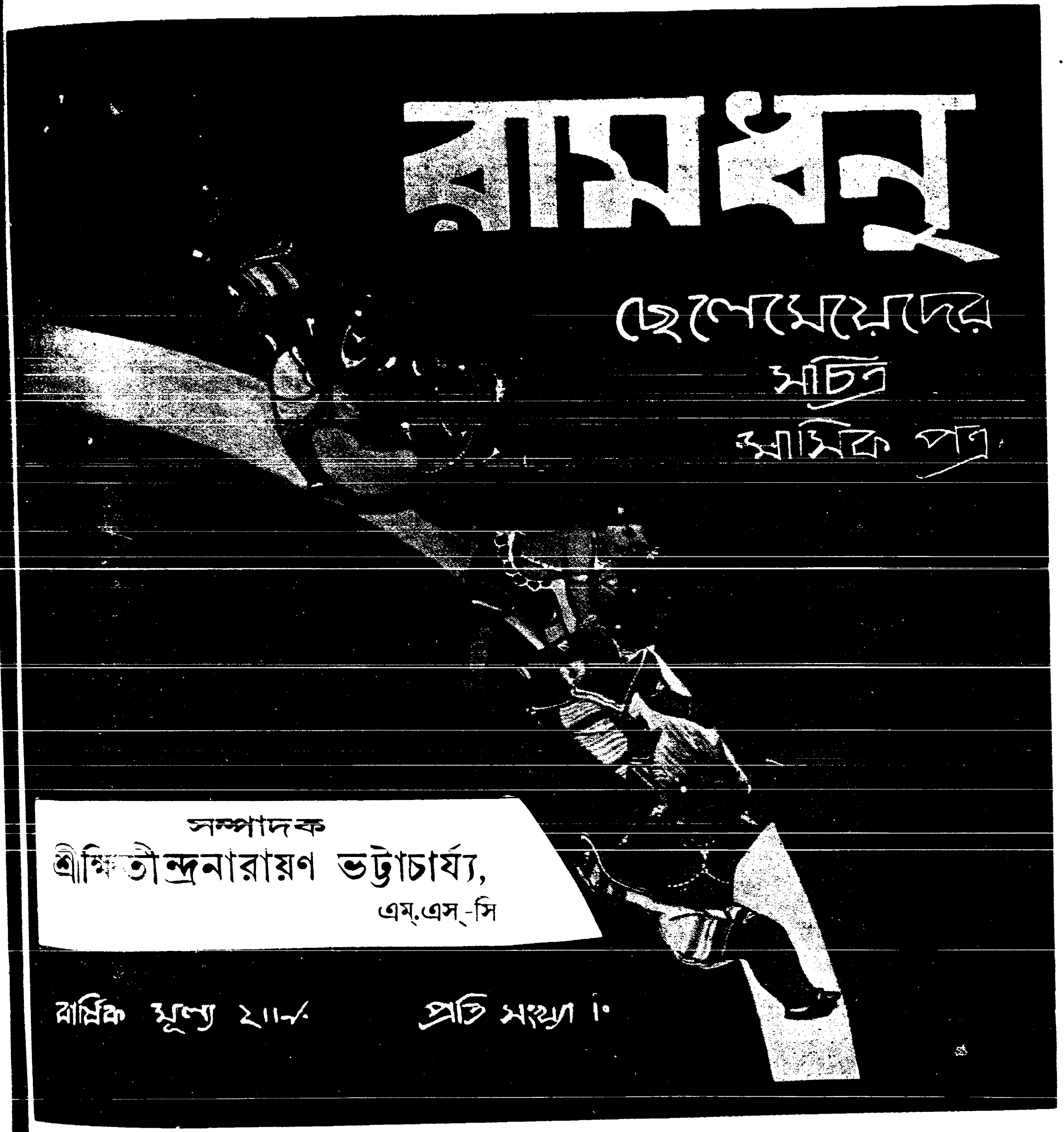

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০; প্রতিসংখ্যা।৹ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

হুঁকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

শীঘ্রই বাহির হইবে

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

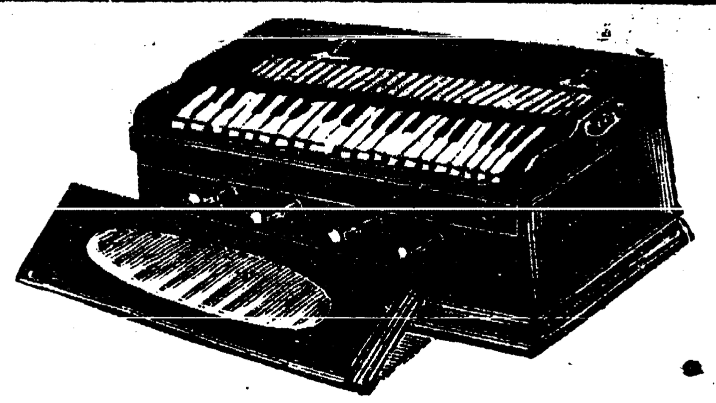

স্বর সাধনায় অরগ্যান কোং-র

হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং

৬।১।১, রসা রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে পনের বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত

আকাশ-গঙ্গা

হিমালয়ের হিমরাজ্যের গঙ্গোত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, কামাখ্যা, সাগরসঙ্গম প্রভৃতি নানা তীর্থের কথা লেখক গল্পের মধ্য দিয়া শিশুদের জন্য লিখিয়াছেন। তীর্থগুলির রাশি রাশি রঙ্গিন ও হাফটোন চিত্রে পুস্তকখানা শোভিত।

ছোটদের জন্য ইহাই একমাত্র সচিত্র

ভ্রমণ-কাহিনী

—দাম মাত্র বারো আনা—

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প

(ভূতুড়ে গল্পের অপূর্ব্ব সঙ্কলন)

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

দেড়শো খোকার কাণ্ড ১৲

শ্রীযুক্ত নিখিলেশ সেনের

রোমাঞ্চকর কাহিনী ॥০

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন গুপ্তের

বিষের তীর ॥০

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

তাতারের বন্দী ⅘০

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের

সোনার পাখী ।৵০

কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ

গল্পের ভিতর দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার-কল্পে এই সিরিজে নারী-চরিত্র-বর্জ্জিত একখানি ক'রে উপন্যাস প্রতিমাসে প্রকাশিত হবে। রোমাঞ্চকর, অ্যাড্ভেঞ্চার ও ভয়াবহ ডিটেক্টিভ কাহিনী-ভরা এই বইগুলি এমন বিচিত্র ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে যে, 'প্রাইজ-বুক' হিসেবে এই সিরিজের বইগুলিই গ্রাহকদের সব-আগে নজরে পড়বে।

প্রথম গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **অন্ধকারের বন্ধু**

দ্বিতীয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

ছিন্নমস্তার মন্দির

একখানি সেই শ্রেণীর বই যা' পড়বার সময় অবাক-বিস্ময়ে ভাবতে হয়, জগতে কত রহস্যময় দৃশ্যই এখনো যবনিকার অন্তরালে আছে। ছাপা—ছবি—অনুপম—অতুলনীয়! প্রত্যেক খানি—আট আনা।

সংবাদপত্র সমূহের অভিমতের সারাংশ—"...মাত্র আট আনায় যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই হইতে পারে, চোখে না দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতাম না।......

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া

দুর্ব্বল শিশুরা

অল্পদিনের মধ্যেই

পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—॥৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

মায়ের কোলে যীশু
শিল্পী র‍্যাফেলের আঁকা একখানি অমর চিত্র

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৮ { ৭ম সংখ্যা

পাষাণ খোকা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাথরের এক খোকা ছিল ঘরে—
এনেছিল হ'তে রমনা,
বয়স তাহার ছুই শ' ষাটের
একটী বরষ কম না।
সে খোকারে লয়ে যে খোকা খেলিত
তিনি ত এখন স্বর্গে,
তাঁহাতে আমাতে চৌদ্দ পুরুষ
হ'ল ক'ন জ্ঞাতিবর্গে।

মায়ের কোলে যীশু
শিল্পী র‍্যাফেলের আঁকা একখানি অমর চিত্র

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৮ { ৭ম সংখ্যা

পাষাণ খোকা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাথরের এক খোকা ছিল ঘরে—
এনেছিল হ'তে রমনা,
বয়স তাহার দুই শ' ষাটের
একটী বরষ কম না।
সে খোকারে লয়ে যে খোকা খেলিত
তিনি ত এখন স্বর্গে,
তাঁহাতে আমাতে চৌদ্দ পুরুষ
হ'ল ক'ন জ্ঞাতিবর্গে।

খেলিবার-খোকা পানে চেয়ে হাসি,
ভাবি খোকা তুমি ধন্য,
পরিবর্ত্তন জান না মোটেই
আজও খোকা ব'লে গণ্য !
যুগের যুগের কতই সঙ্গ—
কতই সোহাগ পাচ্ছ,
অধিকার ক'রে বসে আছ নিজে
গোটা এক শিশুরাজ্য।
পাথর ত ন'স পরশে হ'লি যে
পরশ-পাথর তুই রে,
যদি সোনা হই, আয় তোরে ছুঁই—
বুকের মাঝারে থুই রে।

লণ্ডনে

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য লণ্ডন নয়, সেখানকার যা কিছু সুন্দর তা মানুষের হাতের তৈরী। লণ্ডনে মানুষের অবিশ্রান্ত কাজ করা, তাদের কর্ম্মকুশলতা, তাদের বড় বড় উঁচু বাড়ী ও মানুষের হাঁফ ছাড়ার জন্য প্রতি পাড়ায় পার্ক আমার চোখে ভারী সুন্দর লেগেছে। জার্ম্মান্ কবি হাইন্‌রিখ্ হায়েনে বলেছিলেন: "লণ্ডনে কবিকে পাঠিও না, পাঠিও দার্শনিককে—তার জন্যই লণ্ডন সহর।" লণ্ডন দেখতে দেখতে কবির কথা আমার বারে বারে মনে পড়েছে।

এ সহরে সবাই ব্যস্ত। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই কারো। কাজের ভীড়ে রাস্তা দিয়ে হু হু করে লোকজন ছুটছে। কাজ ছাড়া এরা থাকতে পারে না। রাস্তায় ট্রাম-বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময়েও খবরের কাগজটা পড়ে নিচ্ছে।

খবরের কাগজের কাট্‌তি লণ্ডনে খুব বেশী। শুধু লণ্ডনে কেন, ইউরোপের প্রতি অংশেই বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোক খবরের কাগজ পড়েন। অশিক্ষিতরাও বাদ যান না। এ কথা যখন ভাবলাম তখন ভারতবর্ষের কথাও মনে পড়ল। আমাদের দেশে শিক্ষিতরা ক'জন খবরের কাগজ পড়েন? অশিক্ষিতের কথা ছেড়েই দিলাম। বঙ্কিমবাবু 'লোকশিক্ষা'য় যা বলে গেছেন তা একটুও মিথ্যে নয়। অবশ্য সম্প্রতি আমরা দেশের ও দশের খবর রাখতে কৌতূহলী হয়েছি। এ কৌতূহলের মূলে কিন্তু মুখ্যতঃ প্রভাব রয়েছে আমাদের বিদেশী বন্ধুদের। এঁদের দেখাদেখি আমরা কিছু কিছু শিখছি বই কি! অস্বীকার ক'রে লাভ নেই।

লণ্ডনের পথে লোকের চলাফেরার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। রাস্তায় বহু লোক এক যায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও কারো সঙ্গে কারো গা ঠেকে না। শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য এক বাসে এরা ভীড় ক'রে ওঠে না। যে কয়জনের যায়গা হ'তে পারে সে কয় জন ওঠে, বাকী যারা থাকে তারা অপেক্ষা করে, গজরায় না। সহবৎ শিক্ষা করা এরা সাধারণ শিক্ষার প্রথম বিষয় বলে ভাবে। এর জন্য নানা লেখকের বইও এরা বের করেছে। অনেকে এ সব বই থেকে সহবৎ, সভ্য রীতিনীতি, চালচলন—যাকে ইংরেজরা বলেন 'এটিকেট', ইত্যাদি শেখেন। অভিজাত সম্প্রদায় ছেলেমেয়েদের সহবৎ শিক্ষার জন্য শিক্ষকও নিয়োগ করেন।

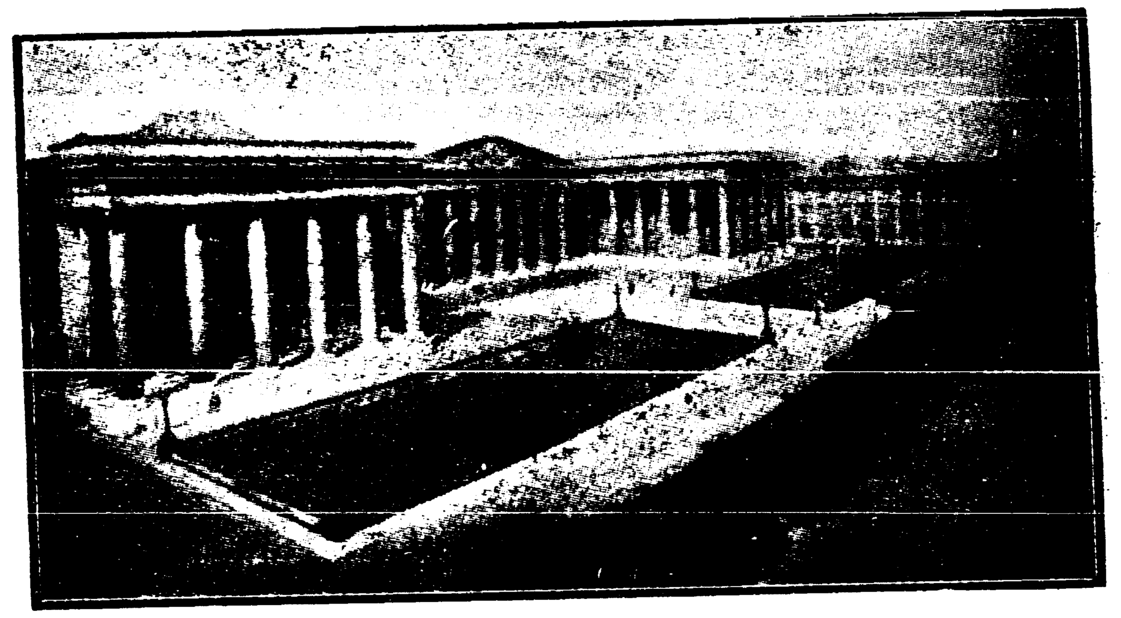

বৃটীশ মিউজিয়াম্ লাইব্রেরী, লণ্ডন

শুধু দিনে নয়, রাতেও লণ্ডন সহর সোরগোলের ডিপো। রাত বারটা পর্য্যন্ত সোরগোল ভাল রকমই টের পাওয়া যায়। এর পর রাত দু'টো পর্য্যন্ত অল্প স্বল্প লোকের দেখা মেলে। কিন্তু দু'টো থেকে চারটে পর্য্যন্ত অত বড় সহরটা

একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। মনে হয় বিরাট্ কোন এক যন্ত্র-দানব সারা দিন অস্থিরভাবে ঘুরছিল, রাত দু'টোয় কার হাতছানিতে থেমে গেছে। তখন মনে পড়ে কবির ক'টি পংক্তি—

"যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ কাঁদায়
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁধায়
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে,
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।"

ভোর বেলায় উঠে দেখা যায় দুধের বোতল নিয়ে গোয়ালারা সাইকেলে করে

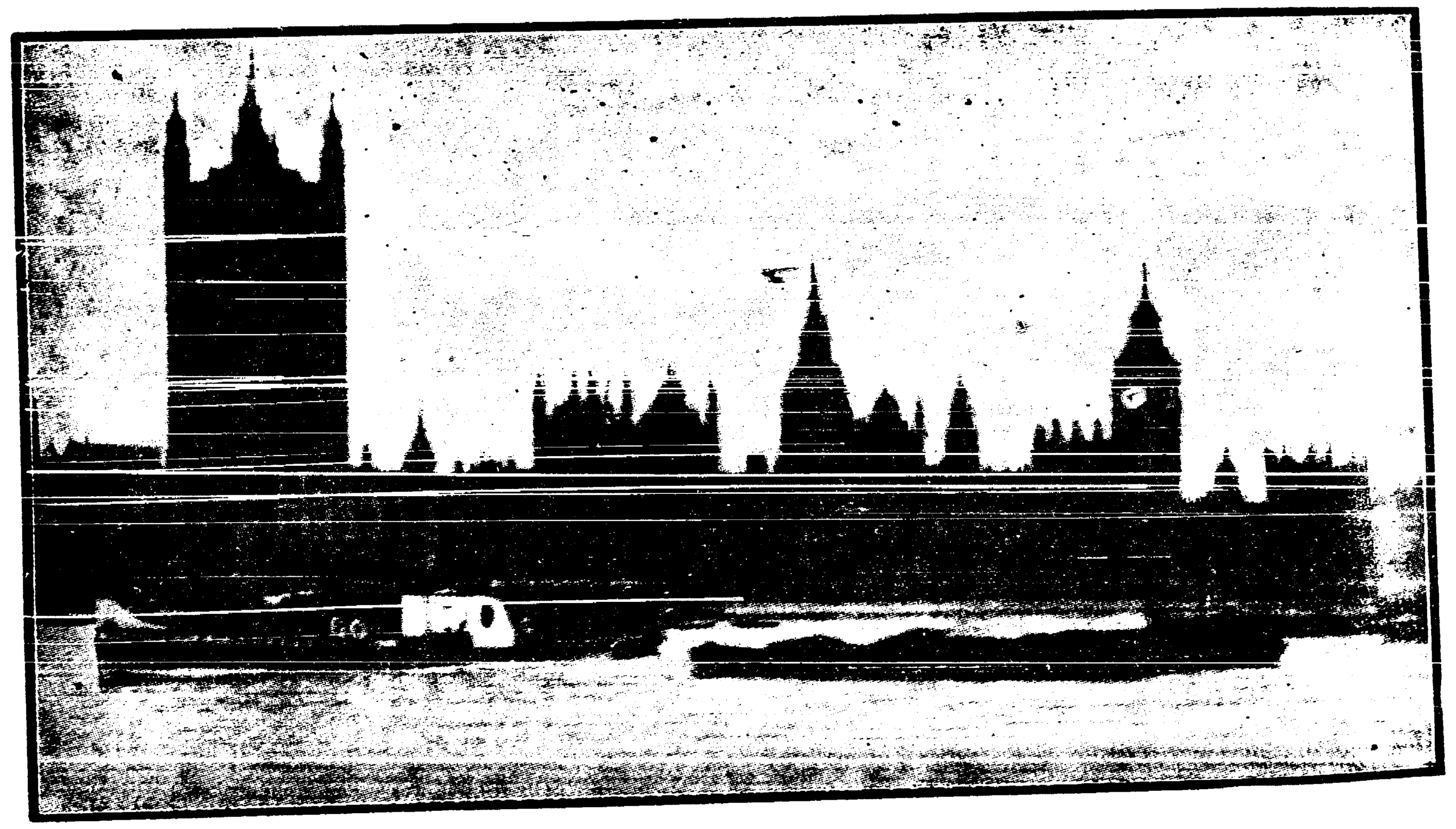

টেম্স্ নদীর ওপর লণ্ডনের পার্লিয়ামেণ্ট ভবন

বাড়ী বাড়ী দুধ দিয়ে বেড়াচ্ছে, মেথরেরা রাস্তা পরিষ্কার করতে লেগে গেছে, বড় বড় লরী নানা রকম খাবার নিয়ে দোকানে দোকানে ও বাজারে সরবরাহ করতে বেরিয়েছে। তার পর দেখা যায় ফুলওয়ালীরা বড় বড় রাস্তার মোড়ে

একটি ক'রে ফুলের দোকান ক'রে বসে' আছে। এটি শুধু লণ্ডনেই দেখি নি, বার্লিন, প্যারিস্, ভিয়েনা প্রভৃতি সব বড় বড় সহরেই দেখেছি। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কত বার যে শোনা যায় 'এ লাভ্লি বাঞ্চ্ অব্ রোজেস্—এ পেনি, স্যর্!' (এক তোড়া গোলাপফুল—মাত্র এক পেনি দাম, মহাশয়) তার ঠিক নেই। গল্প শুনেছি, বিখ্যাত রাজনীতিক পুরুষ গ্লাড্স্টোন্ কখনও কোটের বোতামের ফাঁকে একটি ক'রে সুন্দর ফুল না গুঁজে কোন বক্তৃতা দিতে যেতেন না।

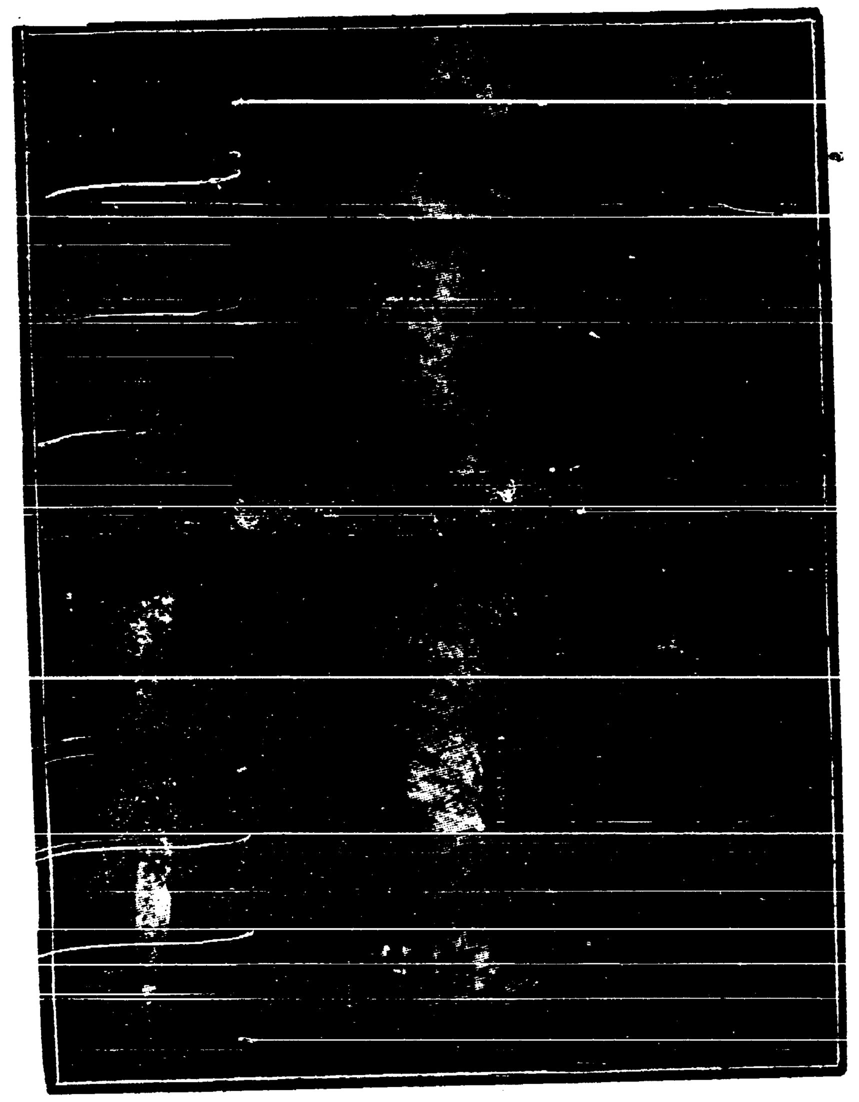

হ্যাম্ষ্টেডের কেন্ উড

ভোর বেলায় পর্ব্বতপ্রমাণ যে যন্ত্র আস্তে আস্তে ঘুরতে সুরু করেছিল একটু বেলা হ'লে সে ক্রমশঃ আরো জোরে ঘুরে চলে। ক্রমে লণ্ডনের রাস্তায় দু'চারটে ট্যাক্সি দেখা দেয় ও তার পর শোনা যায় খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা,র হাঁক-ডাক। আরো একটু বেলা হ'লে আবির্ভাব হয় ভিখারীদের। তারা ভিক্ষা করে বটে কিন্তু মুখে কখনো একটি পয়সাও চায় না। সাধারণতঃ বেহালা অথবা অন্য কোন বাজনা বাজিয়ে পথে পথে তারা বেড়াচ্ছে। কোন ভদ্রলোক দেখলে টুপিটা খুলে সামনে ধরবে। কারো ইচ্ছা হ'ল তো এক পেনি টুপিতে ফেলে দিয়ে গেল। ভিখারী মাথাটা একটু নুইয়ে বল্‌ল, 'থ্যাঙ্ক্ ইউ স্যর্' (ধন্যবাদ, মহাশয়)। এদের মধ্যে এক একজন ভারী সুন্দর বাজনা বাজায়। সত্যি বলতে কি, এদের ভিতর কেউ কেউ বাজনা বাজিয়ে আমাকে তন্ময় করে দিয়েছিল।

যন্ত্রের বেগ ক্রমে আরো জোরে বেড়ে চলে। তখন রাস্তায় বের হ'লে

নিজেকে জনতার মাঝে হারিয়ে ফেলতে হয়। কেউ কারো দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না, যে যার কাজে ছুটে চলে। মানুষের মনে অনেক সময় এমন এক একটা ভাবের উদয় হয় যখন রাস্তায় বেরিয়ে জনতার মাঝে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পারলে অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। এমনি মন নিয়ে একদিন ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি অক্‌স্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটে। চোখে পড়ল পাঁচ নম্বরের বাড়ী। এ বাড়ীতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উনবিংশ শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক চার্লস্ ডিকেন্স থাকতেন। চলতে চলতে পিকাডিলিতে এসে পড়েছি। পিকাডিলি বিখ্যাত যায়গা। এ পাড়ায় যে কত বিখ্যাত লোক বাস করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তার পর লেষ্টার স্কোয়ার!—শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন থাকতেন ঐ পাড়ায়। এগিয়ে গেলাম চারিং ক্রস্‌এ। মনে পড়ল সাহিত্যিক চ্যাপ্‌ম্যানের কথা। গ্রীক্ কবি হোমারের 'দি ইলিয়াড্' ও 'দি ওডেসি' কে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করে ইনি অমর হয়ে গেছেন। তোমরা নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ দু'খানির বাংলা অনুবাদ পড়েছ। পড় নি?

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পড়লাম ষ্ট্র্যাণ্ডে। মনে হ'ল বেন্ জন্‌সনের কথা। তিনি কিছুদিন ঐ রাস্তায় বাস করেছিলেন। ক্রাভেন্ ষ্ট্রীটএ পৌঁছে চোখ পড়ল সাত নম্বরের বাড়ীর উপর। ঐ বাড়ীতে থাকতেন জগৎবরেণ্য বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন্। তার পর এক্‌সেটার ষ্ট্রীট্। ঐ রাস্তায় থাকতেন বিখ্যাত সাহিত্যিক ডাঃ সামুয়েল জন্‌সন্। যখন দিনে সারে চার পেনি করে রোজগার করতেন তখন তিনি বাস করেছিলেন ঐ রাস্তায়। জন্‌সনের মত একাধারে অত বড় পণ্ডিত ও মহানুভব ব্যক্তি ইউরোপে দুর্ল্ভ। শেষকালে ফ্লিট্ ষ্ট্রীট!—লণ্ডনের যত খবরের কাগজের অফিস্ সব ঐ রাস্তার উপর। রাস্তার এপাশে ওপাশে বহু রেস্তোরাঁ। কাগজের অফিসের যত লোক তাদেরই ভীড় সেখানে বেশী।

মাটির নীচ দিয়ে যে রেল যায় তা প্রথম দেখলাম লণ্ডনে। এখন যুদ্ধের সময় মাটির নীচে লোকজন ঘর-বাড়ী করে বাস করছে এও তো শুনছি। মাটির নীচে আমি যে রেল দেখেছিলাম ইংরেজেরা তার নাম দিয়েছে "টিউব"। উপরে ট্রাম, বাস্ ও পায়ে হেঁটে চলার রাস্তা ও তলা দিয়ে চলেছে টিউব। এ ছাড়া টেম্‌স্ নদীর নীচ দিয়েও টিউবের লাইন গেছে। টিউবে করে সহরের সর্ব্বত্র যাওয়া যায়।

অফিসের সময়ে যে কোন বড় ষ্টেসনে দেড় মিনিট অন্তর অন্তর একটা করে টিউব আসে। ট্রেনের শব্দ পাওয়া মাত্র লাইন বেঁধে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে যায়। ট্রেন এসে পৌঁছল,—একজনের পর আর একজন করে ভীড় না জমিয়ে লোক উঠল। প্রতি 'সীটে' সাধারণতঃ দু'জন করে বসতে পারে। যারা বসবার যায়গা পেল না তারা দাঁড়িয়ে রইল। গার্ড দেখে নিল সকলের ওঠা হয়েছে কি না ও একটি ইলেক্‌ট্রীক্ সুইচ্ টিপে দিয়ে সব গাড়ীর দরজা একসঙ্গে বন্ধ করে দিল। গাড়ী ছুটল আঁধার

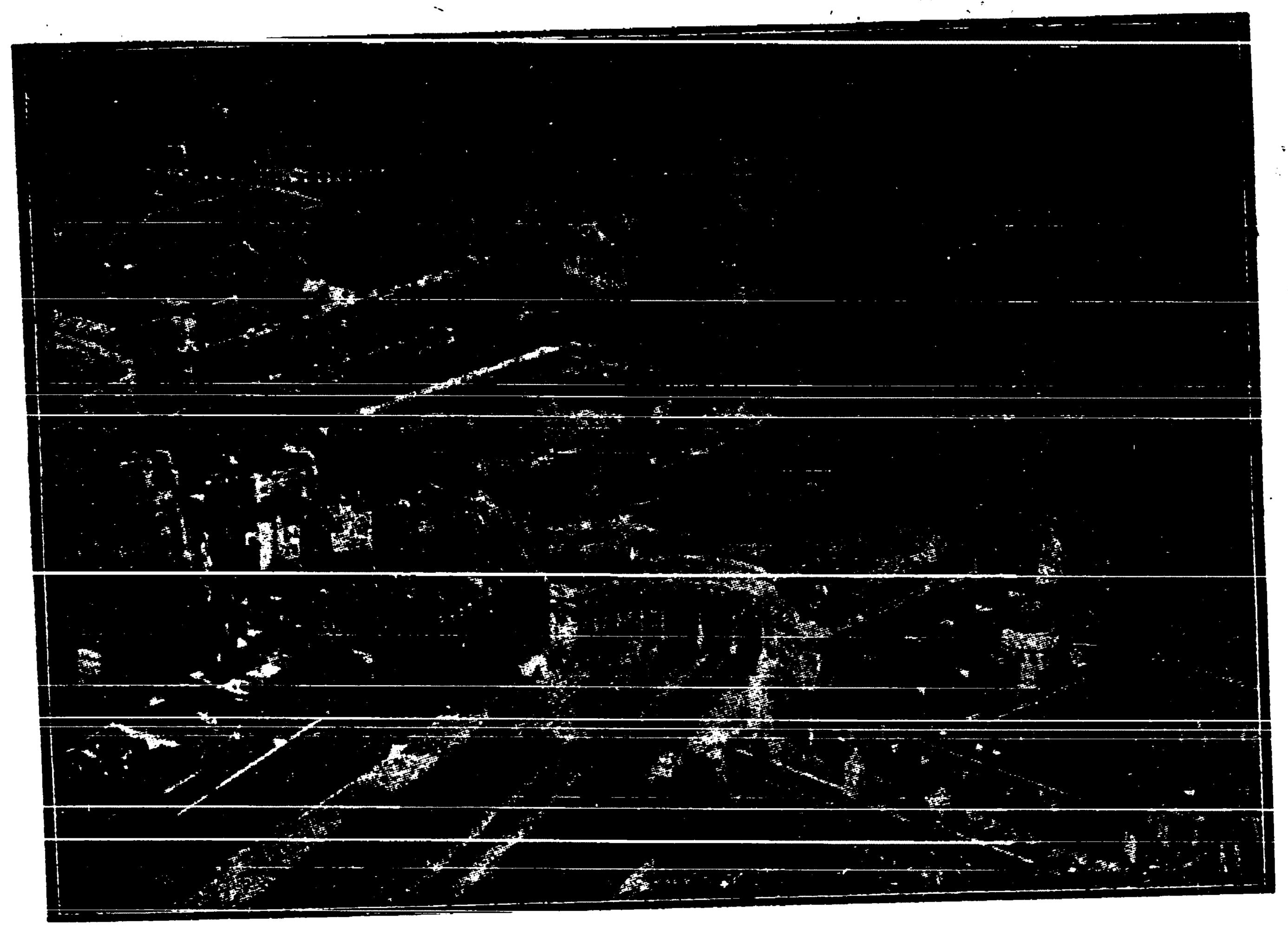

আকাশ থেকে লণ্ডন কেমন দেখায়

গহ্বরের ভিতর। ট্রেনের ভিতর ইলেক্‌ট্রীক্ বাতি জ্বালান আছে। দুই পাশের দেয়াল প্রায় ঘেঁষে গাড়ী ছুটেছে বিদ্যুৎবেগে। বাইরে তাকালে দেখা যায় দেয়ালের গায়ে লাগান মোটা মোটা পাইপ ও মাঝে মাঝে একটি করে জ্বালান বৈদ্যুতিক আলো।

টিউবের ষ্টেসনগুলি দেখতে ভারী সুন্দর। রাস্তার ফুটপাথ থেকে নেমে গেছে একটি সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে যেন বিজ্ঞানের মায়াপুরী সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধব্‌ধবে পরিষ্কার মাটির নীচের ষ্টেসনটি। ষ্টেসনের একপাশে একটি বইএর 'ষ্টল' ও একটি ফলের দোকান। 'অটোম্যাটিক' টিকেটের কলে টিকেট পাওয়া যায়। একটি পেনি ফেলে দিলে বেরিয়ে আসে একটি টিকেট। অনেক টিকেট-কলে ছয় পেনি অথবা তিন পেনি ফেলে দিলে একটি টিকেট ও বাকী পয়সা ফেরত চলে আসে। কোন কোন ষ্টেসন আবার দোতলা। একতলা দিয়ে একটা ট্রেন যায় ও দোতলা দিয়ে আর একটা যায়। যে সব ষ্টেসন নীচু সেখানে কষ্ট করে সিঁড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে নেমে যেতে হয় না,—একটি চলন্ত সিঁড়ির সাহায্যে নেমে যাওয়া যায়। ঐ সিঁড়িকে ইংরাজিতে বলে Escalator (এস্‌কেলেটর)। সিঁড়িটি সব সময়ে চলে। সিঁড়ির পাদানির উপর দাঁড়ালে সে মন্থর গতিতে নীচে নিয়ে যায়। শুধু নীচে নামবার জন্যই সিঁড়ি ব্যবহৃত হয় না, নীচে থেকে ওপরে ওঠাও হয়। আর এ ছাড়া লিফ্‌টও প্রচুর ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনে ও বার্লিনে এস্‌কেলেটরের প্রচুর প্রচলন আছে, প্যারিসে লিফ্‌টই বেশী ব্যবহৃত হয়—এস্‌কেলেটর সেখানে কম।

লণ্ডন সহর থেকে কিছু দূরে যেতে হ'লে আর সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না—ট্রেনে করে মাটির উপর দিয়েই যাওয়া চলে। হামবুর্গ সহরে টিউব নেই, কিন্তু সহরের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ট্রেনে করেই সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে।

শুনেছি লণ্ডনের টিউবে দৈনিক দুই কোটি লোক যাতায়াত করে। সারা সহরে টিউবের লাইনের দৈর্ঘ্য ৬২ মাইল ও সহরের বাইরে যাবার রেলের লাইন ২৯ মাইল। লণ্ডনে সব শুদ্ধ ষ্টেসন ১৯৪টি, এস্‌কেলেটর ৮৫টি ও লিফ্‌ট ১৭১টি।

ষ্টেসনগুলি মাটির নীচে হ'লেও মোটেও অস্বাস্থ্যকর নয়। ষ্টেসনের ভিতরকার বাতাস অনবরত পাম্প্‌ করে বাইরে টেনে আনা হয় ও বাইরের হাওয়া ভিতরে ঠেলে ফেলা হয়।

লণ্ডন, প্যারিস্‌ ও বার্লিন ছাড়া ইউরোপে আর টিউব আছে মস্কোতে ও বুদাপেষ্টএ।

[ভারতের ভুলে-যাওয়া যুগের একটি কাহিনী]

সাত

ঘরে এসে কন্যাকুমারী বিছানায় শুয়ে পড়ল, বালিশে মুখ গুঁজে হু-হু করে কাঁদতে সুরু করে দিলে।

আঘাতটা বড় হয়ে তার বুকে বেজেছিল। ভারতের দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কন্যা হওয়ার যে গৌরব ও যে অহঙ্কার সে এত দিন উপভোগ করছিল, তা এমনি সহসা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে তা কে ভেবেছিল? মনের আকাশে যে কল্পনার প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল ক্ষণিকের ঝড়ো হাওয়ায় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নামগোত্রহীন পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটি মেয়ে সে, সম্রাট্‌ করুণা করে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে আশ্রয় দিয়েছেন—এই তার একমাত্র পরিচয়। উদ্ধত সেনানায়কের মুখ থেকে আজ সেই পরিচয়টুকুই সকলের সামনে ফেটে পড়ল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত। সব গর্ব্ব ও আত্মাভিমান মাটিতে মিশিয়ে গেল সামান্য একটি কথার আঘাতে। সম্রাট্‌নন্দিনীর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান সভাসদ্‌দের মুখের মৃদু হাসির আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আর সম্রাট্‌ সব শুনে মৃদু হাসলেন, পার্শ্বচরদের সামনে তার এই অপমান উপভোগ করলেন। এই জন্যই কি মিহিরকুল তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছেন? এর চেয়ে হূনদের ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়ে মৃত্যুও তো ভালো ছিল!

কন্যাকুমারীর যত বিরাগ পুঞ্জীভূত হ'ল সম্রাট্‌ মিহিরকুলের উপর।

ইতিমধ্যে একজন প্রৌঢ়া পরিচারিকা ভিতরে এল। পায়ের শব্দে কন্যাকুমারী মুখ তুলে তাকাল। তার চোখে জল দেখে পরিচারিকা বল্‌লে—রাজকন্যা, তুমি কাঁদছ?

কন্যাকুমারীর ঠোঁট দুটি থর থর করে কেঁপে উঠল, অভিমানের স্বরে সে বলে উঠল—আজ থেকে আমি আর রাজকন্যা নই, ও-নামে আমায় আর ডাকিস নে।

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই দিদিমণি।

—তুই তো জানিস্‌, আমি রাজকন্যা নই।

এই পরিচারিকাটী সব সময় কন্যাকুমারীর কাছে কাছে থাকত, কোন কথাই তার অজানা ছিল না। স্নেহমাখা সুরে সে বললে—নিজের মেয়ে না হ'লে কি মেয়ে হয় না দিদিমণি? এত দিন কত আদর যত্ন করে সম্রাট্‌ তোমায় মানুষ করলেন…

—সম্রাট্‌ তো আমায় মানুষ করেন নি, আমায় মানুষ করেছিস্‌ তো তুই।

—ছিঃ রাজকুমারী!

—আবার সেই রাজকুমারী! পথে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে কখনও রাজকুমারী হ'তে পারে?

—অমন কথা বলতে নেই রাজকন্যা, নিজেকে অত ছোট করে ভাবছ কেন?

—না, ভাববে না, সবার সামনে জেতমানা আজ সেই কথাই তো জোর গলায় শুনিয়ে দিলে। সম্রাট্‌ একটী কথাও বললেন না। এইজন্যই কি তিনি আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন? কে তাঁকে বলেছিল পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পরে এই ভাবে আমাকে অপমান করতে? এর চেয়ে হূন সওয়ারদের ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়ে আমার মরণও তো ভালো ছিল!

কন্যাকুমারী উচ্ছ্বসিত হয়ে বালিশে মুখ গুঁজল।

বিছানার এক পাশে বসে পরিচারিকা কন্যাকুমারীর মাথাটি কোলের উপর তুলে নিলে, তার পর তার চুলের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে লাগল। ওই স্নেহের পরশটুকু পেয়ে কন্যাকুমারীর কান্না যেন আর থামতে চায় না। সান্ত্বনা দিয়ে পরিচারিকা বল্লে—তুমি জেতমানার সঙ্গে কথা কও কেন রাজকন্যা? ওর কথাগুলোই কেমন যেন বাঁকা বাঁকা! ও-লোকটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। অবিরাম মানুষ খুন করতে করতে ওটা একটা জানোয়ার বনে গেছে।

কথাটা বলে ফেলে পরিচারিকা বাইরের দিকে একবার সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল, যদি কথাটা কেউ শুনে থাকে তা হ'লে আর রক্ষা নেই।

—তা বলে অন্যায় দেখলেও কিছু বল্‌তে পাব না?

—রাজ-রাজড়ার অন্যায় আমাদের মুখ বুঁজে দেখে যাওয়াই যে ভালো রাজকন্যা। ওদের পাপের বোঝা যখন পূর্ণ হবে তখন ওরা আপনিই ভেঙে পড়বে, তোমায় আমায় কিছুই করতে হবে না। ভগবানের বিচারে অন্যায় হবার যো নেই।

রাজকন্যা আর কিছু বল্‌লে না, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শুধু।

রাত্রির প্রথম প্রহর কেটে গেছে। অস্তগামী চাঁদ একটু আগে মুখ লুকিয়েছে ওদিক্‌কার

কালো কালো পাহাড়গুলোর আড়ালে। চারিপাশে অন্ধকারের আবছায়া। এক একটা দমকা হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি শির শির করে শিউরে উঠছে। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে ডেকে চলেছে, বিরামহীন। এক একটি গাছে জোনাকীর পাঁতি চমকাচ্ছে দপ্‌দপ্‌ করে।

প্রাসাদের অলিন্দে কন্যাকুমারী দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে অন্ধকারের অসীমতায়। পাহাড়ের পায়ের গোড়ায় ছোট নগরটীকে আর ঠাহর করা যায় না, কালো পাথরের কোলে তা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কোথাও মানুষের এতটুকু সাড়া নেই, চারিদিক স্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম। অন্য সময় হলে তখনও কোন মন্দির, পাঠগৃহ বা বিপণি থেকে দু-একটি দীপশিখার দূর রেখা চোখে পড়ত, কিন্তু হূন-অধিকৃত শঙ্কাতুর নগরে সে দীপশিখা আর জ্বলে না।

কন্যাকুমারী তাকিয়ে আছে অন্ধকারের পানে। অন্য দিন এতক্ষণে সে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ আর তার কিছু ভালো লাগছে না, চোখে তন্দ্রাও নেই। তার মাথার মধ্যে ঝড় উঠেছে। জীবনের যা কিছু বন্ধন সব ঢিলা হয়ে গেছে, বাঁচবার যত কিছু গৌরব হারিয়ে গেছে। শুধু অন্ধকার জাল বুনে চলেছে তার চারিপাশে। সীমাহীন তেপান্তরের বুকে তার পথ হারিয়ে গেছে, একজনও সঙ্গী নেই যাকে পথের দিশা জিজ্ঞেস করবে। আজ সে বড় নিঃসঙ্গ, একান্ত একা। হিন্দুস্থানে জন্মেও সে আজ হিন্দু নয়, হূন সম্রাটের ঘরে লালিত হয়েও হূনের মর্য্যাদা সে পেলে না। অতীত একেবারে মুছে গেছে, ভবিষ্যতের কোন নির্দ্দেশও নেই। ধরণীর ধূলার বুকে সে হারিয়ে গেছে, চারিপাশের আবেষ্টনী শুধু তাকে উপহাস করে চলেছে প্রতি নিয়ত। এর চেয়ে যে পথ থেকে সম্রাট্‌ তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন সেই পথই তো ছিল তার কাছে বহু আপনার, সেই পথে ফিরে যাওয়াই তার কাছে ভালো,—যেতে তাকে হবেই।

নিশির ডাক শুনে লোকে যেমন বেরিয়ে পড়ে, তেমনই পথের ডাক কন্যাকুমারীকে আকর্ষণ করল,—অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে চিন্তাচ্ছন্ন মনে ধীরপদক্ষেপে সে অলিন্দ অতিক্রম করল।

অলিন্দের শেষে সারি সারি ঘর। সেই ঘরগুলির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সহসা কোন একটি ঘরের ভিতর থেকে কয়েকটি কথা এসে কানে বিঁধল, উন্মনা কন্যাকুমারী থমকে দাঁড়াল। পাশের একটি দরজা খোলা। বাইরে কোন পাহারাদার নেই। ভিতরে কয়েকটি দীপ জ্বলে জ্বলে ম্লান হয়ে এসেছে। সেই ঢিমে আলোয় বসে কারা কথা বলছে, বাইরে থেকে তাদেরকে দেখা যায় না। শোনা যায় জেতমানার কণ্ঠ, বিশেষ জোর করে সে বলছে—বিষ্ণুবর্দ্ধন বলেছে ও-লোকটী তার ভাই; ওটা নিছক মিছে কথা ছাড়া আর কিছুই নয়!

—কিন্তু হিন্দুরা তো মিছে কথা বলে না!—সম্রাটের গলা শোনা গেল! ওদের ধর্ম্মে মিথ্যাভাষণ মহাপাপ।

—এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে,—জেতমানা বল্‌লে। ওদের শাস্ত্রে আছে ছলে-বলে অথবা কৌশলে শত্রুর শেষ করবে। আমরা ওদের শত্রু, আমাদের ক্ষতি করার জন্য ওরা যদি দু'দশটা মিছে কথাই বলে তা মোটেই দূষণীয় নয়।

—তোমার স্থিরবিশ্বাস ওই লোকটাই কালো সওয়ার?

—এ সম্বন্ধে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। শুধু কি আমি, সবাকার মুখেই এই এক কথা, বিষ্ণুবর্দ্ধনের ভাই হ'লে এত দিন সে ছিল কোথায়?

—সত্যও তো হ'তে পারে, সে এত দিন নালন্দায় পড়ছিল।

—আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে সম্রাট্, ও-ই কালো সওয়ার। এত দিন গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। এখন চারিদিকে আমাদের গুপ্তচর ছড়িয়ে পড়েছে, তার উপর পাঁচ হাজার স্বুবর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করায় আর লুকিয়ে থাকার সুবিধা হচ্ছে না। তাই এখন প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়েছে, যাতে আমরা আর সন্দেহ করতে না পারি।

—ভালো কথা। তুমি যখন নিশ্চিত বুঝেছ···

—আমার মনে এতটুকু দ্বিধা নেই সম্রাট্, শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছি।

—বেশ, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।

—আর আমার কোন চিন্তা নেই, সম্রাট্, আজ রাত্রেই আমি ওকে শেষ করব। যে আমাদের শত্রু তার মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলব।

—আর সেই মেয়েটাকে···

সম্রাটের কথা শেষ হবার আগেই জেতমানা বল্‌লে—তার কথা আমি ভুলিনি সম্রাট্, ওই মেয়েটাকে এনে আপনার সভায় নাচাব, তবে আমার নাম জেতমানা।

সম্রাট্ হা হা করে হেসে উঠলেন, জেতমানার পিঠ চাপড়ে দিলেন খুসি মনে।

কন্যাকুমারীর উদভ্রান্ত মন সহসা যেন একটা দিক্ খুঁজে পেলে। সে আর সেখানে দাঁড়াল না, বরাবর চলে এল প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বারে। লৌহ ফটকের পাশে একজন শাস্ত্রী দাঁড়িয়েছিল, কন্যাকুমারীকে দেখে সসম্মানে প্রণাম জানাল। একটি আংটী খুলে কন্যাকুমারী তার হাতে দিলে। প্রণাম জানিয়ে দ্বারী ফটক খুলে দিলে। কন্যাকুমারী পথে বেরিয়ে পড়ল।

অল্পক্ষণেই মধ্যরাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে কন্যাকুমারীর ছায়া মিলিয়ে গেল, মৃদু পদশব্দও আর শোনা গেল না।

সন্ধ্যার সময় রাজবৈদ্য বাহির হয়ে গেছে, এখনও ফেরে নি। দীপের মৃদু আলোর সামনে বসে ধর্ম্মদেব বিষ্ণুপুরাণের পাতা ওলটাচ্ছে, নানান্ তথ্যের মধ্যে ডুবে গেছে তার মন।

ইতিমধ্যে দ্বারে করাঘাত হ'ল। ধর্ম্মদেব তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলে। কিন্তু দরজা খুলেই থমকে গেল—বিষ্ণুবর্দ্ধন তো নয়, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে? কি চান?

—একটা কথা বলতে এসেছি—বলে কোন অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ধর্ম্মদেবকে পাশ কাটিয়ে মেয়েটী ভিতরে এল।

তার মুখে আলোর আভা পড়তেই ধর্ম্মদেব তাকে চিনতে পারল, বল্‌লে—সম্রাট্-নন্দিনী! এত রাত্রে আপনি এখানে!

—আপনি তো জানেন, আমি সম্রাট্‌নন্দিনী নই,—মেয়েটী বল্‌লে। আমি পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া অতি-সাধারণ একটি মেয়ে। দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে সম্রাট্ যখন ভারত অভিযানে এগিয়ে আসছিলেন তখন গান্ধারের এক নদীতটে আমায় দেখতে পান। পণ্ডিতেরা বলেন, এ নাকি অত্যন্ত শুভ সূচনা, ভারতে পদার্পণ করে এই শিশুকন্যা লাভ করা মানে দক্ষিণাপথের কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত জয়ের সূচনা করে। সেই শুভ-সূচনার প্রতীক হিসাবে সম্রাট্ আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে পালন করেন, আর নাম রাখেন কন্যাকুমারী।

বল্‌তে বল্‌তে মধ্যপথে কন্যাকুমারী থেমে গেল, ধর্ম্মদেবের চোখের পানে তাকিয়ে মনে হ'ল সে যেন তার সব কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। একবার মনে করলে সেখান থেকে তখনই চলে যায়, কিন্তু তা হ'লে এত রাত্রে এখানে ছুটে আসার তো কোন অর্থ হয় না। বল্‌লে—আপনি আমার সব কথা হয়তো বিশ্বাস করতে পারছেন না, কিন্তু আমি যা বল্‌তে এসেছি সেগুলো আপনাদেরকে জানানোই আমার কর্ত্তব্য বলে মনে করি। তার পর বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।

ধর্ম্মদেব লজ্জা পেলে। তাড়াতাড়ি বল্‌লে—আপনাকে বড় বিচলিতা বলে মনে হচ্ছে দেবী, আপনি আসন গ্রহণ করুন, তার পর···

—প্রয়োজন নেই। আমার কথা শেষ করে আমি এখনই বিদায় নেব। আমার কথার সত্যমিথ্যা আপনি বুঝতে পারবেন এই রাত্রেই। সেনাপতি জেতমানার বিশ্বাস আপনিই কালো সওয়ার। সেই কথাই সে সম্রাট্‌কে জানিয়েছে, এবং সম্রাট্ তাকে অনুমতি দিয়েছেন আপনাকে নিহত করার। এখনই সে এসে পড়বে। আপনার অবিলম্বে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।

—কিন্তু আমি তো কালো সওয়ার নই।

—না হ'লেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ওদের যখন একবার ধারণা হয়েছে আপনিই কালো সওয়ার, তখন ওরা আপনাকে শেষ না করে ছাড়বে না। যুক্তি-তর্ক-বিচার প্রমাণের

কোন বালাই ওদের নেই। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করার জন্য স্থান ত্যাগ করাই আপনার পক্ষে বিধেয়।

—আজ সকালে আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আবার এই সংবাদ!...আপনার এই ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারব না।

সে কথায় বিশেষ কান না দিয়ে কন্যাকুমারী বললে—আর একটা কথা, সেই মেয়েটীকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন...

—এবং তোমাদের দু'জনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

সহসা ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল। দেখা গেল: অন্ধকারে মুক্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেতমানা। ক্ষণেকের জন্য ধর্ম্মদেব ও কন্যাকুমারীর মুখে কোন কথা সরলো না, জেতমানার মুখের পানে তাকিয়ে তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। একটা আতঙ্কের ঢেউ বহে গেল কন্যাকুমারীর সারা দেহে।

(ক্রমশঃ)

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭

অদ্ভুত আবেষ্টনীর মধ্যে হরির সংশয়ময় নূতন কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল।

সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড এক দীঘির অপর পারে আশ্রমের আর এক বিভাগ, তার নাম 'কর্ম্মকাণ্ড'। সেখানে প্রায় পঞ্চাশটী গুহায় বা পাতালগৃহে কর্ম্মীর দল গোপনে বাস করে। তাহাদের প্রবেশ ও প্রস্থান দুই-ই রহস্যময়। দীঘিতে নানা জাতীয় ছিপ, বজ্‌রা ও

পানসীতে উহারা জলযুদ্ধের মহড়া দেয়। কেমন করিয়া বজ্‌রা আক্রমণ করিতে হয়, বিপদে আত্মরক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া দীর্ঘ সড়কী জলে 'টরপেডো'র মত নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর দ্রুত চলন্ত নৌকা ঘায়েল করিতে হয় এই সব বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা হয়। ইহা ব্যতীত সন্তরণ শিক্ষায় পটুতা, কুস্তি, লাঠি ও বন্দুক চালনায় ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য এইখানেই অর্জ্জন করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটী জলদস্যুদের সামরিক বিদ্যালয় বিশেষ। এখানে প্রথম শ্রেণীর নাবিক বা গাবর দল গঠিত হয়।

এখানকার কর্ম্মীবৃন্দকে হরির ভাল লাগিল না, তাহাদের সন্দিগ্ধ ভাব ও কর্ম্মপদ্ধতি তাহার মোটেই প্রীতিকর বোধ হইল না। তবে তাহাদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দৈহিক গঠন ও কৃত্রিম যুদ্ধ প্রশংসার যোগ্য বটে।

সাধুর আদেশে আশ্রমেই হরির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আশ্রম-সচিব শতাধিক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে হরির পরিচয় করাইয়া দিলেন। হরি সতৃষ্ণনয়নে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে এবং আগ্রহে একখানি চেনা মুখের অন্বেষণ করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাহার ভাগিনেয় 'কটা' নাই।

যে সকল বালককে উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যতটুকু ইহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে আশ্রমের একটী গোপন খাতায় তাহা লিপিবদ্ধ আছে। একটী শিশুর নাম 'দিলু'—বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার এক গ্রামে, গঙ্গাসাগরের পথ হইতে আনা হইয়াছে। আর একটীর নাম 'বিনু', একটীর নাম 'মনু' এইরূপ কত নাম! একটী শিশুর বাড়ী ঢাকা জেলা। মাতাপিতার নামও কোন কোন ক্ষেত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সব শিশু জননীর কোল আলো করিয়া ছিল—কত ভবনের স্বর্ণদীপ আজ এই অজানা প্রান্তরের অন্ধকারে জ্বলিতেছে। এ দীপালীর আলো গোপালের মন্দিরই আলোকিত করিতেছে।

হরি ভাবিতে লাগিল—যে সব মুকুল অকালে ঝরে, যে সব শিশু অকালে পলায় তাহারাও বুঝি স্বর্গের কোন আশ্রমে এমনি সযত্নে লালিত পালিত হয়, পৃথিবী তাহার সন্ধান জানে না। নূতন জীবন লভিয়া, নূতন গৃহ আলোকিত করিবার জন্য তাহারা সজ্জিত হয়। হরির তন্ময়তা দেখিয়া আশ্রম-সচিব ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

মুকুল ঝরে মুকুল ঝরে হায় রে,
লতার বুকে কি দাগ রেখে যায় রে!
কত বেদন যায় যে দিয়ে,
কত সোহাগ যায় সে নিয়ে,
বিষাদেতে গোটা কানন ছায় রে।

ছোট মুকুল—নেহাৎ ছোট হয় ত,
ব্যথা তাহার কিন্তু ছোট নয় ত।
সকল ফুল ও মুকুল মাঝে
সদাই তাহার অভাব রাজে,
ভাবতেও যে কান্না আমার পায় রে!

লতার কাছে কুঁড়ির নাহি জাত রে,
সকল কোরক কোরক-পারিজাত রে!
এমনি মধুর মায়ের স্নেহ,
সকল ছেলেই কার্ত্তিকেয়,
আনন্দেতে ত্রিভুবন মাতায় রে!

হরির দুটী চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সত্যই কত বংশের গৌরব, কত গৃহের সম্পদ্ ও শোভা আজ অজ্ঞাতে এখানে রহিয়াছে—হায়, হারানিধি কি গৃহী আবার ফিরিয়া পায়?

যখন আশ্রমে 'কটা'র সন্ধান মিলিল না তখন সাধুবাবা হরিকে বলিলেন—"আমি বুঝিতেছি সে ওলন্দাজ জলদস্যুর হাতে পড়িয়াছে—তাহার উদ্ধার হইবে, আমি সর্ব্বত্র কর্ম্মীগণকে আদেশ দিয়াছি।"

সাধু হরিকে সস্নেহে বলিলেন—"তোমার ভাগিনেয়ের উদ্ধার ভগবান্ করিবেন, নিশ্চিন্ত থাক। তোমাকে ভগবান্ প্রচুর সাহস ও শারীরিক বল দিয়াছেন—বাঙলার স্থলে-জলে আজ বাঙালীর ধন, মান, প্রাণ বিপন্ন। বাঙলার নদী আজ হাঙ্গর-কুম্ভীর অপেক্ষা ভীষণতর দস্যুদলে পূর্ণ, তাহারা নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালাইতেছে, দেশের বহু যুবককে পথভ্রান্ত করিতেছে—দুর্দ্ধর্ষ ওলন্দাজ দস্যুদিগকে দমন করিতে হইবে। যুদ্ধ জীবের ধর্ম্ম—ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'। এসো, মা কমলে কামিনীর মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া প্রার্থনা কর—'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'।"

এইরূপে গুরুর প্ররোচনায় হরি দস্যুদলের নেতা হইল। সে প্রথম ছয় মাস সেখানকার শিক্ষণীয় বিষয় সুন্দর আয়ত্ত করিল, তার পর নিজ প্রতিভায় সে নব নব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া দলকে নূতন ভাবে গঠিত করিল। শৌর্য্য ও কর্ম্মকুশলতার সঙ্গে সংযম ও ক্ষমার সংযোগে হরি এই দস্যুবৃত্তিতেও একটা ধর্ম্মযুদ্ধের গৌরব ও আকর্ষণ আনিল।

'বাঙলার জল বাঙলার স্থল
ধন্য হউক, ধন্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান্!'

এই যেন হইল নবগঠিত দলের মূলমন্ত্র।

হরি ছিল—'মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার' এই প্রকৃতির লোক। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল ওলন্দাজ জলদস্যুগণকে আক্রমণ; ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর; কিন্তু হরি বৎসর ধরিয়া দলকে প্রস্তুত করিতে লাগিল—আশী দাঁড়ের দুইখানি ছিপ্ প্রস্তুত করাইল, তাহার প্রত্যেক গাবর দক্ষিণ পদ দ্বারা জলে নূতন ভাবে সড়কী ক্ষেপে নিপুণ হইয়া উঠিল। দীঘিতে এখনকার যুদ্ধের মহড়া এক দর্শনীয় ও বিস্ময়ের বস্তু হইল।

হরির নেতৃত্বে গাবরগণ মৃত্যুভয় জানে না, পরাজয় জানে না, তাহার যেন অজয়—অমর।

দলের শক্তি এইরূপে প্রচুর বৃদ্ধি করিয়া হরি প্রথম ওলন্দাজ জাহাজ আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

৭

সেই পরিষ্কার মধ্যাহ্নের আলোয় সুশান্ত দেখিল, দূর দিগন্ত-কোল ঘেঁষিয়া সাগরবক্ষ দিয়া চলিয়াছে—একটি নয়, দুইটি নয়, একেবারে তিন তিনটি জাহাজ! কিন্তু এত দূরে যে জাহাজ তিনটিকে তিনটি কালো দাগের মত দেখাইতেছিল। সেখান হইতে অন্ততঃ সেগুলি পনেরো মাইল দূরে।

বিস্ময়ের আতিশয্যটুকু একটু কমিলে তার প্রথম চিন্তার বিষয় হইল কেমন করিয়া সে জাহাজের লোকগুলিকে জানায় যে তাহারা সেই নির্জ্জন দ্বীপের উপর উঠিয়াছে। পরিত্রাণ পাইবার ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু শুধু হাত বা রুমাল নাড়িয়া সে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতে পারিবে না। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া সমুদ্র-উপকূলে একটা বড় আগুন জ্বালান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্য্য, জাহাজ তিনটা নড়ে না যে! একই জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরো ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া সে দেখিল জাহাজের কোন মাস্তুলও নাই, কোন ধোঁয়াও নাই। সুশান্ত এবার দূরবীণ দিয়া অধিকতর নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ হরি, এ তো জাহাজ নয়! তিনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। তখন বেলা দুইটা। সমুদ্রের জোয়ার তখন কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশান্ত পর্ব্বতশিখর হইতে নামিতে লাগিল। তখন সূর্য্যের কিরণ আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। নীচে নামিবার পূর্ব্বে সে আর একবার চোখে দূরবীণ লাগাইয়া পূর্ব্বদিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিল। সত্যই কি সেদিকে কোন সমুদ্র নাই? কি আশ্চর্য্য, এতক্ষণ সে ইহা দেখে নাই। দূরে—বহু দূরে গাছপালার অন্তরালবর্ত্তী এক সুস্পষ্ট সুনীলরেখা এখন তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। সুদূর পূর্ব্বদিকেও যে এক নীল-নির্জ্জন সমুদ্র দেখা যাইতেছে! কিন্তু সে বহু—বহু দূরে। তাহা হইলে এটা মহাদেশ নয়। ইহা নিশ্চয়ই একটা দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগর আর য়্যান্‌টার্ক্‌টিক মহাসাগরের এই সুদূর সঙ্গমস্থলে এ কোন্ দ্বীপ?

বেলা তিনটার সময় সে নীচে নামিয়া আসিল ও পূর্ব্বের সেই পথ ধরিয়া বেলা পাঁচটার সময় তাহার সঙ্গীদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বন্ধুরা শুনিয়া কেহ হতাশ হইল, কেহ বিশ্বাস করিল না। ইহারা রঞ্জিতের দল। অবশেষে ঠিক হইল, কাল বনের ভিতর দিয়া গিয়া কয়েকজনে পূর্ব্ব দিক্‌টা দেখিয়া আসিবে।

কিন্তু পর দিন যাওয়া হইল না। আকাশ আবার বাঁকিয়া বসিল। ছেলেরা অগত্যা আবার আগের মত মাছ ধরিয়া, পায়রা শিকার করিয়া সময় কাটাইতে বাধ্য হইল।

একদিন মাছ ধরিতে গিয়া বেশ একটা মজার কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ছোটদের দল সেদিন মোহানার নিকট মাছ ধরিতে গিয়াছে। সমস্ত সকাল ও দুপুর ধরিয়া বৃষ্টির পর বিকালের দিকে আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। রঞ্জিতের দল গিয়াছে পায়রা মারিতে। জাহাজের কাজে ব্যাপৃত আছে কেবল সুশান্ত, অশোক, নীলাদ্রি ও বুনো। কিছুক্ষণ পরেই দূর হইতে ভাসিয়া আসিল ছেলেদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। তাহা যে আনন্দের উল্লাসধ্বনি তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই চীৎকারের মধ্যে ভয়মিশ্রিত সাহায্যভিক্ষারও স্পষ্ট সঙ্কেত ছিল। সুশান্তরা নদীর দিকে ছুটিয়া গেল। তাহাদের দেখিয়া আশীষ চীৎকার করিয়া উঠিল, "শীঘ্র দেখ্‌বে এস, সুশান্ত দা, রাজীব কেমন ঘোড়ায় চড়েছে! শীঘ্র ছুটে এস, নইলে বেটা এখনি জলে পালাবে।"

সুশান্তরা কাছে আসিয়া দেখে কি একটা জন্তুর উপর রাজীব ও বাব্‌লু চাপিয়া বসিয়াছে; জন্তুটাও ধীরে ধীরে সমুদ্র পানে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সেটা একটা অতিকায় সামুদ্রিক কূর্ম্ম। নির্জ্জন দক্ষিণ মহাসাগরে মাঝে মাঝে যে রকম মহাকূর্ম্মদের ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায় আমাদের এই কূর্ম্মটিও সেই জাতীয়। বাব্‌লু ও রাজীব তাহার পিঠের উপর বসিয়াছে আর অন্য ছেলেরা এক গাছা বড় দড়ি কচ্ছপটার মুখের দুই পাশ দিয়া লাগামের মত ধরিয়াছে। সবাই মিলিয়া দড়ি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাকে থামায় কে? সেই অতিকায় কচ্ছপ অক্লেশে ছেলেগুলিকে টানিয়া লইয়া চলিল। বাব্‌লুর সে কি উৎকট ক্রন্দন! রাজীবেরও 'মজা' ক্রমে ভীতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া সুশান্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মনে হইল এই কচ্ছপটাকে ধরিলে মন্দ হয় না। কিন্তু এই অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীকে কেমন করিয়া তাহারা ধরে? গুলি করিয়া মারিলেও তাহার কিছু হইবে না। পাথরের মত শক্ত তাহার খোলা। কি করিয়া তাহাকে আটকানো যায়? অশোকের মাথায় তখন একটা মতলব আসিল, সে বলিল—"বেটাকে ধরবার একমাত্র উপায় ওকে উল্‌টে ফেলা।" নীলাদ্রি কহিল—"কিন্তু এত বড় ও এত ভারী প্রাণীকে গুল্‌টাবেই বা কি করে? ওজনে এটা কম পক্ষে দশ মণ হ'বে।" সুশান্ত কহিল—"শীঘ্র কতগুলো বাঁশ নিয়ে এস।" তখন বুনো ও নীলাদ্রি জাহাজ হইতে বাঁশ আনিতে ছুটিল। সমুদ্র তখন মাত্র ৫০ হাত দূরে। সুশান্ত ছুটিয়া গিয়া বাব্‌লু আর রাজীবকে নামাইয়া লইল, তার পর সবাই মিলিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। অতগুলি বলিষ্ঠ ছেলে পিছন পানে ধরিয়াছে কিন্তু সেই মহাকায় কূর্ম্ম সকলকে টানিয়া লইয়া চলিল। আর বুঝি ধরিয়া রাখা যায় না। অবশেষে বাঁশ আসিল, সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় অনেক কষ্টে তাহাকে চিৎ করা হইল। কচ্ছপটা তখন চার পা ও মুখ বাহির করিয়া অসহায়ের মত তাকাইয়া রহিল।

বুনো বলিল—"এই কচ্ছপের মাংস ভারী মিষ্টি হয় আর তেমনি নরম; চল, আজ তোমাদের রেঁধে খাওয়াব।" হাতে কুড়াল ছিল, কাজেই কূর্ম্মরাজকে শিকার করায় আর কষ্ট হইল না।

সুশান্ত কহিল—"শুধু মুড়োটা নিলে হবে না, এর সমস্ত মাংসই আমাদের নিয়ে যাওয়া দরকার। নুন দিয়ে রেখে দিলে ভবিষ্যতে খাবারের অভাব হবে না।"

সুশান্তর কথামত তখনই সকলে কাজে লাগিয়া গেল। অত বড় কচ্ছপটাকে ত আর আস্ত লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে, তাই সেটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া সকলে মিলিয়া জাহাজে লইয়া চলিল। এই ভাবে প্রায় চার মণ মাংসের যোগাড় হইল।

দেখিতে দেখিতে এপ্রিল মাস আসিয়া পড়িল। ঝড়-জলও অনেকটা কমিয়া আসিল। ব্যারোমিটার অনেকটা উঠিয়াছে। মনে হয় প্রকৃতি এখন কিছু দিন তাহার রুদ্রমূর্ত্তি বন্ধ করিয়া রাখিবে। শীত আসিবার পূর্ব্বেই মাথা গুঁজিবার মত একটা আশ্রয় তাহাদের যেমন

করিয়া হোক্ খুঁজিয়া লইতে হইবে। সেদিন রঞ্জিৎ কহিল, "চল সুশান্ত, কাল আমরা ক'জনে পূর্বদিক্‌টা দেখে আসি। বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাবে।" সুশান্ত কহিল—"বেশ চল।" অশোক বলিল, "তোমরা যদি কাল সকালে যাত্রা কর তা হ'লে নিশ্চয় কালকের সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবে ?" সুশান্ত কহিল, "তা না ফিরতেও পারি ; যদি দু'দিন দেরী হয় তা হ'লে তোমরা যেন উতলা হয়ো না।" অশোক কহিল—"বেশ, কিন্তু তোমরা কেবল যে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের সন্ধানে চলেছ তা নয়। এদিকে তো একটা আশ্রয় মিল্‌ল না ; তোমরা দেখবে ওদিকের কোন পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে যদি কোন আশ্রয় মেলে। তোমাদের যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য সমুদ্রের সন্ধান নেওয়া নয়, একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়া।"

তখন সঙ্গে চারিদিনের মত খাবার লইয়া সুশান্ত, রঞ্জিৎ, রোহিতাশ্ব ও নীলাদ্রি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। চারিটা বন্দুক, চারিটা রিভল্‌ভার্, দু'টা কুড়াল, একটা কম্পাস, এবং একটা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রও তাহারা সঙ্গে লইতে ভুলিল না। সঙ্গে বিয়্যার কুকুরও চলিল।

সেদিন আকাশ ও বাতাস ছিল ভারী পরিষ্কার। পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাহারা সমুদ্রতীরস্থিত পাথরগুলি অতিক্রম করিয়া সেই গহন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। মাথার উপর বড় বড় গাছের বড় বড় ডালপালা। নানা রকম পাখী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। বনের মধ্যেও নানা রকম ছোট ছোট বন্য জন্তু। প্রথম প্রথম বিয়্যার তাহাদের তাড়া করিয়া চলিল। কিন্তু দেরী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহারা বিয়্যারকে নিরস্ত করিল। তাহাদের মতলব প্রথমে অন্তরীপের সেই পাহাড়টার ওদিকে পৌঁছাইয়া পূর্ব্বদিকে সমুদ্র অভিমুখে গমন করা। ইহাতে অবশ্য অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হইবে, তা হউক্।

অবশেষে বহু কষ্টে তাহারা একটা ছোট পাহাড়ের উপর উঠিল। রঞ্জিৎ চোখে দূরবীণ লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। কই, সমুদ্রের চিহ্ন তো নাই! রোহিতাশ্বও দেখিল। তখন তারা সুশান্তকে ঠাট্টা করিতে লাগিল।

সুশান্ত কহিল—"এ পাহাড়টা অন্তরীপের পাহাড়ের চেয়ে ঢের নীচু ; তাই হয়ত সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক্, আর তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। এখন এস আমরা সামনের জঙ্গলটা পার হই। সোজা পূবদিকে গেলে আমরা নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখ্‌তে পাব।"

নীলাদ্রি কহিল—"সেই ভালো কথা, তবে বনের মধ্যে ঢোক্‌বার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার, নচেৎ পা দুটো বিদ্রোহ ক'রে বস্‌বে।"

তখন সকলে পাহাড় হইতে নামিয়া প্রথমে পেট ভরিয়া সেই লোণা কচ্ছপের মাংস খাইয়া লইল ; তার পর সকলে পুনরায় পূর্ব্বদিকে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

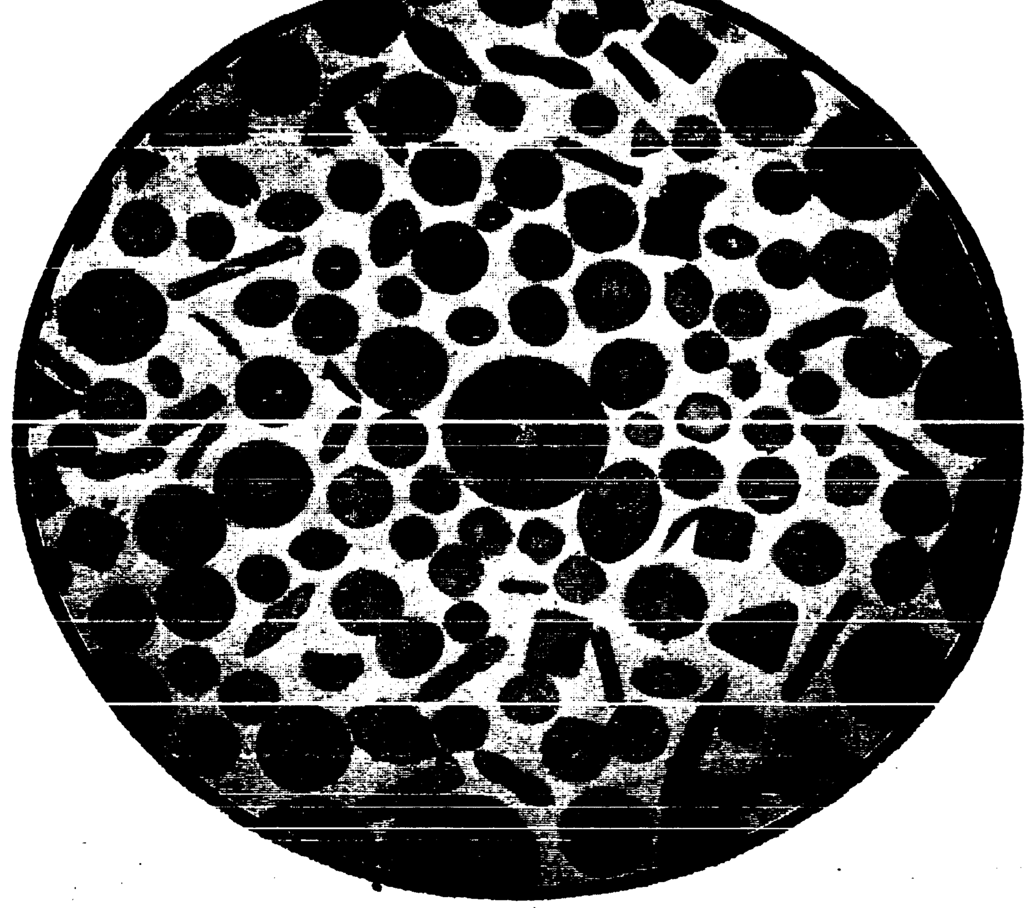

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে ডায়াটম্‌দের এমনি দেখায়। এত ছোট্ট জিনিষের মধ্যে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য কি ক'রে এল ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়। কত বিচিত্র এদের আকার, কত বিচিত্র নক্সা এদের গায়ে!

(৩৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

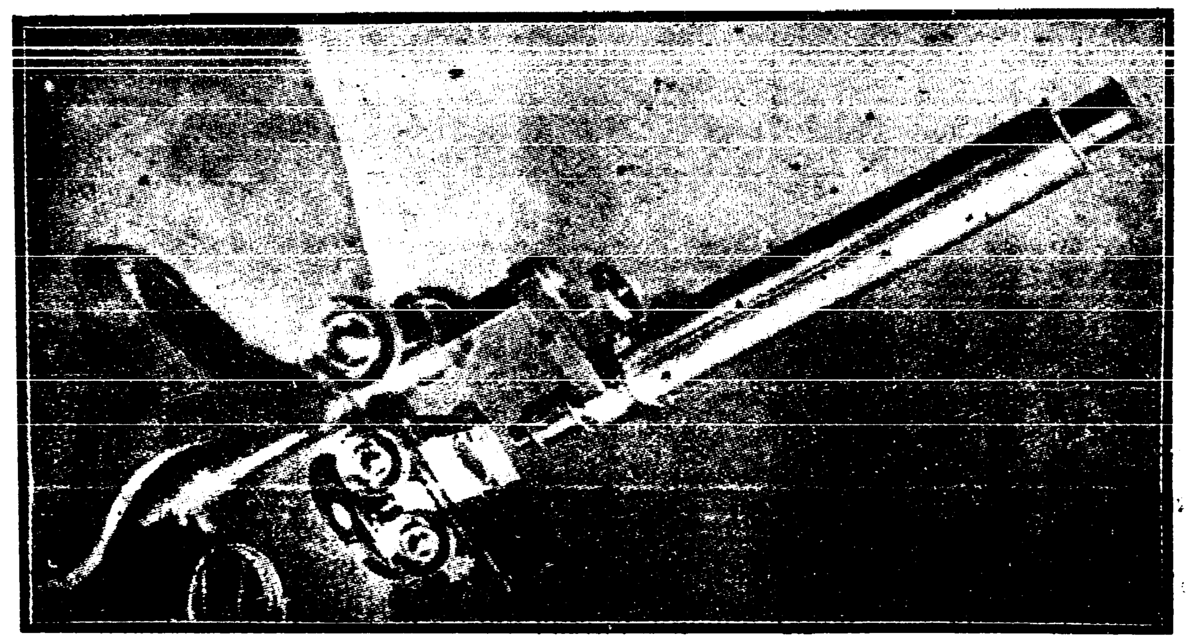

ডায়াটম্ এত ছোট যে খালি চোখে তা নজরেই আসে না। মানুষের চোখে ডায়াটমের রূপ ধরিয়ে দিয়েছে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র। আবার অণুবীক্ষণের লেন্সের সূক্ষ্মতা নির্ণয়ের জন্য ডায়াটম্ ব্যবহার করা হয়।

ছোটদের চিত্রশালা

(গত বারের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত)

আলোকচিত্র—
শ্রীমতী রেণুকা দত্ত

'নাঃ, কোন খবর নেই।'

ডায়াটম্

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য

"ডায়াটম্" নামটা বোধ হয় নতুন মনে হচ্ছে? কিন্তু জিনিষটা খুব পুরোনো আর সাধারণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে ডায়াটম্ হচ্ছে এক জাতীয় শৈবাল। তবে তোমরা যে সব শৈবাল খানা-ডোবাতে দেখ ঠিক সে রকম নয়—তা'র সঙ্গে এদের চেহারার অনেক তফাৎ। খালি চোখে আমরা এদের দেখতে পাই না—যদিও সংখ্যায় এরা অগণ্য বল্‌লেও চলে। এর কারণ আর কিছুই নয়, আকারে এগুলি এত ছোট যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের অস্তিত্ব বোঝা

যায় না। পুকুর, খাল, বিল, সমুদ্র প্রভৃতি সব রকম জলাশয়ই হচ্ছে এদের বাসস্থান। মেরুদেশের প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও যেমন এদের দেখা গেছে তেমনি আবার উষ্ণ ঝরণার মধ্যেও এদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তোমরা শুনলে অবাক্ হবে যে খানা, ডোবা প্রভৃতি নোংরা জায়গায় ডায়াটমের মত এত সুন্দর জিনিষ জন্মাতে পারে। এদের দেহ মাত্র একটী কোষ (Cell) দিয়ে তৈরী। ও রকম চেহারায় জীব আর উদ্ভিদে বড় একটা তফাৎ করা যায় না, অনেকে তাই এদের নিম্নস্তরের জীব বলেও ধরেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা এদের "য়্যাল্‌গি" জাতীয় শৈবালের মধ্যে ফেলেন। সাবানের বাক্স যেমন দুটো খোপ দিয়ে তৈরী,—একটা খোপের উপর আর একটা খোপ বসান থাকে, তেমনি ডায়াটমের দেহও দুটো আবরণে তৈরী, বড়টী ছোটটীকে চাপা দিয়ে থাকে। এই আবরণ বালি জাতীয় এক রকম জিনিষ দিয়ে তৈরী (বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলে সিলিকা) এবং সেই জন্য খুব কঠিন। এগুলো সহজে নষ্ট হয় না। খুব বেশী উত্তাপে কোন ডায়াটম্ মারা যেতে পারে কিন্তু তা'তেও তার কঠিন আবরণ নষ্ট হয় না। উপরের খোপটীতে নানা রকম সুন্দর কারুকার্য্য থাকে। কারুকার্য্যের ভিতর ডায়াটমের দেহ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। বিভিন্ন রংএর মধ্যে সাধারণতঃ ডায়াটমিন নামে এক রকম খয়েরী রং আর ক্লোরোফিল নামে এক রকম সবুজ রং দেখা যায়। গাছের পাতাও এই ক্লোরোফিলের জন্যই সবুজ দেখায় তা বোধ হয় তোমরা বিজ্ঞানের বইএ পড়েছ।

৩৪৭ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ ডায়াটমের আকৃতি কত বিভিন্ন রকমের হয়! কোনটা নৌকার মত দু'দিকে সরু, কোনটা ত্রিভুজের মত, আবার কোনটার আকৃতি চৌকো ধরণের। লম্বাটে ও গোল ধরণের ডায়াটম্‌ও দেখা যায়। এগুলো সাধারণতঃ সমুদ্রে থাকে। অনেক সময় কতকগুলো ডায়াটম্ একত্রিত হয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ছবিতে শুধু এদের আবরণের কারুকার্য্য দেখা যাচ্ছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এদের বিচিত্র বর্ণ ফুটে ওঠে এবং তখন এদের আরো সুন্দর দেখায়।

কিন্তু ছোট্ট হ'লেও এই ক্ষুদে ক্ষুদে ডায়াটম্‌গুলি এক সঙ্গে মিলিত হ'লে যে কি কাণ্ড বাধাতে পারে তা তোমরা ভাবতে পারবে না। অগণ্য মৃত ডায়াটমের

কঙ্কাল একত্র হয়ে মাইলের পর মাইল লম্বা উঁচু উঁচু পাহাড় গড়ে তোলে এ কথা বল্‌লে বিশ্বাস হবে কি? কিন্তু সত্যিই তা সম্ভব, এবং অমনিধারা পাহাড় পৃথিবীতে আছেও। কোন্ আন্তিকাল থেকে এই পাহাড় জমান ব্যাপার চলে আসছে—একটু একটু ক'রে দিনের পর দিন—এমনি ধারা হাজার হাজার বছর। হাজার হাজার বছর ধরে ডায়াটমের মৃতদেহ মাটিতে চাপা পড়ে থেকে থেকে জীবাশ্মে পরিণত হয়; এই সব পাহাড়ের পাথর সেই জীবাশ্মের স্তূপ। ডায়াটমের জীবাশ্মের স্তূপ নানা আকারে পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়—যেমন ধর কিসেলগার। তোমরা বোধ হয় ডিনামাইট নামক প্রচণ্ড বিস্ফোরকের কথা শুনেছ। অন্য কোথাও না শুনলে অন্ততঃ 'নোবেল প্রাইজ' প্রসঙ্গে শুনেছ। নোবেলই এই ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। ডিনামাইট দিয়ে আজকাল বড় বড় পাহাড়, পর্ব্বত ভেঙ্গে মানুষের যাতায়াতের রাস্তা করা হয়। আর এই ডিনামাইটের একটী উপকরণ হচ্ছে কিসেলগার। কিসেলগার অন্য ভাবেও মানুষের কাজে লাগে। নানা রকম বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে তো ব্যবহার করা হয়ই, চীন, জাপান ও ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কিসেলগার খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

এই তো গেল কিসেলগারের কথা, এখন ডায়াটমের কথা আবার বলি। ডায়াটমের গায়ে নানা রকম কারুকার্য্য থাকায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের সূক্ষ্মতা নির্ণয়ের জন্য ডায়াটম্ ব্যবহার করা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কি উপকারিতা তা আর বোধ হয় বলতে হবে না, ব্যাক্‌টিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুবীক্ষণ যন্ত্রই হচ্ছে মানুষের প্রধান অস্ত্র। কয়েক জাতীয় ডায়াটম্ আছে যাদের গায়ে লম্বা ও সরু দাগ থাকে। এই সব ডায়াটম্‌ই লেন্সের সূক্ষ্মতা দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

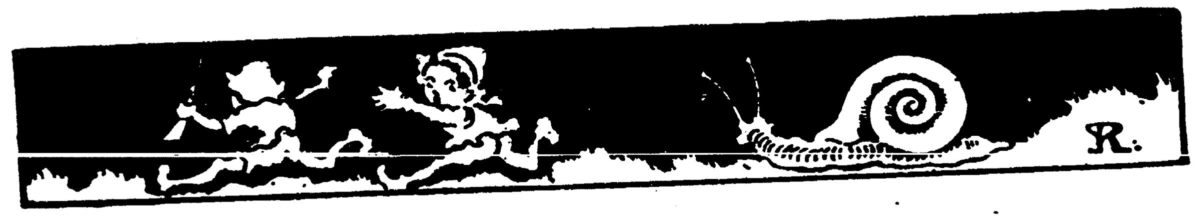

"ভীম ভাসমান মাইন"

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এস্-সি

কয়েক মাস আগে তোমাদের কাছে 'সাব্‌মেরিন্' বা ডুবো-জাহাজের গল্প করেছিলাম, এবং সেই সময়ে কথা প্রসঙ্গে জাহাজ ঘায়েল করার অস্ত্র 'ভীম ভাসমান মাইন'এরও উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু সেবারে ও সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা হয় নি। এজন্য তোমাদের কেউ কেউ কিছু অনুযোগ এবং পত্রাঘাত করেছ। এবারে সে ত্রুটী কিছুটা সংশোধনের চেষ্টা করব।

মাইনের 'ভীম ভাসমান' বিশেষণটা কবি নজরুলের দেওয়া। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় তিনি মাইনকে ঐ ভাবে চিত্রিত করেছেন। বিশেষণটি খুবই অর্থপূর্ণ—যদিও সব মাইনকেই ঠিক 'ভাসমান' বলা চলে না।

সমুদ্রের জলে এই মাইন পাতা হয়—শত্রু-জাহাজ, বিশেষতঃ ডুবো-জাহাজ ঘায়েল করবার জন্য। মাইনের চেহারা সম্বন্ধে তোমাদের একটু-আধটু ধারণা থাকতে পারে। বেশীর ভাগ মাইনই দেখতে অনেকটা বলের মত গোল, তার ভিতরে ভরা থাকে খানিকটা খুব প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ—কম ক'রে অন্ততঃ তিন শ' পাউণ্ড ওজনের। আর থাকে কতকগুলি খুব সূক্ষ্ম কলকব্জা—যার সাহায্যে মাইনকে সময় মত ফাটান যায়। তা ছাড়া মাইন যাতে একেবারে তলিয়ে না যায় সেজন্য তার মধ্যে খানিকটা অবরুদ্ধ বাতাসও ভরে দেওয়া হয়। সমস্ত জিনিষটাও হয় "এয়ারটাইট্"। মাইন পাতবার সময় তার সঙ্গে কোন একটা ভারী জিনিষ বেঁধে সমুদ্রের তলায় নামিয়ে দেওয়া হয়—জাহাজ যে ভাবে নোঙর করা থাকে মাইনও তেমনি ভাবে নোঙর করা হয়, তবে সেটা থাকে—জলের উপরে নয়, কিছু

নীচে। বাঁধবার জন্য শক্ত ইস্পাতের তার বা সময় বিশেষে বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা হয়।

মাইন নানা ধরণের আছে, তবে মোটামুটি তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক—যেগুলো উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আর—যেগুলো একবার নামিয়ে দিলে তার উপর মানুষের আর বিশেষ কোন হাত থাকে না। প্রথমোক্ত-গুলিকে ফাটান হয় বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। জলের নীচে থাকে এই মাইন, আর তার সঙ্গে যোড়া থাকে বৈদ্যুতিক তার, সে তারের অপর দিক্ ডাঙ্গার উপরে—সৈন্যদের ঘাঁটিতে। একজন লোক বসে বসে চারদিক্ লক্ষ্য করে। যখন কোন মিত্রপক্ষের জাহাজ ঐ মাইনের কাছ দিয়ে যায় তখন বোতাম টিপে মাইনে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে রাখা হয়, ফলে সে জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে মাইনের উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। শত্রুপক্ষের কোন জাহাজ কাছে এলে কিন্তু তার রক্ষা নেই, অমনি বোতাম টিপে মাইনের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে দেওয়া হয়—সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে মাইন বিদীর্ণ হয়ে সে জাহাজ চূরমার করে ফেলে।

দ্বিতীয় ধরণের মাইনের কলকব্জার গুণেই তার বিস্ফোরণ হয়। এই মাইনগুলির গা থেকে ছোট ছোট কয়েকটা ধাতুর (সাধারণতঃ সীসের) নল বেরিয়ে থাকে; এগুলির ভিতর আবার থাকে একটা করে এসিডে ভর্ত্তি কাচের নল। কোন ভারী জিনিষের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেই ধাতুর নলগুলি যায় বেঁকে; সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরকার কাচের নল ভেঙ্গে তার এসিডটুকু দিয়ে পড়ে মাইনের ভিতরে। এর ফলে সেখানে একটা বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি হয় এবং তারই সাহায্যে মাইন বিদীর্ণ হয়। এসিডের বদলে কোন কোন মাইনে আবার সহজে জ্বলে ওঠে এ রকম সলতে বসান থাকে। চোট খেলে এই সলতে জ্বলে উঠে ভিতরকার বিস্ফোরক পদার্থকে ফাটিয়ে দেয়। মাইন ফাটাবার আরও নাকি নানা রকম কৌশল আছে, সে সবের বিস্তৃত বিবরণ এখন থাক্।

জাহাজের সঙ্গে মাইনের ধাক্কা লাগা মাত্রই বিস্ফোরণ হয় না—একটু সময় নেয়; ততক্ষণে মাইন একেবারে জাহাজের তলায় চলে যায়, তার ফলে জাহাজ আরও বেশী জখম হয়।

নোঙর-বাঁধা মাইন ছাড়া আরও নানা ধরণের মাইন আছে। যেমন ধর 'ড্রিফ্‌টিং' বা 'ভেসে-বেড়ান' মাইন, 'অসিলেটিং' বা 'দোলায়মান' মাইন ইত্যাদি। ভেসে-বেড়ান মাইনগুলি আকারে ছোট হয় এবং জলের উপরে ভেসে বেড়ায়, কাজেই এগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া কিছু সহজ; গভীর জলে লুকিয়ে থেকে এরা আচমকা আক্রমণ করে না। তা ছাড়া ভেসে বেড়ান'র দরুণ স্রোতের গতি অনুকূল না হ'লে নিজেদের পক্ষের জাহাজকে ব্যতিব্যস্ত করাও এদের পক্ষে অসম্ভব নয়। 'লিওন' মাইন নামে এক রকম মাইন আবিষ্কৃত হয়েছে—এগুলি এমনি কায়দায় তৈরী যে আপনা-আপনিই জলের তলে শুধু ওঠা-নামা করতে পারে—একবার একেবারে তলায় চলে যায়, আবার প্রায় জলের উপর ভেসে ওঠে।

গেল বারে 'য়্যাণ্টেনা' মাইন নামে এক রকম মাইনের কথা বলেছিলাম। এটি মাথা থেকে বার করেছে আমেরিকান্‌রা। এই মাইনগুলির ভিতরে ভরা থাকে প্রায় ৩০০ পাউণ্ড ওজনের টি-এন্-টি বা ঐ রকম কোন প্রচণ্ড বিস্ফোরক, আর এক-একটার গা থেকে লম্বা লম্বা (৩০।৩৫ ফুট) বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে মাকড়সার জাল বা পোকা-মাকড়ের হুলের মত অনেকখানি জায়গা যুড়ে ছড়িয়ে থাকে। কোন জাহাজ অতর্কিতে এই তার ছুঁয়েছে কি রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ গিয়ে মাইনের ভিতরকার ৩০০ পাউণ্ড বিস্ফোরককে ফাটিয়ে এক প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে। সে বিস্ফোরণে জাহাজের দফা সারা।

আর এক রকম মাইনের কথা বলা দরকার। এবারকার যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্ম্মান্‌রা নাকি এই মাইন ব্যবহার ক'রে দস্তুরমত ভাবিয়ে তুলেছিল। আমি 'ম্যাগনেটিক্' মাইন বা 'চুম্বক' মাইনের কথাই বলছি। এই মাইনগুলো সমুদ্রের একেবারে তলায় ফেলে রাখতে হয়—কাজেই সমুদ্র যেখানে খুব গভীর অর্থাৎ উপরের জাহাজ থেকে সমুদ্রতলের দূরত্ব যেখানে খুব বেশী সেখানে এদের রেখে কোন ফল হয় না। এই মাইনগুলো ফাটাবার জন্য কাজে লাগান হয় এদের চুম্বক-শক্তিকে। জাহাজের খোল ধাতুর—বিশেষ ক'রে লোহা দিয়ে তৈরী, এবং লোহার সঙ্গে চুম্বকের কি সম্পর্ক তা বোধ হয় তোমরা জান। যেখানে চুম্বক মাইন রাখা হয়েছে তার কিছু উপর দিয়ে জাহাজ গেলে তার খোল সহজেই

মাইনের চুম্বক-শক্তিকে প্রভাবিত করে। ফলে মাইনের ভিতরকার সূক্ষ্ম যন্ত্র চঞ্চল হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে ভীমবেগে মাইন ফেটে গিয়ে জাহাজকে ঘায়েল করে দেয়। তবে এই মারাত্মক অস্ত্রকে জব্দ করার উপায়ও নাকি ইংরেজরা বার করেছে। জাহাজের খোলে বিদ্যুতের তার জড়িয়ে তারা নাকি এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে ক'রে জাহাজের খোল চুম্বক-প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত থাকবে, চুম্বক-মাইন ফাটবার কোন সুযোগই পাবে না। বাস্তবিক, আধুনিক যুদ্ধ যেন বৈজ্ঞানিকদেরই লড়াই !

মাইন পাতবার নানা রকম কৌশল আছে। জাহাজে বা ডুবো-জাহাজে ক'রে জলে মাইন পাতার রেওয়াজ তো আছেই। এর জন্য সাধারণতঃ বিশেষ ধরণে তৈরী জাহাজ ব্যবহার করা হয়। এরোপ্লেনে ক'রে আকাশ থেকেও অনেক মাইন জলে ফেলে দেওয়া হয়। এ মাইনগুলো অনেকটা হাল্কা ধরণের, আর এরোপ্লেনকেও এজন্য অনেকটা নেমে আসতে হয়। মাইন ফেলবার সময় যাতে সেগুলি চোট না পায় সে জন্য সময় সময় মাইনের সঙ্গে প্যারাসুট বেঁধে দেবারও রেওয়াজ হয়েছে। তার ফলে মাইন ধীরে ধীরে বাতাসে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে গিয়ে ঢোকে। সীপ্লেনে চেপে জলে নেমেও মাইন পাতা হয়। বেশীর ভাগ মাইনই পাতবার পরে কার্য্যক্ষম হ'তে একটু সময় নেয়, সেই সময়ের মধ্যে মাইন-পাতা জাহাজ বা প্লেন নিরাপদ জায়গায় সরে পড়ে। নচেৎ চুম্বক-মাইন প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রগুলি ব্যবহার করা খুব বিপজ্জনকই হ'ত।

মাইন পাতার কথা বল্‌লাম, মাইন সাফ করার কথাও বলি। শত্রুপক্ষের মাইন যাতে স্বপক্ষের জাহাজদের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য এক ধরণের জাহাজের ব্যবস্থা থাকে ; এদের কাজ সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়ান, এবং কোথাও মাইনের সন্ধান পেলে তাকে সরিয়ে বা নষ্ট করে ফেলা। এই সব টহলদারী জাহাজ নানা কৌশলের সাহায্য নেয়। একটার কথা এখানে বলছি। দু'টো জাহাজ পাশাপাশি কিছু তফাতে চলতে থাকে, তাদের মাঝখানে বাঁধা থাকে একটা খুব শক্ত দাঁতওয়ালা তার। এই তার যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমুদ্রের একটা নির্দ্দিষ্ট গভীরতায় ভাসিয়ে রাখা হয়। মাইনগুলো নোঙরের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা থাকে এ কথা আগেই

বলেছি। পূর্ব্বোক্ত দাঁতওয়ালা তার দিয়ে এই মাইনের তারকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং ঐ সময় ঘষাঘষিতে সে তার কেটে গেলে মাইনগুলি ছাড়া পেয়ে জলের উপর ভেসে ওঠে। তখন নিরাপদ দূরে থেকে তাদের গুলি ক'রে ধ্বংস করলেই হ'ল। আরও নানা উপায় আছে, তবে এ কাজ যে কি রকম বিপজ্জনক তা তো বুঝতেই পার। যুদ্ধের সময় মাইন পরিষ্কার করতে গিয়ে কত লোক যে প্রাণ দেয় তার ঠিক নেই।

মাইনের ক্রমাগত উন্নতি হ'লেও যুদ্ধে মাইনের ব্যবহার কিন্তু অনেক দিন থেকে সুরু হয়েছে। ১৮৬১-৬৫ সনে আমেরিকার বিখ্যাত গৃহযুদ্ধেও, মাইন দিয়ে অনেক জাহাজ ঘায়েল করা হয়েছিল। তারও আগে আমেরিকান্ ও রাশিয়ান্‌রা নাকি মাইনের ব্যবহার শিখেছিল তবে তা ততটা কার্য্যকরী হয় নি। তার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ যুদ্ধে, ১৮৭৮ সনে রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে, ১৮৯৮ সনে স্প্যানিশ-আমেরিকান্ যুদ্ধে এবং ১৯০৪-৫এ রুষ-জাপান যুদ্ধেও জাহাজ ঘায়েলের জন্য মাইন ব্যবহার করা হয়েছিল। আর গত বারের আর এবারের মহাযুদ্ধে তো কথাই নেই !

একটা 'চৌরিক' দুর্ঘটনা

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি

শনিবার, বেলা তখন প্রায় তিনটা। দারুণ গরমের মধ্যে সবে মাত্র বাড়ী ফিরেছি, তখনও বাড়ীর ভিতরে ঢুকি নি—সকলে প্রায় সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লেন,—"এই যে আদি এসেছিস্, চল্, চল্, শীগ্‌গির চল্—"

বুঝতে পার্‌লাম না ব্যাপারটা—জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কোথায় যাব ?"

মা বল্‌লেন—"নতুন বাড়ী।"

ব্যাপারটা তখনও পরিষ্কার হ'ল না ঠিক। আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কাল রবিবারে ত

যাওয়া হবে ঠিক ছিল! আজ হঠাৎ?—জিনিষপত্র কিছু যায় নি বল্‌লেই চলে, আমরা আগে থাক্‌তে—?"

শুন্‌লাম, পরদিন মোটেই কোন সময় ভাল নেই, আজকে নাকি এক্ষুণি একটা ভালো সময় আছে। এক্ষুণি যেতে হবে—পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

বুঝলাম এ আমার পিসীমা অর্থাৎ জীবন্ত খনা দেবীর বিধান, কাজেই মান্‌তেই হ'বে।

উঠ্‌লাম এসে নতুন বাড়ীতে, মানে নিজেদের বাড়ীতে। নিজেদের বাড়ী হ'লেও মনটা মোটেই খুসী হ'ল না। একেই ত ঐ ভাড়া বাড়ীটায় এক সঙ্গে প্রায় বিশ বৎসর থেকে ঐ বাড়ীতে থাকাটাই জীবনের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বাড়ীটায় এসে মনটা তাই মুষড়ে গেল কি রকম। তার উপর সারাদিন অফিসে খেটে বাড়ী ফিরে একটু কিছু মুখে পর্য্যন্ত দিতে পারি নি। ক্ষিধের জ্বালায় পেটটা উঠ্‌ছিল মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে—আর এই পেটের মোচড়ানর জন্যই বোধ হয় মনটাও অত বেশী মোচড় খাচ্ছিল; ভাবলাম, কিছু খেলেই বোধ হয় কমে যাবে মনের এই বিমর্ষতা—এ সবই বোধ হয় সাময়িক। কিন্তু সবই ত সাময়িক নয়—একটা যে চিরস্থায়ী প্রমাদ ঘটল আমার অদৃষ্টে! শুনলাম, আমার ঘরের পাশের ঘরটীতে ঠিক হয়েছে পিসীমা থাক্‌বেন। শুনে বসে পড়লাম একেবারে। অনেকেই হয়ত ভাববেন, তাতে কি হয়েছে, পিসীমাই ত?—আরে পিসীমাই ত নয়। পাঁচজনের পিসীমা আর আমার পিসীমা এক নন, আমার পিসীমা, যাকে বলে স্পেশাল পিসীমা। গুরুজন ব্যক্তি হ'ন, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তবে এইটুকু শুধু বলি যে তাঁর ধর্ম্মসাধনার তোড়ে এবং মেজাজের ভয়ে মানুষ ত দূরের কথা, মাছিটি পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ভবিষ্যৎ অবস্থার একটা ভয়াবহ কাল্পনিক দৃশ্য আঁকছিলাম মনে মনে, বাবা হঠাৎ কোথা থেকে এসে অতি ব্যস্ত ভাবে বল্‌লেন—"ওরে, মহামুস্কিল হয়েছে, লাইট্‌গুলোয় ত 'কভার' করা হয় নি—হয় অন্ধকারে থাক্‌তে হবে, না হয় পঞ্চাশ টাকা ফাইন—" কল্‌কাতায় "ব্ল্যাক্ আউট্" সুরু হয়েছে যে!

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লাম—"কয়েকটা আলোর ঢাকনি কিনে নিয়ে এলেই ত হয়।"

বাবা একটু বিরক্ত ভাবেই বল্‌লেন—"তার কি সময় আছে? দেখ্‌ছিস্ না সন্ধ্যা হয়ে এল, ঢাকনি কিনে এনে লাগাতে বহুক্ষণ লাগ্‌বে। ততক্ষণ কি সব অন্ধকারে থাক্‌বে? পারিস্ ত অন্য কোন বন্দোবস্ত কর্ দু' দশ মিনিটের মধ্যে, অন্ততঃ দু' একটা আলো—নিতান্ত যে ক'টা না হলেই নয়—"

বাবাকে আশ্বাস দিলাম—"আচ্ছা, আমি দিচ্ছি ঠিক করে—"

খবরের কাগজ কতকগুলি যোগাড় করে ঠোঙার মত তৈরী করে কোনও রকমে গোটা কতক আলোর চারিদিকে লাগিয়ে দিলাম—সে রাত্রির মত।

বাড়ীতে সকলের মাঝে এতক্ষণ যা গল্প চলছিল তা আমাদের এই নতুন বাড়ীটাকেই কেন্দ্র ক'রে। আলোর ঢাক্‌নি লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে গল্পের মোড় গেল ঘুরে। গল্প জমে উঠ্‌ল; রাস্তায় এবং বাড়ীতে এই আলো বন্ধ হওয়ার ফলে চতুর্দ্দিকে কি রকম চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম চল্‌তে পারে তাই নিয়েই জমে উঠ্‌ল গল্পের আসর। গুজবের দেশ আমাদের—এক একজন একটা যা গুজবের বিবৃতি দিতে সুরু কর্‌লেন তাতে মনে হ'তে লাগ্‌ল যে আমরা বোধ হয় ঠগের দেশে বাস কর্‌ছি। তবুও মন্দ লাগ্‌ছিল না—ভাব্‌লাম, গল্প গল্পই; ক্ষতি ত কিছু হবার ভয় নেই! কিন্তু যা ভাব্‌লাম তা' ত নয়। এই গল্পই যে সর্ব্বনাশ কর্‌ল আমার। পিসীমা একটী মালা হাতে আমাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এক কোণে বসে এক মনে হরিনাম জপ কর্‌ছিলেন, আর এক মন দিয়ে গল্প শুন্‌ছিলেন দারুণ ভাবে।

হঠাৎ মালা জপা বন্ধ রেখে পিসীমা এক রকম প্রায় চীৎকার করেই উঠ্‌লেন—"ওরে আদি, আমার সর্ব্বস্ব যে পড়ে রয়েছে ও বাড়ী! তুই যে ক'রে হোক্ আজই এক্ষুণি সেগুলো আনাবার বন্দোবস্ত কর্। তা নইলে সব চুরি যাবে—সব চুরি যাবে।"

কি সর্ব্বনাশ! এই রাত্রে আবার পিসীমার যথাসর্ব্বস্ব আনবার জন্য ছুট্‌তে হ'বে!

পিসীমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে ও বাড়ীতে আমাদের সব কিছুই ত রয়েছে—বাবার সমস্ত টাকাকড়ি, এমন কি মার, দিদির, বৌদিদির গহনা পর্য্যন্ত—সে সমস্ত ফেলে চোরে পিসীমার যথাসর্ব্বস্ব, মানে একটা ছোট ট্রাঙ্ক (ভগবান্ জানেন তার মধ্যে কি আছে—কারণ আর কেউ কোনও দিন জানবার সুযোগ পায় নি) আর গুটী কতক পুঁটলি, তাই শুধু নিয়ে যাবে না নিশ্চয়। কিন্তু পিসীমা নাছোড়বান্দা!

বল্‌লাম, "ভয় নেই পিসীমা, ও বাড়ীতে আমাদের জোয়ান জোয়ান দু'টো চাকর রয়েছে, রাত্রে খেয়েদেয়ে আমরাও ত কয়েকজন শুতে যাব ও বাড়ী।" পিসীমা অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। একটু গলার স্বর চড়িয়েই বল্‌লেন, "না না, ও সব চাকর-বাকরের কর্ম্ম নয় চোর-ডাকাত ঠেকান; আমার কাছে এনে দে—কোনও ভয় থাক্‌বে না তা হ'লে।"

ভাবলাম, হবেও বা। পিসীমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে এমন সাহস চোর-ডাকাতেরও বোধ হয় নেই। যাই হোক্, ছুট্‌লাম সেই রাত্রে আবার আগেকার বাড়ীতে, নিয়ে এলাম পিসীমার যথাসর্ব্বস্ব।

ঘণ্টাখানেক বাদের কথা। আমি, আমার দুই বোন ও ছোট ভাই দীনু নীচে খেতে বসেছি। পিসীমা একটু আগে অন্ধকারের মাঝেই তাঁর যথাসর্ব্বস্বর তত্ত্বাবধান করে, বারান্দার

দিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে নীচে এসে বসেছেন আমাদের খাওয়ার জায়গা থেকে একটু দূরে। বসে থাক্‌তে থাকতে পিসীমা হঠাৎ যেন চমকে উঠ্‌লেন, কিসের যেন একটা শব্দ শুন্‌তে পেয়েছেন মনে হ'ল, যদিও আমরা কোনই শব্দ শুন্‌তে পেলাম না। পিসীমা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন উপর তলায়। মুহূর্ত্ত মাত্র; তার পরেই হঠাৎ শোনা গেল পিসীমার কণ্ঠের আকুল আর্ত্তনাদ—"চোর, চোর!" আমরা একসঙ্গে সব লাফিয়ে উঠলাম খাওয়া ছেড়ে।

আবার পিসীমার চীৎকার শোনা গেল—"ঐ বারান্দা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়েছে, শীগ্‌গির যা বারান্দার নীচে; ঐ রাস্তার দিকে।"

উপরে না গিয়ে ছুটলাম রাস্তার দিকে। পিসীমা চীৎকার কর্‌ছেন তখন বুক ফাটিয়ে—"ওরে, আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল, কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে বাবা।"

রাস্তায় চারিদিকে অন্ধকার—পাশের মানুষ দেখা যায় না। চোর দেখব কি করে, চোর ধরা ত দূরের কথা! অনেক চেষ্টা করে যাকে ধরলাম আঁকড়ে, সেই আমাকে চোর বলে সাব্যস্ত কর্‌ল এবং কোনও কথা না শুনে আমাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গিয়ে হাজির কর্‌ল থানায়।

থানার লোকেরা আমাকে প্রথমে মোটেই সুনজরে দেখ্‌ল না মনে হ'ল। যে কথা বলি সে কথাই অবিশ্বাস করে। এ রকম দুরবস্থা আমার বহুকাল হয় নি। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার পিসতুত ভাই নেড়ুদা যখন আমাকে বেমক্কা চাঁটা লাগাত, পিসীমার ছেলে ব'লে ভয়ে চুপটী করে যখন শুধু সব সহ্য কর্‌তাম, তখন ঐ রকম দুরবস্থা ঘট্‌ত আমার প্রায়ই। আমি যা বল্‌তাম নেড়ুদা বল্‌ত—"সব মিথ্যে", এমন কি যা না বল্‌তাম তাও বল্‌ত—"মিথ্যে"।

ভাবলাম, থানার এরা বোধ হয় নেড়ুদারই কেউ হ'বে।

জিজ্ঞাসা কর্‌ল ওরা—"ঘরে চোর ঢুকেছিল—কে দেখেছে?" বল্‌লাম, "পিসীমা।"

একজন একটু খিঁচিয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কে পিসীমা?"

ভাবলাম—কে পিসীমা? একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হ'লে দারোগাগিরি ছেড়ে দিতে বাবা! যাক্‌, শুধু বল্‌লাম, "কে পিসীমা আবার? আমার পিসীমা, বাবার সহোদরা।" মেজাজটা আমারও চড়ছিল ক্রমশঃ, ভাবলাম, না হয় জেলেই যাব, এ অপমান আর সহ্য হয় না।

আর একজন জিজ্ঞাসা করল—"কি নিয়েছে জান?"

আমি হঠাৎ বলে বস্‌লাম, 'যথাসর্ব্বস্ব', কারণ তখনও বোধ হয় পিসীমার চীৎকারটা কানে লেগে ছিল।

"আমার কথা শুনে একজন তাড়া দিয়ে বল্‌ল—"যথাসর্ব্বস্ব মানে কি? সোজা করে বলতে পার না? বল, 'যথাসর্ব্বস্ব' মানে কি?"

হঠাৎ যেন আমার জ্ঞান ফিরে এল এবং ফিরে এল বলেই ম'লাম; বলে ফেল্‌লাম,

"যথাসর্ব্বস্ব মানে পিসীমার একটা ট্রাঙ্ক এবং কয়েকটা পোঁটলা।" বলেই মনে হ'ল এ কি কর্‌লাম!

কিন্তু মনে করে আর কি কর্‌ব? ততক্ষণে ইনস্পেক্‌টরের বজ্রহুঙ্কার কানে এল—"ইয়ারকির আর জায়গা পাও নি, ছোকরা? যথাসর্ব্বস্ব মানে পিসীমার একটা ট্রাঙ্ক আর গোটাকতক পোঁটলা? কি ছিল ট্রাঙ্কে? পোঁটলাতেই বা কি ছিল—বল ঠিক করে।"

সর্ব্বনাশ। ট্রাঙ্কে যে কি আছে সে আমি কেন আমার বাবাও জানেন না। এটা শুধু কথার কথা নয়, সত্যিই আমার বাবাও জানেন না। ঠিক কর্‌লাম, এবার ঘাবড়ালে চল্‌বে না। "বেশ দৃঢ়ভাবেই বল্‌লাম, পাঁচ শ' সাত শ' টাকা, কতকগুলি গহনা ছিল ট্রাঙ্কে, আর দামী দামী কাপড় ছিল পোঁটলায়। যত দৃঢ়ভাবেই বলি বিশ্বাস করল না কেউ আমার কথা। বাড়ী বদলান'র সময় থেকে আর চুরির সময় পর্য্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বল্‌লাম খোলাখুলি ভাবে—তাও কেউ বিশ্বাস কর্‌ল না মনে হ'ল।

কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার হাতটা কখন ইনস্পেক্টর ভদ্রলোকের টেবিলের উপর রেখেছিলাম; হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখ পড়ল আমার হাতটার দিকে। তিনি বল্‌লেন, "তোমার হাতে ও কি লেগে?"

সঙ্গে সঙ্গে সবাই অবাক্‌ হয়ে তাকাল আমার হাতের দিকে—ভেবেছিল হয়ত রক্তের দাগ-টাগ কিছু দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু রক্তের দাগের বদলে দেখা গেল হাতে মুগের ডালের দাগ। আমারও তখন হঠাৎ খেয়াল হ'ল—খেতে খেতে উঠে হাত না ধুয়েই চলে এসেছি। ওরা সবাই তখন বিশ্বাস করলে আমার প্রত্যেকটী কথা। তখন ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হয়েই বল্‌লেন, "বড় দুঃখিত, কিছু মনে ক'র না ভাই। চল তুমি, আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি।"

চলে এলাম থানা থেকে। চোর ধরা পড়ুক আর না পড়ুক আমার তখন কিচ্ছু যায় আসে না—আমাকে যে চোর বলে ধরে রাখে নি এই আমার ভাগ্য।

রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ খেয়াল হ'ল পাড়ার অনেকে হয়ত দেখেছে আমাকে চোর ব'লে ধরে নিয়ে যেতে। পরে কি হ'ল তারা হয়ত আর জান্‌বে না। এই ঘটনাটাই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কি রূপ নেবে কে জানে? আমার চরিত্রে হয়ত চিরতরে একটা কলঙ্কের ছাপ থেকে যাবে। কি করা যায়? লোককে ত আর নিজে থেকে গিয়ে বলা যায় না—'ওগো, কাল আমি চুরি করি নি, এই এই ব্যাপার ঘটেছিল।'—তবে? ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লাম ত।···চলেছি, হঠাৎ চোখে পড়ল সামনে এক সংবাদপত্রের অফিস। মাথায় এক মতলব খেলে গেল। এদের কাছে খবরটা দিয়ে যাই না কেন? আর একটু রং দিয়ে বল্‌লেই হবে, থানার দুরবস্থার কথাটাও উল্লেখ করে দেব ঐ সঙ্গে। ওরা আজকালকার দিনে এত বড় একট চুরির ঘটনা (কাগজে

লিখ্‌বে নিশ্চয় 'চৌরিক দুর্ঘটনা') লুফে নেবে, আর লোকেও পড়বে খুব উৎসাহের সঙ্গে,—এ পাড়ার লোকেরা, আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরাও পড়বে নিশ্চয়। তা হ'লেই আদৎ ব্যাপারটা জান্‌বে সবাই, মুখে কা'কেও কিছু বলতেও হবে না. দুর্নামও রটবে না চোর ব'লে। তা ছাড়া খবরের কাগজে আমার এবং আমাদেরই বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে কতখানি লেখা বার হবে—হয়ত এর থেকে একটু বিখ্যাতও হয়ে পড়তে পারি। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত করলাম সে চিন্তাকে। কাগজের লোকেরা বল্‌লে—কালকের কাগজেই বার হবে। খানিকটা দুশ্চিন্তা কাটিয়েই বাড়ী এলাম।

বাড়ী এসে দেখি—ছাই দুশ্চিন্তা কাটিয়ে এলাম। ওর চেয়ে লক্ষ গুণ দুশ্চিন্তা রয়েছে আমার অদৃষ্টে।

বাড়ীর দরজায় দেখি, মহা জটলা বেধেছে পিসীমার চীৎকার শুনে। আমি আস্‌তেই সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌ল—"মশায়, ব্যাপার কি? আপনাদের দরজা ত বন্ধ, কেউই কোন উত্তর দিচ্ছে না যে! ব্যাপারটা কি বলুন ত?"

আমি বল্‌লাম, "ব্যাপার আর কি? চোর ঢুকেছিল বাড়ীতে, বহু জিনিষ চুরি গেছে।"

একজন বেরসিক বল্‌লে, "মশায়, একটু আগে দেখলাম একজন কা'কে ধরে নিয়ে যাচ্ছে থানায় চোর বলে। সে নয় ত?"

চমকে উঠ্‌লাম, চটেও উঠ্‌লাম। একটু খিঁচিয়ে উঠেই বল্‌লাম, না না, সে নয়—সে হ'তে যাবে কেন? বলেই হঠাৎ খেয়াল হ'ল নিজেই ধরা দিচ্ছি যে! চট্‌ করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম—"পুলিশ আসছে, আপনারা এখানে আর বেশী জটলা কর্‌বেন না।"

আর জটলা কর্‌বেন না! ক্রমশঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাড়ীর দরজায় হাট বসে গেল একটা যেন। যাই হোক্, আমি ত ভীড় ঠেলে কোনও রকমে বাড়ীর ভিতরে গেলাম। উপরে উঠে যা শুনলাম তা'তে একেবারে চোখ দুটো আমার কপালে উঠে গেল। শুনলাম—চোরটোর কিচ্ছু আসে নি। পিসীমার ট্রাঙ্ক সুস্থ শরীরে যথাস্থানেই অবস্থান কর্‌ছে, সঙ্গে সঙ্গে পোঁটলাগুলিও। এমন কি পিসীমা তাঁর ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটাও যেমনি বন্ধ করেছিলেন তেমনি বন্ধই আছে।

মাথায় তখন আমার রক্ত উঠে গেছে। চীৎকার করে উঠ্‌লাম, "পিসীমার তবে এ রকম রসিকতা করার মানে?"

শুনলাম—রসিকতা নয়, ভুল। পিসীমার ঘর এবং আমার ঘর—দুটোই পাশাপাশি এবং এক রকমেরই দেখ্‌তে। পিসীমা অন্ধকারে ওঁর নিজের ঘর মনে করে ঢুকেছেন আমার ঘরে। অন্ধকারেব মাঝে হাত দিয়ে যথাস্থানে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দেখ্‌তে পান নি। শুধু তাই নয়, মুখ তুলেই

দেখেছেন যে বারান্দার দরজা খোলা (আমি সেটা খুলেছিলাম এ ঘটনার একটু আগে, বাতাস আসার জন্য)। সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর ধারণা হ'ল চোর এসেছিল, এবং এইমাত্র এসেছিল, কাজেই পালালও ঐ বারান্দা টপ্‌কে। সমস্ত শুনে আমার মুখ থেকে আর কোনও কথা বার হ'ল না।

সমস্ত শরীর তখন আমার অবসন্ন হয়ে আসছে। মনে হ'ল, থানায় কি বিবৃতি দিয়েছি, খবরের কাগজে কাল কি বার হবে! সব মিথ্যে জান্‌লে থানার লোকেরা হয়ত সত্যিই আবার চোর ব'লে ধরবে আমাকে, নিদানে ওদের শুধু শুধু এই রকম ব্যতিব্যস্ত করার জন্য কনষ্টেবল দিয়ে আমার কান মলিয়ে দেবে। মিথ্যা খবর দেওয়ার জন্য খবরের কাগজওয়ালারা আমার নামে ক্ষতিপূরণের দাবী কর্‌বে, কত কে জানে! সব চেয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে আর মুখ দেখাতে পার্‌ব না যে!

শুধু বল্‌লাম—"পুলিশ আস্‌ছে এখনি। তাদের এ সব কথা কেউ ব'ল না। ব'ল সত্যিই চোর এসেছিল এবং ট্রাঙ্ক আর পোঁটলা চুরিও গেছে, আর তা'তে গহনা, কাপড় সব ছিল। আমি আর বস্‌তে পার্‌ছি না।"

পুলিশ এসেছিল, দেখে-শুনেও গিয়েছিল সব।

পর দিন খবরের কাগজেও বার হয়েছিল, ওরা আরও একটু রং চড়িয়েছিল গল্পটাতে।

আমার অবস্থা সেই দিন থেকে সঙ্গীন। শুধু একটা ঘটনাকে অবলম্বন করে রোজ প্রত্যেকের কাছে অজস্র মিথ্যা বল্‌তে হচ্ছে—তবে শুনেছি আত্মরক্ষার্থে সব করা যায়, এই যা সান্ত্বনা।

কলেজ স্কোয়ার রহস্য

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্.এ

কিছুদিন ধরে বিরিঞ্চি রোজ বিকেলে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে যায়। শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—ডিটেক্‌টিভের সহকারীগিরি করার মেহনৎ তো সোজা নয়!—একটু এক্‌সারসাইজ করা দরকার। কিন্তু এক্‌সারসাইজ করা বিরিঞ্চির পোষায় না, ভারী যাচ্ছে-তাই একঘেয়ে লাগে। তাই সে বেড়াবে ঠিক করেছে রোজ বিকেলে।

তা ছাড়া বেড়ানোর আর একটা গুণ, এতে অনেক অভিজ্ঞতা বাড়ে। বিশেষতঃ কলেজ স্কোয়ারে বেড়ালে নিত্যি নতুন এত লোক চোখে পড়ে, ফলে মানুষ চিন্‌বার ক্ষমতা কত বেড়ে যায়! ঘরে বসে হাজার ডন্ কসরৎ কর্‌লেই বা কি? তাতে অভিজ্ঞতা তো আর বাড়্‌বে না! অথচ এ জিনিষটা বাড়া ডিটেক্‌টিভের পক্ষেও যেমন দরকার, তার সহকারীর পক্ষেও কম নয়। আর বিরিঞ্চি হচ্ছে বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ পরশুরাম হালদারের সহকারী। সুতরাং কলেজ স্কোয়ারে যে বিরিঞ্চি বেড়ায় তার উদ্দেশ্য একমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা নয়।

সেদিন বেড়িয়ে ফিরেই বিরিঞ্চি বল্‌ল, "আজ একটা ভারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে স্যর।" অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে পরশুরাম হালদার জিজ্ঞাসা ক'রে উঠ্‌লেন, "তাই নাকি? কি হয়েছে বল তো হে?"

বিরিঞ্চি বল্‌ল, "রোজ যেমন কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে যাই আজও তেমনি গেছি। তিন পাক ঘোরা শেষ ক'রে বিদ্যাসাগর মশায়ের মূর্ত্তির কাছে এসে চার নম্বর পাক সুরু কর্‌ব এমন সময় সেই পাৎলা বুড়োর সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেল।"

"সেই পাৎলা বুড়ো মানে? কোন্ পাৎলা বুড়ো?"

"ওঃ, এর আগে আপনাকে বলি নি বুঝি? যে বুড়োকে আজ প্রায় দিন কুড়ি ধরে রোজ বেড়াতে দেখ্‌ছি কলেজ স্কোয়ারে। লোকটার চোখে সস্তার চশমা—বোধ হয় ফ্রেমটার দাম হবে আনা চারেক—আর গায়ে একটা সস্তা সবুজ রঙের ছিটের ফতুয়া। মাথায় টাক। পায়ে ছেঁড়া চটি। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে স্যর, লোকটা উল্লেখযোগ্য—আমাদের ডিটেক্‌টিভি চোখে ঠেক্‌বেই। রোজই দেখা হ'ত, কিন্তু একদিনও মুখোমুখি হয় নি, আজ হঠাৎ হ'য়ে গেল। মুখোমুখিই বা বলি কেন, ঠোকাঠুকি বল্‌লেও হয়। হতেই লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়েই এমন ভয়ানক চম্‌কে উঠ্‌ল, একেবারে উল্লেখযোগ্য।"

"বল কি হে বিরিঞ্চি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। ওর চম্‌কানি দেখ্‌লে আপনিও চম্‌কে উঠ্‌তেন। মনে হ'ল বুড়ো বিষম ভয় পেয়েছে। ফেরারী খুনী পুলিশের সাম্‌নে পড়লে যেমন ভয় পায়। অল্প কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে লোকটার মুখে ভয়ের ভাব কেটে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল। বল্‌ল— 'মাপ করবেন মশাই, ভুল হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছিলুম। তার চেহারার সঙ্গে আপনার চেহারার অদ্ভুত মিল।' বলে লোকটা বেড়াতে লাগল, আমিও বেড়াতে লাগলুম। বল্‌লুম 'রোজই বেড়াতে আসেন এখানে?' বুড়ো বল্‌ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা যেন একটা ব্যামোতে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজ বিকেলে একবার পার্কে না বেড়ালে বুক ধড়্‌ফড়্ করে, প্রাণ আই-ঢাই ক'রে, রাতে ঘুম হয় না।' বুড়োকে

নিজের মনে বেড়াতে দিয়ে আমি উল্‌টো দিকে চলে যাবার ভান কর্‌লুম, কিন্তু আসলে ওর পিছু নিলুম।"

খুশী হয়ে পরশুরাম হালদার বল্‌লেন, "সাবাস্ বিরিঞ্চি। এমন না হ'লে ডিটেক্‌টিভের সহকারী! অন্য লোক বলে ভুল ক'রে যে ভয়ে আঁৎকে ওঠে তার পিছু নেওয়াই তো উচিত।"

"সে তো ঠিক স্যর। আমায় দেখে অমন ভয়ে আধমরা হয়ে উঠল কেন? নিশ্চয় এর তলায় কোন রহস্য আছে। ভেবে দূর থেকে ওর পিছু নিলুম। উদ্দেশ্য—লোকটার বাড়ী চেনা।"

"উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তো?"

"নিশ্চয় হয়েছে স্যর। আপনার সহকারী নই আমি? আর ওর বাড়ীর ব্যাপারটাই তো আসল উল্লেখযোগ্য। লোকটা থাকে ঘোষ লেনে। সেখান থেকে হেদো খুব সাম্‌নে, কলেজ স্কোয়ার অনেকটা দূর। তবু হেদোয় না গিয়ে বুড়ো রোজ কলেজ স্কোয়ারে বেড়ায় কেন?"

"সত্যিই তো!" পরশুরাম হালদার বলেন। "ব্যাপারটা তো রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে! আচ্ছা, লোকটার চেহারা কি ধরণের বল তো? শয়তানী ধরণের, বোকা ধরণের, অথবা......"

"ওর চেহারাটার বিশেষত্বই এই যে ধরণটা সহজে ধরা যায় না। একবার যদি মনে হয় এ ধরণের, তো আর একবার মনে হয় ও ধরণের।"

"লোকটার নাম, ধাম, পেশা কিছুই জেনে রাখ নি?"

"আজ্ঞে না স্যর।"

"ভালোই করেছ। আস্তে আস্তে সবই জানা যাবে। তাড়াতাড়ি করতে গেলে বুড়ো সন্দেহ করে বস্‌ত, হাতছাড়া হয়ে যেতে পার্‌ত। কিন্তু বাড়ীটা ঠিক চিনে রেখেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। বুড়ো খেঁদী বলে ডাক্‌তেই দরজা খুলে গেল এ-ও দেখে এলুম। আপনি কালকে আমার সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে চলুন স্যর, নিজের চোখে দেখে যা কর্‌বার কর্‌বেন।"

পরদিন পরশুরাম বাবু স্বয়ং বিরিঞ্চির সঙ্গে গেলেন কলেজ স্কোয়ারে। কিন্তু বিরিঞ্চির একটু তফাতে রইলেন, পাছে দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে বুড়ো কোন রকম সন্দেহ করে। কিছুক্ষণ বেড়াতেই দূরে বুড়োকে দেখা গেল।

"ঐ যে বুড়ো আসছে। দেখুন যা বলেছিলুম ঠিক কিনা—উল্লেখযোগ্য কিনা। আমি দূরে সরে থাকি, আপনি যা কর্‌বার করুন।" বলে বিরিঞ্চি আরও দূরে সরে গেল।

পরশুরাম বাবু বুড়োর পিছু নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটা সুরু কর্‌লেন। এক একবার ইচ্ছা

হ’তে লাগল কোন অজুহাতে বুড়োর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়ে এ কথায় ও কথায় বুড়োর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করতে। কিন্তু কালই বিরিঞ্চির সঙ্গে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, আজকেই আবার কিছু কর্‌তে গেলে বুড়োর মনে হঠাৎ খট্‌কা লেগে গিয়ে সব পণ্ড হ’তে পারে এই ভয়ে পরশুরাম বাবু “শুভস্য শীঘ্রম্”এর জায়গায় ভাব্‌তে লাগ্‌লেন “কোন কাজেই অধৈর্য্য হওয়া ভাল নয়”, এবং “সবুরে মেওয়া ফলে”।

কিছুক্ষণ বেড়িয়ে বুড়ো কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরে চল্‌ল। পরশুরাম বাবুও চল্‌লেন তার পিছু নিয়ে। দেখ্‌লেন বিরিঞ্চি ঠিকই দেখেছিল। বুড়ো ঘোষ লেনে একটা বাড়ীর দরজায় এসে খেঁদীকে ডেকে কড়া নাড়্‌তে লাগ্‌ল। এই দেখেই পরশুরাম বাবু কি যেন চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী ফিরে এলেন। রহস্য একটু জটিলই বটে। আজ সারারাত শুয়ে চিন্তা কর্‌তে হবে।

কিন্তু সারা রাত ভেবেও কোন কূল কিনারা পাওয়া গেল না। শুধু রহস্যটা আরও জটিল ব’লে মনে হ’তে লাগ্‌ল।

পরদিন বিকেলে বিশ্রী-রকম বৃষ্টি সুরু হয়ে শেষ হ’তে রাত ন’টা হয়ে গেল। ফলে সেদিন আর বুড়োর খোঁজে কলেজ স্কোয়ারে যাওয়া হ’ল না। তার পরদিনও আবার সেই একই রকম বিশ্রী ব্যাপার। প্রকৃতি দেবী যেন ডিটেক্‌টিভ্‌ পরশুরামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন। হপ্তাখানেক এইভাবে চল্‌ল। তার পর যেদিন আবার বিকেলে আকাশ রইল পরিষ্কার, পরশুরাম হালদার রোদ থাক্‌তেই গিয়ে উপস্থিত হ’লেন কলেজ স্কোয়ারে। ক্রমে সন্ধ্যা হ’ল, সন্ধ্যা গভীর হ’তে গভীরতর হয়ে হ’ল রাত্রি। কিন্তু বুড়োর দেখা নেই তবু। হতাশ হয়ে ফিরে এলেন পরশুরাম হালদার। এই ক’দিন বিকেল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়ে কি সর্ব্বনাশটাই না করেছে! পরদিনও তিনি একই রকম হতাশ হয়ে ফির্‌লেন।

“আমার মনে হয় স্যর, আপনি খেয়াল করেন নি—মানে কোন গভীর বিষয় ভাব্‌তে ভাব্‌তে আন্‌মনা ছিলেন।” বিরিঞ্চি বল্‌ল। “নইলে আকাশ পরিষ্কার দেখেও বুড়ো বেড়াতে বেরোয় নি, এ আমার বিশ্বাস হয় না।”

“হুঁঃ! কি যে বল বিরিঞ্চি!” বল্‌লেন পরশুরাম বাবু। “আচ্ছা, আমি না হয় গভীর চিন্তায় আন্‌মনা থাকি। আজ তুমিই কলেজ স্কোয়ারে যেও। আমার একটা কাজে অন্য জায়গায় যেতে হবে। বুড়োকে পাওয়া চাই।”

রোদ থাক্‌তেই বেরিয়ে পড়ে পরশুরাম বাবু গেলেন ঘোষ লেনের মোড়ে। সেখান থেকে বুড়োকে যে বাড়ীতে কড়া নেড়ে খেঁদীকে ডাক্‌তে দেখেছিলেন সে বাড়ীটা দেখা যায়। দরজার ওপর তিনি কড়া নজর রাখলেন, কেন না বুড়ো বেরোলে এখান দিয়েই

বেরোবে। কিন্তু রাত ন’টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও বুড়োকে বেরোতে তিনি দেখ্‌লেন না। বাড়ী ফিরে শুন্‌লেন বিরিঞ্চি সারা কলেজ স্কোয়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বুড়োকে দেখ্‌তে পায় নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরশুরাম হালদার বল্‌লেন, “পাখী উড়ে পালিয়েছে বিরিঞ্চি। আগেই ওকে পাকড়ানো উচিত ছিল। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ব্যাটা ভয়ানক ঘুঘু লোক। উঃ! চোখে কি ধুলোটাই না দিয়ে গেল!”

“গেলই যে তা এখনও ঠিক করে বলা যায় না স্যর। ওর বাড়ী গিয়ে না খোঁজ কর্‌লে সঠিক বোঝা যাবে কি করে, আছে না পালিয়েছে?”

“তা যে একেবারে মন্দ বলেছ তা-ও নয় বিরিঞ্চি! কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে বুড়ো পালিয়েছে। চশমার ফাঁক দিয়ে ওর চোখ দুটো দেখেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছিলুম ওর ভেতরে পলায়ন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তখনি সাবধান হওয়া উচিত ছিল। উঃ, মস্ত একটা ভুল করেছি।”

বিরিঞ্চি কিন্তু নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পার্‌ল না যে বুড়ো পালিয়েছে। তাই পরদিন সে পরশুরামকে না জানিয়ে রোদ থাক্‌তেই ঠিক পরশুরামেরই মত দাঁড়িয়ে রইল ঘোষ লেনের মোড়ে। সন্ধ্যার একটু আগেই ‘সেই’ বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এল ‘সেই’ পাৎলা বুড়ো। তেম্‌নি সস্তা দামের চশ্‌মা চোখে, গায়ে তেম্‌নি সস্তা সবুজ ছিটের ফতুয়া, পায়ে তেম্‌নি ছেঁড়া চটি। আনন্দে তার মন নেচে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও আর একটু হ’লেই নেচে উঠ্‌ত। তাড়াতাড়ি সে ওধারের ফুটপাথে চলে গেল, পাছে বুড়ো তাকে দেখে চিনে ফেলে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বুড়ো কলেজ স্কোয়ারের দিকে না গিয়ে চল্‌ল ঠিক উল্‌টো দিকে। একটু দূরে থেকে থেকে বিরিঞ্চি তার অনুসরণ কর্‌তে লাগ্‌ল। বুড়ো হেদোয় বেড়াতে ঢুকে পুকুরের রেলিংএর পাশে দাঁড়িয়ে সাঁতারু ক্লাবের মেম্বারদের সাঁতার আর ডাইভিং দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌তেই সাঁতার আর ডাইভিং শেষ হয়ে গেল। বুড়ো একটা বেঞ্চের ওপর চুপচাপ বসে রইল। বোঝা গেল বুড়োর আজ পরিশ্রম করে বেড়াবার ইচ্ছে নেই। চট্‌ করে বিরিঞ্চি বাড়ীর দিকে ছুটে চল্‌ল। বাড়ী পৌঁছে দেখ্‌ল ডিটেক্‌টিভ্‌ পরশুরাম তাঁর ঘরে বসে কি যেন গভীর ভাবে ভাব্‌ছেন।

বিরিঞ্চি বল্‌ল, “বুড়োকে পাওয়া গেছে স্যর, হেদোতে। যাবেন তো শীগ্‌গির চলুন।”

“বল কি হে বিরিঞ্চি! হেদোতে পাওয়া গেছে?” কোথায় কলেজ স্কোয়ার, আর কোথায় হেদো! আশ্চর্য্য! “চল শীগ্‌গির, এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়। হেদো থেকে বুড়ো আবার কোথায় ভেগে যাবে কে জানে!” বলেই বিরিঞ্চিকে নিয়ে পরশুরাম হালদার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে

পড়্‌লেন পকেটে মনিব্যাগ নিয়ে। এবারেও হাতছাড়া হয়ে গেলে আফ্‌শোষের আর সীমা থাক্‌বে না, সুতরাং একটী মুহূর্ত্তও এখন মহামূল্যবান্‌। পরশুরাম হালদার সহকারী বিরিঞ্চিকে নিয়ে ট্যাক্‌সী করে হেদোতে গেলেন।

বুড়ো তখনও সেই বেঞ্চিতে বসে। দু'জনে বুড়োর পাশে গিয়ে বস্‌তেই বিরিঞ্চির দিকে চেয়েই বুড়ো প্রথমটা যেন একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। তার পর বল্‌ল, "আপ্‌নি! এখানে!"

বিরিঞ্চি বল্‌ল, "আজ্ঞে হাঁ।"

বুড়ো প্রশ্ন কর্‌ল, "আর ইনি?"

"শ্রীযুক্ত পরশুরাম হালদার!" বিরিঞ্চি বল্‌ল।

পরশুরাম হালদার কি যেন ভেবে নিয়ে তার পর মৃদুস্বরে অথচ খুব দৃঢ়ভাবে বল্‌লেন, "আপনার কাছে পরিচয় গোপন না-ই বা রাখ্‌লুম। আমি ডিটেক্‌টিভ্‌।"

বুড়ো একটু ভয় পেয়েই বল্‌ল, "কি সর্ব্বনাশ! পুলিশের লোক?"

"কি আশ্চর্য্য!" পরশুরাম হালদার বল্‌লেন। "ডিটেক্‌টিভ্‌ হ'লেই কি আর পুলিশের লোক হয়? শার্লক হোমের নাম শোনেন নি? রবার্ট ব্লেকের নাম শোনেন নি? আমিও সেই রকম ডিটেক্‌টিভ্‌।"

বুড়ো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "পুলিশের লোক নন? জয় হোক্‌ আপনার। আমি পুলিশ আর ভূতকে বড্ড ভয় করি।"

"বাজে কথা থাক্‌।" ডিটেক্‌টিভ হালদার বল্‌লেন। "শুনুন। আমি আর আমার এই সহকারী বিশেষভাবে আপনার ওপর নজর রেখে আসছি। আপনার সম্বন্ধে আমাদের মনে কতকগুলো সমস্যা জেগেছে। আমার প্রশ্নের সোজা জবাব দেবেন কি?"

"আমার সম্বন্ধে সমস্যা? আপনাদের মনে? সে কি?"

"ধাপ্পা দিয়ে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা কর্‌বেন না।" পরশুরাম বল্‌লেন। "কলেজ ছেড়ে অবধি এই লাইনে কাজ করছি, নেহাৎ কাঁচা ছেলে নই।"

বুড়ো প্রশ্ন কর্‌ল, "কি সমস্যা বলুন তো?"

"আপনার বাড়ী থেকে হেদো কলেজ স্কোয়ারের চাইতে ঢের কাছে। তবু আপনি হেদোয় না এসে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে যেতেন কেন?"

"সে দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব মশাই? তবু, কৌতূহলী যখন হয়েইছেন, তখন বলি। কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে যেতুম এক পাওনাদারের ভয়ে। রোজ সে হেদোয় বেড়াতে আস্‌ত বিকেলে। লোকটা আমার নতুন বাড়ীর ঠিকানা জান্‌ত না। বুঝ্‌লেন না ব্যাপারটা?"

"কিন্তু আজ যদি পাওনাদার লোকটার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যায়?"

"সে ভয় আর নেই মশাই। খবরের কাগজে দেখ্‌লুম সে মারা গেছে।"

"বলেন কি? আপনার পাওনাদার এমন বিখ্যাত লোক যার মৃত্যু-সংবাদ খবরের কাগজে বেরিয়েছে?"

"বিখ্যাত আগে ছিল না। কাল লরী চাপা পড়ে মারা গিয়ে একটু বিখ্যাত হয়েছে। মুদী-দোকানের মালিকের শোচনীয় মৃত্যু—পড়েন নি খবরের কাগজে?"

পরশুরাম বাবু না পড়্‌লেও বিরিঞ্চি পড়েছিল। সে বল্‌ল, "ধরণীচরণ দাস তো?"

বুড়ো বল্‌ল, "আজ্ঞে হাঁ, ঠিক ধরেছেন। ওর চেহারা ছিল প্রায় আপনারই মতন। অমন বেয়ারা মুদী এ যুগে জন্মায় নি মশাই। আর কোন মুদীর এ রকম উদ্ভট বেড়ানোর বাতিকের কথা শুনেছেন? যাক্‌, এখন থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানেই বেড়াতে পার্‌ব, বেশ কাছাকাছি। ক'দিন শরীর খারাপের পর আজই প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছি। হেদো সাম্‌নে বলেই না কাহিল শরীর নিয়েও পার্‌লুম! কলেজ স্কোয়ার কি সোজা দূর মশাই?"

এবারের ফুটবল খেলা

শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

এ বছর কল্‌কাতা প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ্‌-প্রতিযোগিতার মরসুম প্রায় শেষ হ'য়ে এল। গেল মাসের খবরে তোমরা শুনেছিলে যে মহামেডান্‌ স্পোর্টিং প্রথম যাচ্ছে—একটা খেলাতেও না হেরে। সুখের বিষয় প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তা'রা তাদের সে-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ গৌরব বজায় রাখা কেবল মাত্র মহামেডান্‌ স্পোর্টিংএর মত দুর্দ্ধর্ষ দলের পক্ষেই সম্ভব। তা'রা এ পর্য্যন্ত (৮ই জুলাই) ২২টি ম্যাচ্‌ খেলেছে। তার মধ্যে ২০টি খেলায়ই জিতেছে এবং

বাকী ২টি খেলাতে ড্র করেছে। ১টি রেঞ্জার্সের সঙ্গে প্রথম বারে এবং অপরটি সম্প্রতি মোহনবাগানের সঙ্গে দ্বিতীয় বারের খেলায়। প্রথম বারের শেষ খেলাটি হয় মোহনবাগানের সঙ্গে মহামেডানের, এবং এটি হয় চ্যারিটি ম্যাচ। এ খেলাটিতে মোহনবাগান বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয়ই দিয়েছিল, অনেক গোল করার সুযোগ পেয়েও নিতান্ত দুর্ভাগ্যের জন্যই তাদের শেষ পর্য্যন্ত এক গোলে হেরে যেতে হয়েছিল। এই দুটি দলের দ্বিতীয় খেলাটিও সম্প্রতি হ'য়ে গেছে। এ খেলাটিও বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। অবশ্য খেলাটি অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হয়। দর্শকদের অনেকেরই মতে মোহনবাগান দল নাকি একটি গোল দিয়েছিল, কিন্তু রেফারি গোলের নির্দ্দেশ দেন নি।

মোহনবাগান এ পর্য্যন্ত ২৩টি ম্যাচ্ খেলেছে। তার মধ্যে ১৪টি খেলায় জিতেছে, ৬টিতে ড্র করেছে এবং ৩টিতে হেরেছে। ৮ই জুলাই দুর্ব্বল স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে তাদের পরাজয় বরণকে কোন রকমেই ক্ষমা করা যায় না। এতে তাদের ২য় স্থানও থাকবে কিনা সন্দেহ। এখন পর্য্যন্ত তাদের পয়েণ্ট্ হ'ল ৩৪। পক্ষান্তরে মহামেডান্ স্পোর্টিং ২২টি খেলেই পেয়েছে ৪২ পয়েণ্ট। কাজেই ঐ ক'টি খেলার জোরেই তারা এবার লীগ্ পাবে; এবং এই নিয়ে তারা পেল ৭ বার লীগ্। মোহনবাগান পেয়েছে মাত্র একবার।

এবারকার রানার্স আপ্ কে হবে তাই নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। ইষ্টবেঙ্গল দল মোহনবাগানের সঙ্গে প্রায় এক তালেই পা ফেলে চলেছে। সম্প্রতি কাষ্টম্‌স্-এর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে ১ গোলে হেরে যাওয়ার ফলে তাদের অবস্থা একটু খারাপ হয়েছিল, কিন্তু মোহনবাগানও সঙ্গে সঙ্গে স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে হেরে সে ভয় ঘুচিয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল মাঝে মাঝে ড্র করে কতকগুলো মূল্যবান্ পয়েণ্ট নষ্ট করেছে, অবশ্য মোহনবাগানও এর থেকে বাদ যায় নি। ইষ্টবেঙ্গল এ পর্য্যন্ত ২২টি ম্যাচ্ খেলেছে। তার মধ্যে ১৪টি খেলায় জিতেছে, ৪টিতে ড্র করেছে এবং ৪টিতে হেরেছে।

লীগের অন্যান্য দলগুলির মধ্যে পুলিশ, এরিয়ান্স, রেঞ্জার্স এবং কাষ্টম্‌স্ মন্দ খেল্‌ছে না। দ্বিতীয় বারে কালীঘাটও কয়েকটা খেলায় বেশ ভালই খেলেছে।

লীগের বিশিষ্ট গোল্‌দাতাগণের মধ্যে প্রথমেই ইষ্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড সোমানার নাম করতে হয়। ইনি ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত সবশুদ্ধ ১৯ খানা গোল দিয়েছেন। তার পর সাবু (মহাঃ স্পোর্টিং) ১৬ খানা এবং ডি. ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান্স) ১৫ খানা।

লীগের পরই শীল্ড খেলা আরম্ভ হওয়ার কথা। এ পর্য্যন্ত বাইরের অনেক দল এতে যোগ দিয়েছে। আজ এই পর্য্যন্তই।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

মুড়োর গুণ

শ্রীমঞ্জিলকুমার সেন

জার্ম্মানীর একটি মস্ত সহর। ষ্টেশনে অনবরত ট্রেন যাতায়াত করছে। লোক নামছে, আসছে, সব সময়েই যেন একটা কিসের ব্যস্ততা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

হুশ্ হুশ্ করে একটা ট্রেন এসে পড়্‌ল। একজন জার্ম্মান্ সেনাপতি ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে একটা কামরায় গিয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর পোষাকের চাক্‌চিক্য, মুখের প্রভুত্বব্যঞ্জক চিহ্ন, আর গম্ভীরী চালের কথাবার্ত্তা শুনে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি শুধু আদেশ করতেই অভ্যস্ত। কামরায় উঠে জার্ম্মান্ সেনাপতি চারধারে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লেন। একটা বেঞ্চিতে একজন ইহুদী ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। পোষাক তাঁর মোটেই ভাল নয়, শরীর শীর্ণ, মাথার চুলগুলিতে পাক ধরেছে। তাঁর দিকে একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে সেনাপতি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিপাত ইহুদীটির দৃষ্টি এড়াল না; তিনি শুধু মৃদু হাসলেন। তাঁর জাতভায়েরা এদের হাতে কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করছে!

ট্রেন ছুটে চলেছে। ক্রমে খাবার সময় হ'ল। জার্ম্মান্ সেনাপতিটীর ভৃত্য

তাঁর জন্য নানা রকম দামী দামী খাবার নিয়ে এল। ইহুদী ভদ্রলোকটি তাঁর টিফিন্ ক্যারিয়ার থেকে বার করলেন শুধু মশ্‌লা মাখান একটা মাছের মুড়ো। জার্ম্মান্ সেনাপতি একবার আড়চোখে সেই খাবারের দিকে চাইলেন। তার পর হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন, "আচ্ছা, আপনারা তো টাকার কুমীর। আপনারা কি খান্ যে সব কাজেই মাথাটা এত খোলে?"

মৃদু হেসে ইহুদী জবাব দিলেন, "আমরা সব জিনিষের মাথা খেয়ে থাকি তাই আমাদের মাথাও খুব পরিষ্কার থাকে আর বুদ্ধিরও অভাব হয় না।" জার্ম্মান্ সেনাপতি এবার বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমি আপনাকে এক 'মার্ক্' দেব, আপনি আমাকে ঐ মুড়োটা দিন্।" ইহুদী বল্‌লেন, "তা কি করে হয়, এই মুড়োটা দিয়ে দিলে যে আমার খাবার কিছুই থাকবে না!" সেনাপতি বল্‌লেন, "আচ্ছা, না হয় দু' মার্কই দেব।" ইহুদী তবুও নারাজ। ক্রমে তিন, চার, পাঁচ, ছয় থেকে মুড়োটার দাম ১২ মার্ক্এ গিয়ে দাঁড়াল। তখন ইহুদী ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "বারো মার্ক্এ আমি দিতে পারি তবে অর্দ্ধেকটা; কারণ সবটুকু দিয়ে দিলে আমাকে উপোস করতে হবে।" জার্ম্মান্ সেনাপতি তাতেই রাজি হ'লেন। ইহুদীটি ১২টি মার্ক্ নিয়ে তাঁকে মুড়ো থেকে অর্দ্ধেকটা দিলেন। জার্ম্মান্ সেনাপতি সেটা খেয়ে দেখ্‌লেন মন্দ নয়।

কিছুক্ষণ পরে জার্ম্মান্ সেনাপতি আবার কথা পাড়লেন, বল্‌লেন, "দেখুন, আপনার এই মুড়োটার দাম বোধ হয় এক মার্ক্‌ও হবে না আর আপনি আমার কাছ থেকে বারোটি মার্ক্ গুণে নিলেন?"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ইহুদী মৃদুহাস্যে বলে উঠ্‌লেন, "দেখুন আমার মুড়োটার গুণ। মুড়ো খাবার আগে আপনার মাথায় এই সামান্য কথাটুকু ঢোকে নি যে এর দাম এক মার্ক্‌ও হ'তে পারে না। কিন্তু খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাথা কেমন খুলতে সুরু করে দিয়েছে!"

সেনাপতি বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন।*

* বিদেশী গল্প থেকে।

বাদল ঝরে

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি.

ভাদরে বাঁদর-ভেজা বাদল ঝরে—
পায়ে-চলা পথ গাঁয়ে কাদায় ভরে।
পাঁদারে ভোঁদর নাচে,
আঁধারে অশথ গাছে
বাদুড়েরা দলে দলে ঝুলিয়া মরে।
বাগানে বাঁদর ভেজে, বাদল ঝরে॥

সুদূরে নদীর তীরে বাদল ঝরে—
দাদুরীর জুড়ি-গানে বধির করে।
চাষীদের বধূ দলে
অধীর চরণে চলে,
পথ-ধারে জোনাকীর দীপ শিহরে।
ডোবায় ডুবিছে ব্যাঙ্, বাদল ঝরে॥

কদম-কেয়ার বনে বাদল ঝরে—
বাতাস সাধিয়া তায় আদর করে।
বাদাড়ে বিপুল নাদে
ঝিঁঝি পোকা গলা সাধে,
পথিকের প্রাণ কাঁদে ঘরের তরে।
বাঁশবনে হাঁস্‌ফাঁস্—বাদল ঝরে॥

ভাসায়ে কাকের বাসা বাদল ঝরে—
ভিজে বেড়ালেরা কেঁদে কোঁদল করে।
মশা-মাছি পাড়ে ডিম,
সুর বাজে রিমি ঝিম্,
চাল-চোঁয়া জল ঝরে রান্না-ঘরে।
গোয়ালের দুধ বাড়ে, বাদল ঝরে॥

দর দর ধারা ধীরে বাদল ঝরে—
ছেলেদের নাকে মুখে সে জল সরে।
চেপে আসে ম্যালেরিয়া
উদরেতে পিলে নিয়া,
শ্মশানে দারুর দর দারুণ চড়ে।
রুধিরের ধারা ধুয়ে বাদল ঝরে॥

"হিরণ্ময় বাবুর 'তুলাল নং ১' পড়লাম। আবার যদি তিনি 'তুলাল নং ২' লিখে বসেন তাই লিখছি, তার আগে যদি তিনি ওদিক্‌কার দেশের খবর (যার সঙ্গে তিনি আমাদের দেশের তুলনা করেছিলেন) নিয়ে কিছু লেখেন তা হ'লে খুব ভাল হয়।..."

শ্রীপূর্ণিমা রায়

"এখানে সেণ্ট কলম্বস কলেজিয়েট স্কুলের বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরলোকগত রামধনু সম্পাদকের লেখা 'দমাদম দামোদর' নাটিকাটি (রামধনু, চৈত্র, ১৩৪৪) খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁদের হাসির নাটক অভিনয়ের সখ আছে তাঁরা এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এইজন্য লিখলাম।..."

শ্রীসরোজকুমার মল্লিক ও
শ্রীবাদল বসু (হাজারীবাগ)

"কিছুদিন আগে রামধনুর একটি প্রবন্ধ পড়ে একজন গ্রাহক বাঙ্গালীর পোষাক সংস্কার নিয়ে আলোচনা (বিতর্ক?) করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে গ্রাহকরা চুপ্‌চাপ্‌ কেন?"

—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

আকাশ গঙ্গা—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। দেবসাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম ৸৹

এই বইখানিতে ১৫টি তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী দেওয়া হয়েছে। শুধু ধর্ম্মতীর্থ নয়, যুগাবতার বীরদের—মহাপুরুষদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল যে সব জায়গা সেগুলিকেও মহাতীর্থ হিসাবে ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্য ভ্রমণ-কাহিনীর বই নেই বল্লেই চলে, এ বইখানি সেই মস্ত অভাব পূর্ণ করবে। লেখকের বর্ণনভঙ্গী যেমন চমৎকার তেমনি অসংখ্য জ্ঞাতব্য তথ্যে বইখানি ভরা। সুন্দর সুন্দর ছবি এবং ঝক্‌ঝকে ছাপা-কাগজ বইখানিকে আরও লোভনীয় করেছে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের বইখানি পড়ে দেখা উচিত।

শিশুরবি—শ্রীবিমল ঘোষ প্রণীত। মধুচক্র, ৯০, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। দাম ।৵৹

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় কেমন ছিলেন জানবার আগ্রহ তোমাদের নিশ্চয়ই হয়। কবির লেখা 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' থেকে তাঁর বাল্যের বিভিন্ন ঘটনাবলী সঙ্কলন ক'রে এই ছোট নাটকটি লেখা হয়েছে। কোন জীবিত কবির জীবনী নিয়ে এমনি ধারা নাটক ইতিপূর্ব্বে আর কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। এদিক্‌ দিয়ে বইখানিকে সাহিত্যে একটি নতুন জিনিষ বলা যেতে পারে। বইখানি আমাদের বেশ ভাল লাগ্‌ল। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের বইখানি পড়ে দেখা উচিত।

রোমাঞ্চকর-কাহিনী—শ্রীনিখিলেশ সেন প্রণীত। দেবসাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম ॥৹

কয়েকটি ছোট ছোট গল্প, অধিকাংশই হাসির। এর কোন কোনটা ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকে বেরিয়েছিল। লিখনভঙ্গী বেশ চিত্তাকর্ষক। ছাপা, বাঁধাই এবং ছবিগুলিও লোভনীয়।

শিকারী শশী—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ প্রণীত। এস্‌.সি. আঢ্য এণ্ড কোং লিঃ, ১২, ওয়েলিংটন্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। দাম ॥৹

গল্পের মত ক'রে লেখা হ'লেও এটি একটি সত্যিকারের বাঙ্গালী বীরের কাহিনী। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য নগণ্য পাড়াগেঁয়ে শশী কেমন ক'রে সত্যিকারের বীর শিকারী হয়ে উঠল তারই গল্প সরল ও সরস ভাবে লেখা। মন-গড়া রোমাঞ্চকর উপন্যাসের যুগে এ রকম একখানি সত্যিকারের রোমাঞ্চকর বই ছেলেরা আদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে।

সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর তোমাদের জানা উচিত। চেষ্টা করে দেখ। না পারলে আগামী সংখ্যায় উত্তর পাবে।)

(১) নীচের লেখাগুলিতে কি কি ভুল আছে?—

(ক) টিশিয়ান্‌ আমেরিকার একজন বড় কবি। এঁর লেখা 'লাষ্ট সাপার' একখানি উপাদেয় বই। (খ) ইটালির লুভ্‌র্‌ বন্দরে স্ফিংক্‌সের মূর্ত্তি একটা দেখবার জিনিষ।

(গ) টেকচাঁদ ঠাকুর বাংলার একজন বিখ্যাত প্রাচীন নাট্যকার। এঁর লেখা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' একখানি বিখ্যাত নাটক।

(২) লিরা, তোড়ী, গ্লাইডার, ছায়াপথ, বিগ্ বেন,—এগুলি বলতে কি বোঝায় ?

ইয়োরোপে যুদ্ধের গতি প্রতি মাসেই নতুন পথে চলেছে। এবারের বড় খবর তোমাদের নিশ্চয়ই অজানা নেই। জার্ম্মেনী হঠাৎ রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসেছে। সোভিয়েট রাশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশ-গুলির অন্যতম, কাজেই জার্ম্মেনীকে এত বড় একটা দেশের বিরুদ্ধে নতুন ক'রে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। জার্ম্মেনীর সঙ্গে রাশিয়ার বিশেষ মিতালী কোন দিনই ছিল না; বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের মুখে এই দুই দেশ যখন হঠাৎ একটা চুক্তিবদ্ধ হয়ে পড়ল তখনও লোকে কম অবাক্ হয় নি। কিন্তু সে চুক্তির মূল্য যে কত ঠুনকো তা এখন বোঝা যাচ্ছে। এই নতুন-করে-ডেকে-আনা ঝঞ্চাট জার্ম্মেনীকে খুবই বিব্রত করবে সন্দেহ নেই।

যাই হোক্, এই দুই দেশের মধ্যে এখন ভীষণ রকম যুদ্ধ চলেছে। প্রায় ২০০০ মাইল জায়গা যুড়ে লড়াই হচ্ছে। লোকক্ষয় যে কত হচ্ছে তার হিসাব দেওয়া যায় না। রাশিয়ার ইউক্রেন অঞ্চল হচ্ছে খুব সমৃদ্ধিশালী, জার্ম্মেনীর নজর অনেক দিন থেকেই সেই দিকে। ফিন্ল্যাণ্ড এবং রুমানিয়াও জার্ম্মেনীকে সাহায্য করছে, ইটালিও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ওদিকে সিরিয়ায় ইংরেজ এবং স্বাধীন ফরাসীবাহিনী খুবই সাফল্য লাভ করেছে। ধরতে গেলে সমস্ত সিরিয়াই তাদের মুঠোর মধ্যে গেছে। এখন সন্ধির কথাবার্ত্তা চলছে।

* * *

কলকাতার ফুটবল লীগের খবর তোমরা অন্য প্রবন্ধে পেয়েছ। তার পরের খবর—মহামেডান স্পোর্টিং এত দিন পরে অপরাজিত থাকবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সম্প্রতি ইষ্ট-বেঙ্গল দল ২য় বারের খেলায় তাদের ৩-২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। এরিয়ান্সএর সঙ্গেও তাদের ২য় ম্যাচে ড্র হয়েছে। অবশ্য এ সব সত্ত্বেও তাদের লীগ্ বিজয়ী হ'তে কোন বাধা হবে না। ইষ্টবেঙ্গল এখন ২য় যাচ্ছে। আই-এফ্-এ শীল্ডের খেলা শীগ্ গিরই সুরু হবে। এবার ৫৭টি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। এত বেশী দল এ পর্য্যন্ত আর কোন দিন আই-এফ্-এ'তে খেলে নি।

প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আর ইহলোকে নেই। তাঁর প্রবর্ত্তিত ব্রতচারী আন্দোলনের কথা কে না জানে? সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ জাতি গড়ে তুলবার পক্ষে এর উপযোগিতা সম্বন্ধে আজ আর কারও মতদ্বৈধ নেই। শুধু বাংলা দেশ নয়, ভারতের সর্ব্বত্র আজ এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। গুরুসদয়ের নাম তারই ভিতর দিয়ে অমর হয়ে থাকবে। গুরু-সদয় বাংলা দেশকে প্রাণ ভরে ভালবাসতেন। তাঁর জীবনের পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, নানা জনহিতকর কাজে—বিশেষ ক'রে স্ত্রীশিক্ষার জন্য তাঁর দরদের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। তাঁর "সরোজনলিনী নারী-শিক্ষামন্দির" এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার জন্য পত্নীপ্রেমিক গুরুসদয় এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে-ছিলেন। বাংলা সাহিত্যকেও তিনি কম ভাল-বাসতেন না। ছোটদের জন্য তাঁর লেখা 'ভজার বাঁশী' বই তোমরা অনেকেই বোধ হয় পড়েছ। ভগবান্ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন এই প্রার্থনা।

* * *

সম্প্রতি আর একটি তরুণ বাঙ্গালী বীরের মৃত্যুসংবাদ তোমাদের দিতে হচ্ছে। এঁর নাম কালীপ্রসাদ চৌধুরী। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ শিকারী ৺কুমুদনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। তোমাদের অনেকের হয়তো মনে আছে কয়েক বছর আগে ৭০ বছরের বৃদ্ধ কুমুদনাথ কি ভাবে শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণ হারান। বীর পিতার পুত্র কালীপ্রসাদও অমনি ভাবে বীরের মতই প্রাণ দিয়েছেন। কলকাতায় তিনি এরোপ্লেন চালনা শিখেছিলেন। তার পর যুদ্ধ বাধতেই তিনি এ যুদ্ধে যোগ দিয়ে লণ্ডনে চলে যান। সম্প্রতি সেখানে এক বিমানযুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) রামমোহন রায় (২) পরমহংস দেব (৩) স্বর্ণকুমারী দেবী (৪) আব্রাহাম লিঙ্কন (৫) টমাস আলভা এডিসন্।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন :—

ভবানী, বাণী, কল্যাণী, গৌ (বাঁকুড়া); লতিকা, বেলা, শঙ্কু, সত্যনারায়ণ লাহিড়ী (ময়মনসিংহ); শান্তি, ভঁদু, লুটু, জেম্‌স প্রভৃতি (গয়া); রণজিৎ, শৈলেন, কৃষ্ণবরণ, রমাপতি প্রভৃতি (বাণীমন্দির—মুড়াগাছা); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা); বিশ্বজিৎ রায় (কালীঘাট); অর্চ্চনা, গায়ত্রী, উমা, শচীন (নীলফামারী); অরবিন্দ, বাণী, পিণ্টু, মঞ্জু প্রভৃতি (রামপুরহাট); সুনীল, সুব্রত, সুপর্ণা ও সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় (কাশী); রণেন্দ্রকুমার, চণ্ডীরাম, হিরণ্ময়, রমেশচন্দ্র পট্টনায়ক সেনগুপ্ত (ভিরিঙ্গী); সুধাংশুরঞ্জন প্রামাণিক (কলিকাতা); জ্ঞানময়, পতু, শম্ভু

(কণ্টাই); দেবব্রত ও জয়ব্রত রায়, মীরা, ঝরণা প্রভৃতি (বন্দিপুর—হুগলী); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমশেদপুর); মনীষা সেন, শঙ্কর, শিবাজী, নীপা প্রভৃতি (গৌহাটী); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); অরুণা সেন (কলিকাতা); মঞ্জিলকুমার সেন (বহরমপুর); মদনলাল, মোহনলাল, গৌরীতোষ, সুধাংশু (গোপালগঞ্জ); রণজিৎকুমার বসু (ধুবড়ী); ডলি বসু (কলিকাতা); চাঁদু, মণ্টু, পাইলটুবিলু, শান্তি চ্যাটার্জ্জী (খড়দহ); অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী); নবেন্দু সেন (বালীগঞ্জ); লক্ষ্মণচন্দ্র সাধুখাঁ (গারুলিয়া): প্রবাসচন্দ্র ও প্রমোদচন্দ্র মুস্তাফী (জামসেদপুর); আশা নন্দী (গৌহাটী)।

যাঁরা আংশিক উত্তর দিয়েছেন :—

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া); কালিদাস পাল (বালুভরা): মণিলাল আগরওয়ালা, বিমলচন্দ্র পোদ্দার (সুজানগর); নন্দ ভট্টাচার্য্য, প্রভাত, ডুলু, বিভূতি প্রভৃতি (পাটনা); ছায়া ও নিমু সেন (মূলঘর); দিদি, ছোড়দি, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (ফরিদপুর); রণেন্দ্রচন্দ্র রায় (হাওড়া); সেবা, মঞ্জু, ছোটকু, লালু প্রভৃতি (করিমগঞ্জ); পূর্ণিমা রায় (বারাকপুর); বীরেন, শৈলেন্দ্র, নিত্যানন্দ, প্রতাপচন্দ্র বসু (কানপুর); উৎপলা সরকার (পুরুলিয়া); নিগমকুমার ও অনাবিল চক্রবর্ত্তী, রমা, সেজকাকীমা প্রভৃতি (গয়া); মায়া দেব (কলিকাতা); রাবেয়া খাতুন (কলিকাতা)।

২টি উত্তরের সঙ্গে কোন নাম দেওয়া নেই।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এক-একটি ভৌগোলিক নাম দিয়ে পূর্ণ করতে হবে :—

(১) ঘরের কোণে —টে ব্যাঙ থাকলে কি —মে —টান সম্ভব?

(২) — বেলা —ণ — দিয়ে গেলে কিন্তু চলবে না!

(৩) আর পারি না, —ক থেকে —ফড়িংটা পর্য্যন্ত জ্বালাচ্ছে!

(৪) এ কি, —উ, ভাজি, ডাল— কিছুই বাদ দাও নি! কিন্তু এখন —, — দিয়ে রাখ"।

(৫) বল কি, সত্যি— —! তবে কন্— দিয়ে ছাদ হবে।

(সব ক'টার উত্তর পাঠাতে হবে।)

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সম্বন্ধে **মৌচাক** বলেন :—
"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"
— অফুরন্ত ছবি—অফুরন্ত হাসি—
দাম আট আনা

শ্রীঅমলেন্দু সেন প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে **All Bengal Teachers' Journal** (শিক্ষা ও সাহিত্য) বলেন :—
"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"
প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা— **দাম ১।।০ মাত্র**

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের লেখা

হিটলারের শত্রু

চমকপ্রদ জীবন্ত উপন্যাস ... ১৲

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

ইউরোপের আলো

ছোটদের উপযোগী প্রথম ইউরোপের ভ্রমণ-কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ৷৷৶০
—বিজ্ঞানের গল্প—

আকাশের গল্প ৸১০
—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

আবিষ্কারের গল্প ৷৷০
—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

জন্মদিনের উপহার ৷৷৴০
—সরস, মজাদার গল্পের বই—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ৷৷৶০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কল্‌কাতার হালচাল ৸৶০

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৷৷০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

হাল্‌কা হাসির খাতা ৷৷০

নতুন কিছু ... ৷৷৶০

পুরাতন

বাঁধান রামধনু

১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট ১।।০
৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট ২।।৶০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

শরীরে খানিকটা মাংসের তাল
থাকলেই আসে না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী
ঘি'এর মত কিছুই নয়।

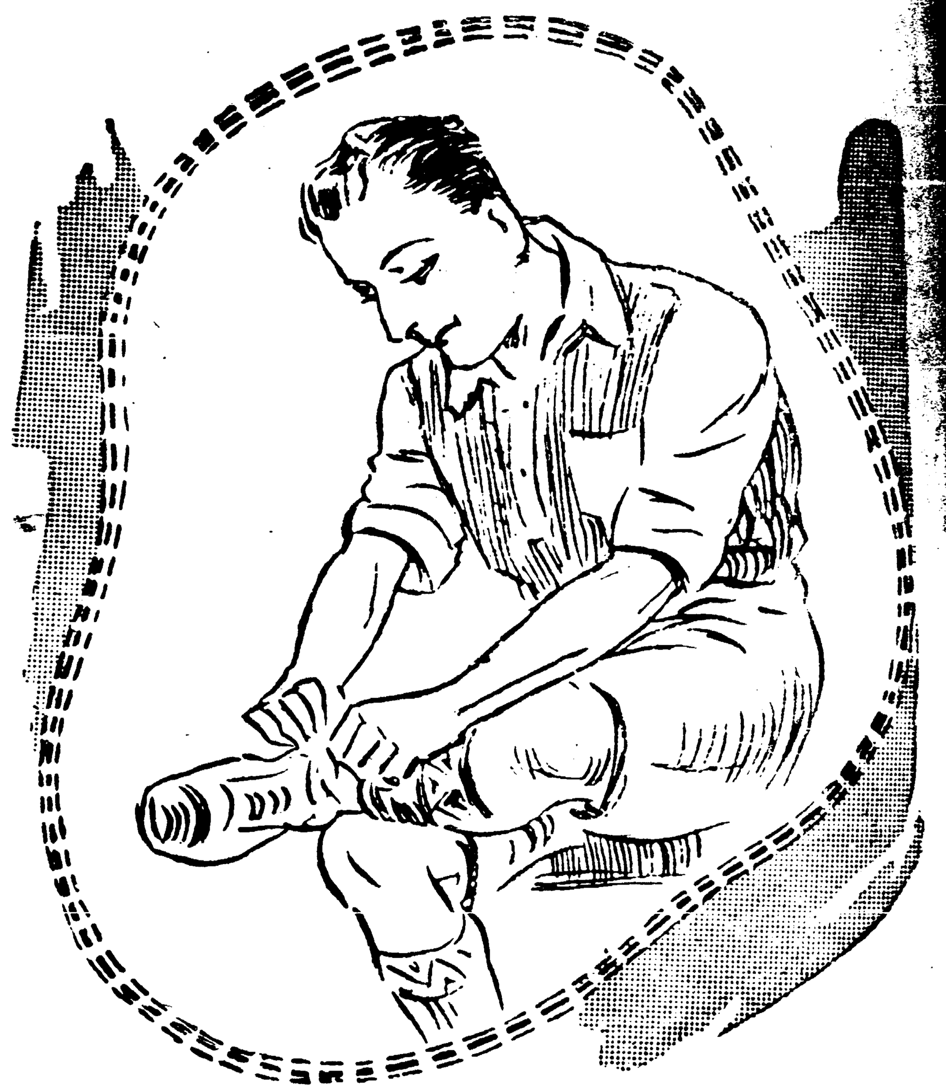

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়

গত ৪০ বছর ধরে লক্ষ্মী ঘি
তার বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতার জন্য
লোকের প্রশংসা পেয়ে আসছে।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন : কলিঃ ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co., 235/1, Bowbazar St., Cal.

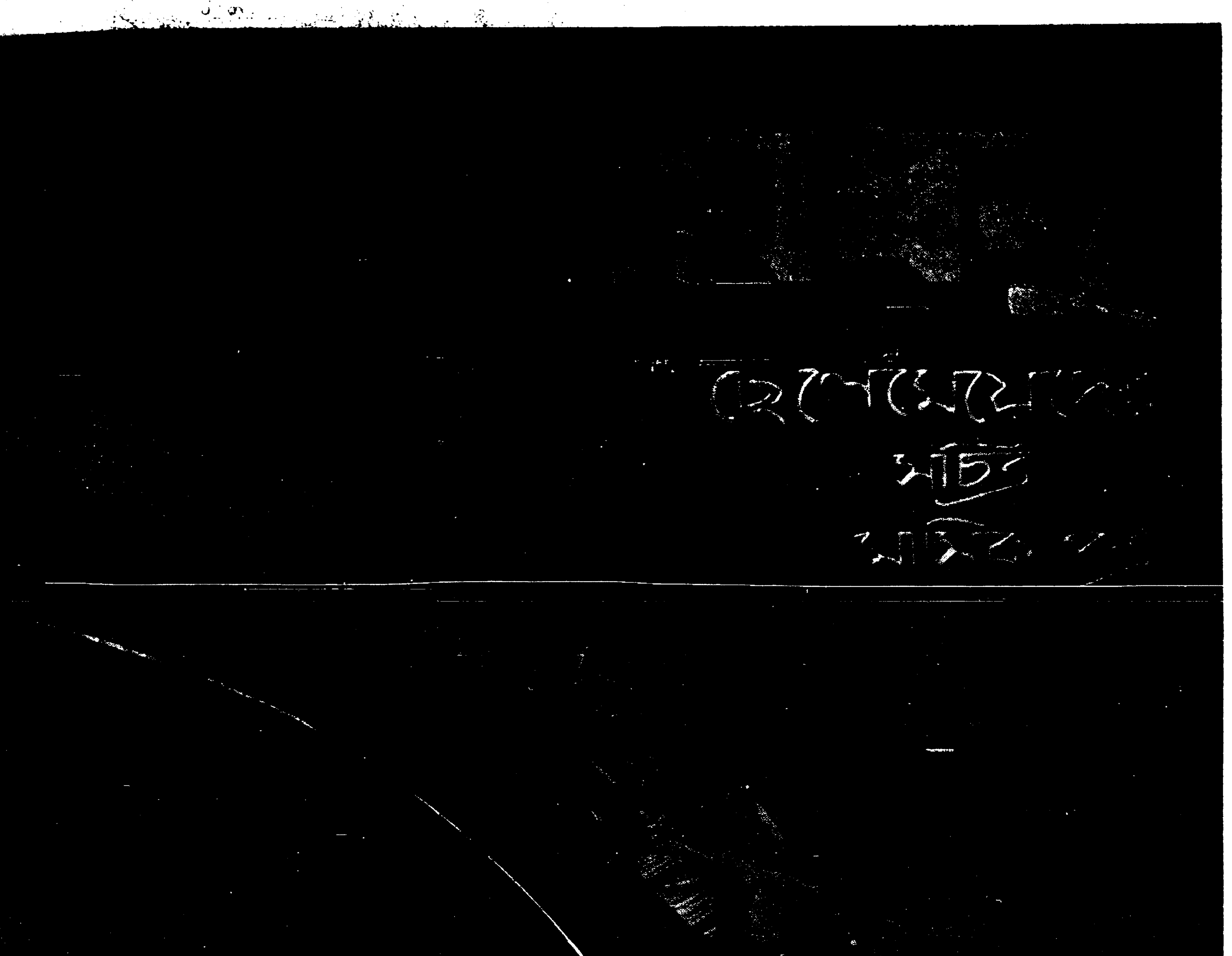

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এস্-সি

বার্ষিক মূল্য ২॥৵ প্রতি সংখ্যা ।০

কার্য্যালয়

১৬, টাউন্সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C—1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

শরীরে খানিকটা মাংসের তাল
থাকলেই আসে না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী
ঘি'এর মত কিছুই নয়।

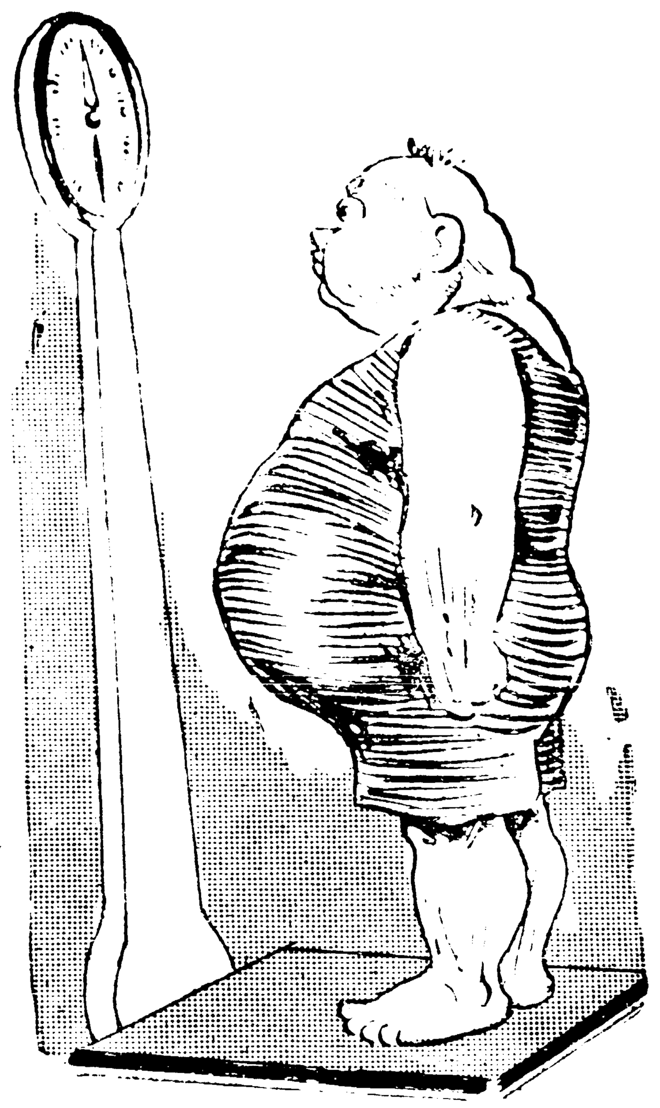

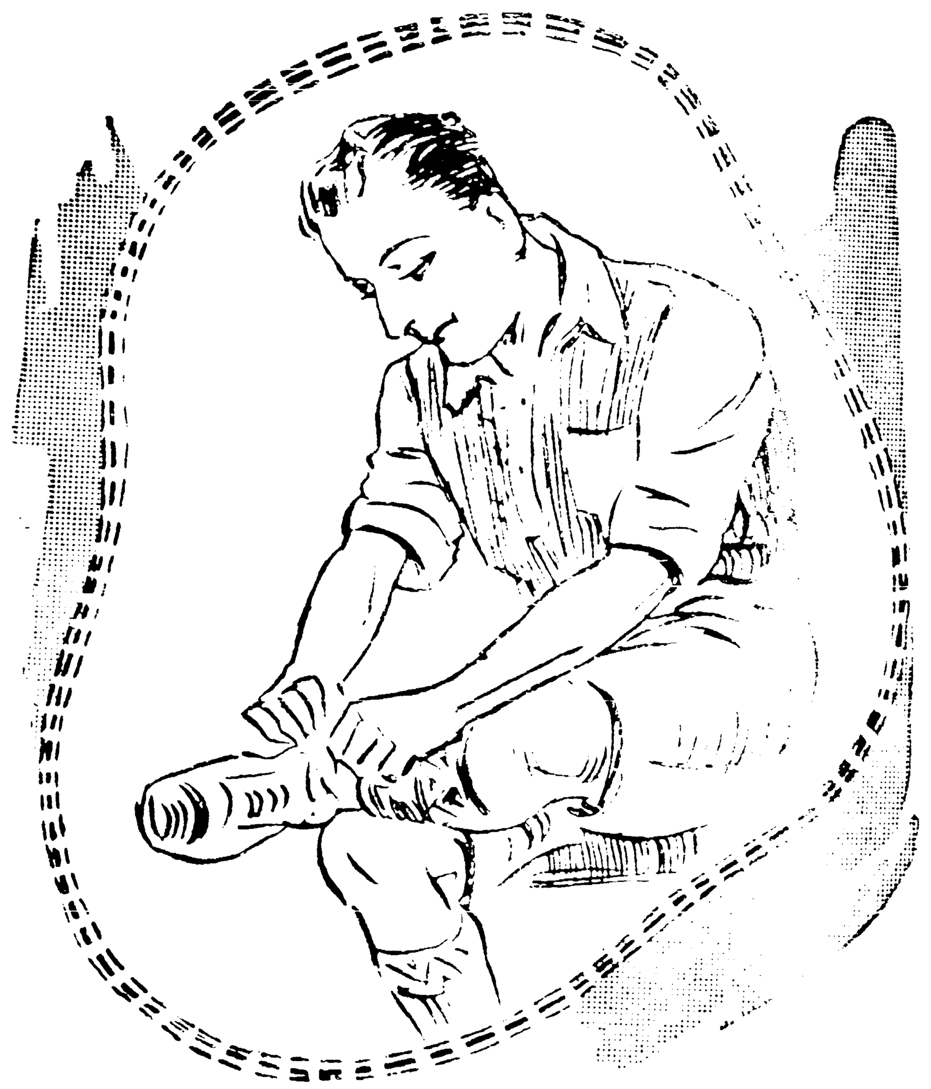

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়

গত ৪০ বছর ধরে লক্ষ্মী ঘি
তার বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতার জন্য
লোকের প্রশংসা পেয়ে আসছে।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover printed by C. H. Aran & Co. 235/1, Bowhazar St., Cal.

১৪শ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৪৮ অষ্টম সংখ্যা

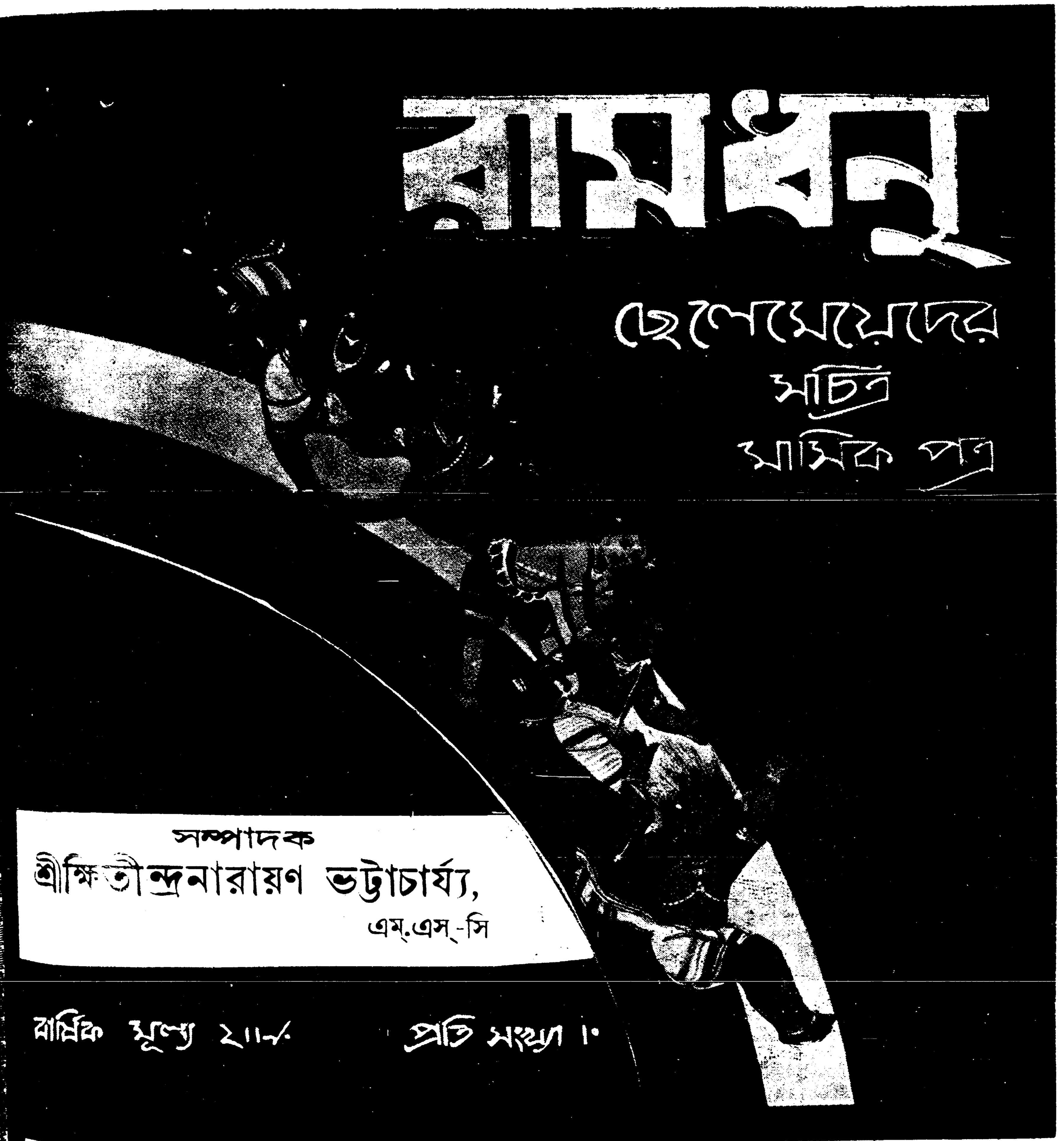

রামধনু

ছেলেমেয়েদের
সচিত্র
মাসিক পত্র

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এস্-সি

বার্ষিক মূল্য ২৷৵ প্রতি সংখ্যা ।০

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরের মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। যাঁহার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

সিপ্রা

জান্তব চর্ব্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

* প্রচুর ফেন
* স্নেহময় স্পর্শ
* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা : : বোম্বাই

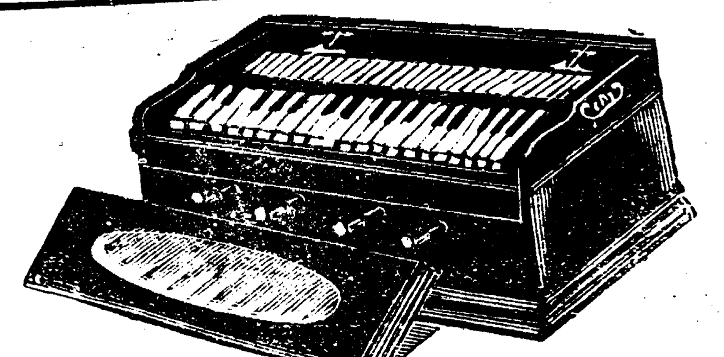

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং-র

হারমোনিয়মই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে

আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং

৬।১১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গল্প-লহরী

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে সতেরো বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া
দুর্ব্বল শিশুরা
অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৮০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৶০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন— (Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—৷৶০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন উপন্যাস

বিষের তীর

সলিলের কাকাবাবুর বর্ম্মায় হীরা, পান্না, চুনীর ব্যবসায় ছিল, ব্যবসার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তা সংগ্রহের ঝোঁক ছিল তাঁর বেশী। একবার তিনি কতকগুলি মূল্যবান্ চুনীর সন্ধান পেয়ে তা সংগ্রহ করতে অসভ্যদের দেশে যাত্রা করেন। পরীক্ষার পর ছুটীতে সলিল তখন কাকার কাছে ছিল। সেও এই অভিযানে অংশ নেয়। তারপর শত বাধা বিপদ ঝড় ঝাপটা ও ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সেই অভিযান শেষ হয়। ইহাই মোটামুটি বইখানির গল্পাংশ। ইহা একখানি সে শ্রেণীর বই, যা পেলে ছেলেমেয়েরা নাওয়া খাওয়া ভুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করবে।
—আনন্দবাজার

দাম মাত্র আট আনা

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ১।০

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
দেড়শো খোকার কাণ্ড ১৲

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ৸০

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর
শিশু-নাটিকা ৷০

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর
আকাশ-গঙ্গা ৸০

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
তাতারের বন্দী ৸০

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের
বোম্বেটে-দ্বীপ ৸০
সোনার পাখী ১৵০

শ্রীযুক্ত গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়ের
মুক্তিপথে (স্ত্রীভূমিকাবর্জ্জিত নাটক) ১৶০

কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ

সংবাদপত্র সমূহের অভিমতের সারাংশ—"...মাত্র আট আনায় যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই হইতে পারে, চোখে না দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতাম না।......

প্রথম গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের **অন্ধকারের বন্ধু**

দ্বিতীয় গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

ছিন্নমস্তার মন্দির

একখানি সেই শ্রেণীর বই যা' পড়বার সময় অবাক-বিস্ময়ে ভাবতে হয়, জগতে কত রহস্যময় দৃশ্যই এখনো যবনিকার অন্তরালে আছে। ছাপা-ছবি—অতুলনীয়!

তৃতীয় গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর

তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক

এই মাত্র প্রকাশিত হইল। আজই একখানা কিনে পড়ে দেখুন।

প্রত্যেক খানি—আট আনা

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

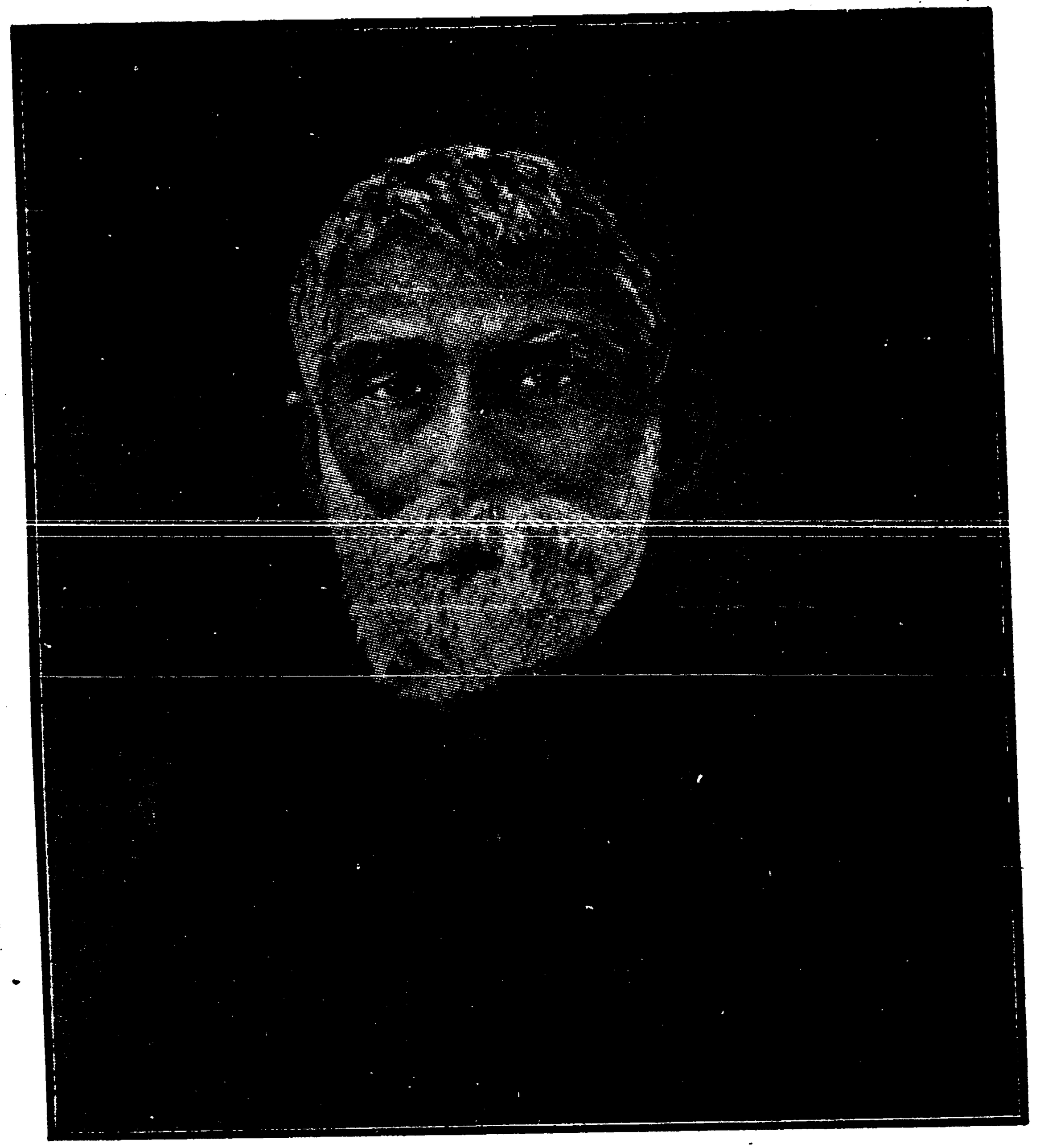

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

"ধন্য সে দেশ জন্মে যেথা
তোমার মত লোক।"

[প্রফুল্ল-জয়ন্তী—পৃঃ ৪২৪ দেখ।]

এ মাসের 'রামধনু' ছাপা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন অকস্মাৎ নিদারুণ খবর এল বাংলার রবীন্দ্রনাথ—ভারতের রবীন্দ্রনাথ—পৃথিবীর যুগসূর্য্য রবীন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নেই। রাখীপূর্ণিমার পুণ্যদিনে তাঁর অমর আত্মা নশ্বর দেহ ছেড়ে অমরলোকে চলে গেছে। মাত্র তিন মাসও হয় নি, তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে বাংলার কিশোর-কিশোরীরা জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তখন কে জান্‌ত কবিকে শ্রদ্ধা জানাবার সেই তাঁদের শেষ সুযোগ গেল, কবির জীবনে আর তা কোন দিন গ্রহণ করার অবসর হবে না!

মানুষ অমর নয়, সবাইকেই একদিন পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়। কিন্তু আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নি, তাঁর রেখে-যাওয়া অক্ষয় মধু-ভাণ্ডারের ভিতর দিয়ে যুগ যুগ ধরে তিনি মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে থাকবেন; মৃত্যুর সাধ্য নেই তাঁকে সেখান থেকে এক তিল সরাতে পারে।

তবু তাঁর সেই সৌম্য, ঋষিতুল্য রূপ আর কখনও চোখে দেখতে পাব না, সেই বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল কণ্ঠের উদাত্ত মধুর বাণী আর কখনও শোনা যাবে না, তাঁর কলমের নিত্যনূতন ঝর্ণাধারা আর কুলু কুলু ক'রে বয়ে যাবে না—এ দিনের কথা ভাবা যায় কি!

বাংলা ভাষাকে যিনি পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে আসন পেতে দিয়ে গেছেন, যাঁর দৌলতে বিদেশে গিয়ে আজ আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারি—আমরা হেয় নই, নিঃস্ব নই, আমরা বাঙ্গালী—রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক—আমাদেরই মাতৃভাষা বাংলা; এবং যা শুনে লোকে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকায়, সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন—এ কথা কি ভাবা যায়!

রামধনুর এ সংখ্যায় কবির সম্বন্ধে কিছু বলবার সময় পাওয়া গেল না। পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে আমরা তাঁর কথা তোমাদের শোনাব। আজ শুধু শেষ বারের মত কবিকে প্রণাম জানিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব—ঈশ্বর, কবির আত্মাকে চিরশান্তি দিন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৮ { ৮ম সংখ্যা

শাঙন পরী

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শাঙন পরী, জলের পরী, মেঘ-পাখনা দুলিয়ে আয়,
রামধনুকের রঙের মায়া, গগন কোণে বুলিয়ে তায়।
আয় রে নিয়ে দূরের স্বপন,
আয় রে ঢেকে চন্দ্র তপন,
কেয়ার বনে খেয়া দিয়ে ছায়ায় ধরা ঘুলিয়ে আয় ;
রামধনুকের সাতটী পরী মেঘ-পাখনা দুলিয়ে আয়।

চাঁদের দেশের মল্লিকা গো, মেঘের মধু মঞ্জরী,
গন্ধব্যাকুল বকুল-বনে এলে কি গান গুঞ্জরি !
দিবস আজি অঝোর ঝরণ,
কাননবীথি কাজল বরণ,
কদম ফুলে চপল চরণ খেলায় মাতে চঞ্চরী,
এসো চাঁদের মল্লিকা গো, মেঘের মধু মঞ্জরী !

আয় ছায়ালি সন্ধ্যা বেলায় এঁকে ফুলের আল্পনা—
যূথী-বনের উতল হাওয়া সুরের স্বপন জাল বোনা।
নিঝুম ঘুমের ঘরের থেকে
সুনীল মায়ায় ভুবন ঢেকে,
আয় গো নেমে মেঘ্‌লা দেশের নতুন কবির কল্পনা।
জাগিয়ে দিয়ে বেলকলিদের—আয় গো স্বপন জল্পনা !

শাঙন পরী—সুরের পরী, আয় গো নেমে অন্তরে,
শুক্‌নো ধরা শ্যামল ক'রে সোনার কাঠির মন্তরে।
উপল ভাঙা ঝর্ণাধারা
দেখে তোমায় আত্ম-হারা,
তোমার পুলক ভূলোক ভরে গহন গিরি প্রান্তরে ;
রামধনুকের সাতটী পরী, আয় নেমে আজ অন্তরে।

অন্ধকারের আতঙ্ক

[শিকার-কাহিনী]

বন্দে আলী মিয়া

শিকার কর্‌তে পারি না পারি—শিকার দেখ্‌বার সখ আমার ছেলেবেলা থেকেই। কেউ বন্দুক নিয়ে শিকার কর্‌তে বেরিয়েছে দেখলেই তার সঙ্গ ধর্‌তুম। বাড়ীর কথা, ইস্কুলের কথা—কিছুই মনে থাক্‌ত না, শিকারীর সঙ্গে সঙ্গে বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। লাভ লোকসানের হিসাব সে বয়সের নয়—রোদে রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোয় কি যে আনন্দ ছিল আজ এই পরিণত বয়সে সেটা বুঝ্‌তে পার্‌ব না।

ছেলে-বয়সের সেই বাতিক এখন অবধি যে ধাওয়া কর্‌বে ভাব্‌তে পারি নি। বিদেশে চাক্‌রী কর্‌তুম—সেবার কি একটা ছুটিতে দেশে গেছি।

শহর থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে পার্শ্বডাঙা গ্রামে একটি নরখাদক ব্যাঘ্র এসে ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করেছে খবর পাওয়া গেল।

বাঘটি অতিশয় বুদ্ধিমান্। এ সম্বন্ধে সেই সংবাদদাতা জানালে, উক্ত গ্রামের আশে পাশের দু'চারজন লোক তার পেটে যেতেই গ্রামবাসীরা অতিমাত্রায় সাবধান হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হবার পূর্ব্বেই গ্রামবাসীরা দরজা বন্ধ করতে আরম্ভ করেছিল এবং গৃহের চারিপাশে বাব্‌লা, মাদার, বেত ইত্যাদি কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। মানুষের মিষ্টি রক্তের স্বাদ যে একবার পেয়েছে অপর জন্তু সে পারতপক্ষে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না। সুতরাং বাঘ বেচারী পড়ল মুশ্‌কিলে। অনাহারেই তার কয়েক দিন কেটে গেল।

সকল লোকের অবস্থা কিছু এক রকম নয়। যারা কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে বাড়ীটাকে ঘিরে রাখতে পার্‌ল তারা বেঁচে গেল। যারা পারলে না তারা দরজায় ভাল করে খিল এঁটে ক্যানেস্ত্রা বাজিয়ে, সারা রাত মশাল জ্বেলে রেখে নিজেদের রক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। বাঘের মাথায় এল দুষ্ট বুদ্ধি। যাদের বাড়ীতে ঢেঁকি

আছে তাদের ঢেঁকিতে গিয়ে সে ধান ভানার মত শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল। গৃহের লোকজনেরা মনে কর্‌লে, প্রতিবেশীরা কেউ হয় তো ধান ভান্‌তে এসেছে। ডেকে সাড়া না পেয়ে তারা ঢেঁকির ঘরের দিকে আস্‌তেই বাঘ লাফিয়ে গিয়ে একজনের টুঁটি কাম্‌ড়ে ধরে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিতে লাগ্‌ল। এমনি ব্যাপার তু'একটা ঘটতেই সকলে সাবধান হয়ে গেল। সুতরাং আশে পাশে তু'দশটা গ্রামে বাঘের আহার মেলা কঠিন হয়ে উঠ্‌ল।

কয়েক দিন আগের ঘটনা। ভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েক জন গাড়োয়ান মাল বোঝাই মোষের গাড়ী নিয়ে শহরের দিকে চলেছিল। পার্শ্বডাঙার পাশে সোণাপাতিলার বিল বহুদূর অবধি গ্রামটিকে বেষ্টন করে আছে। শহরে যেতে হ'লে এই বিলের পাশ দিয়ে যেতে হয়। গাড়োয়ানেরা বিলের পাড়ির ওপরে বটগাছের ছায়ায় গাড়ী নামিয়ে রান্নাবান্না কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌ল এবং রৌদ্রদগ্ধ মোষগুলোকে বিলের জলে স্নান কর্‌বার জন্যে ছেড়ে দিলে।

আহারাদি ক'রে জিরিয়ে নিতে নিতে বেলা পড়ে গেল। একজন গাড়োয়ান জানোয়ারগুলোকে তাড়িয়ে আন্‌তে গিয়ে ফিরে এসে খবর দিলে, একটা মোষ কাদায় আট্‌কে গেছে—কিছুতে উঠ্‌তে পার্‌ছে না।

কথা শুনে সকলেই চল্‌ল মোষটিকে উদ্ধার কর্‌তে। কিন্তু কাছে এসে নিরাশ হয়ে পড়্‌ল। মোষটি যে স্থানে আট্‌কে পড়েছে সে জায়গা ডাঙা থেকে খানিকটা দূরে—জল একেবারেই নেই, শুধু কাদা। আঠালু মাটির কাদা এত ঘন এবং আঠাযুক্ত যে পশুটি নড়্‌তে চড়্‌তে পার্‌ছে না। গাড়োয়ানেরা সেই কাদার মধ্যে নেমে গিয়ে মোষটিকে উদ্ধার করে আন্‌তে সাহস পেলে না। কি জানি, চোরা-কাদার মধ্যে আট্‌কে গিয়ে পশুটির দশাই যদি হয়!

গাড়োয়ানদের মধ্যে তু'তিন জন গ্রামে গিয়ে বাঁশ-দড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে এনে বাঁশের সঙ্গে বাঁশ বেঁধে তু'ধার থেকে মোষটাকে কাদার মধ্যে থেকে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা—সমস্ত কৌশলই শেষ অবধি ব্যর্থ হয়ে গেল। একটুও তাকে উঁচু কর্‌তে পারলে না। এদিকে সূর্য্য বহুক্ষণ ডুবে গিয়েছিল, সন্ধ্যা হ'তে বিশেষ দেরী ছিল না। গাড়োয়ানেরা ভাব্‌লে, আজকে

এ গ্রামে তারা রাত্রি যাপন ক'রে আগামী কাল সকালবেলায় মোষটিকে কাদার মধ্যে থেকে উদ্ধার ক'রে শহরে রওনা হবে।

রাত্রিটা নানা তুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে ওদের কেটে গেল। পরদিন ভোর হ'তে না হ'তে গ্রাম থেকে তু'চার জন গাঁট্টাগোঁট্টা লোককে সঙ্গে নিয়ে গাড়োয়ানেরা বিলের কাছাকাছি এসে হাজির হ'ল। কিন্তু এসে ওরা যা দেখ্‌লে তাতে বিস্ময়ে বাক্‌হীন হয়ে গেল। মোষটা নেই,—রাত্রের মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে অদৃশ্য হয়েছে। কাদার ওপরে বাঘের পায়ের দাগ দেখে ওদের আর সন্দেহ রইল না—মোষটি তারই উদরে প্রবেশ করেছে। অবাক্ হয়ে সকলে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল, তারা পাঁচ সাতজন শক্তিশালী লোক মিলে যে জন্তুটাকে সামান্য মাত্রও নড়াতে পারে নি—একা বাঘ তাকে কাদার মধ্যে থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে গেছে! তা' হ'লে বুঝ্‌তে হবে বাঘের দেহে কত বল!

…কটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে সংবাদদাতা জানাল, পার্শ্বডাঙা গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে একজন বিধবা নারীকে ঘরের ঝাঁপ ভেঙে বাঘে টেনে নিয়ে সাম্‌নেই পাটক্ষেতের মধ্যে আহার করেছে। এই ব্যাপারে গ্রামের সকলেই বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কারণ, ঘরে থেকে মানুষকে নিয়ে যেতে থাক্‌লে কে আর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারে? শীঘ্র এর প্রতিকার না হ'লে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালাবে।

কথাটা ভাল নয়। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট স্থানীয় বিখ্যাত শিকারী বিজয় বাবুকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে রওনা হলেন। আমিও চল্‌লুম সঙ্গে।

বিধবাটির মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল তার থেকে কিছুটা দূরে তুটো মাচান তৈরী করা হ'ল। হাতীগুলাকে গ্রামের জমিদার-বাড়ীতে রেখে, রাত্রের আহারাদি শেষ ক'রে সন্ধ্যার পরেই গিয়ে মাচানে আশ্রয় নেওয়া গেল। একটা মাচানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিজয় বাবু এবং অপর মাচানে পুলিস সুপার ও আমি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগ্‌ল।

অন্ধকারে পাটক্ষেতের দিকে চেয়ে আমরা উৎকণ্ঠিত মনে বন-রাজ ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লুম। অনেকক্ষণ কেটে গেল। বসে থাক্‌তে থাক্‌তে তন্দ্রার মত এসেছিল। হঠাৎ নীচে খস্‌ খস্‌ শব্দ হতেই চেয়ে দেখ্‌লুম, আগুনের মত দুটো উজ্জ্বল চোখ পাটগাছের ওপরে জেগে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুপার আমাকে চুপি চুপি বল্‌লেন : আপনি গুলী করুন—অন্ধকারে আমি লক্ষ্য স্থির রাখ্‌তে পার্‌ছি না।

আমি ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে জবাব দিলুম : এসেছি শিকার দেখ্‌তে, শিকারী সাজ্‌তে হবে এ কথা তো ভাবি নি। আপনারা থাক্‌তে আমি কেন? বলে হাতের বন্দুকটা আর একবার নেড়ে চেড়ে ধর্‌লুম।

হঠাৎ রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করে ও পাশের মাচান থেকে 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' ক'রে দু'টি আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীন প্রান্তরের বুকে ব্যাঘ্রের বিকট গর্জ্জন জেগে উঠ্‌ল। তার পর এমন ভাবে কাৎরাতে লাগ্‌ল যেন মনে হ'ল কোন মানুষকে খুন করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার মাচান থেকে নাম্‌তে যাচ্ছিলেন—আমি তাঁর কোটের আস্তিন চেপে ধরে নিবৃত্ত কর্‌লুম। বল্‌লুম : এ কি কর্‌ছেন! আহত বাঘের মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই।

সেই মুহূর্ত্তে ও-পাশের মাচা থেকে সতর্কবাণী এল : ভোর হবার আগে কেউ নীচে নাম্‌বেন না।

পুলিশ সুপার থেমে থাক্‌বার লোক ন'ন। কিছুক্ষণ আগে তিনি বলেছিলেন, রাত্রে তাঁর লক্ষ্য স্থির থাকে না, সে কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রে সেই ঘন অন্ধকারে শুধু বাঘের গোঙ্‌রানি লক্ষ্য ক'রে তিনি রাইফেলের ঘোড়া টিপ্‌লেন। আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে আগুনের ঝলক দিয়ে বুলেট বেরিয়ে গেল। অব্যর্থ সন্ধান। আহত বাঘটা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

গোঙ্‌রানির শব্দ ক্রমে ক্রমে কমে এসে একেবারে থেমে গেল। অমন বীর—অমন শক্তিশালী জানোয়ার বন্দুকের মাত্র ক'টা বুলেটের মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে।

ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার পাৎলা হয়ে এল—পূব-আকাশে শুকতারা দেখা গেল। আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লুম, পাটক্ষেতের ওপাশে বাঘটা মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে। অনুমানে বুঝ্‌লুম, দেহে প্রাণ নেই।

পরস্পর সাড়া দিয়ে চারজনেই মাচান থাকে নেমে পড়্‌লুম। কাছে এসে দেখ্‌লুম—অত বড় ভয়ঙ্কর বাঘ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

সবুজ কোটের কাহিনী

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্.এ

বৃষ্টিটা একেবারে হঠাৎ এসে পড়্‌ল। খুব কাছে কোন বাড়ী ছিল না যেখানে চট্‌ করে ঢুকে পড়্‌তে পারি। সব চেয়ে কাছে যে বাড়ীটা সে-ও নেহাৎ কম দূর নয়। সেই দিকেই ছুটে চল্‌লুম। আশ্রয়ে যখন ঢুক্‌লুম তখন অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ভিজে গেছি। বাড়ীটি একাধারে হোটেল ও রেস্তরাঁ।

বাড়ীর মালিক—পরে জান্‌লুম এঁর নাম চন্দ্রনাথ বাবু—অতি অমায়িক লোক। বল্‌লেন, "বৃষ্টিটা তো আপনার ওপর ভারী খারাপ ব্যবহার করেছে দেখ্‌ছি। যা জোর নাম্‌ল, থাম্‌তে একটু দেরীই হবে। অতক্ষণ এ ভাবে থাক্‌লে নিউমোনিয়া হয়ে মারা পড়্‌বেন। আপনাকে শুক্‌নো কাপড়-জামা দিচ্ছি।"

বলেই তিনি ভেতর থেকে সদ্য ডাইং এণ্ড্‌ ক্লিনিং কোম্পানী থেকে ধুয়ে-আসা ধুতি, সার্ট আর কোট নিয়ে এলেন আমার জন্য।

বল্‌লেন, "আজই সন্ধ্যাবেলা এসেছে লণ্ড্রী থেকে। কিন্তু মজা হয়েছে কি জানেন? আমার নীল কোটের বদলে ভুল করে এই সবুজ কোটটা দিয়ে দিয়েছে। তা হোক্‌ গে। কাল ফেরৎ দিলেই চল্‌বে। আপনি এ কোট প'রে আজ চলে যাবেন, কাল ধুতি আর সার্টের সঙ্গে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। আর ইতিমধ্যে আপনার এই সব কাপড়-জামাও শুকিয়ে রাখ্‌ব, সেগুলিও ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।"

কথাটা মন্দ লাগ্‌ল না। চন্দ্রনাথ বাবুর কথামতই কাজ কর্‌লুম। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়

পুরু কোটটা প'রে বেশ আরাম হ'ল। কিন্তু সবুজ কোট সৌখীন সমাজে তেমন চল নয় ব'লে মনটা একটু খুঁত খুঁত করতে লাগল। তা ছাড়া, কোটটার বুক পকেটের ঠিক নীচে একটা গোলাকার গর্ত্ত, মনে হ'ল যেন সে জায়গাটা জলন্ত সিগারেট বা চুরুটের সঙ্গে ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছিল কোন দিন। তবু, হ'লই বা একটু খুঁত-ওয়ালা কোট, পাওয়া যে গেছে এই ভাগ্যি।

বৃষ্টি থামতে দেরী হবে দেখে ভাবলুম চন্দ্রনাথ বাবুর রেস্তরাঁয় বসে বসে কিছু খাওয়াই যাক না কেন। নইলে অম্নি কি করে সময় কাটবে? আমার সদিচ্ছা জেনে চন্দ্রনাথ বাবু খুব খুশী হয়েই বল্লেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, বেশ তো। এত সব ভদ্রলোক আমার রেস্তরাঁয় খান, আর আপনি একদিনও খাবেন না সে কি ভালো? আপনি আমায় না চিন্‌লেও আমি যে আপনাকে খুব চিনি মশাই। আপনার নামটা কিন্তু ভুলে যাচ্ছি।"

চন্দ্রনাথ বাবু আমায় চেনেন জেনে অত্যন্ত খুশী হয়ে বল্লুম, "আমার নাম স্নুনীল বোস।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। স্নুনীল বোস।" চন্দ্রনাথ বাবু বল্লেন। "আপনার বাড়ী হচ্ছে গিয়ে ঐ ইয়ে রাস্তায়—নামটা মনে পড়্‌ছে না ছাই।"

বল্লুম, "লেক্ ভিউ রোডে।"

চন্দ্রনাথ বাবু বল্লেন, "ঠিক। লেক্ ভিউ রোডে। অনেক দেখেছি আপনাকে ও রাস্তায়। আস্নুন। রেস্তরাঁয় বস্নুন।"

একধারে বসে পড়ে চা আর ফাউল চপ্ অর্ডার দিলুম। একটু পরেই ওয়াটারপ্রুফ গায়ে এক ভদ্রলোক এসে ঢুক্‌লেন। ওয়াটারপ্রুফ থেকে জল ঝেড়ে ফেলে তিনি বস্‌বার একটা ভালো জায়গা খুঁজতে লাগ্‌লেন। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি যেন খুশী হয়ে উঠ্‌লেন। তার পর এসে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে আমারই মত তিনিও চা আর চপের অর্ডার দিয়ে ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

বল্লেন, "কি অভদ্র বৃষ্টি দেখেছেন? ভাগ্যিস ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে বেরিয়েছিলুম! ঠাণ্ডাও লাগ্‌ছে মন্দ নয়। কি বলেন?"

একটা জবাব দেওয়া উচিত ভদ্রতার খাতিরে। বল্লুম, "তা একটু লাগ্‌ছে।"

এ ভাবে আলাপ স্নুরু করে কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা বলে তার পর ভদ্রলোক বল্লেন, "আমি একটু আধটু কবিতা-টবিতা লিখি। আমার নাম পরশুরাম হালদার।"

বল্লুম, "বেশ ভালো কথা। আমার নাম স্নুনীল বোস।"

"স্নুনীল বোস? বেশ, বেশ। আপনিও কবিতা লেখেন নাকি অরুণ বাবু—মানেই স্নুনীল বাবু?"

"কোন কালেও না।"

"আপনার চেহারায় কিন্তু বেশ একটু কবি কবি ভাব!"

একটু লজ্জিত হয়েই বল্লুম, "কি যে বলেন!"

পরশুরাম বাবু বল্লেন, "ঠিকই বলেছি অরুণ বাবু।"

বল্লুম, "অরুণ বাবু নয়, স্নুনীল বাবু।"

"হ্যাঁ, স্নুনীল বাবু। আমার এক বন্ধুর চেহারা এতটা আপনার মতন যে আপনাকে ডাক্‌তে গিয়ে ভুলে তাকে ডেকে ফেলি। একদিন কিন্তু আপনাকে শুন্‌তে হবে আমার খান কতক কবিতা। আপনার মত কবিতা-রসিক লোককে যদি আমার কবিতা শোনাতে পারি তবে কি আনন্দই যে পাব, তা আর বল্‌বার নয়।"

মনে মনে হাস্‌লুম। লোকটা দেখছি আচ্ছা কবিতা-পাগল! দুনিয়ায় কত রকমের মাথা খারাপ লোক যে থাকে! বেশ একটু মজাই লাগ্‌ল। বল্লুম, "নিশ্চয় শুন্‌ব আপনার কবিতা। না শুনে পারি? তা ছাড়া আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনার কবিতা খুব ভাল হবে।"

পরশুরাম বাবু বল্লেন, "না না, সে কি বলছেন? আমাকে কি কবির মত দেখায়? তা হ'লে আজকেই চলুন না আমার ওখানে। শুভস্য শীঘ্রম্। এই ত আজ বিকেলেই বাড়ী থেকে বেরোবার আগে একটা মস্ত কবিতা শেষ ক'রে এসেছি। যাবেন? ট্যাক্‌সী ক'রে নিয়ে যাব মশাই; আবার ট্যাক্‌সী ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব আপনাকে, কথা দিচ্ছি। পরশুরাম হালদারের কথার নড়চড় হয় না, এ কথা সবাই জানে।"

কবিতা শোনার আগ্রহ আমার কোন দিন ছিল না। কিন্তু এ ভদ্রলোকের কবিতা শুন্‌বার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। লোকটা যেমন অদ্ভুত, খাপছাড়া, তেম্‌নি এঁর কবিতাও অদ্ভুত রকমের হবে নিশ্চয়। আর অদ্ভুত জিনিষের দিকে আমার বরাবরই ঝোঁক্।

বল্লুম, "বেশ, আজই যাব আপনার কবিতা শুন্‌তে।" শুনে পরশুরাম বাবু আশাতীত রকম খুশী হয়ে গেলেন; খুব সম্ভব আমি যে এত তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে যাব তা তিনি ভাব্‌তেই পারেন নি। রেস্তরাঁর বিল্ এলে "আহা হা, করেন কি, করেন কি, আমি দিয়ে দিচ্ছি" বলে আমার বিল্‌ও নিজের বিলের সঙ্গে তিনিই শোধ ক'রে দিলেন। আশ্চর্য্য রকমের অদ্ভুত লোক!

সব জিনিষেরই শেষ আছে। বৃষ্টিরও শেষ হ'ল। পরশুরাম বাবু বল্লেন, "যাবেন এখন?"

বল্লুম, "যাব। তার আগে চন্দ্রনাথ বাবুকে একটা কথা বলে যাই।"

চন্দ্রনাথ বাবুকে বল্লুম কাল ভোরেই আমি এসে তাঁর কাপড়-জামা ফেরৎ দিয়ে আমার

গুলি নিয়ে যাব। তিনি যেন ইতিমধ্যে সেগুলোকে যতটা সম্ভব শুকিয়ে রাখেন। ধন্যবাদও তাঁকে জানালুম। তার বদলে অমায়িক হেসে তিনি জবাব দিলেন, “ছি ছি, ধন্যবাদ আবার কেন? আপনাকে নিউমোনিয়া থেকে বাঁচান—সে তো আমার কর্ত্তব্য। আশা করি এই আপনার প্রথম আর শেষ পদার্পণ হবে না। দয়া রাখ্‌বেন, পায়ের ধূলো দেবেন মাঝে মাঝে। স্ত্রীপুত্র সব হারিয়ে এই হোটেল আর রেস্তরাঁ নিয়েই আছি। এই আমার সব। আপনাদের মত সজ্জন ব্যক্তি এলে মনে বড় আনন্দ পাই।”

“নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আস্‌ব, একবার যখন পরিচয় হ’ল”—বলে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম পরশুরাম বাবুর সঙ্গে।

বল্‌লুম, “কদ্দূর আপনার বাড়ী পরশুরাম বাবু?”

পরশুরাম বাবু বল্‌লেন, “তা যত দূরেই হোক্ বা সামনেই হোক্, আমার কবিতা শোনাতে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, হাঁটিয়ে তো আর নিতে পারি না! ট্যাক্‌সী নিতেই হবে।”

একটু যেতেই ট্যাক্‌সী পাওয়া গেল। দু’জনে উঠে পড়্‌লুম। মিনিট কয়েক বাদে ছোট একটী সুন্দর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। পরশুরাম বাবু গাড়ী থেকে নেমে একবার ট্যাক্‌সীর মিটারের দিকে দেখে নিয়ে দিল-দরিয়া চালে মানি-ব্যাগটী খুলে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন।

তার পর তাঁর সঙ্গে যে ঘরে ঢুক্‌লুম সেটী রীতিমত উল্লেখযোগ্য। এক পাশে একটা দামী খাটে বিছানা পাতা রয়েছে। তারি ওপাশে একটা বড় শেল্‌ফে ঠাসা ইংরাজী ও বাংলা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। এপাশে একটা টেবিলের ওপর এলোমেলো ভাবে ছড়ান নানা রকমের জিনিষ—অনর্থক অতগুলো জিনিষের ফর্দ্দ দেবার চেষ্টা করে কথা বাড়াব না।

“আপনি একটু বসুন। আমি কবিতার খাতা নিয়ে আস্‌ছি।” বলে ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি দরজাটা বাইরে থেকে শেকল বন্ধ করে দিলেন। ব্যাপারটা কেমন একটু গোলমেলে মনে হ’ল। চেঁচিয়ে বল্‌লুম, “এ কি কর্‌ছেন পরশুরাম বাবু?”

কোন জবাব পেলুম না। একটু পরেই শুন্‌তে পেলুম ভদ্রলোক টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা কইছেন:

“অনিমেষ বাবু, লোকটীর খোঁজ পেয়েছি। শুধু খোঁজ পাওয়া নয়, একেবারে বাড়ীতে এনে বন্দী করে রেখেছি।...হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে সব হুবহু মিলে গেছে, নিমাই বাবু যা যা লিখেছিলেন।...কি তা কতকটা অদ্ভুতই বটে। কিন্তু ডিটেক্‌টিভদের এ রকম অনেক অদ্ভুত কাজই কর্‌তে হয়।...কি করে পাক্‌ড়াও কর্‌লুম? সে অনেক কথা। চট্ করে চলে আসুন না। এসেই সব শুন্‌বেন।...না না, পালাবার পথ আমি রাখি নি। ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় শেকল এঁটে দিয়েছি।...তবু, আস্‌বেন তো তাড়াতাড়িই আসুন না। ডিটেক্‌টিভ পরশুরামের কেরামতি দেখে যান। এক্ষুণি

রওনা হচ্ছেন? বেশ বেশ। আচ্ছা।” টেলিফোনের রিসিভার যথাস্থানে রেখে দেবার আওয়াজ পেলুম।

পরশুরাম হালদার লোকটা তা হ’লে ডিটেক্‌টিভ! কিন্তু কেমনতরো ডিটেক্‌টিভ? কে সে নিমাই বাবু যিনি যা যা লিখেছিলেন সমস্তই আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? কি কি তিনি লিখেছিলেন? এ ধরণের নানা প্রশ্ন আমার মনে জাগতে লাগল। উদ্ভট কাহিনী মাসিকে এবং বইয়ে ঢের পড়েছি, কিন্তু নিজেকে যে কোন দিন এ ভাবে এক উদ্ভট ব্যাপারের মধ্যে পড়তে হবে তা স্বপ্নেও কোন দিন ভাবতে পারি নি।

একটু অস্বস্তি যে হচ্ছিল না তা নয় বটে, কিন্তু ভয় পেয়েছিলুম বল্‌লে মিথ্যে কথা বলা হবে। বিষ্ণু ঘোষের ব্যায়ামাগারে রীতিমত ব্যায়াম করে শরীরটাকে যাকে বলে রীতিমতই বাগিয়েছি, আমার হাতের গাঁট্টা খেয়ে কত ব্যাটা জোয়ান ছাতুখোর যে নাকালের একশেষ হয়েছে তার হিসেব নেই। যণ্ডা ডান্‌পিটে নাম কিনেছি অনেক দিন হ’ল, এবং সেটা একেবারে ফাঁকির ওপর নয়। যদি দরকার হয় তো বাছাধনদের বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দেব রামগাঁট্টা কাকে বলে।

সময় কাট্‌তে লাগল যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। পরশুরাম হালদারের আর আসার নামটী নেই। রাগটা আমার ক্রমেই বাড়তে লাগল।

বাড়ীর গেটে মোটরগাড়ী থামার আওয়াজ স্পষ্ট শুন্‌তে পেলুম; তার পরেই শুন্‌লুম মোটা গলায় ডাক—“পরশুরাম কোথায় হে?”

“এই যে। আসুন আসুন অনিমেষ বাবু! আরে, দীনু বাবু আর নীহার বাবুও এসেছেন যে! ভালোই করেছেন। লোক দু’ চারজন বেশীই থাকা ভাল। বলা তো যায় না... বুঝ্‌লেন না?”

“কিন্তু ধর্‌লেন কি করে ভদ্রলোককে বলুন তো?”

“স্রেফ্ দৈবাৎ মশাই।” পরশুরামের কথা। “বৃষ্টি নাম্‌তেই এক রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়লুম। ইনিও সেখানে চা খাচ্ছিলেন। নিমাই বাবুর চিঠির বর্ণনার সঙ্গে সব কিছু এমন মিলে গেল যে ভুল হবার আর যো নেই। বিশেষ করে যখন একটু বাজিয়েই বোঝা গেল ইনি কবিতা-প্রিয়। কিন্তু আপনারা হ’লে ঐ দেখা পর্য্যন্তই। যা কায়দা করে এনে বন্দী করেছি তা জানে শুধু ডিটেক্‌টিভ পরশুরাম হালদার। এই যে এ ঘরে।”

বুঝ্‌লুম সবাই এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। পরশুরাম বাবু ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, “অরুণ বাবু! অরুণ বাবু!” বুঝ্‌লুম এ ডাক আমাকে লক্ষ্য করেই। চুপ করে বসে রইলুম। সাড়া দেবার মত মাথার অবস্থা নয়। শুধু ভাবছিলুম দরজাটা একবার খুলুক, তার পর যা করবার

কর্‌ব। কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে পরশুরাম বাবু চিন্তিত স্বরে বল্‌লেন, "ব্যাপার সুবিধে মনে হচ্ছে না। সাড়া দিচ্ছে না, বোধ হয় ওৎ পেতে আছে। আমরা শেকল খুলে ঘরে ঢুক্‌তে গেলেই প্রচণ্ড আক্রমণ কর্‌বে।"

"কিন্তু উনি তো সে ধরণের পাগল নন পরশুরাম।"

"ডিটেক্‌টিভের ওপর কথা কইবেন না অনিমেষ বাবু। এই লাইনে কাজ করে করে ঝানু হয়ে গেলুম। কোন্ ধরণ যে কখন কি ধরণ হয়ে যায় তা কেউ বল্‌তে পারে না। আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো। কি আপদ্, বিরিঞ্চি আবার এ সময় বাড়ী নেই।"

আর এক ভদ্রলোক—দীনু বা নীহার বাবু—বল্‌লেন, "তিনজনেই যথেষ্ট হবে। আপনি খুলুন দরজা।"

"তবে তৈরী হয়ে দাঁড়ান। খুব সাবধান। এই যে রামখেলনও এসে গেছে। ওরে রামা, তুই এইখানটায় দাঁড়া তো। বহুৎ হুঁশিয়ার। একঠো বাবু ঘরসে নিকালকে আনেসে উন্‌কো পালানে মৎ দেও।"

রামখেলন বল্‌ল, "ক্যা বাবু, ডাকু হ্যায়? ছোরা উরা তো নেহি?"

"তাও বটে।" চিন্তিতভাবে পরশুরাম বলেন। "আমার ড্রয়ার থেকে ছুরি খুলে যে নেয় নি তা-ই বা কি করে বলি! অথচ আমাদের হাতে তো স্রেফ্ কিচ্ছু নেই।"

"তোমার মাথা আর মুণ্ডু।" বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বল্‌লেন অনিমেষ বাবু, আর ঠিক তার পরেই ঝপাং করে শেকলটা পড়ে গেল। দরজা গেল খুলে।

আমায় দেখেই সবাই উঠ্‌লেন চম্‌কে। চম্‌কাবারই কথা। আমার দুটো হাতই ছিল মুঠো করা, আর দু' চোখ দিয়ে ঝর্‌ছিল আগুন।

অনিমেষ বাবু বল্‌লেন, "এ কি করেছ পরশুরাম? এ কাকে পাক্‌ড়াও করেছ। এ তো অরুণ নয়!"

পরশুরাম বাবু যেন এতটুকু হয়ে গেলেন। বল্‌লেন, "বলেন কি অনিমেষ বাবু?"

অনিমেষ বাবু এগিয়ে এসে বল্‌লেন অত্যন্ত লজ্জিতভাবে, "দেখুন, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু পরশুরামেরও খুব দোষ নেই। আপনার চেহারা টেহারা অনেকটা অরুণের মত। আর সব চাইতে বড় জিনিষ হচ্ছে, এ কোটটা অরুণের নিশ্চয়। কারণ ঠিক এই রকমের সবুজ এবং বুকে ছ্যাঁদা-ওয়ালা কোট পৃথিবীতে একটিই আছে। এটাই আপনার এই হাজতবাসের জন্য দায়ী। এ কোট আপনি পেলেন কি ক'রে?"

বোঝা গেল ব্যাপারটা একটা 'কমেডি অব্ এরার্‌স' বা ভুলের প্রহসন মাত্র—এবং এ নিয়ে একটুও রাগ করা আমার পক্ষে মস্ত ভুল হবে। সবুজ কোটের রহস্যটুকু বুঝিয়ে দিতেই

অনিমেষ বাবু আর তাঁর বন্ধু দু'টী এমন হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন যে বেচারা পরশুরাম বাবুও ছলছল চোখ নিয়েই হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

"ব্যাপারটা কি জানেন," অনিমেষ বাবু বল্‌তে লাগলেন, "পুরুলিয়া থেকে নিমাই বাবু জানিয়েছেন তাঁর এক বন্ধুপুত্র, নাম অরুণ সরকার, হাতে স্যুটকেস্ আর মাথায় ছিট নিয়ে উধাও হয়েছে হঠাৎ; চিঠি লিখে রেখে এসেছে সে কল্‌কাতায় চল্‌ল য়্যাড্‌ভেঞ্চার কর্‌তে। কিন্তু অরুণের মত ছিট-ওয়ালা লোককে কল্‌কাতার মত জায়গায় য়্যাড্‌ভেঞ্চার করতে দেওয়া ঠিক নয়। তাই নিমাই বাবু আমায় লিখেছেন অরুণের খোঁজ কর্‌তে। পরশুরাম সখের ডিটেক্‌টিভ জেনে তাকেও লিখেছেন; আর অরুণকে পরশুরাম কখনও দেখে নি বলে চেহারার মোটামুটি বর্ণনাও একটা দিয়েছেন। বিশেষ করে লিখেছেন কোটটার কথা, কারণ ওটা হচ্ছে অরুণকে ধরবার নির্ঘাত উপায়।"

পরশুরাম বাবুর লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে আমার সত্যি বড় মায়া হচ্ছিল। তাঁর পক্ষ সমর্থন করে আমি বল্‌লুম, "কিন্তু পরশুরাম বাবু এই কোটের সাহায্যে আমাকে পাক্‌ড়াও করে সত্যি একটা মস্ত কাজ করেছেন। অরুণ বাবুকে এখন অনায়াসেই ধরা যাবে, ভাগ্যিস্ ডাইং য়্যাণ্ড্ ক্লিনিং কোম্পানী এই কোট-বদলের ভুলটা করেছিল।"

অনিমেষ বাবু বল্‌লেন, "তা যাবে। অরুণ কল্‌কাতা এসে মেসে, হোটেলে, বস্তিতে বা অন্য যেখানেই উঠে থাকুক, কোট ফেরৎ নিতে দোকানে আস্‌বেই। কাজেই তার খোঁজ করা কঠিন হবে না।...আজ রাত্রেই নিমাই বাবুকে একটা টেলি করে দিচ্ছি। সত্যিই বাহাদুরীটা পরশুরামেরই প্রাপ্য।"

পরশুরাম বাবু খুসী হয়ে গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন, "কলেজ ছেড়ে অবধি এই লাইনে কাজ করছি। অভিজ্ঞতা তো আর কম হয় নি!" *

* এ গল্পটী আমার কয়েক বছর আগে প্রকাশিত ইংরাজী গল্প "The Laundry Clerk's Error" এর ভাব নিয়ে লেখা।

[ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী]

আট

ক্ষণেকের মধ্যে ধর্ম্মদেব নিজেকে সামলে নিলে, তার পর হা হা করে হেসে উঠল পরিহাসের অট্টহাসি, বল্‌লে—সকাল বেলার কথা এখনও তুমি ভুলতে পার নি জেতমানা, পরাজয়ের জ্বালা এখনও তোমার বুকে জ্বলছে, না ?

জেতমানার মুখখানি কালো হয়ে গেল, ক্রোধে কুঁচকে উঠল তার চোখ। তলোয়ারের হাতলের উপর হাত রেখে বল্‌লে—তখন যা সম্ভব হয়েছিল এখন আর তা সম্ভব হবে না।

—বেশ, আমি প্রস্তুত, জেতমানা,—ধর্ম্মদেব বল্‌লে,—আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি ? এর চেয়ে বড় সুযোগ হয়তো আর আসবে না।

—তোমার জীবনে যে আর আসবে না, এ কথা সত্য।

—তাই নাকি ? ব্যঙ্গের সুরে ধর্ম্মদেব বলে উঠল।

—হ্যাঁ। কালকের সূর্য্যোদয় দেখার সৌভাগ্য তোমার জীবনে ঘটবে না।

—এ কি সম্রাট্ মিহিরকুলের আদেশ নাকি ?

—হ্যাঁ, সম্রাটেরই আদেশ।

—আর সেই আদেশ পালন করার জন্য কতগুলি লোককে তুমি সঙ্গে করে এনেছ, বল ত' ?

—একজনকেও না।

—বল কী ! তুমি আজ আমাকে অবাক্ করলে জেতমানা। রাত দুপুরে কালো সওয়ারকে ধরতে এসেছ, দু' দশ জন সিপাইশাস্ত্রী সঙ্গে আন নি—তোমার প্রাণের ভয় নেই, য়্যাঁ !

ধর্ম্মদেবের কথার মধ্যে এমন একটা বিদ্রূপের সুর ছিল যা শুনে জেতমানার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল, বলে উঠল,—তোর মত একজন কালো কুত্তাকে ধরার জন্য আমি একাই যথেষ্ট !

—তাই নাকি ! সম্রাট্ মিহিরকুল একটা কালো কুত্তাকে ধরার জন্য পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, তার পর সেনাপতিকে এত রাত্রে পাঠিয়েছেন একটা কুকুর ধরার জন্য ! তোমাদের সম্রাটের কুকুর পোষার সখ তো খুব বেশী বলতে হবে। হাহাহাঃ !

জেতমানা আর সইতে পারল না, কোমর-বন্ধ থেকে তলোয়ার টেনে নিলে। তার পর এক লাফে এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

ধর্ম্মদেবের হাতের কাছে তখন কোনও হাতিয়ার ছিল না, তাড়াতাড়ি বল্‌লে,—তলোয়ারের ভেল্‌কী তো আজ সকালেই অনেক দেখালে, এখন খানিক হাতাহাতিই হোক না কেন, দেখা যাক্ কার গায়ে জোর বেশী !

ধর্ম্মদেবের নিরস্ত্র অবস্থাটা জেতমানার দৃষ্টি এড়ায় নি। তা ছাড়া সে কক্ষের কোথাও এমন কোন অস্ত্র চোখে পড়ে না যা নিয়ে ধর্ম্মদেব অবিলম্বে সশস্ত্র হ'তে পারে। এমন সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। এক ঝটকায় কন্যাকুমারীকে ঠেলে দিয়ে জেতমানা ধর্ম্মদেবকে আক্রমণ করল।

এমন একটা-কিছু যে ঘটতে পারে ধর্ম্মদেব তা আগেই আন্দাজ করেছিল, চকিতে এক লাফে সে ক' পা পিছিয়ে গেল। জেতমানার প্রথম আঘাত ব্যর্থ হ'ল। দ্বিতীয় আঘাত হানার জন্য সে তলোয়ার তুল্‌ল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ধর্ম্মদেব সটান পা পিছলে পড়ে গেল মেঝের উপর, তার পর চকিতে জেতমানার পায়ের মাঝে এক পা বাধিয়ে, আর এক পায়ে প্রচণ্ড বেগে এক লাথি মারল তার হাঁটুতে। নিমেষে জেতমানা ছিট্‌কে পড়ল মেঝের উপর, পাশের দেয়ালে লেগে তলোয়ারখানি মট্ করে ভেঙে গেল। আর সেইক্ষণে ধর্ম্মদেব সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়াল, জেতমানার অবস্থা দেখে অট্টহাসিতে ঘর ফাটিয়ে দিলে।

সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে জেতমানার ক' মুহূর্ত্ত সময় লাগল, ধর্ম্মদেব তখনও হাসছে। হাসতে হাসতেই সে উপহাস করল—কি হূন সর্দ্দার, তলোয়ারের সখ মিটল ?

জেতমানা তখন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে, বাঘের মত সে লাফিয়ে পড়ল ধর্ম্মদেবের উপর। এখন আর তার হাতে তলোয়ার নেই। তার মুখের উপর গোটাকয় মুষ্টি বৃষ্টি করে চকিতে ধর্ম্মদেব এক পাশে সরে গেল। বারেকের জন্য জেতমানার মাথা ঘুরে গেল, তার পর ধর্ম্মদেবের ডান হাতখানি সে চেপে ধরল এক হাতে। এক ঝাঁকানি দিয়ে ধর্ম্মদেবকে কাছে টেনে নিলে, জড়িয়ে ধরল তার গলা। ধর্ম্মদেবের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, গলার পেশীগুলো দপ্ দপ্ করে উঠল। তখনই জেতমানার কোমরের নীচে দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ধর্ম্মদেব তাকে মাটি থেকে খানিকটা উপরে তুলে ফেললে, তার পরেই এক আছাড়।

আছাড়টি তেমন গুরুতর কিছু হয় নি। তখনই এক লাফে জেতমানা উঠে দাঁড়াল

তার পর আবার ধর্ম্মদেবকে আক্রমণ করল। কিন্তু এবার আর অত সহজে ধর্ম্মদেবকে ধরতে পারল না, কতক্ষণ চল্‌ল শুধুই ঘুষোঘুষি। সহসা কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে জেতমানার এক ঘুষি এসে পড়ল ধর্ম্মদেবের নাকের উপর, ধর্ম্মদেবের মাথার স্নায়ুগুলো চিন্‌ চিন্‌ করে উঠল, চোখ ধোঁয়া হয়ে গেল, নাক কেটে রক্ত ঝরতে সুরু করল। তার সেই ক্ষণেকের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে জেতমানা তাকে জাপ্‌টে ধরল, তার পরেই এক কৌশলে তাকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর চেপে বসল। কোমর-বন্ধ থেকে ছোরাখানি টেনে নিলে। ধর্ম্মদেব এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে রুখল। ছোরাখানি আমূল বিঁধে গেল তার বাঁ হাতের তালুতে। ছোরা শুদ্ধ হাতখানি ধর্ম্মদেব টেনে সরিয়ে নিলে। জেতমানার এবার চোখ পড়ল ভাঙা তলোয়ারখানির উপর। তখনই সেখানি কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটু দিয়ে ধর্ম্মদেবের দু'হাত চেপে ধরে গলার উপর নামিয়ে আনল তার তলোয়ার। আর নিমেষ মাত্র। তার পরেই ধর্ম্মদেবের মাথা বিচ্ছিন্ন হবে তার দেহ থেকে…

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরি আমূল বসে গেল জেতমানার পিঠে, একটা বিদ্যুতের শিহরণ বহে গেল জেতমানার সর্ব্বাঙ্গে। ধর্ম্মদেবকে আঘাত হানা আর হ'ল না, নিজেই সে ঘুরে পড়ল মেঝের উপর।

রাজকুমারী মল্লিকা অবসন্ন দেহে পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল, এ ঘরের মাতামাতির শব্দে সহসা তার ঘুম ভেঙে যায়, এসে দেখে ধর্ম্মদেবের বুকের উপর বসে জেতমানা তলোয়ার তুলছে। ক্ষণেকের জন্য সে কি করবে ভেবে পায় না। একটা কোন হাতিয়ারের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে সে ঘরের চারিপাশে তাকায়। তার পরেই তার চোখে পড়ে কন্যাকুমারীর বুকের কাছে সোনায় বাঁধান একখানি ছোরার হাতল চিক্‌চিক্‌ করছে। চকিতে সেটি টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয় জেতমানার পিঠে।

আঘাতটা মারাত্মক হয়েছিল। সাপের মত এঁকে বেঁকে বার কয় ছট্‌ফট্‌ করে জেতমানা স্থির হয়ে গেল।

কন্যাকুমারী এতটা আশঙ্কা করে নি, বলে উঠল—তুমি এ কী করলে!

মল্লিকা তার মুখের পানে তাকাল, বল্‌লে—ঠিক করেছি। ও আমার মাকে পিছন দিক থেকে ছুরি মেরেছিল, আজ আমি তার প্রতিশোধ নিলাম। ওই রক্তে আমি বাপ-মায়ের তর্পণ করব, আমার সব অপমানের দেনা আজ শোধ হ'ল।

হি-হি করে মল্লিকা পাগলের মত হেসে উঠল। ধর্ম্মদেব কিছুক্ষণ বিস্মিত চোখে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল শুধু।

স্তব্ধতা ভেঙে প্রথম কথা কইল কন্যাকুমারী, বল্‌লে—যাক্‌ যা হবার হয়ে গেছে, এখানে চুপ

করে দাঁড়িয়ে থাকার মত অবসর আর নেই। এখন যত শীগ্‌গির আপনারা দু'জনে এ স্থান ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল।

কথাটা সত্য। ধর্ম্মদেব ত্বরিতে পাশের কক্ষ থেকে সশস্ত্র হয়ে এল, বল্‌লে—এসো।

মল্লিকা এগিয়ে এল, কিন্তু কন্যাকুমারীর দিক্‌ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ধর্ম্মদেব বল্‌লে—তুমি?

কন্যাকুমারীর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বল্‌লে—আমি কোথায় যাব? আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে প্রাসাদে। আপনারা যান।

এই বলে আর কোন কথার অপেক্ষা না রেখে যেমন অতর্কিতে সে এসেছিল তেমনি সহসা বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বৃথা কালক্ষেপ না করে ঘোড়াশালা থেকে দুটি ঘোড়া এনে একটির পিঠে মল্লিকাকে উঠিয়ে দিয়ে অপরটিতে সে নিজে উঠে বস্‌ল, তার পর দু'জনে পাশাপাশি বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নীচে নগরীর সীমা শেষ হয়ে যায়। পথের পাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহগুলির বদলে দেখা দেয় বিক্ষিপ্ত গাছের সারি। সেই জনহীন বনপথ দিয়ে যেতে যেতে নিঃসঙ্গ নীরবতা মনের উপর চেপে বসে। মনে হয়, মৃত্যুর সঙ্গে এই রাত্রির অন্ধকারের কোথায় যেন একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। অন্ধকারটাই বুঝি তার স্পষ্টতম প্রকাশ। মৃত্যুর ক্ষণিক স্পর্শে মানুষ যে অন্ধকারে তলিয়ে যায় তার রহস্য আর ভেদ করা যায় না, তাই মানুষ এই অন্ধকারকে এত ভয় করে। তার সঙ্গে মানুষের এতটুকু সম্প্রীতি নেই, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই সে মানুষকে শুধু ভয় দেখায়, দুর্ব্বলতার প্রতীক্ষায় মানুষের চারিপাশে যেন ওৎ পেতে বসে থাকে। সময় অসময়ের বিচার করে না, পাণ্ডিত্যের সম্মান দেয় না, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা দেখে পিছিয়ে যায় না, যে কোন মুহূর্ত্তে তাকে আত্মসাৎ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে শুধু। এই অন্ধকারকে যে যতটুকু ফাঁকী দিতে পারে, তার ততটুকুই লাভ।

রাত্রির চন্দ্রালোকিত অন্ধকার।

ঝিল্লিমুখর পত্র-মর্ম্মরিত স্তব্ধতা।

এলোমেলো বন্ধুর পাহাড়ী পথ।

শত্রুশঙ্কাতুর মন।

সব ছাপিয়ে উঠেছে উপলসঙ্কুল পথে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ—টগ্‌বগ্‌, টগাবগ্‌, টগ্‌বগ্‌।

পাশাপাশি দু'জনে চলেছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। কোথায় চলেছে তা তারা

জানে না, শুধু যেতে হবে—এখান থেকে বহু দূরে—হূনদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তাই তারা চলেছে। মনে সদাই শঙ্কা কখন কোন্ অন্তরাল থেকে হূন সেনা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কখন তাদের তলোয়ার একসঙ্গে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে চাঁদের আলোয়। ধর্ম্মদেব নিজের জন্য তত ভাবে না, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে তার ভয় নেই। কিন্তু মল্লিকার কি হবে, তাই তার চিন্তা।

সহসা পিছনে কার যেন পদশব্দ শোনা যায়। মনে হ'ল, কে যেন পিছনে আসছে। তলোয়ারের হাতলের উপর হাত রেখে ধর্ম্মদেব কিছুক্ষণ পিছন দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কাউকেই ঠাহর করতে পারলে না, গাছের আবছায়ায় সব অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে।

ধর্ম্মদেব ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দেয়, পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটতে থাকে। তথাপি শব্দ কাছে আসে, অনুসরণকারী নিকটবর্ত্তী হচ্ছে বলে মনে হয়। ধর্ম্মদেব ঘোড়ার রাশ আরো শিথিল করল। মল্লিকাকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি তলোয়ার চালাতে জান, রাজকন্যা?

—জানি।

—তোমার ঘোড়ার জিনে তলোয়ার ঝোলান আছে, প্রয়োজন হ'লে আত্মরক্ষা ক'র।

—জানি, বলে মল্লিকা মাথা দোলাল। তলোয়ারখানি যে পাশে ঝুলছে, তা সে অনেক আগেই লক্ষ্য করেছে।

ইতিমধ্যে পাশের বনে দ্রুত মর্ম্মর্ শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠল, তার পরেই গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—কে যায়?

ধর্ম্মদেব চমকে উঠল, কিন্তু কোন জবাব দিলে না, ঘোড়া যেমন ছুটছিল তেমনই ছুটে চল্‌ল—আগের চেয়ে দ্রুততর হ'ল যেন।

আবার প্রশ্ন উঠল—কে যায়?

কণ্ঠ ও উচ্চারণভঙ্গী ঠিক হূন সেনার মত তো নয়, তার উপর মনে হ'ল লোকটি যেন কাণের পাশ থেকে কথা বলছে! কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা গেল না। প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিটীর অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নেবার জন্য ধর্ম্মদেবকে এবার জবাব দিতে হ'ল; সংক্ষেপে সে বল্‌লে—আমি।

—কে তুমি?

—ভারতবাসী।

—ভারতবাসী!—বলে তার কথার প্রতিধ্বনি তুলে সামনের কয়েকটি গাছের আড়াল থেকে একজন অশ্বারোহী আত্মপ্রকাশ করল। তার কালো বর্ম্ম আর কালো ঘোড়া দেখে ধর্ম্মদেব এক কটাক্ষেই তাকে কালো সওয়ার বলে চিনতে পারল। কালো সওয়ারও তাদেরকে চিনল, হাসিমুখে বল্‌লে—ওঃ, কারুষ রাজকুমার আর উজ্জয়িনীর রাজকন্যা! তা এত রাত্রে পালাচ্ছ কোথায়?

ধর্ম্মদেব বল্‌লে—যেদিকে দু'চোখ যায়।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু যার বাড়ীতে খুন করে রেখে এলে, কাল সকালে সেই লোকটীর কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? যে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল, তার কাছে কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা কথা আছে।

ধর্ম্মদেব চমকে উঠল। জেতমানা যে খুন হয়েছে, সে খবর এই লোকটি এরই মধ্যে জানতে পারল কেমন করে!

কালো সওয়ার বল্‌লে—নিজেকে নিয়ে তোমরা খুব ব্যস্ত, তা জানি। কিন্তু রাজবৈদ্যের গৃহে জেতমানার মৃতদেহ যখন আবিষ্কৃত হবে তখন সম্রাট্ মিহিরকুল তার কোন কথাই শুনবে না, কি কঠোর শাস্তিই তাকে পেতে হবে সেই কথাটা একবার ভেবে দেখেছ? সে বেচারাকে একবার সতর্ক করে দেওয়াও কি তোমাদের উচিত ছিল না?

পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে এই কথাটা ধর্ম্মদেবের মনেই ছিল না, এবার সে সত্যই লজ্জা পেল। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে আর্য্য, এ কথাটা আমার মনে ছিল না। আপনি এই রাজকুমারীকে যে কোন একটা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন, আমি এখনই একবার রাজবৈদ্যের কাছে ফিরে যাই।

হা-হা করে কালো সওয়ার হেসে উঠল, বল্‌লে—থাক্, আর বীরত্ব দেখিয়ে দরকার নেই। রাজবৈদ্যকে সাবধান করে দেবার ভারটা আমিই নিলাম। তোমরা যেমন যাচ্ছ, যাও। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথা, এই পথে বেশী দূর অগ্রসর হ'লে তোমরা হূনদের হাতে ধরা পড়বে। তার চেয়ে ডাইনের এই বনপথ ধর, বরাবর গেলে একটী পুরানো শিবমন্দির পাবে, সেখানে আমার নাম করলেই আশ্রয় পাবে। তার পর সুবিধামত তারাই তোমাদেরকে নিরাপদে হূন সীমান্ত পার করে দেবে। এত বড় হত্যাকাণ্ডের পর এ ভাবে পথ চলা তোমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

কালো সওয়ার আর দাঁড়াল না। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূর দূরান্তরে লীন হয়ে যাবার আগেই চারিপাশের স্তব্ধতাকে ঝঙ্কৃত করে তুল্‌ল তার উচ্চকণ্ঠের সঙ্গীত:

ওই আসে ওরে, হূন সওয়ার! আয় চলে আয়, ধর্ তলোয়ার,
ঝন্ ঝনাঝন্—কর্ প্রহার।
মার্ রে মার—মার—মার।
হূন অনাচার কর্ রে শেষ, স্বাধীন কর্ সোনার দেশ।

অশ্বের গতির সঙ্গে সঙ্গে সুরের রেশটুকু দূর দূরান্তরে প্রতিধ্বনি তোলে। জাতির মুক্তিকামী

দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ার বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে যায় দিক্‌দিগন্তে, সুপ্ত নগরীর ঘরে ঘরে নরনারীর ঘুম ভেঙে যায়, নিঃসঙ্গ কণ্ঠ তাদের কাণে এসে ধাক্কা দেয়,—

"মার্‌ রে মার—মার—মার—"

ঘুম ভেঙে তরুণেরা বিছানার উপর উঠে বসে, বৃদ্ধেরা ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে। কালো সওয়ারের কালো ঘোড়া ছুটে যায় নগরীর বুকের উপর দিয়ে। (ক্রমশঃ)

কবিতা

সমস্যা!

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

বাবা বলেন—"খোকা,
দিনরাত্তির দুষ্টামি তোর যায় না লেখাজোখা।
কেবল খেলা খেলা, পড়ায় করিস্‌ হেলা,
টো-টো করে বাইরে ঘুরিস্‌—পাই নে টিকির দেখা!
দেখ্‌ দিকি নি খুকী কেমন লক্ষ্মী মেয়ে, ঘরেই থাকে একা!"

মা বল্‌লেন—"খুকী,
খেলা-ঘরের পুতুল নিয়ে কাটাবি দিন নাকি!
আয় দে আনাজ কুটে, বাট্‌না কিছু বেটে,
দুষ্টু মেয়ে শুন্‌বে যদি আমার ডাকাডাকি!
দাদা তো তোর শান্ত অমন, তুই যেন এক ধিঙ্গী হ'লি দেখি!"

ছোটদের চিত্রশালা

(প্রতিযোগিতার ছবি)

হ্যাঁ, এইবার ছবি তুলতে পার, আমি তৈরী।
আলোকচিত্র—শ্রীমতী শুক্লা সেন

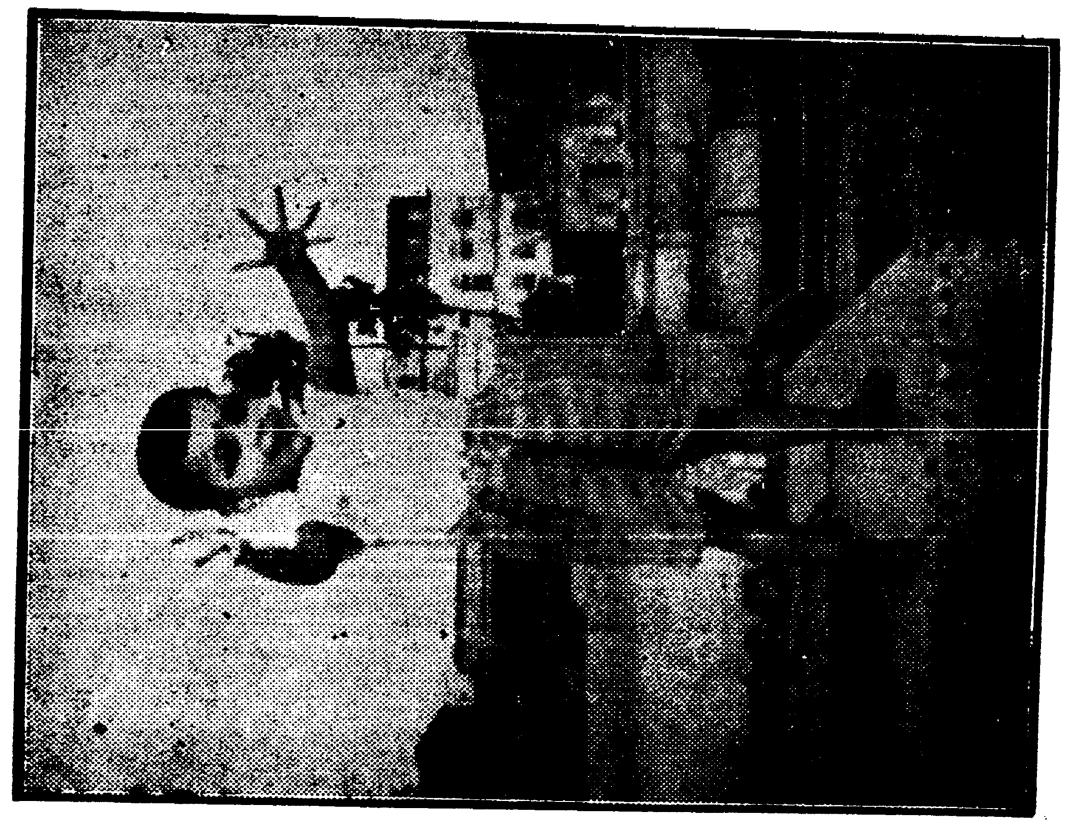

আমি কত উঁচু!
আলোকচিত্র—শ্রীনিখিলানন্দ মণ্ডল

বাষ্পে ঘেরা শিশু পৃথিবী—প্রাণের কোন চিহ্ন নেই

('প্রথম প্রাণ' প্রবন্ধ দেখ)

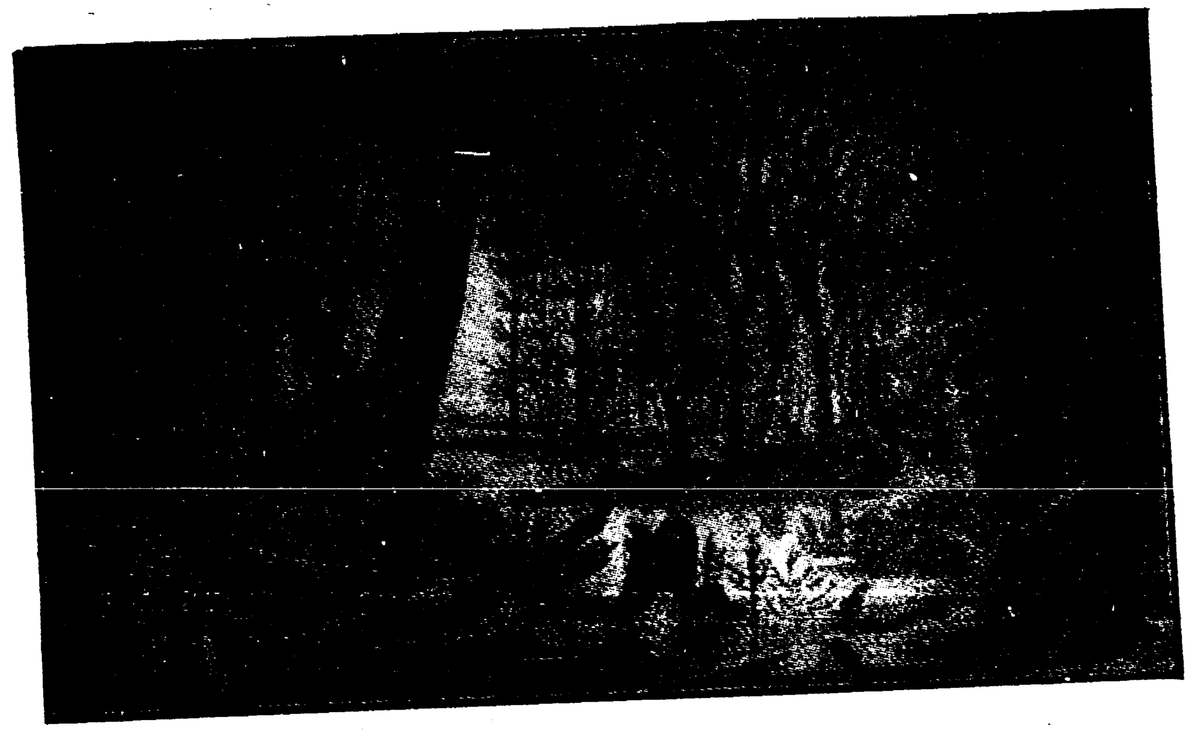

পৃথিবীর ডাঙ্গায় প্রাণের আবির্ভাব—প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন

(পৃঃ ৪০৩ দেখ)

প্রথম প্রাণ

শ্রীনিখিলেশ সেন

নির্জ্জন নিস্তব্ধ পৃথিবী। তুমি নেই, আমি নেই, নেই একটিও জনপ্রাণী। এমন কি নেইক' রূপকথার রাজপুত্র, নেইক' তার পক্ষিরাজ ঘোড়া। রূপকথার রাজকন্যেও নেই। সেই সঙ্গে নেই তার দ্বাররক্ষী দৈত্যও। আর নেইক' একটাও গাছপালা, যাদের আমরা মনে করতে পারি রাজপুত্রের বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামন্ত—দৈত্যের মায়া-বলে যাদের ওরকম অবস্থা হয়েছে।

কি করে গল্প আরম্ভ করা যায় বল ত? গল্প আরম্ভ করতে গেলেই এদের কাউকে না কাউকে চাই-ই। সুতরাং আগে এরা কি করে এল দেখা যাক্, তার পরে অন্য গল্প।

পৃথিবীর ওরকম অবস্থা সত্যিই একদিন ছিল। কিন্তু তার পর যতই পৃথিবীর বয়স বাড়তে লাগল ততই একটির পর একটি করে নানা রকম প্রাণী পৃথিবীতে আসতে লাগল। এমনি করে কত রকমের প্রাণী পৃথিবীতে এল আর গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তারা কেমন করে এল? কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয়? অন্য কোন জগতের ভাঙ্গা টুকরো থেকে কি পৃথিবীতে প্রাণ আসে? ধরে নিলাম তাই না হয় হ'ল, কিন্তু তা হ'লেও ত প্রাণের প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলাম না, কারণ সেই জগতেই বা প্রাণ কোথা থেকে এল আমাদের তা হ'লে সে কথা জানতে হবে।

আসল কথা হ'ল এই যে কোন মানুষই এখনও পর্য্যন্ত সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে না কেমন করে প্রাণীহীন পৃথিবী জীবন্ত প্রাণীতে পূর্ণ হয়ে উঠল; কেমন করে মরুভূমির মত শিশু পৃথিবী বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম গাছপালা, ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে উঠল।

কেমন করে প্রথম প্রাণ এসেছিল তা বলতে না পারলেও কোথায় প্রথম প্রাণ এসেছিল বৈজ্ঞানিকেরা তা বলতে পেরেছেন। প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় সমুদ্রে।

কিন্তু সমুদ্রে প্রথম যেদিন প্রাণের সৃষ্টি হয় সেদিন থেকে আজকের পৃথিবীতে

যত প্রাণী এসেছে গেছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে আমরা তাদের সম্বন্ধে যে সব কথা জানতে পেরেছি তা কেমন করে পেরেছি তা তোমাদের বলা দরকার। পৃথিবীর বুকেই সে সব কথা লেখা আছে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে সব পুরোনো পাথর আছে তারাই হ'ল পৃথিবীর প্রাচীন যুগের ইতিহাস—অতীতের পৃথিবীর প্রাণিজীবনের কথাও এইখানেই লেখা আছে,—সেই সব প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অক্ষরে।

প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের পর অনেক দিন কেটে গেল, যখন একটু একটু করে জীবন্ত জিনিষে সমুদ্র পূর্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু তখনও ডাঙ্গায় প্রাণের দেখা নেই। পৃথিবীর বাইরেটা তখনও বাষ্পের গাঢ় মেঘে ঢাকা। সূর্য্যের আলো তখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

এই সব প্রাণী, প্রথম যা পৃথিবীতে আসে, তারা ছিল খুব সম্ভবতঃ নরম তুলতুলে 'জেলী'র মত দেহবিশিষ্ট—এদের শরীরে হাড় বা শক্ত কোন জিনিষ ছিল না। যদি এদের দেহে হাড় বা ওই ধরণের শক্ত কোন জিনিষ থাকত তা হ'লে তাদের পরবর্ত্তী যুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের সঙ্গে তাদের কঙ্কালও আবিষ্কৃত হ'ত। কিন্তু বহু পুরোনো সব পাথরেও—বৈজ্ঞানিকদের মতে যে সব পাথর পৃথিবীর শিশুকাল থেকেই পৃথিবীর বুকের ওপর আছে—তাতে তাদের কঙ্কালের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। তোমরা হয়ত এখন প্রশ্ন করতে পার যে এই ধরণের জীব পৃথিবীতে এক সময় ছিল তাই বা আমরা কি করে জানলাম। তার উত্তর হচ্ছে এই যে এ পর্য্যন্ত মানুষ প্রাণের আবির্ভাব এবং উন্নতি সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পেরেছে তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে এ ধরণের জীব পৃথিবীতে প্রথম না এলে পৃথিবীর পরবর্ত্তী যুগের উন্নত শ্রেণীর প্রাণ সম্ভব হ'ত না। তা ছাড়া, তাদের কঙ্কাল পাওয়া না গেলেও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ এই সব পাথরে পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকদের মতে এই সব প্রাচীন পাহাড়গুলো প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের সময় পলি জাতীয় পদার্থ ছিল, এবং সুদীর্ঘ দিন ধরে পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে যে সব প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে গেছে তারই ফলে এগুলো পাহাড়-পর্ব্বতে

পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। এই সব পাহাড়ের অনেক জায়গায় এক রকম জীবন্ত জিনিষের চলাফেরার চিহ্ন পাওয়া গেছে।

আরও এক শ্রেণীর খুব প্রাচীন পাথরের বুকে পাওয়া যায় খুব সাধারণ শ্রেণীর কতকগুলো ছোট ছোট গাছপালার চিহ্ন। এই সব পাথরগুলোকে পণ্ডিতেরা বলেন "প্রোটোজোইক যুগের পাথর", অর্থাৎ যে যুগে "প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয় সেই সময়কার পাথর।" এই পাথরগুলোই হ'ল পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ও উন্নতির ইতিহাসের প্রথম পাতা। এর পরের যুগকে বলা হয় "প্যালিওজোয়িক্" যুগ—'প্রাচীন প্রাণের' যুগ।

প্রোটোজোয়িক যুগের প্রাণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কিন্তু প্যালিওজোয়িক যুগের প্রাণ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা গেছে; এবং এ কথা বলা যায় যে প্রোটোজোইক যুগের প্রাণ বেশী দিন পৃথিবীর বুকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি কিন্তু প্যালিওজোয়িক যুগের প্রাণীরা তার চেয়েও অনেক বেশী দিন পৃথিবীর বুকের ওপর চলাফেরা করে বেড়িয়েছে।

প্যালিওজোয়িক যুগের প্রথম দিকে যে সব প্রাণী পৃথিবীর বুকে ছিল তা হচ্ছে শাঁখ, ঝিনুক, কয়েক রকমের মাছ, সামুদ্রিক গাছপালা এবং সামুদ্রিক বিছা। সামুদ্রিক বিছাগুলো লম্বায় প্রায় আট ফুট হ'ত, এবং পৃথিবীতে সে পর্য্যন্ত যত রকমের প্রাণ এসেছিল তার মধ্যে এরাই ছিল সব চেয়ে উন্নত শ্রেণীর জীব। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে যে ক'টি জীবের নাম এ পর্য্যন্ত করেছি তা সবই সামুদ্রিক জীব। এর কারণ, আগেই বলেছি, তখনও পর্য্যন্ত প্রাণ সমুদ্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ডাঙ্গায় তখনও প্রাণের আবির্ভাব হয় নি। বস্তুতঃ কোন প্রাণীর পক্ষে ডাঙ্গা তখন ছিল রীতিমত বিপদ্জনক যায়গা। যদি কোন জীব ভাসতে ভাসতে কোন রকমে সমুদ্রের তীরের ওপর উঠে যেত তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গেই তা জলাভাবে শুকিয়ে উঠত ও মারা যেত।

আজকের দিনেও আমরা দেখতে পাই যে জল ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। বেশীদিন জল না পেলে মানুষ বাঁচতে পারে না। গাছের বেলাও ঠিক একই কথা। কিন্তু আজকালকার গাছ, মানুষ ও তখনকার জীবদের মধ্যে

পার্থক্য এই যে তখনকার জীবেরা জলের বাইরে বাঁচতে পারত না, কিন্তু আজকালকার গাছ, মানুষ প্রভৃতি জল থেকে দূরে বাস করতে পারে যদি প্রয়োজনের সময় নিয়মিত তারা জল পায়। এটা সম্ভব হয়েছে প্রাণের ক্রমোন্নতির ফলেই। আজকালকার গাছ, মানুষ প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করে রাখতে পারে, যা তখনকার জীবেরা পারত না।

সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ যে প্রথম যে জীব সমুদ্রের জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে এল তারা প্রথম প্রাণীদের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের, এবং নিজেদের দেহের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল সংগ্রহ করে রাখবার উপায় তাদের ছিল। সামুদ্রিক গাছপালারাই খুব সম্ভবতঃ প্রথম জল ছেড়ে ডাঙ্গায় ওঠে। জোয়ারের সময় ভাসতে ভাসতে তারা প্রায়ই সমুদ্রের তীরে গিয়ে আটকে যেত, এবং ভাঁটার সময় জল কমে গেলে ডাঙ্গার ওপর পড়ে থাকত। ফলে প্রায়ই তারা মারা পড়ত। সুতরাং বাঁচবার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে জল সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল, এবং এমনিভাবে চেষ্টা করতে করতে অবশেষে তাদের দেহের ওপর একটা পুরু আবরণের সৃষ্টি হ'ল, যার ফলে তারা যখন জলে থাকত তখন তাদের দেহের মধ্যে যেটুকু জল থাকত তা ডাঙ্গার ওপরের রোদ্দুর এবং হাওয়ার সংস্পর্শে সহজে আসতে পারত না, ফলে তারা ডাঙ্গায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আর মারা পড়ত না।

এইভাবেই হ'ল ডাঙ্গায় প্রথম প্রাণের আবির্ভাব। এই সময়ে পৃথিবীর ওপরের বাষ্পের মেঘ গলে যাওয়ার ফলে সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণ পৃথিবীর বুকের ওপর এসে পড়ল, সুতরাং যে সব সামুদ্রিক গাছপালা জল ছেড়ে ডাঙ্গার ওপর উঠত তাদের সূর্য্যের এই উত্তপ্ত কিরণের সম্মুখীন হ'তে হ'ত, এবং তার ফলে তারা আপনা থেকেই কুঁকড়ে যেত। কিন্তু তবুও এরা সূর্য্যের আলো থেকে দূরে থাকতে পারলে না,—সূর্য্য যেন কোন অদৃশ্য শক্তি দিয়ে তাদের আকর্ষণ করত। সুতরাং সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করে কুঁকড়ে না যাবার জন্যে তারা একটা উপায় বার করবার চেষ্টা করতে লাগল, এবং তাদের এই চেষ্টার ফলেই হোক, বা সূর্য্যকিরণের কোন গুণেই হোক, তাদের নরম দেহের মধ্যে একটা শক্ত অংশ

গড়ে উঠতে লাগল, এবং এই শক্ত অংশটির মধ্যেই আমরা কাঠের প্রথম সন্ধান পাই, অর্থাৎ তখনই কাঠ জিনিষটা প্রথম পৃথিবীতে আসে।

এর পর থেকেই সুরু হ'ল জল ছেড়ে ডাঙ্গায় প্রাণের অভিযান এবং প্যালিওজোয়িক যুগের শেষ দিকে ডাঙ্গা লতা, গাছ প্রভৃতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তখনও একেবারে শুকনো যায়গায় গাছপালার আবির্ভাব হ'ল না, ডাঙ্গার ওপর ভিজে স্যাঁৎসেঁতে যায়গা যে সব ছিল সেইখানেই তারা আধিপত্য বিস্তার করলে।

পৃথিবীর প্রাণের সেই প্রথম যুগে যে সব গাছ ডাঙ্গার ওপর ছিল তার বেশীর ভাগই ফার্ণ জাতীয় গাছ। এই গাছগুলি এত বড় হ'ত যে যে সব যায়গায় একসঙ্গে অনেক গাছ থাকত তাকে জঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। এগুলি উচ্চতায় এক শ' ফুট পর্য্যন্ত হ'ত এবং এক একটি গাছ চতুর্দ্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করত।

এই সব সুবিশাল জঙ্গলে তখন একটিও পাখী ছিল না। তখনকার কোন গাছেই ফুল ফুটত না। এমন কি, একটি বড় জীবন্ত বন্যজন্তুও সেখানে ছিল না। ছিল কেবল শামুক, বিছা, মাকড়সা এবং বড় বড় রাক্ষুসে মাছি। এক একটা মাছি পাখা ছড়ালে দু' ফুট করে যায়গা অধিকার করত। এরা সবাই জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠেছিল, এবং সেখানে সূর্য্যের আলোর গুণে খানিকটা উন্নত হয়েছিল।

সমুদ্রেও তখন প্রাণ খানিকটা উন্নত হয়েছিল, দেখা দিয়েছিল বড় বড় সরীসৃপ জাতের জীব। প্রথম যুগের এই সব সরীসৃপেরা তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণীদের উন্নত সংস্করণ, এবং তখন পর্য্যন্ত তারাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর প্রাণী।

এই পর্য্যন্তই হ'ল প্যালিওজোয়িক যুগ। এর পর থেকে যে যুগ আরম্ভ হ'ল তাকে বলা হয় "মেসোজোয়িক যুগ" বা "মধ্য-প্রাণ যুগ"। এই যুগটি হ'ল বড় বড় সরীসৃপের যুগ, এবং এই যুগে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় প্রাণীর আবির্ভাব হয়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই সব বিরাট বিরাট প্রাণীরা পৃথিবীর বুকে বাস করে। কিন্তু অবশেষে তারাও প্রায় সকলেই পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। তার পর সুরু হয় "কেনোজোয়িক যুগ" বা "নতুন প্রাণ যুগ"। এই যুগ থেকে

আরম্ভ হ'ল অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাণীদের যুগ, এবং অনেক নতুন ধরণের প্রাণী পৃথিবীর বুকে এল।

প্রাণের উন্নতি "প্যালিওজোয়িক যুগ" থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, এবং মেসোজোয়িক যুগেও তা খুব দ্রুতগতিতে হয় নি। কিন্তু কেনোজোয়িক যুগে দ্রুতগতিতে প্রাণের উন্নতি সাধিত হয়, এবং একটির পর একটি করে নানা বিচিত্র প্রাণী পৃথিবীর বুকে আসে।

সে সবের কথা আর একদিন বলবার ইচ্ছা রইল।

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮

হরি প্রায় দুই তিন বৎসর গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, গ্রামবাসী এখনও আগ্রহের সহিত তাহার কথা বলে, তাহার সন্ধান লয়। হরির ভগিনী প্রায় পাগলিনীর মত নিত্য ছেলের প্রত্যাগমনের দিন গণে। সন্ধ্যা হইতে সারা রাত্রি প্রদীপটী এখনো জ্বলে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের গৃহিণীরা কতদিন সেই করুণ কাহিনীর কথা আলোচনা করেন। থানাঘাটে, যেখানে হরি খেয়া দিত, সেখানকার পারের যাত্রীরা হরির কথা জিজ্ঞাসা করে, সবাই বলে, 'অমন মাঝি হয় না'।

হরির অভাবে, হরির অদর্শনে, তাহার সাকরেদ দীনু-তিনুর জীবন বড় নীরস, বড় ক্লেশকর ঠেকিতে লাগিল। গ্রামে উপর্য্যুপরি বন্যায় ধান্যাদি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দীনু, তিনু বৈরাগীর বেশে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইল। হরির অন্বেষণও একটা উদ্দেশ্য বটে।

দীনুর গলা ভাল—সে একতারা বাজাইয়া গান করে, এবং যাহা পায় তাতেই দিন চলে। তিনু ভিক্ষা করিতে নারাজ। তার ভারী অভিমান কোথায় কে ফিরাইয়া দিবে, ভৎর্সনা করিবে, ভ্রূকুটি করিবে। তাহা তার অসহ্য। ইহা অপেক্ষা কাড়িয়া লওয়া সে পছন্দ করে। তার ধারণা ওটা ত রাজারাজড়াদের পেশা, ওতে দোষ কি? কিন্তু দীনু তাকে সংযত করে, বলে ওটা মহাপাপ, প্রথমতঃ উহাতে বিপদ্ যথেষ্ট, দ্বিতীয়তঃ এই অবস্থায়, এই বেশে উহা অশোভনীয়। তাই তিনু রঙিন কাগজের ফুল ও ঘূর্ণী ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করে। তার হাসি মুখ, ছেলে-হাসানো ভাষা সবাই পছন্দ করে। এক ঘণ্টার মধ্যে তার সব ফুল বিক্রয় হইয়া যায়।

তিনু হাসিয়া বলে—"দেখ্ দীনু, তোর ওই বাজ্না ও কাঁদুনে গান—ওটা বাপু জলপথ। আর আমার এটা স্থলপথ—স্থলপদ্ম আর নানা ফুলে ঘেরা পথ দিয়ে আমার নিত্য যাতায়াত। কত কচি মুখের, কত কুঁড়ি ফুলের সঙ্গে নিত্যি আলাপ বল্ দেখি! কত দিন আমি দাম নিতেই ভুলে যাই। এ চলার আনন্দ আমাকে পেয়ে বসেছে। যেখানে যাই দেশের ছোট ছেলেমেয়ে ঘিরে দাঁড়ায়। একটা পূজোর আমোদ। ফুলের বাহার আছে বটে কিন্তু ভাই ছেলেদের তুলনা নেই—এক একটা মাণিক রে—সাত রাজার ধন! আমার এই ব্যবসা সবার সেরা—যেখানে যাই একটা মেলা বসাই। সঙ্গে একটা ফুলের মালঞ্চ চলে।"

দীনু হাসে আর বলে—"তিনু, তুই দেখ্ছি একেবারে ভাবুক হয়ে গেলি। কিন্তু আশ্চর্য্য, তোকে দেখে কেউ ছেলেধরা মনে করে না! এত বড় চেহারা, তার ওপর দাড়ি!"

প্রায় ৪।৫ মাস এই ভাবে দুই বন্ধুতে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক জমিদারের দেউড়ীতে গিয়া হাজির হইল। সেখানে সাজানো ঢাল, তলোয়ার, দু'খানা বাঘের চামড়া, দু'টা প্রকাণ্ড মুদ্গর, সড়কি, তীর-ধনুক, টাঙ্গি—একটা অস্ত্রাগার বলিলেই হয়। তিনজন পশ্চিমা দ্বারবান্—যমের ন্যায় আকার বটে, মুখে সর্ব্বদাই বীরত্বের আস্ফালন। দেউড়ীর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড পেটা-ঘড়ি, তাহাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময় জানানো হয়। দীনু, তিনু মনে মনে ভাবে 'এই অস্ত্রগুলা যদি পাই—এই তিনটে পালোয়ানকে এইখানে বেঁধে রেখে, বাড়ী লুট করতে পারি।' প্রধান দ্বারবান্ সিংজী কেমন করিয়া একশত ডাকাতের মোহড়া লইয়াছিলেন এবং একুশ হাত লম্ফ দিয়া একটা পরিখা পার হইয়াছিলেন সেই সব রঞ্জিত বীরত্বের কাহিনী বলিতে লাগিলেন, দীনু, তিনু নিতান্ত ভাল মানুষের মত কল্পিত বিস্ময়ে তাহা গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। দ্বারবান্দের প্রত্যেকের প্রতি বেলা একসের আটা, একপোয়া ঘিউ, অরহরকা ডাল প্রভৃতি রসদের দীর্ঘ ফর্দ্দ শুনিয়া তিনুর বড়ই লোভ হইতেছিল—ভাবিতেছিল যদি জমিদার বল পরীক্ষা করিয়া দ্বারবান্ রাখে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখে।

দ্বারবানের বীরত্বের কাহিনী চলিতেছে এমন সময় দেখা গেল দুই জন কাবুলী একটা হৃষ্টপুষ্ট গাভী জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে—ঋণী কৃষকপত্নী এবং তাহার কৃশকায় শিশু পুত্রটী কাঁদিতে কাঁদিতে অনুনয় করিয়া পিছনে যাইতেছে। এটা দেখিয়া দীনুর দারুণ জবরদস্তি মনে হইল। টাকা পাইবে টাকা লইবে, জোর করিয়া গরু খুলিয়া লইয়া যাইবে কেন? সে সিংজীকে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিল। সিংজী ভারী গলা করিয়া বলিল—কাবুলীরা ভারী গোঁয়ার—উহাদের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে দাঙ্গা করা—মাথা দেওয়া। পরের জন্য এ ঝুঁকি কে লইবে? বিশেষতঃ উহারা পাওনাদার, জুলুম করিবার অধিকারী।

দীনু উঠিয়া কাবুলীদিগকে বিনয় করিয়া গাইটী ছাড়িয়া দিতে বলিল, দীনুর সঙ্গে কয়েকজন গরীব লোকের মেয়েছেলেও যোগ দিল। দ্বারবান্ মজা দেখিতে লাগিল। কাবুলীরা অনুরোধে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আরও জোরে গরুটীকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া দীনু তাড়াতাড়ি গরুর গলার দড়া ধরিল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া দুইজন কাবুলী এক সঙ্গে দীনুকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। দীনু এমনি কৌশলে একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল যে একটা কাবুলী সজোরে সটান মাটীতে পড়িয়া গেল। অপর জনের ধাক্কায় দীনু টলিল না, গরুর দড়ার দ্বারা কাবুলীকে চাবুকের মত এক ঘা বসাইয়া দিল। কাবুলীটা হতভম্ব। বাঙলা দেশে আসিয়া এমন ব্যবহার সে আর পায় নাই। দুই জনে একবার দীনুর মুখ পানে চাহিল, দেখিল মুখটা যেন চেনা চেনা। কোন দূর পল্লীগ্রামে লোকটার সঙ্গে একবার শক্তি পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার বিষাদস্মৃতি যেন মনে জাগরূক হইল। হরি গাভীর বন্ধন মোচন করিয়া দিতেই গাভী ছুটিয়া পলাইল। সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল, কৃষকপত্নী ও রুগ্ন শিশুটীর আনন্দ যেন ধরে না।

কাবুলীরা বাড়াবাড়ি না করিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। দীনু ও তিনু আবার তাহাদের পর্য্যটন আরম্ভ করিল—দ্বারবান্ সিংজী ভাবিতে লাগিল এরা যে সে ভিখারী নয়,—বোধ হয় ডাকাত, না হয় অপদেবতা, মানুষের বেশে ফিরিতেছে।

এই গ্রামেই দীনু সংবাদ পাইল যে এক সাধু আছেন দূর গঙ্গাতীরে, যিনি হারানো ছেলে যোগবলে ফিরাইয়া দিতে পারেন। ষোল বৎসরের এক ছেলেকে এক গৃহস্থ ফিরিয়া পাইয়াছেন, সেই ছেলের আজ বিবাহ। এ যেন মা ষষ্ঠীর ব্রত-কথায় ক্ষীরের খোকার বদলে সত্যিকার রাজপুত্তুর পাওয়া।

দীনু, তিনু সাধুর ঠিকানার উদ্দেশে যাত্রা করিল, ভাবিল হরি নিশ্চয়ই তাহার ভাগিনেয়ের জন্য সাধুর শরণাপন্ন হইবে। অন্ততঃ হরির সন্ধান সেখানে মিলিতে পারে।

প্রায় দশ বার দিন চলার পর তাহারা গঙ্গার এক বাঁধা ঘাটে উপস্থিত হইল। সেখান হইতে সাধুর ডেরা দুই তিন দিনের পথ।

আহারাদির পর বৈকালে ঘাটে বহু লোক জমিয়াছে, দীনু গান ধরিয়াছে—

"হরি বিনে বৃন্দাবনে
আর কি সুখের সে দিন আছে?
নরনারী আনন্দহীন,
তরুলতা শুকায়ে গেছে।"

গানটী বেশ জমিয়াছে—অদূরে একখানি সুন্দর বজরা, জমিদার বা রাজা-মহারাজার হইবে, খুব জাঁকজমক।

একজন বরকন্দাজ আসিয়া দীনুকে বলিল, "তোমার গান হুজুরের ভাল লাগিয়াছে, বজরায় গান শুনাইবে এসো, মোটা দক্ষিণা পাইবে।"

দীনু ও তিনু দু'জনে সসম্ভ্রমে বজরায় গেল; আসবাব ও ধূমধাম দেখিয়া ভাবিল এ বোধ হয় কোন মহারাজার বজরা হইবে। হুজুরের চেহারা শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল। কি লাবণ্য! যেমন তেজব্যঞ্জক তেমনি শান্তমূর্ত্তি।

দীনু গান ধরিল—

"দিল কোন্ নরবর শ্যাম সরোবর
কদম্ব কানন উপরে।"

সুমধুর গীতটী সাঙ্গ হইতেই আদেশ হইল গঙ্গার ঘাটে যে গানটী দীনু গাহিতেছিল সেইটী গাহিতে।

"হরি বিনে বৃন্দাবনে
আর কি সুখের সে দিন আছে?
নরনারী আনন্দহীন,
তরুলতা শুকায়ে গেছে।"

দীনু সে গান গাহিল। হুজুরের গীত খুবই ভাল লাগিয়াছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের বাড়ী কোথা?"

দীনু—"মহারাজ, বর্দ্ধমান জেলায় কোগ্রাম"। দীনু তাঁহাকে মহারাজাই মনে করিল। মহারাজার মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষিত হইল। তিনি বলিলেন—"এত দূর হতে এখানে এসেছ কেন?"

দীনু—"মহারাজ, দেশে দুর্ভিক্ষ, বড় অভাব, আর ভাল লাগ্‌ল না।"

মহারাজ—"বেশ, তোমাদের গ্রামের সে বকুল গাছটি আছে? অজয়ে তেমনি বড় বান ডাকে?"

দীনু বলিল—"মহারাজ, আমাদের দেশে গিয়েছিলেন? যাবেন বৈকি, সেখানে মা মঙ্গলচণ্ডীকে দেখ্‌তে রাজা-মহারাজা ত আসেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা এক শ' বিঘে নিষ্কর জমি দিয়েছেন।"

মহারাজার কণ্ঠ যেন বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি থানাঘাটে পার হয়েছি। সেখানে সে মাঝি আছে কি? তার কেউ আছে?"

দীনু আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া বলিল, "হুজুর, তিনি ভাগিনেয়ের সন্ধানে দেশত্যাগ করেছেন, তাঁর বোন জীবন্মৃত—আমরা তাঁর বড় প্রিয় ছিলাম।"

যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে হঠাৎ দূরে একটা বিউগিলের শব্দ শুনা গেল। মহারাজা চকিতে উঠিয়া গেলেন। সহসা বজ্‌রায় একটা প্রখর কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হইল। বজ্‌রার প্রকাণ্ড পাল বাতাসে ফুলিয়া উঠিল, হাতা দাঁড় ঝুপ্‌ঝাপ শব্দে পড়িতে লাগিল—চক্ষের পলকে বজ্‌রা প্রবল বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। দীনু-তিনু নামিবার অবকাশ পাইল না—চেষ্টাও করিল না। একটা বিপুল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা বজ্‌রাতেই রহিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

সুইজারল্যাণ্ডের স্মৃতি

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

সুইজারল্যাণ্ড দেখলে মনে হয় যেন প্রকৃতি তার শৈশব-জীবনে এক অদ্ভুত খেয়াল নিয়ে দেশটাকে আপন মনে সাজিয়ে তুলেছিল। তাই একই দেশে ও একই ঋতুতে পূবে যখন প্রস্ফুটিত হয়েছে বসন্তের ফুল, দখিনে তখন ফলেছে শরতের ফল ও উত্তরে পড়েছে শীতের তুষার।

এমন একদিন ছিল যেদিন সুইজারল্যাণ্ডের লোকদের কাছে জীবন ছিল ভারবহ। সেদিন বেশী বরফ পড়লে ঘর থেকে মানুষের বের হওয়া ছিল বিপদ্‌সঙ্কুল। হু-হু করে ঝড় বইছে, পথ-ঘাট সব বরফে ভরে গেছে,—বাইরে বের হ'লে হয় জমাট বরফের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নয়তো প্রবল হাওয়ায় ওড়া বরফের গুঁড়োতে চাপা খেয়ে মানুষ মারা যেত। এমনি ভাবে বহু ছোট ছোট গ্রামে আজও অনেক লোক মারা যাচ্ছে।

বরফে মরার হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের বহু দিনের খাবার আগের থেকে ঘরে সংগ্রহ করে রাখতে হ'ত,—আর সমস্ত শীতকালটা ধরে তাদের সেই সঞ্চিত খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে হ'ত। সুইজারল্যাণ্ডে আর এক অসুবিধা ছিল। এক সহর থেকে আর এক সহরে যাতায়াতের ভাল পথ ছিল না। রেল বা মোটরের রাস্তা তখন ছিল না। পাহাড় ভেদ করে ছোট ছোট রাস্তা কাটা হ'ত। কিন্তু সে সব পথও শীতকালে বরফে ভরে থাকত। পথের এই অসুবিধা দূর করতে প্রথম নামলেন বীর নেপোলিয়ন উনবিংশ শতাব্দীতে। তিনি যে সব রাস্তা নির্ম্মাণ করে গেছেন সে সব রাস্তা তৈরী শেষ হয়েছিল ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। আজ সুইজারল্যাণ্ডের অনেক রাস্তা সৌন্দর্য্যে পৃথিবীতে অতুলনীয়। ভাল রাস্তা তৈরী হওয়ার পর বহু দেশ থেকে ঐ দেশে লোকে ভ্রমণ করতে যাচ্ছে। ট্রেনের পথও আজ সেখানে অতি সুগঠিত। ফলে সুইজারল্যাণ্ড আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের এক প্রকাণ্ড কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি, রং, জমানো দুধ, জুতো ও মদ আজ পৃথিবীর কোন্ দেশে না চালান যাচ্ছে? শুধু তাই নয়, এর মধ্যে তাদের কোন কোন ব্যবসা পৃথিবীতে একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। সুইজারল্যাণ্ডে কয়লা ও লোহা কম—এইটিই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সব চাইতে বড় অসুবিধা। লোহার অসুবিধায় আজও তারা ভুগছে কিন্তু কয়লার অভাব অনেকটা পূরণ করেছে খুব উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে জল পড়ার সাহায্যে হাইড্রো-ইলেকট্রিক্‌এর সৃষ্টি করে।

জেনিভা সহরটি সমতলভূমির উপর গড়ে উঠেছে। সহরের চারিদিকে আকাশ-ছোঁয়া পর্ব্বতমালা। সহরের বুক যুড়ে ছড়িয়ে আছে জেনিভা হ্রদ। হ্রদটি এত বড় যে তাকে দেখলে নদী বলে ভুল হয়। হ্রদের এক মুখে জেনিভার সহরখানি, আর এক মুখ বেরিয়ে গেছে সুইজারল্যাণ্ডের পূবে। জলের দুই পাড়েই জেনিভা সহর। মাঝখানে একটি পুল তৈরী করে দিয়ে সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়ার সুবিধা করে দিয়েছে। হ্রদে কতকগুলি ষ্টিমার ও নৌকা ভাসছিল। ছুটির দিনে ও বিকালবেলায় জেনিভাবাসী ওই ষ্টিমারে করে বেড়ায়।

সারা সহরটা ঘুরে দেখলাম, রাস্তাগুলি খুব পরিষ্কার, বাড়ীগুলি খুব উঁচু ও

হোটেল সেখানে অজস্র। জেনিভাতে বহু মিউজিয়ম্ আছে ও তার ভিতর বিজ্ঞান-বিষয়ক মিউজিয়ম্‌গুলিই সব চাইতে নাম-করা। জেনিভা হ্রদের পাড়ের রাস্তাগুলি খুব সুন্দর। রাস্তার নীচ দিয়েই বয়ে গেছে হ্রদের জল। তাতে ভাসছিল কয়েকটি রাজহাঁস।

'লীগ্ অফ্ নেশনস্'এর অট্টালিকা দেখে এলাম। প্রকাণ্ড সাদা বাড়ী, চারদিকে সুন্দর বাগান। সেদিন লীগের একটি মিটিং ছিল, তাই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা সম্ভবপর হ'ল না। 'লীগ্ অফ্ নেশনস্' পৃথিবীর যত প্রকার উন্নতি করেছে তার ভিতর একটির কথা ইউরোপের কিশোর-কিশোরীরা বিশেষভাবে জানে। লীগ্ কয়েক বছর আগে জার্ম্মানী, রাশিয়া, ইতালী ও স্পেনের রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত শিশু, কিশোর ও বয়স্ক লোকদের ভার নিয়ে তাদের বিদেশে পাঠিয়ে আশ্রয় খুঁজে দিয়েছে। এর জন্য তার বহু অর্থব্যয় হয়েছে। আজ সে সব ছেলেমেয়েরা বিদেশীদের সঙ্গে দিব্যি মিশে গেছে।

লোজান সহর জেনিভার চেয়েও সুন্দর লাগল। সহরটি গড়ে উঠেছে পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের গায়ে চওড়া চওড়া পিচ্-ফেলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা, তার দু'ধারে বড় বড় বাড়ী ও অজস্র ছোট বড় সাজান দোকান বিদেশীর চোখে ভারী ভাল লাগে। একটি বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম দূরের আকাশ-ছোঁয়া পর্ব্বতশ্রেণী। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। কিন্তু তখনও পাহাড়গুলির চূড়া বরফে সাদা হয়ে ছিল। পাহাড় ও জেনিভা সহরের মাঝখানে জেনিভা হ্রদের প্রকাণ্ড জলরাশি। ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে পথের পরিচয় নিতে নিতে হ্রদের পাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। ঢালু রাস্তাটির দু'ধারে ছিল খুব বড় বড় বাড়ী ও তৎসংলগ্ন এক-একটি বাগান ও আশেপাশে ছোট এক-একটি দোকান। এই ধরণের দোকান ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রচুর আছে। সেখানে ফল-তরকারীও বেচে আবার ষ্টেশনারী জিনিষপত্র, লজেন্স, চকোলেট, ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ডও বিক্রী করে। দোকানদারের বাড়ীর বাইরের ঘরটিকে দোকান করেছে। দোকানে ঢোকবার দরজার সঙ্গে একটি কলিং বেল্ লাগান আছে। দোকানদার নিশ্চিন্তে ভিতরে বসে নিজের কাজকর্ম্ম করছে। 'টুং' করে শব্দ হওয়া মাত্র দোকানদার

বেরিয়ে আসে। এসেই হাসিমুখে খরিদ্দারকে অভিনন্দন করে বলে: নমস্কার। ইংলণ্ডে যদি খরিদ্দারের সঙ্গে দোকানদারের একটু জানাশোনা থাকে তা হ'লে নমস্কার করেই প্রথমে সেদিনকার প্রাকৃতিক আব্‌হাওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা তোলে। যেমনি ক্রেতার কাজ হয়ে যায় অমনি আবার বলে: নমস্কার। জার্ম্মানীতে বলে: আবার দেখা হবে আশা করি।

হ্রদের পাড়ে গিয়ে দেখি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। হ্রদের ভিতর পাথর ফেলে একটা সরু রাস্তা করা আছে। সে পাথরের উপর বসলে চোখে পড়ে একদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি ও পর্ব্বতমালা, অপর দিকে পাহাড়ের উপর লোজান সহর। এমনি এক জায়গায় বসে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে দার্শনিক রুসো প্রায়ই আনন্দে চোখের জল ফেলেছেন।

হ্রদের পাড়ে একটি রেস্তোরাঁ। তার উঠানে বহু টেবিল ও চেয়ার পাতা

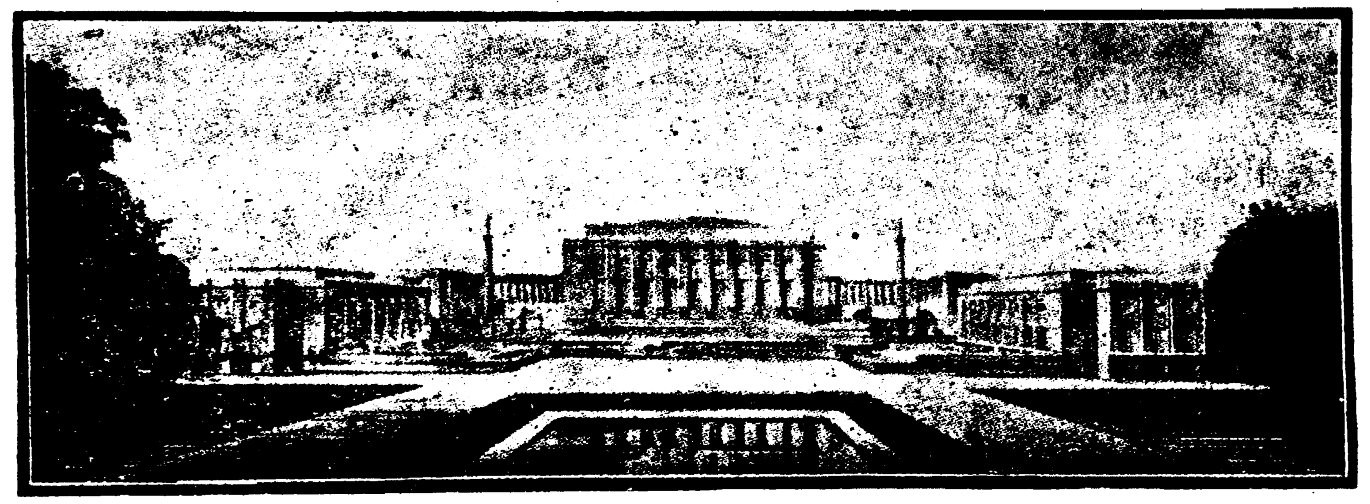

লীগ্ অফ্ নেশন্‌স্‌এর বাড়ী—জেনিভা

আছে। কাজের লোকেরা অবসর সময়ে ঐখানে বসে এক কাপ্ কফি নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আর সময় কাটায়।

রেস্তোরাঁর পাশেই কতকগুলি নৌকা বাঁধা ছিল। ঘণ্টা হিসাবে ঐ নৌকাগুলি ভাড়া করে হ্রদের ভিতর ভেসে বেড়ান যায়। ঐ রেস্তোরাঁতে একজন অখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সাথে আলাপ হয়েছিল। তিনি বললেন, চুম্বক-বিষয়ক কয়েকখানি যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন কিন্তু তাঁর এত টাকা নাই যে সেগুলি নিয়ে তিনি ব্যবসা করেন। তাই সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি বড় বড় সহরে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন কোন ধনী লোকের সাহায্য পাওয়ার আশায়। ভদ্রলোক শুধু বৈজ্ঞানিক নন,—বহু বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দেখলাম খুব উঁচু। তাঁর মতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। যাই হোক্, এই বৈজ্ঞানিকটির মত কত মহাত্মা লোকচক্ষুর অগোচরে মানুষের হিতসাধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, কে তার খোঁজ রাখে?

সে রেস্তোরাঁর রান্না খেয়ে জার্ম্মান্ রান্নার কথা মনে পড়ল। দু'টীতে খুব সাদৃশ্য আছে মনে হ'ল। আমাকে যে খাবারের মেনু দিয়েছিল তাতে দেখলুম তিন ভাষায় লেখা আছে—জার্ম্মান্, ইটালিয়ান্ ও ফরাসী। এর কারণ বুঝতে দেরী হ'ল না। কারণ সুইজারল্যাণ্ডের কোন প্রদেশে ঐ তিনটীর ভিতর একটী ভাষায় কথা চলে। জেনিভাতে দেখেছিলাম, ফরাসী ভাষার চল বেশী। লোজানের লোকজন প্রথমে ফরাসী ভাষাতেই কথাবার্ত্তা সুরু করে কিন্তু জার্ম্মান্ ভাষাও তারা খুব ভাল জানে। লুসার্ন্, জুরিখ্, বার্ণ ও বস্‌ল্ এ জার্ম্মান্ ভাষাই কথিত ভাষা। ইটালীর কাছাকাছি সহরগুলিতে ইটালিয়ান্ ভাষার প্রাধান্য বেশী।

ফেরার পথে জাহাজে, ১৯৩৯

১০

ওদিকে পাহাড়ের রাস্তায় চলিতে তত কষ্ট হয় নাই; এখন বনের মধ্যে চলিতে তাহাদের রীতিমত কষ্ট হইতে লাগিল। পথও অতিক্রম করিতে না করিতেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। বনের মধ্যে প্রচুর শুক্‌না ডালপালা। তাহাই জড় করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া তাহারা সেই রাত্রি সেই বনের মধ্যে কাটাইল এবং পরদিন ভোর হইতেই পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিল।

জঙ্গলের মধ্যে নানা রকমের গাছ, কতক চেনা কতক বা অচেনা। বেশীর ভাগ বার্চ্চ, বীচ, পাইন, ওক ও ঝাউগাছ। এক রকম বড় বড় গাছ তাহারা দেখিতে পাইল যাহার ছালগুলা এমনি ফাটিয়া রহিয়াছে, ঠিক যেন দালচিনি গাছ। সেই ছালের গন্ধও বেশ সুরভিত। বেলা দুইটার সময় তাহারা একটা ফাঁকা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে আর তেমন গভীর বন নাই। সেই উন্মুক্ত ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কুলুকুলু শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। নদীতে বড় জোর এক হাঁটু জল, কিন্তু কি পরিষ্কার কাচের মত সেই জল! ভিতরে অসংখ্য নুড়ি ও পাথর; তাই স্রোতও বেশ প্রখর। নদীর এক জায়গায় এমন সুন্দর ভাবে কতকগুলি পাথর সাজানো রহিয়াছে যে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ঠিক যেন কে নদী পার হইবার জন্য পাথরগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

সেদিনও সারা দিন হাঁটিয়া সমুদ্রের সন্ধান মিলিল না। অবশেষে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে আবার মাংস ও বিস্কুট খাইয়া তাহারা ঘুমাইবার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। শেষে তাহারা একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিতে পাইল, তাহার একটা প্রকাণ্ড ডাল প্রচুর শাখাপ্রশাখা লইয়া মাটী পর্য্যন্ত এমন নুইয়া পড়িয়াছে যেন সেটা একটা কুঞ্জবন। তাহার তলায় রাত্রের মত তাহারা আশ্রয় লইল।

সকাল সাতটার সময় সকলকার ঘুম ভাঙিল। প্রভাতসূর্য্যের সোনার আলোয় চারিদিক্ ঝল্‌মল্ করিতেছে। নীলাদ্রি সর্ব্বপ্রথম সেই কুঞ্জের বাহিরে আসিল। বাহিরে গিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সুশান্ত, রঞ্জিৎ, রোহিতাশ্ব, শীগ্‌গির এদিকে এস।" সকলে বাহির হইয়া আসিল। নীলাদ্রি যেন তখন হাঁপাইতেছে, বলিল—"ঐ দেখ, সমস্ত রাত কিসের তলায় আমরা ঘুমিয়েছি!" সকলে তখন চাহিয়া দেখিল। যে দৃশ্য তখন তাহাদের চোখে পড়িল তাহাতে তাহারা কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হইয়া রহিল। যাহার তলায় তাহারা রাত্রিতে ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে তাহা একটা শাখাবহুল বৃক্ষকাণ্ড নয়, সেটা একটা ক্ষুদ্র কুটীর। এই অদ্ভুত কুটীরের বিশেষত্ব এই যে ইহার দেয়াল নাই। চারিদিক্-ঢালু ঘরের চাল একটা বৃক্ষকাণ্ডে সংলগ্ন। আমেরিকায় রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌রা এইরূপ ঘরে বাস করিয়া থাকে। এইরূপ কুটীরকে তাহারা 'আজুপা' বলে।

সেই পাতার ছাউনি কুটীর দেখিয়া রঞ্জিৎ কহিল—"দ্বীপে তা হ'লে লোকের বসতি আছে!" সুশান্ত কহিল—"আপাততঃ না থাকলেও অতীতে যে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" রোহিতাশ্ব কহিল—"এইবার বোঝা গেল নদীর উপর কেন অমন ভাবে পাথর সাজানো রয়েছে।" সেখানে আর দেরী না করিয়া তাহারা আবার হাঁটিতে সুরু করিল। কয়েক ঘণ্টা হাঁটিবার পর দেখা গেল এখন আর তেমন বড় বড় গাছ চোখে পড়ে না; কেবল মাথা সমান

উঁচু ঝোপ-ঝাড়। আশায় আনন্দে সুশান্তর বুক দুলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা সেই নিবিড় ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া এক বিস্তৃত সুপরিসর বালুচরের উপর আসিয়া পড়িল। বালুচরের কিছু দূরেই এক তরঙ্গায়িত উত্তাল সমুদ্র তাহার অজস্র-উৎসারিত ফেন-সমারোহ লইয়া বেলাভূমির উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে।

যাক্, জায়গাটি যে মহাদেশ নয়, দ্বীপ তাহা বুঝা গেল। আর অপেক্ষা করিয়া লাভ নাই। সামান্য একটু জিরাইয়া এবং কিছু খাইয়া লইয়া চারিজনেই ফিরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সকলের নজর পড়িল বিয়্যারের দিকে। কুকুরটা তাহাদের সঙ্গ না লইয়া কি মনে করিয়া সমুদ্রতীর ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! নীলাদ্রি ডাকিল—"বিয়্যার, বিয়্যার, এদিকে আয়।" কিন্তু সে সেই কথায় কর্ণপাত না করিয়া একেবারে সমুদ্র-জলের উপর গিয়া দাঁড়াইল। তার পর যে কাণ্ড বিয়্যার করিল তাহাতে তাহাদের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিয়্যার সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া জলে মুখ ডুবাইয়া চক্ চক্ করিয়া জলপান করিতেছে। লোণা সমুদ্র-জল বিয়্যার পান করে কি করিয়া? সকলেই অবাক্ হইয়া সমুদ্রতীরে ছুটিয়া গেল।

রোহিতাশ্ব এক আঁজলা জল লইয়া মুখে দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ কি ব্যাপার, রঞ্জিৎ! সমুদ্রের জল এত মিষ্টি, এত পরিষ্কার কেন?" তিনজনে তখন সেই জল পান করিয়া দেখিল অতি পরিষ্কার, টাট্‌কা, মিঠা জল। যে সুবিস্তৃত জলরাশিকে তাহারা এতক্ষণ সমুদ্র বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহা সমুদ্র নহে; সেটা একটা প্রকাণ্ড দিগন্তবিসারী হ্রদ।

পরদিন তাহারা একটা পাহাড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা নদীর কিনারা ধরিয়া সেই পাহাড় উঠিয়াছে। নদীর দক্ষিণ পাড়ে সুবিস্তৃত জলাভূমি। সেটা এত বড় যে তাহার কোন কূলকিনারা দেখা গেল না। এখানে নদীর প্রস্থও যেমন, গভীরতাও তেমনি বেশী। সেই পাহাড়টার পাশ দিয়া চলিয়া তাহারা কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতলভূমির উপর গিয়া পৌঁছাইল। হঠাৎ কি দেখিয়া নীলাদ্রি চেঁচাইয়া উঠিল। সকলে চাহিয়া দেখিল, কতকগুলি বড় বড় পাথরের আড়ালে একটা জীর্ণ নৌকা পড়িয়া রহিয়াছে। নদী সে স্থল হইতে অল্প দূরেই। বৎসরের পর বৎসর একটানা বর্ষার জল লাগিয়া নৌকাটার আর কিছু পদার্থ নাই। শ্যাওলায় আবৃত হইয়া কাঠগুলি পচিয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সেই নৌকা দেখিয়া তাহাদের মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাদের মনে হইল নিকটেই কোন জঙ্‌লী লোক আছে, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝি বা তাহারা তাহাদের আক্রমণ করিয়া বসে। এদিকে বিয়্যারের আচরণও বড় সন্দেহজনক ঠেকিতে লাগিল। বিয়্যার কখনো চাপা গর্জ্জন করে, কখনো সামনে ছুটিয়া যায়, কখনো বা নিতান্ত ভয়গ্রস্তের মত লেজ গুটাইয়া তাহাদের নিকট ছুটিয়া পলাইয়া আসে। হঠাৎ নিকটবর্ত্তী একটা প্রকাণ্ড অতিবৃদ্ধ বীচ্ গাছের গুঁড়ির উপর রঞ্জিতের দৃষ্টি পড়িল।

সেই গাছের উপর পরিষ্কার দুইটি ইংরাজী অক্ষর ও তাহার নীচে ইংরাজী সাল খোদিত রহিয়াছে: F. B.—1827। সেই খোদিত অক্ষরগুলির প্রতি চারিজনে ভূতের মত তাকাইয়া রহিল। এদিকে বিয়্যার তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই। কুকুরের রকম-সকম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া সুশান্ত বলিল—"খুব সাবধান, সামনে নিশ্চয় কোন বিপদ্ আছে।" চারিজনে তখন বন্দুক উঁচাইয়া বিয়্যারের পিছু পিছু ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া চলিল। কুকুরটা একটা নিবিড় ঝোপের নিকট দাঁড়াইয়া চাপা গর্জ্জন করিতে লাগিল। সুশান্ত কহিল—"ভিতরে কোন গহ্বর আছে বোধ হয়!" রঞ্জিৎ অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল—"তাই ত মনে হয়।" সুশান্ত কহিল—"চল, ভিতরটা একবার দেখা যাক্।" তখন কুড়াল লইয়া তাহারা গাছ কাটিয়া কাটিয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ করিয়া লইল,—ভিতরে কি আছে তাহা কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এতটুকু শব্দ তাহাদের কানে আসিল না। বিয়্যারের তখনো সেই চঞ্চল, সন্ত্রস্ত ভাব। তখন তাহারা সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। খানিকটা গিয়াই সকলে সেই পাহাড়ের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পর্ব্বতগাত্রে বেশ বড় একটা গহ্বর; কিন্তু তাহার দরজা নিতান্ত ছোট ও সরু। সেই দৃশ্য দেখিয়া চারিজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। ভয় পাইলে চলিবে না; ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। হয়ত এই পর্ব্বতগহ্বরই তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য আশ্রয় দান করিবে। কিন্তু অন্ধকার বায়ুশূন্য গহ্বরের কথা বলা যায় না। যদি ভিতরটা বিষাক্ত গ্যাসে পূর্ণ থাকে তবে যে মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহাদের প্রাণসংশয় হইবে! সুশান্ত তাই বুদ্ধি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কিছু শুকনা পাতা লইয়া ভিতরে ফেলিয়া জ্বালাইয়া দেখিল। শুষ্ক পাতার স্তূপ আগুনের স্পর্শে বেশ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুশান্ত কহিল, "যাক্, ভিতরটা বিষাক্ত গ্যাসে পূর্ণ নয়।"

রোহিতাশ্ব এতক্ষণ চুপ করিয়া সুশান্তর কাণ্ড দেখিতেছিল, এইবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"এই অন্ধকার অজানা গহ্বরের মধ্যে এখন ঢুকবে নাকি?"

সুশান্ত কহিল—"নিশ্চয়ই।" এই বলিয়া একটা খুব বড় ও শুষ্ক ডাল লইয়া তাহা মশালের মত জ্বালাইয়া সে গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করিল। আর তিনজনে তাহার পিছন পিছন চলিল। চারিজনের বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পড়িতেছিল। এই সম্পূর্ণ অজানা পর্ব্বত-গহ্বরের মধ্যে কি আছে না আছে তাহা একমাত্র ভগবান্ই জানেন। সে যেন এক মৃত্যুপুরী, যেন এক ছায়াময় বিশাল প্রেতরাজ্য! সামনের প্রবেশদ্বার প্রায় চারি ফুট উচ্চ, প্রস্থে প্রায় দুই ফুট। কিন্তু ভিতরটা বেশ সুপরিসর, হল্ঘরের মত বড়—উচ্চতায় প্রায় বারো ফুট ও লম্বা-চওড়ায় পঁচিশ ফুটেরও বেশী। মেঝেটা বালি ও শক্ত পাথরে ঢাকা। মশালটা ভালো জ্বলিতেছিল না; রোহিতাশ্ব না দেখিতে পাইয়া কিসের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। সকলে আলো

লইয়া হেঁট হইয়া দেখিল সেটা একটা কাঠের বেঞ্চি। দেখিয়া তাহারা অবাক হইল। কিছু দূরেই রহিয়াছে একটা বহু পুরানো কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর একটি মাটীর কলসী, দু'খানা থালা, একটা বড় ছুরি, একটা এনামেলের কাপ্, একটা পিতলের জগ্ ও মাছ ধরিবার জন্ত কতকগুলি সরঞ্জাম রহিয়াছে। ওপাশের দেওয়ালের নিকট একটা বড় কাঠের সিন্ধুকও দেখা গেল। তাহার ডালা তুলিয়া তাহারা দেখিল ভিতরে কতকগুলি অতিজীর্ণ কাপড়-জামা রহিয়াছে। এক কালে এই গহ্বরে যে মানুষ বাস করিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কত দিন আগের কথা? সে লোক বা লোকগুলিরই বা কি হইল?

হঠাৎ তাহাদের নজর পড়িল হল্ঘরের অপর পার্শ্বে। পাথরের দেওয়ালের নিকট একটি ক্ষুদ্র সামান্য তৃণ-শয্যা। মাথার শিয়রে একটা টুলের উপর একটা কাঠের মোমদানি। মোমবাতি গলিয়া তলায় শেষ হইয়া রহিয়াছে। সুশান্ত সেই চাদর সরাইতে উদ্যত হইয়াছিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল চাদরের নীচে নিশ্চয় কোন মৃতদেহ আছে। সেই দগ্ধপ্রায় মোমবাতিটাই তাহাকে ভয় দেখাইয়া দিল। কিন্তু জোর করিয়া মনে সাহস আনিয়া সে টান মারিয়া চাদরটা খুলিয়া ফেলিল। না, বিছানার উপর কোন মৃতদেহের চিহ্ন নাই।

কি জানি কেন বিয়্যার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। সে তখনো দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া সমানভাবে চীৎকার করিয়া চলিয়াছে। এইবার সকলে বাহিরে ফিরিয়া আসিল। সামনে কিছু দূরেই সেই নদীটা। দুয়ার হইতে নদীর তীর পর্য্যন্ত একটা ঘন বনের মত। তাহারা তখন সেই বনের ডালপালা সরাইয়া নদীর দিকে চলিল। মাত্র কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সকলেই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া পর মুহূর্ত্তে স্থাণুর মত সেইখানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড বীচ্ গাছের গোড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে একটি ভীতিপ্রদ মনুষ্য-কঙ্কাল।

(ক্রমশঃ)

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

[প্রশ্ন শ্রাবণ সংখ্যায় দেখ।]

১। (ক) টিশিয়ান্ কবি ন'ন, চিত্রকর; তিনি আমেরিকার লোক ন'ন—তাঁর বাড়ী ছিল ভেনিসে। 'লাষ্ট্ সাপার' বই নয়, একখানি বিখ্যাত ছবি—সেখানা লিওনার্দ দা ভিঞ্চির আঁকা, টিশিয়ানের আঁকা নয়।

(খ) লুভ্র্ বন্দর নয়, একটি চিত্রশালা; ইটালিতে নয়, প্যারিসে। স্ফিংক্সের মূর্ত্তি আছে মিশরে, লুভ্র্‌এ নয়।

(গ) টেকচাঁদ ঠাকুর নাট্যকার ন'ন—ঔপন্যাসিক। এঁর বিখ্যাত বই "আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" নয়। সেটি কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা—এবং সেটিও নাটক নয়—গদ্য-চিত্র।

২। লিরা—ইটালিয় মুদ্রা বিশেষ। তোড়ী—একটি রাগিনীর নাম। গ্লাইডার—যন্ত্রহীন এরোপ্লেন, উঁচুতে ছেড়ে দিলে আপনা-আপনি বাতাসে ভাসতে ভাসতে উড়তে পারে। ছায়াপথ—আকাশে, বিশেষ করে শরৎকালে, যে একটি আবছা সাদা রংএর আলোর পথ দেখা যায় তারই নাম; আসলে এটি তারাপুঞ্জ। বিগ্ বেন্—লণ্ডনে ওয়েষ্ট মিন্ষ্টার য়্যাবির বিখ্যাত বিরাটকায় ঘড়ি।

গালপাট্টার মিয়াদ

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি

সেদিন শনিবার। মাইনের দশ টাকার পনেরোখানা কড়্‌কড়ে নোট ভরা মণিব্যাগএ পকেট ভর্ত্তি। অফিস ফেরৎ আড্ডা দেবার ইচ্ছেয় ছাতা হাতে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছি। চারিদিক্ থম্‌থমে। শীগ্‌গিরই বৃষ্টি নামবে বোধ হয়। হ্যারিসন রোডের উপর দিয়ে চলছি·· হঠাৎ একটা রেস্তোরাঁয়—ও কে?

বহুদিনবিস্মৃত একখানি মুখের আদল হঠাৎ যেন মনের চোখে ভেসে উঠ্‌ল। থম্‌কে দাঁড়ালাম। ইতস্ততঃ করে ঢুকে পড়া গেল ভিতরে।

"হ্যাল্‌লো—"

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠি।

যা অনুমান করেছিলাম ঠিকই। আমাদের সেই মহাচালিয়াৎ দীনতারণই বটে। ছোকরা দেশবন্ধু ইস্কুলে আমাদের সঙ্গে পড়্‌ত, এবং তখন থেকেই চালবাজীতে ওর ঘুড়ি মেলা ভার ছিল। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য্য ছিল ওর চেহারা। ১৭।১৮ বছরের ছেলে—দেখলে মনে হ'ত ২৬ বছরের জোয়ান। তার উপর আবার দুই গালে ছিল এক যোড়া গালপাট্টা। ইস্কুলের ছেলের গালে গালপাট্টা এ যুগে অসম্ভব হ'লেও তখনকার দিনে একান্ত অশোভন বা অস্বাভাবিক

ছিল না। গালপাট্টার জোরে ইস্কুলে এবং বাইরে ওর প্রতিপত্তি কম ছিল না। তবে আমরা সবাই ওকে ডাকতাম 'গালপাট্টা' বলে, এমন কি আড়ালে মাষ্টার মশাইরাও তাই বলতেন।

দেখলাম, চেহারার আদলটা এখনও তেমনি আছে কিন্তু বাইরের অদল-বদলে আর সহজে ধরবার যো নেই। রং আরও ফর্সা হয়েছে, চুলে খেলছে বাবরী, চোখে উঠেছে পাঁসনে, মুখে সিগ্রেট, আঙুলে আর্টিষ্টিক আংটি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে শান্তিপুরী, পায়ে নাগরাই··· একেবারে ফুলবাবুটি। কিন্তু সেই গালপাট্টার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি,—একটু ঘন এবং কালো হয়েছে এই যা। গালপাট্টা দেখেই ওকে চিনলাম।

আলাপ সুরু হ'ল। না, চালের পরিমাণ কিছুমাত্র কমে নি। বোলচালে এখনও থ' বনে যেতে হয়। লেখাপড়ার দৌড় তো সেই ম্যাট্রিক অবধি। তার পর কোন্ চুলোয় কী করে কাটাচ্ছে কে জানে ?···তবে হ্যাঁ, ইয়ার-বন্ধু অনেক জুটেছে বটে।

সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্যানুষ্ঠান, ফার্ষ্ট এম্পায়ার, নিউ থিয়েটার্স, ইত্যাদি আলাপেই ওরা মশগুল। বোলচালের ফাঁকে ফাঁকে চলছে চা আর চুরুট। কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল আবহাওয়াটা। অথচ পুরোনো ক্লাসফ্রেণ্ড, ধাঁ করে অভদ্রের মত ফেলে উঠতেও পারি নে। ওদের কথার মধ্যে খাপ খাইয়ে ফোড়ন দেব বলে ওৎ পেতে থাকি।

এদিকে ইউরোপের মহাযুদ্ধ পূরোদমে চল্‌ছে। সব জিনিষপত্রের দরদাম বেজায় চড়ে গেছে। বিদেশী জিনিষের দাম তো দুনো হয়ে গেছে। দীনতারণের দলেও স্বভাবতঃ সেই সব আলোচনাই চলছিল। এ বাজারে রয়ে-সয়ে ছাড়তে পারলে যে কোন মালেই নাকি লাল হয়ে যাওয়া যায়।

"আমার যদি ছাড়বার মত কিছু থাকত তো দেখতে আজই"—টেবিল চাপড়ে বলে দীনতারণ; আমার দিকে আড় চোখে তাকায় একবার।

"তা বেশ তো", চট্ করে বলে ওঠে এক ইয়ার, "উপস্থিত তোমার ঐ গালপাট্টাই দাও না ছেড়ে, বাবা! হ্যাঁ—"

হো হো করে ঘরশুদ্ধ লোক হেসে ওঠে। অবশ্য আমিও প্রাণ ভরে যোগ দেই সে হাসির হুল্লোড়ে।

"তা সত্যি", হাসির হর্‌রা থামলে একটু গম্ভীর চালে বলে দীনতারণ, "কেউ যদি আমার এ গালপাট্টা উচিত মূল্য দিয়ে কিনত···যুদ্ধের বাজারে আমি এই দিতাম ঝেড়ে—কী বল ভাই ?" আমার দিকে সমর্থনের আশায় তাকায় সে।

"তা মন্দ কি"—কথার উপরে কথা বলে উঠি আমি, "সুবিধা দরে পেলে তো আমিই কিনি—আহা, এমন গালপাট্টা !"

"কিনবে ? য়্যাঁ—" দীনতারণের আগ্রহাতিশয্যে প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি আমি—"সত্যি ? বেশ, দিচ্ছি আমি সস্তায় ছেড়ে—নাও পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ—ব্যস্। রাজী ?"

দশ বছর আগেকার স্কুলের ছেলেমী আমার মধ্যে হঠাৎ প্রবল বিক্রমে চাড়া দিয়ে উঠল। ওর চালবাজীটা এবার ভাঙ্গতে হবে; কেমন জিদ ধরে গেল। বল্লাম, "বেশ, পঞ্চাশ পঞ্চাশই সই। কিনলাম আমি।"

পকেট থেকে মণিব্যাগ বের করে ভাঁজ করা নোটের তাড়া থেকে গুণে' গুণে' পাঁচখানা আল্‌গা করে টেবিলে রেখে আঙুলে চেপে ধর্‌লাম। ততক্ষণে হাল্কা ভাবটা কেটে গিয়ে সমস্ত রেস্তোরাঁয় জেগেছে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য।

"সত্যি আমি কিন্‌লাম"—দৃঢ়স্বরে বল্‌লাম আমি। "এই রাখ্‌লাম টাকা। লেখ রসিদ।" তখন যে আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ল তাতে জিনিষটাকে তুচ্ছ ক'রে উড়িয়ে দেওয়ার মত সাহস আর কারও হ'ল না। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার বাবুকে সাক্ষী মেনে দীনতারণ আমাকে সত্যিই ষ্ট্যাম্প মেরে রসিদ লিখে দিলে :

"আমি, শ্রীদীনতারণ তলাপাত্র, আমার গালপাট্টার সমস্ত স্বত্বের বিনিময়ে শ্রীগণেশচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে নগদ ৫০৲ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। আমার গালে থাকিলেও এই গালপাট্টার উপর সমস্ত দাবী আজ হইতে উক্ত গণেশচন্দ্র রায়ের। আমি ইহার অযত্ন করিব না, তিনি যতদিন গ্রহণ না করেন ততদিন ইহার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপর থাকিবে। ইতি—

শ্রীদীনতারণ তলাপাত্র।"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। দীনতারণের গালপাট্টা ও গুম্ফ-যুগলের অন্তরালে সয়তানী হাসির ঝিলিক্ খেলে যায়। যে দাড়ি-গোঁফ লোকের পয়সা খরচ করে কামাতে হয়, তাই দিয়ে পয়সা কামানোর অদ্ভুত বুদ্ধিতে সে ঝক্‌মক্ করে।

তার পর হপ্তাখানেক কেটে যায়। ইতিমধ্যে অবশ্য যখনি দীনুর সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হয়েছে ও একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেছে—"কি হে ? তোমার দাড়ি নিচ্ছ নাকি ?"

"হবে হবে।" ওকে এড়িয়ে যাই আমি। "যুদ্ধের বাজার কি না—হেঁ-হেঁ, সবুরে মেওয়া ফলে।" তার পর গম্ভীর সুরে বলি—"দেখ ভাই, দাড়িটার যত্নআত্তি ক'র, যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে। একটু তেল মাখাতে পার না রোজ ?"

অপ্রস্তুত হয়ে হন্ হন্ করে চলে যায় দীনতারণ।

আরও একমাস চলে যায়।

ইতিমধ্যে দীনতারণের দুই গালে আমার সম্পত্তি বেশ বেড়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে দীনতারণ আর দাড়ি ছাঁটতেও পারে না। এক মাসের ওপর ছাঁটাই না হওয়ায় দুই গালে রীতিমত জঙ্গল

গজিয়েছে। এদিকে ওর গালপাট্টা যে একান্তই আমার সম্পত্তি লোকমুখে সারা পাড়ায় সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে ওকে প্রায়ই শুনতে হয়—"ঐ রে, গণেশের গালপাট্টা নিয়ে দীনু তলাই যাচ্ছে; দেখ্‌!"

দীনুর চালিয়াতির গতি একটু মন্দা হয়ে পড়েছে। বেচারা! এই গালপাট্টার জেরটা যে এত দূর গড়াবে ও তা স্বপ্নেও ভাবে নি। দেখা হ'লেই সেই এক প্রশ্ন—"ওহে! তোমার এ জঙ্গল কাঁহাতক্‌ বয়ে বেড়াব আর? এ জঙ্গল দিয়ে কী যে করবে তুমি!" দাড়িটা যদি নিজের দখলে থাকত ইচ্ছামত কেটে ছেঁটে ঠিক করে রাখতে পার্‌ত। পরের বোঝা গালে বয়ে বেড়ান তো সোজা দায়িত্ব নয়!

ইতিমধ্যে সহরে এক উদীয়মান নৃত্যশিল্পী দলের আবির্ভাব হ'ল। দীনুর এ সবে ভারী উৎসাহ। শীগ্‌গিরই ও তিন রাত্রি 'শো'-এর ব্যবস্থা করে ফেল্‌লে। ওর মামা সিনেমা-একটর, দীনুর সেটাই বড় সার্টিফিকেট। কয়েকটি ইয়ার-বন্ধু জুটিয়ে দীনু লেগে গেল বাড়ী বাড়ী টিকিট বিক্রী কর্‌তে। 'গরম বিস্কুটের' মত টিকিট বিক্রী হ'তে লাগ্‌ল। দীনুর ট্যাকেও বেশ কিছু জম্‌ল।

ক'দিন আর দীনুর দেখা পাই নি। ভারী ব্যস্ত। গালপাট্টার কথা হয়তো খেয়ালই নেই ওর। হ্যাণ্ড্‌বিলে নাম ছাপিয়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার বাধিয়েছে, যা হোক্‌।

যে দিন 'শো' সেদিন সকাল বেলা হঠাৎ দেখা এক সুপ্রসিদ্ধ সেলুনে, একেবারে দৈবযোগে। আমিও গেছি চুল ছাঁটতে। ঢুকেই দেখি প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীনতারণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে আমারই গালপাট্টার তোয়াজ করছে। বুঝলাম সময় ঘনিয়েছে। এইবার আমার পালা।

"হ্যাল্লো!"—দীনুকে সচকিত করে সম্বোধন করি। আয়নার মধ্যে আমার প্রতিবিম্ব দেখে দীনু একটু ঘাবড়ে যায়।

"কি হে! গালপাট্টা?"

"ন্‌না—না—" বাধা দিয়ে বলি আমি। "ওর জন্য ব্যস্ত কি? থাক্‌ না।" চুল ছাঁটতে বসে পড়ি আমি নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

"আচ্ছা দাঁড়াও"—দোকানীকে থামিয়ে দীনুকে বলি এবার, "না হয় তুমি ব'স। ও ছাই আজই কামানো হয়ে যাক্‌।"

হঠাৎ এতটুকু হ'য়ে যায় দীনুর মুখটা। আমতা আমতা ক'রে ব'লে ওঠে সে—"না—না, আজ থাক, আজ থাক, এর পর যে কোন একদিন তুমি বলবে, আমি নিজে এসে—"

"উঁহু", আমি দৃঢ়স্বরে বলি—"আমার জিনিষ, আমার যখন ইচ্ছে কেটে নেব। কেমন, এই কথাই ছিল কি না? দাড়ি তোমার গালের হ'তে পারে কিন্তু ওর মালিক আমি।"

"তা ঠিকই; তবে কিনা—" দীনুর স্বরে ভরা একান্ত কাকুতি। "মানে আজকে একটা 'ডান্স পারফরমেন্স' আছে কি না! মানে আমাকেই—"

"মানে টানে কিছু নেই। মোদ্দা আমার গালপাট্টা নিয়ে তোমাকে কেরামতি দেখাতে দিচ্ছি নে আমি, হ্যাঁ, ব'স তুমি।"

দীনু আর কী করে! আস্তে এসে বসে পড়ে চেয়ারে। দেখতে দেখতে ওর দুই গালপাট্টার ওপর ঘন সাদা ফেনার আস্তর পড়ে। হাতের ক্ষুরটা উঠিয়ে কামানো সুরু করবে পরামাণিক, এমন সময়ে হঠাৎ আমার খেয়াল ঘুরে যায়। "হ্যাঁ দেখ, আচ্ছা, আজ না হয় থাক্‌—বেচারা এত করে বলছে যখন!"

"তার মানে? ইয়ার্কি নাকি?"—দীনু রুখে ওঠে। "না হে, লাগাও ক্ষুর—এখুনি। এ তো রীতিমত অপমান—'ডিফামেশ্যন'—"

"রাগ দেখিও অন্য সময়ে। নিজের সম্পত্তি আমি যখন ইচ্ছে তখন কেটে নেব, তোমার কি?"

দীনু একদম ডুবে যায়। তার পর যায় আস্তে আস্তে মুখ ধুতে।

দুপুর বেলা দেখি আমার বাইরের ঘর দীনুর দলের লোকে ভর্ত্তি। ব্যাপার কি! জুলুম করবে নাকি?

"কী ব্যাপার?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"আর ব্যাপার! সেই গালপাট্টা! মানে, এবার ওটা নিয়ে নিন, স্যর! লোকটা নইলে ক্ষেপে যাবে। দাড়ি-ছাড়া তো হোক, তার পর ছাই, নাচের আসরে যাক্‌ কি না যাক্‌!"

বল্‌লাম, "তা আপনারা যখন সবাই বলছেন, বেশ, নেব আমি আজই।"

সন্ধ্যা ৭-১৫তে নৃত্যোৎসব। আমি ওদের ঠিক সাড়ে ছ'টায় হ্যারিসন রোডের সেই রেস্তোরাঁয় হাজির হ'তে অনুরোধ জানালাম।

সাড়ে ছ'টায় সবাই সেখানে উপস্থিত। খবর দিয়ে এক পরামাণিককে সেখানে জোটান গেছে। এইবার জরুরী তলব পাঠান হ'ল শ্রীমান্‌ দীনতারণকে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি, এমন সময় ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকল দীনু। রীতিমত সেজেগুজেই বেরিয়েছে সে—'শো' সুরু হ'তে আর মোটে তিন কোয়ার্টার বাকী। তাকে অন্ততঃ পনেরো মিনিট আগে পৌঁছতেই হবে।

"নাও, ঝট্‌পট্‌ কাজ সারো বাপু! আমার আবার—" বলতে বলতে বাঁ হাতের রিষ্ট্‌ওয়াচের দিকে নজর দেয় দীনু।

"তাই তো। ঠিক্ ঠিক্!" অসম্ভব ব্যস্ততা দেখিয়ে বলি আমি, "ওহে পরামাণিক, নাও, ঝট্‌পট্‌ কর দিকি।"

সাগ্রহে মুখ উঁচিয়ে ধরে দীনু। দেখতে দেখতে ওর বাঁ দিকের গালের জঙ্গল শাণিত ক্ষুরের মুখে সাফ হ'য়ে যায়।

"জল্‌দি কর ভাই, জল্‌দি"—ডান গাল বাড়িয়ে দিয়ে বলে দীনু। আড়চোখে ঘড়িটার দিকে তাকায়। ৬টা ৪৫ মিনিট। "কেন দিক্ কর্‌ছ বাপু? ওর গালপাট্টা ওকে শীগ্‌গির গছিয়ে দিয়ে আমি বাঁচি। আমার আর সময় নেই।"

"আহা, আহা!" বাধা দিয়ে বলে উঠি আমি। "অত ব্যস্ত হবার কি?" তার পর গম্ভীর স্বরে—"তা ছাড়া, তোমার যখন সময় কম, সবাই যখন তোমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন তখন থাক্, ওদিক্‌টা না হয় আর একদিন হবে। এই পরামাণিক, দাঁড়াও।" ধমক দিই আমি উদ্যতহস্ত পরামাণিককে।

এবার উচ্ছ্বসিত হাসির হল্লায় সমস্ত রেস্তোরাঁ ভরে যায়। আয়নার মধ্যে এক গালপাট্টা দেখে দীনুর দু' চোখ তখন ছানাবড়া।

"সে হবে না। যখন বলেছ, সবটাই তোমাকে নিতে হবে—হ্যাঁ, এক্ষুণি।"

"আবার চোট্‌পাট! আমার জিনিষ, আমার যখন যতটা খুসী নেব"—গম্ভীর ভাবে বলি। "সবটা যদি নাই এক সঙ্গে কাটি, আধখানা কামানো দেখতেই যদি আমার ভাল লাগে—তুমি বল্‌বার কে হে? দস্তুরমত লেখাপড়া করে গুণে দাম দিয়েছি।"

দীনু এবার পাগলের মত হয়ে ওঠে। তার গালপাট্টা যে হাসিঠাট্টাকে ছাড়িয়ে উঠবে এ ধারণা তার ছিল না। অগত্যা আমার অনমনীয়তা দেখে সে আপোষ প্রস্তাব করে। ইতিমধ্যে মজার ব্যাপার দেখে রাস্তার অনেক লোক জড় হয়েছে ঘরের ভেতরে।

"আচ্ছা বেশ, তোমার পায়ে ধরি, এটার দাবী তুমি বিক্রী ক'রে দাও—হাঁ, আমাকেই দাও। কত চাই তোমার?"

"তা যুদ্ধের বাজার,"—উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বলি আমি, "মজুদ্ মাল বিক্রী করে কিঞ্চিৎ লাভের আশা তো আমিও রাখি—"

"বেশ তো, দিচ্ছি। কত চাই তোমার?—দশ—বিশ—ত্রিশ—চল্লিশ—পঞ্চাশ—?"

"এইবার না ব্যবসায়ীর মত কথা হ'ল!" আমি আগ্রহের সঙ্গে বলি। "যুদ্ধের বাজারে কিঞ্চিৎ লাভের মতলবেই আমি গালপাট্টা কিনতে পঞ্চাশটি টাকা ঢেলেছিলাম—যথেষ্ট দাম পেলে অবিশ্যি ছেড়ে দেব।"

"বেশ তো! তোমার যথেষ্ট দামের দৌড় কদ্দূর?" অধৈর্য্য হয়ে বলে দীনু।

"কম্‌সে কম এক শ' টাকা, অন্ততঃ—"

"এ—ক—শ'—!" দীনতারণের স্বর কান্নার আবেশে ভারী হয়ে ওঠে।

"একটি আধলা কম নয়—" দৃঢ়স্বরে বলি আমি।

"বেশ, এক শ'—একশ'ই সই। এই নাও।" এই ব'লে দীনু পকেট-ব্যাগ্‌টা থেকে বের ক'রে দশটি নোট গুণে আমার সামনে টেবিলের উপর রাখল। টিকেট বিক্রীর টাকা। তার পর তার গলা শোনা গেল—"এই পরামাণিক, জল্‌দি জল্‌দি।"

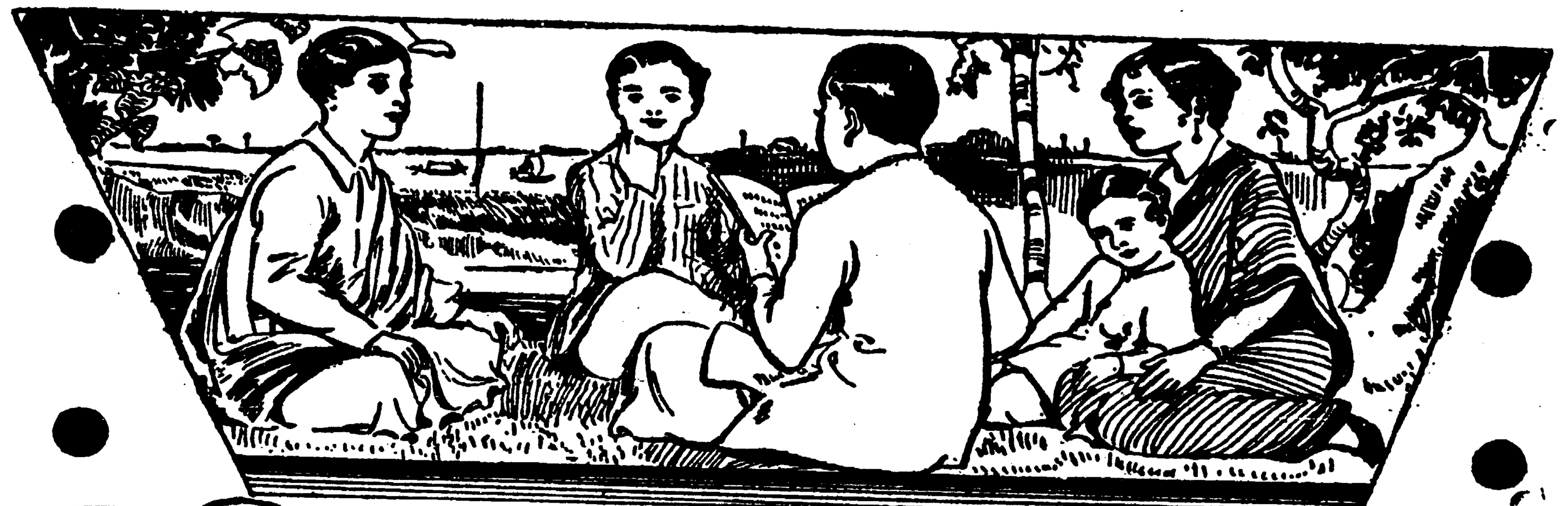

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বৃষ্টি

কুমারী সতী চট্টোপাধ্যায়

ঢাক্‌লো আকাশ কাজল কালো মেঘে,
নাম্‌লো রে ভাই, বিষ্টি এবার নাম্‌লো,
সবুজ গাছে উঠ্‌লো হাওয়া জেগে,
সূয্যিমামার রাগটা বুঝি থাম্‌লো!

বিষ্টি হয়ে ঠাণ্ডা মাটী থেকে
আস্‌ছে ভেসে মিষ্টি ভিজে গন্ধ,
একলা বসে, জান্‌লা খুলে রেখে
শুনছি আমি বিষ্টিধারার ছন্দ।

দুষ্টু মেয়ের নূপুর যেন বাজ্‌ছে,
রিম্‌ঝিম্ ঝিম্—কি মিষ্টি তার শব্দ,
কিংবা কোনো দুঃখী মেয়ে কাঁদ্‌ছে—
শুনছে সবাই হয়ে নীরব স্তব্ধ।

উতল হাওয়া আবার এল ধেয়ে,
চাতক পাখীর কান্না করুণ থাম্‌লো,
নীল্‌চে আকাশ কাল্‌চে মেঘে ছেয়ে
নাম্‌লো রে ভাই, বিষ্টি আবার নাম্‌লো।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স আশী বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে গত ১৭ই শ্রাবণ তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা মিলে এক জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার বড় আদরের সন্তান; বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে কী নিগূঢ় আত্মীয়তায় তিনি বাঁধা তা কে না জানে? অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র, গুরু প্রফুল্লচন্দ্র, রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র, দেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র, সমাজ-সংস্কারক প্রফুল্লচন্দ্র, আর্ত্তত্রাতা প্রফুল্লচন্দ্র, মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র—কোন্‌টার কথা বল্‌ব? দেশকে এমন ভাবে ভালবাসা, দেশের জন্য এমন ক'রে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে—নিঃস্ব ক'রে বিলিয়ে দেওয়া—এর তুলনা কোথায় পাব? প্রফুল্লচন্দ্রের দেশবাসী ব'লে পরিচয় দিতে পেরে আজ নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

আজ এই বিশেষ দিনটিতে বাংলার এই প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কটিকে নমস্কার জানাচ্ছি। এ সংখ্যার মুখপত্রে তাঁর প্রতিকৃতি ধারণ ক'রে "রামধনু" গৌরব বোধ করছে। তোমরা প্রার্থনা ক'র, ঈশ্বর তাঁকে শতায়ু করুন—চিরজীবী করুন।

আষাঢ় মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহক-গ্রাহিকার ভোটে বিষয়গুলি গুণানুসারে এই রকম দাঁড়িয়েছে :—

(১) য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উপন্যাস	(৫) ভূতের গল্প	(৯) বিজ্ঞান	(১৩) কবিতা
(২) য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প	(৬) দেশবিদেশের কথা	(১০) ব্যঙ্গ কবিতা	(১৪) সংবাদ
(৩) হাসির গল্প	(৭) হাসির উপন্যাস	(১১) ইতিহাস	(১৫) প্রবন্ধ
(৪) করুণ গল্প	(৮) ভ্রমণ-কাহিনী	(১২) পৌরাণিক গল্প	(১৬) ছড়া

এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি উত্তর দিয়েছেন শ্রীঅনিলকুমার রায় (কলিকাতা)। তিনিই প্রথম পুরস্কার পাবেন। ২য় পুরস্কার পাবেন কুমারী ইলা সেনগুপ্তা (ঢাকা)। আগামী সংখ্যায় আবার নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা দেওয়া হবে।

সন্দেশ

কল্‌কাতায় ফুটবল্‌ খেলার মরশুম পুরোদমেই চলেছে। লীগ্‌ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, যা বাকী আছে তার ফলাফলের ওপর আর কোন গুরুত্ব নেই। ১ম বিভাগে এবারেও মহমেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন্‌ হয়েছে সে খবর তোমরা পেয়েছ। সম্প্রতি মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গলের ২য় খেলা হয়ে যাবার পর কে রানার্স্‌ আপ্‌ হবে তাও স্থির হয়েছে। ইষ্ট-বেঙ্গল মোহনবাগানকে ২—০ গোলে হারিয়ে রানার্স্‌ আপ্‌ হয়েছে। এই ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে ২য় বারের খেলায় মহমেডান্‌ স্পোর্টিংকেও হার স্বীকার করতে হয়েছে তা তোমরা শুনেছ। অবশ্য শেষ দিকে মহমেডান স্পোর্টিং ডালহৌসীর কাছেও ৩—১ গোলে হেরে গেছে। তবে সে খেলাটি নাকি ৩।৪ মিনিট আগেই শেষ হয়।

লীগ্‌ শেষ হবার আগেই আই-এফ্‌-এ শীল্ডের খেলা সুরু হয়েছে। এবারে ৫৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেক শক্তিশালী দল এসেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ফাইনালে গেছে কে. ও. এস্‌. বি. ও মহমেডান স্পোর্টিং। ফাইনাল খেলা হবে ৩১শে শ্রাবণ। কে. ও. এস্‌. বি. সেমিফাইনালে ওয়েল্‌চ্‌ রেজিমেণ্ট্‌কে ২—০ হারায়। তার আগের রাউণ্ডে মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের প্রবল প্রতিযোগিতা হয়। ২ দিন 'ড্র' হয়ে ৩য় দিনে তারা ১ গোলে জয়লাভ করে। অন্য দিকের সেমিফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং এরিয়ান্সকে ১—০ গোলে হারায়।

গত বারের শীল্ড্‌ বিজয়ী এরিয়ান্সের বরাত এবারেও অনেকটা ভালই ছিল বলতে হবে। ২য় রাউণ্ডেই তারা জলপাইগুড়ির কাছে ২ গোলে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু জলপাইগুড়ি দলের একটি খেলোয়াড় অন্য জায়গার ব'লে আপত্তি তুলে তারা পুনরায় খেলবার সুযোগ পায় এবং এই খেলায় জলপাইগুড়ি দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। ৪র্থ রাউণ্ডে তারা অপ্রত্যাশিত ভাবে লীগের রানার্স্‌ আপ্‌ ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়ে দেয়। মহমেডান স্পোর্টিংকে তেমন কোন শক্তিশালী দলের সঙ্গে যুঝতে হয় নি, এবং কয়েকটি দলকে তারা অত্যন্ত শোচনীয় ভাবেই হারিয়েছে। ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্ট এসোসিয়েশন্‌ তাদের কাছে ১০ গোল খেয়েছে, হাওড়া ডিষ্ট্রীক্ট খেয়েছে ১১ গোল। ৪র্থ রাউণ্ডে ক্যাল্‌কাটা দল তাদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করেছিল। শেষ হবার ১০ মিনিট আগে পর্য্যন্ত ক্যালকাটা বিজয়ী থেকে তার পর ড্র করে। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং আরও ৩ খানি গোল দিয়ে জয়ী হয়।

* * *

সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট প্রেমেন্দ্র সিং ভাগৎ যুদ্ধে বীরত্বের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌ পেয়েছেন। সেনাবিভাগে এটি বড় সহজ সম্মান নয়। এবারকার যুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মান পেলেন।

* * *

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'রামধনু'তে তোমরা পৃথিবীর হাইজাম্পের রেকর্ড্‌ ভাঙ্গার কথা পড়েছিলে। সম্প্রতি সে রেকর্ড্‌ও আবার ভঙ্গ হয়েছে। ভেঙ্গেছেন সেই লেস ষ্ট্রীট্‌। নতুন রেকর্ড্‌ হ'ল ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) কটক, আরা, কালকা। (২) বৈকাল, সিকিম, পাটনা। (৩) চিলকা, গঙ্গা। (৪) সিমলা, পুরী, খুলনা, ঢাকা। (৫) ইটালি, পাবনা, ক্রীট্।

উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন :—

মঞ্জিলকুমার সেন (বহরমপুর); সবিতা রায় (পাটনা); অনিল ও ইলা রায় (নিউদিল্লী); শোভন গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা); সিপ্রা ও রেবা (এলাহাবাদ)।

যাঁদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হয়েছে :—

শান্তি, ভুঁতু, গণেশ, জেম্‌স (গয়া); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); জ্ঞানময়, পতু, শম্ভু (কাঁথি); কালিদাস পাল (বালুভরা); শিবানী বসু (বালীগঞ্জ); রেখা মিত্র (কলিকাতা); সুদর্শন চন্দ্র (কৃষ্ণনগর); সেবাতৃপ্তি সেন (লক্ষ্ণৌ); ভুবন, কালু, গঙ্গা (হুগলী); চন্দ্রা দেবী (মাদ্রাজ); রাবেয়া খাতুন (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীঅসীম রাহা

নীচে দেখতে পাচ্ছ, দু'টো ক'রে কথা, এবং তার মাঝখানে একটা ক'রে শূন্য স্থান। তোমাকে ঐ শূন্য স্থানগুলিতে এমন এক একটি কথা বসাতে হবে যার মানে বা ভাবার্থ হবে তার আগের আর শেষের কথাটি। উদাহরণ: ধাঁধা:—'হাত — খাজনা'। উত্তর :—'কর'। (হাত কর খাজনা)। এমনি ভাবে চেষ্টা কর :—

(১) পংক্তি — ছাতা (২) গন্ধ — কাপড় (৩) মাথা — নাড়ী (৪) প্রাণ — জল (৫) গ্রন্থ — ছাড়া। (৬) বৃক্ষবিশেষ — গাত্রাবরণ (৭) বর্ণ — অনশ্বর (৮) খাদ্যবিশেষ — বাড়ী (৯) অঙ্কুর — যন্ত্র (১০) বংশ — সমূহ।

(সব ক'টার উত্তর পাঠাতে হবে।)

=উপহারের কয়েকখানি সেরা বই=

=পূজোর আগেই বেরোবে=

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকা-কাশির গল্প

কূটবুদ্ধিশালী হুকা-কাশির আরও কয়েকটি বিস্ময়কর রহস্যভেদের কাহিনী

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

ইউরোপের আলো

ছোটদের উপযোগী প্রথম ইউরোপের ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্ এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

সম্বন্ধে **মৌচাক** বলেন :—

"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

—অফুরন্ত ছবি—অফুরন্ত হাসি—

দাম আট আনা

শ্রীঅমলেন্দু সেন প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে **All Bengal Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য)** বলেন :—

"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা—**দাম ১৷০ মাত্র**

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ॥৵০

—বিজ্ঞানের গল্প—

আকাশের গল্প ৸১০

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

আবিষ্কারের গল্প ॥০

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

জন্মদিনের উপহার ॥/০

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ॥৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কল্‌কাতার হালচাল ৸৵০

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ॥০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

হাল্‌কা হাসির খাতা ॥০

নতুন কিছু ... ॥৵০

পুরাতন

বাঁধান রামধনু

১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১৷০

৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই আসে না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

গত ৪০ বছর ধরে লক্ষ্মী ঘি বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতার জন্য লোকের প্রশংসা পেয়ে আসছে।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

ফোন: কলিঃ ৩৬৬০

Cover: C. H. Aran & Co.

কার্য্যালয়

১৬, টাউন্সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি. পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরস্বরূপ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

বাহির হইয়াছে

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

আজই একখানি কিনিতে ভুলিও না।

সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট
দাম মাত্র আট আনা

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ

হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৷৵০

হাস্য ও রহস্য

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ৷৵০

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক
একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায়
হাসি। দাম ৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

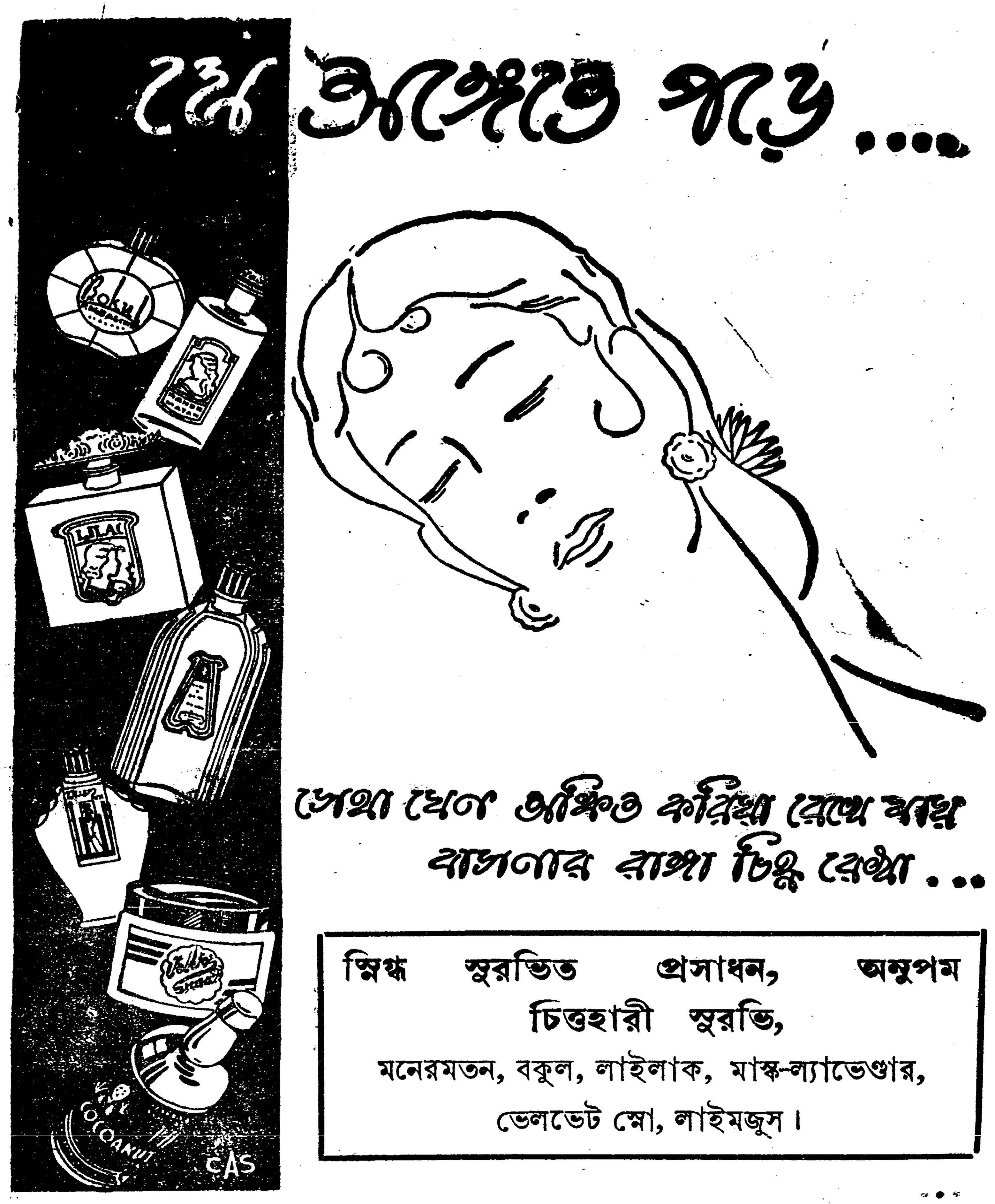

স্নিগ্ধ সুরভিত প্রসাধন, অনুপম চিত্তহারী সুরভি,
মনেরমতন, বকুল, লাইলাক, মাস্ক-ল্যাভেণ্ডার,
ভেলভেট স্নো, লাইমজুস।

পি. এম. বাকচি এণ্ড কোং কলিকাতা

আমাদের প্রকাশিত ছেলেমেয়েদের কয়েকখানা ভাল বই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কাউণ্ট অফ মণ্টে কৃষ্টো (২য় সংস্করণ) ১৲

ডিকেন্‌স'এর গল্প (২য় সংস্করণ) ৷৷৵০

সুমথ নাথ ঘোষ

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স (২য় সংস্করণ) ১৲

ট্রেজার আইল্যাণ্ড .. ৷৷৵০

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ভয় দেখানো ভয়ানক ... ৸০

অমৃত দ্বীপ ... ৷৷০

জেরিনার কণ্ঠহার ১৲

অতিশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত)

২৭শে নভেম্বর ... ৷৷৵০

প্রেমেন্দ্র মিত্র—পৃথিবী ছাড়িয়ে ১৲

বুদ্ধদেব বসু—দস্যুদলের ভোমরা ৸৵০

সুধাংশু দাশগুপ্ত—মায়া দ্বীপ ৷৷৵০

সুধীর রায়—সোনালী পদ্ম ৷৵০

জ্যোতীষ চক্রবর্ত্তী

বহুরূপীর বিপদ ৷৷০

রবীন সেনের—গল্পের বেলুন ৷৷০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

কৃতান্তের দন্তবিকাশ ... ৸০

ফুটবলের দৌড় ৷৵০ মামার জন্মদিন ৷৷০

বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি ৷৷০

নগেন্দ্র দত্ত—কুমড়ো পটাশ ৷৷০

সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

যক্ষপুরী ৸০ আকাশ পথে ৸০

আশ্চর্য্য দেশের ভয়ানক রহস্য ৸০

রাক্ষস মুলুকে সাদা শয়তান ৷৷০

কি ভয়ানক ৷৵০ কাটামুণ্ডের দেশ ৷৵০

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

আদি মানুষ ৷৷০ রেডিও ডাকাত ৷৷৵০

পাগলা মহেশ্বর ৷৷৵০

দিনেশ মুখোপাধ্যায়ের

ছোটদের

রবীন্দ্রনাথ ৷৷০

সুশীলকুমার রায়চৌধুরী

বিজ্ঞান কাহিনী ৸০ বিজ্ঞানের নানাকথা ৸৵০

বিজ্ঞানের পরিচয় ১৲ বিজ্ঞানের খবর ৸০

সুনির্ম্মল বসু

রোমাঞ্চের দেশে ৷৷০

হেম বাগচি—মায়া প্রদীপ ৷৷০

হারান চট্টোপাধ্যায়—ল্যাঙ-রাই আম ৷৵০

রমেশচন্দ্র দাস

পাতাল নগরী ১৲ চম্পা দ্বীপ ১৷৷০

স্ত্রী ভূমিকা বর্জ্জিত ছেলেদের নাটক

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

বীর বালক ৷/০

সীতা (মেয়েদের) ৷৷০ সাবিত্রী (মেয়েদের) ৷৷০

দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত

ভক্তের ভগবান ৷৵০

কেশব সেন প্রণীত

মহারাষ্ট্র গৌরব ৷৵০ দেশের ছেলে ৷৵০

সোনার বাংলা ৷৵০ অভিমন্যু ৷৵০

একলব্য ৷৵০ জয়পতাকা ৷৵০

রাখাল রাজা ৷৵০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্ধুরা বলছে—দিন দিন 'লাভ্‌লি' হচ্ছি।—কেউ বা বলছে 'লাইভ্‌লি', আমি জানি—এ দুটিই সত্য এবং "কুমারেশের" কাজ। তাই "লিভার" খারাপ হলেই আমি সবাইকে "কুমারেশ" খেতে বলি। তুই-ও কিছুদিন ব্যবহার করে দেখ না, নিশ্চয়ই ফল পাবি।

কুমারেশ ও, আর, সি, এল, লিঃ সালকিয়া. হাওড়া

নূতন বই — **সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বই**

সময়োপযোগী বহুবাঞ্ছিত ব্যবহারিক বই!

দেশের ভাবী আশার স্থল—ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী

তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিকল্পনায় লিখেছেন—

ছেলেদের টিফিন

কি খাব মা, কি খাব মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, বাসি ভাত খাও যাদু, ঐ ঢাকা রয়েছে!

কালের গতিতে ছেলেদের ক্ষুধার খোরাক দিতে আজ আর বাসি ভাতের কথাও উঠে না, এখন সেখানে এসেছে দোকানের বাসি খাবার, পচা ডিমের তৈরী কেক বিস্কুট ইত্যাদি! ছেলেদের হাতেই টিফিনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর দিনে-ডাকাতির সুযোগ দিয়েছি। এরই প্রতিকারকল্পে প্রাণশক্তিসম্পন্ন বহু বহু রুচিকর খাদ্য দেশীয় প্রথায় কত সহজে ও সুবিধায় বাড়ীতে তৈরী করা যায়, লেখিকা **তাদের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী** এই গ্রন্থে প্রকাশ ক'রে ছেলেদের—তথা আমাদেরও সাংসারিক জলযোগের খাদ্যধারার গতির মোড় ফিরিয়ে একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন।

দু'শো পাতার বই। চমৎকার ছাপা ও বাঁধাই। দাম—১৲

প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা রাখা এবং প্রত্যেক মায়ের পড়া উচিত।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বি, বি, ৩৮৭৫

নূতন বই! **নূতন বই!!**

শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য্য এম্-এ প্রণীত

দেবতার ক্ষুধা ॥৵০

আফ্রিকার এক অনাবিষ্কৃত প্রদেশের অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে এরূপ বই ইতিপূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই।

শ্রীবিমল দত্ত এম্-এ প্রণীত

স্কটের গল্প ১৲

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার্ ওয়াল্টার স্কটের কয়েকটী প্রসিদ্ধ উপন্যাসের গল্প।

লাফিং গ্যাস্ ॥০ — জঙ্গলের রাজা ॥০

রত্নখনির বিভীষিকা ১৲

পিরামিডের গুপ্তধন ৸০

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ॥৵০

শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত

ইকড়ি মিকড়ি (হাসির গল্প) ॥৵০

কাতুকুতু ॥০ — মজাদার ।৵০

টাক্‌ড়ুমাড়ুম ।/০ — কালোমানিক ।/০

চারু-সাহিত্য-কুটীর ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিঃ

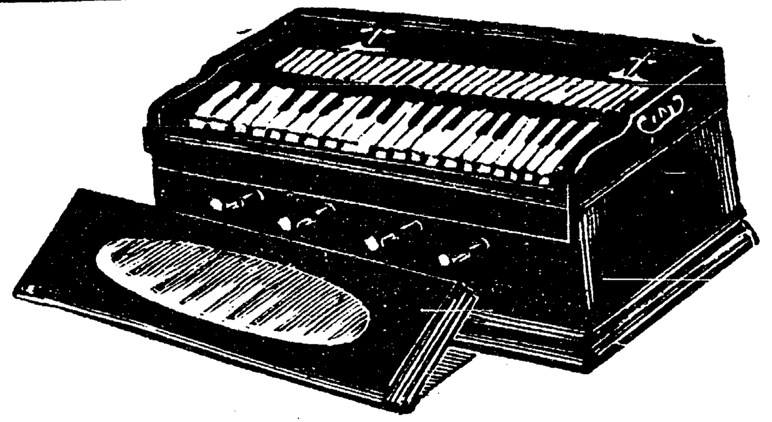

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং'র

হারমোনিয়মই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে

আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং

৬।১।১, রসা রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বাহির হইল! বাহির হইল!

বার্ষিক শিশুসাথী পূজার উৎসবে ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার!

বার্ষিক শিশুসাথী গত পনের বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী শিশুদের পূজার আমোদ পূর্ণ করিয়াছে—এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

মূল্য ১৵০ মাশুল স্বতন্ত্র

গল্প—কবিতা—বিজ্ঞানের কথা—দেশ-বিদেশের কথা—জীবনী—ভ্রমণ-কাহিনী—শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি এবং রাশি রাশি একবর্ণ ও বহুবর্ণ ছবিতে

বার্ষিক শিশুসাথী অতুলনীয়!

মূল্য ১৵০ মাশুল স্বতন্ত্র

সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন:

ডক্টর **শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য**, এম. এ., বি. টি., পি-এইচ. ডি., সরস্বতী

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

বিজ্ঞানের মায়াপুরী

বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণ-কৌশল গল্পের মতই সরস। বহু ছবিতে পূর্ণ—রঙিন মলাটে বাঁধাই।

মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা প্রণীত

বনে-জঙ্গলে

আফ্রিকার জঙ্গলে নানা রকম হিংস্র জানোয়ার-শিকারের কাহিনী। পাতায় পাতায় ছবি; মনোরম মলাটে বাঁধাই।

মূল্য ১৲ টাকা

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা — ৩৮নং জন্‌সন্ রোড্, ঢাকা

পূজার উপহারের নূতন নূতন বই!

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

সাতসমুদ্র তেরনদীর পাড়ে

সরস রূপ-কথার বই। সুন্দর সুন্দর ছবিতে সমুজ্জ্বল—বহুবর্ণে চিত্রিত মলাটে বাঁধাই। মূল্য ।৵০ আনা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সুন্দরবনে

গল্পের মধ্য দিয়া সুন্দরবন অঞ্চলের সরস ও সচিত্র কাহিনী। মূল্য ॥০ আনা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত

রাজা সীতারাম

স্ত্রী-চরিত্র-বর্জ্জিত ছোটদের নাটক। বাঙ্গলার বারভূঞার অন্যতম বীর সীতারামের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী।

মূল্য ॥০ আনা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা প্রণীত

ছোটদের জাতকের গল্প

জাতকের কয়েকটি গল্প ছোটদের জন্য লেখা। ভাষার লালিত্যে, চিত্র-বাহুল্যে ও মলাটের সৌষ্ঠবে বইখানি সকলেরই আদরণীয়।

মূল্য ॥৵০ আনা

ঃ কয়েকখানি ভাল ভাল গল্পের বই ঃ

ছুটির গল্প…॥০	মজার গল্প…॥৵০	বাঙ্গালীর গল্প…৸০
পাঁচমিশালী গল্প…॥০	বিজ্ঞানের গল্প ৸০	গোপাল ভাঁড়ের গল্প…॥০
পৌরাণিক গল্প (১ম) ॥০	সাতরাজ্যের গল্প ॥০	পৌরাণিক গল্প (২য়)…॥০
রাজতরঙ্গিণীর গল্প…॥০	কথাসরিৎসাগরের গল্প…১৲	ছোটদের বেতালের গল্প…১০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

মেরু-অভিযান

দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের সচিত্র কাহিনী—গল্পের মত সরস।

মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীবরদাকুমার পাল প্রণীত

পরশমণি

যুক্তাক্ষর ছাড়া ছোট ছোট কথায় লেখা ছড়া ও হাসির গল্পে পূর্ণ। বড় অক্ষরে ছাপা। সুন্দর সুন্দর ছবি। মূল্য ।৵০

শ্রীবিনয় দত্ত প্রণীত

বিচিত্র দেশ

নিগ্রো, মাওরী, এস্কিমো প্রভৃতি জাতির সরস ও সচিত্র কাহিনী। মূল্য ॥৵০

* পত্র লিখিলে **উপহার পুস্তকের তালিকা** প্রেরিত হয় *

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা — ৩৮নং জন্‌সন রোড, ঢাকা

-পূজায় ছেলেমেয়েদের উপহারের বই-

"র‍্যালে ও ড্রেকের অভিযান" "রাক্ষুসে আফ্রিকা" প্রভৃতি—

প্রণেতা—প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রহস্যের ইন্দ্রজাল—॥০

নূতন ধরণের ছোটদের রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস—সত্যসত্যই কিশোর সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে। গোয়েন্দা (এ্যামেচার) অজিত সেনের জীবন-মরণ পণ করা অভিযান—সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের রুদ্ধ নিঃশ্বাস পাঠকের মনেও জীবন-মৃত্যুর দোলা দেয়। একবার হাতে পড়লে শেষ না করে কিছুতেই উঠতে পারা যায় না। সমস্ত ছবিগুলিই এঁকেছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীসমর দে। ছবি ছাপা অতি চমৎকার।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের

আসামের জঙ্গলে—॥০

খগেন বাবুর লেখার সঙ্গে পরিচয় নাই এমন পাঠক খুব কমই আছে। খগেন বাবু বাংলার ছোট বড় প্রত্যেকেরই মন জয় করেছেন। আসামের জঙ্গলের অভিযানের কাহিনী অতি সুন্দর ভাবে এই বইখানিতে বর্ণিত হয়েছে। বইখানিকে অনায়াসেই খগেন বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যেতে পারে। পড়তে পড়তে মন তন্ময় হয়ে যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

এ যুগের দৈত্য

নব কলেবরে নূতন সজ্জায় শিশু-সাহিত্যের আসরে হানা দিয়েছে। দাম মাত্র ছয় আনা

এন্‌, এল্‌, পাল এণ্ড্‌ কোং

ফুলিস্কেপ কাগজ, খাতা এবং বই বিক্রেতা ২০৩।২,এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

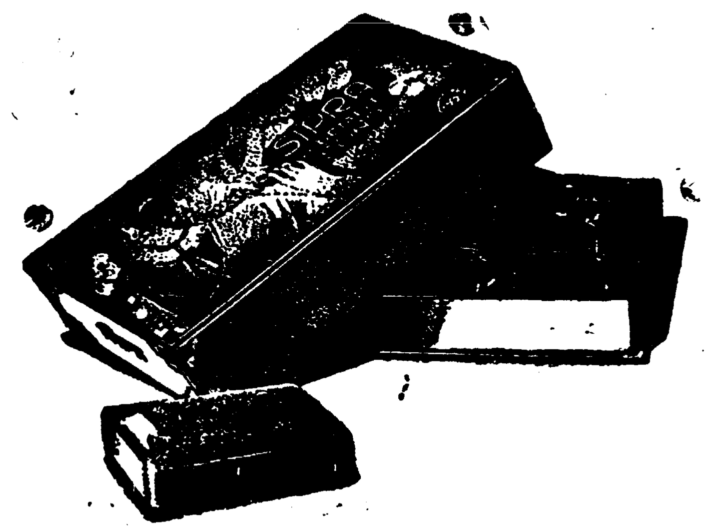

* প্রচুর ফেন

* স্নেহময় স্পর্শ

* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

আমাদের অতুলনীয় শিশুসাহিত্য!

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর নতুন বই

আমার ভূত দেখা!

শিবরামবাবুর কলমে প্রথম ভূতের গল্প—ভয়াবহ অবশ্যই—তা বলে' হাসির কিছু কম নয় কিন্তু! তবে হাসির চোটে ছেলেমেয়েদের ভূতের ভয় কেটে যাবার ভয় আছে।... উপহার দেবার উপযোগী করে' মূল্যবান্‌ কাগজে রঙীন্‌ কালির ছাপা—শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা অজস্র মজারু ছবি!

—দাম আট আনা মাত্র—

বাবুম্‌ বুবুম্‌ বুম্‌!

(ভয়ঙ্কর ভারী যুদ্ধের গল্প)

যুদ্ধে গেলে মানুষ খুন্‌ হয়, যুদ্ধে না গিয়েও কেবল হেসে খুন্‌ হবার জন্যে এ-বই! হর্ষবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধনের এবার দু'নম্বরের যুদ্ধযাত্রা! কাণ্ডখানা একবার ভাবো!... দামী আইভরি ফিনিশে রঙীন্‌ কালিতে ছাপা—শ্রীশৈলর আঁকা অসংখ্য কার্টুন!

—দাম আট আনা মাত্র—

—শিবরাম বাবুর আরেকখানি জনপ্রিয় বই—

হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি!

প্রথম সংস্করণের বাইশ শো কপির দেড় হাজারেরও বেশি এক বছরের মধ্যে কেটে গেছে—এই একটি কথাই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় কি? পুরু কাগজে চমৎকার ছাপা—চমকপ্রদ প্রচ্ছদ—শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা অজস্র হাসির কার্টুন। —দাম আট আনা মাত্র।

শিশু-সাহিত্য সিরিজের অভিনব উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

মেম সাহেব ॥০

শশধর দত্তের

মানুষ ধরার দেশে ॥০

জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

মরণ যেথায় পদে পদে ॥০

কেশবচন্দ্র গুপ্তের

মণি-কল্যাণ ॥০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

তিন চোর ॥০

লালা সাহেব ॥০

অনেক দূরে ১৲

ইতিহাসে নেই ॥০

প্রকাশক—ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস্‌ ৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের শিশুপাঠ্য পুস্তক

ছড়া ও ছবি
৭ম সংস্করণ—তিন আনা

ছবির বই
১৮শ সংস্করণ—চার আনা

নূতন ছবি
১৩শ সংস্করণ—চার আনা

মজার গল্প
১৬শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

আষাঢ়ে স্বপ্ন
১৪শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

খেলার সাথী
১৬শ সংস্করণ—পাঁচ আনা

খেলার গান
৪র্থ সংস্করণ—ছয় আনা

রাঙা ছবি
২১শ সংস্করণ—ছয় আনা

হিজিবিজি
৮ম সংস্করণ—ছয় আনা

হাসি খুসি
১ম ভাগ
৩৯শ সংস্করণ—মূল্য ।/০ আনা

—০—

হাসি খুসি
২য় ভাগ
২১শ সংস্করণ—মূল্য ।৵০ আনা
'বর্ণমালা' ও 'সংযুক্তবর্ণ' শিখাইবার এমন **সহজ, সুন্দর** অথচ **'বিজ্ঞান-সম্মত'** পদ্ধতি আর কোনও বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। অসংখ্য ভাল ভাল চিত্রে সুশোভিত।

—০—

শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী
এখানি ছোট-বড় সকলেরই আনন্দ-ভাণ্ডার। অসংখ্য চিত্রে সুশোভিত প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠার বই—মূল্য পাঁচ টাকা।

ছড়া ও পড়া
৪র্থ সংস্করণ—আট আনা

মোহনলাল
ছেলেদের উপন্যাস—॥০ আনা

হাসিরাশি
১৯শ সংস্করণ—দশ আনা

হাসি ও খেলা
১৬শ সংস্করণ—দশ আনা

হাসির গল্প
৭ম সংস্করণ—দশ আনা

ছবি ও গল্প
১৫শ সংস্করণ—এক টাকা

খুকুমণির ছড়া
১০ম সংস্করণ—এক টাকা

জানোয়ারের কাণ্ড
২য় সংস্করণ—এক টাকা

ছোটদের চিড়িয়াখানা
৩য় সংস্করণ—এক টাকা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

আগমনী **আগমনী** আগমনী

ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছড়া ও গল্পের এমন সুন্দর সংগ্রহ-পুস্তক বাংলাতে অতি অল্পই আছে। পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার। সুন্দর চিত্র শোভিত—মূল্য ১।০ আনা।

সিটি বুক্ সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বহু চিত্র সুশোভিত] যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত [মূল্য ১৷৹ আনা

গল্প-সঞ্চয়

রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা সমন্বিত

যাঁহার 'হাসিখুসি' গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া খেলাচ্ছলে ঘরে ঘরে অ, আ, ক, খ শিখাইয়াছে, যাঁহার **'খুকুমণির ছড়া', 'হাসিরাশি'** প্রভৃতি পড়িয়া লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে ও তাহাদের মা-বাপেরা ছড়া ও গল্পের সঙ্গে প্রথম পরিচিত, শিশুদের সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু, **যোগীন্দ্রনাথ সরকার-মহাশয়** রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বিখ্যাত গল্প-লেখকদের অবধি প্রায় ত্রিশটি উৎকৃষ্ট গল্প সংগ্রহ করিয়া শিশুদের হাতে এই বইখানি উপহার দিয়া গিয়াছেন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের

২০শ সংস্করণ মূল্য আট আনা **ছোটদের রামায়ণ** ২০শ সংস্করণ মূল্য আট আনা

১৬শ সংস্করণ মূল্য এক টাকা **ছোটদের মহাভারত** ১৬শ সংস্করণ মূল্য এক টাকা

রবীন্দ্রনাথ বলেন—'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' যদি বাঙ্গালী-ছেলেমেয়েরা না পড়ে, তবে তার চেয়ে শোচনীয় অশিক্ষা তাদের পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না। সেই পড়্‌বার পথ যোগীন্দ্রবাবু মনোরম করেছেন। এই বই দুইখানি ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার মাধুর্য্যে ও ছাপার সৌন্দর্য্যে ছেলে-বুড়ো সকলকেই মুগ্ধ করিবে।

চতুর্থ সংস্করণ মূল্য দুই টাকা **বনেজঙ্গলে** চতুর্থ সংস্করণ মূল্য দুই টাকা

এরূপ সুবিস্তৃত লোমহর্ষণ শিকার-কাহিনী বঙ্গ-সাহিত্যে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। ছোট বড়—সকলেই একবাক্যে বইখানির প্রশংসা করিয়াছেন। বহু সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্রে সুরঞ্জিত। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। উপহারের এমন বই আর নাই।

সিটি বুক্ সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই বই ক'খানিই সাহিত্যে নবযুগ এনেছে—

শ্রীযোগেশ বাগল প্রণীত ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভূমিকাসম্বলিত

"মুক্তির সন্ধানে ভারত" —১৲

বা ভারতের নব জাগরণের ইতিবৃত্ত

মূল্য—২॥০ টাকা মাত্র

(এতে আছে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গত দেড় শত বৎসরের নিখুঁত ইতিহাস)

সাহসীর জয়যাত্রা (৩য় সং) —১৲

জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের জীবন-চরিত

জগৎ কোন্ পথে ? (২য় সং) —১৲

জগতের রাষ্ট্রগত অবস্থা সংক্ষেপে তথ্যপূর্ণ, ঘটনাবলীপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

এবার পূজায় — এই ক'খানি বই-ই — এবার পূজায়

ছেলেমেয়েরা আগে পড়বে

শ্রীবীরেন দাস

খেলাঘর

মূল্য—॥০

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

স্বর্গের দেবতা

মূল্য—॥৵০

হেমেন্দ্র রায়—**অদৃশ্য মানুষ**
সৌরীন্দ্র মুখার্জ্জী—**নিঝুম পুরী**
খগেন্দ্র মিত্র—**অজানা দেশের পথে**
সুনির্ম্মল বসু—**অসম্ভব দুনিয়ায়**
খগেন্দ্র মিত্র—**সৈনিকের ডায়েরী**
সতীশ গুহ—**গল্পে ভাগবত**
কেশব সেন—**কেদার রায়** (শিশু নাটক)
গৌরগোপাল—**মহারণ** (") পৌরাণিক

আরও অনেক, পত্র লিখুন,

এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

১২, নারকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া
দুর্ব্বল শিশুরা
অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—॥৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের বাড়ী ফাটিয়ে হাস্‌তে দিন্ !

আস্তে আস্তে তারা বড়ো হোক্, ক্ষতি নেই—কিন্তু হাসতে হাসতেই তারা বড়ো হোক্ !

—আমাদের প্রকাশিত তুমুল হাসির এই সব বই—

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু—লিখিত

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—৷৵০

শৈল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিচিত্রিত

শ্রীবুদ্ধদেব বসু—লিখিত

পথের রাত্রি—৷৵০

এক পেয়ালা চা—৷৵০

গল্প ঠাকুরদা—৷৵০

সচিত্র বিরাট চিরনূতন গল্পসঞ্চয়নী

আবৃত্তি

প্রায় সকল বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকগণের মৌলিক সব রকম গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, কার্টুন ছবি প্রভৃতির বিরাট সঞ্চয়ন, ৪৫০ পৃষ্ঠা।

মূল্য এক টাকা চারি আনা

—শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা—

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর সহযোগে

জীবনের সাফল্য—৷৵০

মণ্টুর মাষ্টার

(২য় সংস্করণ—৷৵০)

ধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারীর সহযোগে

রোমাঞ্চকর য়্যাড্‌ভেঞ্চার—৷৵০

এ-সব ক-খানি বইয়েই শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা অসংখ্য মজার ছবি !

এই মাসেই বাহির হইবে

প্রবোধকুমার সান্যালের

সত্যি বলছি

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

মানুষের উপকার কর

—এ-ছাড়া আমাদের প্রকাশিত আর সব ভালো ভালো বই—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আজব দেশে অমলা (Alice in wonderland)—৷৷০

মানুষ-পিশাচ—৸০ মড়ার মৃত্যু—৷৵০

ছায়াকায়ার মায়াপুরে—৷৵০

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

কালগ্রাসে কালযবন—৷০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দুর্গম পথে—৷৵০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

লালন ফকিরের ভিটে—৷৵০

গুজবের জন্ম—৷৵০

আদিম দ্বীপে—৷৵০

শ্রীসুকুমার দে সরকার

অরণ্য-রহস্য—৷৵০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ব্যোমদাসের মাদুলি—৷৵০

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রাজার ছেলে—৷৵০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

বীরবাহুর বনিয়াদী চাল—৷৵০

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কল্পলোকের কথা—৷০

কবি বন্দে আলি মিঞা

তিন আজগুবি—৷৵০

প্রাপ্তিস্থান :—ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কয়েকখানি নূতন বই যা পড়ে মানুষ হবে

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত

লা' মিজারেবল

দাম—বার আনা

শেক্‌সপীয়ারের ট্র্যাজেডী

দাম—এক টাকা

শেক্‌সপীয়ারের কমেডী

দাম—এক টাকা

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু কর্ত্তৃক অনূদিত

এন্‌ডারসেনের গল্প

দাম—পাঁচ সিকা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক অনূদিত,

লাষ্ট ডেজ অফ পম্পেই

দাম—এক টাকা

হান্‌চব্যাক অফ নতর-দাম

দাম—এক টাকা

আঙ্কল টম্‌স কেবিন

দাম—এক টাকা

বেন হুর

দাম—পাঁচ সিকা

টলষ্টয়ের ছোটদের গল্প

দাম—এক টাকা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের

সপ্তর্ষি

(সাতজন বৈজ্ঞানিকের চরিতকথা ও আবিষ্কার)

দাম—দশ আনা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের

মার্কিন জাতির কর্ম্মবীর

দাম—এক টাকা

শ্রীঅখিল নিয়োগীর

ছেলেদের একাঙ্কিকা

দাম—এক টাকা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেবারের বীর তনয়

দাম—এক টাকা

নূতন যুগের নূতন মানুষ

(বিশ্ববিখ্যাত দশজন রাজনীতিজ্ঞের জীবনী)

দাম—এক টাকা

বিজ্ঞানের আবিষ্কার

দাম—এক টাকা

মজার গল্প

দাম—আট আনা

রুশ জাতির কর্ম্মবীর

(লেনিন হ'তে অনেক রুশ নেতার জীবনী)

দাম—এক টাকা

ইউ, এন, ধর এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দেব সাহিত্য-কুটীরের বহু প্রত্যাশিত পূজা-বার্ষিকী—

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনায়

অন্যান্য বছরের মত গল্প, নানাবিধ প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, ঐতিহাসিক-কাহিনী, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী—এ ছাড়া একটি উপন্যাস ও রাশি রাশি রং বেরঙ্গের চিত্র সুসমৃদ্ধ হইয়া

ভাদ্রের শেষ ভাগে বাহির হইবে। মূল্য ১৸০ টাকা

কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। অন্ধকারের বন্ধু

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২। ছিন্নমস্তার মন্দির

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। বিজয় অভিযান

—পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে—

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত পঞ্চম গ্রন্থ—নিবিড় রহস্য-ঘেরা ভয়ঙ্কর অথচ বিচিত্র কাহিনী

৫। ছায়া কালো-কালো

প্রত্যেকটির মূল্য—আট আনা

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ছোটদের প্রাণ ভ'রে হাসতে দিন

মনে রাখবেন
ছোটদের মুখে হাসি আনতে হ'লে
সকলের আগে চাই

ভীম নাগের সন্দেশ

ভীম নাগের সন্দেশ বাংলার গৌরব।
এর অভাবে কোন আনন্দোৎসবই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে না।

সেই সঙ্গে মনে রাখবেন
দূরের প্রিয়জনকে পূজায় উপহার পাঠাতে হ'লে
ভীম নাগের

বায়ুশূন্য টিনে ভরা রসগোল্লা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট

কারণ যে যাই বলুক, রসনার আনন্দই হচ্ছে সব চেয়ে বড় আনন্দ।
এ রসগোল্লা শুধু সুস্বাদু নয়, এগুলি দীর্ঘদিনেও নষ্ট হয় না।

ভীম নাগ—কলিকাতা

নগদ ১০,০০০ টাকা পুরস্কার

"লক্ষ্মী" এবং "সিদ্ধ বশীকরণ" কবচ

এই কবচ সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত :—নিউদিল্লী হইতে মিঃ প্রেম লিখিতেছেন (১৫।৪।৪১) আপনার কবচ আমার যথেষ্ট ভাল করিয়াছে। আমি সন্তুষ্ট। এখন আপনার ৫নং অতি শক্তিমান্‌টি, যাহার দাম ৭।৴০, যাহাতে একবারে চার ইপ্সিত বস্তুলাভ হয়, পরীক্ষা করিতে চাই। সত্বর পাঠাইবেন।

সিদ্ধ বশীকরণ কবচ—আপনার প্রিয় যে কেউ—পুরুষ বা স্ত্রীলোক, বন্ধু বা শত্রু আপনার প্রতি যতই বিরূপ হউন্ না কেন, আপনার বশ হইবেন ও ভালবাসিবেন। মূল্য—সোনার ৫৸৶০, রূপার ২৸০, তামার ১৸৶০ (৩টি ৫৲)

লক্ষ্মী কবচ—ধনলাভেচ্ছুরা পরীক্ষা করুন। ইহা গ্রহের মন্দ প্রকোপ দূর করিয়া সৌভাগ্য আনে। সংক্ষেপে ইহাতে ধারণকারীর ব্যবসায়ে লাভ, লটারীতে সাফল্য, শত্রু জয়, পরীক্ষা ও মোকদ্দমায় সাফল্য, চাকুরীলাভ ও নানাকার্য্য সাধিত হয়। সন্তানকামীরা ২টি লইবেন। একটি পুরুষের, একটি স্ত্রীর জন্য। মূল্য—তামার ১৸৶০ (৩টি ৫৲), রূপার ২৸০, সোনার ৫৸৶০। ১টিতে ৪টি ইপ্সিত বস্তু পাইতে হইলে আমাদের ৫নং অতি শক্তিমান্ কবচ, দাম ৭।৴০, চাহিবেন। যাঁহাদের স্ত্রীর সন্তান জন্মের পূর্ব্বে বা অল্প বয়সে মারা যায় তাঁহারা ৩নং কবচ, দাম ১১৲, চাহিবেন।

দ্রষ্টব্য—(১) যিনি উপরোক্ত দাবী অসত্য প্রমাণ করিতে পারিবেন তিনি ১০,০০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। কবচ ব্যর্থ হইলে টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে। (২) এই কবচ ব্যবহারে কোনরূপ নিয়ম পালন লাগে না, কোনরূপ ক্লেশকর ব্যাপার সহিতে হয় না।

ঠিকানা :—**আনন্দস্বামী, আনন্দ কুটি**—পি. বি. ৬১ (ডি ১৫৫৯) লাহোর (ভারতবর্ষ)

সঙ্গীতযন্ত্র কিনিতে হইলে ডোয়ার্কিনেই কিনিবেন

উহাই আপনাকে যথার্থ সন্তোষ দিতে পারিবে

৫৩ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮৮) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রস্তুত একটি হারমোনিয়ম পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছিলেন :—"আপনাদের ডোয়ার্কিন ফ্লুট" পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহার হাপর অতি সহজেই চালান যায়। ইহার স্বর প্রবল এবং সুমিষ্ট। ইহাতে অল্পের মধ্যে সকল প্রকার সুবিধাই আছে। দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষে আপনাদের এই যন্ত্র যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই যন্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি, আমাকে ইহার মূল্য লিখিয়া পাঠাইবেন।

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি-গীতিমালা, ২য় খণ্ড, ৺জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর বয়সের গান, তাঁহারই প্রদত্ত সুর, মূল্য ২৲ টাকা।

বিলাতী বেহালা, ছড়ি, বাক্স ও প্রাথমিক শিক্ষা পুস্তক সহ ... ৩০৲

DWARKIN AND SON, LTD., 11, Esplanade, Calcutta.

বিনা মূল্যে

মাসে ৬৭৫৲ টাকা উপার্জ্জন করুন

আপনি যদি সত্যি সত্যি মাসে ৬৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে চান তবে আমাদের আসল **আমেরিকান্ নিউ গোল্ড**এর এজেন্সী লউন। এই সোনায় কষ্টিপাথরে আসল সোনার মতই দাগ পড়ে, এবং আসল সোনার মতই ইহাকে পিটাইয়া পাতে কিংবা টানিয়া তারে পরিণত করা যায়। ইহার রং কখনও বদলায় না। আমাদের সোনায় প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার আমাদের কাছে পাওয়া যায়। নমুনার জন্য চার তোলা আমেরিকান্ নিউ গোল্ড, এক জোড়া সৌখীন ব্যাঙ্গল্‌স, এক জোড়া ইয়ারিং এবং একটি বোম্বাই ফ্যাশনের আংটি পাঠান হইবে। উৎসাহশীল এবং প্রতিপত্তিশালী এজেন্টগণ সব রকম সুবিধা পাইবেন।

বিনা মূল্যে—অলঙ্কারের সম্পূর্ণ তালিকা এবং এজেন্সী লইবার নিয়মাবলী বিনামূল্যে পাঠান হয়। আজই পত্র লিখুন।

আমেরিকান্ নিউ গোল্ড কোম্পানী

পোষ্ট বক্স নং ৬১ (ডি ১৫৫৯) লাহোর (ভারতবর্ষ)

American New Gold Company

Post box No. 61 (D1559) Lahore (India)

—আমাদের ছেলেমেয়েদের নূতন বই—

কুমড়োপটাস—নগেন্দ্রনাথ দত্ত—তোমাদের পরিচিত জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাহিনী নিয়ে লেখা।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথায় ভরা।

রাতের বিভীষিকা—ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়—রাতে যারা ভয় দেখায়—তাদের কথায় ভরা।

হরেক রকম - সরোজকুমার রায় চৌধুরী—বইখানা শিশুচিত্তের খোরাকে ভরপুর।

বিজ্ঞানের অ, আ—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলি গল্পের ছাঁচে লেখা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন ?—খগেন্দ্রনাথ মিত্র—সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই।

জাতকমালিকা—কালিদাস রায়—গৌতমের গতজন্মের কথা।

দুর্গমপথের যাত্রী—ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী—আবিষ্কার ও ভৌগোলিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

যা সকলে চায়—সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়—ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

এ, এন, ব্যানার্জ্জি

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

আর, এন, দাস রোড, ঢাকুরিয়া দক্ষিণ কলিকাতা।

...য়ের কয়েকখানি সেরা বই

শ্রীঅমলেন্দু সেন প্রণীত

অনুসন্ধানী

সম্বন্ধে **All Bengal Teachers' Journal (শিক্ষা ও সাহিত্য)** বলেন :—
"সাধারণ জ্ঞানের বই। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"
প্রায় পৌণে চারিশত পৃষ্ঠা—**দাম ১৷৷০ মাত্র**

রামধনুর প্রথম সম্পাদক
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

দিগিজয়ী বীর

মহাবীর আলেকজান্দারের বৈচিত্র্যময় জীবন-কথা
নূতন সুদৃশ্য রঙ্গিন বাঁধান মলাট, অজস্র ছবি। উপহারের নিখুঁত বই। **দাম—৷৷০**

ডক্টর সুশীলচন্দ্র মিত্রের
বৈজ্ঞানিক ভোজ ... ৷০

শ্রীনির্ম্মলা দেবীর
ঠাকুরমার মহাভারত ৮০

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের
হিটলারের শত্রু ... ১

পুরাতন
বাঁধান রামধনু
১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১৷৷০
৭ম—১৩শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২৷৷৵০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৷৷৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কল্‌কাতার হালচাল ৸৵০
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৷৷০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হাল্‌কা হাসির খাতা ৷৷০
নতুন কিছু ... ৷৷৵০

শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সেনের
চোরের মেয়ে ... ৷৷৵০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
গল্পসল্প (২য় সং) ... ৶১০
ছুটীর গল্প ... ৶১০

শ্রীমাঠব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার
আজব গল্প ... ৷০
অনেক গল্প ... ৷০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং ... ৷৷০

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দাশগুপ্তের
দুরন্ত ... ৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

[illegible]

১৯২।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"শারদীয়ার উপহার"

১। গল্পে চিত্তরঞ্জন—(জীবনী) মূল্য—॥০ আনা
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

২। সিরাজদ্দৌলা—(নাটক) মূল্য—।৵০ আনা
প্রবোধ সরকার

৩। ভারত-বীর—(নাটক) মূল্য—।৵০ আনা
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মাইতি

৪। হিটলারের শত্রু—(যুদ্ধ উপন্যাস) মূল্য—১৲ টাকা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

৫। কুয়ো-ভেডিস্—(অনুবাদ উপন্যাস) মূল্য—॥০ আনা
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

আলেকজান্দার ডুমার অমর লেখনী-প্রসূত
দি ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্কের অনুবাদ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত
শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

ছোটদের উপযোগী ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী

অমলশঙ্কর রায়ের

ইউরোপের আলো

—বাংলায় ছোটদের জন্য লেখা এ ধরণের বই বোধ হয় এই-ই প্রথম—

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, সুইট্জারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে লেখক যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারই কাহিনী সরস, গল্পের মত ভাষায় লেখা। পড়বার—জানবার—উপভোগ করবার মত বই।

পুরু এণ্টিক কাগজে সুদৃশ্য ছাপা, রঙ্গিন বাঁধান মলাট। **দাম—এক টাকা**

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

বনকুসুম কেশ তৈল

উপহারে ও ব্যবহারে অনবদ্য

বনকুসুম স্নো

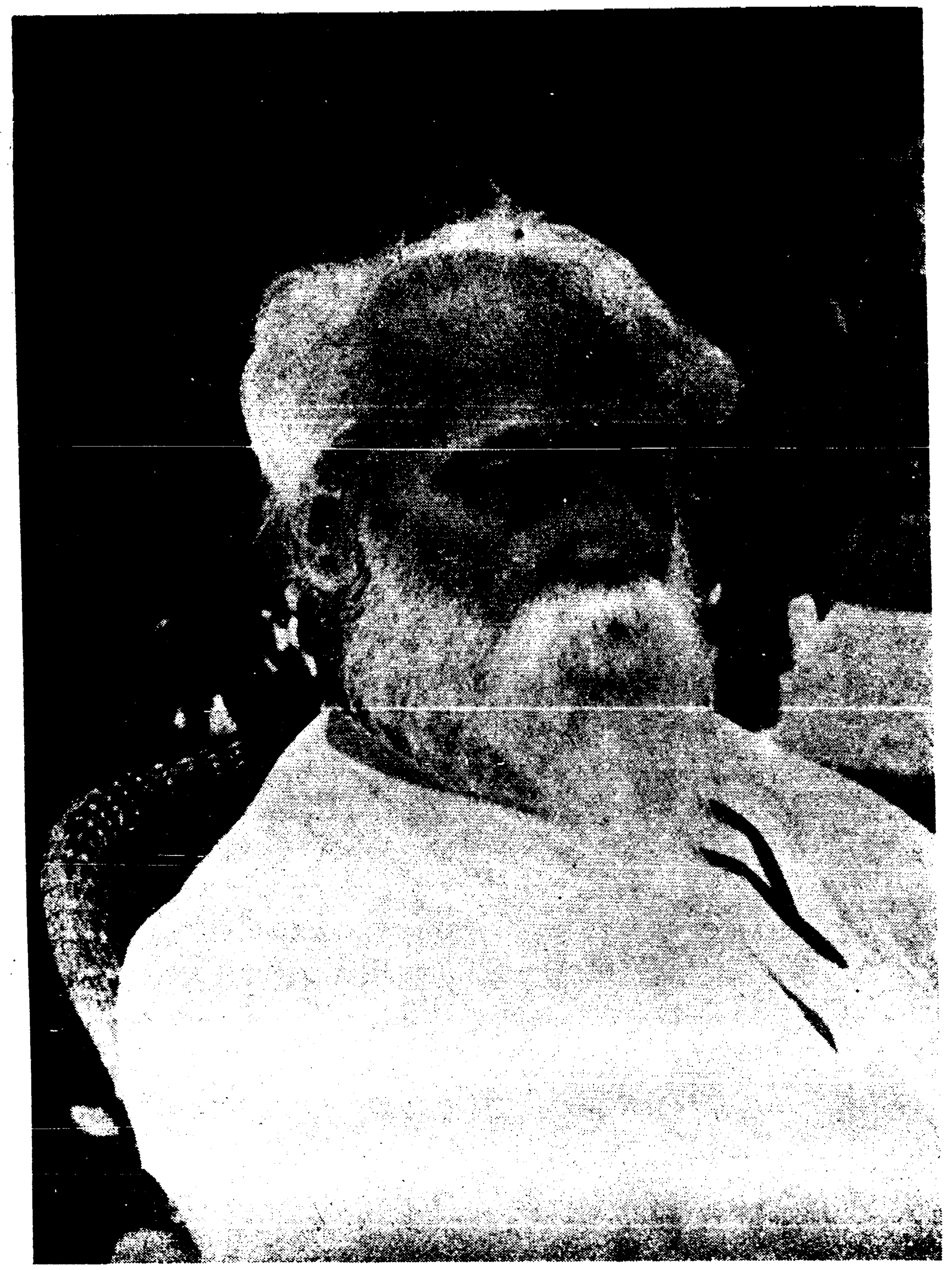

— মহাকবি রবীন্দ্রনাথ —

"আমাদের তরে সে যে রেখে গেল সুন্দরতর ধরা,
মানুষের বুকে দিয়ে গেল গান স্বপনের সুরে গড়া।
জীবনের মাঝে অমৃত দিল সে গেহ ভরি' দিল স্নেহ-প্রেম-রসে,
পথের ধূলিরে ঢাকি' দিল ফুলে নন্দন-বন-ঝরা।"

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
গৃহীত আলোকচিত্র

অধ্যাপক শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা (২য় সং)

ঘরে বসে অল্প খরচে সাবান, স্নো, পাউডার, লজেন্স, কালি প্রভৃতি নানা রকম রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করবার সহজ উপায় এতে আছে। সামান্ত মূলধনে ব্যবসা করতে হ'লে এ বই খুব কাজে লাগবে। প্রবাসী, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রশংসিত। **দাম ১৲**

বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালীর অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঙ্গালী আবার কি ভাবে বাঁচতে পারে—এ বইএ আছে। শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র সমূহে উচ্চ প্রশংসিত। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়। ... দাম—॥৶০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সগৌরবে সতেরো বৎসর ধরিয়া 'গল্প-লহরী' তাহার নূতন নূতন ভাব-ভঙ্গিমায়, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, গান ও স্বরলিপির বিপুল সম্ভার লইয়া সারা ভারতবর্ষে পূর্ণোদ্যমে অভিযান করিতেছে। সুশ্রী রেখাচিত্রেও গল্প-লহরী সুশোভিত। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে তিন টাকা; ষাণ্মাসিক এক টাকা, বার আনা। প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। চার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়। তিনটী গ্রাহক করিয়া দিলে এক বৎসর বিনা মূল্যে 'গল্প-লহরী' দেওয়া হয়।

কার্য্যালয়—৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন,
পোষ্ট বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—
প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—
পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৶০

আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—
অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী
অভিযান-কাহিনী—
পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—
চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট,
চমৎকার ছবি। দাম—॥/০

ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক্ টিউলিপের"
মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৮ { ৯ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাস্কর রূপদক্ষ চিত্রকর
আদর্শ করে যে মূরতি মনোহর;
যে রাজপুত্র বিহীন-পক্ষিরাজ—
লভিল বিজয় কিরীট-আলোর তাজ;
মঙ্গলময় পুণ্যাভিষেকে যাঁর
সপ্ত সাগর পাঠাইল ভেট তার;
পাঠাইয়া দিল শুভ্র সুমেরু রাতি
উপঢৌকন আরোরার মায়া বাতি;

চীন, পারস্য, সাক্‌সন, টিউটন
ধন্য হইল লভি' যাঁর দরশন ;
নূতন এবং প্রাচীন ভূমণ্ডল
পাঠাইল জয়মাল্য ও আঁখিজল ;
ভাষা যাঁর পূত করের স্পর্শ মাগে,
অতীত যাঁহার আহ্বানে পুনঃ জাগে,
দেশে দেশে যাঁর সুযশের সৌরভ,
যিনি বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব,
কর নতি, কর নতি, কর প্রণিপাত
প্রিয় সখা গুরু ওই রবীন্দ্রনাথ।

গোবরে পোকার গুণ্ডামী

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি এ.

শ্রাবণের ভাপসা গরম। ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি নেমেই আছে। একঘেয়ে পড়া আর ঘরের মধ্যে আটকা থাকা ভাল লাগে না। পুলিন এসে বল্‌ল, 'চল্ ভাই, গোবরডাঙ্গা থেকে ঘুরে আসি।' গোবরডাঙ্গা তার মাসীর বাড়ী। পুলিনের মাসতুতো বোনের বিয়ে। গোবরডাঙ্গা বনগাঁ থেকে খুব বেশী দূর নয়। দুই একটা ষ্টেশনের ব্যবধান মাত্র। সেদিন ছিল শনিবার। বাবাকে ব'লে মত করিয়ে নিলাম। স্থির হ'ল, সন্ধ্যার গাড়ীতেই আমরা রওনা দেব—দুপুরে যে গরম!

কিন্তু পুলিনের পটল, কুমড়ো এই সব তরকারির পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে সময় হ'য়ে গেল গাড়ীর।

আমরাও ষ্টেশনে পৌঁছলাম, গাড়ীও ছেড়ে দিল। কিন্তু বাড়ী ফিরে যাওয়া হবে না—যদি দ্বিতীয়বার ছুটি মঞ্জুর না হয়! তিন ঘণ্টা পরে আর একখানা গাড়ী। ষ্টেশনে ভয়ানক গরম। অগত্যা আমরা ষ্টেশনের বাইরে একটা নির্জ্জন

ফাঁকা যায়গায় গিয়ে ঘাসের উপর সতরঞ্চ বিছিয়ে বসলাম। এখানে ওখানে আকন্দের গাছ, ঘেঁটু ফুলের দুর্গন্ধ।

দু'জনে গল্প করছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। হঠাৎ পুলিন তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে ব'ল্‌ল, 'সাপ! সতরঞ্চের নীচে সাপ!' সতরঞ্চ উল্‌টে ফেলে দেখা গেল, সেটা সাপ নয়—একটা মস্ত বড় গোবরে পোকা—সতরঞ্চ ভেদ করেই উঠবার চেষ্টায় ছিল।

গাড়ী এল। আমরা টিকিট ক'রে উঠে ব'সলাম।

পনর মিনিটও কাটে নি। দেখা গেল, একটা গোবরে পোকা ভোঁ ভোঁ করে গাড়ীর মধ্যে উড়ছে। একজন ভদ্রলোক বল্‌লেন, 'মজা দেখবেন? সকলে আপনারা হাত মুঠো ক'রে বসুন,—দেখবেন ঐ পোকাটা এক্ষুণি টিপ্ করে পড়ে যাবে। আমরা মক্ষম-সক্ষম ভাবে দুই হাত মুঠো ক'রে বসে রইলাম। মাথার উপর ভোঁ ভোঁ করে গোবরে পোকা উড়ছে আর গাড়ীসুদ্ধ লোক হাত মুঠো করে চেয়ে আছে সেই দিকে।

গোবরে পোকা গোবরের ঢেলা নিয়ে তার গর্ত্তে যাচ্ছে।

ঠিক এমনি সময়ে আলোর বাল্‌বের ঢাকনীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গোবরে পোকাটা ধাঁ ক'রে পড়ল এসে এক হিন্দুস্থানীর মোটা ভুঁড়ির উপর! লালাজী ত' ভুঁড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন, কিন্তু পোকাটার আর সন্ধান মিলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এইবার আমরা নাম্‌ব। এক কাবুলীওয়ালা তিড়িং ক'রে অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, 'ইয়া—ফঁন্‌সতে—কিয়া, কিয়া!'

তার জবড়জঙ্গ কাপড়-জামার মধ্যে ঢুকে পড়েছে সেই গোবরে পোকা!

আমরা নামলাম। ষ্টেশনটি ছোট। লোকগুলি বোধ হয় আরও ছোট। পুলিনকে তারা আটকে ফেল্‌ল কুমড়ো আর পটলের জন্যে;—ওগুলো নাকি 'ফ্রেশ্ ফ্রুট'!

বিয়ে-বাড়ী। চারিদিকে সোরগোল। উঠানটি পরিষ্কার ক'রে তাতে গোবর-লিপ্ত করা হ'য়েছে। উপরে সামিয়ানা। সেখানেই বিয়ের আসর। বর এবং বরযাত্ররা সব এসে গেছে।

পুরোহিত মন্ত্র পড়ছিলেন,—'বিষ্টরঃ—বিষ্টরঃ—'

কিন্তু অকস্মাৎ নারায়ণ-শিলার সিংহাসন নড়ে উঠল। আবার, আবারও!

মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে উঠল। কেউ বল্‌ল, 'ভূমিকম্প নয় ত?'

আবার সিংহাসনের একদিক্ প্রায় এক ইঞ্চি উঁচু হ'য়ে উঠল। তাই ত'! বৃদ্ধেরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, এটা কেমন হ'ল!

অবশেষে সিংহাসন থেকে নারায়ণ-শিলা গড়িয়ে প'ড়লেন মাটিতে।

সর্ব্বনাশ! এটা ত' খুবই অশুভ লক্ষণ! কার ত্রুটিতে হ'ল এটা? পুরোহিতের মুখ চূণ হ'য়ে গেছে।

অবশেষে সিংহাসনের নীচে থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরুল একটি গোবরে পোকা! একটি ছেলে পোকাটাকে চিৎ ক'রে ফেলতেই অসীম বিক্রমে সে হাত-পা ছুঁড়তে লেগে গেল।

বরশয্যার খাটে বোঁ বোঁ শব্দে কালো ভোমরা গর্ত্ত খুঁড়তে লেগে গেছে। একজন ঝাঁটা হাতে ব'সে গেছে ওদের তাড়াবার জন্য। ভোমরা গোবরে পোকারই জাতভাই। এরা অবশ্য গরু-ঘোড়া বা অন্যান্য প্রাণীর নিষ্ঠীবন না খেয়ে কেবল ফুলে ফুলে মধু খেয়েই বেড়ায়। আকন্দের ফুল ওদের বড়ই প্রিয়। গোবরে পোকার গাত্রাবরণ চক্‌চকে নয়; কিন্তু ভোমরাকে দেখতে বেশ কালো মিশমিশে। উড়বার সময় ওদের কালো পাখার পাশ দিয়ে একটা পাতলা পাখা ওড়ে। ভোমরার বন্ বন্ শব্দের মধ্যে বেশ একটা ছন্দ আছে।

শুভ-দৃষ্টির সময় এল। বরের গলায় মোটা বেল ফুলের গ'ড়ে। বর

দাঁড়িয়ে আছে—কন্যার পিঁড়িখানি উঁচু ক'রে ধরা হ'ল। বর তার গলায় মালা দেবে ঠিক এমনি সময়ে বোঁ ক'রে উড়ে এসে পড়ল সেই মালায় কালো ভোমরা!

কেউ ছুঁড়ছে চাদর—কেউ ভোমরাটাকে হাত দিয়ে ফেলতে গিয়ে মালাটাই ফেল্‌ল ছিঁড়ে।

তাকের উপর বরের মিশ্রী-জল তৈরী ছিল। বরকে দিতে গিয়ে দেখা গেল,—তার মধ্যে একটা গোবরে পোকা পড়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে ব'সে আছে।

বিবাহের পর ছাতে বরযাত্র আর কন্যাযাত্রকে দুই ভাগে পাতা ক'রে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। পাঁচটা গ্যাস লাইট ছাতের এক পাশ থেকে আর এক পাশ কেবল ঘুরছে। কী পোকারে বাবা! সবাই আলোগুলোকে দূরে রাখতে চায়।

ভোমরা (গোবরে পোকার জাতভাই) — পুরুষ গোবরে পোকা — স্ত্রী গোবরে পোকা

বরযাত্ররা বলে, 'আলো থাক্ কন্যাপক্ষের ওদিকে—ওঁরাই ত' ওগুলো জ্বেলেছেন।' কন্যাপক্ষীয়রা বলে, 'তা কি হয় মশাই, আপনারা সম্মানীয় অতিথি—অন্ধকারে ব'সে খাবেন!'

ছোট ছোট গোবরে পোকার অত্যাচার সামান্য নয়।

পুলিনের পোঁটলার মধ্যে তখনও দশ-পনেরটা ভোমরা আর গোবরে পোকা জ্যান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোবর ভালবাসে ব'লেই ওদের নাম হ'য়েছে গোবরে পোকা—অবশ্য গোবর বলতে এখানে একমাত্র গরুর গোবরই নয়, ঘোড়া

এবং অন্যান্য প্রাণীরও। যদিও সব প্রাণীকেই গো-জাতীয় বলা যায় না। স্ত্রী-পুরুষে মিলে এরা মাটির নীচে গর্ত্ত তৈরী করে। তার পর গরু বা ঘোড়ার গোবরে এদের ভাঁড়ার ঘরটা পূর্ণ করে রাখে। একটা গোবরে পোকা তার নিজের দেহের বিশগুণ ভারী—এবং চার ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধযুক্ত গোবরের ঢেলাও পেছনের পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে অক্লেশে নিজের গর্ত্তে নিয়ে যেতে পারে। পচা আবর্জ্জনা, গোবর প্রভৃতি এরা মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে মাটিকে উর্ব্বরা করে। খেলার মাঠে বা বাড়ীর উঠানে গোবর প'ড়ে থাকলে পরদিনই দেখতে পাওয়া যায় সেখানে গোবর নেই, তার যায়গায় মাটি উঠে আছে। গোবরে পোকাই এই ব্যবস্থা ক'রে রাখে। এই পোকার চেহারা যেমন—ভোঁ ভোঁ আওয়াজও তেমনি বেসুরো। গণ্ডারের মতই এরা একগুঁয়ে। এদের মুখের কাছে আছে একটা শক্ত জিনিষ তাই দিয়ে এরা চটাপট্ গর্ত্ত খুঁড়ে ফেলে। গোবরে পোকা দিনের বেলাতেও মাঠে-ঘাটে ফাঁকা যায়গায় গোবরের বল নিয়ে নির্ভয়ে চলে যায়। এরা জানে, ওদের গায়ের ঐ বিশ্রী গন্ধটার জন্য অন্য পশুপক্ষী ওদের ছায়াও মাড়াবে না। আর এক জাতীয় পোকা আছে, সেগুলো দেখতে গোবরে পোকার মতই কিন্তু তাদের গায়ে দুর্গন্ধ নেই। তারাও ঐ গোবরে পোকার ছদ্মবেশে নিজেদের অভক্ষ্য এবং অস্পৃশ্য ব'লেই চালিয়ে নেয়। প্রাণিজগতে এমনিধারা ছদ্মবেশী বক-ধার্ম্মিকের অভাব নেই।

গোবরে পোকা যা খায় তা নিয়ে অনেকে অপ্রিয় সমালোচনা করতে পারে এই লজ্জাতেই বোধ হয় এরা গর্ত্তের ভিতর গিয়ে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আহার করে। প্রাচীন মিশরের লোকেরা জীবনটাকে ঝেড়ে কেটে নতুন ক'রে গড়ে তুলতে এই গোবরে পোকাকেই আদর্শ ব'লে গ্রহণ করত।

বিয়ে-বাড়ীর কথা এখনও শেষ হয় নি। বিয়ে-বাড়ীর ব্যবস্থা বিয়ের পর কিছু অব্যবস্থাই হ'য়ে পড়ে। পুরুতঠাকুর অগত্যা বরাসনের উপরেই কতকগুলি প্রীতি-উপহার মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাত্রে তিনি ধড়ফড় ক'রে উঠলেন, দেওয়ালের আলোটা ঢিল মেরে কে যেন নিবিয়ে দিয়েছে! কাউকেই ধরা গেল না, তবে ওয়াল্ ল্যাম্পটির চিমনির মধ্যে একটি গোবরে পোকা প'ড়ে মরে আছে দেখা গেল।

পণ্ডিতমশায় আবার শুলেন এবং আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন,—প্রীতি-উপহার ভেদ ক'রে একটা মস্ত বড় গোবরে পোকা তাঁর কানের মধ্যে এবং কেশ-বিরল মাথার মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা কর্‌ছিল।

মহাময়ূর জাতক

[জাতকের গল্প]

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

একবার বোধিসত্ত্ব ময়ূরীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একটি ময়ূরী লোকালয়ে একটি ডিম পাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। এই ডিম হইতে সুবর্ণ বর্ণের ময়ূররূপে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন।

একদিন স্বচ্ছ সরোবরে জলপান করিতে গিয়া তিনি নিজের দেহের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল লোকালয়ে বা তাহার নিকটে তাঁহার বাস করা নিরাপদ নয়। কোন্ দিন তাঁহাকে কোন্ রাজার উদ্যানে পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি দুর্গম হিমালয় প্রদেশে এক শিখরের উপর আশ্রয় লইলেন।

এদিকে রাজমহিষী ক্ষেমা স্বপ্ন দেখিলেন একটি সুবর্ণ বর্ণের ময়ূর সিংহাসনে বসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছে। রাণী এই সময়ে সন্তানসম্ভবা ছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর মহারাজকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলিলেন। তার পর আবদার ধরিলেন—"যেখানে পা'ন সোনালী রংএর ময়ূর লইয়া আসুন, নতুবা আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।"

রাজা অমাত্য ও সভাপণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিলেন—সুবর্ণ বর্ণের ময়ূর কোথাও আছে কি না। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রাদি ঘাঁটিয়া বলিলেন—"হাঁ মহারাজ, স্বর্ণ বর্ণের ময়ূর পৃথিবীতে আছে।"

রাজা মহিষীর সাধ পূরণের জন্য দেশে দেশে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে স্বর্ণ বর্ণের ময়ূর ধরিয়া আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করা হইবে।

বারাণসী প্রদেশের একজন ব্যাধ একবার হিমালয় প্রদেশে শিকার করিতে গিয়া পর্ব্বত-শিখরে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া আসিয়াছিল। সে মৃত্যুকালে তাহার পুত্রকে সে কথা বলিয়া গিয়াছিল। ঐ ব্যাধপুত্র ঘোষণা শুনিয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল—"মহারাজ, আমি সোনার ময়ূর আনিয়া দিতে পারি।"

ব্যাধ হিমালয় প্রদেশে যাত্রা করিল। সেখানে সে ময়ূরটিকে দেখিতে পাইল, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিল না। ব্যাধ ক্রমে সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে রাণীও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজা ভাবিলেন ময়ূর না পাইয়াই রাণীর অকালমৃত্যু হইল। তখন তিনি একটি সোনার ফলকের উপর ক্ষোদিত করাইলেন—"হিমালয় প্রদেশে সোনার রংএর ময়ূর আছে—যে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে সে অজর অমর হইবে।"

রাজাও বৃদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র ঐ ময়ূরের সন্ধানে ব্যাধগণকে হিমালয়ে পাঠাইলেন—কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না। এইভাবে সাত জন রাজা গত হইলেন, সকলেই হিমচণ্ডপ্রদেশে দলে দলে ব্যাধ পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই সেখানে তুষার-সমাহিত হইল।

অষ্টম রাজার সময়ে একজন ব্যাধ একটি পোষা ময়ূর লইয়া ঐ প্রদেশে যাত্রা করিল। সে পর্ব্বতশিখরে বোধিসত্ত্বকে দেখিল। তখন সে ফাঁদ পাতিয়া পোষা ময়ূরটি তাহার পাশে রাখিয়া গুহার মধ্যে লুকাইয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব দুর্গম প্রদেশে স্বজাতীয় জীব একটিকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য নামিয়া আসিলেন। যেমন নামিলেন, অমনি পাশবদ্ধ হইলেন। ব্যাধ গুহা হইতে বাহির হইয়া ভাবিল—ময়ূরটি বিরাট বলশালী। ইহার নিকট যাওয়াই কঠিন। যদিই বা ধরি তবে কিছুতেই লইয়া যাইতে পারিব না। এই ময়ূর নিশ্চয়ই দৈবশক্তিসম্পন্ন, ইহাকে বন্দী করিয়া বধ করিলে হয়ত কোন দৈব বিপদ্ ঘটিবে। অতএব দূর হইতে শর নিক্ষেপে ইহার পাশ ছেদন করা যাক্। এই ভাবিয়া ব্যাধ ধনুকে শর যোজনা করিল। বোধিসত্ত্ব তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হে ব্যাধ, তুমি নিশ্চয়ই পুরস্কারের আশায় আমাকে পাশবদ্ধ করিয়াছ। তবে কেন আমাকে বধ করিবার জন্য শর যোজনা করিলে? আমাকে লইয়া চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। আমার বন্ধনে যদি তোমার মঙ্গল হয় তবে তাহাই হউক।"

ব্যাধ ময়ূরকণ্ঠে মানুষের ভাষা শুনিয়া প্রথমে অবাক্ হইয়া গেল, তার পর ময়ূরের উদারতা দেখিয়াও মুগ্ধ হইল।

ব্যাধ বলিল—"হে শিখিরাজ, তোমার প্রাণবধের জন্য শর যোজনা করি নাই। তোমাকে পাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্যই আমি শর নিক্ষেপ করিতেছিলাম। আমার পুরস্কারে প্রয়োজন নাই।"

শিখিরাজ—"কেবল আমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া যাইবে কেন? আপনাকেও পাশমুক্ত কর।"

ব্যাধ—"আমি ত কোন পাশে বদ্ধ নই!"

শিখিরাজ—"তবে কি তুমি প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছ বন্ধু?"

ব্যাধ—"প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইলে মরণান্তে কি ফল লাভ করা যায়, বল?"

শিখিরাজ—"প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ হয়।"

ব্যাধ—"আমি অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—দেবতা কল্পনা মাত্র, পরলোক নাই। পাপ পুণ্যের ফল মানুষ ইহজীবনেই ভোগ করে। এই সকল কথা শুনিয়াই আমি পাখী মারিয়া জীবিকা অর্জ্জন করি।"

শিখিরাজ—"যাহা দেখা যায় না তাহারা তাহা বিশ্বাস করে না। রবিশশী আকাশে উদিত হয়, তার পর তাহারা অস্ত যায়, তাহাদের আর দেখা যায় না। তাই বলিয়া কি রাত্রিকালে সূর্য্য নাই—দিনের বেলায় চন্দ্র নাই বলিবে?"

ব্যাধ—"না, তাহারা তখন লোকান্তরে থাকে।"

শিখিরাজ—"তবেই বুঝিতে পারিতেছ, চোখে দেখা যায় না বলিয়া লোকান্তর নাই—পাপ-পুণ্যের ফল দুই দিনেই ফুরাইয়া যায়—এ কথা যাহারা বলে তাহারা মূর্খ।"

ব্যাধ—"দানের পুণ্যফল অনেককে এ জীবনে লাভ করিতে দেখি না, তবে কি তাহা পরজীবনে ফলে? আমাকে এ কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। কিরূপ আচরণ করিলে আমি নরক এড়াইব—তাহাও তুমি বল।"

শিখিরাজ—"যে সকল শ্রমণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কাষায় বসন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে, পর দিনের জন্যও সঞ্চয় করে না—তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিও, তাঁহারা ইহ-পরলোকের রহস্য বুঝাইয়া দিবেন। আমি যত দূর পারি বলিতেছি।" এই বলিয়া শিখিরাজ সংসারের অনিত্যতা, অসারতা ও জীবের দুঃখ, ক্লেশ হইতে মুক্তির উপায় একে একে বিবৃত করিলেন।

এই কথা শুনিতে শুনিতে ব্যাধের দিব্যজ্ঞান জন্মিল। পদ্মকোরক যেমন বিকাশের জন্য অরুণকিরণের প্রতীক্ষা করে—ব্যাধের চিত্ত সেই অবস্থায় ছিল। ব্যাধ দিব্যানন্দ অনুভব করিল। সে বলিয়া উঠিল—"সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে, বসন্ত আসিলে তরুশ্রেণী যেমন পাণ্ডুপত্র ত্যাগ

করে, আমার ব্যাধসুলভ হিংস্র প্রবৃত্তিও তেমনি তিরোহিত হইল।" তার পর কহিল, "শিখিরাজ, আমার চিত্ত ত আপনার কৃপায় পাশমুক্ত হইল কিন্তু আমার গৃহে যে অসংখ্য পক্ষী পিঞ্জরাবদ্ধ আছে তাহারা কি করিয়া মুক্তি লাভ করিবে? আমি ত আর সংসারে ফিরিয়া যাইব না!"

শিখিরাজ—"ব্যাধ, তুমি বাক্‌সিদ্ধ হইয়াছ। তুমি মনে মনে বল 'আমি যত জীবকে বন্দী করিয়াছি সকলেই মুক্তি লাভ করুক।'" ব্যাধ তাহাই বলিল। শিখিরাজ বলিলেন—"দেখ ব্যাধ, তাহারা যে মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহার প্রমাণ দেখ। তোমার কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের পাশ মুক্ত হইয়াছে—আমি এখন স্বাধীন।"

ব্যাধ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া গিরিগুহায় চলিয়া গেল; শিখিরাজ গিরিচূড়ায় গিয়া বসিলেন।

বাঁদুরে বর

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ

বেজায় পেটের অসুখ করেছিল। পাঁচটি দিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই, কেবল ঘটি ঘটি বার্লি আর ছোট্ট শিশি থেকে কচি কচি বড়ি খাওয়া, আর—"কেন ছোলাভাজা খেইছিলি?" "কেন গোলাপী রেউড়ী খেইছিলি?"—এই এক কথা। তার পর সবে মাত্র সেরে উঠেছি, এখনও দাঁড়াতে গেলে হাঁটুর কাছে মুড়ে মুড়ে যায়, বিকেল বেলা, চমৎকার দিন, পাড়ার সবাই যখন ইস্কুল থেকে এসে জলখাবার' খেয়ে ঘুড়ী উড়োচ্ছে. বাড়ীর সবাই বেরিয়ে গেছে, আমি দোতলার বারাণ্ডায় বাবার ঈজি-চেয়ারে বসে আছি, মন ভাল করবার জন্য এ হাতলের উপর এক ঠ্যাং আর ও হাতলের উপর এক ঠ্যাং রেখেছি, আবার থেকে থেকে এ ঠ্যাংটা ও হাতলে নিচ্ছি আর ও ঠ্যাংটা ক্রস বানিয়ে এ হাতলে দিচ্ছি, ডাক্তার যা' যা' বারণ করেছে এমন কিছু কচ্ছি না, কিছু খাচ্ছি-টাচ্ছি না, বাতাবীলেবু গাছটাতে কচি কচি তেতো তেতো বাতাবীলেবু হ'য়েছে, তাই এক মনে দেখছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখি কিনা কালো একটা কী জানি বাতাবীলেবু গাছের গুঁড়ি বেয়ে আধ-অন্ধকারে ওঠা-নামা করছে! দেখলাম তার ওঠা-নামাটা একটু অদ্ভুত ধরণের, একবার সুড়ুৎ ক'রে উপরে ওঠে, আবার আধ মিনিট বাদে আস্তে আস্তে নেমে যায়। তার পর আবার আস্তে আস্তে উপরে ওঠে আর সুড়ুৎ ক'রে নেমে যায়। এমনি কচ্ছে তো

কচ্ছেই। তাই না দেখে দেখে ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট ছাল-ছাড়ান চ্যাঁচামেচি শুনে চম্‌কে একেবারে জেগে গেলাম।

অন্ধকার হ'য়ে হ'য়ে এসেছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখ্‌লাম যে ওঠা-নামা করছিল সে একটা বাঁদর; এখন আর ওঠা-নামা করছে না কারণ তার লম্বা ল্যাজ্‌টা আর ঝুল্ ঝুল্ না ক'রে বাতাবী-লেবু গাছের দুটো সরু ডালের ফাঁকে এমন ক'রে আটকে গেছে, সে আর কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। দেখ্‌লাম বাঁদরের বগলে একটা ময়লা ন্যাক্‌ড়া জড়ান নাপিতদের বাক্সের মতন বাক্স, আর তার মুখে একটা কাতর ভাব। ভারী দুঃখ লাগ্‌ল। হাঁটু মুড়ে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে বাবার লাঠিটা এক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলাম, তাই দিয়ে এক খোঁচা মতন দিতেই বাঁদরটা কি—চ্ ক'রে একটা শব্দ ক'রে নীচে পড়ে গেল।

ভাব্‌লাম বোধ হয় চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই দেখ্‌লাম সে বাক্স বগলে নর্দ্দমার পাইপ্ বেয়ে উপরে এসে রেলিংএ বসেছে। আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হওয়াতেই একটু লজ্জা লজ্জা মতন হেসে বল্‌ল, "আমি তোমার উপর খুব খুসি হয়েছি আর তোমাকে একটা বর দেব। কি চাও বল?"

আমি বল্‌লাম, "যদি বলি কি চাই ঠিক তাই দেবে তো?" সে বল্‌ল, "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। যা চাও তাই দেব। য়্যানুয়েল পরীক্ষার অঙ্কের প্রশ্ন চাও?" বলেই ন্যাকড়া বাঁধা খুলে কাঠের বাক্স থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। আমি বল্‌লাম, "না, ও আমি চাই না?"

তখন সে বল্‌ল, "পিসিমা যে আজ নারকোল-নাড়ু ক'রে ভাঁড়ার ঘরে বন্ধ করেছেন, তাই চাও?" বলে বাক্স খুলে একমুঠো নারকোল-নাড়ু বের করল। আমি জিভের জল গিলে বল্‌লাম, "না, ও আমি চাই না।"

তখন সে একটু বিরক্ত হ'য়ে যেন বল্‌ল,—"তবে কি দাদার কলম নেবে? বাবার হাত-ঘড়ি? ঘোতনের টর্চ্চ?" বলেই সেগুলো একে একে বাক্স থেকে বের করল। আমি সেদিকে পিঠ ফিরে বসে বল্‌লাম, "না, ও আমি চাই না।"

তখন সে রেগে শূন্যে দু' হাত তুলে বল্‌ল,—"তবে কী যে তুমি চাও তা পষ্ট ক'রেই বল না।"

তখন আমি পষ্ট ক'রেই বল্‌লাম—"আমি চাই যে এখন থেকে আমি যখন যা' বল্‌ব তক্ষুণি তাই হ'বে।"

বাঁদরটা শিউরে উঠে, দু' কানে হাত চাপা দিয়ে বল্‌ল—"ও ছাড়া আর যা চাও তাই দেব।" আমি বল্‌লাম, "ও ছাড়া আর কিচ্ছু চাই না যে!" তখন সে বল্‌ল—"তথাস্তু।"

বলে বাক্স বগলে পাইপ্ বেয়ে অর্দ্ধেকটা পথ নেমেছে এমন সময় আমি বল্লাম, "আমি ঐ বাক্সটা চাই।" বলেই দেখি বাক্স আমার কোলে। বাঁদরকে আর দেখতে পেলাম না।

বাক্স খুলে দেখ্লাম তার মধ্যে কতকগুলো আধ-চেবান আখের ছিব্ড়ে ছাড়া কিচ্ছু নেই। ভীষণ রাগ হ'ল। বল্লাম, "এ আমি চাই না। আমি চাই অঙ্কের পরীক্ষার প্রশ্ন, পিসিমার নারকোল-নাড়ু, দাদার মতন কলম, বাবার ঘড়ি, ঘোতনদের টর্চ্চ।" বলেই দেখি ঈজি-চেয়ারের হাতলে সে সব সারি সারি সাজান রয়েছে!

তার পর এত সব মনের ইচ্ছা পেয়ে পেয়ে আমি বে-পরোয়া হ'য়ে গেলাম। যা খুসি তাই চাইতে লাগলাম। যে সব জিনিষ চাই না, যা দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না, যা আমার ভালও লাগে না, এমন সব জিনিষ দিয়ে বারাণ্ডায় একটা পাহাড় বানিয়ে ফেল্লাম। তার পর তাকিয়ে দেখি পাশের বাড়ীর লাটু একটা প্যাকিং কেসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে একটা চ্যাপ্টা কাঠি থেকে চুষে চুষে আইসক্রীম খাচ্ছে। হঠাৎ না ভেবে-চিন্তে ব'লে বসলাম—"আমি লাটু হ'তে চাই।" বলেই টের পেলাম আমার নীচে নরম ঈজি-চেয়ারের বদলে এব্ড়ো খেব্ড়ো পেরেক-ওঠা প্যাকিং কেস্, আর হাতে একটা আধ-চোষা আইসক্রীম। আরও বুঝলাম আমার ভীষণ দাঁত ব্যথা হ'য়েছে। বাবা, সে কি দাঁত ব্যথা! তা'র চোটে অমন ভালো আইসক্রীমটা ছাইএর মত লাগ্ছিল।

ঘর থেকে লাটুর বাবা বেরিয়ে এসে ভীষণ রেগে বল্লেন, "লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! দাঁত ব্যথার উপর বরফ খাওয়া!" বলে সেটা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন। রাগে গা জ্বলে যেতে লাগ্ল। দাঁতে দাঁতে চেপে বল্লাম—"আমি লাটুর বাবা হ'তে চাই!" বলেই টের পেলাম আমার পেটটা একটু একটু কামড়াচ্ছে, আর ডান পা'টার শিরা টেনে ধরেছে, আর আপিস থেকে এখনও মাইনে দেয় নি ব'লে খুব বিরক্ত লাগ্ছে।

আমি আর কিছু না ব'লে ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে মালিশের ওষুধের শিশিটা তুলে নিতেই লাটুর মা বল্লেন—"আবার আমার কাঁচি আন্তে ভুলে গেছ? আমি বেশ জানি আমি যা বল্ব—" আমি চোখ বুঁজে বল্লাম, "এখান থেকে যেখানে হ'ক চলে যেতে চাই।"

টের পেলাম আমি এক ঘন জঙ্গলের ভিতর একটা গাছ আঁকড়ে ঝুলে রয়েছি, আর ঠিক আমার নীচে একটা মস্ত হুমো বাঘ ডোরাকাটা থাবা মেলে হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর তার জিভ্ দিয়ে জল পড়ছে। হাত দু'টো আমার অবশ হ'য়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল বোধ হয় কাল থেকে ঝুলে আছি। পড়েই গেছিলাম আর একটু হ'লে, হঠাৎ বল্লাম—"বাবাঃ! মামাবাড়ীর মতন নিরাপদ জায়গায় গেলে বাঁচি।"

তখনই বুঝ্তে পারলাম আমি আমার মেজ মামিমার কোলে শুয়ে আছি আর মেজ মামিমা

আমাকে ঝিনুকে ক'রে জোলো জোলো দুধ খাওয়াচ্ছেন, দম আট্কিয়ে আস্ছে তাই আমি ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছি, আর মেজ মামা নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্ছেন—"আহা, ওর পেটে তেল জল সেঁক দাও না!" কান্না থামিয়ে মনে মনে বল্লাম—"বুড়োগুলো ম'লে বেশ হয়।" যেই না বলা মেজ মামা অমনি চোখ উল্টিয়ে জিভ বের করে সটাং হ'য়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। মামিমাও আমাকে নামিয়ে চোখ উল্টিয়ে জিভ বের ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। টের পেলাম ঘরের বাইরেও যেখানে বড়রা আছে সেখানেই এক ভীষণ ব্যাপার হচ্ছে।

আমি ভয়ে আধমরা হ'য়ে বল্লাম—"বর নেবার আগে যেমন ছিল আবার তেমন চাই।"

বল্তেই দেখি দোতলার বারাণ্ডায় ঈজি-চেয়ারে বসে আছি, এ হাতলে এক ঠ্যাং ও হাতলে এক ঠ্যাং। মাঝে মাঝে ঠ্যাং বদ্লাচ্ছি। আর বাতাবীলেবু গাছে কী একটা ওঠা-নামা করছে। ভাল ক'রে দেখলাম সত্যি একটা বাঁদর, তার বগলে একটা বাক্স মতনও আছে। আমি তাকে আমার একপাটি চটি ছুঁড়ে মারলাম আর সে বাক্স-টাক্স ফেলে পালিয়ে গেল। বাক্সটা নীচে পড়ে গিয়ে খুলে গেল, দেখ্লাম তা'তে ক্ষুর, কাঁচি এই সব ভরা; নাপিতদের বাক্স।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার ঈজি-চেয়ারে এসে শুলাম। এ হাতলে ও ঠ্যাং আর ও হাতলে এ ঠ্যাং রাখলাম।

আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য

অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি. এম্.বি.

পৃথিবীতে দুই রকমের জীব দেখা যায়। সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবের শরীরের তাপ বাহিরের তাপের সহিত কম বেশী হয় এবং তাহাতে তাহাদের অসুবিধা হইলেও তাহারা বাঁচিয়া থাকে। তোমরা বোধ হয় জান যে ভরা শীতকাল সাপ, ব্যাঙ মাটীর নীচে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকে কিন্তু মরে না।

বলে বাক্স বগলে পাইপ্ বেয়ে অর্দ্ধেকটা পথ নেমেছে এমন সময় আমি বল্‌লাম, "আমি ঐ বাক্সটা চাই।" বলেই দেখি বাক্স আমার কোলে। বাঁদরকে আর দেখতে পেলাম না।

বাক্স খুলে দেখ্‌লাম তার মধ্যে কতকগুলো আধ-চেবান আখের ছিব্‌ড়ে ছাড়া কিছু নেই। ভীষণ রাগ হ'ল। বল্‌লাম, "এ আমি চাই না। আমি চাই অঙ্কের পরীক্ষার প্রশ্ন, পিসিমার নারকোল-নাড়ু, দাদার মতন কলম, বাবার ঘড়ি, ঘোতনদের টর্চ্চ।" বলেই দেখি ঈজি-চেয়ারের হাতলে সে সব সারি সারি সাজান রয়েছে!

তার পর এত সব মনের ইচ্ছা পেয়ে পেয়ে আমি বে-পরোয়া হ'য়ে গেলাম। যা খুসি তাই চাইতে লাগলাম। যে সব জিনিষ চাই না, যা দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না, যা আমার ভালও লাগে না, এমন সব জিনিষ দিয়ে বারাণ্ডায় একটা পাহাড় বানিয়ে ফেল্‌লাম। তার পর তাকিয়ে দেখি পাশের বাড়ীর লাটু একটা প্যাকিং কেসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে একটা চ্যাপ্টা কাঠি থেকে চুষে চুষে আইসক্রীম খাচ্ছে। হঠাৎ না ভেবে-চিন্তে ব'লে বসলাম—"আমি লাটু হ'তে চাই।" বলেই টের পেলাম আমার নীচে নরম ঈজি-চেয়ারের বদলে এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো পেরেক-ওঠা প্যাকিং কেস্, আর হাতে একটা আধ-চোষা আইসক্রীম। আরও বুঝলাম আমার ভীষণ দাঁত ব্যথা হ'য়েছে। বাবা, সে কি দাঁত ব্যথা! তা'র চোটে অমন ভালো আইসক্রীমটা ছাইএর মত লাগ্‌ছিল।

ঘর থেকে লাটুর বাবা বেরিয়ে এসে ভীষণ রেগে বল্‌লেন, "লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! দাঁত ব্যথার উপর বরফ খাওয়া!" বলে সেটা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন। রাগে গা জ্বলে যেতে লাগ্‌ল। দাঁতে দাঁতে চেপে বল্‌লাম—"আমি লাটুর বাবা হ'তে চাই!" বলেই টের পেলাম আমার পেটটা একটু একটু কাম্‌ড়াচ্ছে, আর ডান পা'টার শিরা টেনে ধরেছে, আর আপিস থেকে এখনও মাইনে দেয় নি ব'লে খুব বিরক্ত লাগ্‌ছে।

আমি আর কিছু না ব'লে ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে মালিশের ওষুধের শিশিটা তুলে নিতেই লাটুর মা বল্‌লেন—"আবার আমার কাঁচি আন্‌তে ভুলে গেছ? আমি বেশ জানি আমি যা বল্‌ব—" আমি চোখ বুঁজে বল্‌লাম, "এখান থেকে যেখানে হ'ক চলে যেতে চাই।"

টের পেলাম আমি এক ঘন জঙ্গলের ভিতর একটা গাছ আঁক্‌ড়ে ঝুলে রয়েছি, আর ঠিক আমার নীচে একটা মস্ত হুমো বাঘ ডোরাকাটা থাবা মেলে হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর তার জিভ্ দিয়ে জল পড়ছে। হাত দু'টো আমার অবশ হ'য়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল বোধ হয় কাল থেকে ঝুলে আছি। পড়েই গেছিলাম আর একটু হ'লে, হঠাৎ বল্‌লাম—"বাবাঃ! মামাবাড়ীর মতন নিরাপদ জায়গায় গেলে বাঁচি।"

তখনই বুঝ্‌তে পারলাম আমি আমার মেজ মামিমার কোলে শুয়ে আছি আর মেজ মামিমা

আমাকে ঝিনুকে ক'রে জোলো জোলো দুধ খাওয়াচ্ছেন, দম আট্‌কিয়ে আস্‌ছে তাই আমি ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছি, আর মেজ মামা নিজের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌ছেন—"আহা, ওর পেটে তেল জল সেঁক দাও না!" কান্না থামিয়ে মনে মনে বল্‌লাম—"বুড়োগুলো ম'লে বেশ হয়।" যেই না বলা মেজ মামা অমনি চোখ উল্‌টিয়ে জিভ বের করে সটাং হ'য়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। মামিমাও আমাকে নামিয়ে চোখ উল্‌টিয়ে জিভ বের ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। টের পেলাম ঘরের বাইরেও যেখানে বড়রা আছে সেখানেই এক ভীষণ ব্যাপার হচ্ছে।

আমি ভয়ে আধমরা হ'য়ে বল্‌লাম—"বর নেবার আগে যেমন ছিল আবার তেমন চাই।"

বল্‌তেই দেখি দোতলার বারাণ্ডায় ঈজি-চেয়ারে বসে আছি, এ হাতলে এক ঠ্যাং ও হাতলে এক ঠ্যাং। মাঝে মাঝে ঠ্যাং বদ্‌লাচ্ছি। আর বাতাবীলেবু গাছে কী একটা ওঠা-নামা করছে। ভাল ক'রে দেখলাম সত্যি একটা বাঁদর, তার বগলে একটা বাক্স মতনও আছে। আমি তাকে আমার একপাটি চটি ছুঁড়ে মারলাম আর সে বাক্স-টাক্স ফেলে পালিয়ে গেল। বাক্সটা নীচে পড়ে গিয়ে খুলে গেল, দেখ্‌লাম তা'তে ক্ষুর, কাঁচি এই সব ভরা; নাপিতদের বাক্স।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার ঈজি-চেয়ারে এসে শুলাম। এ হাতলে ও ঠ্যাং আর ও হাতলে এ ঠ্যাং রাখলাম।

আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য

অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি. এম্.বি.

পৃথিবীতে দুই রকমের জীব দেখা যায়। সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবের শরীরের তাপ বাহিরের তাপের সহিত কম বেশী হয় এবং তাহাতে তাহাদের অসুবিধা হইলেও তাহারা বাঁচিয়া থাকে। তোমরা বোধ হয় জান যে ভরা শীতকাল সাপ, ব্যাঙ মাটীর নীচে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকে কিন্তু মরে না।

আমরা আর এক রকম জীব; আমাদের ব্যাপার অন্য ধরণের। আমাদের শরীরের তাপ একটু কম বেশী হইলেই আমরা মরিয়া যাই। সুস্থ অবস্থায় থাকিতে হইলে আমাদের শরীরের তাপ সমভাবে ৯৮° ডিগ্রী ফারেনহীটে থাকা চাই। তোমরা জ্বর দেখিবার থার্ম্মোমিটার দেখিয়াছ। ইহাতে ৯৫° হইতে ১১০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ মাপা যায় কারণ আমাদের শরীরে তাপ ৯৫° ডিগ্রীর কম বা ১০৭°।১০৮° ডিগ্রীর বেশী হইলে আমরা বাঁচি না। আমাদের শরীরের তাপ ৯৮° ডিগ্রীর বেশী বা কম হইলেই ভাবনার কথা হইয়া পড়ে।

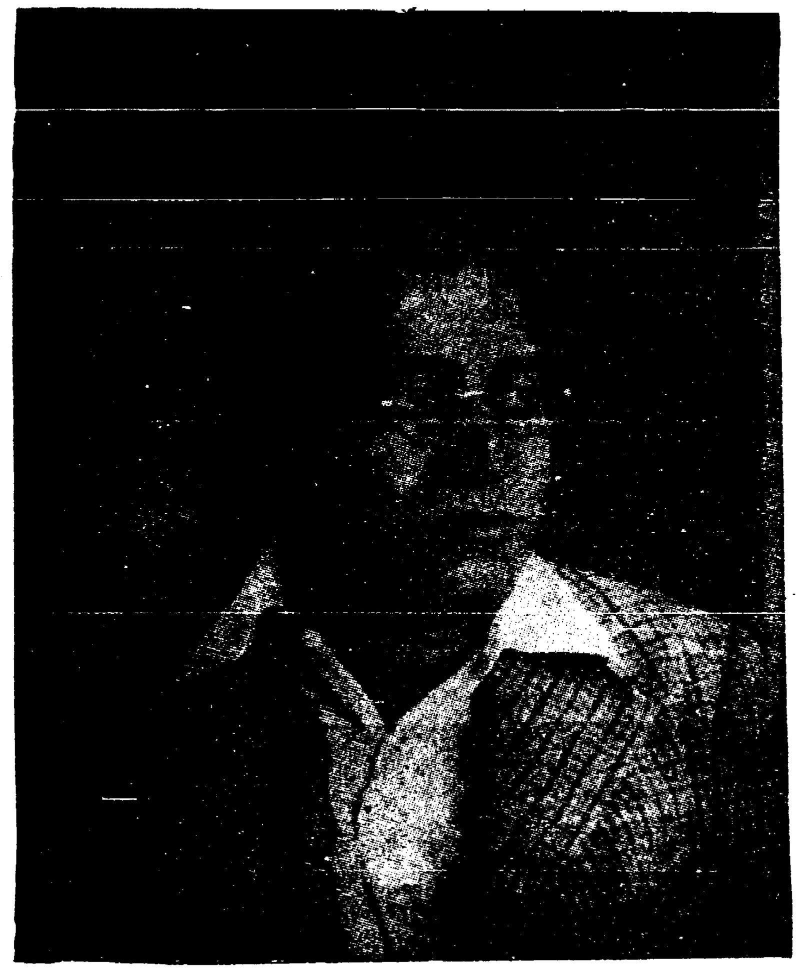
অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বাটী জল বা এক টুক্‌রা লোহার কথা ধরা যাক্। শীতে জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা, গরম কালে তুপুরে ইহা প্রায় ফুটিতে থাকে। লোহারও সেই অবস্থা। ইহার অর্থ এই যে নির্জ্জীব পদার্থের তাপ বাহিরের তাপের সহিত কম বেশী হয়। সাপ, ব্যাঙদের শরীরের তাপ প্রায় নির্জ্জীব পদার্থের মত বাহিরের তাপের সঙ্গে বাড়ে কমে। আমাদের শরীরে তা হয় না কেন? তুমি আজ থার্ম্মোমিটার লইয়া ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের বরফে যাও—সেখানে দেখিবে তোমার দেহের উত্তাপ ৯৮°। অথবা সাহারায় গ্রীষ্মকালে তুপুরেও তোমার উত্তাপ ৯৮°। ইহার মানে এই নয় কি যে আমাদের শরীরের উত্তাপ সমভাবে ৯৮° ডিগ্রীতে রাখার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে? ব্যাপারটী একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

তোমাদের আশা করি মনে আছে, কিছু দিন আগে তোমাদের বলিয়াছিলাম

যে আমাদের দেহ এঞ্জিনের মত সর্ব্বদা কতগুলি জিনিষ (খাদ্য) পোড়াইয়া শরীরে তাপ উৎপাদন করে এবং কাজ করিবার ক্ষমতা পায়। আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন বাষ্প লইয়া খাদ্য পোড়াই এবং কার্ব্বন-ডাইঅক্‌সাইড বাষ্প নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির করি। ফলে শরীর উত্তপ্ত হয় ও আমরা চলাফেরা, দৌড়-ঝাঁপ নানা রকমের কাজ করিতে পারি। শরীরে সর্ব্বদা যখন তাপ উৎপন্ন হইতেছে তখন সেই তাপ বাহির হইবারও ব্যবস্থা আছে—তা না হইলে তাপ সর্ব্বদা বাড়িয়া যাইত, একভাবে থাকিত না। আমাদের উত্তাপের কিছুটা বাহিরের বাতাসের দ্বারা পরিবাহিত ও পরিচালিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। আশ-পাশের বাতাস যদি ঠাণ্ডা থাকে তবে অনেকটা উত্তাপ বিকীরিতও হইয়া যায়। এই তিন উপায়ে একটী গরম লোহার টুক্‌রাও কতক্ষণ বাদে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সুতরাং বায়ু যদি চলাচল করে—অর্থাৎ বাতাস বা ঝড় বহে তবে সুন্দরভাবে তাপ বাহির হইয়া শরীরকে ঠাণ্ডা রাখিতে পারে এবং শীতকালে বায়ু যখন ঠাণ্ডা থাকে তখন তাপ বিকীরিত হইয়া শরীর আরও ঠাণ্ডা হয়। শীতকালে, ঝড়ের সময় আমরা তাই এত ঠাণ্ডা বোধ করি এবং শরীরের তাপ যাহাতে বেশী না বাহির হয় সেইজন্য ঘরের মধ্যে লেপ ঢাকা দিয়া শুইয়া থাকি।

কিন্তু আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালে, বাহিরের তাপ যখন শরীরের তাপের বেশী এবং বায়ু যখন নিশ্চল, তখন শরীর ঠাণ্ডা হয় কি উপায়ে? তখন আর এক ব্যবস্থা আছে। ঐ অবস্থায় আমরা ঘামি এবং এই ঘাম যখন শরীরের উপর হইতে আস্তে আস্তে শুকাইয়া যায় তখন অনেক উত্তাপ বাহির হইয়া শরীরকে ঠাণ্ডা করে। তোমরা কাপড় শুকান দেখিয়াছ ত'? ভিজা কাপড় শীঘ্র শুকায় যদি বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে—যেমন শীতকালে। বর্ষায় শুকায় সব চেয়ে আস্তে কারণ বাতাস তখন জলীয় বাষ্পে ভরপূর, ভিজা কাপড়ের বাষ্প লইবার আর জায়গা নাই। সুতরাং বায়ু যখন জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ, যেমন "ভরা ভাদরে," তখন ভিজা কাপড় ও আমাদের দেহের ঘাম শুকায় কম ও আমাদের শরীরে তাপ বাড়ে—প্রাণ "আই ঢাই" করে।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে শরীর ঠাণ্ডা হইবার সুবিধা হয় যখন বাহিরের

তাপ হয় কম, বায়ুর চলাচল হয় বেশী এবং বাতাসে বাষ্পের পরিমাণ হয় কম। ভাদ্র মাসে বাহিরের উত্তাপ বেশী, বায়ু নিশ্চল এবং সম্পূর্ণভাবে বাষ্পে ভিজা। তাই এই সময়ে আমাদের অসুবিধা হয় সব চেয়ে বেশী। তোমরা সকলেই বায়োস্কোপ দেখিতে যাও। গরমকালে সেখানকার অবস্থা কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য আনে তা জান। বায়োস্কোপ হলের কষ্ট অক্সিজেন বাষ্পের অভাব বা কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্ বা অন্য বিষাক্ত বাষ্পের আধিক্যের জন্য নহে, ইহার একমাত্র কারণ ভাদ্র মাসের মত অবস্থায় শরীর ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়, এবং বেশী উত্তপ্ত হইলে অবস্থা সঙ্গীনও হইতে পারে।

আমাদের স্বাস্থ্যের সহিত শরীরের উত্তাপের তা হইলে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং সেইজন্য সুস্থ থাকিতে হইলে উত্তপ্ত, নিশ্চল, আর্দ্র আবহাওয়ার সময় আমাদিগকে কতগুলি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ বেশী জামা-কাপড় তাপ নির্গমনের প্রধান বাধা; সুতরাং গ্রীষ্মকালে জামা-কাপড় সব চেয়ে কম হওয়া চাই। জামা-কাপড় সূতির ও সাদা রঙ্গের হওয়া দরকার—কারণ সূতির কাপড় পশম রেশমের চেয়ে অধিক পরিমাণে 'তাপ-পরিবাহী' এবং সাদা রং বাহিরের উত্তাপে সব চেয়ে কম গরম হয়। কাপড়-জামা ঢিলা হওয়া দরকার যাহাতে শরীর ও কাপড়ের মধ্যে বাতাস না আটকাইয়া থাকে এবং স্বচ্ছন্দে চলাচল করিতে পারে। একটী ধুতি ও পাঞ্জাবী বা হাফ-কামিজ সব চেয়ে সুবিধাজনক। যত পার খালি গায়ে থাকারও চেষ্টা করিবে। ফ্যাসনের দোহাই দিয়া অসুস্থ হওয়ার কোন মানে নাই।

দ্বিতীয়তঃ যত পার বাহিরে থাক, গায়ে হাওয়া লাগাও। অবশ্য দুপুর রোদে ছাদে শুইয়া থাকিতে বলিতেছি না। ঘরে থাকার সময় যতটা পার বারাণ্ডায় থাক, দরজা-জানলা খুলিয়া রাখ। তাতেও যদি সুবিধা না হয় কৃত্রিম উপায়ে বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত দরকার হইতে পারে; অর্থাৎ পাখা চালাইতে হইতে পারে। দেখিতে হইবে যে ঘাম আস্তে আস্তে শুকাইয়া শরীরকে ঠাণ্ডা করিতেছে। টস্ টস্ করিয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে না।

তৃতীয়তঃ তেল মাখিয়া স্নান কর, বেশী জল খাও এবং গুরুভোজন ও

পরিশ্রম—যাহাতে শরীরের উত্তাপ বাড়ে, তাহা যত পার বাদ দাও। আমাদের দেশে ভাদ্র মাসে অসুখ-বিসুখ সব চেয়ে বেশী। উপরের উপায় অবলম্বন করিলে আশা করা যায় শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুস্থতা অনেক কম থাকিবে।

রামুর বুজরুকী

[বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক]

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

আমাদের পাড়ার রামু দিন কতক গা ঢাকা দিয়াছিল. হঠাৎ সে ফিরিয়া আসিল;—বড় বড় রুক্ষ চুল, কতক বা জটা বাঁধা; পরনে বাসন্তী রংএর কাপড়। আসিয়া রটাইয়া দিল, হরিদ্বারের কাছে হৃষীকেশের জঙ্গলে সে এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। তাঁহার নিকট সামান্য একটু যোগযাগ শিখিয়া আসিয়াছে।

পাড়ায় যাহারা দেবদ্বিজে একটু বেশী বিশ্বাসী তাহাদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সবাই রামুর পাদোদক খাইতে চায়; রামু এক বাটী জলে পায়ের বুড়া আঙ্গুল ডুবাইয়া দেয়—ভক্তেরা মুখে দিয়া অবাক্ হয়—পাদোদক এত মিষ্টি! দেখিয়া নিতান্ত অবিশ্বাসীদেরও মন ভিজিল।

তার পর দেখা গেল রামু প্রেতাত্মার সাহায্যে ভবিষ্যৎ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা অসাধারণ রকম মিলিয়া যাইতেছে! লোকে কোন প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলে রামু তাহাকে এক টুকরা চিঠির কাগজ দিয়া তাহাতে প্রশ্নটি লিখিয়া দিয়া ভাঁজ করিয়া রামুর হাতে দিতে বলে। কাগজে কি প্রশ্ন আছে রামুর তাহা জানিবার কথা নয়। কাগজ লইয়া রামু বরুণ দেবের পূজায় বসে। খানিকক্ষণ পূজার পর সে ভাঁজ করা কাগজখানি এক ঘটি জলে ডুবাইয়া তার পর তুলিয়া প্রশ্নকারীর সম্মুখে ধরে। প্রশ্নকর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া দেখে প্রশ্নের নীচেই স্পষ্ট অক্ষরে উত্তর লেখা রহিয়াছে।

এই সব ব্যাপারে রামুর রীতিমত পসার বাড়িয়া চলিল। এমন কি দু'একটা প্রশ্নের উত্তর না মিলিলেও কেহ সন্দেহ করিত না, তাহারা বলিত প্রেতাত্মারা কখনও কখনও বিরক্ত হইলে এমন উল্‌টা জবাব দেয়।

শেষটা কিন্তু একদিন রামু ধরা পড়িয়া গেল। তার বিস্তৃত কাহিনী আর তোমরা নাই শুনিলে। রামুর কৌশলগুলি শুধু বলিয়া দিতেছি।

পাদোদকের গুপ্ত কথা স্যাকেরিন্ ট্যাবলেট। যে কোনও ডাক্তারখানায় সামান্য মূল্যে এক শিশি ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ডায়াবেটিস রোগীরা অনেকে চায়ে চিনি না দিয়া স্যাকেরিন্ দেয়। ইহার মিষ্টতা চিনির চেয়ে অনেক বেশী। একটা ট্যাবলেট একটু গঁদের সঙ্গে মাড়িয়া পায়ের আঙ্গুলে মাখাইলেই হইল। জলের সম্পর্কে ঐ স্যাকেরিন্ আসিয়া উহাকে মিষ্ট করিয়া দেয়।

ভৌতিক লেখার রহস্য (Secret) টিংচার আয়োডিন ও বার্লি গোলা। রামু চিহ্ন-দেওয়া চার রকম চিঠির কাগজ রাখিত। বার্লি গোলা দিয়া সেগুলির তলায় লেখা থাকিত চার রকম জবাব। কোনটায়—'ভাল', কোনটায় 'ভাল নয়', কোনটায় 'হাঁ', কোনটায় 'না'।

একজন হয়তো প্রশ্ন করিল মোকদ্দমায় জিত হইবে কিনা। সে লোকটির একটি মোকদ্দমার সম্প্রতি রায় বাহির হইবে। স্বভাবতঃই মনে হইবে সে মোকদ্দমার কথা জানিতে চায়। তাহার কেস্‌টা দুর্ব্বল। তাহাকে একটা 'না' লেখা কাগজ দেওয়া হইল। যেখানে ওরূপ কোনও আন্দাজ করা চলে না সেখানে আন্দাজি কোনও একটা কাগজ দেওয়া যায়—সত্য হইবার সম্ভাবনা আধাআধি। না মিলিলে বলা যাইবে প্রেতেরা চটিয়া আছে, ফলে উল্‌টা জবাব দিয়াছে। আর যাদের মেলে তাহাদের অনেকেই গুরুতর ভক্ত, এমন কি দালাল পর্য্যন্ত হইয়া পড়ে।

তার পর বরুণ দেবের কথা। শ্বেতসার আর আয়োডিন মিলিলে নীল রং হয় তা হয়তো জান। ঘটির ভিতর টিংচার আয়োডিন মেশান জল থাকে, কাগজখানা তাহাতে ডুবাইলেই বার্লির (শ্বেতসার) অদৃশ্য লেখা নীল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

বিজ্ঞানের সাহায্যে এইরূপ অনেক জুয়াচুরী করিয়া সাধারণ লোকের চোখে ধাঁধা দেওয়া যাইতে পারে।

পকেটে আট দশটা শিশি সেলাই করিয়া বসান যাইতে পারে। প্রত্যেকটাতে এক এক রকমের গন্ধ থাকিবে। আর একটা বড় শিশিতে কয়লার গুঁড়া থাকিবে। মার্ক্ এর মেডিসিনাল্ চারকোল্ (Medicinal Charcoal) হইলে ভাল হয়। কাহাকেও গন্ধ দিতে হইবে 'বকুলে'র। বকুলের শিশিতে হাত দিয়া তাহার হাতে বকুল গন্ধ করা হইল। পরে আঙ্গুলটাকে কয়লায় ঘষিয়া নির্গন্ধ করা হইল। আর একজন চায় গোলাপ-গন্ধ, তাহাকে তাহা দেওয়া হইল। পকেটে শিশিগুলির অবস্থান হইতে কোন্‌টা কোন্ শিশি তাহা মনে রাখিতে একটু অভ্যাস দরকার।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

আবির্ভাব
২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮

তিরোভাব
২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

“চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্ল্লভ চন্দন কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি,
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যাঁর,
বেণু, বীণা জিনি মিঠা বাণী যাঁর খনি সুষমার,
চিত্ত প্রসাধনী পরী দিল যাঁরে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার, তাঁরে নমস্কার।”

* * *

“রাজার যদি হয় জুবিলী—কবির হ’তে পারবে সে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে, কবির পূজা সব দেশে।
চাণক্যের এই প্রাচীন বাক্য—লক্ষ কথার এক কথা—
রাজার যদি হয় জুবিলী, কবির হ’তে পারবে তা।”

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

* * *

“কোন্ সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি করে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে!
কত যে কথায় কাহিনীতে গানে সুরে কবিতায় তব
সেই আনন্দ-গোলোকের ধেনু রূপ নিল অভিনব।”

* * *

“এত রস পেয়ে নীরস শীর্ণ ক্ষুধিত মানুষ তরে
কেন কেঁদেছিলে, কেন কাঁদাইলে আজীবন প্রেম-ভরে?
শুনেছি সূর্য্য নিভে গেলে হয় সৌরলোকের লয়,
বাঙ্‌লার রবি নিভে গেল আজ, আর কাহারও নয়।”

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

“তুমি বুঝি দূর যুগে বীণা লয়ে বক্ষে
কেঁদেছিলে শরাহত ক্রৌঞ্চের দুঃখে?

হেরি বুঝি জানকীর ম্লান মুখ-ইন্দু
শ্লোকে গেঁথে রেখেছিলে অশ্রুর বিন্দু?
আজি সেই গমকের সাড়া পাই কর্ণে,
নব রস লভে ধরা গন্ধে ও বর্ণে।”

* * *

“গঙ্গাজলের সঙ্গে, নূতন নয়,
জনম জনম আছে তব পরিচয়।
তোমার ভস্ম পায় যদি পারাবার
হইবে তাহাতে অমৃতের সঞ্চার।”

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

* * *

“অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগল ভালো,
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝর্ণা হয়ে ঢাল্‌লো আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্তরাগে তোমার তূলির টানটি জাগে,
তোমার চরণাঙ্ক লভি’ তৃণাঙ্কুরও মন ভুলালো।”

—কালিদাস রায়

“ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে আমরা কেবল বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকে হারাই নি, মানবসেবায় প্রাণ-উৎসর্গ-করা একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদীকে হারিয়েছি।” —মহাত্মা গান্ধী

“রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির সব চেয়ে বড় প্রতীক,……বাল্মীকি ও কালিদাসের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে হয়।” —স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

“তাঁর বহুমুখী কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা দিয়ে তিনি পৃথিবীর চোখে ভারতের মর্য্যাদা বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে গেছেন।” —লর্ড্ লিন্‌লিথ্‌গো

“এ রকম আত্মা বিরল যার প্রতিভা ব্যক্তি বিশেষের একার সম্পত্তি নয়, সকলের সম্পত্তি। ডাঃ ঠাকুরের আত্মাও সেই রকম।” —স্যর্ মরিস্ গয়ার

বিশ্বকবির তিরোভাব

[শিশুদের পক্ষ হইতে লিখিত]

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি

বিশ্বকবির তিরোভাব হ'ল, নিঃস্ব বাংলা কাঁদে,
শ্রাবণ মেঘের ক্লান্ত বেদনা নুয়ে পড়ে অবসাদে।
জাহ্নবী-কূলে নামে কালোছায়া
উদাস করিয়া সংসার মায়া,
কবি নাই তবে কেন এ পৃথিবী শূন্য কুটীর বাঁধে ?
রবিহীন রাতে শুধু আঁখিপাতে বিরস বেদনা কাঁদে।

চিতার অনলে দাউ দাউ জ্বলে অন্তিম রবি-শিখা,
গঙ্গা-সলিলে শিহরিয়া ঝলে শেষ বারতার লিখা।
দূর গগনের লুকানো তারায়
সে বারতাখানি অসীমে হারায়—
বিধবা ধরার সীমন্তে যেন মুছে শেষ ললাটিকা।
উতলা বাতাসে সেই ব্যথা ভাসে,—নিবিল রবির শিখা।

গুমরিয়া উঠে সারা বাংলায়—"সে কোথায়, সে কোথায় ?"
ছুটি-পাওয়া ছেলে ঘর-বাড়ী ফেলে কোথা খেলিবারে যায় ?
ভাগীরথী-তটে যার তরী ঘাটে
প্রেমের পসরা দিল হাটে হাটে,
মা বলিয়া গেল সকল বধূরে পল্লী-কানন-ছায়,
এ গেহ পাসরি কোন্ ঘাটে তরী খেয়া দিল সে কোথায় ?

'সোনার তরী'তে তুলে নিয়ে গেল কোন্ মাঝি দূর দেশে ?
সেথায় কি তারে অরূপ-সাগরে ডুবাল সর্ব্বনেশে !

বাংলা মায়ের কোল হ'তে কাড়ি'
বিশ্বে বিলায়ে দিল কি বিথারি ?
কোটি মানুষের মনে মনে সে কি লুকোচুরি খেলে হেসে,
সদা সুখেদুখে সকলেরি বুকে আড়ি পাতে সব দেশে ?

আমরা বালক বাঙালীর ছেলে তারে ভালোবাসিয়াছি,
অন্তরে তার যে শিশুটি ছিল, তারে আঁকড়িয়া আছি।
চলিয়া গেল সে পিছে ফেলি তার
জল, মাটি, বায়ু এই বাংলার,
শিশু-জীবনের আয়ু রেখে গেছে, তাই নিয়ে মোরা বাঁচি ;
তারি পায়ে-চলা পথের কিনারে মোরা বাসা বাঁধিয়াছি।

সে গিয়াছে চলি,—'বকুল বনের পাখী' ত এখনো ডাকে—
লক্ষ্মীছাড়ারে গৃহহারা করে সুদূর পথের বাঁকে।
'দুয়ার বাহিরে' রঙ্গিনী ধরা
'লীলাসঙ্গিনী' কৌতুকে ভরা
কাজ ভাঙাবার গান গেয়ে তার জড়ায় মালার পাকে ;
ফাগুনের বনে ক্ষণে অকারণে মৌমাছি মনে ডাকে।

আষাঢ়ে এখনো ভরা গাঙে গাঙে জল ছলো ছলো বাজে,
ওপারে দেউলে আরতি ঘণ্টা শুনি মন্দির মাঝে।
তেপান্তরের মাঠ বেয়ে যেন
ঘোড়া ছুটে যায়, মনে লাগে হেন,
দূরে তালগাছে ব্যাঙ্গমা নাচে, ব্যাঙ্গমী গায় সাঁঝে।
আষাঢ়-গগনে মেঘ-গরজনে আহ্বান কার বাজে ?

এই আহ্বানে সে গিয়াছে চলি' কাজের সীমানা পারে,
সপ্তর্ষিরা যেদিকে চলিছে আকাশের পারাবারে।
আজি বঙ্গের জ্ঞান-বৃদ্ধেরা
তার স্মৃতি-গাথা রচে সেরা সেরা,
আমরা বালক রবির আলোকে গায়ে মাখি লব তারে ;
হাসিতে খুসিতে শত ছেলেমিতে ছড়াইব চারিধারে।

আমাদের তরে সে যে রেখে গেল সুন্দরতর ধরা,
মানুষের বুকে দিয়ে গেল গান স্বপনের সুরে গড়া।
জীবনের মাঝে অমৃত দিল সে,
গেহ ভরি' দিল স্নেহ-প্রেম-রসে,
পথের ধূলিরে ঢাকি দিল ফুলে নন্দন-বন-ঝরা।
মহামানবের মিলনে দিল সে সুন্দরতর ধরা।

স্মৃতি-মন্দির রচিবে বিরাট্ চিতাভস্মের পরে—
তাহারি মাঝে কি কবি ঘুমাইবে প্রস্তরময় ঘরে ?
সেকি আসিবে না বাহিরে ছুটিয়া
ছেলেমেয়ে সনে খেলিতে লুটিয়া ?
সে কি গাহিবে না বনমর্ম্মরে বিহগ-কলস্বরে ?
প্রতি প্রত্যূষে জাগিবে না তার কাব্য জীবন 'পরে ?

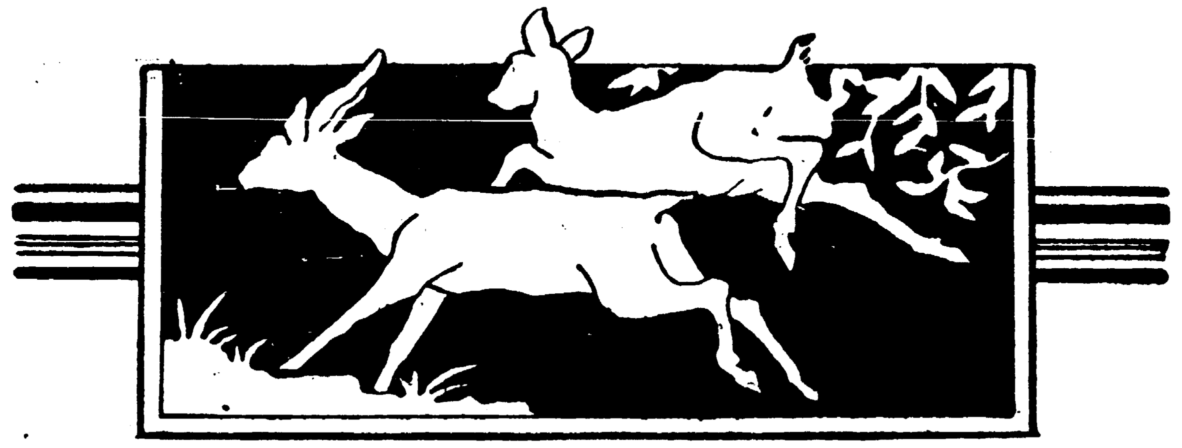

রবীন্দ্রনাথের আরো গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

গত আষাঢ় সংখ্যা রামধনুতে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবির জীবনের কয়েকটি গল্প তোমাদের শুনিয়েছিলাম। গল্পগুলি তোমাদের অনেকেরই নাকি ভাল লেগেছিল. এবং কেউ কেউ অনুরোধও করেছিলে ও রকম গল্প আর জানা থাকলে আরও কয়েকটি শোনাতে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

আজ কবি নেই। রবি-হারা বাংলা দেশ গভীর শোকে মুহ্যমান্। আজ স্বভাবতঃই কবির কথা—কবির সম্বন্ধে নানা রকম গল্প তোমাদের বেশী ক'রে শুনবার ইচ্ছা হবে। তাই সেই রকম আর কয়েকটি গল্প তোমাদের বল্‌ব। এরও অনেকগুলি কবির আত্ম-জীব্‌নী থেকে পাওয়া।

শিশু রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা খুব অনাড়ম্বরভাবে কেটেছিল। অত বড় ঘরের ছেলে, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতিতে কোন কিছুতেই কোন রকম বিলাসিতার প্রশ্রয় তিনি পান নি। দশ বছর বয়সের আগে কোন দিন তাঁর পায়ে মোজা ওঠে নি, শীতকালেও একটা সাদা জামার ওপর আর একটা সাদা জামা পরে তাঁকে শীত কাটাতে হ'ত। অবশ্য পায়ের জন্য এক জোড়া (তার বেশী নয়) চটী জুতো থাকৃত কিন্তু হাঁটবার সময় প্রায়ই তা পায়ের সঙ্গে থাকত না—

পায়ের আগে আগে চল্‌ত। দরজী অনেক সময় ছেলেমানুষ ব'লে তাঁর জামায় পকেট লাগান অনাবশ্যক বোধ করত। এইখানে ছিল রবীন্দ্রনাথের দুঃখ। বড় হয়ে তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন—"এমন বালক কোন অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই পকেটে রাখিবার মত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছু মাত্র নাই।"

তোমাদের মত ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের চকোলেট খাবার সৌভাগ্যও হয় নি। ও জিনিষটা তখনও বাংলাদেশে আমদানী হয় নি। ছেলেদের সখ মেটাবার জন্য তখন ছিল এক পয়সা দামের তিলে ঢাকা চিনির ডেলা—গোলাপী-রেউড়ি, এবং ঐ মহা মূল্যবান্ জিনিষটি শিশুকবির পকেট অনেক সময়ই চটচটে করে রাখত।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার কয়েকটি "অসাধ্য সাধনে" হাত দিয়েছিলেন। একবার তাঁর সখ হ'ল আতা খাবার। যে সে আতা নয়, নিজের হাতে গাছ বুনে সেই গাছে আতা ফলিয়ে তাই খেতে হবে। বারান্দার এক কোণায় খানিকটা ধুলো জমে ছিল, রবীন্দ্রনাথ তারই মধ্যে আতার বীচি পুঁতে সুরু করলেন জল দিতে। বলা বাহুল্য সে আতা আর তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। আর একবার তাঁর সখ হ'ল পড়বার ঘরে একটা নকল পাহাড় বানাতে হবে। তাঁর এক দাদার বাগানে ঐ রকম একটি পাহাড় ছিল, তাই দেখে তাঁর ঐ সখ জেগে থাকবে। সঙ্গীদের সঙ্গে সেই পাহাড় থেকে পাথর এনে এনে পড়বার ঘরের এক কোণে জড় করা হ'ল। শুধু তাই নয়, সেই পাহাড়ের গায়ে ফুলগাছের চারা পুঁতবারও ব্যবস্থা হ'ল। তার পর সেই 'পরম বিস্ময়জনক' সৃষ্টি গুরুজনদের ডেকে দেখাতে গিয়েই ঘট্‌ল যত বিপত্তি। কবির ভাষায়—"ইস্কুল ঘরের কোণে যে পাহাড় সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষা লাভ করিয়া বড়ই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম।"

আর একবার, রবীন্দ্রনাথ তখন থাকেন শিলাইদহে, তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কাছে। তাঁদের ঘরে মালী রোজ ফুলদানীতে ফুল সাজিয়ে দিয়ে যেত। রঙ্গিন ফুল দেখে শিশুকবির মনে সখ জাগল ঐ ফুলের রস বার ক'রে, কালির বদলে সেই রঙ্গিন ফুলের রস দিয়ে তিনি কবিতা লিখবেন। হাত দিয়ে টিপে যেটুকু

রস বার করা গেল তা'তে কলম ডোবান যায় না। রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবলেন, না, এতে হবে না, ফুলের রস বার করার জন্য একটা কল তৈরী করা দরকার। কলটা হবে এই রকম: একটা ছেঁদাওয়ালা কাঠের বাটী, তার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার জন্য একটা হামানদিস্তার নোড়া জাতীয় পদার্থ। ছুতোর ডেকে ফরমাস মত কল তৈরী করানো হ'ল। মহা উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ সেই কাঠের বাটী বোঝাই ক'রে ফুল নিয়ে কলে পেষাই করতে লাগলেন—কিন্তু রস এক ফোঁটা বেরোল না, শুধু ফুলগুলি চটকে কাদার মত হয়ে গেল। অবশেষে বিফলমনোরথ হয়ে কবিকে ফুলের রসে কবিতা লেখার আশা ত্যাগ করতে হ'ল। বড় হয়ে কবি এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—"জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম।"

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য বরাবরই খুব ভাল ছিল। এমন কি ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাবার ঝোঁকে শরীরকে অসুস্থ ক'রে তুলবার নানা রকম কৌশলও তাঁকে কাবু করতে পারত না। সারা দিন ভিজে জুতো পরে কাটাতেন—অথচ সর্দি হ'ত না, কার্ত্তিক মাসের হিমে সারা রাত খোলা ছাদে পড়ে থাকতেন, কিন্তু 'গলায় সামান্য একটু খুস্‌খুস্‌নি কাসিরও সাড়া পাওয়া যেত না'। মাঝে মাঝে অবশ্য পেট কামড়ানোর নাম ক'রে ইস্কুল ফাঁকি দিতেন, কিন্তু আসলে সে ব্যারামেও কখনও তাঁকে ভুগতে হয় নি। ক্বচিৎ কখনও জ্বর, থুড়ি 'গা-গরম', হ'লে বাড়ীর ডাক্তার এসে ক্যাষ্টর অয়েল আর উপোসের ব্যবস্থা করতেন। থার্মোমিটারের ধার ধারত না কেউ। পরের দিনই 'গা-গরম'কে পালাতে হ'ত। ঐ ক্যাষ্টর অয়েল ওষুধটা ছিল কবির দু' চোখের বিষ।

খুব ভোরে ওঠা স্বভাব ছিল তাঁর চিরকালের। ছেলেবেলায় একবার বাড়ীতে রাত জেগে যাত্রা শুনতে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হয়ে যায়। এই ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে কবি তাঁর 'ছেলেবেলা'য় লিখেছেন—"সূর্য্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি এ ঘটে নি আর কোনো দিন।" এর কিছু দিন পরে বাপের সঙ্গে ডালহৌসী পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে যে বিবরণ তিনি দিয়েছিলেন তা'তেও দেখি বালক রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ে দেশের সেই প্রচণ্ড শীতেও অন্ধকার থাকতে লেপের তলা থেকে উঠে

সংস্কৃত পড়া মুখস্থ করছেন—‘নরঃ—নরৌ—নরাঃ’। ভোরে ওঠার অভ্যাস তাঁর পরিণত বয়সেও যায় নি। শান্তিনিকেতনের একজন অধ্যাপকের মুখে শুনেছি—বোধ হয় সমস্ত শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের মধ্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ)ই রোজ সব চাইতে আগে শয্যাত্যাগ করতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও নাকি তিনি সুর্য্যোদয় দেখবার জন্য অন্ধকার থাকতে উঠে পড়তেন।

এইবার রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের দু’-একটি কথা বল্‌ব। তোমরা অনেকেই বোধ হয় শুনেছ প্রথম ভাগ পড়বার সময় ‘কর খল’ শেষ করে শিশু রবীন্দ্রনাথ যেদিন পড়লেন ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ সেদিন থেকেই তাঁর ভিতরকার কবি রবীন্দ্রনাথ মাথা তুলে দাঁড়াল। এই দু’টি কথা তো সব ছেলেই পড়ে—আমরাও পড়েছি, তোমরাও পড়েছ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ দু’টি কথায় যে কি যাদুমন্ত্রের আস্বাদ পেয়েছিলেন বড় হয়ে তার কথা বলতে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর জীবনে এইটেই ছিল আদি কবির প্রথম কবিতা। আরও একটি ছড়া ছিল তাঁর শৈশবের একান্ত প্রিয়—তাঁর ভাষায় “শৈশবের মেঘদূত”। সে ছড়াটিও তোমরা সবাই জান—“বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।” বড় হয়ে কবি এর ওপর যে চমৎকার কবিতাটা লিখেছিলেন্ তা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ।

এর পরে শিশু রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর পুকুর-ধারের বটের কাহিনী থেকে। আষাঢ় সংখ্যায় তোমাদের বলেছিলাম—রবীন্দ্রনাথদের বাড়ীর চাকর শ্যাম কি ক’রে সীতার গণ্ডীর মত গণ্ডী এঁকে শিশু রবিকে তার মধ্যে আটকে রেখে পালাত। সেই গণ্ডীর মধ্যে বসে বসে রবীন্দ্রনাথের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। সেখানটার সামনেই ছিল একটা জানলা, আর জানলার নীচেই ছিল একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। এই পুকুরের পূব দিকে ছিল একটা প্রকাণ্ড ঝুরি-নামা বটগাছ। পুকুরে নানা ধরণের লোক নাইতে আসত, রবীন্দ্রনাথ বসে বসে তাই দেখ্‌তেন—প্রত্যহ দেখতে দেখতে তাদের চলাফেরা যেন তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। দুপুর বেলা লোকজন চলে গেলে রবীন্দ্রনাথের মন অধিকার করে বস্‌ত ঐ প্রাচীন বট। তার গুঁড়ির চারদিকে অনেকগুলি ঝুরি নেমে এসে একটা অন্ধকার জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। দেখে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হ’ত—“দৈবাৎ

সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে।” এই রহস্যময় বটগাছের কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনে ভুলতে পারেন নি। এই বটগাছকে নিয়েই লেখা তাঁর বিখ্যাত কবিতা হয়তো তোমরা পড়েছ—

“নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট?” (শিশু)

আর একটি ঘটনার কথা বলি। একবার কলকাতায় খুব ব্যারামপীড়া দেখা দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথরা সপরিবারে পেনেটিতে গঙ্গার ধারে এক বাগান-বাড়ীতে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম বাড়ী থেকে বাইরে এলেন। সেখানে কি ভাবে তাঁর দিন কাটত তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—“সামনে গোটা কয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা-বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কি অপূর্ব্ব খবর পাওয়া যাইবে!”

রবীন্দ্রনাথের কবিতা লিখতে শিখবার গল্প তোমাদের আগের বারে বলেছি। এই ব্যাপার নিয়ে একবার একটা মজার কাণ্ড হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন নর্ম্মাল স্কুলে পড়তেন। স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ক’রে খবর পেলেন রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে জানেন। একদিন তাঁর কাছ থেকে ফরমাস এল অমুক বিষয় নিয়ে একটা কবিতা লিখতে হবে এবং সেটা ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ে শোনাতে হবে। যথা সময়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখলেন এবং ক্লাসে তা পড়ে শোনালেন। সহপাঠীরা কিন্তু কেউ লেখাটা বালক কবির নিজের লেখা বলে বিশ্বাস করল না। একজন বল্‌ল যে লেখাটা ছাপার বই থেকে চুরি—সে বই এনে দেখাতে পারে। বই কেউ দেখতে চাইল না, এমনিতেই সবাই সে কথা বিশ্বাস করল। এর পর ক্লাসে কবির সংখ্যা খুব বেড়ে গেল—এবং ঐ কবিরা কবিতা রচনার জন্য যে সহজ উপায় অবলম্বন করল তা খুব প্রশংসার যোগ্য নয়। এই সহপাঠীরা

বড় হয়ে একদিন কবি রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিল বলে গর্ব্ব অনুভব করত কিনা কে বলবে!

ঠিক এই রকম না হ'লেও অনেকটা এই ধরণের একটা ঘটনা বড় হয়েও রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটেছিল। অবশ্য এর জন্য রবীন্দ্রনাথের কৌতুকপ্রিয়তাও কতকটা দায়ী। 'ভানুসিংহ' এই ছদ্মনাম দিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের বই "ভানুসিংহের পদাবলী"র কথা তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান। বৈষ্ণব কবিদের আদর্শে এই কবিতাগুলি লেখা। প্রথম কয়েকটি কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বন্ধুকে বল্‌লেন, "দেখ, সেদিন সমাজের লাইব্রেরী ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভানুসিংহ নামে এক অজ্ঞাতনামা কবির লেখা কয়েকটি পুঁথি পেয়েছি। তাই থেকে কিছু কপি করে এনেছি, দেখ তো কেমন?" কবিতা শুনে বন্ধু খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বল্‌লেন. "এ পুঁথি আমার চাই। এ রকম কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়েও বেরোত না। আমি 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' নাম দিয়ে-এগুলি ছাপাবার ব্যবস্থা করব।" রবীন্দ্রনাথ হেসে বল্‌লেন, "এ রকম কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়ে নিশ্চয়ই বেরোতে পারে না—কারণ এগুলি আমার লেখা।" বন্ধু গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নি।"

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শ কবি ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। রবীন্দ্রনাথ যদি কখনও জানাতেন যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা তিনি বিহারীলালের মত কবি হবেন তবে তাঁর বৌদি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী) তাঁকে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিতেন।

এর পরের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' বইখানি তখন সবে বেরিয়েছে। এই সময় একবার তিনি সুপ্রসিদ্ধ রমেশ দত্ত মহাশয়ের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁদের বাড়ীতে গেছেন। সেই সময়ে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও সেখানে হাজির হলেন। রমেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি একগাছা ফুলের মালা নিয়ে বঙ্কিমের গলায় পরাতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র হেসে মালাটি নিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "এ মালা এঁর প্রাপ্য। রমেশ, তুমি এঁর লেখা সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়েছ?" তার পর বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের কাছে সন্ধ্যাসঙ্গীতের উচ্চ প্রশংসা সুরু করে দিলেন।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় রাজার মত সম্মান পেয়েছেন। তাঁর নিজের গড়া বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা তো অনেকে তাঁকে দেবতার মতই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। আশ্রমের সবাই (এবং বাইরেরও অনেকে—যেমন গান্ধীজি, জওহরলাল প্রভৃতি) তাঁকে ডাকতেন "গুরুদেব" ব'লে। বিদেশের ছাত্রেরাও তাঁকে কি রকম শ্রদ্ধা করত তার দু'-একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে আজকের গল্প শেষ করব।

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কয়েক বছর পর—রবীন্দ্রনাথ সেবার ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, নানা জায়গা থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসছে। বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও এসেছে, সেখানে তিনি বক্তৃতা দেবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগেই দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, সিঁড়িতে, সম্মুখের রাস্তায় হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেছে—কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। ছাত্রের সংখ্যাই বেশী, অন্য লোকও (স্ত্রীপুরুষ) কম নয়। সবাই ভারতের ঋষি কবিকে দেখতে চায়—তাঁর বক্তৃতা শুনতে চায়। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে আর এক লোকেরও ভিতরে যাবার রাস্তা নেই। যথা সময়ে রবীন্দ্রনাথর এলেন, কিন্তু কার সাধ্য ভিড় ঠেলে তাঁকে ভিতরে বক্তৃতামঞ্চে নিয়ে যায়? লোকে লোকে সমস্ত জায়গা যেন জমাট বেঁধে গেছে, ইচ্ছে থাকলেও কেউ সরে কবিকে পথ করে দিতে পাচ্ছে না। শেষে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "আমাদের মাঝ থেকে কয়েক শ' লোক এখান থেকে না বেরিয়ে গেলে কবিকে ভিড় সরিয়ে ভিতরে আনা সম্ভব হবে না।" অধ্যাপকের কথায় পাঁচ-ছ'শ' ছাত্র হলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, তখন কবিকে বহু কষ্টে বক্তৃতামঞ্চে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কবি অবশ্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লেন. শুধু তাঁদের জন্য তিনি অন্যত্র বিশেষভাবে আর একটা বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করবেন।

ডেনমার্ক্ সহরের রাজধানী কোপেনহেগেন্‌এ কবি পৌঁছলেন—রাত তখন বেশ গভীর। আর ডেনমার্কের শীতও বড় কম নয়। কিন্তু দেখা গেল, ঐ শীতেও হাজার হাজার ছাত্র মশাল হাতে ক'রে কবিকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে এসেছে। শুধু তাইতেই তারা সন্তুষ্ট নয়, সেই রাতে তারা কবিকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে নিয়ে গেল। পথে দেখা গেল, রাস্তার দু'ধারে

সেই সব ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও কাতারে কাতারে লোক,—সেই বরফ-ঝরা শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে তারা মশাল হাতে কবিকে বরণ করতে এসেছে।

কবি যখন চীন ভ্রমণে যান তখনও সেখানকার ছাত্রেরা তাঁকে কম শ্রদ্ধা দেখায় নি। ছাত্রেরা নাকি গভর্ণমেণ্টের কাছে অনুরোধ করেছিল ভারতের এই ঋষি কবিকে যেন চীন-সম্রাটের প্রাসাদের কাছে থাকতে দেওয়া হয়, এবং গভর্ণমেণ্ট ছাত্রদের সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারেন নি।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথা বার বার মনে পড়ছে—

"কে এমন পাইয়াছিল, কে এমন হারাইয়াছে?"

শান্তিনিকেতনে কবির শ্রাদ্ধবাসর

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

গত ২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার রাখীপূর্ণিমা তিথিতে আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ দেহাতীত হ'য়েছেন। ৩২শে শ্রাবণ রবিবার শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ঐ উপলক্ষ্যে আমরা পাঁচজন কলকাতা থেকে সেখানে গিয়েছিলাম। তারই কথা তোমাদের বল্‌ব।

৩০শে শ্রাবণ, শুক্রবার রাত্রে আমরা বোলপুর পৌঁছলাম। কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেই ঘোষণা করেছিলেন, কবির ইচ্ছামত শ্রাদ্ধকার্য্য বিনা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। হয়েছিলও তাই। আশ্রমবাসী ছাড়া শ্রাদ্ধবাসরে বাইরের মুষ্টিমেয় আমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করেছিলেন,—এঁদের মধ্যে আবার প্রায়ই শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রছাত্রী।

আমরা উঠেছিলাম সুরুল শ্রীনিকেতনে। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে বাস্ যাতায়াত করে—মাইল দেড়েকের মত রাস্তা। শনিবার। দিনে কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল না, তাই বিশেষ বিশেষ দর্শনযোগ্য জিনিষগুলো আর এবার দেখে নেওয়া গেল, যদিও আমরা কেউ এখানে নতুন নই।

দু'দিক্‌কার মাঠে কচি ধানগাছের দিগন্তপ্রসারী সবুজ আস্তরণ বিছানো। আরো দূরে—খোয়াই-এর দিকে—ফাঁকে ফাঁকে তালগাছের সারি। আমরা চলেছি লাল কাঁকর-বিছানো রাস্তায়। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের সঙ্গে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির এলোমেলো ছাট আস্‌ছে। অল্পক্ষণেই আমাদের রাস্তা ফুরিয়ে এল বটে, তবে মনে হ'ল,—এই যে আজ শ্রাবণের স্নিগ্ধ মেঘকজ্জল রূপটি, একেই উপলক্ষ্য করে গুরুদেবের অমর লেখনী কতই না বিভিন্ন ধারায় স্বতঃ উৎসারিত হ'য়েছে!

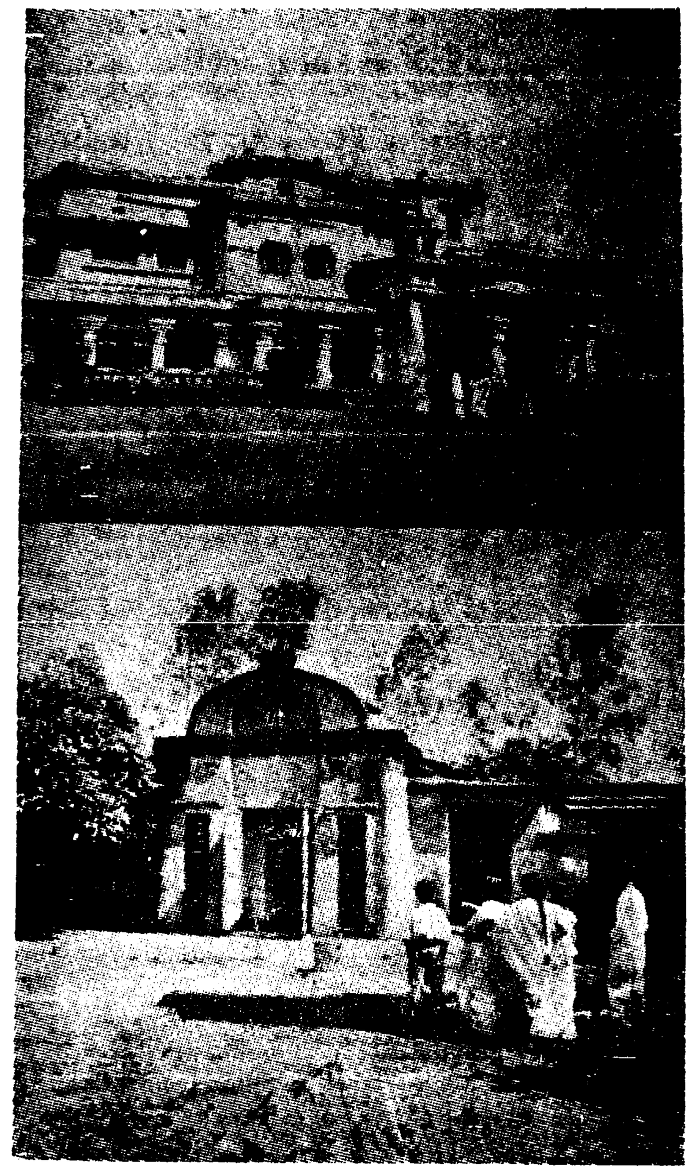

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর বাড়ী
উপরে—উত্তরায়ণ, নীচে—শ্যামলী

শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার কিছু পরে বৃষ্টি অত্যন্ত বেড়ে গেল। তার মধ্যেই আমরা চীনভবন, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম্, কলাভবন, উত্তরায়ণ, শ্যামলী, পুনশ্চ প্রভৃতি দেখে নিলাম। চীনভবনের পরিচ্ছন্নতা, লাইব্রেরীর সংখ্যাতীত পুস্তকের শ্রেণী ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর 'ফ্রেস্‌কো', মিউজিয়মের অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের বিশ্ববিখ্যাত চিত্রাবলী, কলাভবনে রামকিঙ্কর বেইজ মহাশয়ের ভাস্কর্য্য-শিক্ষাদান, উত্তরায়ণের স্থাপত্য শিল্প এবং ছোট্ট শ্যামলী ও পুনশ্চর চারুদর্শন রূপ মনকে যেন এক নতুন জগতে নিয়ে গেল। বিকেলের দিকে শ্রীনিকেতন কুটীরশিল্পাগার পরিদর্শন কর্‌লুম।

একটু সকাল ক'রে খেয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। ভোর চারটায় উঠ্‌তে হবে। রবিবারের অনুষ্ঠানপত্রের বিধিমতে সকাল ছ'টায় বৈতালিকদের গান। শ্রীনিকেতন থেকে একটা দল পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতন যাবে। আমরাও ঐ সঙ্গে যোগ দেব।

ঘুম ভাঙল ঠিক সময়টিতেই, কিন্তু বেরোতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। আমরা বৈতালিক দলটিকে আর ধর্‌তে পার্‌লাম না। আকাশের অবস্থাও তেমনি। 'মেঘে মেঘে নিরন্ধ্র গগন।' তবে বৈতালিক দলের 'ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ম্ময়, তোমারি হউক জয়'—এই সম্মিলিত গানটী দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ভেদ ক'রে আমাদের হৃদয়যন্ত্রেও একতারার মত বেজে উঠ্‌ছিল। ভিজতে ভিজতে শ্রাদ্ধ-মণ্ডপতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

আমন্ত্রিতেরা এলেন দল বেঁধে বৃষ্টির মধ্যেই। শ্রাদ্ধমণ্ডপটি সাজানোর ভার নিয়েছিলেন কলাভবনের প্রধান শিক্ষক নন্দলাল বসু, বিশ্বভারতী সচিব ও শিল্পী সুরেন্দ্রমোহন কর, আর রামকিঙ্কর বেইজ। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা। আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভ, শ্বেতকুমুদ, লীলপদ্ম আর রজনী-গন্ধার গুচ্ছ গুচ্ছ ভারে শ্রাদ্ধের স্থানটিকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করা হয়েছে। ঘৃতপ্রদীপ ও ধূপের গন্ধ চতুর্দ্দিক্‌ আমোদিত করছে। "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী"—সঙ্গীত-ভবনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক এই গানটি গাওয়া হ'ল। আর একটি গান হ'ল, তার প্রথমটা এই রকম :

"সমুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার!
তুমি হবে চিরসাথী
লও, লও হে ক্রোড় পাতি',
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতির ধ্রুবতারকা।" *

এর পর ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের আত্মার মঙ্গল কামনা ক'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, একটি সংস্কৃত শ্লোক গাওয়া হ'ল। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যম ও নচিকেতার কথোপকথনের মধ্যে মৃত্যুস্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। আরো একটী শ্লোক গীত হ'ল।

* এই গানটি গুরুদেবের দেহাবসানের পর গীত হয়, এ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ ক'রেছিলেন। সেই অনুসারে গত ২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার গুরুদেবের পরলোক গমনের দিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে এটি প্রথম গীত হয়।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার তাঁর পিতার আত্মার মুক্তি কামনা করলেন জ্যোতির্ম্ময়ের নিকট। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে' এই সঙ্গীতটি গাইবার পর অনুষ্ঠানের কার্য্য একরূপ শেষ হ'ল। তার পর সমবেত আশ্রমবাসীগণ 'কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে প্রাণ' এই গানটি গেয়ে সপ্তপর্ণী বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করলেন। এই গাছটির নীচে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিফলক রক্ষিত আছে। আমরাও এই শেষ গানের সঙ্গে আমাদের কণ্ঠ মিলাবার চেষ্টা কর্‌লাম।

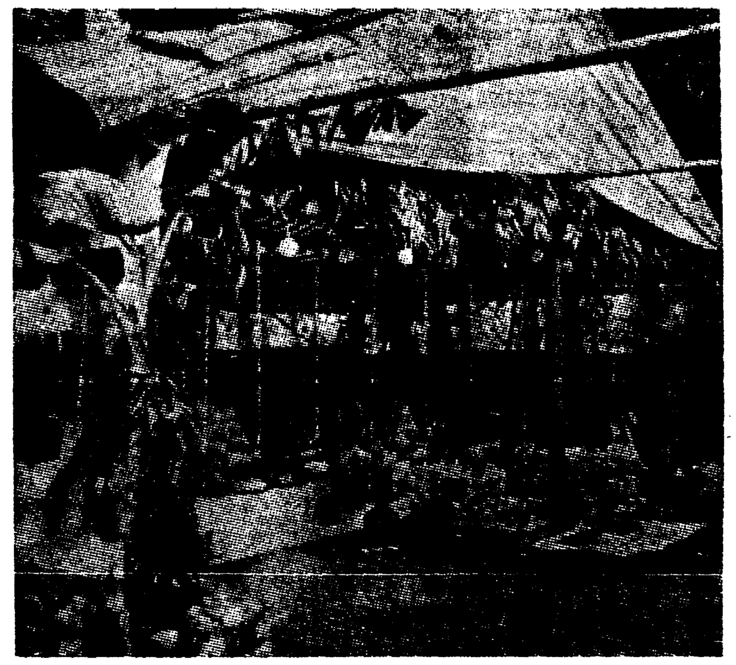
কবিগুরুর শ্রাদ্ধবাসরের একটি দৃশ্য

সব শেষ হ'য়ে গেল। চোখের জলের সঙ্গে অন্তরের সবটুকু ভক্তি ও ভালবাসা সেই সপ্তপর্ণী বৃক্ষটির নীচে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে আমরা উদীচীতে এলাম,—যেখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কয়টি দিন কাটিয়েছেন। দেখ্‌লাম, ঘরটিকে ফুল দিয়ে চমৎকার সাজানো হয়েছে। তাঁর অবস্থান-কালে যেমনি অনাড়ম্বর আসবাব দিয়ে ঘরটি সাজানো থাকৃত এখনও ঠিক তেমনি রয়েছে। শুধু আসল মানুষটি-ই নেই,—যে মানুষ এককালে এই নিভৃত নিলয়ে বসে আপন মনে কতই না অভিনব ছন্দে কল্পনার ইন্দধনুকে শরসঙ্গীত সংযোজনা কর্‌তেন। এখন কেবল স্মৃতির ব্যথা নিয়ে ঘরখানি যেন নিঃশব্দে মুখ বুজে আছে।

চোখ দু'টি হঠাৎ ছলছলিয়ে এল জলভারে। ফিরে এলাম ঘরের পথে,—যে পথের ধূলির মধ্যে গুরুদেবের অক্ষয় পদরেণু ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। সেই গৈরিক ধূলি এক মুঠো তুলে নিলাম, আর মনে মনে বল্‌লাম :

"যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,

যে মণি ছুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হ'ক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।" *

পাঁচ শ' বছর পরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনিভা ঘোষ

পাঁচ শ' বছর পরের রবীন্দ্রনাথ! তখন তাঁর অবস্থা কি রকম থাকবে,—কি চোখে দেখ্‌বে লোকে তখন রবীন্দ্রনাথকে আর তাঁর সৃষ্টিকে?

সেই সময়ে—অর্থাৎ পাঁচ শ' বছর পরে শিশুরা হয়ত ঠাকুরমার কোলে বিনিদ্র রজনী কাটাবার প্রয়াসে ঠাকুরমাকে গল্প বল্‌বার জন্য অনুরোধ ক'রে আব্দার ধরবে। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করবেন, "কার গল্প বলব,—বাল্মীকির?"

শিশুরা সমস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠবে, "না, না, সেই যে সেই কবির গল্প বল।"

ঠাকুরমা আবার শিশুদের মন বুঝবার ছলে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করবেন, "কার, কালিদাসের?"

শিশুরা অধৈর্য্য হয়ে ব'লে উঠবে, "তুমি কিচ্ছু জান না, ঠাকু'মা! সেই যে সেই বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁরই গল্প বল।"

ঠাকুরমা সুরু করবেন—"প্রকৃতির শান্ত ছায়ায়, শান্তিনিকেতন ব'লে একটা জায়গা ছিল। সেখানে প্রত্যহ এক 'শিশু' নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে এক নিকেতন গড়ে তুলেছিল। সেই স্রষ্টাই রবীন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন শিশুর খেলার সাথী, নারীর বন্ধু, বৃদ্ধদের সহায়, যুবকদের সম্পদ্। শিশুদের তিনি এত

* এই প্রবন্ধের আলোকচিত্র কয়টি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সমর সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। —লেখক

ভালবাসতেন যে নিজেই শিশু সেজে, রূপকথার রাজকুমারের মত বীরপুরুষ সেজে, কল্পনায় মাকে নিয়ে যুদ্ধ কর্‌তেন অচেনা কাল্পনিক বীরপুরুষদের সঙ্গে।" শিশুরা রূপকথার গল্পের মত রবি ঠাকুরের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে; রবি ঠাকুরকে তাদের মনের কাল্পনিক রাজকুমার ভেবে স্বপ্ন দেখবে।

তখনকার পণ্ডিতেরা ভাববেন রবি ঠাকুরের মত অত বড় একজন পুরাতন কবি কি কালিদাসের যুগের লোক? অথবা কালিদাসের মত অত বড় কবি কি রবীন্দ্রনাথের যুগের লোক? তাঁরা রবি ঠাকুর এবং কালিদাস, কে আগে এবং কে পরে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

কোনও কোনও পণ্ডিত হয়ত সিদ্ধান্ত করবেন রবি ঠাকুর কি একই জন কবি? না ঐ নামে দু' তিন জন কবি ছিলেন? যদি একজন হ'ন, তবে একজনের পক্ষে কি অত শত কবিতা লেখা সম্ভব? তখন আর একজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করবেন—না, ঐ নামে একই সময়ে, একই দেশে দু' তিন জন কবি ছিলেন—যাঁদের কবিতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে হয়ত ভানুসিংহের কবিতাবলী আবিষ্কৃত হয়ে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন আনবে। ভানুসিংহ এবং রবি ঠাকুর কি একই লোক? যদি বিভিন্ন লোক হন তবে তাঁদের কবিতার মধ্যে এত সামঞ্জস্য কেন? তখনকার যুগে কি সকলে এক ধরণের কবিতা লিখত?

তাঁদের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে। তিনি কি সত্যিই একাশী বছর বেঁচে ছিলেন? বেঁচে না হয় ছিলেন কিন্তু শেষ বয়স

যে মণি হুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।
ধূলায় তাদের যত হ'ক অবহেলা।
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।" *

পাঁচ শ' বছর পরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনিভা ঘোষ

পাঁচ শ' বছর পরের রবীন্দ্রনাথ! তখন তাঁর অবস্থা কি রকম থাকবে,—কি চোখে দেখ্‌বে লোকে তখন রবীন্দ্রনাথকে আর তাঁর সৃষ্টিকে?

সেই সময়ে—অর্থাৎ পাঁচ শ' বছর পরে শিশুরা হয়ত ঠাকুরমার কোলে বিনিদ্র রজনী কাটাবার প্রয়াসে ঠাকুরমাকে গল্প বল্‌বার জন্য অনুরোধ ক'রে আব্দার ধরবে। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করবেন, "কার গল্প বলব,—বাল্মীকির?"

শিশুরা সমস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠবে, "না, না, সেই যে সেই কবির গল্প বল।"

ঠাকুরমা আবার শিশুদের মন বুঝবার ছলে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করবেন, "কার, কালিদাসের?"

শিশুরা অধৈর্য্য হয়ে ব'লে উঠবে, "তুমি কিচ্ছু জান না, ঠাকু'মা! সেই যে সেই বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁরই গল্প বল।"

ঠাকুরমা সুরু করবেন—"প্রকৃতির শান্ত ছায়ায়, শান্তিনিকেতন ব'লে একটা জায়গা ছিল। সেখানে প্রত্যহ এক 'শিশু' নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে এক নিকেতন গড়ে তুলেছিল। সেই স্রষ্টাই রবীন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন শিশুর খেলার সাথী, নারীর বন্ধু, বৃদ্ধদের সহায়, যুবকদের সম্পদ্। শিশুদের তিনি এত

* এই প্রবন্ধের আলোকচিত্র কয়টি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সমর সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। —লেখক

ভালবাসতেন যে নিজেই শিশু সেজে, রূপকথার রাজকুমারের মত বীরপুরুষ সেজে, কল্পনায় মাকে নিয়ে যুদ্ধ কর্‌তেন অচেনা কাল্পনিক বীরপুরুষদের সঙ্গে।" শিশুরা রূপকথার গল্পের মত রবি ঠাকুরের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে; রবি ঠাকুরকে তাদের মনের কাল্পনিক রাজকুমার ভেবে স্বপ্ন দেখবে।

তখনকার পণ্ডিতেরা ভাববেন রবি ঠাকুরের মত অত বড় একজন পুরাতন কবি কি কালিদাসের যুগের লোক? অথবা কালিদাসের মত অত বড় কবি কি রবীন্দ্রনাথের যুগের লোক? তাঁরা রবি ঠাকুর এবং কালিদাস, কে আগে এবং কে পরে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

কোনও কোনও পণ্ডিত হয়ত সিদ্ধান্ত করবেন রবি ঠাকুর কি একই জন কবি? না ঐ নামে দু' তিন জন কবি ছিলেন? যদি একজন হ'ন, তবে একজনের পক্ষে কি অত শত কবিতা লেখা সম্ভব? তখন আর একজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করবেন—না, ঐ নামে একই সময়ে, একই দেশে দু' তিন জন কবি ছিলেন—যাঁদের কবিতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে হয়ত ভানুসিংহের কবিতাবলী আবিষ্কৃত হয়ে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন আনবে। ভানুসিংহ এবং রবি ঠাকুর কি একই লোক? যদি বিভিন্ন লোক হন তবে তাঁদের কবিতার মধ্যে এত সামঞ্জস্য কেন? তখনকার যুগে কি সকলে এক ধরণের কবিতা লিখত?

তাঁদের মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে। তিনি কি সত্যিই একাশী বছর বেঁচে ছিলেন? বেঁচে না হয় ছিলেন কিন্তু শেষ বয়স

পর্য্যন্ত কি তিনি কবিতা লিখেছিলেন? বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কবিতা লেখার প্রেরণা শক্তি তিনি কোথায় পেয়েছিলেন? তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন, তখন "রবীন্দ্রনাথ নামে একজন একাশী বৎসর বেঁচেছিলেন এ হয়ত সত্য, কিন্তু তিনি একাশী বৎসর অবধি কবিতা লেখেন নি নিশ্চয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ নামে আর একজন কবি বঙ্গের আকাশে উদিত হয়েছিলেন।" তখনকার লোকদের কাছে একাশী বৎসর হয়তো এক বিরাট যুগ। আর একজন হয়ত সিদ্ধান্ত করবেন যে রবীন্দ্রনাথ নামে দু'জন এবং ভানুসিংহ নামে আর একজন কবি ৫০০ বছর আগে একই সময় কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের এবং বার্দ্ধক্যের কবিতার পার্থক্য উপলব্ধি করে তাঁরা যৌবনের কবিকে এক রবীন্দ্রনাথ এবং বৃদ্ধ বয়সের কবিকে আর এক রবীন্দ্রনাথ বলে ঠিক করবেন।

ওদিকে নাট্যকারদের মধ্যেও হয়ত বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। তাঁরা ভাববেন, পাঁচ শ' বছর আগে এত বিভিন্ন নাটক কি একজন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—না তখন যাঁরাই নাটক লিখতেন তাঁদেরই রবীন্দ্রনাথ বলা হ'ত? এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা পুরোনো পুঁথিপত্র পরীক্ষা ক'রে ক'রে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলবেন।

বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন পর্য্যটকেরা এসে শান্তিনিকেতনের শ্যামলীকে এক রবীন্দ্রনাথের, জোড়াসাঁকোর বাসভবন আর এক রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ক'রে সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরবেন।

এমনও হয়ত হ'তে পারে, তখনকার যুগের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থ করবে: "অনেক—অনেক দিন পূর্ব্বেও এই বাংলা দেশে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-চর্চ্চার প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নামক এক প্রাচীন কবির কতগুলি কবিতা প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অতি যত্নের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত আছে।" রবীন্দ্রনাথের কথা চিন্তা ক'রে তা'রা আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাবে। তা'রা ভাববে, পাঁচ শ' বছর পূর্ব্বের পৃথিবীর সেই অনুন্নত আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-শক্তির মত কবিত্ব-শক্তি কেমন ক'রে বিকশিত হয়েছিল!

আজ থেকে পাঁচ শ' বছর পরে এক বর্ষা-মুখর রাতে বর্ষার বারিধারার সঙ্গে সঙ্গে একজন হয়ত অন্যের কানের কাছে অতি ধীরে ধীরে গাইবে:

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়—"

তৎক্ষণাৎ শ্রোতা গায়ককে জিজ্ঞাসা করবে, "এ কার লেখা? কোথায় পেলে?" বলে নিজেই তখনকার যুগের এক শ্রেষ্ঠ কবির নাম উল্লেখ ক'রে জিজ্ঞাসা করবে এটা তাঁর লেখা কিনা। গায়ক নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দেবে: "না, কে একজন প্রাচীন কবি রবীন্দ্রনাথের।" এই কে এক রবীন্দ্রনাথ, এই রবীন্দ্রনাথ থাকবেন সকলের মনের ছায়ায়, সকলের অন্তর স্পর্শ ক'রে।

এই নশ্বর জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথের পার্থিব দেহ বিলুপ্ত হ'লেও রবির রশ্মি যুগ যুগান্তর ধ'রে মানবের মনকে অভিভূত ক'রে রাখবে। এই পৃথিবীর কিছুই চিরস্থায়ী নয়। শাশ্বত পথিক কবিকেও আমাদের মাঝে চিরদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যে সৃষ্টি রেখে গেলেন তাঁর পিছনে, তাকেই নিবিড় ভাবে ধরে উপলব্ধি করব তাঁর পরশ। এটাই হবে আমাদের সান্ত্বনা।*

* বেহালার ইউনিক ক্লাবের 'রবীন্দ্রস্মৃতিতর্পণ' অনুষ্ঠানে লেখিকা কর্ত্তৃক পঠিত। গত পূজা সংখ্যা আনন্দ-বাজারের একটি প্রবন্ধের কাছে এই প্রবন্ধটি ভাবের জন্য কথঞ্চিৎ ঋণী।

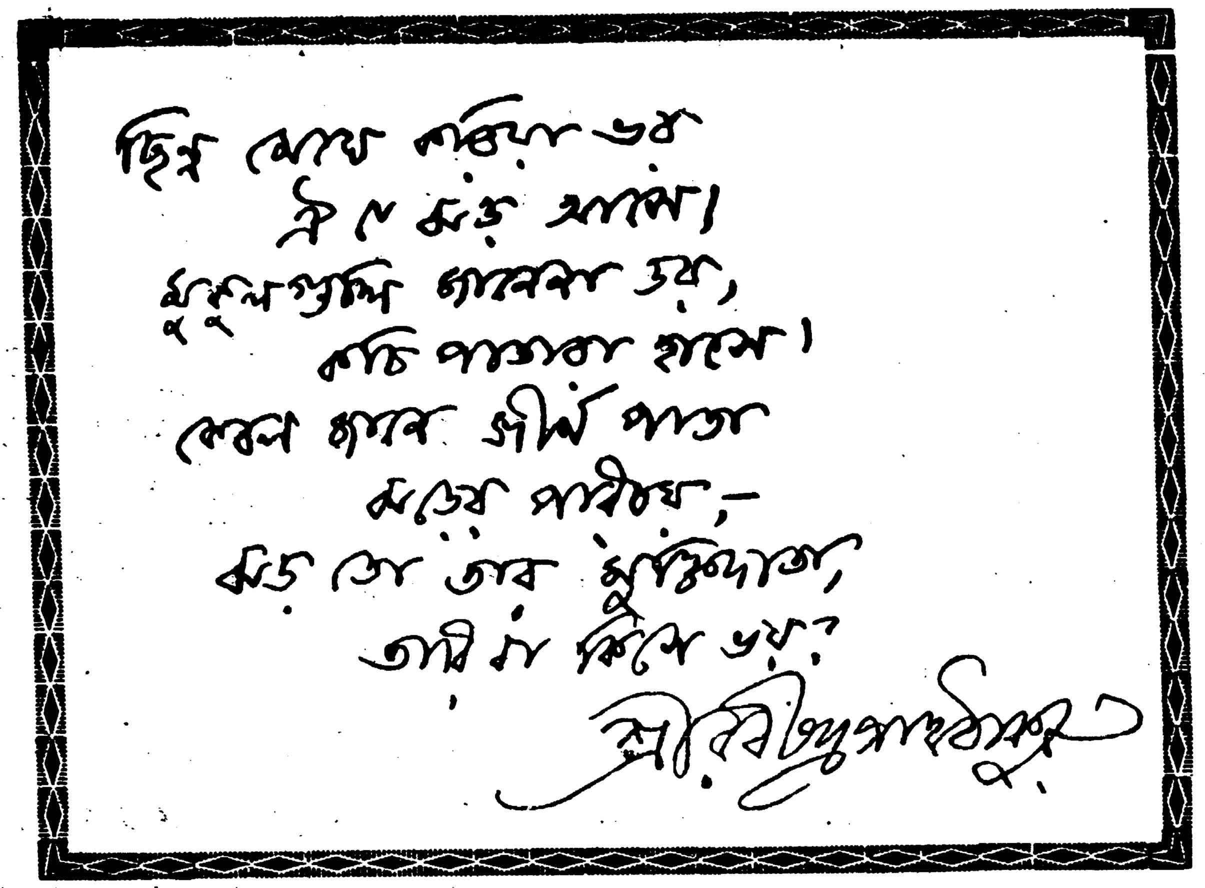

কবি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের সৌজন্যে

নানা কথা

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

আমেরিকার কাণ্ড

বড় জাতের জিনিষ বোঝাতে হ'লে চলতি কথায় আমরা কথার সঙ্গে একটা 'রাম' অথবা 'বোম্বাই' শব্দ যোগ করি, যেমন 'বোকারাম' অথবা 'বোম্বাই মূলো'। কিন্তু আমেরিকায় যা' বড় বড় জিনিষ হ'চ্ছে এবং হ'য়েছে তা'তে আমার মনে হয় যে 'আমেরিকান' বল্‌তেও বিরাট জিনিষ বোঝাবে। যেমন ধর', আমেরিকার মাউণ্ট পালোমারের উপর যে দূরবীণ সেদিন বসান হ'ল; তা'র কাচখানাই দু'শো ইঞ্চি চওড়া, সাতাশ ইঞ্চি মোটা, সাড়ে পাঁচশো মণ তা'র ওজন। কলোরাডো নদীতে এক বাঁধ দেওয়া হ'য়েছে, তা' সোয়া সাতশো ফুট উঁচু অর্থাৎ কলকাতার মনুমেণ্ট প্রায় পাঁচটা মাথায় মাথায় বসালে যতটা হয় ততটা

উঁচু। এই বাঁধ হওয়ার ফলে জল জ'মে ১০০ মাইল একটা হ্রদের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই জলকে বিদ্যুৎ উৎপাদন আর চাষের কাজে লাগান' হ'বে। এতেও কি হ'য়েছে? আর একটা বাঁধ হ'চ্ছে, তাতে খরচ হ'বে ১২০ কোটী টাকা, কলোরেডো নদীর বাঁধের চেয়ে তিনগুণ বড়, সেটা কলাম্বিয়া নদীর বাঁধ। আবার এই সেদিন আমেরিকার সাউথ ডাকোটা প্রদেশে মাউণ্ট রাশ্‌মোর পাহাড়ের কালো পাথর কুঁদে কত কি না কাণ্ড হ'চ্ছে! আস্ত পাহাড় কেটে চারজন প্রধান আমেরিকাবাসীর মূর্ত্তি তৈয়ারী হ'ল। তা'দের মধ্যে একজন জর্জ্জ ওয়াশিংটন, যিনি আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে সেনাপতি ছিলেন এবং পরে প্রেসিডেণ্ট্ হ'ন। বাকী তিনজনও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন, এব্রাহাম লিঙ্কন, থিওডোর রুজভেল্ট আর টমাস জেফার্সন। বহু দূর থেকে এই মূর্ত্তিগুলি দেখা যাবে। এ ছাড়া পাহাড়ের মধ্যে পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু আর আশী ফুট চওড়া একশো ফুট লম্বা একটা গুহা কেটে একটা হল্‌ঘর তৈরী হ'বে, তা'তে আধুনিক সভ্যতার সব নিদর্শন সামগ্রী রাখা হ'বে। তার পর পাহাড়ের গায়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার বর্গ ফুট্ জায়গা পালিশ ক'রে একটা ব্ল্যাক্‌বোর্ডের মত তৈরী হ'বে, তা'তে তিন ফুট্ খাড়া অক্ষরে আমেরিকার ইতিহাস সংক্ষেপে লেখা হ'বে। বোঝ' ব্যাপারখানা।

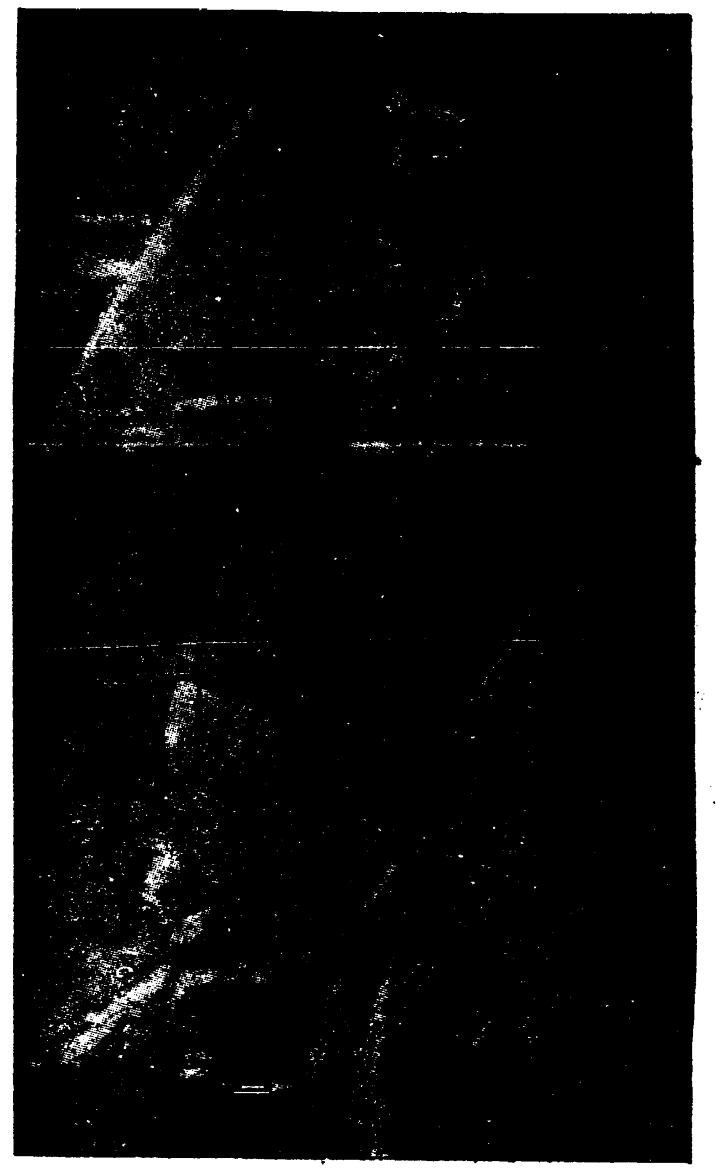

পাহাড়ের গায়ে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের বিরাট্ মূর্ত্তি

রাস্তার কথা

যাঁরা মেরুপ্রদেশে কুকুরের গাড়ী নিয়ে যা'ন, অথবা এক গাছা দড়ি আর

একটী লোহার গাঁতির সাহায্যে হিমালয়ের চূড়ায় ওঠেন, তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের ডাঙ্গায় চলাচল করতে হ'লেই রাস্তা লাগে। পায়ে চলার রাস্তা আবার যেমন তেমন হ'লেই হয়, সে মেঠো পথই হোক্, আর পাহাড়ের পাকদাণ্ডিই হোক্। কিন্তু তাড়াতাড়ি যেতে হ'লে ভাল বাঁধান রাস্তা চাই। মোটর গাড়ীর জন্যে আবার খুব ভাল পথ হওয়া চাই। পাথর দিয়ে অথবা পিচ্ ঢেলে অথবা সিমেণ্ট কংক্রীট দিয়ে রাস্তার ওপরটা বাঁধান চাই। ভাল পথঘাট থাকা সভ্যতার একটা লক্ষণ এবং প্রয়োজনও বটে। ভাল রাস্তার জন্যে জার্ম্মানীতে কয়েক বৎসর যাবৎই খুব উঠে প'ড়ে চেষ্টা হ'চ্ছে। ফলে সে দেশে মোট প্রায় দু'হাজার মাইল খুব উন্নত ধরণের পথ তৈরী হ'য়েছে। সেগুলোকে বলে অটোবান (autobahn)। এগুলি এমন ভাবে তৈরী হ'য়েছে যে ১১০ মাইল বেগে এর ওপর দিয়ে গাড়ী ছুটলেও কোনও ভয় নেই। পথের বাঁকগুলি আর চড়াই-উৎরাই এমন হিসেব ক'রে করা যে নির্ভয়ে গাড়ী ঐ বেগে ছুটতে পারে। প্রত্যেক রাস্তায় তিনটি ভাগ, এক ভাগ দিয়ে গাড়ীগুলি যাবে, আর একটা ভাগ দিয়ে আস্‌বে, প্রত্যেকটা ২২১ ফুট্ চওড়া। এই দুই ভাগের মাঝখানে আট দশ হাত্ চওড়া এক ফালি সবুজ ঘাসজমি থেকে এর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

মজার বৃষ্টি

আকাশ থেকে জলই পড়ে জান' আর কখনও কখনও জমাট্ জলের শিল পড়তেও দেখেছ। কিন্তু রক্তবৃষ্টি কিংবা ব্যাঙ বৃষ্টির কথা জান'? এও কখনও কখনও শোনা গেছে। নানা রকম প্রাকৃতিক কারণে এ রকম ঘটে। আবার মানুষের খোদকারীর ফলে বালি বৃষ্টিও হয়, যখন এরোপ্লেন থেকে মেঘের উপর বালি ছিটিয়ে মেঘ গলিয়ে বৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়। এই মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ ছাপান ইস্তাহার জার্ম্মানীর ওপর বৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে মজার বৃষ্টি হ'য়েছে আবার সেই আমেরিকায়। ডেন্‌ভার সহরের আবহাওয়া আফিস থেকে বায়ুমণ্ডলের বিষয়ে কতকগুলি খবর নেবার জন্য কতকগুলো বেলুন খুব উঁচুতে ওড়ান হয়। তা'র থেকে কতকগুলি যন্ত্র সিল্কের প্যারাশুটে বেঁধে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। সেগুলির গায়ে লেখা থাকে যে যারা যন্ত্র ও প্যারাশুটগুলি

কুড়িয়ে পাবে তা'রা যেন আবহাওয়া আফিসে ওগুলো ফেরৎ দিয়ে যায়। যথাসময়ে দেখা গেল যে যন্ত্রগুলি সবই আফিসে ফেরৎ এসেছে বটে, কিন্তু প্যারাশুটগুলি প্রায় সবই থেকে গিয়েছে, মেয়েরা তা' কেটে জামা বানাবার লোভ ছাড়তে পারে নি'। তাদের পৌষমাস, হাওয়া আফিসের সর্ব্বনাশ।

ভ্যাণ্টার ডাক্তারি

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ভ্যাণ্টা সেদিন এসে সোজা আমার ঘরের মধ্যে আমার পিঠে মস্ত এক চাপড় দিয়ে বললে—কী হে, কেমন আছো?

আমি খানিকক্ষণ চোখ পিটপিট ক'রে বললুম—এই কেটে যাচ্ছে একরকম।

—উঃ, টায়ার্ড, ডগ-টায়ার্ড! ব'লে, বলা নেই, কওয়া নেই, ভ্যাণ্টা আমার লক্ষ্মৌ ছিটে ঢাকা পরিপাটি বিছানায় চিৎপাত লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো। মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত শরীর রী-রী ক'রে উঠলো, কিন্তু—নেহাৎ ভালোমানুষ আমি—কিছুই বলতে পারলুম না। ভ্যাণ্টা বলতে লাগলো—তুমিই বলো ভাই নবা, সহরসুদ্ধু রোগী কি আমাকে ছাড়া আর ডাক্তার দেখতে পায় না! এই তো সেদিন মাত্র এসে বসেছি কলকাতায়—এর মধ্যেই দলে-দলে রোগী আসতে সুরু করেছে। দু'বেলা চেম্বর ভর্ত্তি, তার উপর কল্ কত! একখানা 'কার' না-হ'লে আর চলছে না হে!

আমি বললুম—হুঁ।

—উঃ, খেটে-খেটে মারা গেলাম একেবারে। আজ একদম পালিয়ে এসেছি, আজ আমার সারাদিন বিশ্রাম। ডক্টর পি. কে. মিটাহ্-কে আজ আর কোনো রোগীই খুঁজে পাবে না। হাঃ হাঃ!

ভ্যাণ্টা ঘোড়ার মতো হেসে উঠলো।

আমি মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, কী করা যায়। হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়বো এমন উপায়ও নেই, তা হ'লে ভ্যাণ্টার ডাক্তারির ফলে হয়তো বিনা রোগেই স্বর্গলাভ হ'য়ে যাবে। বাড়িতে

আগুন লাগা কি হঠাৎ কোনো দুঃসংবাদবাহী টেলিগ্রামের আবির্ভাব ছাড়া আর তো উপায় দেখি নে। ভিতরে-ভিতরে আমি ঘেমে উঠতে লাগলুম।

বিশ্বাস করো তোমরা—ভ্যাণ্টা সমানে দু' ঘণ্টা কত কী ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু ব'কে গেলো, আমি কাঠ হ'য়ে চুপ ক'রে রইলুম। কখনো বলি হুঁ, কখনো বলি হাঁ, কিন্তু শেষ পর্যান্ত তাও আর গলা দিয়ে বেরোয় না। ভ্যাণ্টা নিজেই নিজের রসিকতায় হাসে, নিজেই নিজের সঙ্গে তর্ক ক'রে আমার বিছানার চাদর বালিশের উপর কিল-ঘুঁষি চড়-চাপড় চালাতে চালাতে তার কথার তোড় কেবলই ফেনিয়ে উঠতে থাকে। আমি একদম আধ-মরা হ'য়ে গেলুম, মুখ নীল হ'য়ে গেলো, হাত-পা কাঁপতে লাগলো, কানের কাছে কেমন একটা পিঁ-পিঁ আওয়াজ শুনতে পেলুম।

এমন সময় আমার মা ঘরে ঢুকে বললেন—কী রে নবা, আজ আর নাওয়া-খাওয়া নেই? কেবল গল্পেই পেট ভরবে?

ভ্যাণ্টা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে মা-কে প্রণাম ক'রে বল্‌লে—কেমন আছেন, মাসিমা? ভালো আছেন তো?

মা বল্‌লেন—আর বোলো না বাবা, ভুগে-ভুগে সারা হলুম।

—কেন, মাসিমা, কী হয়েছে?

আমি কাসলুম, চোখ টিপলুম, ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলুম, কিন্তু মা কিছুই দেখলেন না, শুনলেন না, বুঝলেন না। বলতে লাগলেন—হার্টে যে কী ব্যামো হ'লো, সারেও না মরিও না। কত দিন যে আর এ-যন্ত্রণা—

ভ্যাণ্টা মহা উৎসাহে ব'লে উঠলো—এর জন্যে ভাবছেন, মাসিমা! আপনাকে এক্ষুণি সারিয়ে দিচ্ছি। একটা ইন্‌জেকশন—

মা বল্‌লেন—ও-সব ওষুধ-বিষুধ, ফোঁড়াফুঁড়ি তো কতই হ'লো—ওতে কিচ্ছু হয় না।

ভ্যাণ্টা হেসে বল্‌লে—সব ডাক্তার তো আর সমান নয়, মাসিমা। জর্ম্মানিতে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায় কত সব নতুন-নতুন আশ্চর্য্য ওষুধ বেরুচ্ছে, সব ডাক্তারই কি তার খবর রাখে? দাঁড়ান—আপনাকে আজকেই, এক্ষুণি একটা ইন্‌জেকশন দিচ্ছি—আপনার কষ্ট যদি না কমে তো কী বল্‌লাম।

মা বল্‌লেন—সত্যি কি তেমন কোনো ওষুধ আছে?

আমি দেখলুম, ব্যাপার মারাত্মক। ভ্যাণ্টার কথায় মা তো প্রায় বিগলিত। তাঁর দোষ কী—হার্টের ব্যামোয় বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন, যে-কোনো উপায়ে কষ্ট যদি কমে সে-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারেন না তিনি। এদিকে ভ্যাণ্টা বল্‌তে লাগলো—ওষুধ আছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন,

মাসিমা? ওষুধের কি অভাব আজকাল? রোজ স্যাম্প্‌ল্‌ই পাই কত! এই তো সেদিন শ্রীরামপুরে গিয়েছিলুম এক কল্‌-এ—হাঁপানির রোগী—এমন এক ইন্‌জেক্‌শন ঠুশলুম যার ওরা কোনোদিন নামও শোনে নি। ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে তো বেরিয়ে এসেছি, ষ্টেশনে ট্রেন ধরবো—এমন সময় দেখি পিছন-পিছন রোগীর বাড়ির লোক হৈ-হৈ করতে-করতে আসছে। এলে হবে কী—তক্ষুণি একখানা ট্রেন এসে দাঁড়ালো, আমি টুক ক'রে উঠে পড়লুম, আর ওরা ষ্টেশনে ঢোকবার আগে গাড়ি দিলে ছেড়ে—আধ ঘণ্টায় কলকাতায়। হ্যাঃ-হ্যাঃ!

ভ্যাণ্টার এই হাসির অর্থ ঠিক বুঝতে পারলুম না, জিজ্ঞেস করলুম—রোগী? তার কী হ'লো?

—কে জানে কী হ'লো! ম'রে গেলেই বা আমি কী করতে পারি বলো? ওষুধ তো ঠিকই দিয়েছিলুম, এখন রোগী যদি এমন বোকা হয় যে তাতেই টেঁশলো সে তো আর আমার দোষ নয়। কী কাণ্ড! হঠাৎ হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভ্যাণ্টা ব'লে উঠলো, বারোটা বাজে যে! নাঃ, বন্ধু-বান্ধব ভালোবাসি ব'লে আমার প্র্যাকটিসে যে কত ক্ষতি হচ্ছে তা আর বলবার নয়। মাসিমা, এই দেখুন, নবার কি উচিত হয়েছে আমাকে এ রকম আটকে রাখা? এখন এত বেলায়—

মা বল্‌লেন—এত বেলায় আর বাড়ি গিয়ে কী করবে, এখানেই স্নান ক'রে খেয়ে নাও।

উঃ, কী সাংঘাতিক! কী লোমহর্ষক! ভ্যাণ্টা স্নান করলো, খেলো, তার পর আরো জাঁকিয়ে বসে পান চিবোতে-চিবোতে যে-দরজি ওর পাৎলুন বানায় তার গল্প করতে বসলো। এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে—দাদাবাবু, মা যেন কেমন করছেন।

ছুটে গিয়ে দেখি, মা-র হার্টের কষ্ট হঠাৎ খুব বেড়েছে, কথা বলতে পারছেন না, আধ-শোয়া অবস্থায় বালিশে হেলান দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন কষ্টে। মা-র এ-রকম প্রায়ই হয়, তাই খুব চিন্তিত বোধ করলুম না, কিন্তু তক্ষুণি বেরিয়ে গেলুম আমাদের চেনা ডাক্তার অবিনাশবাবুর খোঁজে। ভ্যাণ্টাকে ব'লে গেলুম—তুমি একটু বোসো মা-র কাছে।

অবিনাশবাবুকে নিয়ে ফিরতে একটু দেরি হ'লো। এসে দেখি, মা-র চোখ কপালে উঠেছে, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, গলা দিয়ে ঘ্যাড় ঘ্যাড় আওয়াজ বেরুচ্ছে, আর ভ্যাণ্টা সামনে দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে দেখছে।

আমি ঘরে ঢুকেই বল্‌লুম—এ কী!

ভ্যাণ্টা চুপি-চুপি বল্‌লে—কিচ্ছু ভেবো না, একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি তারই রিয়্যাক্‌শন।

আমি বল্‌লুম—তুমি ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছো!

অবিনাশবাবু এগিয়ে এসে বল্‌লেন—কী ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন, দেখি ?

ভ্যাণ্টা ওষুধের শিশিটি অবিনাশবাবুর হাতে দিয়ে বল্‌লে—তুমি তো বেরিয়ে গেলে, আমি ভাবলুম দেরি ক'রে লাভ কী ? তক্ষুণি পাড়ার ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ আর ইন্‌জেক্‌শনের ছুঁচ নিয়ে এলুম, তার পর—

কিন্তু ভ্যাণ্টার কথার মাঝখানেই অবিনাশবাবু ব'লে উঠলেন—এ আপনি কী করেছেন ! তাঁর গলার স্বর শুনে আমার বুক কেঁপে উঠলো।

ভ্যাণ্টা আমতা-আমতা ক'রে বল্‌লে—কেন, কেন, এ তো···

আপনার মুণ্ডু ! আপনি কোথাকার ডাক্তার জিজ্ঞেস করতে পারি ? XY 29 যে হার্টের রোগের পক্ষে বিষ তা কি আপনি জানেন না ?

ভ্যাণ্টা বল্‌লে—য়্যাঁ, কী বল্‌লেন !

—চুপ করুন আপনি ! অবিনাশবাবু রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠলেন—যত সব—! তার পর ওষুধের ছোট্ট শিশিটাকে আলোয় তুলে ধ'রে ভালো ক'রে দেখতে দেখতে হঠাৎ অন্য রকম স্বরে ব'লে উঠলেন—এ কী ! এ কী ! তা হ'লে আপনি কী ওষুধ দিলেন ? এ-শিশির তো সীলও ভাঙেন নি, সব ওষুধই ভিতরে রয়েছে—

ভ্যাণ্টা ছুটে গিয়ে কোত্থেকে আর একটা ছোট্ট শিশি নিয়ে এলো। জিভে মস্ত কামড় দিয়ে বল্‌লে—বাঃ। সবটা 'ডিষ্টিল্‌ড্ ওয়াটার'ই দিয়ে দিয়েছি, ওষুধ দিতে মনে নেই।

অবিনাশবাবু বল্‌লেন—ভাগ্যিস মনে নেই। অতগুলো জল ঢুকিয়ে দিয়েও ভালো করেন নি, তাতেই কষ্ট বেড়েছে। তবে ঐ ওষুধ এক ফোঁটা গেলে··· যাক্ গে, আপনার হাতে উনি যে প্রাণে বেঁচেছেন এই যথেষ্ট।

ভ্যাণ্টার ডবল ভুলে মা তো সে-যাত্রায় রক্ষা পেলেন, কিন্তু ডবল ভুল যাদের বেলায় হয় না তাদের কী উপায় ?

পূজার উপহার

শ্রীদীপ্তেন্দ্র সান্যাল

হাসির নয়, কিঞ্চিৎ পরিহাসের ব্যাপারই ঘটে গেল। একটিমাত্র টাই নিয়ে—নগণ্য একটি অংশ পরিচ্ছদের, তাই নিয়েই এই প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদের সূচনা। ব্যাপারটা খুলেই বলা যাক্।

সকালে উঠেই দেখি আমার নামে দু' দুটো পার্সেল হাজির হয়েছে। অকারণ পুলকেই প্রথমটিকে চটপট মুক্ত করি। দাদার পূজোর উপহার ? হ্যাঁ, তাই। বাদামী রংএর সুদৃশ্য এক চামড়ার কেসের মধ্যে দামী চিঠির কাগজ রয়েছে কিছু, একদিকে ব্লটিং রাখার জায়গা, আর একদিকে কলম এবং পেন্সিল—এমন কি রবারের জন্যেও জায়গা আছে। ও, মাই গড্, একটা নোট্-বইও রয়েছে—বাঃ বাঃ, বেশ তো !

কিন্তু ওটা—ওটা আবার কে পাঠাল আমায় ? আর ত' আমার দাদা নেই—অবশ্য সখের দাদা আছেন অনেকগুলি, কিন্তু এমন সুখের দাদা ত আর নেই !

দ্বিতীয়টিকে খুলতেই কি না খুলতেই বিস্ময়ের বেগ সামলাতেই কেটে যায় বেশ কিছুক্ষণ। তার ভিতর রয়েছে একটি টাই, গলায় বাঁধবার। পাঠিয়েছে শ্রীমান্ দনুজেন্দ্র !

অবশেষে কি না পূজার উপহার এল দনুজের কাছ থেকে ! ওই শেষকালে প্রেজেণ্টেশান পাঠাল ! এত কাল ধরে ত' দেখছি ও যা কিছু পাঠায় নিশ্চিন্ত মনে নিজের দু' পকেটের মধ্যেই পাঠায়। ও-পাড়ার খলিফা ছেলে ও, ওর ধার-কাছ দিয়ে যেতেই কেমন ভয় করে। কে জানে কখন বা ধারই চেয়ে বসে ! ওই কিনা শেষটা—

যাই হোক্, পাঠিয়েছে যখন তখন একটা চিঠি দিতেই হয়। চিঠির কাগজ তো হাতের কাছেই রয়েছে—দাদাই পাঠিয়েছে। কিন্তু কি লেখা যায় ? ভেবে ভেবে লিখলাম :

"ভাই দনুজ,

আশাতীত আনন্দ পেলাম টাইটি পেয়ে। দাদা একটা লেটার কেসে সুন্দর কিছু চিঠির কাগজ পাঠিয়েছেন। সেই কাগজেই তোমায় লিখছি।·· ···"

নাঃ, অত খোসামোদ করা হবে না। চিঠিটা ছিঁড়ে আবার গোড়া থেকে সুরু করি :

"তোমার সুন্দর উপহার পেয়ে···" না, এও যুৎসই হচ্ছে না। ক্রমশঃই আমার চেষ্টা বাড়তে থাকে। কোন চিঠি আধ লাইন, কোন চিঠি এক লাইন লিখেই ছিঁড়ে ফেলতে হয়। অবশেষে, দাদার দেওয়া এত সাধের চিঠির কাগজ যখন আর মাত্র একটি বাকী থাকে, তখন, মোটামুটি একটা চলনসই গোছের চিঠি খাড়া করি।

ততক্ষণে আমি বেশ ক্ষেপে গেছি। কি দরকার ছিল ওর অমন একটা বিশ্রী উপহার পাঠিয়ে আমাকে বিপদে ফেলতে ? এদিকে ভদ্রতা রাখতে আমার যে প্রাণ যায় ! চিঠিটায় তাই একটু ঝাঁঝই বেরোল :

"তোমার পূজোর উপহার পেলাম। তোমার ল্যাজ থাকলে ওটা সেখানেই বেঁধে দিতাম। তোমার জন্যে দামী চিঠির কাগজগুলো সব গেল খরচা হয়ে, অবশ্য তোমার পাল্লায় পড়া অবধি, জানি, পৈতৃক প্রাণটাই খরচা হয়ে যাবে কোন্ দিন, এ আর এমন কি !···যাই হোক্ এ রকম

উপহার না পাঠিয়ে তুমি আমার কাছে টাইএর দাম চেয়ে নিলেই পারতে—আমি খুসী হয়েই দিয়ে দিতাম। কিন্তু...” ইত্যাদি।

কয়েক দিন পরে চিঠির জবাব এল :

“ভাই দীপেন্দ্র,

“তুমি আমার ওপর নিতান্তই চটেছ দেখছি। কিন্তু একেবারেই ভুল বুঝে চটেছ কিংবা কিছু না বুঝেই। টাইটাকে তুমি উপহার ব'লে ধরে নেবে এ আমি মোটেই আশঙ্কা করি নি।

“টাইটা মোটেই তোমাকে উপহার হিসেবে আমি পাঠাই নি। সম্প্রতি আমি এক জামা-কাপড়ের দোকানে কায নিয়েছি। ভেবেছিলাম বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কিছু মাল চালাতে পারব। তাই তোমাকেও পাঠিয়েছিলাম। টাইএর বাক্সটার মধ্যে ছোট্ট একটা বিল্‌ও ছিল, উত্তেজনার বশে সেটা তুমি লক্ষ্য কর নি হয়তো। যাই হোক্, দাম তো তুমি ‘খুসী হয়েই’ দিতে রাজী আছ, কাজেই ওটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলে আমার অশেষ উপকার হয়। জান তো, নতুন ব্যবসা—

—ইতি দনুজেন্দ্র।”

এর পরে আর দাম না দিয়ে পারা যায় না। নিজের চিঠিতে নিজেই গেঁথে গেছি। শেষটা আমাকে স্রেফ গরু বানিয়ে ছোকরা বধ করে গেল,—মানে গোবধ ক'রে গেল!

সতেরো নম্বর বাড়ী

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়

সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্। কতক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে তবু বিরাম নেই। পথ জলে ও কাদায় মাখামাখি, পথিকের পদে পদে বিড়ম্বনা—সম্ভ্রম বাঁচাবার অকারণ চেষ্টা। ব্ল্যাক্-আউটের টিনের মুখোস-পরা গ্যাস্‌পোষ্ট্‌গুলি পায়ের তলায় গোল ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে; চম্‌কানো আলো, এর চেয়ে ঘন আঁধারই ছিল ভাল। ড্রেনের ভিতর জল গড়িয়ে যাওয়ার কাতরানি—পৃথিবীকে বেঁধে জলে চুবিয়ে ধরা হয়েছে।

প্রশান্ত ও অশোক একটি সরু গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালো। দু'জনার গায়েই ওয়াটারপ্রুফ্ লম্বা কোট, মাথায় ওয়াটারপ্রুফ্ খোল-আঁটা টুপি,—ভিজে জবজবে, বাদামী রং কালো দেখাচ্ছে।

প্রশান্ত কপাল ও নাকের ডগা থেকে জল রুমালে মুছে বাড়ীর দেওয়ালে আঁটা রাস্তার নাম পড়লো—ননীগোপাল লেন।

অশোক বললো,—এই ত' এসে পড়েছি। তুমি বললে বাগবাজারের ট্রাম ডিপোর কাছে অথচ আধ ঘণ্টা হাঁটা হয়ে গেছে। এ দিক্‌টা কত নির্জ্জন দেখেছ!

—আমি আগে কখনো আসি নি; ভেবেছিলাম কাছেই হবে। যাই হোক্ এসে পড়েছি, এবার সতেরো নম্বর বাড়ী খুঁজে নিতে দেরী হবে না। দেখ, চুপ্‌চাপ্ গিয়ে পড়তে হবে, জানতে দেওয়া হবে না, চম্‌কে দিতে চাই।

ছেঁড়া ছাতা মাথায় এক পথিক থপ্ থপ্ করে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাচ্ছিল, চলে গেল।

দু'জনে আঁকা-বাঁকা সরু গলিতে এগিয়ে চললো, দু'পাশের বাড়ীর নম্বর কাছে গিয়ে চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে।

একটি ভাঙ্গা ফটকের সামনে এসে অশোক বললো,—এই যে সতেরো! নম্বর-প্লেট নেই বটে কিন্তু দেখ রং দিয়ে বড় বড় করে লেখা।

পাশের রোয়াকে একটি কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে ছিল। মাথা তুলে এক চোখে দেখলো, ল্যাজ নাড়লো, আবার শুয়ে পড়লো।

ফটক পেরিয়ে খানিকটা খোলা জায়গা, জলে ও কাদায় ভর্ত্তি। পাশে সাদা দোতালা বাড়ী। সমস্ত জানলা বন্ধ, অন্ধকার, কেবল উপরের একটি ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে সবুজ আলোর ছড়ি বেরিয়ে এসেছে।

নীচের দরজা হাট ক'রে খোলা। সন্তর্পণে দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। অন্ধকার বারান্দা হাতড়ে বার করা গেল সেই ঘরটি যার ভিতর সবুজ আলো জ্বালা।

দরজায় আস্তে টোকা মেরে প্রশান্ত ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো,—সব ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? একেবারে চমকে যাবে।

সড়াৎ ক'রে দরজা খুলে গেল। কে খুলে দিল দেখা গেল না। চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়লো। একটি বেশ বড় ঘর। দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া চেয়ার সাজানো। মাঝখানে গোল টেবিল ঘিরে পাঁচ জন লোক তাস খেলছে, পাশে রাখা থাক থাক সাজানো চকচকে টাকা! আরো কয়েকটি জিনিষ টেবিলে রাখা আপনি চোখে পড়ে যায়,—একখানি বাঁকা ধারাল ছোরা, একটি পিস্তল, ও একটি কাচের শূন্য গেলাস।

এই রাত্রে এত কম আলোতেও একজন লোক কালো চশমা পরে খেলছিল। হাতের তাস টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো,—এই যে, এসে পড়েছেন! আজ

বুঝি আপনাদের পাঠালো? বড় ছেলেমানুষ দেখছি,—কতদিন টিক্‌টিকির চাকরীতে ঢুকেছেন?

প্রশান্ত অবাক্। চম্‌কে দিতে এসে নিজেই চম্‌কে গেল। বললো, টিক্‌টিকির চাকরী মানে?

—বাঃ বেশ মস্করা করছেন! টিক্‌টিকি জানেন না? পুলিসের সুপুত্তুর যারা—আমাদের মত নিরীহ মানুষের পিছনে ঘুরে জ্বালিয়ে বেড়ায়। এই যে বসে একটু নিরিবিলি জুয়া খেলছি আপনাদের কি মশাই?

অশোক রেগেমেগে বল্লে,—কি বলছেন এ সব! আমরা এই প্রশান্তর মাসীমার বাড়ী এসেছি। আগ্রা থেকে তাঁরা আজ সকালে এসে সতেরো নম্বর বাড়ীতে উঠেছেন, চিঠি পেয়ে দেখা করতে এসেছি।

টেবিলের চারপাশের লোকেরা হো হো করে হেসে গড়িয়ে গেল। হাসি থামলে একজন নাকী সুরে বললো, 'মাসীর বাড়ী'!—আবার হো হো করে হাসি।

সেই কালো চশমা পরা লোকটি টাকার একটি থাক নাড়তে নাড়তে বললো,—দেখুন, আজ নতুন নয়, ও সব অনেক শুনেছি, বোকার মত মাসীর বাড়ীটা না বল্‌লেই পারতেন। আজ সকালে নতুন ভাড়াটে এসেছে স্বীকার করি, কিন্তু সতেরো নয়, সাতাশ নম্বরে। এমন জলের মত সোজা ধাপ্পা অন্ততঃ আপনাদের দিতে লজ্জা হওয়া উচিত। আপনাদের ফিস্‌ফিসানি গলির মোড় থেকে আমার লোক শুনে এসেছে। চমকে দিতে চেয়েছিলেন না? আশ্চর্য্য হচ্ছি, দলবল না নিয়ে মাত্র দু'জনে কোন্ সাহসে এলেন!

এবার প্রশান্ত ক্ষেপে গেল। ফস্ করে পকেট থেকে একখানা পোষ্টকার্ড বার করে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে বললো,—দেখুন মাসীমার বাড়ী কিনা। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে লাগলো।

টেবিলের চারপাশে যেন স্প্রিংএর তৈরী মানুষ ওরা। পোষ্টকার্ডের উপর এক সঙ্গে ঝুঁকেই দুলতে লাগলো হাসির দমকে। পৃথিবীর যেন সব চেয়ে অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব বস্তু ঐ চিঠিখানি।

বিস্মিতভাবে কাছে গিয়ে প্রশান্ত দেখে পোষ্টকার্ডে শুধু কালি জাবড়ানো, একটি অক্ষরও পড়া যায় না। মুঠোর রুমালে দেখলো অসংখ্য কালির ছাপ। মনে পড়লো বার বার মুখের উপর থেকে বৃষ্টির জল মুছে রুমাল পকেটে রেখেছে, ঐ চিঠির পকেটেই—ভুল করে। আশোকও ব্যাপারটি এক মিনিটে বুঝে নিয়েছে।

হাসি থামতে সেই কালো চশমা পরা লোকটি বল্‌লো,—ঢের হয়েছে মশাইরা, একেবারে নভিস্! আমাদের মত ঝানু জুয়াড়ীদের ধরতে এসেছেন! যান, ঐ দিকে চেয়ারে চুপ করে

দু'জনে বসুন গে, সেই ভোরের দিকে আমাদের খেলা শেষ হবে, তখন আচ্ছা করে পিটিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

খপ্ করে অশোকের হাত ধরে চাকার মত ঘুরে প্রশান্ত বিদ্যুৎবেগে দরজার দিকে ফিরলো। ফিরতেই এক হাতীর সঙ্গে কলিশন্, আচম্‌কা। কাফ্রী! কাফ্রীই বোধ হয় হবে। সমস্ত দরজা যুড়ে এক ভীমকায় কালো কুচ্‌কুচে মানুষ, কখন এসে দাঁড়িয়েছে কে জানে! প্রশান্তর মাথা তার বুকে ঠুকে গিয়ে টন্‌টন্ করে উঠলো। কিন্তু ঐ ইস্পাত বুকে যে কিছুই হয় নি সে কথা বিনা সন্দেহে বলা যায়। ভীষণকায় লোকটি দু'জনকে দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া চেয়ারের দিকে ঠেলে দিলো। গোল টেবিল ঘিরে পাঁচজন মানুষ তখন নিশ্চিন্তভাবে আবার খেলতে সুরু করে দিয়েছে।

চেয়ারে বসে প্রশান্ত বললো,—দেখলে অশোক, সাতাশের জায়গায় সতেরো লিখে মাসীমা তাড়াতাড়িতে কি মারাত্মক ভুল করেছেন। এতক্ষণ কত ভাল ভাল জিনিষ খাওয়া যেত, কত মজার গল্প করা যেত, না এখানে বন্দী হয়ে থাকা।

—শুধু বন্দী নয়, সকালে আচ্ছা করে পিটিয়ে ছেড়ে দেবে বলেছে, ভুলে যেও না। তখন নিজের বাড়ীও নয়, মাসীমার বাড়ীও নয়, সোজা হাসপাতালে গিয়ে উঠতে হবে।

—হ্যাঁ, ঐ কালো দুশমন ভীমভবানী যদি ধরে ত' একটি হাড়ও আস্ত রাখবে না। পাকেচক্রে আজ আমরা ডিটেক্‌টিভ্ হয়ে গেলাম! যদি একবার ছাড়ান পাই সব ক'টাকে পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিয়ে তবে আমার নাম।—প্রশান্ত গলা খাটো করে শেষ করে।

—মশাইরা, দয়া করে কথাবার্ত্তা বন্ধ রাখুন। আমাদের খেলায় ভুল হয়ে যাবে,—টাকা পয়সার ব্যাপার, ভুল মানেই পকেট সাফ্।—সেই কালো চশমা পরা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বললো।

কি করে, দু'জনে চুপ করে বসে রইলো, নির্জ্জীবের মত। ঘরের ভিতর তাস ভাঁজানোর পট্‌পট্ ও টেবিলের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা সরাবার খস্‌খস্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। পাঁচটি মানুষ বোবার মত খেলে যেতে লাগলো কথা না বলে। বাইরে তেমনি বৃষ্টি পড়ছে, ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্।

কত রাত কে জানে! বারোটা একটা হতে পারে, কি আরো বেশী। চারিদিক্ তেমনি নিস্তব্ধ! বাইরে জল পড়ার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, বোধ হয় বৃষ্টি থেমেছে। সেই কালো চশমা পরা লোকটি টেবিলে চাপড় মেরে বললো,—ব্যস! ঠিক একঘণ্টা বাদে ফিরে এসো কিন্তু, আর তাকে সঙ্গে এনো, বুঝলে? বাকী চারজনে উঠে বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। টেবিলের উপর তাস ও টাকা তেমনি ছড়ানো। লোকটি এক টুকরা কাগজে পেন্‌সিল দিয়ে কি সব হিসাব নিকাশ করতে লাগলো। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

হাতের কাগজ তাসের প্যাকেটে চাপা রেখে সেই কালো চশমা পরা লোকটি ডাকলো,—সুগ্রীব, সুগ্রীব!

প্রশান্ত ও অশোক বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইলো। কেউ এলো না, কোন উত্তরও এলো না।

—বেটা কুম্ভকর্ণ একবার ঘুমোলে আর রক্ষা নেই। বলতে বলতে লোকটি উঠে দরজার কাছে গেল। দরজার একটি পাল্লা খুলে এগিয়ে গিয়ে আবার ডাকলো,—সুগ্রীব!

সেই কালো চশমা পরা লোকটির সমস্ত দেহটাই দরজার বাইরে বারান্দায়, কেবল একটি হাতে দরজার পাল্লা ধরা। অশোক বাঘের মত লাফিয়ে দরজার উপর গিয়ে পড়লো। আটকে পড়া হাত এক নিমেষে হিঁচড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বারান্দায় একটা ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ হ'ল। ততক্ষণ অশোক খিল লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রশান্ত বসে নেই। খটাখট্ সমস্ত জানলা খুলে দিয়েছে। দেখা গেল মাঝের জানলায় একটি গরাদে নেই। দু'জনে প্রাণপণে চাপ দিয়ে পাশের গরাদে দুটি বাঁকালো, যাতে একজন মানুষ কষ্টে গলে বেরিয়ে যেতে পারে। বারান্দায় একটা শব্দ হ'ল, যেন মানুষের পায়ের আওয়াজ!

এক মুহূর্ত্ত দেরী করা নয়। ধুপ্ ধুপ্ লাফিয়ে পড়া, ফটকের ভিতর সেই খোলা জায়গাটায়। জলে কাদায় জামাকাপড়ের রইলো না কিছু। হাতে পায়ে ছড়ে গেল। সেদিকে জ্ঞান নেই। যখন রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছে অশোক আবিষ্কার করলো, মাত্র একটি পায়ে জুতো।

* * *

পুলিস ফৌজের সঙ্গে প্রশান্ত ও অশোক আবার যখন সেই সতেরো নম্বর বাড়ীতে ফিরে এসে পৌঁছালো তখন প্রায় ভোর হয়ে আসছে। সারা বাড়ী তন্নতন্ন করে খোঁজা হ'ল, কেউ নেই কোথাও। বেমালুম সরে পড়েছে, মায় আসবাবপত্র সমেত! সেই বড় ঘরটিতে এসে দেখলো, জানলা সব খোলা, সবুজ আলো তেমনি জ্বলছে। চোখে পড়লো দেওয়ালে আটকানো এক টুকরা কাগজে কালি দিয়ে আঁকা একখানি হাতের ছবি। একটা হাত মুঠো করে আছে, কেবল বুড়ো আঙুলটি সোজা, উঁচু করা,—তার মানে লবডঙ্কা!

রামধনুর পাঠকপাঠিকা, ছোট্ট বন্ধুরা,

শারদীয়া সংখ্যা হাতে নিয়ে আজ তোমাদের সামনে এসেছি। প্রতি বছর এ দিনটির জন্য কত না আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি, কিন্তু এবার যেন সবই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এবার আর আমাদের মধ্যে নেই এ কথা যেন কিছুতেই ভাবতে পারা যায় না।

এই সংখ্যায় কবির সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হ'ল। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আরও অনেক লেখা আমরা পেয়েছি, সেগুলি আস্তে আস্তে প্রকাশের ব্যবস্থা করব। তোমাদের কাছ থেকেও আমরা কবির সম্বন্ধে অনেক কবিতা, প্রবন্ধ এবং অজস্র চিঠি পেয়েছি—তার ছত্রে ছত্রে তোমাদের ছোট্ট হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তার থেকেও কিছু কিছু আমরা বারান্তরে প্রকাশ করব।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্ম্মূল্যের জন্য এবারকার রামধনুর পৃষ্ঠাসংখ্যা আশানুরূপ বাড়ান গেল না, আশা করি তবু তোমাদের ভাল লাগবে। তোমাদের 'রামধনু'কে তোমরা কি রকম ভালবাস তা তো আমাদের অজানা নেই!

পূজা-সংখ্যা ব'লে বরাবরকার মত ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি এবারে দেওয়া হ'ল না, আগামী বারে সেগুলি আবার বেরুবে। শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য একটি কৌতুক-নাট্যের অনুরোধ করেছেন। এবারে সেটা সম্ভব হ'ল না, শীঘ্রই তা দেবার চেষ্টা করব।

পূজার ছুটী কে কেমন কাটাচ্ছ, জানিও। প্রীতিসম্ভাষণ নিও। ইতি—

রাঃ সঃ

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

রাজপথ—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোণারপুর, ২৪ পরগণা। দাম—।৵০

এটি ছেলেদের জন্য লেখা একটি ছোট্ট নাটক। লেখক নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। এ বইখানি অভিনয় ক'রে তোমরা আনন্দ পাবে এবং তার ভাগ দর্শকদেরও দিতে পারবে।

মেবারের বীর তনয়—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ইউ. এন্. ধর এণ্ড কোং। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—১৲

রাজপুত বীরদের অমর কাহিনী। নৃপেন্দ্রবাবু শিশুসাহিত্যের যশস্বী লেখক। তাঁর হাতে পড়ে সে কাহিনী মধুরতর হয়েছে। ছোটরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এ বই শেষ করবে।

বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৪৮। সম্পাদক ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.টি, পি-এইচ্.ডি, সরস্বতী। প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—১৸০

প্রতি বছরের মত এবারেও মন-ভুলান রূপ নিয়ে এবং শিশুসাহিত্যের বহু বিখ্যাত লেখকের সরস রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এই বার্ষিকীখানি বেরিয়েছে। যুদ্ধের বাজারেও এমন মূল্যবান্ কাগজ ও এত প্রচুর ছবির ব্যবস্থা করা কম বাহাদুরীর কথা নয়। পজার দিনে এটিকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপহার বলা যেতে পারে।

রূপকথা—ভাদ্র, ১৩৪৮। সম্পাদক শ্রীরবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার বি.এ। পি. ৩১১, সাউদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা। বার্ষিক ২৷৵০, প্রতি সংখ্যা ।০।

ছোটদের মাসিক। দক্ষিণারঞ্জন, সুনির্ম্মল প্রভৃতি বিভিন্ন খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিকের লেখায় এই সংখ্যা সমৃদ্ধ, এবং গল্প, প্রবন্ধ, ছবি, খবরাখবর প্রভৃতি ছোটদের উপযোগী নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। পত্রিকাখানির দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। আমরা এর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সম্প্রতি কলকাতায় সাহিত্যিক মহল থেকে সুবিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান বাংলা সাহিত্যে বড় কম নয়। 'বীরবল' এই ছদ্ম নাম নিয়ে তিনি যে রস পরিবেশন করেছেন তার কথা বাঙ্গালী কোন দিন ভুলবে না। আর একটা ব্যাপারে 'বীরবলের' নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রচলন ধরতে গেলে তিনিই প্রথম সুরু করেন এবং তারই জন্য এই ভাষাকে বলা হয় "বীরবলী ভাষা"। প্রথম যখন তিনি এই ভাষায় লেখা সুরু করলেন তখন তার বিরুদ্ধ সমালোচনা বড় কম হয় নি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাংলার সাহিত্যিকরা যে আস্তে আস্তে এই ভাষাকেই বেছে নিচ্ছেন তার প্রমাণ পেতে কষ্ট হয় না। দেশবাসীর কাছে এ সম্বর্দ্ধনা তাঁর প্রাপ্য ছিল।

আমরা শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

*　　*　　*

কলকাতার আই-এফ্-এ শীল্ডের খেলা যথা সময়ে শেষ হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং কে. ও. এস্.বি দলকে ২—০ গোলে হারিয়ে

দ্বিতীয় বার শীল্ড্ বিজয়ের সম্মান লাভ করল। ভারতীয় দলের মধ্যে মোহনবাগান ও এরিয়ান্স ছাড়া আর কোন দল এ শীল্ড্ পায় নি, এবং মহমেডান্ স্পোর্টিং ছাড়া দু' বার কোন ভারতীয় দলই পায় নি। এবার তারা ৭ম বার লীগ্ও পেল। তাদের এ কৃতিত্বের তুলনা নেই।

*　　*　　*

এবারে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতি-যোগিতা হয়ে গেছে। সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রতিযোগিতার কথা বলছি। বিভিন্ন প্রদেশের বাছাই-করা দলের মধ্যে এই খেলা হয়। ফুটবলে এ রকম খেলা এ দেশে এই প্রথম। ফাইনালে বাংলা দলই বিজয়ী হয়ে কাপ পেয়েছে। তারা প্রথমে বিহারের সঙ্গে একদিন ড্র রেখে পরের দিন ৪ গোলে জয়ী হয়। সেমিফাইনালে বোম্বাইকে ১—০ গোলে হারায়; ফাইনালে দিল্লী দলকে ৫—১ গোলে হারায়। বোম্বাই দলের সঙ্গে তাদের খেলাটি দেখবার মত হয়েছিল।

*　　*　　*

জার্ম্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ সমানে চলেছে। জার্ম্মানী গোড়ায় যে ভাবে সুরু করেছিল তা'তে অনেকে মনে করেছিল রাশিয়ার পক্ষে হয়তো মুশ্কিলই হবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাশিয়ার কাছে জার্ম্মানী প্রবল ভাবে বাধা পাচ্ছে, রাশিয়ান্রা সমানে প্রতি-আক্রমণ করতেও কসুর করছে না। সম্প্রতি লেনিনগ্রেডের কাছে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে। এদিকে জাপানের মতিগতি বিশেষ সন্দেহজনক। ইতিমধ্যে তারা ইন্দোচীনের কাছে নানা সুবিধা আদায় করেছে; শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডেও নানা সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় আছে।

এদিকে ইরাণে জার্ম্মান্ প্রতিপত্তি বন্ধ করবার জন্য ইংরেজ ও রাশিয়ান্ বাহিনী সেখানে হাজির হয়েছে। ইরাণ সরকার তাদের বাধা দেয় নি।

*　　*　　*

সম্প্রতি কল্‌কাতায় 'ত্রিবাঙ্কুর'নামে একখানি ছোট যুদ্ধজাহাজ তৈরী হয়েছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা এর জন্য টাকা দিয়েছেন। এর এঞ্জিনের কতক অংশ ছাড়া সবই এদেশে তৈরী। ওদিকে হিন্দুস্থান এরোপ্লেন তৈরীর কারখানা থেকে একখানি এরোপ্লেন তৈরীও শেষ হয়েছে।

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

বিষয়:—"আশ্বিন (১৩৪৮) সংখ্যা রামধনুর একটি নিরপেক্ষ সমালোচনা।" সঙ্গে নীচের কুপনটি পূর্ণ করে পাঠাতে হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে আলাদা কুপন না থাকলে তা গ্রাহ্য হবে না। ২টি পুরস্কার দেওয়া হবে—একটি ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য, একটি ১৬ বছরের বেশী যাঁদের বয়স তাঁদের জন্য। ১০ই কার্ত্তিকের মধ্যে লেখা আমাদের কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

এইখানে কাট

রা. আ'৪৮

নাম..

ঠিকানা..

বয়স..

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) ছত্র (২) বাস (৩) শির (৪) জীবন (৫) বই (৬) শাল (৭) অক্ষর (৮) পুরী (৯) কল (১০) কুল।

(উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।)

নূতন ধাঁধা

নীচের ফাঁকগুলি এমন এক-একটি শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে যে প্রত্যেক বার প্রথম ফাঁকে যা বসবে দ্বিতীয় ফাঁকেও সেই শব্দটিই বসবে।

(১) কি, — নিয়ে খোঁটা, তবে ঐ — দিয়েই তোমার মাথা ভাঙব।

(২) — আছে ও —বাস নিয়ে, ওদিকে ওর — যে সংসার ছেড়ে —জী হয়ে গেল তাঁর খোঁজ নেই!

(৩) — দিও না, বরং — পেতে দিচ্ছি, মার।

(৪) ও কার — বাইরে, — এল কি?

(৫) — ছাদ পাব কোথায়, চাল যে — র।

(৬) তোমার একমাত্র — — দিয়ে প্রহার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। সেজন্য কার্ত্তিকের 'রামধনু' ১লা কার্ত্তিক বাহির না হইয়া কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে।—রাঃ কাঃ

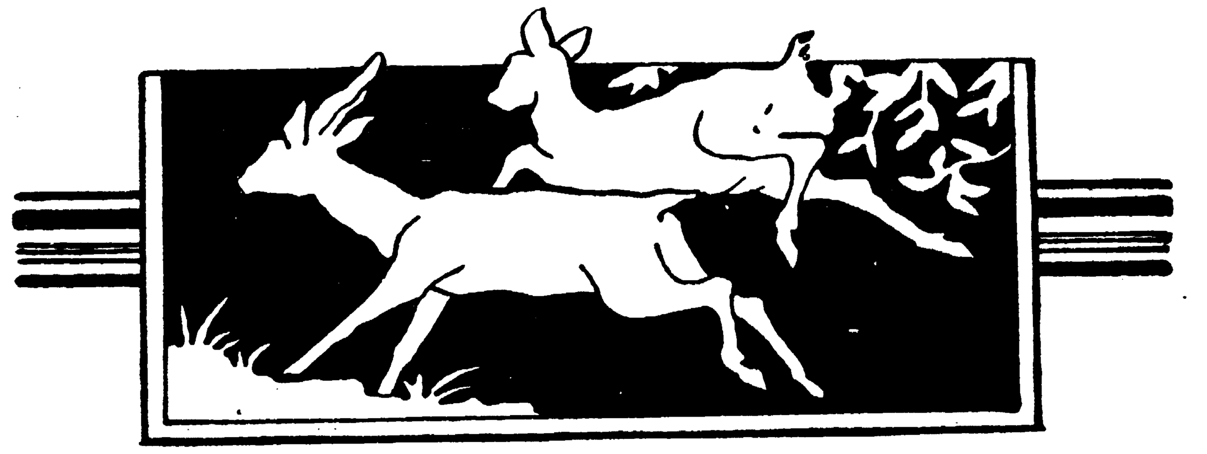

এবার পূজায় চাই-ই

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

অজস্র ছবি অজস্র হাসি

অজস্র মজা

দাম আট আনা

মৌচাক বলেন :—

"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

আধুনিক-যুদ্ধ প্রণেতা শ্রীভবেশচন্দ্র রায় এম্.এস্-সি ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত আর একখানা বহুতত্ত্ব সম্বলিত সাধারণ জ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থ :—

নানা কথা

এই গ্রন্থে আছে—পৃথিবীর নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিষয়; বিংশশতাব্দীর প্রসিদ্ধ নর-নারীর কথা, নিত্য ব্যবহার্য্য কতিপয় সংক্ষিপ্ত করণ; সাহিত্যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, পদার্থ-বিদ্যায়, রসায়ন শাস্ত্রে ও শান্তি-প্রচেষ্টায় নোবেল প্রাইজ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গবেষণার ধারা ও কথা, যুদ্ধের ধারা ও অস্ত্র-শস্ত্রের পরিচয় ও আরো কত কি?

প্রত্যেক অভিভাবক এই গ্রন্থ পড়িয়া ও ছেলেমেয়েদিগকে পড়াইয়া তাহাদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করুন।

প্রকাশক—নরেন্দ্রনাথ সিংহ

প্রাপ্তিস্থান—ভারত-সাহিত্য ভবন,

২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত

ভূমিকা

ও

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার কর্ত্তৃক

গ্রথিত

কবিগুরুকে জানা আমাদের প্রত্যেকের দরকার। তাঁর আদর্শ জীবনী পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন যে আজ আমরা কি হারাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের স্নেহপাত্র ও তাঁহার সংস্পর্শিত এবং সবুজপত্রের সমসাময়িক লেখক দ্বারা লিখিত তাঁহার এই জীবনবৃত্তান্ত।

দে ব্রাদার্স এণ্ড কোং

বোলপুর—বীরভূম। ব্রাঞ্চ :—৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C–1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাক্‌লেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

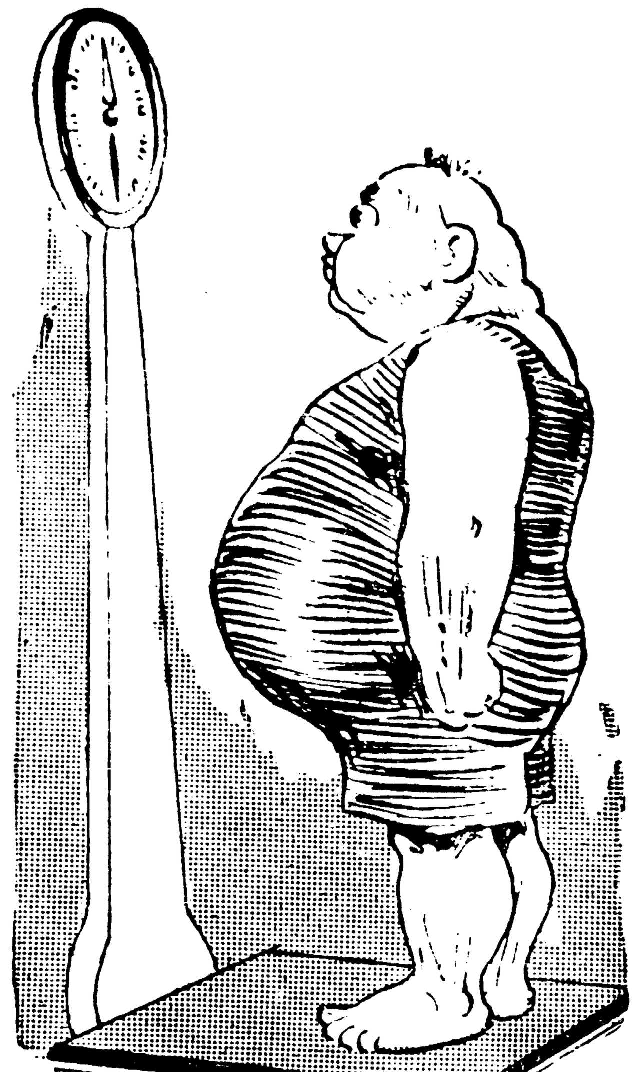

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

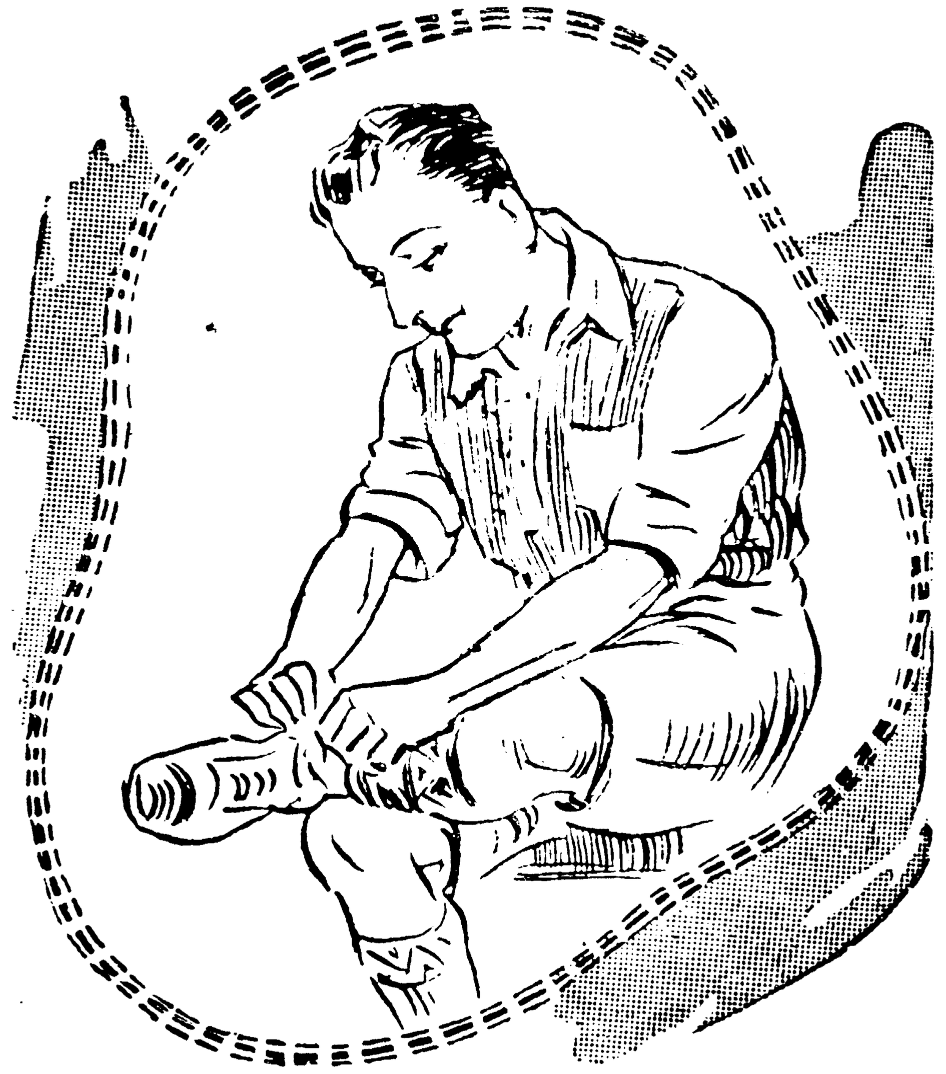

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover : C. H. Aran & Co.

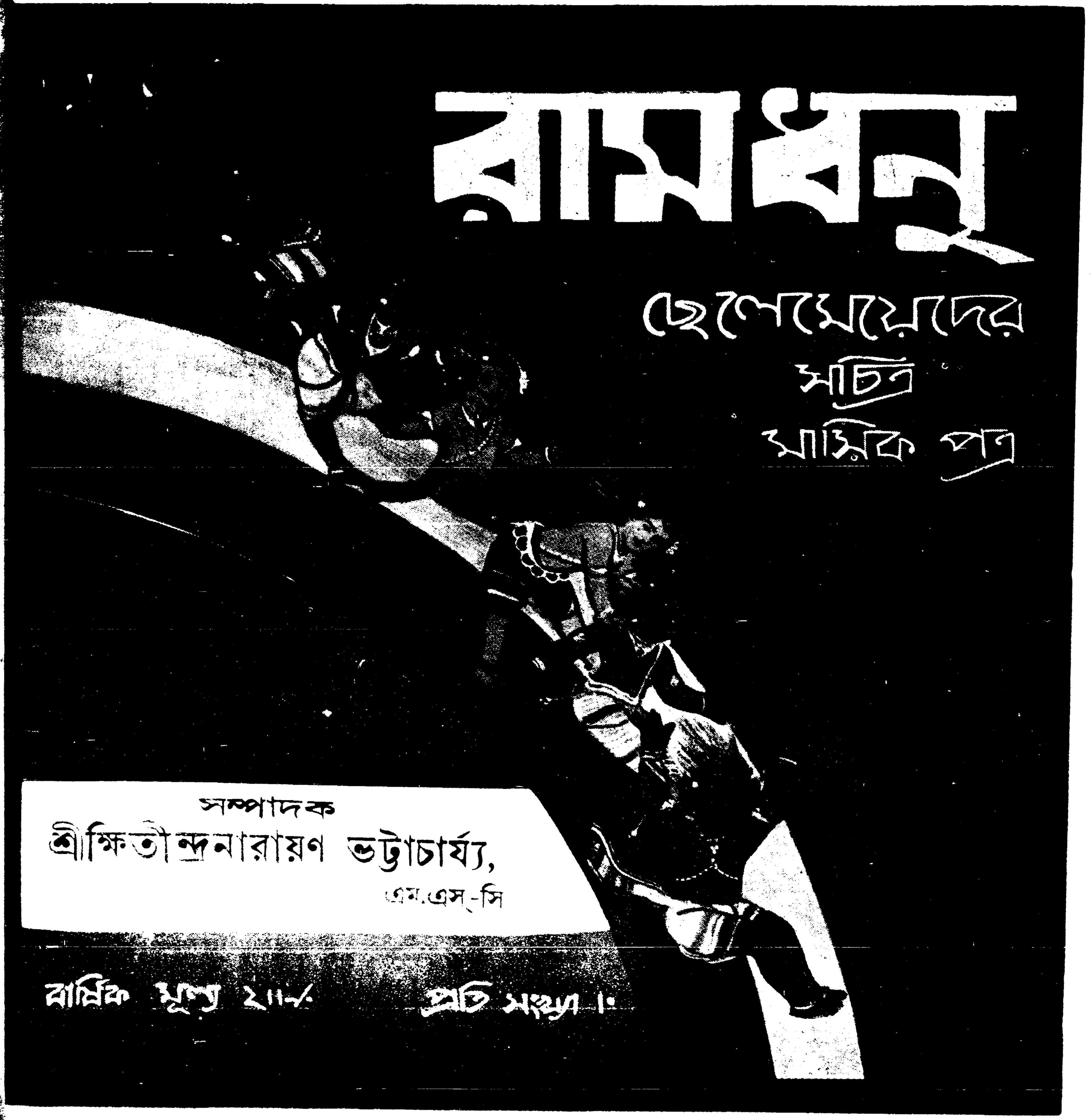

কার্য্যালয়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০ ; প্রতিসংখ্যা।৹ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তৈল ব্যবহার করুন
২৪৩, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া
দুর্ব্বল শিশুরা
অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের
হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৸০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৸০

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—॥৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের
কাশ্মীরের কথা— ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

দেব সাহিত্য-কুটীরের বহু প্রত্যাশিত পূজা-বার্ষিকী

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে।

অন্যান্য বছরের মত উহাতে গল্প, নানাবিধ প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, ঐতিহাসিক-কাহিনী, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী—এ ছাড়া হেমেন্দ্র রায়ের একটি বড় শিশু উপন্যাস আছে। রাশি রাশি রং বেরঙ্গের চিত্রে ভরা। প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। মূল ১৷৷০ টাকা

কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ

বাহির হইয়াছে—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। **অন্ধকারের বন্ধু**

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২। **ছিন্নমস্তার মন্দির**

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। **তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক**

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। **বিজয় অভিযান**

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর
৫। **ছায়া কালো-কালো**

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
৬। **রাত্রির যাত্রী**

শ্রীনরেশ সেনগুপ্তের
৭। **হারাণো বই**

প্রত্যেকটির মূল্য—আট আনা

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

নূতন বই — **সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বই**

সময়োপযোগী বহুবাঞ্ছিত ব্যবহারিক বই!

দেশের ভাবী আশার স্থল—ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী

তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিকল্পনায় লিখেছেন—

ছেলেদের টিফিন

কি খাব মা, কি খাব মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, বাসি ভাত খাও যাদু, ঐ ঢাকা রয়েছে!

কালের গতিতে ছেলেদের ক্ষুধার খোরাক দিতে আজ আর বাসি ভাতের কথাও উঠে না, এখন সেখানে এসেছে দোকানের বাসি খাবার, পচা ডিমের তৈরী কেক বিস্কুট ইত্যাদি! ছেলেদের হাতেই টিফিনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর দিনে-ডাকাতির সুযোগ দিয়েছি। এরই প্রতিকারকল্পে প্রাণশক্তিসম্পন্ন বহু বহু রুচিকর খাদ্য দেশীয় প্রথায় কত সহজে ও সুবিধায় বাড়ীতে তৈরী করা যায়, লেখিকা **তাদের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী** এই গ্রন্থে প্রকাশ ক'রে ছেলেদের—তথা আমাদেরও সাংসারিক জলযোগের খাদ্যধারার গতির মোড় ফিরিয়ে একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন।

দু'শো পাতার বই। চমৎকার ছাপা ও বাঁধাই। দাম—১৲

প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা রাখা এবং প্রত্যেক মায়ের পড়া উচিত।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বি, বি, ৩৮৭৫

—কিশোর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপহার—

"র‍্যালে ও ড্রেকের অভিযান", "রাক্ষুসে আফ্রিকা" প্রণেতা
প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্তীর

রহস্যের ইন্দ্রজাল

নূতন ধরণের ছোটদের রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টীভ্‌ উপন্যাস—সত্যসত্যই কিশোর সাহিত্যে যুগান্তর এনেছে। গোয়েন্দা (এ্যামেচার) অজিত সেনের জীবন-মরণ পণ করা অভিযান—সঙ্কটময় মুহূর্তের রুদ্ধ নিঃশ্বাস পাঠকের মনেও জীবন-মৃত্যুর দোলা দেয়। একবার হাতে পড়লে শেষ না করে কিছুতেই উঠতে পারা যায় না। সমস্ত ছবিগুলিই এঁকেছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীসমর দে। ছবি ছাপা অতি চমৎকার।

দাম মাত্র আট আনা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের

আসামের জঙ্গলে

খগেন বাবুর লেখার সঙ্গে পরিচয় নাই এমন পাঠক খুব কমই আছে। খগেন বাবু বাংলার ছোট বড় প্রত্যেকেরই মন জয় করেছেন। আসামের জঙ্গলের অভিযানের কাহিনী অতি সুন্দর ভাবে এই বইখানিতে বর্ণিত হয়েছে। বইখানিকে অনায়াসেই খগেন বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যেতে পারে। পড়তে পড়তে মন তন্ময় হয়ে যায়।

—দাম মাত্র আট আনা।

শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

এ যুগের দৈত্য

কবি বন্দেআলী মিয়ার

শিশুদের বিষাদ-সিন্ধু

নব কলেবরে নূতন সজ্জায় শিশু-সাহিত্যের আসরে হানা দিয়েছে। দাম মাত্র ছয় আনা।

পাল প্রকাশনা-নিকেতন—২০৩।২বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

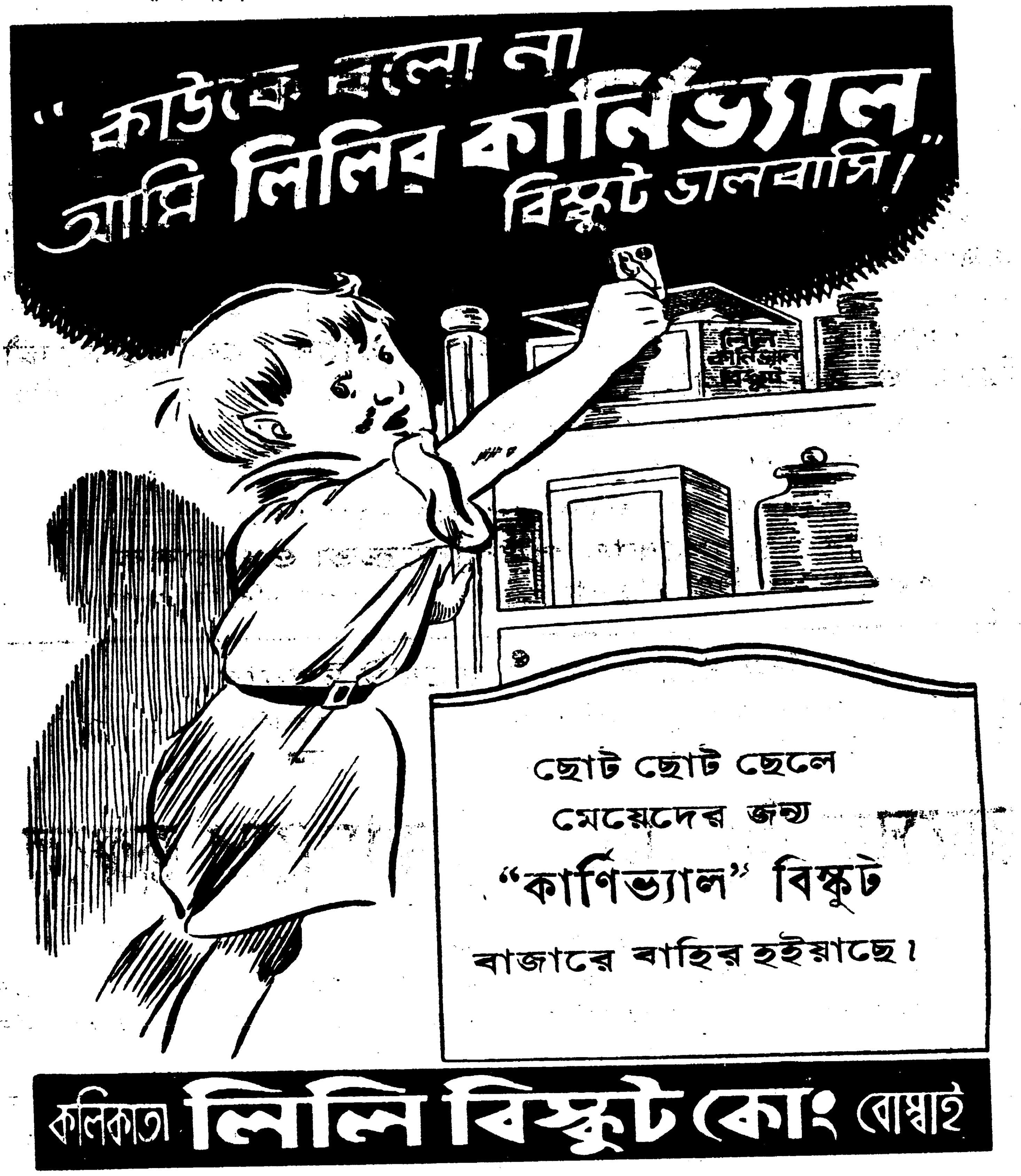
" কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
ছেলেমেয়েরাই সুশ্রী
তাদের সবাই ভালবাসে
তোমরাও ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গো সোপ্ দিয়ে নিয়মিত স্নান করবে আর হাত-পা ধোবে। দেখবে, তোমাদেরও সবাই খু-উ-উব ভাল-বাসবে! কারণ—মার্গো সোপ্ জীবাণু নষ্ট ক'রে খোস-পাচড়া দূর করে, চামড়া মোলায়েম করে।
MARGO SOAP
CONTAINS ACTIVE MARGOSIC PRINCIPLE
TOILET & MEDICINAL
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

আমাদের অতুলনীয় শিশুসাহিত্য!

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর নতুন বই

আমার ভুত দেখা!

শিবরামবাবুর কলমে প্রথম ভূতের গল্প—ভয়াবহ অবশ্যই—তা'বলে' হাসির কিছু কম নয় কিন্তু! তবে হাসির চোটে ছেলেমেয়েদের ভূতের ভয় কেটে যাবার ভয় আছে।… উপহার দেবার উপযোগী করে' মূল্যবান্ কাগজে রঙীন্ কালির ছাপা—শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা অজস্র মজার ছবি!

—দাম আট আনা মাত্র—

বাবুম্ বুবুম্ বুম্!

(ভয়ঙ্কর ভারী যুদ্ধের গল্প)

যুদ্ধে গেলে মানুষ খুন্ হয়, যুদ্ধে না গিয়েও কেবল হেসে খুন্ হবার জন্যে এ-বই! হর্ষবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধনের এবার দু'নম্বরের যুদ্ধযাত্রা! কাণ্ডখানা একবার ভাবো!… দামী আইভরি ফিনিশে রঙীন্ কালিতে ছাপা—শ্রীশৈলর আঁকা অসংখ্য কার্টুন্!

—দাম আট আনা মাত্র—

—শিবরাম বাবুর আরেকখানি জনপ্রিয় বই—

হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি!

প্রথম সংস্করণের বাইশ শো কপির দেড় হাজারেরও বেশি এক বছরের মধ্যে কেটে গেছে—এই একটি কথাই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় কি? পুরু কাগজে চমৎকার ছাপা—চমকপ্রদ প্রচ্ছদ—শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা অজস্র হাসির কার্টুন। —দাম আট আনা মাত্র।

শিশু-সাহিত্য সিরিজের অভিনব উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

মেম সাহেব ॥০

শশধর দত্তের

মানুষ ধরার দেশে ॥০

জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

মরণ যেথায় পদে পদে ॥০

ক্ষেশবচন্দ্র গুপ্তের

মণি-কল্যাণ ॥০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

তিন চোর ॥০

লালা সাহেব ॥০

অনেক দূরে ১৲

ইতিহাসে নেই ॥০

প্রকাশক—ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস্ ৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেশপ্রিয় লাইব্রেরী

১৯৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। গল্পে চিত্তরঞ্জন—(জীবনী)
মূল্য—॥০ আনা
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

২। সিরাজদ্দৌলা—(নাটক)
মূল্য—।৵০ আনা
প্রবোধ সরকার

৩। ভারত-বীর—(নাটক)
মূল্য—।৵০ আনা— শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মাইতি

৪। হিট্‌লারের শত্রু—
(যুদ্ধ-উপন্যাস)
মূল্য—১৲ টাকা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

৫। কুয়ো ভেডিস্—
(অনুবাদ উপন্যাস)
মূল্য—॥০ আনা
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত
আলেকজান্দার ডুমার অমর লেখনী প্রসূত
দি ম্যান ইন্ দি আয়রণ্ মাস্ক-এর অনুবাদ
শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

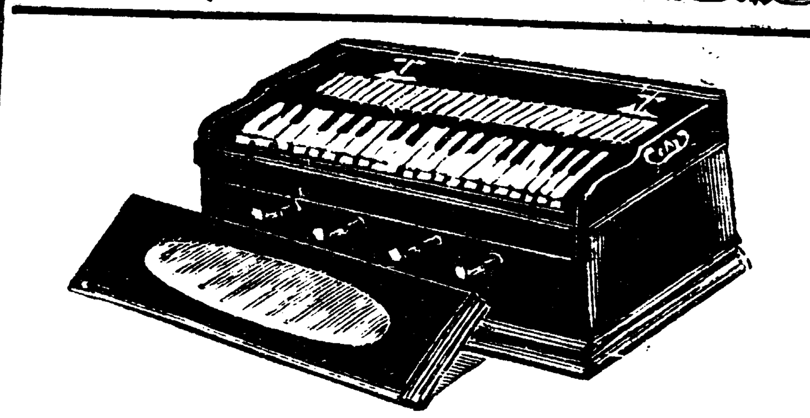

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং-র

হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ!

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং

৬।১।১, রসা রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

একখানি চাই-ই

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

অজস্র ছবি অজস্র হাসি
অজস্র মজা

দাম আট আনা

মৌচাক বলেন :—

"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

— আমাদের ছেলেমেয়েদের নূতন বই —

নগেন্দ্রনাথ দত্ত
ক্ষুমড়োপটাস
তোমাদের পরিচিত জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাহিনী নিয়ে লেখা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ
বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথায় ভরা।

ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়
রাতের বিভীষিকা
রাতে যারা ভয় দেখায়—তাদের কথায় ভরা।

সরোজকুমার রায় চৌধুরী
হরেক রকম
বইখানা শিশুচিত্তের খোরাকে ভরপূর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
বিজ্ঞানের অ, আ
বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলি গল্পের ছাঁচে লেখা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন?
সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই।

কালিদাস রায়
জাতকমালিকা
গৌতমের গতজন্মের কথা।

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
দুর্গমপথের যাত্রী
আবিষ্কার ও ভৌগোলিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
যা সকলে চায়
ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

এ, এন, ব্যানার্জ্জি
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক। আর, এন, দাস রোড, ঢাকুরিয়া দক্ষিণ কলিকাতা।

ছোটদের উপযোগী ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী
অমলশঙ্কর রায়ের
ইউরোপের আলো

—বাংলায় ছোটদের জন্য লেখা এ ধরণের বই বোধ হয় এই-ই প্রথম—

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে লেখক যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারই কাহিনী সরস, গল্পের মত ভাষায় লেখা। পড়বার—জানবার—উপভোগ করবার মত বই।

পুরু এণ্টিক কাগজে সুদৃশ্য ছাপা, রঙ্গিন বাঁধান মলাট। **দাম—এক টাকা**

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

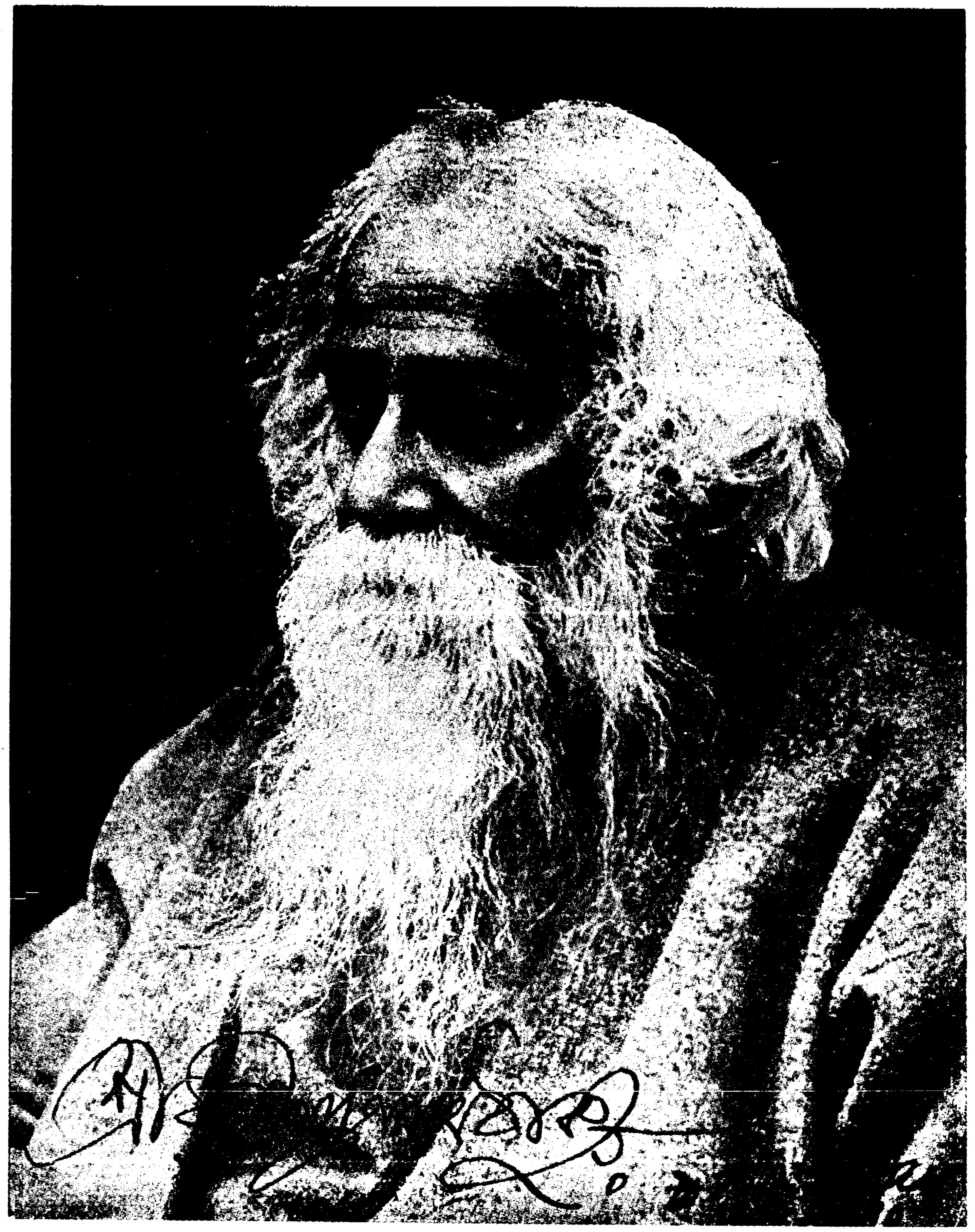

“আজও যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে,
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূর কালে।”

— রবীন্দ্রনাথ

রূপকথার সৌজন্যে]

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৪৮ {১০ম সংখ্যা

আফিংখোরের সাক্ষ্য

বন্দে আলি মিয়া

চৌধুরীদের পুকুরের পাড়ে ছিল ভাঙা প’ড়ো ঘর—
দেয়ালের মাটি খসে গেছে সব—চালেতে নাইকো খড়।
বাঁশ-বাগানের ছায়াতে সেথায় আঁধার হইয়া রয়,
দস্যি ছেলেরা দিনের বেলায় যেতে হোথা পায় ভয়।
সেই ঘরে নাকি পাড়ার যতেক আফিংখোরের দল
সন্ধ্যা লাগিতে জড় হয়ে সবে করে মহা কোলাহল ;
কেহ টানে গাঁজা—কেহ বা আফিং—চণ্ডু চরস কেহ,
বুঁদ হয়ে শেষে মাটির ’পরেই দেয় এলাইয়া দেহ।

আফিংখোরেরা বহু রাত ভরি' থাকে সেই আড্ডায়,
ভাং খায় আর বাক্স বাজিয়ে মাথা নেড়ে গান গায়।

মনের সুখেতে আছে যত নেশাখোর,
হঠাৎ একটা অঘটন ঘটি' বিপদ্ হইল ঘোর।
যাদব ওদের দলের স্যাঙাৎ—রাত্রে হয়েছে খুন
খবর শুনিয়া ভয়ে সবাকার মুখটি হইল চূণ;
পরদিন সেথা পুলিশ আসিয়া তল্লাস করি' ঘর
সবারে বাঁধিয়া থানার হাজতে নিয়ে গেল সরাসর।
মাধব ওদের দলের প্রধান—অতি চালভারী লোক—
তোব্ড়ানো গাল—শির উঁচু গলা—রাঙা ঢুলু ঢুলু চোখ।

বিচারের দিনে তারে নিয়ে গেল হাকিমের এজ্‌লাসে
কী বলিতে হায় কী বা সে বলিবে—জিভ শুকাইয়া আসে।
হাকিম সুধায়: তোমরা তো সবে একসাথে নেশা টানো
যাদবেরে কে বা করিয়াছে খুন বল তুমি যাহা জানো?
মাধব কহিল: করেছে কে খুন এ কথা কেমনে বলি—
রোজ সন্ধ্যায় আড্ডায় এসে নেশা করে যেত চলি।
সুধু সেইটুকু জানাশুনা ছিল— ইহার অধিক নয়,
খুন দেখি নাই, কেমনে দেখিব! কথা শুনে পাই ভয়।
হাকিম তাহারে জিজ্ঞাসা করে: শোনো তবে পুনরায়
মরেছে যে রাতে সেই রাতে কিগো গেছিলো সে আড্ডায়?
মাধব কহিল: যাদবের লেগে চোখে আসে আজ বারি,
গোটা কুড়ি টাকা নিয়েছিনু কবে এখনো সে টাকা ধারি।
তার দেনা আর শোধ হলো নাকো—ধর্ম্মাবতার, শোনো,
টাকাগুলি তারে পৌঁছে দেবার করো গো উপায় কোনো!

হাকিম কহিল: বাজে কথা তব কোর্ট না শুনিতে চায়,
যেই দিন রাতে হয়েছিল খুন—সে রাতে দেখেছ তায়?
মাধব কহিল: দেখিয়াছি বটে—আড্ডায়ও গিয়েছিল,
আমার গাঁজার কল্কি কাড়িয়া খুব কষে টেনেছিল;
মাথা ছিল কিবা গলাকাটা হয়ে গিয়েছিল সেই রাতে
মনে নাই কিছু—বল্‌ছি সত্য আপনার সাক্ষাতে।

সাক্ষ্য শুনিয়া হাকিম অবাক্—কোর্টের লোকেরা কয়
আফিংখোরের কথা এ নহিলে এতখানি ঠিক হয়!
এমন সরল - দেখিয়াছে যাহা বলিয়াছে অকপটে,
লোক দেখিয়াছে মাথা দেখে নাই—ভাবিবার কথা বটে।

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৯

বজ্‌রা তর তর শব্দে চলিয়াছে উজানে, দীনু তিনু দক্ষিণ মুখে বসিয়া আছে। তিনু বলিল—'সস্তায় কিস্তি পেয়ে দীনু, এ কি সত্যি ফরাক্কাবাদ যাচ্ছি নাকি?'

দীনু—'গঙ্গার ধারে কোথায় সাপে খেয়ে মরতাম, এ তো বেশ রাজার মত যাওয়া যাচ্ছে!'

তিনু—'আমি সাপে খেয়ে মরতে নারাজ। শেয়াল কুকুরে খেয়ে মরাও পছন্দ করি নে। সুন্দরবনের বড় বাঘে ধরবে, পিঠে ফেলে নিয়ে যাবে, নোংরা শেয়াকুলের বন দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে না, সে মরণ ঢের ভাল। ইতুরে মরণ চাই নে।'

কথা শেষ না হইতেই তিনু দেখিল সম্মুখে একখানা বড় ভাউলে তু'খানা লম্বা ছিপ! মাস্তুলে পতাকায় এক প্রকাণ্ড বাঘের ছবি আঁকা। আলো আঁধারিতে সত্যিকার বাঘ বলিয়া মনে হয়।

তিনু—'এ কি! এ যে সত্য সত্যই বাঘ এসে পড়ল!'

দীনু—'ও সব সদাগরী জাহাজের পতাকা।'

আরও ছোট বড় বহু নৌকায় ঐ বাঘ পতাকা দেখিয়া তিনু বলিল—'এ যে গোটা সুন্দরবন আস্‌ছে! সেইজন্যে রাত্রে বাঘের নাম করতে মানা—বাঘ বলতেই বাঘ!'

এ রকম ছিপ, এত মাঝিমাল্লা, এমন ধরণ-ধারণ দীনুও কখনো দেখে নাই। একটু ভীত ও বিস্মিত হইল।

এই সময়ে একজন পাচক আসিয়া উহাদিগকে গরম লুচি, ব্যঞ্জন ও সন্দেশাদি দিয়া গেল। দীনু, তিনু চঞ্চলতার মধ্যেও পরিপাটী ভোজন করিল। তিনু বলিল—

"চিনি খান যিনি
জোগান চিন্তামণি।"

দীনু হাসিয়া বলিল, 'তিনু, আমরা চিনি খাবার মত লোক নই তবু চিন্তামণি আমাদিকেও ভোলেন নি। পারণটা হ'ল ভাল।'

তিনু—'মহারাজা আমাদের মত ভিখারীর প্রতিও কি সদয়! তাঁর মঙ্গল হোক্।'

এই সময়ে বজ্‌রার মালিক উপস্থিত হইয়া বলিল—'ভাই, আমি রাজা মহারাজা নই, তিনু। আমি তোমাদের হরি, তোমাদিকে এই বিদেশে পেয়ে বড় সুখী হলাম। সময় অল্প, আমরা ওলন্দাজ দস্যুদের কাছাকাছি এসেছি। তোমরা নির্ভয়ে থাক। যত কিছু সবই সেই 'কটা'র জন্য—আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। এখন কাজ আছে।'

দীনু, তিনু সত্যই হাতে চাঁদ পাইল। অপ্রত্যাশিত ভাবে হরিকে পাইয়া এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ও সম্মান দেখিয়া উহারা মুগ্ধ হইল। দীনু বলিল—'গুণী ও ভাল লোকের সর্ব্বত্র আদর—সর্ব্বত্র জয়, বুঝলে তিনু?'

তিনু—'ওলন্দাজ ওলন্দাজ বল্‌ছে, তা'রা কে দীনু?'

দীনু—'শুনেছি তারা একটা বিলাতী রাজমিস্ত্রির জাত। আন্দাজে ওলং চালায় বলে দেশে কাজ জোটে না, এখানে এসে লুট করে, নৌকা মারে। এ বজ্‌রাও লুট করবার চেষ্টা করছে।'

তিনু—'বাঃ রে ওলন্দাজ! নৌকা মারবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে মার খাব, বটে! দেখা যাবে।'

তুই জনের অনেকক্ষণ নিদ্রা হইল না। সুন্দর বজ্‌রা, মধুর হাওয়া এবং সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। গঙ্গামায়ির কোলে ঘুমের অভাব কোথায়? তু'জনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া শয়ন করিল। একটু পরেই তিনুর জোরে নাক ডাকিতে লাগিল, সেও কতকটা ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের মত। দীনু গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতে লাগিল—

"সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না
ভাল পেয়েছ ভবে জ্ঞান বিছানা।"

তার পর ধীরে ধীরে সেও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

একটা ভীষণ কোলাহলে উহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রায় তুইটা হইবে। আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হুকুম হইল, 'বেড় দাও'। অম্‌নি কোথায় বাঁকের আড়ালে, গাছের ছায়ায়, যে সব ছিপ্‌ লুক্কায়িত ছিল, তীর বেগে আসিয়া তিনখানা দ্রুতগামী দক্ষিণ অভিমুখী বজ্‌রা ও একখানা ছিপ্‌কে ঘেরাও করিল। বজ্‌রাগুলি খুব বড় এবং সুদৃঢ়, বজ্‌রার উপবে সশস্ত্র সান্ত্রী পাহারা দিতেছিল—সে আওয়াজ করিল গুরুম্ গুরুম্ গুম্। যুগপৎ তিনখানা বজ্‌রা হইতেই গুলি চলিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ কেউটে সাপকে বেড়িয়া স্ফীত-লাঙ্গুল বেজী যেমন বন্ বন্ শব্দে ঘোরে, তেমনি আক্রমণকারী ছিপ্‌গুলি বজ্‌রাগুলিকে মণ্ডলী করিয়া ঘুরিতে লাগিল এবং প্রত্যেক বারেই ১০।১৫ জন করিয়া গাবর লাফাইয়া বজ্‌রায় উঠিতে লাগিল। তাহাদের আকৃতি একরকম, যেন পাথর কুঁদিয়া তৈয়ারী সুডোল বীরমূর্ত্তি। চারিদিকে হুড়মুড়, তুপ্‌দাপ, ঝুপঝাপ, তার উপর বন্দুকের ঘন ঘন গুরুম্ গুরুম শব্দ। একটা তীব্র সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। সে উদ্দীপনার মধ্যে দীনু তিনুও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—তাহাদের পুরাতন খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি জাগিয়া উঠিল।

উপরে দাপাদাপি চলিতেছিল কিন্তু আশী দাঁড়ের ছিপ্‌ হইতে কর্ম্মীগণ জলের মধ্য দিয়া যে বল্লম নিক্ষেপ করিতেছিল তাহাতে তু'খানা বজ্‌রারই তলদেশ বিধ্বস্ত হইয়া গেল, উহা ডুবিতে আরম্ভ করিল। আরোহীগণ উহা বুঝিতেই পারে নাই। বজ্‌রার জিনিষপত্র লুণ্ঠিত ও আরোহীগণ বন্দী হইল।

তৃতীয় বজ্‌রার হাল ধরিয়াছিল একজন ইউরোপীয়। এমন কৌশলে সে বজ্‌রাখানিকে চালাইল যে উহা প্রায় ছিপের অবরোধ ভেদ করিয়া বাহির গঙ্গায় পড়ে আর কি! এমন সময় একটা সড়কীতে ভর করিয়া দীনু লাফাইয়া হালের উপর পড়িল,—ঠিক যেন প্যারাশুটে আকাশ হইতে নামিল। প্রকাণ্ড ধাক্কা দিয়া সাহেবকে উল্‌টাইয়া জলে ফেলিয়া দিয়া এমন

নিপুণ ভাবে হাল ধরিল যে বজ্‌রা অবিলম্বে একেবারে ছিপের বেড়ের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বজ্‌রার ভিতর হইতে এক বিপুলাকৃতি লালমুখ ওলন্দাজ বোম্বেটে রিভলভার হস্তে ক্রোধে দীনুকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। দীনু রিভলভার কি জানে না, সে দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়াই রহিল—মৃত্যুকে যেন সে গ্রাহ্যই করে না। অন্য সকলেই দীনুর রক্ষা নাই ভাবিয়া 'মার মার' চীৎকার করিয়া উঠিল।

সাহেব গুলি করিতে যাইবে এমন সময় বজ্‌রা হইতে অলক্ষ্যে হরি কখন বাহির হইয়া সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার সবল বাহুর বেড় দিয়া সাহেবের হাত এমন ভাবে সজোরে টিপিয়া ধরিল যে রিভলভার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে পাটাতনে পড়িয়া গেল—জনৈক কর্ম্মী উহা কুড়াইয়া লইল। আট দশ জন দেশীয় ও ওলন্দাজ দস্যু একসঙ্গে হরিকে আক্রমণ করিল কিন্তু হরি কোন চেষ্টা করার পূর্ব্বেই ছিপ্ হইতে ২০।২৫ জন গাবর উক্ত দলকে পরাভূত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া সাহেবকে বাঁধিয়া হরির বজ্‌রায় আনিয়া তুলিল। চারিদিকে একটা উল্লাসধ্বনি উঠিল—

'বাঙলার জল ধন্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান্!'

পর্য্যুদস্ত বহর কতক ডুবিল, কতক আহত, ভগ্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

এই বহরটী ওলন্দাজ দস্যু ডাইক এর দলের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও দুর্জ্জয় বহর। পাটনা হইতে বে-আইনী আফিম এবং বহুমূল্য লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ মুর্শিদাবাদ হইয়া চুঁচুড়া যাইতেছিল।

ওলন্দাজগণ দেশীয়দিগকে গ্রাহ্য করিত না কারণ প্রথমতঃ তাহারা আগ্নেয় অস্ত্রে সুসজ্জিত, দ্বিতীয়তঃ তাহারা অধিক বলশালী, সাহসী ও সুদক্ষ এই তাহাদের ধারণা। দেশীয় দল এতাবৎ তাহাদিগকে কখনো আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। ডাইক অতি বড় দাম্ভিক ও দুঃসাহসিক। ইউরোপীয় বলিয়া তাহার দারুণ অহঙ্কার। নবাব সরকার ও বৃটিশ সরকার দুই-ই তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন এবং সমস্ত শ্বেতাঙ্গ মহলে বড় সদাগর বলিয়া তাহার প্রতিপত্তি ছিল।

এত বড় দেশীয় শত্রুর সম্মুখীন সে কখনো হয় নাই। এমন শোচনীয় পরাজয়ও অপ্রত্যাশিত। সাহেব দেখিল এ নাবিকদল কি গঠনে, কি শক্তিতে, কি রণনৈপুণ্যে ইউরোপীয় নাবিক অপেক্ষা বরং শ্রেষ্ঠ। এমন শৃঙ্খলা, এমন শৌর্য্য প্রশংসনীয়। এমন নিবিড় অবরোধ, এমন ডুবন্ত বল্লমের আঘাতে সুদৃঢ় বজ্‌রা ঘায়েল করা সে ভাবে নাই। পতাকার বাঘ যে

সত্য সত্যই ব্যাঘ্র-বিক্রমের প্রতীক আজ সাহেব তাহা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিল। দলের কর্ত্তা Harry কোন্ দেশীয় এ বিষয়ে তার সন্দেহ হইতে লাগিল। আবার ছিপ্ হইতে শব্দ উঠিল—

'বাঙলার জল ধন্য হউক, ধন্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান্।'

তখনও ভোর। প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া ব্যাঘ্র-পতাকা উড়াইয়া আশী দাঁড়ের ছিপ্ দু'খানি তীরবেগে ছুটিয়াছে। মাঝিমাল্লা ও কর্ম্মীগণ জয়গৌরবে গাহিতেছে :

বাঙলা দেশের সুঁদরী কাঠের জঙ্গলে—
কেমন করে জন্মালি তুই বাঘ?
মেঘের দেশের অজানা কোন্ খোঙ্গলে
সুপ্ত ছিল প্রচণ্ড এ দাপ!

যেথায় ভীরু শশক ফেরে শঙ্কাতে,
লাফিয়ে বেড়ায়, দন্ত দেখায় হনু,
উঠ্‌লো কেঁপে কানন যে তোর ডঙ্কাতে
যেমন আরাব, তেম্‌নি ভীষণ তনু।

চক্ষু ও কি! দীপ্ত অনলকুণ্ড যে,
ও কি নখর, ও কি দারুণ থাবা!
যেমন গ্রীবা তেম্‌নি ও তোর মুণ্ড যে,
সিংহ সে ও হচ্ছে দেখে হাবা।

বগ্‌রীচরা পলিমাটির পৃথ্বী এ,
জম্‌কে ছিল ধান্য, পান ও সর্ষপে,
বুঝ্‌তে নারি কোন্ খেয়ালীর কীর্ত্তি এ,
কে জান্‌ত এ বাঘের থাবার ভর সবে!

ভীতু ভেতো ভাঙ্গা দেশের শরক্ষেতে
এ কি ভয়াল ভীষণতার ভাণ্ডারা,
হায় এ ফণি মনসার এ অর্ঘ্যেতে
লক্ষ্মীকে কি পূজ্‌লে দেশের পাণ্ডারা!

এ নয় ফুল আর প্রজাপতির দেশ শুধু—
ভেব না কেউ, কেবল ফেউ আর ছাগ আছে,
হেথায় জাগে লতার বুকে ডাঁস মধু
বনে মোদের আজও এমন বাঘ আছে !

সাহেব দেখিল ক্রমে ক্রমে ছিপ্‌গুলি ক্ষুদ্র রেখার ন্যায় চক্রবাকে মিলাইয়া যাইতেছে—তাহাদের গীতের রেশটা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। সুরটা সাহেবের কাণে মন্দ লাগিতেছিল না।

পশ্চাতে হেড়োভাঙ্গার দহ, হয়ত তাহার অতল তলে সাহেবের বজ্‌রাগুলি চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে। বন্দীভাবে পরের বজ্‌রায় অবস্থিতি সাহেবের স্বাধীন প্রাণকে দারুণ মর্ম্মপীড়া দিতেছিল। (ক্রমশঃ)

[ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী]

নয়

রাত্রির চতুর্থ প্রহর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শুকতারাকে ম্লান করে দিয়ে আকাশের পূর্ব্ব প্রান্তে এবার উষার আলো ফুটে উঠবে, এমন সময় দুটি শ্রান্ত ঘোড়-সওয়ার মহাকালের মন্দিরে এসে পৌঁছালো।

মন্দিরের দরজা খোলাই ছিল, ঘোড়ার পদশব্দ শুনে এক সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণ আগেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বল্‌লেন—এসো, তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।

—আমাদের জন্য !—ধর্ম্মদেবের মনটা ছাঁৎ করে ওঠে, বল্‌লে—আপনি ?

—আমি ?—ব্রাহ্মণ হাসলেন, বল্‌লেন—আমায় চেন না ? আমিই তো এখানকার সব,

ওই মহাকালের চাইতেও এখানে আমি বড়। আমি কথা বলি, কাজ করি, গৃহহীন অনাথ-আতুরদের সান্ত্বনা দিই, আশ্রয় দিই, অন্ন দিই। আর তোমাদের ওই মহাকাল, ওর কাছে মাথা খুঁড়লেও নিজেরই মাথা ফাটবে, তার বেশী আর কিছু হবে না। তবু তোমরা ওকে ছাড়বে না !

মল্লিকা বল্‌লে—আপনিই এখানকার পুরোহিত ভৈরব আচার্য্য ?

—ওইটাই আমার সব চেয়ে বড় লজ্জার কথা মা। সকাল সন্ধ্যে ওই প্রাণহীন পাষাণকে দুটো বেলপাতা আর একটু গঙ্গাজল না দিয়েও পারি না, অথচ শ্রদ্ধাও আর হয় না এতটুকু। ওই কি সত্যিকারের মহাকাল, পৃথিবীর সমস্ত কলুষকে নিজের মাঝে লয় করে দিয়ে যিনি নীলকণ্ঠ হয়েছেন, সকল অন্যায়কে ধ্বংস করার আগ্রহে যিনি রুদ্র নাচে নেচে ওঠেন, সর্ব্বপাপসংহারী প্রলয়ঙ্কর যাঁর রূপ ? আজ জাতির এই দুর্দ্দিনে তা হ'লে তাঁর মাঝে সাড়া জাগে না কেন ? এত লাঞ্ছিত নরনারীর আর্ত্তনাদ শুনে ধরিত্রী কেঁপে ওঠে না কেন তাঁর পদভারে ? আকাশ তো বিদীর্ণ হয়ে যায় না তাঁর ডম্বরু-ধ্বনিতে ? কেন জান, ওঁর মধ্যে আর প্রাণ নেই, অনুভূতির স্পন্দন তাই ওঁকে আঘাত করতে পারে না। তা তুমি ওকে পাথরই বল, কি দেবাদিদেব মহাদেবই বল, ও তো পাষাণ ছাড়া আর কিছু নয় !

মল্লিকা হেসে বল্‌লে—তা হ'লে ওঁর পূজো করেন কেন ?

—কেন করি ? অভ্যাস বলে। আবাল্য করে আসছি, সহসা আজ বন্ধ করে দিলে মনটা খুঁত খুঁত করবে। তাই নিজের তৃপ্তির জন্য করি। তা ছাড়া এত নিঃস্ব, লাঞ্ছিত, নরনারীর দল এসে মাথা খুঁড়বে কোথায় ? তাদেরও তো সান্ত্বনা পাবার একটা জায়গা চাই !

ভৈরব আচার্য্য হো হো করে হেসে উঠলেন। তার পর যেন সহসা বর্ত্তমানে ফিরে এসে বল্‌লেন—ওঃ, তোমরা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিতরে এসো। ঘোড়া দুটো ওই গাছেই বেঁধে রেখে এসো।

দু'জনে আচার্য্যকে প্রণাম করলো। জয়ন্ত বলে আচার্য্য দু'জনের হাত ধরে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের ভিতর সবই অন্ধকার, এমনি অন্ধকার যে আচার্য্যদেব সঙ্গে না থাকলে কোনমতেই অগ্রসর হওয়া যেত না।

ভিতরে ঢুকে আচার্য্য বল্‌লেন—কই, প্রণাম কর।

মল্লিকা বল্‌লে—কোন্ দিকে প্রণাম করবো বলুন ?

আচার্য্য বল্‌লেন—যেদিকে তোমাদের ইচ্ছা, চারিদিকেই করতে পার, দেবতা তো চারিপাশেই আছেন।

—না, তা হ'লে না দেখে প্রণাম করবো না, আগে একটা আলোর ব্যবস্থা করুন, তার পর।

—কিন্তু দেখলে পরে কি আর প্রণাম করতে পারবে মা ?—বলে আচার্য্য ডাকলেন—লক্ষ্মণ, উঠেছ ?

—আজ্ঞে আচার্য্যদেব, কি আদেশ বলুন ?

—একবার প্রদীপটা জ্বালা না বাবা, এরা দেখতে চায়।

কোণে চকমকির স্ফুরণ দেখা গেল, মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যেই দীপের আলোয় সব আলোময় হয়ে উঠলো। আচার্য্য বল্‌লেন—ওই দেখ তোমাদের মহাকাল—

ধর্ম্মদেব ও মল্লিকা যা দেখলো তাতে তারা শিউরে উঠলো। কালো পাথরের প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে আছে, ভক্তিমান্ হিন্দুর পক্ষে সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। প্রণাম করতে তারা ভুলে গেল, পুতুলের মত অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সেই পাথরের টুকরোগুলির পানে।

আচার্য্য তাদের মুখের পানে তাকিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠলেন, বল্‌লেন—কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে, প্রণাম করলে না ?

দু'জনের কারোই প্রণাম করতে হাত উঠলো না, তারা তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আচার্য্যদেব এবার অট্টহাসি হেসে উঠলেন, বল্‌লেন—নমস্কার করতে বুঝি আর হাত উঠছে না, ওর মধ্যে বুঝি আর ভগবান্ নেই ? যতক্ষণ ওই পাথরটা আস্ত ছিল, দেখতে ভালো লাগছিল ততক্ষণ ওর মধ্যে ভগবান্ ছিলেন, যেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অমনি ভগবান্ পালিয়ে গেলেন, য়ঁ্যা ?

ধর্ম্মদেব জিজ্ঞেস করলে—কবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো ?

—কবে ?—আচার্য্য উত্তর দিলেন—যবে হূনেরা হিন্দুস্থানের সীমান্ত অতিক্রম করলো, সেইদিনই তো ম্লেচ্ছের পদাঘাতে আমাদের এই পুণ্যভূমি দেবহীন হ'ল। বাহুতে যাদের শক্তি নেই, মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা করার মত মনের জোর যাদের নেই, তারা তাদের দেবতাকে রক্ষা করবে কেমন করে, তাই দেবতাও তাদের ত্যাগ করলেন। না হ'লে দুর্ব্বল প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য যে দেবতা একদিন স্ফটিকের থাম ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই দেবতা আজ শত সহস্রের আর্ত্তনাদ কাণে শুনতে পান না! যে দেবতা একদিন শিশুপালের একটা অপমান সইতে পারেন নি, সেই দেবতা আজ শত মন্দির, শত বিগ্রহের অপমান চুপ্ করে সইছেন কেমন করে ? কেন জান, দেবতা আমাদের আজ ত্যাগ করেছেন; ভীরু, অক্ষম, কাপুরুষের কাছে দেবতা থাকেন না, দেবতা হ'লেন শক্তিমানের। নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্য—ভগবানের কৃপা দুর্ব্বল পায় না।

বল্‌তে বল্‌তে আচার্য্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বল্‌লেন—এই পাথরের ঠাকুরকে দেখেই

এত চমকে গেলে তো চলবে না, রক্তমাংসের নারায়ণেরা এর চেয়ে ঢের বেশী নিগ্রহ সয়েছে তা জানো ? এসো—

আচার্য্য তাদের হাত ধরে নিয়ে এলেন মন্দির-চত্বরের পিছনে। সামনেই মেলার মাঠ, আগে এখানে শিবরাত্রির সময় মেলা বসতো, হূনদের ভয়ে গত বছর কয় ধরে তা বন্ধ আছে। সেইদিকে নির্দ্দেশ করে আচার্য্য বল্‌লেন—ওই মাঠে আজ আবার মেলা বসেছে, তবে সে পার্ব্বণের মেলা নয়, দুঃখের মেলা। যাদের পয়সায় তোমরা বুক ফুলিয়ে বেড়াও অথচ দরকার হ'লে যাদের রক্ষা করতে পার না, যাদের খাজনা তোমাদের সিংহাসনের ভিত্তি, কিন্তু স্বার্থ ও সংঘর্ষের সময়ে অহঙ্কারে যাদের তোমরা চিনতে পার না, তারা সব আজ এখানে এসেছে, এই ভাঙা মন্দিরের ভাঙা দেবতার কাছে একটু নিরাপদ আশ্রয় চায়। বোকারা বোঝে না, যেখানে দেবতা নিজেকেই রক্ষা করতে পারেন না সেখানে অপরকে আর তিনি বাঁচাবেন কেমন করে!

খানিক চুপ করে আচার্য্য সেই অন্ধকারের মাঝে জনতার আবছায়ার পানে তাকিয়ে রইলেন, এক একটি ছায়ার পানে তাকিয়ে যেন তাদের মুখগুলি মনের চোখে দেখে নেবার চেষ্টা করলেন, তার পর বল্‌লেন—ওদের কেউ-বা এসেছে কারুষ থেকে, কেউ-বা উজ্জয়িনী। তোমাদের দেখলেই হয়তো অনেকে চিনতে পারবে।

ধর্ম্মদেব তাড়াতাড়ি বল্‌লে—কিন্তু আমি তো ওদেরকে পরিচয় দিতে চাই না আচার্য্য দেব!

—কেন, এখন আর ভয়টা কিসের ? এখন তো রাজায় প্রজায় সমান হয়ে গেছে। এতদিন ওরা ভাবতো তোমরা অসাধারণ—অতিমানব, সেইজন্য তোমাদের খুসি করতে ওরা বুকের রক্ত পর্য্যন্ত দিয়েছে। আজ তোমাদের দেখলে ওদের তবু সেই ভুলটা ভাঙবে, ওরা বুঝবে তোমরাও ওদেরই মত মানুষ, শুধু তফাৎ এইটুকু যে নিজেদের স্বার্থটাকে বড় করে ভেবে দল পাকিয়ে আর একদলকে খুন-জখম করে তাদের মাথার উপর ওরা উঠে বসতে পারে নি। তারা দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে আর তোমরা দিব্যি বসে বসে তার উপস্বত্ব ভোগ করছ।

—শুধু শুধুই ভোগ করেছি আচার্য্যদেব, তাদের নিরাপত্তার চেষ্টা কি করি নি ?

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, নিজেরা দিব্যি বর্ম্ম এঁটে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর এরা কুকুর-শেয়ালের মত প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি করছে।

—আমি একা এখন ওদের জন্য কি করতে পারি বলুন ? আমার লোকজন নেই, অর্থ নেই...

—ও সব বাজে কথা!

—বাজে কথা ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইচ্ছা থাকলে ওসব একদিনে সংগ্রহ করা যায়।

—বেশ, আপনি আমায় যোগাড় করে দিন, তার পর দেখবেন...

—কত সৈন্য পেলে তুমি মিহিরকুলের সম্মুখীন হতে পার ?

—অশ্বারোহী না তীরন্দাজ ?

—দুই-ই ।

—দু' হাজার ।

—যদি পাঁচ হাজার দিই ?

—জয় সুনিশ্চিত ।

—বেশ, তাই পাবে, কিন্তু যদি পরাজিত হও ?

—আমি জীবিত থাকতে পরাজয় ঘটবে না ।

—জীবন পণ ?

—হ্যাঁ, জীবন পণ ।

—বেশ, এসো ।

দু'জনের হাত ধরে ভৈরব আচার্য্য মন্দিরসংলগ্ন এক অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন ।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচণ্ডীচরণ দে

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"। রাজা কেবল নিজের দেশেই সম্মান পান, বিদ্বান্ ব্যক্তি কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানে পূজা পাইয়া থাকেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ।

বহুদিন আগে ভদ্রকালী গ্রামে "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথের বিদেশে সম্মান লাভের একটি গল্প বলেন। রামানন্দ বাবু এক সময়ে জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থানে ৺রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি বলিলেন যে এক সময় রবীন্দ্রনাথ একখানি বিলাতী জাহাজে কোথায় যাইতেছিলেন, একখানি জাপানী জাহাজও অকূল পাথারে পাড়ি দিয়া চলিয়াছিল।

তোমরা বোধ হয় জান, সীমাহীন সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে তার-বিহীন টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা আছে। জাপানী জাহাজের ক্যাপ্টেন কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে বিলাতী জাহাজখানিতে বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ আছেন। এই সংবাদ পাইয়া জাপানী জাহাজের ক্যাপ্টেন বেতারে বিশেষভাবে বিলাতী জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করিলেন যে যখন দুইখানি জাহাজ কাছাকাছি আসিবে তখন যেন জাহাজ দুইখানি পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়।

বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ

কয়েক ঘণ্টা পরে দুইখানি জাহাজ পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল। তখন জাপানী জাহাজের ক্যাপ্টেন সকলকে ডাকিয়া ডেকের উপর আনিলেন। রবীন্দ্রনাথ আগেই জাপানী ক্যাপ্টেনের ইচ্ছার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি করযোড়ে ডেকের উপর আসিলেন। জাপানীরা আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিলেন এবং বন্দনা-গীতি করিতে লাগিলেন। কবি মুগ্ধ হইয়া গেলেন! তাহার পর জাহাজ ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিল। দেখ, অকুল সমুদ্রে এ কি অভিনব ব্যাপার! ইহার বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। আজ জগৎ-যুড়িয়া কাটাকাটি হানাহানি চলিতেছে। মানুষ যদি সকল মানুষকে ভালবাসিতে পারিত তাহা হইলে পৃথিবীতে অনেক অশান্তি কমিয়া যাইত।

রবীন্দ্রনাথ মহামিলনের মন্ত্র লইয়া সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়াছিলেন। যেখানে গিয়াছিলেন সেখানেই প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে বহু মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছিলেন। তাহার কিছু কিছু তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী" ও অন্যান্য বিখ্যাত স্থানে সযতনে সাজান আছে। রবীন্দ্রনাথের

—বেশ, আপনি আমায় যোগাড় করে দিন, তার পর দেখবেন...

—কত সৈন্য পেলে তুমি মিহিরকুলের সম্মুখীন হতে পার ?

—অশ্বারোহী না তীরন্দাজ ?

—দুই-ই।

—দু' হাজার।

—যদি পাঁচ হাজার দিই ?

—জয় সুনিশ্চিত।

—বেশ, তাই পাবে, কিন্তু যদি পরাজিত হও ?

—আমি জীবিত থাকতে পরাজয় ঘটবে না।

—জীবন পণ ?

—হ্যাঁ, জীবন পণ।

—বেশ, এসো।

দু'জনের হাত ধরে ভৈরব আচার্য্য মন্দিরসংলগ্ন এক অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচণ্ডীচরণ দে

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"। রাজা কেবল নিজের দেশেই সম্মান পান, বিদ্বান্ ব্যক্তি কিন্তু পৃথিবীর সকল স্থানে পূজা পাইয়া থাকেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ।

বহুদিন আগে ভদ্রকালী গ্রামে "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথের বিদেশে সম্মান লাভের একটি গল্প বলেন। রামানন্দ বাবু এক সময়ে জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থানে ৺রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন। তিনি বলিলেন যে এক সময় রবীন্দ্রনাথ একখানি বিলাতী জাহাজে কোথায় যাইতেছিলেন, একখানি জাপানী জাহাজও অকূল পাথারে পাড়ি দিয়া চলিয়াছিল।

তোমরা বোধ হয় জান, সীমাহীন সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে তার-বিহীন টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা আছে। জাপানী জাহাজের ক্যাপ্টেন কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে বিলাতী জাহাজখানিতে বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ আছেন। এই সংবাদ পাইয়া জাপানী জাহাজের ক্যাপ্টেন বেতারে বিশেষভাবে বিলাতী জাহাজের ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করিলেন যে যখন দুইখানি জাহাজ কাছাকাছি আসিবে তখন যেন জাহাজ দুইখানি পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়।

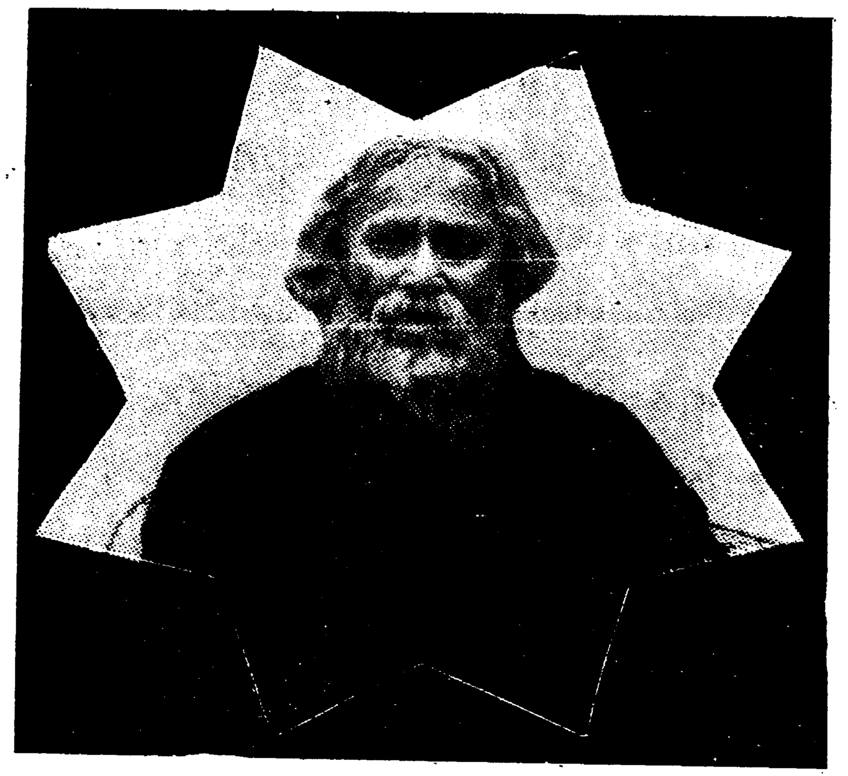

বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ

কয়েক ঘণ্টা পরে দুইখানি জাহাজ পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইল। তখন জাপানী জাহাজের ক্যাপ্টেন সকলকে ডাকিয়া ডেকের উপর আনিলেন। রবীন্দ্রনাথ আগেই জাপানী ক্যাপ্টেনের ইচ্ছার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি করযোড়ে ডেকের উপর আসিলেন। জাপানীরা আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিলেন এবং বন্দনা-গীতি করিতে লাগিলেন। কবি মুগ্ধ হইয়া গেলেন! তাহার পর জাহাজ ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিল। দেখ, অকুল সমুদ্রে এ কি অভিনব ব্যাপার! ইহার বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। আজ জগৎ-যুড়িয়া কাটাকাটি হানাহানি চলিতেছে। মানুষ যদি সকল মানুষকে ভালবাসিতে পারিত তাহা হইলে পৃথিবীতে অনেক অশান্তি কমিয়া যাইত।

রবীন্দ্রনাথ মহামিলনের মন্ত্র লইয়া সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়াছিলেন। যেখানে গিয়াছিলেন সেখানেই প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে বহু মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছিলেন। তাহার কিছু কিছু তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী" ও অন্যান্য বিখ্যাত স্থানে সযতনে সাজান আছে। রবীন্দ্রনাথের

বিশেষত্ব এই যে বিশ্বকবি হইয়াও তিনি শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সুগায়ক। শিশুদের তিনি চিরদিনই ভালবাসিতেন। তাহাদের জন্য কবি যে সব লিখিয়াছেন তাহা দরদ দিয়াই লিখিয়াছিলেন।

অনেক দিন আগে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। রবীন্দ্রনাথ এক প্রকাণ্ড খড়ের ঘরের মেঝেতে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার চারিদিকে অনেক ছোট ছোট ছেলে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। তিনি এক একজনের নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন এবং এক একজনকে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছিলেন—"তোমার হাতে ওটা কি?" ছেলেটী বলিল—"আমার হাতে এটা একটা পেন্সিল।" রবীন্দ্রনাথ তখন গুরু মহাশয়। গুরুদেব বলিলেন, "তুমি ঠিক জান ওটা পেন্সিল? আচ্ছা, ওটা কি ক'রে তৈরী হ'ল আমাকে বুঝিয়ে বল।" ছেলেরা তখন নানা কথায় জবাব দিতে লাগিল। তিনি ধীর ভাবে শুনিতে লাগিলেন। তার পর তিনি সস্নেহে এই "শুভ্র প্রাণগুলি"কে তাঁহার কাছে বসাইয়া পেন্সিলের জন্ম-কথা বলিতে লাগিলেন। ছেলেরা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

এবারের জয়ন্তী-উৎসবে ত্রিপুরা দরবারে এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ত্রিপুরার প্রাসাদের দরবার কক্ষে রাজকীয় প্রথানুসারে এবং মনোরম শোভাযাত্রা সহকারে দরবার করিয়া বিশ্বকবিকে "ভারত-ভাস্কর" উপাধি দান করা হইয়াছিল। সুদূর চীন হইতে মার্শাল চিয়াং কাই শেকের অভিনন্দন-বাণীর উত্তরে কবি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—"মানব সমাজ যেন শান্তিতে আপন জীবন গড়িতে পারে, যেন বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়।" দেখ, এই বৃদ্ধ বয়সেও কবি কিরূপ শান্তিদূত ছিলেন! শান্তিময় দেবতা তাঁহার আত্মার শান্তি দিন ইহাই প্রার্থনা।

"আমার স্মৃতি থাক্ না গাঁথা আমার গীতি মাঝে
যেখানে ঐ ঝাউএর পাতা মর্ম্মরিয়া বাজে;
যেখানে ঐ শিউলি তলে ক্ষণ-হাসির শিশির জলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে কিরণ-কণা-মালী।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীহরিপদ গুহ

এই ত সেদিন অযুত কণ্ঠ মুখর হ'ল জয়-গানে,
আজ্‌কে হঠাৎ বিষাদ-ছায়া সবার চোখে জল আনে।
'শতায়ু হোক্ জীবন তোমার'— চাইল যত দেশবাসী;
ফল্‌লো না তা' ফল্‌লো না হায়, সকল আশা যায় ভাসি।

পেয়েছিলাম তোমায় মোরা, গর্ব্ব মোদের এই খালি;
বাণীর আসন শূন্য ছিল—পূজ্‌লে তাঁরে দীপ জ্বালি'।
ধন্য হ'ল অর্ঘ্য তোমার—ধন্য তোমার কল্পনা,
যে দান তুমি কর্‌লে কবি, কোন যুগেই অল্প না।

সইলে তুমি অনেক ব্যথা, অনেকখানি বিষ-জ্বালা,
এ দেশ তোমা চিন্‌ল না হায়, বিদেশ দিল জয়-মালা!
লিখ্‌বে না গো, লিখ্‌বে না কেউ, এমন লেখার শক্তি কার?
ছিঁড়েছে তার বাণীর বীণার—বাজ্‌বে না আর সুর বাহার!

দিনের রবি অস্ত গেছে সাম্‌নে রেখে রক্ত-রাগ,
জাগ্‌বে তুমি সবার বুকে—উজল রবে স্মৃতির দাগ।

বাস্‌লে ভাল ধরার মাটি—কেমন ক'রে ভুল্‌বে তায় ?
আবার এস সোনার মাণিক, ডাক্‌ছে তোমায় বাঙ্‌লা মায়।

ভোলানাথের আত্মবিলাপ

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্‌-সি

ভূতের গল্প লিখ্‌তে বসেছিলাম—ভূতুড়ে গল্প নয়, খাঁটী ভূতের গল্প—ভেজালহীন ভূতের গল্প লিখ্‌তে বসেছিলাম। লেখার আগে একটু ধ্যানে বস্‌লাম—ভূতেদের রাজা ভূতনাথের ধ্যানে ; যদি কিছু শক্তি নামে।

শক্তি হয়ত নাম্‌ছিল, কিংবা স্বয়ং ভূতনাথই নাম্‌ছিলেন হয়ত ; কিন্তু সব মাটী ক'রে দিলেন আমাদের পাড়ার দাদু, দা'ঠাকুর এসে। চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম, অবশ্য ব'সে নয়, শুয়ে ; এমন সময় কাণে এল, "ওরে আদি কোথা রে ?"

ধ্যান গেল ভেঙে। দাদুকে বল্‌লাম, "সর্ব্বনাশ কর্‌লে দা'ঠাকুর !"

দাদু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লেন, "কেন রে, কি কর্‌লাম ?"

বল্‌লাম, "ধ্যানে বসেছিলাম, ধ্যানে শুয়েছিলামই বলা উচিত, মহাদেবের ধ্যানে।"

"মহাদেবের ধ্যানে !" আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন দাদু।

সব কথা খুলে বলি দাদুকে।

দাদু একটু হেসে বল্‌লেন, "ওরে, সে কি আর হয় অত সহজে ? মহাদেবও আজকাল চতুর হয়ে গেছেন রে, চতুর হয়ে গেছেন। অত সহজে আর ভোলেন না। জীবনে নেড়া যদি একবারের বেশী না ঠকেন, মহাদেব, হাজার হ'লেও দেবতা—তিনিই বা দু'বার ঠক্‌বেন কেন ?"

বুঝলাম দা'ঠাকুর মৌতাতের মাথায় আছেন ; গল্প লেখার চেয়ে গল্প শোনার জন্য বেশী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "মহাদেব ঠক্‌লেন কবে ? আর মহাদেবের সে ঠকার গল্পই বা জান্‌লেন কেমন ক'রে ?"

দাদু বল্‌লেন, "তোদের ভজুয়াটা গেল কোথায় ? এক ছিলিম তামাক দিতে বল্‌ না !"

তামাক এল, দাদু একটা টান দিয়ে বল্‌লেন, "শোন্‌। একদিন সমস্ত যজমানের বাড়ী

ঘুরে নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরেছি, এক পয়সা কারও কাছে পাই নি। ভাবলাম, লক্ষ্মীপূজো করি ; কিন্তু লক্ষ্মীপূজো করব কি—দুটো পয়সাও হাতে নেই। কি করি—এদিকে তোদের দিদিমার গঞ্জনাও আর সহ্য হয় না। ঠিক কর্‌লাম, হয় বিবাগী হয়ে যাব আর না হয় আত্মহত্যাই করব। দুটোর একটাও করতে হ'ল না, হঠাৎ খেয়াল হ'ল, মহাদেবের পূজো করলেই হয়। মহাদেব অত্যন্ত 'ভালো মানুষ,' দুটো বিল্বপত্র আর একটু গঙ্গাজল হ'লেই হ'ল। সহজেই মিল্‌ল। ঘড়ায় ছিল গঙ্গাজল, গাছে ছিল পাতা ; দুটীর সংযোগে পূজো সুরু করলাম মাটীর শিব তৈরী করে। ভাব্‌লাম, মহাদেব খুসী হলেই তাঁর কথায় মা লক্ষ্মীও খুসী হ'বেন নিশ্চয়, মহাদেব যাই হ'ন, লক্ষ্মীদেবীর বাবা ত ? খানিকক্ষণ একমনে পূজো করতেই দেখি—ঘরের দরজার কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছেন ! ভাল ক'রে লক্ষ্য করতেই দেখি স্বয়ং মহাদেব। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম ; বল্‌লাম ব্যস্তভাবে—'আরে প্রভু যে ! আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?'

"মহাদেব একটু লজ্জিত ভাবেই বল্‌লেন—'না, না, থাক্‌, থাক্‌।' মুখে তাঁর সে সদাপ্রসন্ন ভাব আর নেই, কি রকম যেন মুষড়ে মত রয়েছেন মনে হ'ল। বল্‌লেন, 'দেখ বাবা ! কেউ ডাক্‌লে না এসে থাক্‌তে পারি না কিন্তু বর দিতে বা কোন সাহায্যই আর কাকেও করতে পারি নে।'

"আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন প্রভু ?'

"প্রভু বল্‌লেন, 'বেকুব বনে যাওয়ার ভয়ে। জান ত' দেবতা-মহলে আমার সাদাসিধে বলে একটু দুর্নাম আছে, মানুষেও যে না বলে তা নয়। ও সব কথায় কান দিতাম না এতদিন। কিন্তু, সেবার সামান্য একটা মানুষের কাছে ও রকম বেকুব বনে যাওয়ার পর আর ত্রিসংসারে মুখ দেখাতে পারি নে।'

"একটু চুপ করে থেকেই আবার তিনি নিজেই সুরু করলেন,—'গোঁদলপাড়া জান ? গোঁদলপাড়া ? জান না বোধ হয়। যাক্‌, গোঁদলপাড়া ব'লে একটা জায়গায় লক্ষ্মীকান্ত বলে একটা লোক ছিল। অত বড় বদ্‌লোক সংসারে আর দুটো নেই। ব্রহ্মা যে কেন ওকে সৃষ্টি করেছিলেন তার ঠিক নেই—ওকে সৃষ্টি করা নিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে আমার ঝগড়াই হয়ে গেছে সেদিন। যাক্—শোন। ও লোকটার নিজের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না—অথচ ওরই আত্মীয় যা'রা তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভাল। ওর ছোট বাড়ীর সামনে একটু দূরেই তাদের প্রকাণ্ড বাড়ী—অজস্র টাকাকড়ি, প্রচুর সম্পত্তি। তার জন্য ত আমি দায়ী নই। ও ত লক্ষ্মীর ডিপার্টমেণ্ট। আর তা ছাড়া ও যা পাজি, লক্ষ্মীর বিরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। একই পুরুতঠাকুর বড় বাড়ীতেও পূজো করে, ওর বাড়ীতেও পূজো করে—লক্ষ্মীপূজো। একদিন ও বল্‌লে—

পুরুতঠাকুর! আচ্ছা, আপনি ত ও বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজো করেন, আমার বাড়ীতেও লক্ষ্মীপুজো করেন। ওদের ধন সম্পত্তির আর সীমা নেই অথচ আমার সেই যে অবস্থা সেই অবস্থাই রইল! এর মানে কি? আপনি নিশ্চয় ভাল করে মন্ত্র পড়েন না।

"'পুরুতঠাকুরটীও কম বিট্‌কেল নয়। সে বল্‌লে, আসল কথা কি জান, বাবা? আজকাল দেবতারাও গেছেন বদ্‌লে। মন্ত্র বা ভক্তিতে ভোলেন না, ঘুষ চান, ঘুষ। ষোড়শোপচারে পুজো দাও, তবেই খুসী। তুমিও একদিন বেশ খরচ করে পুজো কর, দেখ্‌বে, লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হবেন।

"'লক্ষ্মীকান্ত বল্‌লে—কত টাকা লাগ্‌বে?

"'পুরুতঠাকুর দেখ্‌লেন যে লক্ষ্মীকান্তের স্ত্রীর গায়ে যে গহনা আছে তা বিক্রি করলে শ'খানেক টাকা হ'তে পারে। একটু যেন ভেবে বল্‌লেন, এই শ'খানেক টাকা হলেই হবে।

"'লক্ষ্মীকান্তও তেতে গেল—বল্‌লে, ঠাকুর, ঠিক বল্‌ছ হবে?

"'পুরুতঠাকুর নির্ব্বিকার ভাবে বল্‌লে—নিশ্চয়ই হবে! মনে মনে ভাবলে—ছাই হবে, সে শ'খানেক টাকার ষোড়শোপচার আমার বাড়ীতে আস্‌বে—পুরোহিত যখন আমি।

"'লক্ষ্মীকান্ত তার গিন্নীর গায়ের সমস্ত গহনা বিক্রি করে শ'খানেক টাকা যোগাড় করল। গিন্নীকে বোঝালে—এই একশ' টাকার গহনা দিলে হাজার হাজার টাকার গহনা হবে—দেখ্‌বে।

"'ষোড়শোপচারে পূজো হ'ল শ'খানেক টাকা খরচ ক'রে। শ'খানেক টাকার দ্রব্য উঠ্‌ল গিয়ে পুরুতঠাকুরের বাড়ী; লক্ষ্মীকান্তের লক্ষ্মীর দয়াও আর মিল্‌ল না। দিন যায়। লক্ষ্মীকান্ত উঠ্‌ল ক্ষেপে। একদিন পাগলের মত গিয়ে পুরুতঠাকুরের হাত গিয়ে ধরল চেপে। চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে, কই ঠাকুর, অবস্থা ভাল হ'ল কই আমার? মজা পেয়েছ। নিজের অবস্থা ভাল করার মতলব তোমার আমার ঘাড় ভেঙ্গে, না?

"'পুরুতঠাকুর ভয় পেয়ে বল্‌লে—বাবা, রাগ কোরো না! এখনও যে অনেকটাই বাকী রয়েছে।

"'লক্ষ্মীকান্ত চোখ পাকিয়ে বললে—কি বাকী রয়েছে?

"'পুরুতঠাকুর বল্‌লে—পূজা যা করবার তা' ত করেছি আমি, এবার তোমার করবার পালা। বড় শক্ত—অথচ সেটা না করলেও লক্ষ্মী সদয়া হবেন না।

"'কি করতে হবে আমাকে বলুন—লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞাসা করে মরীয়া হয়ে।

"'পুরুতঠাকুর বল্‌লে—লক্ষ্মী ত' খুসী হয়েছেন, এখন দরকার মহাদেবকে খুসী করা। বড় বাড়ীর বড় বাবু এই অমাবস্যা থেকে এক পক্ষ ধরে নির্জ্জলা উপবাস ক'রে মহাদেবের ধ্যান করবেন। তোমাকে তার চেয়েও বেশী কর্‌তে হবে, বাবা! ঐ বনের মাঝে যে মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে যে মহাদেব আছেন, সেই মহাদেবের ধ্যান করতে হবে তোমাকে নির্জ্জলা

উপবাস করে। ও বাড়ীর বড় বাবু পনেরো দিন ধ্যান কর্‌বে, তুমি এক মাস কর যদি তা হ'লে বড় বাবুর যা মিল্‌বে তোমার নিশ্চয় তার চেয়ে বেশী মিল্‌বে মহাদেবের বরে।'

"এই কথা বলেই মহাদেব বল্‌লেন—'দেখ মজাটা! বেটা পুরুত, দিল আমার ঘাড়ে ফেলে! ঐ শয়তানটাকে আমার উপর ভর করিয়ে দিলে শেষ পর্য্যন্ত!'—ব'লে আবার সুরু করলেন—

"'যাক্, শোন তার পর আমার দুর্দ্দশার কাহিনী।'

"'পুরুত ঠাকুরের কথা শুনে লক্ষ্মীকান্ত প্রথমটায় যেন বেশ একটু ঘাব্‌ড়ে গেল। খানিক পরে হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে—আচ্ছা ঠাকুর! তাই করব, কিন্তু তার পরেও যদি না আমার বাসনা পূর্ণ হয় তা হ'লে তোমাকে খুন করব—সত্যিকারের খুন করব—তা সে ব্রহ্মহত্যার পাতকে পড়্‌তে হয় সেও রাজি—

"'পুরুতঠাকুর মনে মনে ভাবল—এখন ত' বাঁচি, বাবা! পরে যা হ'বার তা হ'বে। ও বেটা এক মাস নির্জ্জলা উপবাস ক'রে কি আর বেঁচে ফিরবে ঐ মন্দির থেকে? ওখানেই ও বেটার মরতে হবে শেষ পর্য্যন্ত।

"'যাক্, লক্ষ্মীকান্ত ত ঢুক্‌ল আমার ঐ মন্দিরে। সত্যি-সত্যিই সুরু করল আমার ধ্যান করতে—স্রেফ্ নির্জ্জলা উপবাস করে।' বলে আবার আমাকে মহাদেব বল্‌লেন, 'কি মুস্কিল বল ত' আমার হ'ল! সামান্যতে আমি খুসী হই ব'লে অন্য দেবদেবীদের কাছে আমার কি লাঞ্ছনাই সহ্য করতে হয় তা তুমি জান না। আর এ ক্ষেত্রে একটা লোক জল পর্য্যন্ত স্পর্শ না ক'রে ধ্যান করবে আমার—আর আমি থাক্‌ব নির্ব্বিকার হয়ে—এ কি করে সম্ভব হয়? যাই হোক্, মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, কিছুতেই মনকে নরম হ'তে দেব না। তা ছাড়া এও ভাবলাম ও কি আর একমাস ধরে সত্যিই পারবে নির্জ্জলা উপবাস করে ধ্যান করতে! কিন্তু, আশ্চর্য্য! সত্যিই ও সমানে চালাতে লাগল নির্জ্জলা উপবাস ও ধ্যান। মনটা আমার গলে গলে অবস্থা হয়ে এসেছে তবুও বহু কষ্টে সামলে আছি। গোল বাধাল তোমাদের ঐ লক্ষ্মী। জান ত' কেউ না খেলে মেয়েদের অবস্থা কি হয়? লক্ষ্মী আমাকে সমানে খোঁচাতে লাগল—বাবা, লোকটা যে মরে যাবে; যা হয় একটা কিছু কর।

"'আমি বল্‌লাম—মরে মরুক! ওর মত লোকের মরাই ভাল। ব্রহ্মার যেমন কাণ্ড, ঐ রকম একটা পাষণ্ড সৃষ্টি করার অর্থ কি আমি বুঝি না।'

"'লক্ষ্মী নাছোড়বান্দা—না বাবা, তুমি যাও, নইলে লোকটা যে মরে যাবে!

"'আমি বল্‌লাম—বেশ বিরক্ত হয়েই বল্‌লাম, তা অত যদি দয়া ত' তুইই যা না! ও ত' আদতে চায় তোরই কৃপা!'

"'লক্ষ্মী বল্‌লে, ও ত জীবন পণ ক'রে আমাকে ডাকৃছে না—ডাকৃছে তোমাকে। আমাকে না ডাকলে যাই কি ক'রে বল? দেবতাদের আইনে বাধে যে!

"'লক্ষ্মীর বক্‌বকানি আর সহ্য করতে না পেরে গেলাম বেটার কাছে। মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তোমরা যাই বল—হাজার হ'লেও দেবাদিদেব মহাদেব ত আমি, একটা জ্যোতিঃ আছে ত' আমার! মন্দিরটার মধ্যে আলো হয়ে উঠ্‌ল খানিকটা। আলো হ'তে লক্ষ্মীকান্ত মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। আমাকে দেখে ভক্তি হওয়া ত' দূরে থাক্ খেঁকিয়ে উঠে বল্‌লে—কে হে তুমি অর্ব্বাচীন?

"'আমি বল্‌লাম, আমি দেবাদিদেব মহাদেব—

"'বেটা শয়তান, বিশ্বাস করলে না হে! আমার এই সাদাসিধে পোষাক দেখে বিশ্বাসই করল না যে আমি মহাদেব। শুধু বিশ্বাস করল না নয়—'রেগুলার ইনসাল্ট্' করলে আমাকে! বল্‌লে, বেশ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে একটু করুণার সঙ্গেই বল্‌লে—তুমি আমাকে কি দেবে বাবা? আমার ত' পরনে তবু একখানা কাপড় আছে কিন্তু তুমি যে স্রেফ্ একটা কপ্‌নি প'রে আছ! তুমি এক কাজ কর—আমার ট্যাঁকে একটা আধুলি রয়েছে এইটে নিয়ে যাও, স্বর্গে যাওয়ার পথে একখানা বড় দেখে গামছা কিনে নিয়ে যেও পরবার জন্য। কাপড় কিনে দেওয়ার মত পয়সা নেই, কি করব বল?

"'পাষণ্ডটার কথা শুনে সমস্ত শরীর রি রি ক'রে উঠল—ভাবলাম, দিই বেটাকে ভস্ম ক'রে। কিন্তু তক্ষণি মনে হ'ল, ভস্ম করলে লক্ষ্মীর কান্নায় পাগল হয়ে উঠতে হ'বে, আর তা ছাড়া তোমরাও ত বাপু ভাল নও খুব; কোনও খোঁজ-খবর নেবে না, শুধু চিরকাল দোষ দেবে যে ধ্যানরত ভক্তকে মহাদেব করলেন ভস্ম! যাক্—শেষ পর্য্যন্ত ওটাকে বোঝালাম কোনও রকমে যে ক্ষমতা আছে আমার বর দেওয়ার। বল্‌লাম—কি চাস্, বল্ তুই?

"'ও বল্‌লে—যা চাইব তাই দেবে, প্রতিজ্ঞা কর।

"'বুঝলাম বেটার মতলব খারাপ। বল্‌লাম, দেখ্, তুই যা চাইবি তোর নিজের সুখ সুবিধার জন্য সব দেব কিন্তু হিংসুটেগিরি চল্‌বে না। তুই যা চাইবি তোর অদৃষ্টে তাই হবে কিন্তু ঐ বড় বাড়ীর ওদের দ্বিগুণ হ'বে তার। বলে আমি হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লাম; ভাবলাম, খুব জব্দ করেছি, এস বাছাধন দেখি একবার!

"'ও শয়তানটা প্রথম একটু মুষড়ে পড়ল মনে হ'ল—তার পর হঠাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে, আমার অদৃষ্টে যা হ'বে, ওদের বাড়ীর সকলের—দাসদাসীর পর্য্যন্ত সকলের তার দ্বিগুণ হবে?

"'আমিও তেতে গেলাম, বল্‌লাম—হ্যাঁ সকলের।

"'ও বেটা বল্‌লে কি জান? বল্‌লে—ঠাকুর, বর দাও—কাল সকাল হওয়ার আগে আমার বাড়ীর চারিধারে ত্রিশ হাত গভীর যেন এক প্রকাণ্ড জল-ভরা খাদ হয় আর আমার যেন একটী চক্ষু কাণা হয়ে যায়।

"'বল্‌লাম—তথাস্তু। প্রথমটায় বুঝি নি বেটার এ বর প্রার্থনার অর্থ কি? বুঝলাম, পরদিন সকালেই।

"'সকাল হ'তেই ও বাড়ীর সকলের, দাসদাসীর পর্য্যন্ত, হয়ে গেল দুটী চক্ষু অন্ধ। ওদের বাড়ীর কেউই কিছু বুঝতে পার্‌ল না প্রথমটায়। চোখে হঠাৎ কেউই কেন কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছে না তার কোন কারণই কিছু খুঁজে পেল না তারা। কাছেই একজন ডাক্তার ছিল। তাকে ডেকে আনবার জন্য একজন চাকরকে পাঠান হ'ল; সে কোনও রকমে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে গেল ডাক্তারের বাড়ী, কিন্তু সে আর ফির্‌ল না। আর একজন গেল, সেও ফিরল না। এমনি ক'রে একে একে সমস্ত দাসদাসী, ছেলেমেয়ে, বাড়ীর বাবুরা, এমন কি বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত সকলে যাওয়ার চেষ্টা করলে ডাক্তারের বাড়ী কোনও রকমে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে। কিন্তু ডাক্তারের বাড়ী যাওয়ার আগেই প্রত্যেকেরই মৃত্যু ঘটল ঐ খাদের মধ্যে পড়ে। বেচারারা কি ক'রে জান্‌বে বল যে রাতারাতি তাদের বাড়ীর চারপাশে ষাট হাত চওড়া একটা খাদ তৈরী হয়ে গেছে!

"'যাই হোক্, এরা ত' সবাই গেল মারা। আর তোমাদের মানুষের রাজত্বের আইন অনুসারে ওদের আত্মীয় ব'লে ঐ শয়তানটাই হ'ল ওদের ঐ অগাধ সম্পত্তির অধিকারী; ওর কেবলমাত্র একটা মাত্র চোখ গেল, আর কিছুই হ'ল না। নিজের বাড়ীর পাশের খাদও পার হ'ল তার উপরে তক্তা ফেলে, আর ঐ বড় বাড়ীর চারপাশের খাদ বুজিয়ে নিল মাটী ফেলে। ব্যস্, আমাকে স্রেফ্ বেকুব বানিয়ে দিলে হে!

"'লক্ষ্মীকে গিয়ে বল্‌লাম—দেখ্‌লি, তোর আবদারের জন্য একটা পরিবারকে নির্ব্বংশ করে এলাম, আর তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ঐ বেটা শয়তানটা হ'ল ওদের সমস্ত সম্পদের অধিকারী!...এ আফশোষ আমার কোনদিনই যাবে না—ছিঃ ছিঃ, এ কি করলাম!'"

দা'ঠাকুর বল্‌লে—"আমার মুখে অজ্ঞানতে বুঝি একটু হাসি বার হয়ে এসেছিল—ভোলানাথের এই আত্মবিলাপ শুনে। মহাদেব সে হাসি দেখে মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছেন দেখি। চোখ পাকিয়ে বল্‌লেন, 'তোমরা ত' হাস্‌বেই। আমার অবস্থায় পড়্‌লে বুঝ্‌তে পারতে ব্যাপারটা। স্বর্গে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছে আমার। সামনে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু আড়ালে সমস্ত দেবতারা, বিশেষতঃ ঐ ফিচ্‌কে দেবতাগুলো এমন মুখ টিপে টিপে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে আমার এই দুরবস্থা দেখে যে আমার ইচ্ছা করে এক এক সময় ওদের সব ভস্ম করে দিই—' বল্‌তে বল্‌তে মহাদেবের চোখে জল এসে গেল প্রায়।

"আমি তাঁর অবস্থা দেখে বল্লাম—'থাক্, প্রভু! আমার আর ঐশ্বর্য্যে দরকার নেই। আপনি এখন আসুন তা হ'লে।' মহাদেব একটু যেন লজ্জিতভাবেই অন্তর্হিত হলেন।"

গল্প শেষ করেই দাদু বল্লেন—"কাজেই ও ভূতনাথকে ধ্যান করে লাভ হবে না দাদু!"

আমি বল্লাম—"হয়েছে বৈ কি দাদু! ধ্যান করছিলাম বলেই ত' শুনলাম তোমার কাছে ভোলানাথের এ আত্মবিলাপের কথা—এইটাই পাঠিয়ে দিই এবার সম্পাদক ভায়ার কাছে।"

দাদু বল্লেন—"ওরে চোর, আমার এ গল্প তুই ছাপিয়ে নিজের নাম করতে চাস?"

আমি বল্লাম, "বিশ্বাস করুন দাদু, গল্পের মধ্যে আপনার নামই থাক্‌বে—আমি শুধু হ'ব লিপিকার। রাজি ত'?"

দাদু খুসী হয়ে বল্লেন, "আচ্ছা, তা হ'লে রাজি।"

জাপানের দীর্ঘপুচ্ছ মোরগ

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী

জাপান দেশের অদ্ভুত রকম লম্বা লেজওয়ালা মোরগের কথা হয়তো অনেকে শুনেছ। এই অদ্ভুত পাখী কিন্তু আগে সেখানে ছিল না। এর সৃষ্টি হয়েছে জাপানীদেরই চেষ্টায়—প্রায় দু' শ' বছরের চেষ্টায় বলা যেতে পারে। অনেকের মতে পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যত রকম গৃহপালিত জীবের অস্তিত্ব আছে, তাদের মধ্যে এই মোরগই নাকি দেখতে সব চেয়ে সুন্দর। এই মোরগের এক একটী আমেরিকাতে ১৫ শ' ডলার মূল্যেও বিক্রীত হ'তে দেখা গেছে।

এই পাখীগুলো তোষা মোরগ নামে পরিচিত; এদের জাপানী নাম হচ্ছে "ওনাগা-ডোরি" (দীর্ঘপুচ্ছযুক্ত মোরগ) অথবা "শিনোয়ারী-টো" (একটী সহরের নামানুসারে)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দায়িময়ো-থামানৌচি শক্তিশালী তোষা সম্প্রদায়ের জমিদার ছিলেন। জাপানের দক্ষিণে শিকাকু দ্বীপের তোষা প্রদেশের

ওপর তাঁর একাধিপত্য ছিল। থামানৌচির বংশের সবাই "অটৌরি" নামক পাখীর পালক-শোভিত মুকুট পরতেন।

থামানৌচির মাথায় একবার এক খেয়াল চাপ্‌ল। তিনি তাঁর সৈন্যদের আদেশ করলেন—তাদের বর্শাগুলো পাখীর পালকে সজ্জিত করতে হবে। এর জন্য তিনি ঘোষণা করলেন, যে লোক দীর্ঘ পালক ও পুচ্ছযুক্ত পাখী ধরে আনতে পারবে অথবা সৃষ্টি করতে পারবে তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হ'বে। তোষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেল। কিন্তু দীর্ঘপুচ্ছযুক্ত পাখী অধিক সংখ্যক সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল না। আর যা পাওয়া গেল তাদেরও পুচ্ছ এবং পালক খুব বেশী দীর্ঘ নয়। তখন অনেকে চেষ্টা ক'রতে আরম্ভ ক'রল বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাধারণ পাখীর পালক ও পুচ্ছকে দীর্ঘ ক'রে গ'ড়ে তোলা যায় কি না।

অনেক দিন ধ'রে গোপনে গবেষণা ক'রবার পর শিনোয়ারী সহরের একজন

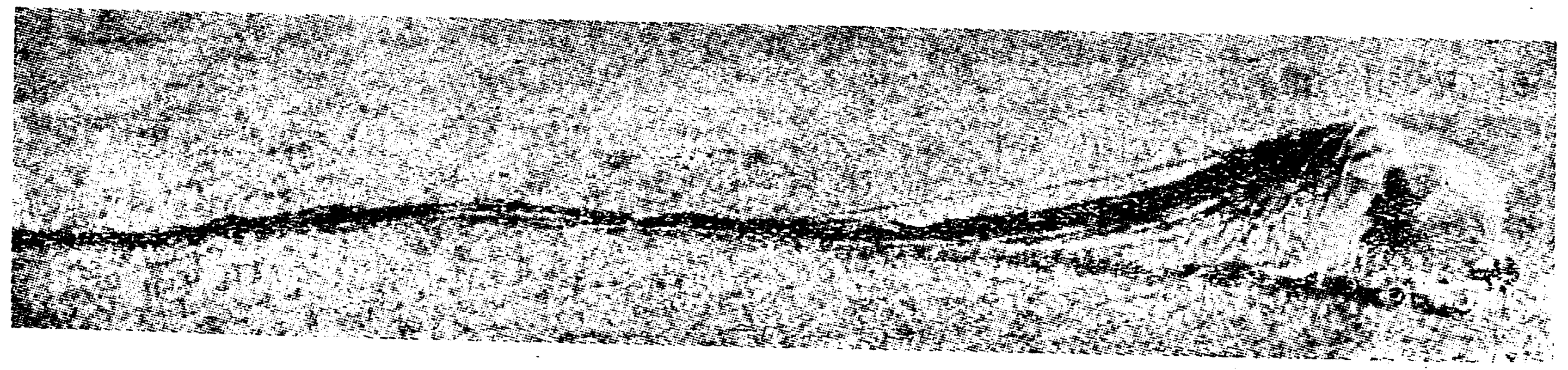

দীর্ঘপুচ্ছ জাপানী মোরগের 'পুচ্ছের' একটু নমুনা

অধিবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অসম্ভব রকম দীর্ঘ এবং সুন্দর পুচ্ছযুক্ত কতকগুলো পাখী আমদানী ক'রল। এই পাখী দেখে সবাই মেতে উঠল বিপুল উৎসাহে। এবার শুধু পুচ্ছের দৈর্ঘ্য নিয়ে নয়, পালক ও পুচ্ছের রং নিয়েও গবেষণা আরম্ভ হ'ল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এক রকম তুষারশুভ্র মোরগের আমদানী হ'ল। এগুলোর ছিল অসম্ভব রকম দীর্ঘ পুচ্ছ, উজ্জ্বল হলদে রংএর পা, আর মাথায় রক্তবর্ণ চিরুণী। তোষা প্রদেশের অধিবাসীরা সর্ব্বপ্রথম এই মোরগ আমদানী ক'রেছিল ব'লে এগুলোর নাম হ'ল তোষা মোরগ।

উপরি-উক্ত তুষারশুভ্র মোরগ ব্যতীত এই ধরণের আরও তিন রকমের

পাখী জাপানে দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলোর নাম "শিরাফুযি" (শুভ্র মস্তক ও কাল পুচ্ছযুক্ত), "টো-কেনকো" (রক্তবর্ণ পুচ্ছযুক্ত) এবং "দো-কিরি" (ত্রিবর্ণযুক্ত)। আধুনিক জাপানীরা তোষা মোরগকেই বেশী পছন্দ করে। কয়েক বছর আগে এই শিরাফুযি জাতের একটী পাখী জাপানে পক্ষী-প্রদর্শনীতে চ্যাম্পিয়নশিপ্ লাভ করেছিল। তার পুচ্ছের সংখ্যা ছিল ২৪টী এবং পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫ ফুটেরও বেশী। সে সময়ে তার দাম হয়েছিল ছ' হাজার ইয়েন।

প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে এই সমস্ত পাখী পালন করা হয়। কোন বৈদেশিককে এদের পালন-প্রথা দেখতে দেওয়া হয় না। তবে বসন্ত কালে ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরির পাদদেশে দু' চারটীকে বেড়াতে দেখা যায়।

তোষা মুরগীর পালক কিন্তু খুব বেশী হ'লেও আট ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। মুরগীগুলি মোরগের মত সুন্দরভাবে হাঁটতেও পারে না। এদের প্রত্যেকে প্রতি ঋতুতে প্রায় ১৫টী ক'রে ডিম পাড়ে। সাধারণ মুরগী দিয়ে এই সব ডিমে তা দেওয়া হয়।

এক বছরের তোষা শাবকের পুচ্ছ প্রায় আড়াই ফুট লম্বা হয়। তিন বছর বয়সে পুচ্ছ নয় ফুট লম্বা হয়। তখন পালকগুলো খুব সুন্দর দেখায়। তার পর প্রতি বৎসর ছয় ইঞ্চি করে বাড়তে থাকে। সাধারণতঃ তোষা মোরগগুলো চার থেকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। হঠাৎ যদি কোনটা ৮।৯ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে যায় তা হ'লে তার পুচ্ছ ২৩।২৪ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হ'তে পারে।

এই বিরাট্ পুচ্ছ অত্যধিক যত্নসহকারে রক্ষা করা হয়। নির্ব্বাচিত সবগুলো মোরগকে একটী কাচের আবেষ্টনীর মধ্যে রাখা হয়; এর ওপর নীচ খোলা, একটী বৃহৎ খাঁচার মত। মোরগ তার ভিতরে বসলে যাতে তার পুচ্ছ মাটী স্পর্শ না করতে পারে এইভাবে সেটী ঝুলিয়ে রাখা হয়।

মোরগের থাকবার জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ, তাই মোরগ তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে বা পুচ্ছ নষ্ট করে ফেলতে পারে না। তবে মোরগকে শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস করান' হয়। ব্যায়ামের সময় ছাড়া প্রায় সব সময়েই তারা সেই খাঁচার মধ্যে থাকে। রাত্রিতে পুচ্ছটিকে কুণ্ডলী করে একটী ঝুড়ির ভিতর সযত্নে রেখে দেওয়া

হয়, এমন ভাবে যাতে নিদ্রিত অবস্থায় মোরগের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। যেখানে খাঁচাটী থাকে সে জায়গাটী সুরক্ষিত থাকে আর থাকে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা।

পুচ্ছ দীর্ঘ করবার জন্য কোন রকম কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হয় নি। স্বাভাবিক নিয়মেই সেগুলি বাড়তে থাকে। প্রতি মাসে একদিন ক'রে মোরগের পুচ্ছ এবং পালকগুলো গরম জল দিয়ে ধুইয়ে দেওয়া হয়। তার পর ছাদের ওপরে অথবা সবুজ মাঠের ওপরে তা'কে ছেড়ে দিয়ে সেগুলো শুকিয়ে নেওয়া হয়। প্রত্যেক দিন সে বেড়াতে বের হয় তা'র রক্ষকের সঙ্গে। তবে উড়তে পারে না—কারণ আগে থেকেই তা'র একটী ডানা কেটে দেওয়া হয়। ব্যায়ামের সময় তার রক্ষক পুচ্ছটিকে কুণ্ডলীকৃত ক'রে পাতলা কাগজে জড়িয়ে নিজের কনুইএর ওপরে রাখে। একসঙ্গে যখন অনেকগুলো মোরগ "প্যারেড" করে তখন দেখতে চমৎকার লাগে।

বলা বাহুল্য এদের খাদ্য সম্বন্ধে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। খোসা সমেত চাল, সবুজ শাক-সব্জী, মূলো, সয়ে, কোন কোন সামুদ্রিক মাছ প্রভৃতি এদের খাদ্য। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জলও সরবরাহ করা হয়।

আমেরিকার কয়েকজন উৎসাহী যুবক এ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁদের মতে চেষ্টা করলে আমেরিকাতেও এইরূপ পাখী হ'তে পারে। জাপানের এবং নিউইয়র্কের জলবায়ুতে বেশী তফাৎ নেই। আর, কোন কিছুর প্রয়োজন হ'লে, জাপান তো বেশী দূর নয়, অনায়াসেই তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু জাপানীরা এ সম্বন্ধে বৈদেশিকদের কিছুই ব'লতে রাজি নয়।

পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই বোধ হয় জাপানীদের মত সৌন্দর্য্যপ্রিয় নয়! মিষ্টার থামাগুচির বাইশ ফুট পুচ্ছবিশিষ্ট একটী তুষারশুভ্র তোষা পাখী ছিল। এই পাখীটির মৃত্যু হবার পর তিনি এক শিল্পীকে নিযুক্ত করলেন, তাঁর শয়ন-কক্ষের একটী বৃহৎ স্তম্ভে ঐ পাখীর প্রতিকৃতি খোদিত করবার জন্য। আজও সেই খোদিত প্রতিকৃতি আপন শোভা-সৌন্দর্য্য নিয়ে জীবন্ত পাখীর মত

সেখানে বিরাজিত র'য়েছে। জাপান ভ্রমণকারীদের চোখে সেই স্মৃতিচিহ্ন আজও বিস্ময় উৎপাদন করে।

১১

সেই ভয়ঙ্কর কঙ্কাল দেখিয়া ছেলে চারিটি কিছুক্ষণের জন্য কাঠ হইয়া রহিল, তার পর সাহস করিয়া আর একটু কাছে গিয়া দাঁড়াইল। লোকটা হাত পা ছড়াইয়া মরিয়াছিল—সমস্ত কঙ্কালটি এখনো আস্ত রহিয়াছে। সেই বিস্তৃত দন্তপংক্তি, মাংসহীন চক্ষুর কোটর দুটি, শুভ্র শুষ্ক করোটি খুব সাহসী ব্যক্তির মনেও ভীতি-সঞ্চার করে, তাহারা ত ক্ষুদ্র বালক মাত্র। কিন্তু বালক হইলেও তাহারা এখন অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া পূর্ণবয়স্ক জনোচিত সাহস ও বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। সেই নরকঙ্কাল দেখিয়া তাহাদের তখন কেবলই মনে হইতে লাগিল—কে এই হতভাগ্য ব্যক্তি, যে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে মরিতে আসিয়াছে! সে কি কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের নাবিক? কোন্ দেশের লোক সে? কত বয়সই বা তাহার? কত দিন—কত মাস—কত বৎসর না জানি সে এই দ্বীপের উপর কাটাইয়াছিল? হয়ত যৌবনকালে দ্বীপের উপর আসিয়া উঠিয়াছিল, তার পর বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া একেবারে বৃদ্ধ বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। এতদিন সে কেমন করিয়া এই নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব দ্বীপে তাহারা জীবিকার সংস্থান করিয়াছিল?

কিন্তু তখন আর এক প্রশ্ন সুশান্তর মনে উদিত হইতেই আর সমস্ত প্রশ্নই তাহার মন হইতে দূরীভূত হইল। এটা যদি বাস্তবিক একটা মহাদেশের অংশ হয় তবে এই হতভাগ্য নাবিক কেন সারা জীবন এই একই স্থানে কাটাইল? কেন সে পূর্ব্বদিকে আগাইয়া কোন সহর বা লোকালয়ে গমন করিবার চেষ্টা করে নাই? ভিতরে যাইবার এমন কি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে যাহা সে অতিক্রম করিতে পারে নাই?

যাহা হউক এখন পর্ব্বতগহ্বরের ভিতরটা ভালো করিয়া পরীক্ষা করা দরকার। হয়ত তাহার ভিতরে এমন কিছু নিদর্শন, এমন কোন কাগজপত্র মিলিবে যাহা হইতে এই হতভাগ্য নাবিক ও তাহার জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইবে। আর সেই সব তত্ত্ব তাহাদের পক্ষেও কম আবশ্যক নয়! আর সামনে যেরূপ প্রচণ্ড শীত আসিতেছে তাহাতে এই পর্ব্বতগহ্বরও ভবিষ্যতে তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ হইতে পারে। তারা তখন চারিজনে পুনরায় সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। রঞ্জিতের যত বাহাদুরী, যত দাম্ভিকতা শান্তি ও সম্পদের সময়; এখন এই উভয়সঙ্কট দ্বিধাসঙ্কুল মুহূর্ত্তে সে সম্পূর্ণরূপে সুশান্তর বশবর্ত্তী হইয়া চলিল।

এইবার তাহারা গুহার অভ্যন্তর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। একদিকে দেওয়ালের উপর একটা কাঠের সেল্ফ্ লাগানো রহিয়াছে। তাহার উপর অনেকগুলি মোমবাতি। সভ্যপ্রদেশের সুদর্শন মোমবাতি নহে, সেগুলি চর্ব্বি ও মোম দিয়া হাতের তৈয়ারী।

নীলাদ্রি তখন একটা মোমবাতি লইয়া জ্বালাইয়া টেবিলের উপর রাখিল। সেই গুহাটি বেশ প্রকাণ্ড; গুহার প্রাচীর শক্ত গ্রানাইট্ পাথরের। মেঝেও বেশ শুকনো খট্‌খটে। বাহির হইবার কিন্তু সেই নদীর দিকে একটি মাত্র দরজা। সুশান্ত ভাবিল, গুহার মধ্যে বাতাস চলাচলের জন্য আর একটি দুয়ারের প্রয়োজন। যাহা হউক, বিপদের সময় ইহাই তাহাদের বেশ আশ্রয় দিতে পারিবে। পনেরোটি ছেলের স্থান সংকুলান ইহার ভিতরে সহজেই হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে চিরকাল বাস করিতে হইলে কতকগুলি বিভিন্ন কামরার দরকার। একই ঘরের মধ্যে শুইবার স্থান, ভাঁড়ার ঘর, রাঁধিবার জায়গা হইতে পারে না। তাহাতে স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হইবে। অবশ্য পাঁচ ছয় মাস শীতের জন্য তাহাদের ইহাতেই কুলাইবে; সুশান্ত তখন গুহাস্থিত দ্রব্যগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিল। নিতান্ত তুচ্ছ সামান্য সে সব সামগ্রী। কি দারুণ অভাব ও দৈন্যের মধ্যে সেই হতভাগ্য লোকটিকে দিন যাপন করিতে হইয়াছে! কতকগুলি ভাঙা তক্তা, একটি কুড়াল, একটি শাবল, একটি কোদাল, রান্নার দুই চারিটা পাত্র, একটা হাতুড়ি—এই ছিল তাহার দৈনন্দিন জীবনযাপনের স্থূল উপাদান।

সুশান্ত তখন সঙ্গীদের পানে চাহিয়া কহিল—"এই গুহাই আজ হ'তে আমাদের আশ্রয়-স্থল হবে। এককালে যখন এর মধ্যে লোক বাস করেছিল তখন আমরাই বা পারব না কেন?"

এই কথা বলিয়াই তাহার বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল বাহিরের সেই ভয়ঙ্কর নর-কঙ্কালের কথা। তাহার মত তাহারাও কি এই অজানা দেশে এসে একে মরিবে? শেষ পর্য্যন্ত যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় দিন কাটিবে? চৌদ্দটি সঙ্গী একে একে মরিয়াছে, এইবার তাহার পালা। আচ্ছা, লোকটি মরিয়াছে কত দিন আগে? নিশ্চয় বহু বৎসর পূর্ব্বে—গাছতলার সেই শুষ্ক হাড়গুলা ত স্পষ্টই সেই কথা বলে।

হয়ত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, হয়ত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, হয়ত বা তাহারও বহু পূর্ব্বে। তখন সুশান্তর মনে পড়িল গাছের উপর খোদিত সেই ইংরাজী সালের কথা—১৮২৭। তবে কি লোকটা মরিয়াছে আজ একশত বৎসরের অধিক হইল? এতদিন পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী গুহার মধ্যে রহিয়াছে? এই এক শত বৎসরের মধ্যে আর কেহই কি সেই গুহার মধ্যে পদার্পণ করে নাই? এই এক শত বৎসর কোন মানুষই কি এই দ্বীপে ওঠে নাই?

খুঁজিতে খুঁজিতে আর একটি বড় ছুরি পাওয়া গেল। তার পর একটি বহু পুরানো কম্পাস, একটি চায়ের কেট্‌লী। কিন্তু জাহাজ চালানোর বা দিক্ নিরূপণ করিবার আর কোন যন্ত্রই তাহারা গুহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না, এমন কি একটা বন্দুক পর্য্যন্ত তাহাদের চোখে পড়িল না। হঠাৎ ঘরের এক কোণে নীলাদ্রির চোখ পড়িল। সে কহিল—“সুশান্ত, দেখ দেখ ওটা কি?” বাস্তবিক সেই অদ্ভুত জিনিষটা যে কি সামগ্রী তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। তাহার পাশেই আবার সেই জাতীয় আর একটি দ্রব্য। বুঝিয়াছিল কিন্তু সুশান্ত। প্রথম দ্রব্যটির নাম ‘বোলা’। ইহার সম্বন্ধে সে পুস্তকে পড়িয়াছিল। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই বোলার সাহায্যে বন্য জন্তু ধরিয়া থাকে। একটা প্রকাণ্ড লম্বা দড়ির দুইদিকে দুইটা বল্ বাঁধা; তাহা ছুঁড়িয়া তাহারা যে কোন জন্তুকে ধরিতে পারে। তাহাদের এমনই অভ্যস্ত হাত যে তাহা ছুঁড়িয়া কোন জন্তুর উপর নিক্ষেপ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মাটীতে পড়িয়া যায় ও তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিমেষের মধ্যে অবশ হইয়া পড়ে। তখন নিকটে গিয়া তাহাকে আয়ত্তে আনা কিছুই নয়। এই বোলার বিবরণ সে অনেক গল্প-পুস্তকে পড়িয়াছে। পাশের দ্রব্যটির নাম ‘লাস্সো’; লাস্সোর সাহায্যে বড় বড় বন্য ঘোড়াও যে সহজে ধরা যায় তাহা ত তোমরা সকলেই জান। এইবার বুঝা গেল লোকটা কেমন করিয়া বনের জীবজন্তু ধরিত। বন্দুকের অভাব এই বোলা ও লাস্সোর দ্বারা কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়াছিল। বিছানার বালিসপত্র সরাইয়া তাহারা একটি ক্ষুদ্র ঘড়ি পাইল। অতি সুন্দর সূক্ষ্ম তাহার কারিকুরি; রূপার ঢাক্‌নি; সঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে রূপার চেন ও রূপার চাবি। সুশান্ত অতি কষ্টে তাহার ঢাক্‌নি খুলিল। ভিতরে সোনার কাঁটা; তিনটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়া রহিয়াছে। সে চাবি দিয়া দম দিল, কিন্তু ঘড়ি চলিল না। ভিতরে কত দিন তেল পড়ে নাই। রঞ্জিৎ কহিল—“ঘড়ির ভিতরে নিশ্চয় মেকারের (ঘড়ি-নির্ম্মাতার) নাম লেখা আছে।” হাঁ, সুশান্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিল ঘড়ির ডালার উপর লেখা রহিয়াছে—“Delpench, Saint Malo”; ফরাসী নাম, কোন ফরাসী কারখানায় এই ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু লোকটির জাতি যে এখনো জানা গেল না! খুব সম্ভব সে ফরাসী জাতি; স্বদেশজাত জিনিষ ছাড়া সে কি আর বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে? কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

কিন্তু সমস্ত সন্দেহ তাহাদের শীঘ্রই দূর হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদের হাতে পড়িল একটা নোট্-বুক। ভিতরের কাগজগুলি একেবারে হলুদবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে ফরাসী ভাষায় কি সব লেখা। রঞ্জিৎ ও সুশান্ত যথাক্রমে লা মার্টিনিয়ার ও সেণ্ট্ জেভিয়ার্সের ছাত্র—তাই ফরাসী ও ল্যাটিন্ ভাষা অল্প অল্প জানিত। নোটবুকের প্রথম পাতায় নাম লেখা রহিয়াছে—ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ। যাক্, আর কোন সন্দেহ নাই যে লোকটি জাতিতে ফরাসী ছিল এবং এই লোকটিই মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত এই গুহার মধ্যে বাস করিয়াছিল।

১২

ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ—এই নামের আদ্যাক্ষর দুটি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা গাছের উপর খোদিত দেখিয়াছে। সেই খাতাখানার পাতা উল্টাইয়া তাহারা বুঝিল সেটি সেই ফরাসীর রোজ-নাম্‌চা। দ্বীপে যেদিন সে প্রথম উঠিয়াছিল সেইদিন হইতে মৃত্যুর কয়েকদিন আগের পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সেই ডায়েরীর পাতায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তবে অনেক দিনের পেন্সিলের লেখা বলিয়া অনেক জায়গা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। এক জায়গায় স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে—“দুন্দুয়্যা ক্রুয়াঁ”—নিশ্চয়ই সেই জাহাজের নাম যাহাতে সে নাবিকের কাজ করিত ও যাহা এই সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে সলিলমগ্ন হইয়াছে। খাতার গোড়ার দিকে তাহারা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ পাইল—ঠিক যে সাল গাছের উপর খোদিত আছে। অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ এই দ্বীপে পদার্পণ করে। সেই জাহাজ ডুবির পর বেচারী বাহির হইতে উদ্ধারের কোন সাহায্য পায় নাই, তাই মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে এই দ্বীপে কাটাইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনাবলী দর্শন করিয়া ছেলে চারিটির মনে রীতিমত দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের ভাগ্যেও কি এইরূপ দুর্দ্দশা লেখা আছে? এমন সময় খাতার ভিতর হইতে একখানা বড় ভাঁজ-করা কাগজ মেঝেয় পড়িয়া গেল। রোহিতাশ্ব তাহা কুড়াইয়া লইয়া দেখিল হাতে আঁকা একখানা প্রকাণ্ড ম্যাপ। অতি জঘন্য কালিতে ম্যাপখানা আঁকা। বদোয়াঁ নিশ্চয় দ্বীপে আসিবার পর দ্বীপের কোন ফল পাকড় লইয়া এই কালি প্রস্তুত করিয়াছিল। রোহিতাশ্ব কহিল—“লোকটা যখন ম্যাপ তৈরী করতে পারত তখন নিশ্চয় সে সাধারণ নাবিক ছিল না, নিশ্চয় জাহাজের কোন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিল।” রঞ্জিৎ কহিল—“নিশ্চয়; আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু ম্যাপটা কোন্ দেশের তা বুঝ্‌তে পারছ, সুশান্ত?”

সুশান্ত কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল—“আমার ত মনে হচ্ছে এটা এই দেশের ম্যাপ। এই দেখ এইখানটায় আমাদের জাহাজ আছে; এই সেই উপসাগর, এই সেই সব প্রবালশ্রেণী। এই দেখ সেই হ্রদটা। পশ্চিম দিকে আমি যাদের তিনটে জাহাজ মনে করেছিলাম তা বাস্তবিকই তিনটে দ্বীপ; এই দেখ সেই তিনটে দ্বীপ আঁকা রয়েছে। দ্বীপের মাঝখানে সেই

গভীর অরণ্য যার মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি। হ্রদটা খুব বড় নয়; হ্রদের ওপারেই গহন বন আঁকা রয়েছে; এবং তার ওপারেই এই দেখ নীল রঙে সমুদ্র আঁকা রয়েছে।"

নীলাদ্রি কহিল—"তা হ'লে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভবপর নয়। আর এইবার বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যার উপর উঠেছি তা একটা সামান্য দ্বীপ। মহাদেশ মহাদেশ ক'রে আমরা এত দিন শুধু মিথ্যাই মাথা ঘামালুম।"

রঞ্জিতের মুখ তখন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, তাই সুশান্ত আর কথা বাড়াইল না। কিন্তু সেটা যে দ্বীপ সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। এখন এই ম্যাপটা ছেলেদের নিকট কম প্রয়োজনীয় হইবে না। ম্যাপ হইতে বোঝা গেল, দ্বীপটা গোলাকার নয়, বেশ আয়ত গঠন। ঠিক যেন একটা বড় প্রজাপতি ডানা ছড়াইয়া জলে ভাসিতেছে। দ্বীপের মাঝখানে এক গভীর অরণ্য; আর অরণ্যের মধ্যস্থলে সেই হ্রদ। অর্থাৎ হ্রদের এ পারেও যেমন নিবিড় বন, ওপারেও তেমনি। হ্রদটা নিতান্ত ছোট নহে, দৈর্ঘ্যে তাহা পনেরো মাইল, প্রস্থে পাঁচ ছয় মাইল হইবে। এত বড় হ্রদকে ত সমুদ্র বলিয়াই মনে হইবে। হ্রদ হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে; কতকগুলি বনের মধ্যে গিয়া লোপ পাইয়াছে। ম্যাপের অঙ্কিত স্কেচ্ দেখিয়া বোঝা গেল দ্বীপটা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ হইবে ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ মাইল চওড়া হইবে। কিন্তু দ্বীপটা যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ অংশে অবস্থিত তাহা ম্যাপ হইতে বোঝা গেল না। তবে এইটুকু তাহারা বেশ বুঝিল যে এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দ্বীপের উপর তাহাদের এখন বহুদিন কাটাইতে হইবে। দ্বীপটা সমুদ্রের এমন জায়গায় অবস্থিত যাহার নিকট দিয়া কোন জাহাজই যাতায়াত করে না। এখন এই গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় নাই। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া জাহাজ হইতে যাবতীয় সামগ্রী এই গুহার মধ্যে লইয়া আসাই হইবে তাহাদের প্রথম কাজ। (ক্রমশঃ)

মাটী খোঁড়ার কথা

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্.এ, পি.আর.এস্

তোমাদের ভেতরে যারা ইতিহাস পড়, ত্যারা জান যে হাজার হাজার বছর আগেকার অনেক বড় বড় সহর মাটীর তল থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। এই সব সহরের ভাঙ্গা ঘড়-বাড়ী, রাস্তা, মন্দির ইত্যাদি থেকে সে সব যুগের

অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। এই সব জিনিষের সাহায্যে ইতিহাস রচনা করা হয়। এই রকমভাবে পুরোন কালের ভারতবর্ষ, চীন, অসুর, বাবিলন, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশের ইতিহাস লেখা হয়েছে। তোমাদের মনে একটী প্রশ্ন আসতে পারে—কি রকম ভাবে পৃথিবীর বুকের ভেতর থেকে এই সব সহর খুঁড়ে বার করা হ'ল। বর্ত্তমান সময়কে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয় কিন্তু বিজ্ঞান খালি এখনকার একচেটে নয়। মানুষ সর্ব্বযুগে ও সর্ব্ব অবস্থাতে কোন কাজ করতে হ'লে একটা নিয়মের ভেতর দিয়ে করে। সে রকম মাটীর বুক থেকে পুরোন কালের সহর বার করার ব্যাপারেও একটী বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে এই পদ্ধতিটী ক্রমেই কিছু না কিছু বদলে যাচ্ছে। যাক্, আজকালকার দিনে কি রকম করে মাটীর ভেতর থেকে হাজার হাজার বছরের পুরোন সহর খুঁড়ে বার করা হয় তা তোমাদের বল্‌ব।

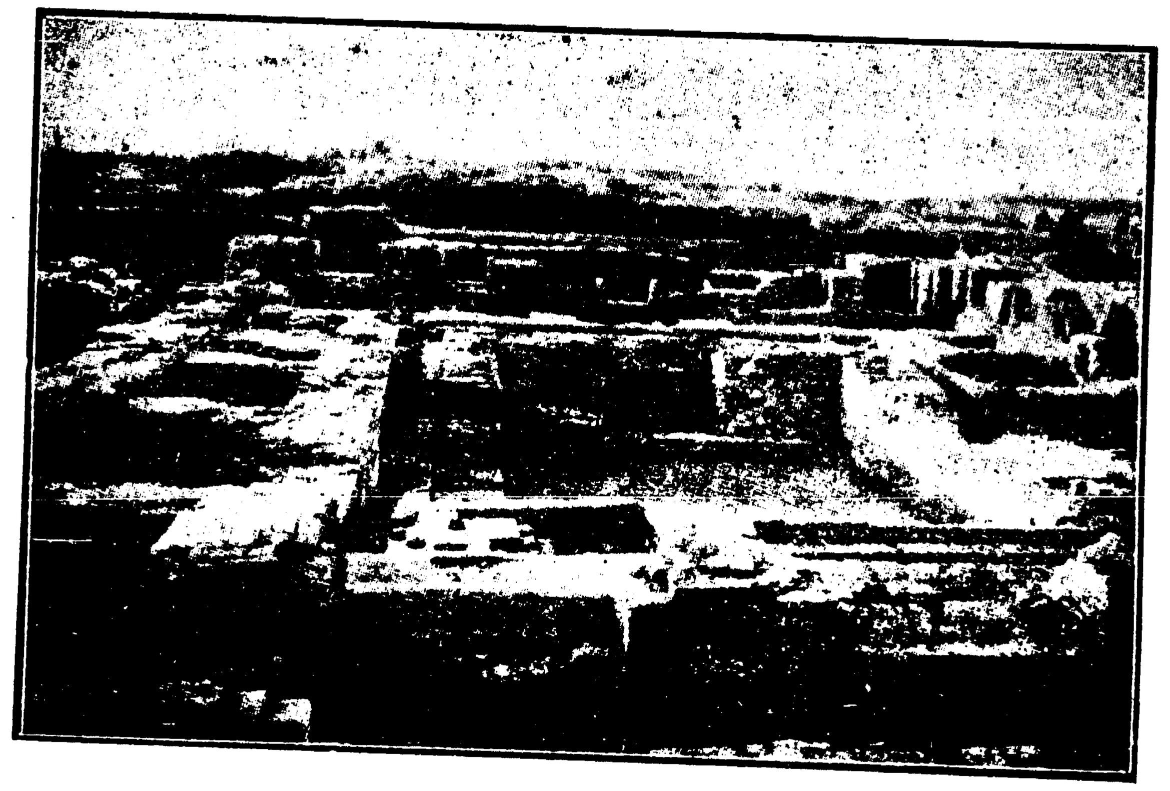

মাটী খুঁড়ে পুরোন যুগের সহর বার করার একটি দৃশ্য

মাটীর তল থেকে পুরোন কালের সহর খুঁড়ে বার করতে হ'লে অনেক টাকার দরকার; সেজন্য খুঁড়লে কিছু পাওয়া যাবে কিনা তা আগে থেকে না জেনে খোঁড়া হয় না। এ রকম জায়গা বড় বড় পণ্ডিতরা ঘুরে ঘুরে আবিষ্কার করে থাকেন। একটী দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া যাক্। চীন দেশের নামকরা পরিব্রাজক হুয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আমাদের দেশে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী নিয়ে একটী বই লিখে যান। এই বইটীতে তিনি যে সব সহরে গিয়েছিলেন সেগুলি একটী হ'তে আর একটী কত দূরে

ও কোন্ দিকে এবং তাঁর যেতে কত দিন লেগেছিল তা খুব নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। হুয়েন সাং এই বইতে বর্ণিত যে রাস্তা দিয়ে ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে গিয়েছিলেন সেই রাস্তা দিয়ে স্যর আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত সেই সব সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে যান। এ রকম ও আরও অন্যান্য ভাবে পৃথিবীর নানা দেশের পুরোন যুগের সহর আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুরোন সহরের অস্তিত্ব মাটী খুঁড়ে না বার করেও ওপর থেকে কি করে বোঝা যায় তা বলা দরকার। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে সহর যত পুরোনই হোক্ না কেন তার সমস্তটাই একেবারে মাটীর তলে চলে যায় না। তার কিছু না কিছু অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকে ও সে সমস্ত অংশের ওপর গজিয়ে ওঠে বনজঙ্গল। যেখানে পুরোন যুগের সহর ছিল সেখানে প্রায়ই মাটীর ঢিপি দেখতে পাওয়া যায়। বৃষ্টির জলে বা অন্য কোন উপায়ে এ সব ঢিপি থেকে বেরিয়ে পড়ে পুরোন যুগের অনেক ঘরবাড়ীর ভগ্নাবশেষ। এ ছাড়া এ সমস্ত জায়গাতে পুরোন টাকা, মূর্ত্তি, লিপিযুক্ত জিনিষ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সব জিনিষ একত্র করে ভালভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারা যায় যে এখানে একটী পুরোন যুগের সহর আছে। তখন সেটাকে মাটীর ভেতর থেকে খুঁড়ে বার করা হয়।

বছরের সব সময়ই খোঁড়ার পক্ষে প্রশস্ত নয়; এক এক দেশে এক এক সময়ে খোঁড়া হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শীতকালের মাস চারেক সময়ে এই কাজ করা হয়।

যে সব জায়গাতে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় সে সমস্ত জায়গা সাধারণতঃ জনমানবহীন বল্‌লেও চলে। সেজন্য খোঁড়ার কাজ আরম্ভ করার আগে ঐরূপ স্থানের একটী জায়গা বেশ ভালভাবে পরিষ্কার করে অনেক তাঁবু খাটান হয়। যে সব লোক এই কাজে নিযুক্ত হন তাঁদের জন্যই এই সব তাঁবু। এইভাবে এখানে কয়েক মাসের জন্য প্রায় একটী ছোটখাট গ্রাম গড়ে ওঠে।

এই খোঁড়ার কাজে যাঁরা ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত তাঁকে অধিনায়ক (Field Director) করা হয়। মাটীর তল থেকে যে সমস্ত জিনিষ বের হবে তাদের তাৎপর্য্য তিনি ঠিকভাবে বুঝতে পারবেন এটা

ধরে নেওয়া হয়। একটী স্থানের বিভিন্ন জায়গাতে খুঁড়বার জন্য এঁকে ছাড়া এঁর মত উচ্চশিক্ষিত কিন্তু কম অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া ফটোগ্রাফার, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌মানও থাকে।

কোন স্থানে খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে সেই স্থানের একটী জায়গা ভাল কালী দিয়ে চিহ্নিত করা হয়; ইংরেজীতে এই চিহ্নিত জায়গাটীকে 'ডেটাম্ লাইন্' বলা হয়। এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ যে সব জিনিষ পাওয়া যায় তা এর কত ফুট নীচে বা ওপরে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। সাধারণতঃ যে স্থানে খোঁড়া হয় সেখানকার সব চেয়ে উঁচু একটী জায়গাতে এই ডেটাম্ লাইন্ ঠিক করা হয়, কারণ তা হ'লে যে কোন জিনিষই পাওয়া যাক্ না কেন তা এর নীচেই হবে।

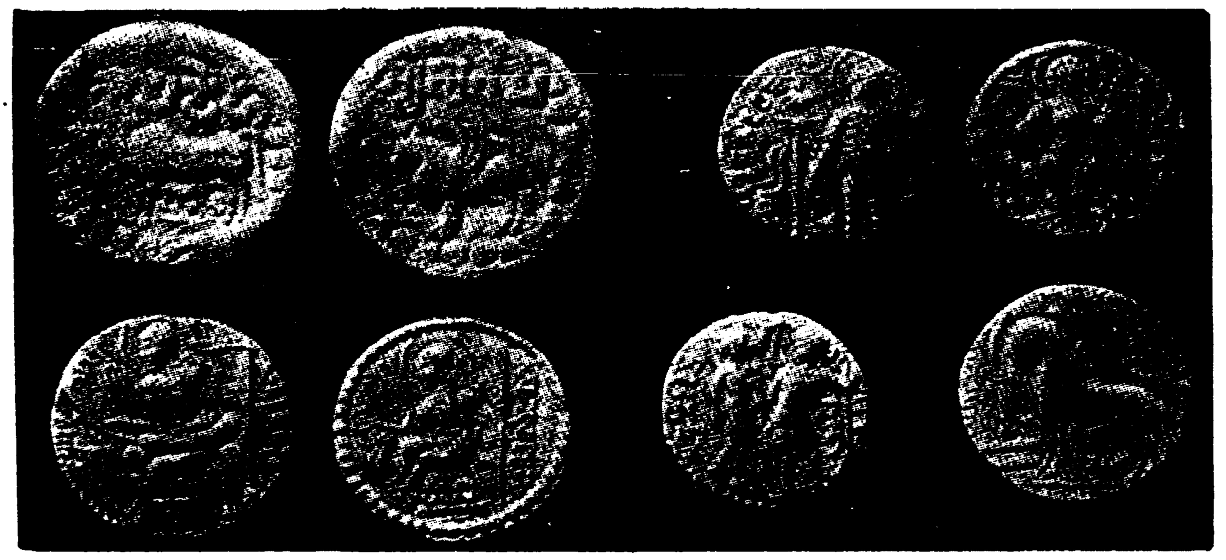
মাটীর তলায় পাওয়া প্রাচীন মুদ্রা

খোঁড়ার কাজ এক এক দেশে এক এক সময়ে হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত ও তুপুর ১টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত হয়ে থাকে।

যে স্থানে খোঁড়া হবে বলে ঠিক করা হয় সাধারণতঃ সে স্থান খুব বড়ই হয়ে থাকে এবং এক বছরে তার সমস্তটা খোঁড়া কখনই সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ সমস্ত স্থানটীর খোঁড়ার ওপরেই আজকাল বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয় না; একটী জায়গাতে কত বিভিন্ন যুগের সহর ও জিনিষ পাওয়া যেতে পারে সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে থাকে। একটী স্থানের খানিকটা বেশ ভাল করে ও গভীর ভাবে খুঁড়লে সেই সমস্ত জায়গাটীতে কেমন করে বিভিন্ন যুগের সহর ও জিনিষ পাওয়া যেতে পারে সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য থাকে। একটী

কলসী মিশ্রিত তিন ফুট আন্দাজ মাটী। সেই মাটীর নীচে আবার পাওয়া গেল পূব থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে এমন আর একটী দেওয়াল। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে পূব থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে যে দেওয়াল সেটা যে যুগে নির্ম্মিত হয়েছিল তার পরবর্ত্তী যুগে নির্ম্মিত হয়েছিল ওপরের দেওয়ালটী। এই রকম ভাবে এক এক জায়গাতে স্তরে স্তরে সাজান অনেক যুগের সভ্যতা পাওয়া যেতে পারে।

এখন তোমরা বলতে পার যে যে সব বাড়ী, মন্দির ইত্যাদি মাটীর তল থেকে খুঁড়ে বার করা হয় তার যুগ কি করে নির্ণীত হয়। যে কোন জায়গাতে খুঁড়লে দু'রকম জিনিষ পাওয়া যায়। যেমন কোন কোন জায়গাতে পঠিত লিপিযুক্ত অনুশাসন বা মুদ্রা পাওয়া যায় আবার কোন কোন জায়গাতে লিপিযুক্ত কোন জিনিষই পাওয়া যায় না। যেখানে লিপিযুক্ত অনুশাসন বা মুদ্রা পাওয়া যায় সেখানে ঐ সব অনুশাসন বা মুদ্রা খুব ভাল করে অধ্যয়ন করলে ঐ মুদ্রা বা লিপি কোন্ যুগের তা বুঝতে পারা যায়। সুতরাং এই সব লিপিযুক্ত অনুশাসন ও মুদ্রা থেকে এই সব বাড়ী কোন্ যুগের তা বুঝতে পারা যায়। যে সব জায়গাতে লিপিযুক্ত অনুশাসন বা মুদ্রা পাওয়া যায় না সেখানে বিভিন্ন স্তরের জিনিষ বিভিন্নভাবে সাজিয়ে যুগ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়। এ রকম ভাবে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের প্রাচীন ইতিহাস গঠন করবার চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে এবং তাতে সাফল্যও লাভ করা হয়েছে।

সমস্ত দিন কাজ করার পর সন্ধ্যাবেলায় বিভিন্ন জায়গার নায়কেরা একত্র হন এবং সমস্ত দিনের খোঁড়ার ব্যাপারটা একসঙ্গে আলোচনা করেন। এরূপ আলোচনার ফলে অনেক জিনিষ বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

দিনের পর দিন এইভাবে খোঁড়া হয় ও এইভাবে মাটীর ভেতর থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সা, মূর্ত্তি, গহনা প্রভৃতি পাওয়া যায় ও সেগুলির বিবরণ, নক্সা ও ফটো বিশদভাবে নেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের দেশে গরমকাল এলে আর খোঁড়ার কাজ চালান সম্ভব হয় না; তখন কাজ বছরকার মতন বন্ধ করে দিতে হয়। কাজ বন্ধ করে দেবার পরে কয়েক দিনের জন্য নায়করা এই খোঁড়ার কাহিনীর একটী খসড়া করে নেন। এটাকে ইংরেজীতে 'ফাইনাল্ নোট্‌স্' বলা হয়।

তার পর তাঁবু গুটিয়ে বছরকার মত সেখান থেকে চলে আসা হয় এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে এই খোঁড়ার কাহিনী অতি বিশদভাবে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ করে লেখা হয়। এটা তার পর বইয়ের বা প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত করা হয়। এক একটী জায়গা এত বড় থাকে যে বছরের পর বছর খোঁড়া হ'লে তবে সেই জায়গার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা হয়। যখন কোন জায়গার খোঁড়াব কাজ একেবারে শেষ হয়ে যায়, তখন সেই খোঁড়ার কাহিনী নিয়ে একটী প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করা হয়।

মানুষের সভ্যতা কত দিনের পুরোন তা এখনও ঠিক ভাবে জানা যায় নি; কিন্তু সেটা জানবার জন্যই মানুষ এই ধরিত্রীর বুকের তলে যে সব জিনিষ আছে তা পাওয়ার চেষ্টা করছে। এই রকমভাবে পৃথিবীর নানা স্থানে মাটীর তল থেকে পুরোন যুগের ঘর-বাড়ী, জিনিষপত্তর বার করা হচ্ছে ও তাই দিয়ে সে যুগের ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

একটি রাত

শ্রীমিহির রায়

সেই তখন থেকেই শব্দটা হচ্ছিল। বিশ্রী রকম একঘেয়ে একটা খস্ খস্ শব্দ। প্রথমে ইচ্ছে করেই কান দেই নি ওটাতে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠতে হ'ল। টর্চ্চটা পাশেই পড়ে ছিল, ওটাও নিলাম হাতে তুলে। ছম্‌ছমে রাত। তার ওপরে রাত হচ্ছে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে গ্রামের প্রান্তরে। সাবধান এখানে হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বাইরে ফুটফুটে হীরের মত উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। রাস্তার ওধারের পুকুরের জলে চাঁদ বেড়াচ্ছিল ভেসে। মাঝে মাঝে মাছের ল্যাজের ঝাপ্‌টায় জলগুলো চিক্ চিকিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। দূর দূরান্তরের গাছগুলো ছিল নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে।

আমার বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দটা থেমে গিয়েছিল। টর্চ্চের আলো ঘুরিয়ে এদিক্

ওদিক্ দেখবার বৃথা চেষ্টা কিছুক্ষণ করলাম। নাঃ, অত জ্যোৎস্নায়ও কিছু চোখে পড়ল না। টর্চ্চের ব্যাটারীও বুঝি ফুরিয়ে এসেছে।

সারাটা দিন শরীরের ওপর দিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম গিয়েছে। নূতন করে টর্চ্চে ব্যাটারী ভরে ঘুরে ফিরে ব্যাপারটা ভালো করে দেখবার উৎসাহ তখন আমার ছিল না, ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। ঘরে ফিরে এসে আবার পড়লাম শুয়ে।

গ্রামটাতে সবে মাত্র আমরা গত পরশু দিন এসেছি। সরকারী জরীপ বিভাগে কাজ করি। গ্রামের ওপর দিয়ে একটা পাকা রাস্তা যাবে মহকুমাতে। সেই সংক্রান্তে কলকাতা থেকে আমরা কয়েকজন এসেছি অপরিচিত এই গ্রামটাতে।

আমার অন্য সমস্ত সহকর্ম্মীরা তাঁবু খাটিয়ে নিজেদের বাসস্থান করে নিয়েছিলেন কর্ম্মস্থলেরই আশে পাশে। শুধুমাত্র আমিই এই অর্দ্ধ ভাঙ্গা ঘরটাতে আস্তানা গেড়েছি—যদিও এটাও কর্ম্মস্থলের খুব কাছেই বলতে হবে। এই ঘরটা ব্যবহার করা হয় এখানকার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পাঠশালা হিসাবে।

ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু তন্দ্রা আসছে – আবার যেন শুনতে পেলাম সেই একঘেয়ে শব্দটা। খস্-খস্-খস্। শব্দটার বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃই বাড়তে লাগল এবং শেষ পর্য্যন্ত আমার ঘুম একেবারেই গেল ভেঙ্গে।

জেগে গেলেও নিঃসাড়ে আমি ঘাপ্‌টি মেরে বিছানাতেই শুয়ে রইলাম। বাস্তবিকই চোর সে আসবে সে আমি বিশ্বাস করি না। কারণ চুরি করে সন্তুষ্ট হবার মত সম্পত্তি আমার ঘরে আদপেই নেই। স্যুটকেসের গহ্বর অর্দ্ধেক ফাঁপা, এবং বাকী অর্দ্ধেকের বেশীর ভাগ অংশই হচ্ছে সার্ভের খুঁটিনাটি যন্ত্র দিয়ে ভর্ত্তি। জামা-কাপড়ের সংখ্যাও অতি অল্প। চোরে চুরি করবে কি? অল্প পরিমাণে যে টাকা আমি সঙ্গে এখানে এনেছি সেও নিজের কাছে রাখি নি। তবে! নাঃ, ব্যাপারটা দেখতেই হচ্ছে।

দরজার হুড়্‌কো অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে ধীরে আলগা করে নিলাম। তবুও দরজার পাল্লা খুলবার সময় বাতাসের আকস্মিক ধাক্কায় ক্যাঁচ করে বিশ্রী রকম খানিকটা শব্দ হ'ল। নিঝুম আবহাওয়ায় শব্দটার প্রতিধ্বনি বেশ জোরেই হ'ল, আবার বাইরের শব্দটা গেল থেমে। কিন্তু না, একটু চুপ্ করতেই শব্দটা আরম্ভ হ'ল আবার।

চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কি অসীম নিস্তব্ধতা বাইরে! শির্‌শির্ করে ভিজে মিষ্টি বাতাস। স্বপ্নের মত অপরূপ লাগছিল বাইরের পৃথিবীকে।

পা টিপে টিপে আমি মাটীতে নামলাম। জ্যোৎস্নায় যাতে ছায়া না পড়ে সেই রকম ভাবে ঘরের পেছন দিকে এগোতে লাগলাম, শব্দটা তখনও সমান তালে আসছিল।

বিস্ময়ে আমি হতবাক্ হয়ে গেলাম। জ্যোৎস্না আবার পরিষ্কার ভাবে উঠেছে। দেখলাম একজন লোক—লোকটা যে নেপালী সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়—পরনে ঢলঢলে একটা পায়জামা, গায়ে কলার দেওয়া গেঞ্জী, একরাশ শুক্‌নো পাতা এক জায়গায় জড় করছে। রাশি রাশি শুক্‌নো ঝরা পাতা। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত না। নেশার মত এখান থেকে সেখান থেকে পাতার পর পাতা এনে লোকটা ফেলছে সেই সংগৃহীত পাতাগুলোর ওপরে। এত রাত্রে! ব্যাপার কি? লোকটা কি পাগল?

নিজের উপস্থিতি গোপন রেখে চিত্রার্পিতের মত আমি দাঁড়িয়ে আছি। লোকটির হাবভাব সন্দেহজনক, কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে কৌতূহলকর। আমাকে ঔৎসুক্য প্রবল ভাবে ঘিরে ধরল। ঘরটার সঙ্গে লেগে ওঠা আমগাছটার আড়ালে নিজেকে আমি নিশ্চিন্তেই লুকোলাম। এই গাছটির তলার প্রত্যেকটি পাতাই লোকটি নিয়েছিল কুড়িয়ে। সুতরাং ওর এদিকে আসবার সম্ভাবনা নেই-ই এক রকম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল কাজ ওর এবার ফুরিয়েছে। কিন্তু ও কি, ট্যাঁক থেকে ফস্ করে কি বার করছে ও! জ্যোৎস্নালোকে জিনিষটা এবার আমি স্পষ্টই দেখতে পেলাম। জিনিষটা হচ্ছে একটা দিয়াশলাই।

সর্ব্বনাশ! ঝরে-পড়া শুক্‌নো পাতা। জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি পড়লে কি রক্ষা থাকবে? মুহূর্ত্তে ধূ-ধূ করে ওগুলো জ্বলে উঠবে অজস্র লেলিহান শিখা নিয়ে। গ্রীষ্মের ঝিরঝিরে রাত্রি। ওই পাতার পাহাড়ে একবার আগুন ধরলে কি আর উপায় আছে! নিমেষে গ্রামের বুকে আগুন ছড়িয়ে পড়বে যে!

চোখের পলকে নেপালীটার ওপর লাফিয়ে পড়লাম। ওকে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে দেয়াশলাইটা নিলাম ছিনিয়ে। প্রবলভাবে ওকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—"ইয়ে ক্যা করতা? ক্যা নাম তোমহ্‌রা?"

অসম্ভাবিত ভাবে মানুষের অস্তিত্ব বিদিত হয়ে নেপালীটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। চোখটা ওর দেখলাম অস্বাভাবিক রকম জ্বলছে। তবু কোন রকমে বল্‌ল—'কুছ্ নেহি বাবু।"

"পাজি শয়তান!" আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। "মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পেলে না?" কথাগুলি বলবার মত হিন্দী বিদ্যা আমার ছিল না।

নেপালীটা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার ওপরে আমার এই সিংহনাদ। ও গেল থতমত খেয়ে। মুখ দিয়ে তার অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল—"মেরা লেড়কা—মেরা লেড়কা!"

জ্যোৎস্নার আলোতে লক্ষ্য করলাম নেপালীটার সেই উজ্জ্বল চোখ দু'টি অশ্রুতে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। কেমন মায়া হ'ল। বল্‌লাম, "কুছ্ ডর নেহি। ইধার আও।"

আমার ঘরটাতে নেপালীটাকে ডেকে নিয়ে এলাম। ব্যাপারটা রহস্যময়। দুটো কড়া ধমকেই কেঁদে আকুল হবার মত জাত তো নেপালীরা নয়! কিন্তু কোন কথাই ওর কাছ থেকে সে রাত্রে বার করতে পারলাম না। ও শুধু কেঁদেই চল্‌ল। সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লাম, "আজ এখানে শুয়ে থাক, কাল না হয় সব কথা শুন্‌ব।"

কিন্তু পরদিন আর ওকে দেখা গেল না। তবে রহস্যের উদ্ধার হ'ল। ব্যাপারটা আশে-পাশের গ্রামে প্রায় ইতিহাস হয়ে আছে। ঘটনাটা মর্ম্মান্তিক।

নেপালীটার ছেলে কাজ করত গুর্খা পল্টনে। ছেলে মাত্র ওর ওই একটিই। কি একটা কারণে পল্টনদের সেই দল এসেছিল এই মহকুমাতে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারের জন্যই বোধ হয় হবে। সেই পল্টনদের সঙ্গে এসেছিল এই নেপালীর ছেলে বাহাদুর সিং।

পল্টনের দল সাময়িক ভাবেই এখানে এসেছিল কিন্তু বাহাদুর সিংকে থেকে যেতে হয় চিরকালের জন্য। মিলিটারি লাইনে কোন্ এক অপরাধের জন্য বাহাদুর সিংকে কর্ত্তৃপক্ষ শাস্তি স্বরূপ সেদিন নির্জ্জন সেলএ আটক করে রেখে দিয়েছিলেন। পূরো চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু সেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বাহাদুর সিংএর জীবনে এল ধ্বংসের আহ্বান।

সে মাসটা ছিল চৈত্র। নিশ্চুপ গভীর রাত্রিতে সেলের মধ্যে বাহাদুর সিং বসেছিল আবদ্ধ অবস্থায়। সন্ধ্যা বেলাতে মাত্র সে শাস্তিভার গ্রহণ করেছে। আরো পূরো একটি দিন এই আবদ্ধ অবস্থায় কাটাতে হবে তাকে। কিন্তু এর মধ্যেই ও হাঁফিয়ে পড়েছে। অস্থির চিত্তে অতি ছোট ঘরটির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বাহাদুর সিং পায়চারী করতে লাগল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত অনেক কণ্ঠের সোরগোল শুনে বাহাদুর সিং দাঁড়াল। আওয়াজটা আসছিল তাদেরই আস্তানার দিক্ থেকে। কিছুক্ষণ কান পেতে থাকবার পর সোরগোলের কারণ সে অসহায় ভাবে বুঝতে পারল; আগুন লেগেছে।

চৈত্র মাসের গভীর রাত্রিতে লেগেছে আগুন। হু-হু করে আগুন হয়ে উঠল প্রখর। উজ্জ্বল হ'ল ওর শিখা। দিক্ বিদিক্ সীমারেখা না রেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্দ্দিকে পড়ল ব্যাপ্ত হয়ে। দুরন্ত ক্ষ্যাপার মত সমস্ত সৈনিক ব্যারাক ঘিরে ফেল্‌ল।

পাড়াগাঁয়ের অস্থায়ী আস্তানা। কোনও পাকা ব্যবস্থাই ছিল না। আর তা ছাড়া শৃঙ্খলা-জ্ঞানের পরিচয় দেবার মত বুদ্ধিই বা তখন কোথায়? বিশৃঙ্খল হাওয়ার মত যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। বাহাদুর সিংএর কথা স্মরণে আনবার মত সময়ের প্রাচুর্য্যও বোধ হয় তখন তাদের কারও ছিল না।

অগ্নির এই হোলি উৎসব অবশেষে থামল। ভোরের আবছা আলো তখন লাজুক মেয়ের মত প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে পৃথিবীতে। দেখা গেল, গ্রামের একটা অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত

হয়েছে। লোকালয়ের দিকে আগুন না যাওয়ায় আর কোন মানুষের প্রাণ এ অগ্নিকাণ্ডে আহুতি পড়ে নি, একমাত্র বাহাদুর সিং ছাড়া। নির্জ্জন সেল্‌এ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তার জীবন-মরণের সেই দ্বন্দ্বের কথা কল্পনা না করাই ভাল।

সেই থেকেই বাহাদুর সিংএর বাবা, এই বৃদ্ধ নেপালীর প্রকৃতি যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। সারা বছর সে কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, পুলিশ শত খোঁজেও তার হদিস পায় না। শুধু গ্রামের কাছাকাছি কোথাও তাঁবু পড়লেই হঠাৎ ও কোথা থেকে এসে হাজির হয়। বোধ হয় ভাবে, ওগুলি বুঝি সব তাদেরই তাঁবু যাদের হাতে ওর ছেলেকে ও ছেড়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর অশিক্ষিত অন্তরে প্রতিশোধের দুরন্ত বাসনা জেগে ওঠে।

এর পরে যে ক'দিন ঐ গ্রামে ছিলাম, নেপালীটিকে আর দেখি নি।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

ইউরোপের আলো—শ্রীঅমলশঙ্কর রায় প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা। মূল্য ১৲

ছোটদের উপযোগী ক'রে লেখা ইয়োরোপ ভ্রমণের কাহিনী। লেখক ইতিপূর্ব্বেই শিশু-সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন, রামধনুতেও তোমরা তাঁর অনেক লেখা পড়েছ। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে তিনি যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, এই বই-খানিতে তাই-ই তিনি ছোটদের পরিবেশন করেছেন। ইয়োরোপকে তিনি সাধারণ 'টুরিষ্ট' বা 'ভ্রমণ-বিলাসী'র চোখ নিয়ে দেখেন নি, বৈজ্ঞানিকের মত গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সে দেশের ভাল-মন্দ সব দিক্ জানবার চেষ্টা করেছেন। এই অন্তরঙ্গতা বইখানাকে আরও উপভোগ্য করেছে। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সরস, ছোটদের কাছে গল্প বলবার ক্ষমতাও তাঁর প্রচুর। আমাদের যত দূর জানা আছে, ছোটদের মত ক'রে লেখা ইয়োরোপের গল্প বাংলায় পুস্তকাকারে আর কেউ বার করেন নি। সে দিক্ দিয়েও বাংলা শিশুসাহিত্যে বইখানি একটি উল্লেখযোগ্য দান সন্দেহ নেই। পুরু এন্টিক কাগজে বড় বড় হরফে পরিষ্কার ছাপা, উপহারের উপযোগী সুন্দর রঙ্গিন বাঁধান মলাট। আমরা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বইখানা পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

টলস্টয়ের ছোটদের গল্প—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইউ. এন্. ধর এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ১৲

রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক ও মনীষী টলষ্টয়ের গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। তার থেকে ৮টী গল্প নিয়ে লেখক স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। তোমাদের প্রত্যেকেরই বইটা পড়ে দেখা উচিত।

মার্কিন জাতির কর্ম্মবীর—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক ইউ. এন্. ধর এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ১৲

যে সব মনীষী নানা দিক্ দিয়ে আমেরিকার নাম উজ্জ্বল করেছেন তাঁদেরই পুণ্য জীবন-কথা। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এ রকম একখানা বই-এর বিশেষ দরকার ছিল। লেখকের কাছে আমরা এই রকম আরও নানা দেশের মনীষীদের কাহিনী শুনতে চাই।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা আমাদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানবে। তোমাদের কাছ থেকেও বিজয়ার শুভেচ্ছাজ্ঞাপক অনেক চিঠি আমরা পেয়েছি। তার জবাব সবাইকে আলাদা করে দেওয়া সম্ভব নয়, রামধনুই সে ভার নিল। আশা করি পূজোর দিনগুলি তোমাদের ভাল ভাবেই কেটেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তোমাদের কাছ থেকে যে সব চিঠি পেয়েছি তার কিছুটা এই সঙ্গে উদ্ধৃত করা হ'ল। —রাঃ সঃ

(১)

"...আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর সংবাদ যেদিন পেলাম সেদিন জানলাম যে দেবতারা তা হ'লে সত্যি অমর নন। তাঁদেরও নশ্বর দেহ ত্যাগ করতে হয়। ছোট বেলা থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনে আসচি। তখন মনে করতাম সত্যিই বুঝি রামচন্দ্র, অর্জ্জুন এঁদের মতই রবীন্দ্রনাথ; তারপর যখন ক্রমে বড় হলাম (অর্থাৎ বোঝবার মত শক্তি হ'ল) আর তাঁর লেখা নানা রকম কবিতা পড়তে লাগলাম তখন মনে হ'ল যে রামচন্দ্র, অর্জ্জুনের থেকেও ইনি আমাদের আরও আপনার কবি দাদু। তখন আমি খুব ছোট, ১৯৩২ সাল। আমার দিদি (শান্তা) অভিমান জানিয়ে তাঁর সই পাবার জন্য একটী চিঠি দেয়। সকলেই ভেবেছিলাম যে তিনি চিঠির উত্তর দেবেন না।

কিন্তু তার কিছুদিন পরে সকলের ভুল তিনি ভেঙ্গে দিয়ে দিদিকে ৪ লাইন আশীর্ব্বাদ পাঠান। সেই কবিতাটার :—

"শান্তা, তুমি শান্তিনাশের ভয় দেখালে মোরে
সই করা নাম করবে আদায় ঝগড়া করার জোরে।
এই তো দেখি বঁটা হাতে শিউলীতলায় যাওয়া
আপনি যে ফুল ছড়িয়ে দিল শরৎপ্রাতের হাওয়া।"

তার পর এই কবিতাটা প্রবাসী কাগজেও ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে তার অনেক আগে ও চার লাইন ছাপা হয়ে গেছে। কবি দাদুর কথা আমরা কোন দিনও ভুলতে পারব না। তিনি অমর, তিনি দেবতা, তাঁর নিজের ভাষায় রোজ তাঁর পায়ে প্রণাম জানিয়ে বলব :—

"তোমার শূন্যতা তুমি
পরিপূর্ণ করেছ আপনি।"

—কুমারী রিণা রায়

(২)

সেদিন ছিল ৭ই আগষ্ট। অমৃতবাজারে বিশ্বকবির স্বাস্থ্য দেখলাম বড়ই উদ্বেগপূর্ণ; তাই ভারী মনে স্কুলে গেলাম। বারটার পর থেকে আকাশ কালো করে মেঘ এল। মেঘটাতে থেমে থেমে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। স্কুলের পূর্ব্বদিকে নদী, আর নদীর ওপারে কালো মেঘ,—গুড়্ গুড়্ শব্দ করছে আর মনের মধ্যে কি রকম যেন একটা খারাপ বোধ করতে লাগলাম।

টিফিনের ছুট হ'তে মাত্র ৭ মিনিট, হঠাৎ স্কুলে একটা হট্টগোল পড়ে গেল; ওধার থেকে ছুটে এসে একটা লোক খবর দিলে রবীন্দ্রনাথ "ডেড্"—আমার মনের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল; সেই দিনই লাইব্রেরী থেকে তাঁর দু'টো বই নিয়েছিলাম।...

স্কুল ছুটিতে আনন্দ মোটেই হ'ল না। মেঘ গুড়্ গুড়্ ডেকে বেশ জমে গেছিলো; এই দিনেই মনে পড়ল তাঁর লেখা "পোষ্ট মাষ্টার"— পোষ্ট মাষ্টার উলাপুরের চালাঘরের কোণে বর্ষা-বাদল দিনে বসে কি ভাব্‌ত!...

যখন ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এলাম তখন শ্রাবণের গম্ভীর মেঘভারাক্রান্ত আকাশের পানে মাত্র একবার চেয়েছিলাম; কেন চেয়েছিলাম জানি না। কিন্তু তার পর আর চাই নি। দম্‌কা বাতাসে বর্ষার জল এসে গায়ে লাগল— ক্ষণিকের আরাম, তার পর আবার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। এই অন্ধকার যুগের অন্ধকার, এই অন্ধকার দূর করতে চাই উজ্জ্বল আলো—সে আলো বোধ হয় এখন আসবে না। ১৪ই আগষ্ট ১৯৪১ সাল। —শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

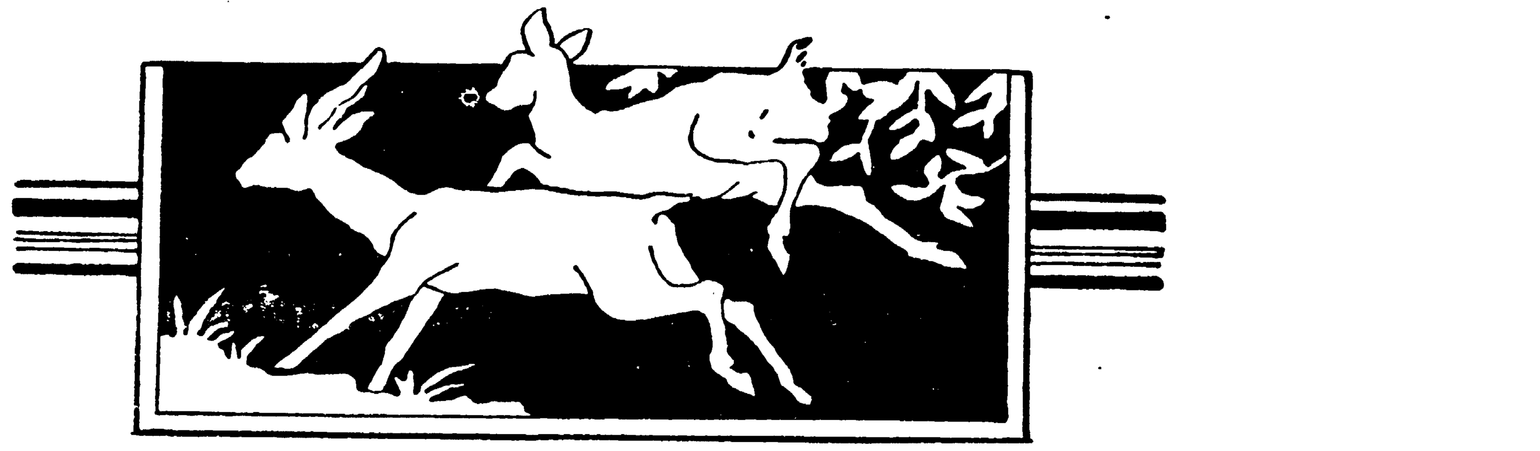

রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক ও মনীষী টলষ্টয়ের গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। তার থেকে ৮টী গল্প নিয়ে লেখক স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। তোমাদের প্রত্যেকেরই বইটা পড়ে দেখা উচিত।

মার্কিন জাতির কর্ম্মবীর—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক ইউ. এন্. ধর এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ১৲

যে সব মনীষী নানা দিক্ দিয়ে আমেরিকার নাম উজ্জ্বল করেছেন তাঁদেরই পুণ্য জীবন-কথা। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এ রকম একখানা বই-এর বিশেষ দরকার ছিল। লেখকের কাছে আমরা এই রকম আরও নানা দেশের মনীষীদের কাহিনী শুনতে চাই।

রামধনুর পাঠক-পাঠিকারা আমাদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানবে। তোমাদের কাছ থেকেও বিজয়ার শুভেচ্ছাজ্ঞাপক অনেক চিঠি আমরা পেয়েছি। তার জবাব সবাইকে আলাদা করে দেওয়া সম্ভব নয়, রামধনুই সে ভার নিল। আশা করি পূজোর দিনগুলি তোমাদের ভাল ভাবেই কেটেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তোমাদের কাছ থেকে যে সব চিঠি পেয়েছি তার কিছুটা এই সঙ্গে উদ্ধৃত করা হ'ল। —রাঃ সঃ

(১)

"...আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর সংবাদ যেদিন পেলাম সেদিন জানলাম যে দেবতারা তা হ'লে সত্যি অমর নন। তাঁদেরও নশ্বর দেহ ত্যাগ করতে হয়। ছোট বেলা থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনে আসচি। তখন মনে করতাম সত্যিই বুঝি রামচন্দ্র, অর্জ্জুন এঁদের মতই রবীন্দ্রনাথ ; তারপর যখন ক্রমে বড় হলাম (অর্থাৎ বোঝবার মত শক্তি হ'ল) আর তাঁর লেখা নানা রকম কবিতা পড়তে লাগলাম তখন মনে হ'ল যে রামচন্দ্র, অর্জ্জুনের থেকেও ইনি আমাদের আরও আপনার কবি দাদু। তখন আমি খুব ছোট, ১৯৩২ সাল। আমার দিদি (শান্তা) অভিমান জানিয়ে তাঁর সই পাবার জন্য একটী চিঠি দেয়। সকলেই ভেবেছিলাম যে তিনি চিঠির উত্তর দেবেন না।

কিন্তু তার কিছুদিন পরে সকলের ভুল তিনি ভেঙ্গে দিয়ে দিদিকে ৪ লাইন আশীর্ব্বাদ পাঠান। সেই কবিতাটার :—

"শান্তা, তুমি শান্তিনাশের ভয় দেখালে মোরে
সই করা নাম করবে আদায় ঝগড়া করার জোরে।
এই তো দেখি বঁটী হাতে শিউলীতলায় যাওয়া
আপনি যে ফুল ছড়িয়ে দিল শরৎপ্রাতের হাওয়া।"

তার পর এই কবিতাটা প্রবাসী কাগজেও ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে তার অনেক আগে ও চার লাইন ছাপা হয়ে গেছে। কবি দাদুর কথা আমরা কোন দিনও ভুলতে পারব না। তিনি অমর, তিনি দেবতা, তাঁর নিজের ভাষায় রোজ তাঁর পায়ে প্রণাম জানিয়ে বলব :—

"তোমার শূন্যতা তুমি
পরিপূর্ণ করেছ আপনি।"

—কুমারী রিণা রায়

(২)

সেদিন ছিল ৭ই আগষ্ট। অমৃতবাজারে বিশ্বকবির স্বাস্থ্য দেখলাম বড়ই উদ্বেগপূর্ণ ; তাই ভারী মনে স্কুলে গেলাম। বারটার পর থেকে আকাশ কালো করে মেঘ এল। মেঘটাতে থেমে থেমে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। স্কুলের পূর্ব্বদিকে নদী, আর নদীর ওপারে কালো মেঘ,—গুড়্ গুড়্ শব্দ করছে আর মনের মধ্যে কি রকম যেন একটা খারাপ বোধ করতে লাগলাম।

টিফিনের ছুট হ'তে মাত্র ৭ মিনিট, হঠাৎ স্কুলে একটা হট্টগোল পড়ে গেল ; ওধার থেকে ছুটে এসে একটা লোক খবর দিলে রবীন্দ্রনাথ "ডেড্"—আমার মনের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল ; সেই দিনই লাইব্রেরী থেকে তাঁর দু'টো বই নিয়েছিলাম।...

স্কুল ছুটিতে আনন্দ মোটেই হ'ল না। মেঘ গুড়্ গুড়্ ডেকে বেশ জমে গেছিলো ; এই দিনেই মনে পড়ল তাঁর লেখা "পোষ্ট মাষ্টার"— পোষ্ট মাষ্টার উলাপুরের চালাঘরের কোণে বর্ষা-বাদল দিনে বসে কি ভাবত।...

যখন ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এলাম তখন শ্রাবণের গম্ভীর মেঘভারাক্রান্ত আকাশের পানে মাত্র একবার চেয়েছিলাম ; কেন চেয়েছিলাম জানি না। কিন্তু তার পর আর চাই নি। দমকা বাতাসে বর্ষার জল এসে গায়ে লাগল— ক্ষণিকের আরাম, তার পর আবার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। এই অন্ধকার যুগের অন্ধকার, এই অন্ধকার দূর করতে চাই উজ্জ্বল আলো—সে আলো বোধ হয় এখন আসবে না। ১৪ই আগষ্ট ১৯৪১ সাল।

—শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

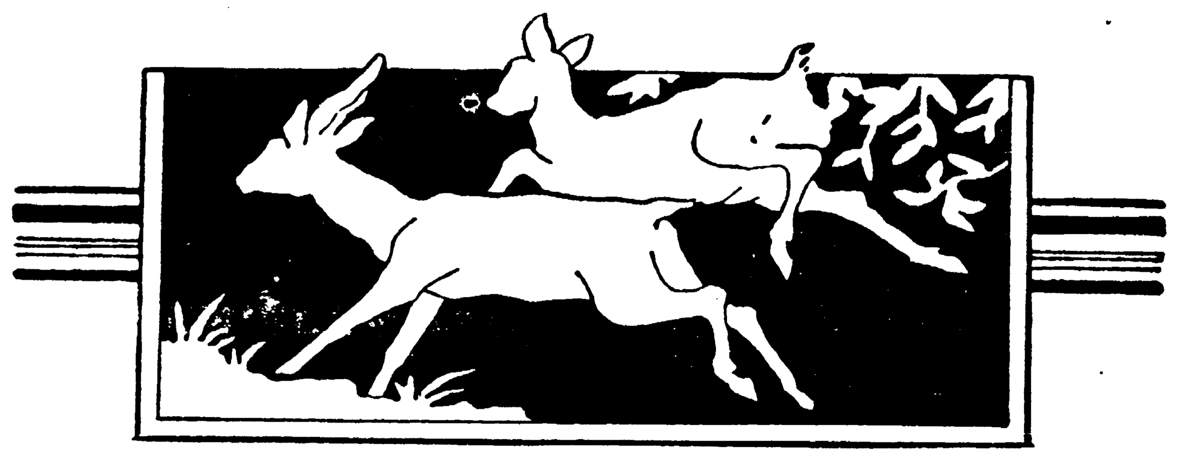

Correction

যুদ্ধের খবর ইতিমধ্যে অনেক দূর গড়িয়েছে তা বোধ হয় শুনেছ। জার্ম্মেনী এখন তার প্রায় সমস্ত শক্তি একত্র করে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সহরের উপর অভিযান চালিয়েছে। শীতের আগেই তারা একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায়। আজ, ২১শে অক্টোবরের, খবর—মস্কো সহরে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মস্কো থেকে রাজধানী সরিয়ে ৫৫০ মাইল দূরে কুয্‌বিশেভ সহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইউক্রেন অঞ্চলেও প্রতিপক্ষ কয়েকটা উল্লেখযোগ্য সহর দখল করেছে। রাশিয়ানরা জীবন পণ দিয়ে বাধা দিচ্ছে এবং অনেক ঘাঁটী পুনরুদ্ধারও করছে। লোকক্ষয় যে কি ভীষণ রকম হচ্ছে তার হিসাব দেওয়াও কষ্টকর।

এদিকে জাপানের মতিগতি দেখে সুদূর প্রাচ্যেও একটা ঝড়ের পূর্ব্বাভাস অনেকে অনুমান করছেন। সম্প্রতি সেখানে কনোয়ে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেছেন। জেনারেল টেযোকে প্রধান মন্ত্রী করে যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে তাঁরা যুদ্ধেরই বেশী পক্ষপাতী বলে অনেকের ধারণা। আমেরিকাও এ জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

* * *

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের নাম কে না জানে? যে সব মনীষী নানা দিক্ দিয়ে ভারতকে বিদেশের চোখে বড় করে তুলেছেন ইনি তাঁদের একজন। ভারতীয় চিত্রশিল্পে যে নিজস্ব নতুন ধারার প্রবর্ত্তন ইনি করেছেন তার জন্য এঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ শুধু বড় চিত্রকরই ন'ন—বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ ছোটদের সাহিত্যে, তাঁর দান বড় কম নয়। সম্প্রতি সত্তর বছর বয়সে সমারোহের সঙ্গে এঁর জয়ন্তী-অনুষ্ঠান হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ পদ খালি হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথই এই পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

* * *

তোমরা বায়স্কোপে "গুড্‌বাই মিষ্টার চিপ্‌স্" নামে বইটা দেখে থাকবে। ইংলণ্ডের একটি পাব্‌লিক্ স্কুলের জীবনযাত্রা নিয়ে এ বইটি রচিত। রেপটনের বিখ্যাত পাব্‌লিক্ স্কুলে এর অনেক দৃশ্য তোলা হয়েছিল, স্কুলের কয়েকটি ছেলেও ছাত্র-জনতার অংশ নিয়েছিল। এই বইটি তুলতে ছাত্রদের জন্য যে সব জামা-কাপড় তৈরী করা হয়েছিল সম্প্রতি সেগুলি ল্যামবেথ মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র সেখানকার গরীব ছেলেদের উপহার দিয়েছেন। এই সব ছেলেদের ঘর-বাড়ী, জামা-কাপড় সবই বিমান আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) বংশ (২) বেশ, স্বামী (৩) গাল (৪) ডাক (৫) খোলা (৬) দণ্ড।

উত্তরদাতাদের নাম (আশ্বিন)

চণ্ডী, জবা, কুন্দ, ছন্দ (দানাপুর); অরুণা মজুমদার (সেন) ও শিশির রায় (কলিকাতা); রণজিৎকুমার বসু (ধুবড়ী); মঞ্জিলকুমার সেন (বহরমপুর); রমেশচন্দ্র, চুনী, কানু ও লহর পট্টনায়ক (সেনগুপ্ত) প্রভৃতি (রামচন্দ্রপুর); ছায়া ও নিমু সেন (মূলঘর); শীলা, অশোক, অমিয়, প্রভাত (ভবানীপুর); মণিরাম, মোহনলাল আগরওয়ালা (সুজানগর—পাবনা); শিপ্রা সেন (নিউদিল্লী); কুশল বসু (এলাহাবাদ); রেবা রায় (বালীগঞ্জ); চম্পাবতী দেবী (লক্ষ্ণৌ); রাবেয়া খাতুন (ঢাকা); ননীগোপাল ও উমা (লাহোর); অর্চ্চনা দেবী, গীতাগায়ত্রী, উমা ও শচীন ভট্টাচার্য্য (নীলফামারী)।

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন :—

শান্তি, ভঁদু, গণেশ, জেম্‌স প্রভৃতি (গয়া); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা); কালিদাস পাল (বালুভরা); মাধুরী ঘোষ ও অণিমা ঘোষ (কলিকাতা); ছায়া, নিমু সেন (মূলঘর); বাণী, কিকি, মেজকাকা, খোকা প্রভৃতি (চাইবাসা); ছবি রায় (নিউ দিল্লী); শীলা, অশোক, অমিয়, অমিতাভ প্রভৃতি (ভবানীপুর); চণ্ডী, হীরু, ধুন্দুল, ধামাপচু (ভিরিঙ্গী); প্রবীর, সোমনাথ, অসীম, বিশ্বজিৎ প্রভৃতি (কলিকাতা); জ্ঞানময় মজুমদার, পতু, শম্ভু (কাঁথি); নদীয়ারচাঁদ মণ্ডল (মেদিনীপুর); শোভনা দেবী (মধুবনী); রমেশচন্দ্র, রণেন্দ্র, রবীন্দ্র, রথীন্দ্র প্রভৃতি (রামচন্দ্রপুর); হাসি, লিলি, গোরা (ডালটনগঞ্জ); অঞ্জলি, ছন্দামিত্রা, বাচ্চু, অসীম (কলিকাতা); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা)।

যাঁদের উত্তর আংশিক শুদ্ধ হয়েছে :—

চন্দ্রশেখরপ্রসাদ দে ও বীণাপাণি দে (জামালপুর); সুবীর ও সুজিত রায় (শ্রীহট্ট); সোনু, মনু, মোহন, খুসী (কলিকাতা); দেবদাস মুখার্জ্জি (ভবানীপুর); পূর্ণিমা রায় (বারাকপুর); সুধাময়, প্রণব, কৃষ্ণবরণ (বাণীমন্দির—মুড়াগাছা); বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া);

সুপ্রভা ও মাণিকা সেনগুপ্তা (বালীগঞ্জ) ; কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল) ; বিমল, সুপ্রকাশ ও মণিরাম (সুজানগর—পাবনা) ; সুশীলচন্দ্র নিয়োগী (আদমদীঘি) ; নিগমকুমার, মা, টুটু, সেজকাকীমা প্রভৃতি (গয়া) ; সৌরীন্দ্র, নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, সমরেন্দ্র প্রভৃতি (নিমপুরা) ; লক্ষণচন্দ্র সাধু খাঁ (গাঙ্গুলিয়া) ; মঞ্জিলকুমার সেন (বহরমপুর) ; বাবু, গৌরী, রণজিৎকুমার বসু (ধুবড়ী) ; অমরনাথ, অসিত, অজয়, সবিতা (বহিরগাছি—নদীয়া) ; নবেন্দু সেন (বালীগঞ্জ) ; রিণা রায় (টালীগঞ্জ) ; তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (রাণাঘাট) ; নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, বিভূতি, দুলু, নন্দ প্রভৃতি (পাটনা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীমণিরাম আগরওয়ালা

নীচের প্রতিটী লাইনে দু'টো ক'রে শূন্য স্থান দেখ্‌তে পাচ্ছ। ঐ স্থানে দু'টী ক'রে কথা বসাতে হবে। প্রতি লাইনের প্রথম কথাটীতে কোন আকার ইকারদি যোগ হবে না,—যেমন জল, ছল প্রভৃতি। প্রথম কথার দু'টো অক্ষরেই আকার লাগালে দ্বিতীয় কথাটী পাবে। যেমন,—জালা, ছালা ইত্যাদি।

১। তুমিই — সে কেন তোমার — পরিবে ?
২। — এর জলে এখানে যে — হইয়া গেল !
৩। এক — মাল — তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।
৪। তাহার — — জগতে বিরল।
৫। সে — দিন পরে কলি— হইতে আসিল ?
৬। — না দিলে যে — য় যাইতে হইবে।
৭। সম্মুখ — করিতে — পশ্চাৎপদ হন না।
৮। — দিয়া কাজ করিতে কে — করিয়াছে ?
৯। এর — ও — তোমার সাধ্য নয়।

(সবগুলির উত্তর পাঠাতে হবে।)

বাহির হইয়াছে

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি

গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেকটিভ্

হুকা-কাশির

বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

আজই একখানি কিনিতে ভুলিও না।

সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট

দাম মাত্র আট আনা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—॥/০

ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান :—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C-1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

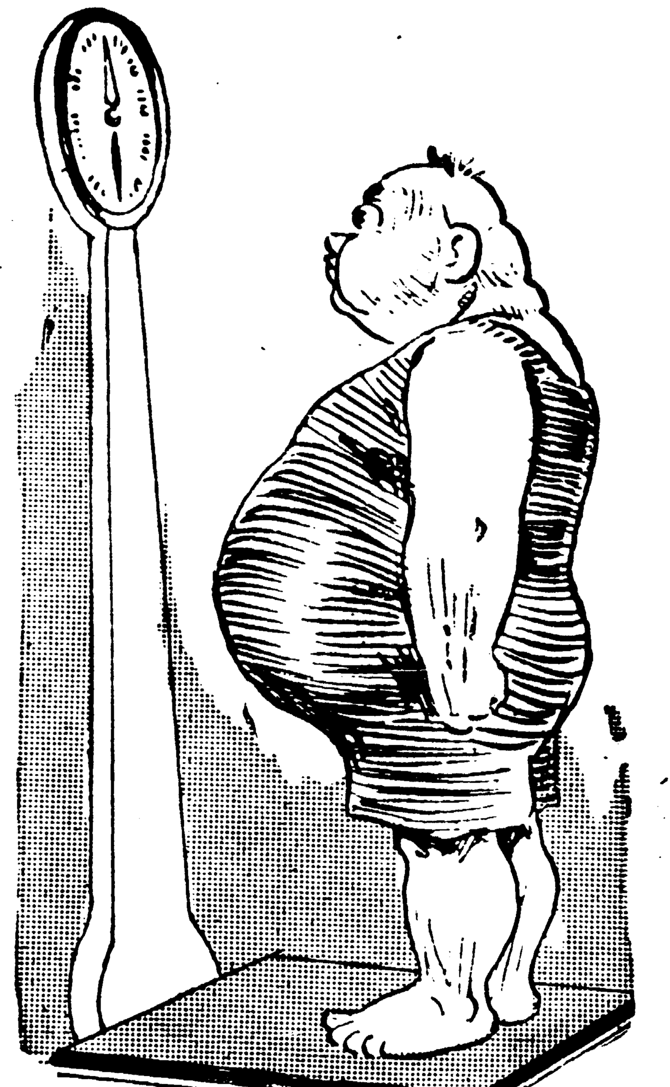

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
ফোন: কলি: ৩৬৬০

Cover: C. H. Aran & Co.

১৪শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ একাদশ সংখ্যা

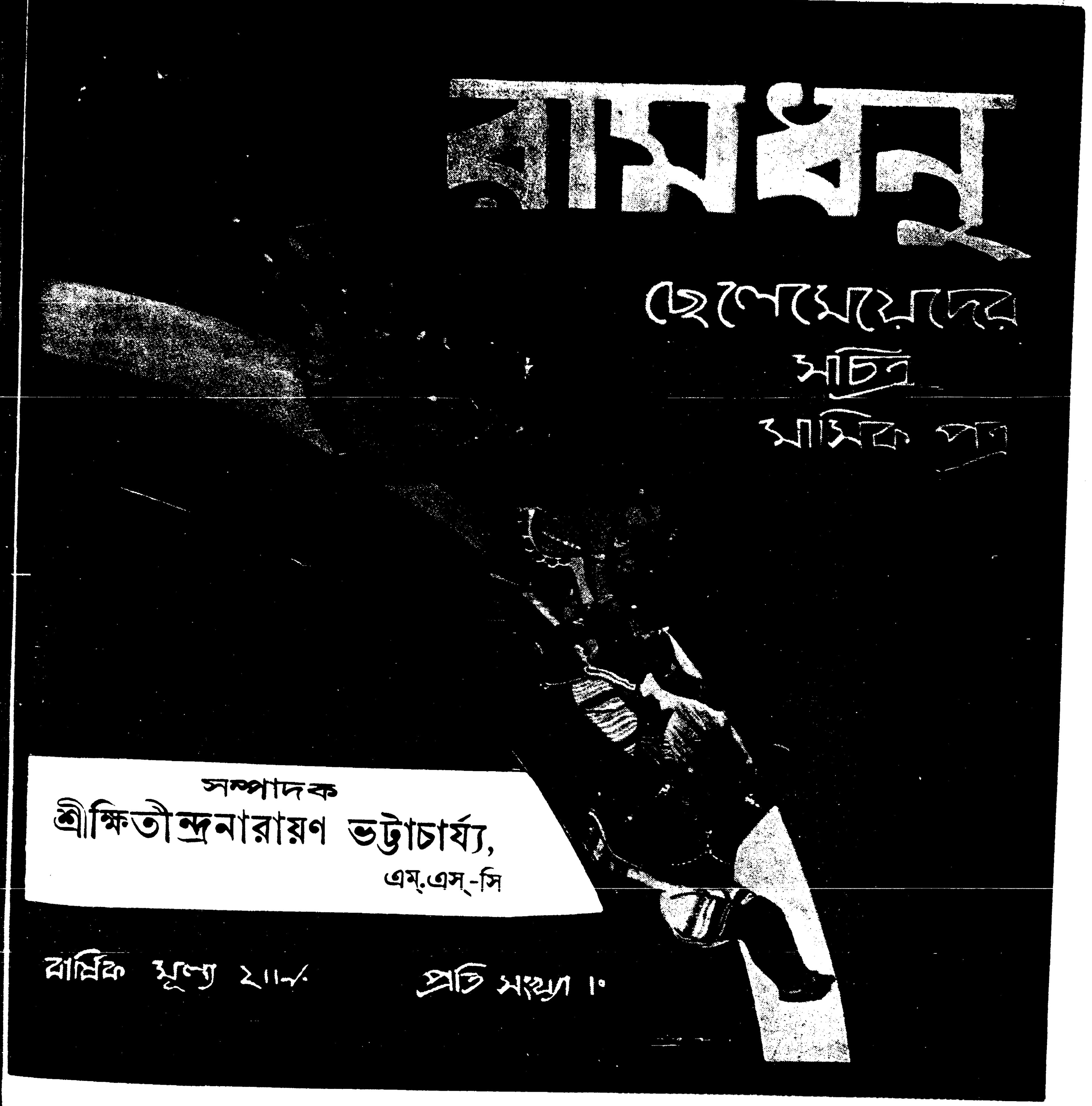

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C-1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

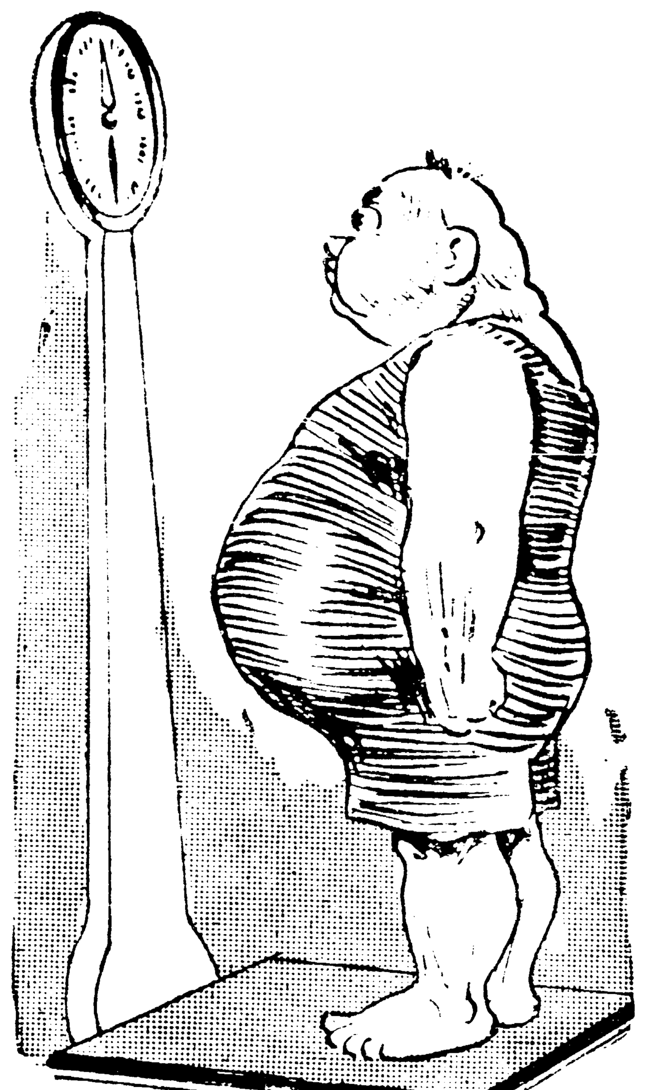

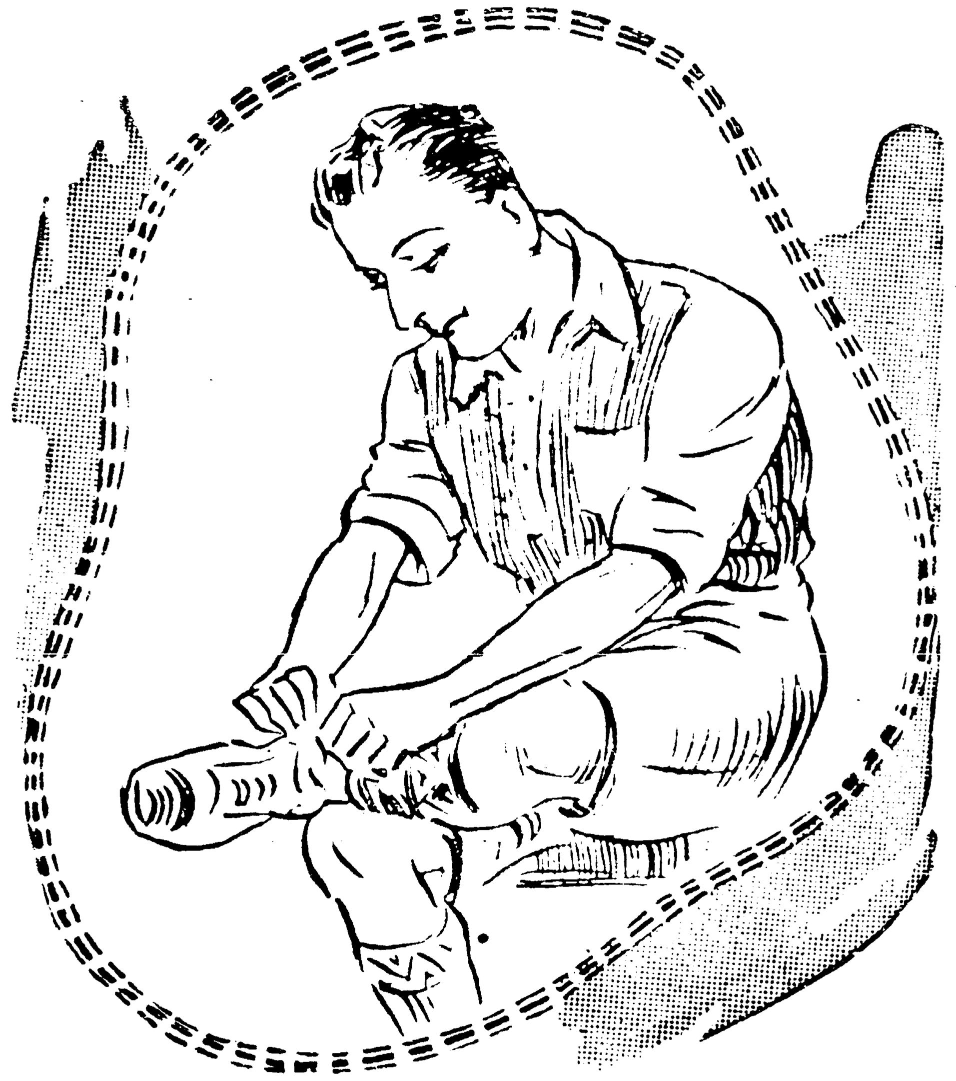

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover: C. H. Aran & Co.

১৪শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ | একাদশ সংখ্যা

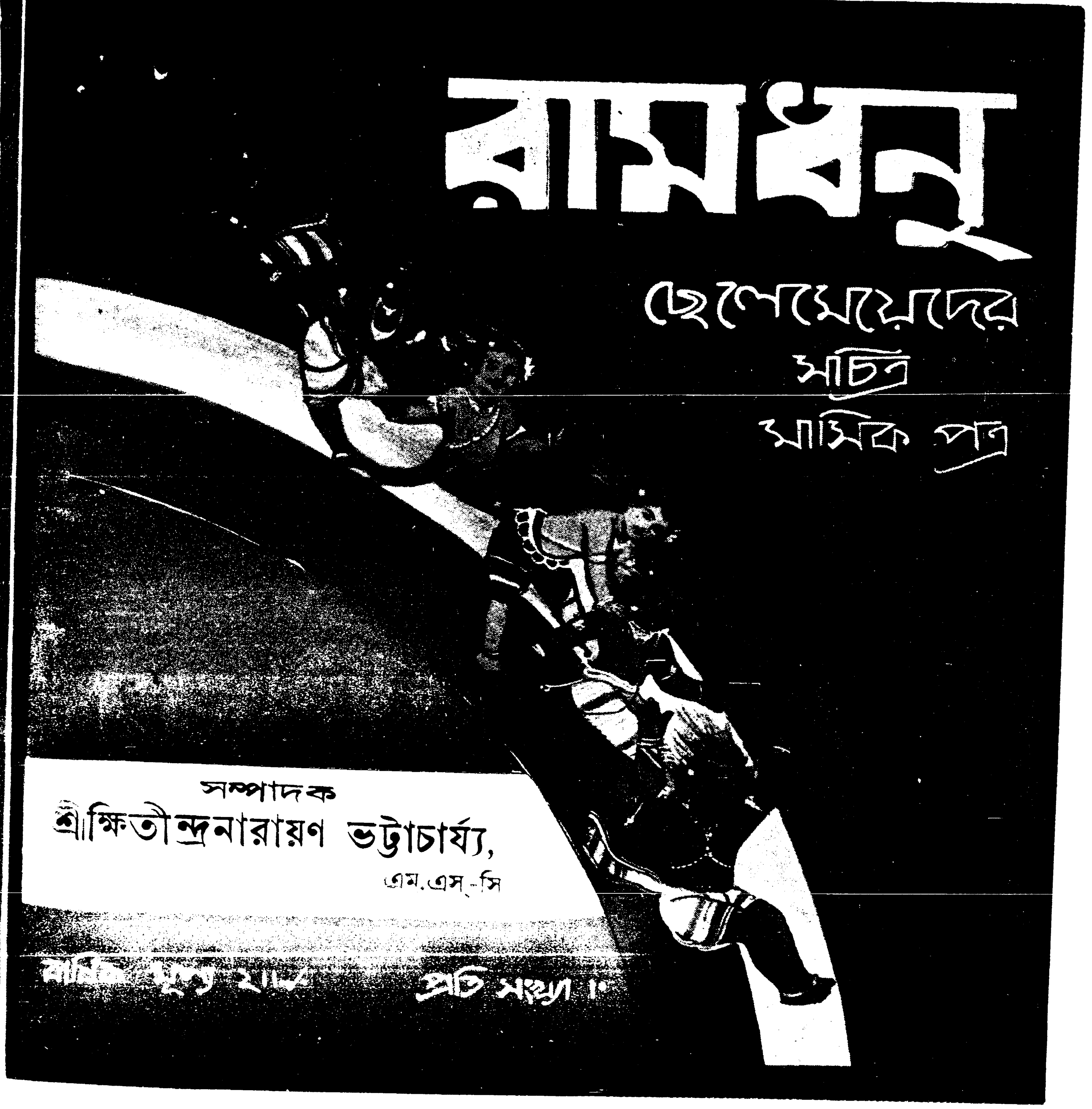

কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না. এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

দেশপ্রিয় লাইব্রেরী
১৯৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। গল্পে চিত্তরঞ্জন—(জীবনী)
মূল্য—॥০ আনা
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

২। সিরাজদ্দৌলা—(নাটক)
মূল্য—।৵০ আনা
প্রবোধ সরকার

৩। ভারত-বীর—(নাটক)
মূল্য—।৵০ আনা—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মাইতি

৪। হিট্‌লারের শত্রু—
(যুদ্ধ-উপন্যাস)
মূল্য—১৲ টাকা
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

৫। কুয়ো ভেডিস্—
(অনুবাদ উপন্যাস)
মূল্য—॥০ আনা
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত
আলেকজান্দার ডুমার অমর লেখনী প্রসূত
দি ম্যান ইন্ দি আয়রণ্ মাস্ক-এর অনুবাদ
শীঘ্রই বাহির হইতেছে।

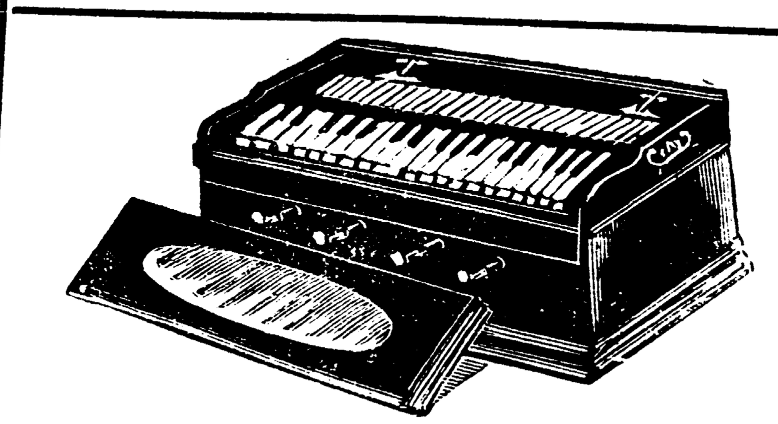

সুর সাধনায় অরগ্যান কোংর
হারমোনিয়মই
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে
আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।
অরগ্যান কোং
৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

একখানি চাই-ই
শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত
বদ্যিনাথের বড়ি
অজস্র ছবি অজস্র হাসি
অজস্র মজা
দাম আট আনা

মৌচাক বলেন :—
"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

=কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ=

(রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্‌ শিশু উপন্যাস)

প্রতি মাসেই বাহির হইতেছে— :: —প্রত্যেকখানি আট আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। **অন্ধকারের বন্ধু**

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২। **ছিন্নমস্তার মন্দির**

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। **তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক**

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। **বিজয় অভিযান**

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর
৫। **ছায়া কালো-কালো**

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
৬। **রাত্রির যাত্রী**

শিশু-সাহিত্যে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম দান

৭। হারাণো বই

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

৮। জীবন্ত সমাধি

—আমাদের প্রকাশিত এ বৎসরের নূতন বই—

শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী, এম্.এ প্রণীত
স্বর্গে থিয়েটার (পৌরাণিক গল্প) ॥৵০

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প (ভূতুড়ে গল্পসঞ্চয়ন) ১।০

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
দেড়শো খোকার কাণ্ড (শিশু-উপন্যাস) ১৲

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (কৌতুক কথা) ৸০

শ্রীযুক্ত নিখিলেশ সেনের
রোমাঞ্চকর কাহিনী (ছোট গল্প) ॥০

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়ের
ছেলেধরা সার্কাস (শিশু উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
দানবীর কার্নেগী (জীবনী) ॥০

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের
প্রতাপসিংহ (ছেলেদের নাটক) ॥০

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর
আকাশগঙ্গা (ভ্রমণ কথা) ৸০

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
তাতারের বন্দী (বৈদেশিক গল্প) ৸০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
বিষের তীর (শিশু উপন্যাস) ॥০
নিশির ডাক (শিশু উপন্যাস) ৸০

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের
বোম্বেটে-দ্বীপ (শিশু উপন্যাস) ৸০
সোনার পাখী (ছোট গল্প) ।৵০

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর
ঋষি অরবিন্দ (জীবনী) ॥০

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের
হারানো দিন (শিশু উপন্যাস) ১৲

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ডোঙ্গরের বালামৃত

ব্যবহার করিয়া

দুর্ব্বল শিশুরা

অল্পদিনের মধ্যেই

পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়।

=ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক আবিষ্কার যাত্রীর বিস্ময়কর কাহিনী। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা ও ৪১ খানি চিত্র সম্বলিত। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। সর্ব্বত্র প্রশংসিত মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর—(Heroes of Bengal) ১।০

বাংলার বীরাঙ্গনা—(Heroines of Bengal) মূল্য—৮০

মেবার কাহিনী—(Tales of Mewar) ১৲

শিখের কথা—(History of the Sikhs) মূল্য—১৵০

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) শিশিরকুমার রাহা প্রণীত। মূল্য—৮০

বাংলার নবরত্ন— (Nine Gems of Bengal) অমরেন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য—৷৷৵০

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের

কাশ্মীরের কথা— ৮০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

নূতন বই **সম্পূর্ণ নূতন প্রকরণের বই**

সময়োপযোগী বহুবাঞ্ছিত ব্যবহারিক বই!

দেশের ভাবী আশার স্থল—ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে

শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী সাহিত্য সরস্বতী

তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ পরিকল্পনায় লিখেছেন—

ছেলেদের টিফিন

কি খাব মা, কি খাব মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, বাসি ভাত খাও যাদু, ঐ ঢাকা রয়েছে!

কালের গতিতে ছেলেদের ক্ষুধার খোরাক দিতে আজ আর বাসি ভাতের কথাও উঠে না, এখন সেখানে এসেছে দোকানের বাসি খাবার, পচা ডিমের তৈরী কেক বিস্কুট ইত্যাদি। ছেলেদের হাতেই টিফিনের ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমরা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর দিনে-ডাকাতির সুযোগ দিয়েছি। এরই প্রতিকারকল্পে প্রাণশক্তিসম্পন্ন বহু বহু রুচিকর খাদ্য দেশীয় প্রথায় কত সহজে ও সুবিধায় বাড়ীতে তৈরী করা যায়, লেখিকা **তাদের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় ও প্রস্তুতপ্রণালী** এই গ্রন্থে প্রকাশ ক'রে ছেলেদের—তথা আমাদেরও সাংসারিক জলযোগের খাদ্যধারার গতির মোড় ফিরিয়ে একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছেন।

দু'শো পাতার বই। চমৎকার ছাপা ও বাঁধাই। দাম—১৲

প্রত্যেক গৃহস্থের ইহা রাখা এবং প্রত্যেক মায়ের পড়া উচিত।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—বি, বি, ৩৮৭৫

— আমাদের ছেলেমেয়েদের নূতন বই —

নগেন্দ্রনাথ দত্তের **কুমড়োপটাস**
তোমাদের পরিচিত জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাহিনী নিয়ে লেখা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ
বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথায় ভরা।

ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়ের
রাতের বিভীষিকা
রাতে যারা ভয় দেখায়—তাদের কথায় ভরা।

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর
হরেক রকম
বইখানা শিশুচিত্তের খোরাকে ভরপুর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের **বিজ্ঞানের অ, আ**
বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলি গল্পের ছাঁচে লেখা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রর
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন?
সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই।

কালিদাস রায়ের **জাতকমালিকা**
গৌতমের গতজন্মের কথা।

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর **দুর্গমপথের যাত্রী**
আবিষ্কার ও ভৌগোলিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
যা সকলে চায়
ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

এ, এন, ব্যানার্জ্জি

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক। আর, এন, দাস রোড, ঢাকুরিয়া দক্ষিণ কলিকাতা।

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

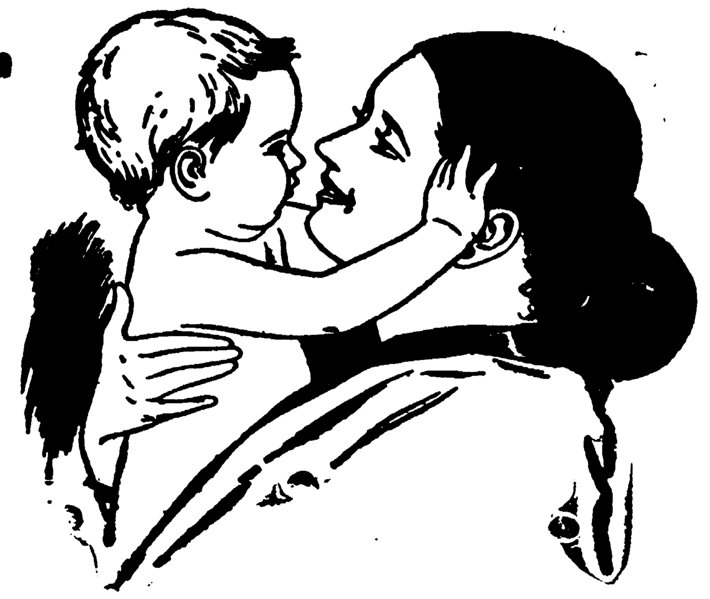

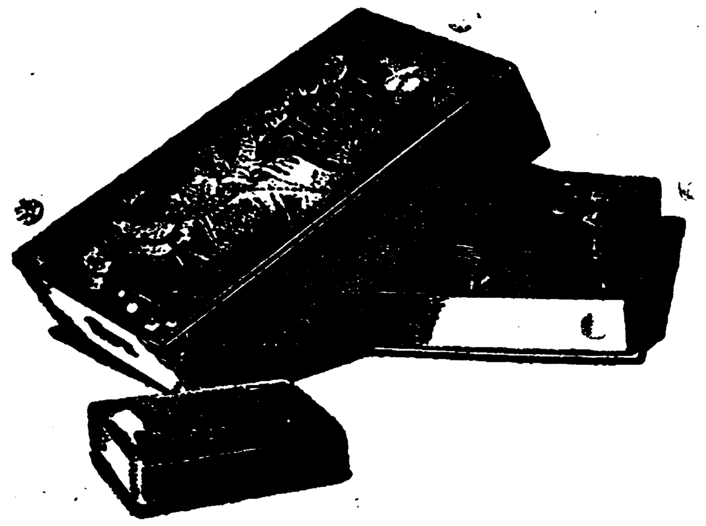

* প্রচুর ফেন
* স্নেহময় স্পর্শ
* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

ছোটদের উপযোগী ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী

অমলশঙ্কর রায়ের

ইউরোপের আলো

—বাংলায় ছোটদের জন্য লেখা এ ধরণের বই বোধ হয় এই-ই প্রথম—

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে লেখক যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারই কাহিনী সরস, গল্পের মত ভাষায় লেখা। পড়বার—জানবার—উপভোগ করবার মত বই।

পুরু এণ্টিক কাগজে সুদৃশ্য ছাপা, রঙ্গিন বাঁধান মলাট। **দাম—এক টাকা**

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

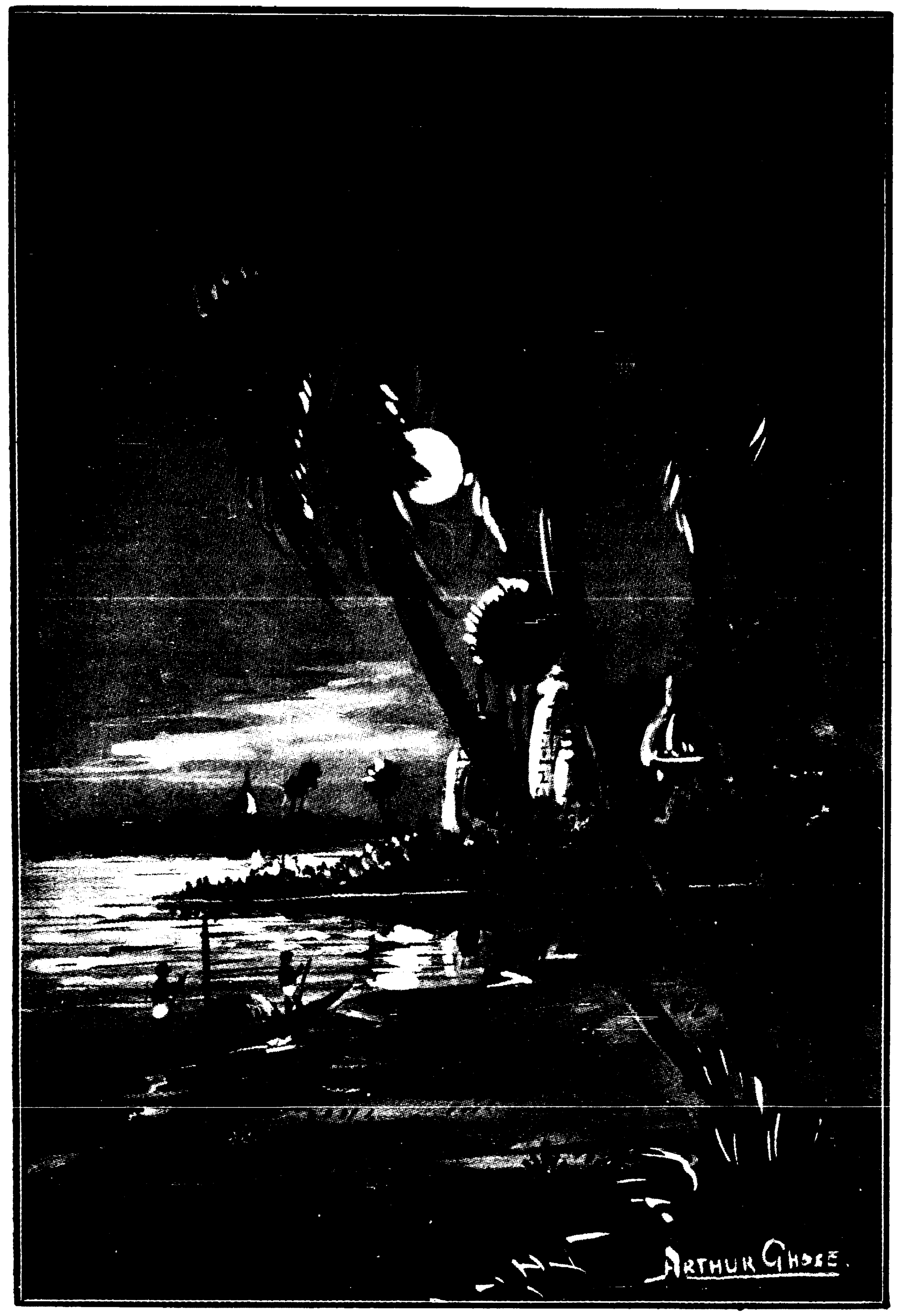

কোজাগরী পূর্ণিমা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত আর্থার সুধীর কুমার ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ { ১১শ সংখ্যা

সবুজ পরী

শ্রীবিমল দত্ত, এম্.এ

সবুজ পরীকে জানি আমি,
রাতদিন কত কাজ তার—
হল্‌দে, সবুজ, লাল, নীল
পশমে ভরানো ভাণ্ডার।
সেলাইয়ের কাঠি দুটো তার
অলক্ষ্যে খালি চল্‌ছে,
মাঠে মাঠে আর বনে বনে
তাই ত' কুসুম ফল্‌ছে।

জর্দ্দা, কমলা, আশ্‌মানী
নীল্‌চে, পেঁয়াজী রংদার
ফুলগুলো সেই বুন্‌ছে
অলক্ষ্যে থেকে এন্তার।
ভুল নাই, তার ভুল নাই,
রং-এ রং-এ ঠিক খাপ খায়,
ফিকে রঙে আর গাঢ় রঙে
বুনে রেখে দেয় আব্‌ছায়।
নদীতীরে, ভাঙা ঘাটলায়
এত ছোট ছোট তোলে ফুল
মানুষের চোখে পড়ে না তা'
পরীরা দেখ্‌ছে নির্ভুল।
দ্রুত সে বুন্‌ছে দিনরাত
সাজায় যতনে ফিট্‌ফাট্
গভীর আঁধার রাত্রেও
কাঠি চলে তার সুট্‌সাট্।
মাঠে বুনে রাখে যাদুকরী
সবুজে ছোপানো গাল্‌চে,
বুনো ফুলে আর মেঠো ফুলে
ঢাল্‌ছে বেগুনে লাল্‌চে।
আমি বসে বসে ভাবি তাই
কত যে পশম আছে তার,
এত রং সব কোথা পায়
কোথায় তাহার ভাণ্ডার!

[ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী]

দশ

এদিকে—

প্রভাতেই জেতমানার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হ'ল।

দেখে শুনে সম্রাট্ মিহিরকুল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, আদেশ দিলেন—দু'চোখে যা দেখবে জ্বালিয়ে দাও, বাড়ীঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও, নরনারীকে বর্শা-ফলকে বিঁধে জীবন্ত দগ্ধ কর।

মার মার রবে হূনেরা বেরিয়ে পড়লো, সম্রাট্ মিহিরকুলও তাদের সঙ্গে বেরুলেন আগুনের রোশনাই দেখতে।

দেখতে দেখতে নগরীর পল্লীতে পল্লীতে আগুন জ্বলে ওঠে, আকাশ হয়ে ওঠে ধূমাচ্ছন্ন। মৃত্যুভীত নরনারী ও শিশুকণ্ঠের আর্ত্তনাদ সেই ধূমের শিখায় শিখায় মহাব্যোমে লীন হয়ে যায়। হিংসা-প্রবণ হূনেরা অত্যাচারে উল্লসিত হয়ে ওঠে, তাদের হৈ-চৈ আর হুল্লোড় ডুবিয়ে দেয় চারিপাশের কাতরতাকে।

সম্রাট্ মিহিরকুল দূর থেকে দেখেন, উপভোগ করেন, আত্মপ্রসাদে তাঁর মুখের রেখাগুলি কঠিনতর হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে জন কয় বিশিষ্ট নাগরিক সম্রাটের সম্মুখীন হ'ল; হাতযোড় করে নিবেদন জানাল—সম্রাট্, নগর ধ্বংস করবেন না। আমরা তো আপনার চরণে কোন অপরাধ করি নি, তবে কেন আপনি আমাদের উপর এই গুরুতর শাস্তির বিধান দিয়েছেন প্রভু! ভগবান্ আপনাকে পাঠিয়েছেন দুর্ব্বলকে রক্ষা করার জন্য, প্রজাপুঞ্জের পালনের জন্য, আপনি আমাদের ধনপ্রাণ না রাখলে কে রাখবে সম্রাট্? হে দেব, আমরা আপনার চরণে মিনতি করছি, আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন, সেনাদের নিবারণ করুন।

—ভগবান্ আমাকে পাঠিয়েছেন!—মিহিরকুল হা-হা করে হেসে উঠলেন, বল্‌লেন—সেই জন্যই তো তোমাদের সবাইকে আমি সেই ভগবানের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। বেচারাকে স্বর্গে বড় একা-একা থাকতে হয় কি না! হাঃ-হাঃ!

পরক্ষণেই পার্শ্বচরদের ইঙ্গিত করলেন—এই, এদেরকে নিয়ে যাও।

অনুচরেরা তখনই তাদের সবাইকে ধরে সামনের এক বহ্নিমান্ গৃহের প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করল।

কোন এক সময় শাদা ঘোড়ার পিঠে কন্যাকুমারী সম্রাটের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বহ্নিমান্ নগরীর আর্ত্তনাদ শুনে সে প্রাসাদে স্থির থাকতে পারে নি, বাহির হয়ে পড়েছিল। চারিপাশের নৃশংসতা সে আর চোখে দেখতে পারল না। বার বার উত্তরাপথের কত সমৃদ্ধ নগরী সে চোখের উপর এম্‌নিভাবে ভস্মীভূত হতে দেখেছে, কিন্তু আজও এই দৃশ্যে সে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারল না। অসহ্য মনে হওয়ায় ফস্ করে সে বলে ফেল্‌লে—একজনের অপরাধে এতজনকে শাস্তি দিচ্ছেন কেন বাবা? ওরা তো সত্যিই কোন অপরাধ করে নি!

পিছন পানে তাকিয়ে সম্রাটের ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠল, বল্‌লেন—কি করে দেশ শাসন করতে হয় তা তোমার চেয়ে আমি ভালই জানি, রাজনন্দিনী!

কন্যাকুমারী আর কিছু বলতে সাহস পেলে না।

অত্যাচারী হূনদের ধ্বংস-অভিযান সমভাবেই এগিয়ে চল্‌ল নগরীর বুকের উপর দিয়ে।

মহাকালের মন্দিরেও সেই খবর এসে পৌঁছাল।

হূনদের সেই মৃত্যুযজ্ঞ থেকে যে দু'চার জন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পারল, তারা এসে বল্‌লে—সব গেল, এবার আর ওরা বাড়ীঘরই শুধু পুড়িয়ে দিচ্ছে না, জীবন্ত মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারছে তারই সঙ্গে। এখনই একটা-কিছু করতে না পারলে সব শ্মশান হয়ে যাবে!

মন্দির থেকে দেখা যায়, নীচে উপত্যকার জনপদ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, মেঘের পর মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছে আকাশের গায়।

ভৈরব আচার্য্যের মুখে কিন্তু এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না, বল্‌লেন—এ সব প্রতিরোধ করবে কে—দেশে মানুষ কই? সবই মাথা পেতে সইতে হবে। এ যে পরাধীনতারই আশীর্ব্বাদ!

মল্লিকা চঞ্চল হয়ে ওঠে, আকাশের ক্রমঃবর্দ্ধমান ধূমকুণ্ডলীর পানে তাকিয়ে সে নিজেকে

স্থির রাখতে পারে না, একটা কথা বার বার তার মনে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করতে থাকে: তার জন্যই তো এত লোক প্রাণ হারাচ্ছে, এ শুধু তার একার অপরাধ। বল্‌লে—না, আমার একার অপরাধের জন্য এত লোক কষ্ট পাবে তা হয় না। আমিই যাব, বলব—আমিই জেতমানাকে খুন করেছি। যে সাজা দিতে হয় আমাকে দাও।

ভৈরব আচার্য্য বল্‌লেন—তুমি ভুল বুঝেছ মা, তুমি ধরা দিলেই এ অনাচার থামবে না, তোরামানা ও মিহিরকুল যেখানে গেছে সেইখানেই এই ব্যাপার ঘটেছে, এখানে কেন যে এত দিন তা ঘটে নি, তাই বিস্ময়কর।

—আপনার কথাই মানলাম—মল্লিকা বল্‌লে,—কিন্তু এই অত্যাচারের মূলে যে আমিই এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

আচার্য্য বল্‌লেন—উপলক্ষ্যই তো সব নয় মা, ওদের অদৃষ্টও তো মানতে হবে। তা ছাড়া এক বন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য এক অত্যাচারীর প্রাণ নাশ করেছ—ওটা তো কোন অপরাধ নয় মা, পুণ্য কর্ম্ম। রামায়ণ মহাভারতে অমন কত কাহিনীই তো লেখা আছে, মা! কৃষ্ণ-অবতার রূপে নারায়ণ নিজমুখে বলেছেন—

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

প্রত্যেক মানুষ যেন মনে করে যে সে পৃথিবীতে এসেছে সজ্জনকে রক্ষা করতে, অসৎকে নাশ করতে, ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে মানবসমাজের উন্নতি সাধন করতে। তোমার-আমার অন্তর্নিহিত ভগবান্ আমাদেরকে সেই পথেরই নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। আমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই নির্দ্দেশ শুনি না বলেই তো আজ আমাদের এত দুঃখ-দুর্দ্দশা। তুমি যদি তেমন কোন সৎ কাজ করে থাক তাতে তোমার অনুশোচনা করার তো কিছু নেই।

মল্লিকার মন কিন্তু আচার্য্যের কথায় সাড়া দিল না, তার মনের কাঁটাটা খচ্ খচ্ করতে লাগল মনের কোণে। আন্‌মনে সে তাকিয়ে রইল দিগ্‌বলয়ের পানে, পাহাড়ী বনভূমি যেখানে শস্যশ্যামল জনপদে গিয়ে পৌঁছেছে। দিগ্‌বলয়ের অন্তরাল থেকে সেদিক্‌কার কিছুই চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে ঢালু পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী মেঘের পর মেঘের রেখা টানছে আকাশের গায়। সেই মেঘের কালিমার পানে তাকিয়ে মল্লিকার মন কালো হয়ে ওঠে। সে স্থির হতে পারে না। একটা কথাই বার বার তার মনে ওঠে: জেতমানাকে খুন না করলে এ সব কিছুই ঘটত না, এত নরনারীর মৃত্যু ও নির্য্যাতনের জন্য সে-ই তো দায়ী। সে গিয়ে ধরা দিলে সব অনাচার এখনই থেমে যাবে, এখনও কত জন পরিত্রাণ পাবে অনিবার্য্য উৎপীড়নের হাত থেকে। সে পালিয়ে এসে নিজেকে বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু শত সহস্রকে

বলি দিয়েছে নিজের স্বার্থের বেদীতে। হোক্ না সে রাজার মেয়ে, তবু তার একার জীবনের মূল্য কি এতই বেশী! একার জন্য বহুকে নিঃশেষ করা কি অন্যায় নয়, পাপ নয়?

মল্লিকার মনে হয় অগণিত নরনারীর আর্ত্তনাদ যেন সে শুনতে পাচ্ছে. স্পষ্ট দিনের আলোতেও তাকে ঘিরে কালো কালো প্রেতাত্মার ছায়া ঘুরছে। তার পাপে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঘনীভূত হচ্ছে তার চারিপাশে। মল্লিকা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না, কাছেই ঘোড়া বাঁধা ছিল, কোন এক সময় তার পিঠে চড়ে বসল। নিষেধ করার মত, বোঝাবার..মত সামনে কেউ ছিল: না। দেখতে দেখতে ঢালু পাহাড়ী পথে গাছের আড়ালে অশ্বারোহিণী অদৃশ্যা হয়ে গেল।

তেজী ঘোড়ার দৃপ্ত পদক্ষেপের নীচে পার্ব্বত্য পথ দ্রুত শেষ হয়ে এল। কোন এক সময় তর তর করে অশ্বারোহিণী নেমে এল বহ্নিমান্ জনপদের মাঝে। সম্রাট্ মিহিরকুল তখন উচ্ছৃঙ্খল সেনার কীর্ত্তি-কলাপ উপভোগ করছেন, দেখছেন আগুনের জৌলুষ, শুনছেন আর্ত্তনাদের উচ্ছ্বাস। পাশে ঘোড়ার পিঠে কন্যাকুমারী। একেবারে তাদের সামনে এসে মল্লিকা ঘোড়ার রাশ সংযত কর্‌ল, তার পর কোন রকম শিষ্টাচার না দেখিয়ে সোজাসুজি বল্‌ল—সম্রাট্, এই সব নিরপরাধ নাগরিকদের উপর অত্যাচার করবেন না। আমিই জেতমানাকে খুন করেছি, যে শাস্তি দিতে চান আমাকে দিন।

মিহিরকুল মল্লিকাকে চিনতে পারলেন, মুখে ফুটে উঠ্‌ল মৃদু হাসি, বল্‌লেন—তুমি খুন করেছ? অসম্ভব! জেতমানাকে খুন করার শক্তি তোমার নেই। এ সেই কালো সওয়ারের কাজ, সে কোথায় গেল?

—আমিই তাকে খুন করেছি সম্রাট্।

—তোমার মত দুর্ব্বলা একটা হিন্দুর মেয়ে হূন সেনাপতি জেতমানাকে খুন করেছে—এই কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল? সূর্য্যবংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ মিহিরকুলকে তুমি এতই বোকা ঠাউরেছ?

মল্লিকার একবার মনে হ'ল কন্যাকুমারীকে সাক্ষী মানে, কিন্তু তখনই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে-কথা আর তুল্‌ল না, বল্‌লে—আমি সত্য কথাই বল্‌ছি সম্রাট্!

—তোমার সত্যমিথ্যায় আমার কিছু যায়-আসে না—সম্রাট্ ধমক দিলেন; কালো সওয়ার কোথায় তাই আমি জানতে চাই।

—তার কথা আমি কিছুই জানি না, সম্রাট্।

—জান না?

—না, সম্রাট্।

—বেশ, জান কি না আমি দেখছি। মিহিরকুল পার্শ্বচরদের ইঙ্গিত করলেন—এই, চাবুক চালাও—

তখনই জন কয় জোয়ান হূন মল্লিকাকে জোর করে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আন্‌ল।

কন্যাকুমারী তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানাতে গেল, ডাকল—বাবা!···

—চুপ্ কর! সম্রাট্ মিহিরকুল অনভিজ্ঞা বালিকার উপদেশ চায় না—বলে সম্রাট্ এমন ভাবে কন্যাকুমারীর মুখের পানে তাকালেন যে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, আর-কিছু বলতে সে সাহস পেলে না।

সম্রাট্ হাতের ইসারা করলেন, একজন হূন বেত নিয়ে এগিয়ে গেল।

তখনকার দিনে হিন্দু মেয়েদের পিঠ অনাবৃতই থাকত, জামা বা ওড়নার রীতি তখনও চল হয় নি। হূনের হাতের বেত এসে পড়্‌ল মল্লিকার অনাবৃত পিঠের উপর। তীব্র অনুভূতি মল্লিকাকে বারেক সঙ্কুচিত কর্‌ল। অমলিন শুভ্র পিঠের উপর বেত্রাঘাতের একটী রক্তমুখী রেখা ফুটে উঠ্‌ল।

মিহিরকুল মৃদু হেসে বল্‌লেন—কি রূপসী রাজকন্যে, এখন বল্‌বে কালো সওয়ার কোথায় আছে, না আরো মার খেতে চাও?

—আপনি আমায় বিশ্বাস করুন সম্রাট্, তার কথা আমি কিছুই জানি না।

সম্রাট্ হা-হা করে হেসে উঠ্‌লেন অবিশ্বাসের হাসি, তার পর বেত-ধারীকে বল্‌লেন—থামলে কেন? চালাও। (ক্রমশঃ)

খাদ্যের অবজ্ঞাত উপকরণ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

পাকা গিন্নী-মহলে একটা কথা চলিত আছে—"যে সকল ছেলে সাপটিয়া খায় তারা বলবান্ ও পুষ্টদেহ হয় আর যে সব ছেলে 'মিরিক্‌চিড়ে' অর্থাৎ খাবার সময় এটা খাব না ওটা খাব না এইরূপ বায়না করে তারা দুর্ব্বল ও রোগা থাকিয়া যায়।" কথাটার ভিতর অনেক সত্য আছে। যে সকল খাদ্যকে বা খাদ্যাংশকে আমরা অবজ্ঞা করি তাহাদের মধ্যেও অনেক গুণ বিদ্যমান থাকিতে পারে।

আমার এক বন্ধু ছেলেবেলায় অত্যন্ত 'মিরিক্‌চিড়ে' ছিলেন,—খাবার সময় আলুর বা বেগুণের সামান্য একটু খোসা পর্য্যন্ত বাদ দিয়া খাইতেন। পান্তুয়ার খোসাটাও বোধ হয় এক সময় বাদ দিতেন। তার পর তিনি এক বইয়ে পড়িলেন ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন প্রত্যেকটি খাদ্য ত্রিশ বার চর্ব্বণ করিতেন। তিনিও তাহাই আরম্ভ করিলেন। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের মত তিনি কুড়াল লইয়া গাছ কাটিতেন না; গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ কি খাইতেন তাহা দেখিলেন না। আলুর খোসা, পটলের বীজ, শাকশব্জীর আঁশ প্রভৃতি বর্জ্জিত বাঙ্গালীর খাদ্য তিনি প্রচুর চর্ব্বণের পর গলাধঃকরণ করিতেন। ইহার ফলে পরবর্ত্তীকালে তাঁহার গুরুতর অজীর্ণ রোগ (Dyspepsia) জন্মে।

ঐ অজীর্ণ রোগের কারণ এখন জানা গিয়াছে। তাঁহার খাদ্যে কর্কশ অংশের অভাব ঘটিয়া উহা জন্মিয়াছিল। খাদ্যের কর্কশ অংশকে ইংরাজীতে Roughage বলে। কর্কশাংশ অন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত হইয়া অন্ত্রের গায়ে যেন চিমটি কাটে, তাহার ফলে অন্ত্রের মাংসপেশীগুলি বেশ জোরে সঙ্কুচিত হয়। ইহার ফলে সমস্ত পাকযন্ত্রের স্বাস্থ্য ও প্রচলনশীলতা সম্যক্ রক্ষিত হয়। এরূপ পাকযন্ত্রে কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিতে পারে না। আর কোষ্ঠবদ্ধতাই নানা রকম অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগের প্রধান কারণ।

এবারে অবজ্ঞাত খাদ্যের একটি তালিকা ও ঐ সকল খাদ্যের দ্বারা কি উপকার পাওয়া যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

(১) আঁশ জাতীয় কর্কশ অংশ:—আলু ও বেগুণের খোসা, বিবিধ আনাজের আঁশ, পটলের বীজ, কিসমিসের খোসা, নারিকেল, কাঁচা ছোলা প্রভৃতি খাদ্যের কর্কশ অংশ দান করে। প্রত্যেক দিনের খাদ্যে কিছু পরিমাণ কর্কশ অংশ থাকা আবশ্যক। তবে কোন জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং" এ কথা মনে রাখিতে হইবে। আর ভিন্ন ভিন্ন লোকের পাকস্থলী ঠিক একরূপ অনুভূতি-সম্পন্ন নহে। কাহারও কাহারও অল্প কর্কশাংশেই উদরাময়ের মত হয়। শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের পাকযন্ত্রও ক্রমশঃ সবল হইতে পারে। ঐরূপ লোকের কর্কশ দ্রব্য প্রথম প্রথম উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে হইবে। চানাচুর ও ছোলাভাজার মত দ্রব্য যাহাদের একবারে সহ্য হয় না তাহারা যদি ঐ সকল জিনিস উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া

খায় তাহা হইলে পেট কামড়ানি হয় না। ডালিম, বেদানা ও পেয়ারার বীজ উত্তম কর্কশাংশের কাজ করে। পানের সহিত ব্যবহৃত সুপারী এবং ডাল ও তরকারীর ফোড়ন ভাল কর্কশাংশের কাজ করে।

(২) মুড়ি ও ছোলা ভাজা:—মুড়ি ও ছোলা ভাজা কর্কশাংশের কতক কাজ করে। কিন্তু ঐ সকল খাদ্যের প্রধান উপকার এই যে উহারা দাঁত ও চোয়ালের মাংসপেশীগুলিকে কার্য্য দিয়া তাহাদিগকে সবল ও সুস্থ রাখে। প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে কতকটা শক্ত জিনিস থাকা আবশ্যক। নিয়ত ভাত ও আলু সিদ্ধের মত খাদ্য খাইলে দাঁত ক্রমশঃ ব্যায়াম অভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এখন জানা গিয়াছে দুর্ব্বল দাঁত হইতে বহু রোগের উৎপত্তি হয়।

(৩) শাক ও পাতা:—কর্কশাংশ ছাড়া এগুলি শরীরকে নিত্য বিবিধ ভিটামিন ও প্রয়োজনীয় লবণ পদার্থ সমূহ দেয়। অতএব উহাদিগকে অবজ্ঞা করা চলে না। প্রাত্যহিক খাদ্যে কিছু পরিমাণ শাকপাতা রাখিতে হইবে।

(৪) তেঁতুল, কয়েদবেল, আমড়া—এগুলিও অবজ্ঞার দ্রব্য নহে, উহারাও শরীরে ভিটামিন ও প্রয়োজনীয় লবণ পদার্থ প্রদান করে।

(৫) কুচা চিংড়ি মাছ, মৌরলা, পুঁটি, ট্যাংরা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্য অবজ্ঞার দ্রব্য নহে। চিংড়ির খোলা এবং ক্ষুদ্র মৎস্যের কাঁটা উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইলে শরীরে ক্যালসিয়ম্-ঘটিত লবণ পদার্থ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বাঙ্গালীর খাদ্যে ক্যালসিয়ম্ কম। অতএব কুচা মাছ হইতে প্রাপ্ত ঐ ক্যালসিয়ম্ পরম উপকারী দ্রব্য। কবিরাজেরা দুর্ব্বল রোগীকে ক্ষুদ্র মৎস্য খাইতে দেন।

(৬) অনেকে শুধু একরকম ডাল ভালবাসে। মুগ বা মশুরী। ইহারা অন্য ডাল একেবারে খায় না। কিন্তু শুধু দুই-একটি ডালেই শরীর গঠনের সকল উপকরণ থাকে না। নানা রকম ডাল খাইলে সেই সব উপাদান সহজেই মিলে।

দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, দই, সন্দেশ বা রাবড়ীর কথা বলিলাম না, কারণ সেগুলি খাদ্যের অনবজ্ঞাত উপকরণ।

মজার বাড়ী

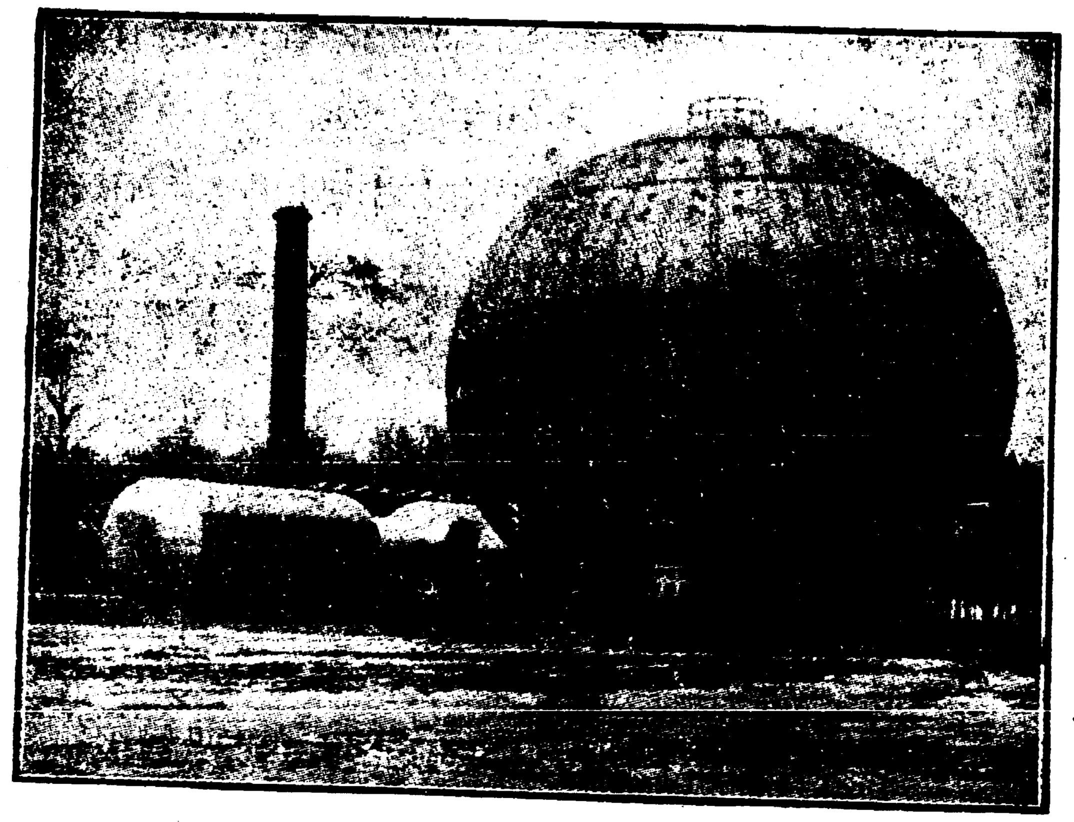

ক্লীভল্যাণ্ড সহরের বলের মত অদ্ভুত বাড়ী

এটি একটি হাসপাতাল, রোগীদের আলো-হাওয়ার সুবিধার জন্য এ ভাবে তৈরী করা হয়েছে। বাড়ীটি পাঁচতলা, সবটাই ইস্পাত দিয়ে তৈরী।

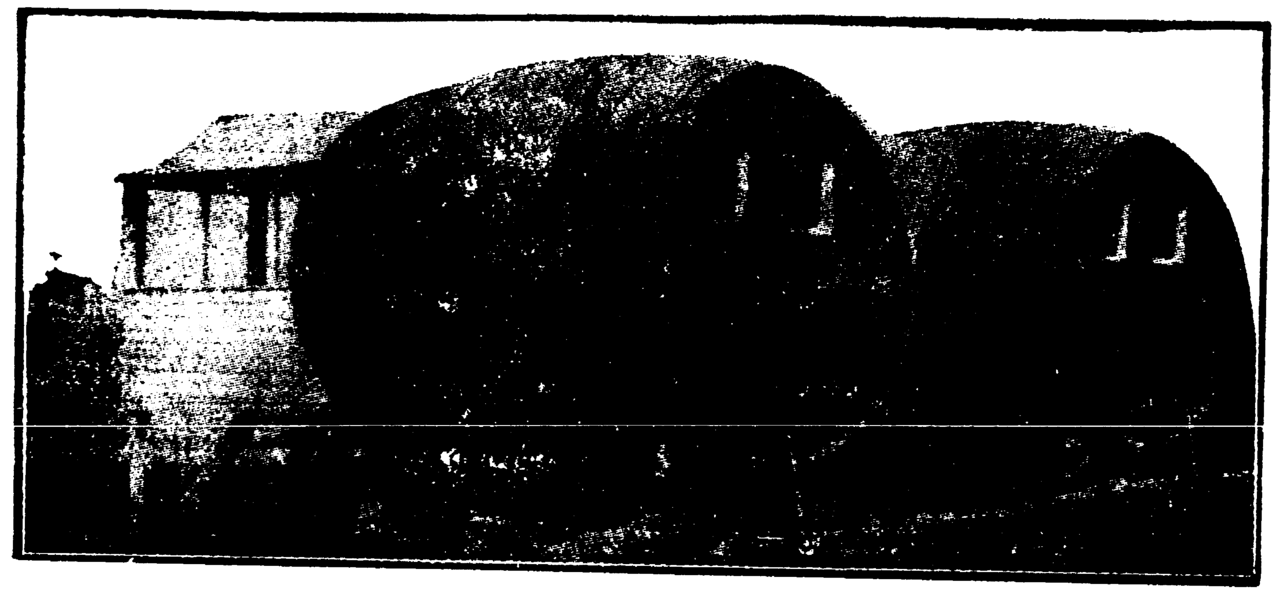

মদের পিপে থেকে তৈরী অদ্ভুত বাড়ী

আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের এক ভদ্রলোক পুরোনো অব্যবহার্য্য কতকগুলো মদের পিপে দিয়ে এই অদ্ভুত চেহারার বাংলো তৈরী করেছেন। এর ভেতর আধুনিক বসত-বাড়ীর উপযোগী সব রকম ব্যবস্থাই আছে।

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১০

হরির বজ্‌রায় পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি বিরাজ করিতেছে। এত বড় সংঘর্ষের কোন চিহ্নই তাহাতে নাই। হরি দীনু-তিনুকে বলিল, "তোমাদের আগমন শুভ-সূচক, দস্যুদের পরাজয়ে তোমাদেরও কৃতিত্ব কম নয়। দেথ তিনু, অজয়ে বেশ নৌকা বাইতাম ঘোষাল মশাই গাইতেন—

'তুফান উঠেছে যমুনায়—'

"আজ মনে পড়ে। এই শান্তির রাত, মা গঙ্গার বুকে এ দাপাদাপি বড় বেয়াদবি মনে হয়। মা দুরন্ত সন্তানদের এ উপদ্রব কি ভালবাসেন? এমন অকূল-পাথারে মনে কেবল কমলে কামিনীর রূপই ভেসে ওঠে। দীনু, তুমি গাইতে—

'এই যে ছিল, কোথায় গেল
কমলদলবাসিনী!'

"সেই সুখের দিন ছিল—এ রাজগি ভাল লাগে না। জলের মায়া, নৌকার মায়া, তার সঙ্গে কটা'র আকর্ষণ আমাকে অভিভূত করেছে।"

হরির দৃষ্টি হঠাৎ বন্দী 'ডাইকে'র প্রতি পড়িল। হরি তৎক্ষণাৎ সাহেবের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া সসম্মানে কেদারায় বসাইল এবং নিজে একথানা কেদারায় বসিয়া বন্ধুর ন্যায় কথোপকথন করিতে লাগিল। সাহেব ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলা শিথিয়াছিল, হরিও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ওলন্দাজী বলিতে পারিত।

হরি—"কাপ্তেন সাহেব, কোথায় তোমাদের দেশের সভ্যতা, সদাচার এনে এ দেশকে সমৃদ্ধ করবে, তা না সঙ্গে করে এনেছ দস্যুবৃত্তি! সমুদ্রের সন্তান, রত্নাঞ্জলি না এনে আন্‌লে হাঙ্গরবৃত্তি! মা গঙ্গার জল অপবিত্র কর্‌ছ।"

সাহেব—"জোর যার মুলুক তার এ দেশের লোকের নীতি। এখানকার লোক কাপুরুষ, অত্যাচারীর কাছে মাথা নত করে। সভ্যতার দান নেবার যোগ্যতা এদের নেই। এরা বাঘ ও সাপকে পূজো দেয়।"

হরি—"ভুল বুঝেছ সাহেব! এ দেশ অতিথিকে দেবতা মনে করে, বিদেশী ডাকাতও তাই সে আতিথ্য হতে বঞ্চিত হয় না। আমরা বাঘ, সাপকে পূজো দিই কিন্তু আরাধনা করি দর্পহারী মধুসূদনের, অসুরনাশিনী জগন্মাতার।"

সাহেব—"আমি বিশ বৎসর বাঙলায় আছি, এদের মত এমন নোংরা জাত আর দেখি নি।"

হরি—"তোমরা হীন বোম্বেটে, নোংরা লোক ভিন্ন অন্য কার সঙ্গ পাবে? তোমরা যে অস্পৃশ্য। এখানে নোংরা জন্তুর জন্য ময়লা ক্ষেত আছে। তুমি দুর্ভাগ্য। জান না হিন্দুর মত অন্তরে বাইরে পবিত্র জাত—পরিচ্ছন্ন জাত পৃথিবীর কোথাও নেই। তুমি ব্রাহ্মণ দেখেছ? কি করে দেখবে, সে চোখ তোমাকে ভগবান্ দেন নি। তোমাকে ফাঁসি দেওয়া ঠিক হয়েছে, তবে তা এখন বন্ধ রেখে তোমাকে এক আশ্রমের দ্বারোয়ান করে রাখা হবে যাতে মরণের আগে অন্ততঃ ভারতের সদাচার ও সুশিক্ষার কিছু পরিচয়ও তুমি পাবার সুবিধে পাও। পাপাচারে মনুষ্যত্ব থেকে তোমার অধঃপতন হয়েছে—মরণের আগে কতকটা সংশোধন হয়ে যাক্।"

সাহেব—(সুর নরম করিয়া) "যে কোন পণ চাও আমি তা-ই দিতে প্রস্তুত, আমায় মুক্তি দাও।"

হরি—"সাহেব তোমরা খুব ধনী, আমি খুব গরীব; কিন্তু আমাকে কেনবার মত টাকা তোমাদের গোটা দেশে নেই। তবে একটি মাত্র পণে তোমায় মুক্তি দিতে পারি।"

এই সময়ে বজ্‌রা হইতে জনৈক কর্ম্মী উপহাস করিয়া বলিল—

"It is said of the Dutch
They give too little, they want too much."

(ওলন্দাজদের সম্বন্ধে একটা কথা আছে—তারা খুব কম দেয়, খুব বেশী চায়।)

সাহেবের মুখটা ঈষৎ রক্তিমাভ হইল, তাহা গোপন করিয়া কাতর ভাবে বলিল—"যতই কঠিন পণ হোক, যতই ক্লেশকর হোক, তা আমি পূরণ কর্‌ব।"

হরি—"তুমি শপথ কর, তুমি সৎ হবে, দস্যুতা ছাড়বে।"

সাহেব পণ শুনিয়া অবাক্ হইল। এত বড় পাপের এমন লঘু দণ্ড হইবে সে ভাবে নাই। তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, অনুতাপের আবেশ তাহার রূঢ় মুর্ত্তিতে কেমন একটা কমনীয়তা আনিয়া দিল। এত সহজে উদ্ধার পাইবে, সাহেবের তাহা কল্পনার অতীত ছিল। হরি সহাস্যে করমর্দ্দন করিয়া সাহেবকে একটা পান্‌সীতে উঠাইয়া দিল; সাহেব বার বার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইল।

পান্‌সী একটু অগ্রসর হইতেই অতি দ্রুত একখানা ছিপ্ আসিয়া সাহেবকে ঠিক চিলের মত ছোঁ মারিয়া যেন তুলিয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। যে যুবকটী সাহেবকে হাতে ধরিয়া ছিপে উঠাইয়া লইল—হরি সচকিতে দেখিল তাহার মুখখানি চেনা চেনা—অনেকটা 'কটা'র মুখের মত।

(ক্রমশঃ)

গোলাপগঞ্জের কয়েদখানা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

প্রসিদ্ধ প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ্ সতীনাথ মল্লিক তাঁর সহকারী রাধামোহনকে লইয়া কি একটা তদন্তে গোলাপগঞ্জে আসিয়াছেন। স্বয়ং রাজাবাহাদুরের বাড়ীতে সেদিন তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। খাওয়াদাওয়ার পর নানা রকম মুখরোচক গল্প সুরু হইল। কথায় কথায় চোর, ডাকাত, বাটপাড় প্রভৃতির প্রসঙ্গ উঠিল।

সতীনাথ বাবু কহিলেন, "বলতে কি, আমি এমন লোক দেখেছি, জেলখানার গারদ যার কাছে কিছুই না। ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে সে ফাঁকি দিয়ে জেল ভেঙ্গে পালাতে পারে।"

রাজাবাহাদুর এক ধারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন, গড়গড়ার নল চাকরের হাতে দিয়া বলিলেন, "সে গারদও নিশ্চয়ই তেমনি। আমার এখানকার জেলখানায় যে ব্যবস্থা আছে তা দেখলে বোধ হয় আর সে কথা বলতেন না।"

সতীনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লেও বলতাম। বুদ্ধির জোর থাকলে মানুষের অসাধ্য যে কিছুই নয় এ আমি সত্যি বিশ্বাস করি।"

"কিন্তু—" রাজাবাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "আমিও বিশ্বাস করি, আমার এখানে

আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে আমি যে ব্যবস্থা করিয়েছি, কোন মানুষের সাধ্য নেই তার সঙ্গে আঁটতে পারে। আপনার সেই বুদ্ধিজীবীটিকে এনে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

সতীনাথ বাবু সহাস্যমুখে বলিলেন, "তাকে আর এখন কোথায় পাব, তবে যদি বলেন আমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"আপনি নিজে!"

"হ্যাঁ, আমি নিজে। ডিটেক্‌টিভি করতে হ'লে একটু-আধটু কল-কৌশল আমাদেরও অভ্যাস করতে হয়।"

সকলে অবাক্ হইয়া মুখ তুলিল। কিন্তু সতীনাথ বাবুর দিকে চাহিয়া বোঝা গেল তিনি ঠাট্টা করিতেছেন না, সত্যিই তিনি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত।

রাজাবাহাদুরও ছাড়িবার পাত্র ন'ন। কহিলেন, "বেশ, তবে পরীক্ষাটা হয়েই যাক্। এবং শুভস্য শীঘ্রম্; আজই লেখাপড়া হয়ে যাক্ না কেন! ক'দিন সময় চাই? সাত দিন?"

সতীনাথ বাবুর মুখে আবার সেই হাসি। বলিলেন—"যথেষ্ট!"

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই নাটকীয় চুক্তি সত্য সত্যই কাগজে-কলমে লেখাপড়া হইয়া গেল। ঠিক হইল, পরদিন সকালেই সতীনাথ বাবুকে গোলাপগঞ্জ জেলের সব চেয়ে সুদৃঢ় সেল্‌এ আবদ্ধ করা হইবে। সঙ্গে নিতান্ত না রাখিলে নয় এমন ২।১টি জিনিষ ছাড়া তিনি কোন কিছু রাখিতে পারিবেন না। তবে তাঁহাকে অবশ্য কয়েদীর পোষাক পরিতে হইবে না। সেল্‌এ পূরিবার পূর্ব্বে তাঁর দেহ ও পোষাক তন্ন তন্ন করিয়া তাল্লাসী করিয়া তবে তাঁহাকে সেল্‌এ ঢুকিতে দেওয়া হইবে। যত দূর সম্ভব কড়া পাহারারও ব্যবস্থা হইবে। তা সত্ত্বেও আজ হইতে সাত দিন পরে, অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার রাত্রি ৮টার মধ্যে সতীনাথ বাবুকে জেল হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। পারিলে পুরস্কার হাজার মোহর।" রাজাবাহাদুর বড় বড় অক্ষরে সই করিয়া দিলেন, সতীনাথ বাবুও তার নীচে সই করিলেন।

পরদিন যথা সময়ে দেহ তাল্লাসীর পর সতীনাথ বাবু হাসিমুখে গিয়া জেলখানায় ঢুকিলেন। পরনের পোষাক অত্যন্ত সাধাসিধা। সাধারণ একখানা ধুতি, গায়ে মোটা শার্ট, পায়ে সিল্কের মোজা এবং সদ্য পালিশ করা এক যোড়া জুতা। জেলের সব চেয়ে নিভৃত সেল্‌এ তাঁর জায়গা ঠিক হইল। সেখানেও অতি সাধারণ আসবাব। একটা ছোট লোহার খাটে কম্বলের বিছানা, গায়ে দিবার জন্যও তদ্রূপ আর একটি কম্বল। ঘরের একদিকে একখানা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার, তার পাশে এক কুঁজা জল, আর দাঁত মাজিবার সরঞ্জাম—একটা টুথ্ ব্রাশ., এক কৌটা মাজন, আর মাথা আঁচড়াইবার একখানা রঙ্গিন চিরুণী। রাজাবাহাদুর স্বয়ং আসিয়া তদারক করিয়া গেলেন। ঘরে ডবল তালা লাগাইয়া দেওয়া হইল।

সকলে চলিয়া গেলে সতীনাথ বাবু চারদিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ঘরের মেঝে শক্ত সিমেণ্টে বাঁধান, পাথরের দেয়াল অন্ততঃ তিন ফুট পুরু। লোহার দরজায় হাতুড়ীর ঘা মারিয়াও একটু তোবড়ান যায় কিনা সন্দেহ। একধারে একটি মাত্র জানালা—সেটিও সুদৃঢ় লোহার জালি দিয়া ঢাকা। জানালার বাহিরে কিছু উপর দিয়া ইলেক্‌ট্রিকের তার চলিয়া গিয়াছে। এই তার হইতেই সমস্ত জেলে আলো সরবরাহ হয়। বাহিরে এক ফালি খোলা জমি, তার পর প্রায় বিশ ফুট উঁচু প্রাচীর। না, রাজাবাহাদুর মিথ্যা বলেন নাই, দুর্ভেদ্যই বটে। এই ঘরে—এই আধ-অন্ধকারে নিঃসঙ্গ ভাবে সাত দিন কাটাইতে হইবে ভাবিলেও মন বিগড়াইয়া যায়। সময় কাটাইবার জন্য একখানি বইও ইহারা বিশ্বাস করিয়া দেয় নাই।

বাহিরে পাহারাদারের ভারী বুটের শব্দ ভেদ করিয়া একটা ভোঁ আওয়াজ শোনা গেল, সতীনাথ বাবু জানালার কাছে আগাইয়া আসিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না, শুধু চোখের সামনে দিয়া কয়েকটা পাখী ডানা ছড়াইয়া উড়িয়া গেল। সতীনাথ বাবু খাটে আসিয়া বসিলেন, তার পর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তিন দিন পরের কথা। রাজাবাহাদুর প্রত্যহ দু'বেলা খবর লইতেছেন। ইতিমধ্যে কোন অঘটন ঘটে নাই। শুধু সতীনাথ বাবুর ঘরের কুঁজাটা একদিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তার বদলে একটা নতুন কুঁজা দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু তার পর দিন জেলার আসিয়া রাজাবাহাদুরকে খবর দিল, কাল সন্ধ্যাবেলা সতীনাথ বাবুর জানালা দিয়া একটা কাপড়ে মোড়া ছোট্ট পুঁটুলি পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। পাহারাদার তুলিয়া দেখে তার ভিতরে একটা দশ টাকার নোট, আর কাপড়ের উপর কালি দিয়া লেখা—"সাহায্যের বিনিময়ে"। পাহারাদার ঘুষ খাইবার লোক নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা জেলারের কানে আনিয়াছে। জেলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীর ঘর খানা-তাল্লাস করিয়াছে, কিন্তু কিছুই পায় নাই। সতীনাথ বাবুর পরনের জামা-কাপড়ও সম্পূর্ণ অক্ষত দেখা গিয়াছে।

শুনিয়া রাজাবাহাদুর একটু বিচলিত হইলেন। সতীনাথ বাবু ঘুষ দিয়া পাহারাদারকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইহাতে যতটা ভাবনা না হউক্, সেলের অন্ধকার কোণে বসিয়া নোট্, কাপড় এবং লিখিবার কালি তিনি সংগ্রহ করিলেন কোথা হইতে ইহাই সব চেয়ে আশ্চর্য্য এবং ভাবনার কথা। ঘুষ দিয়া যে সতীনাথ বাবু কিছু করিতে পারিবেন না ইহা রাজাবাহাদুরের জানা ছিল—কারণ তাঁর জেলের কর্ম্মচারীরা সকলেই অতিরিক্ত রকম বিশ্বাসী। তা ছাড়া যে সেল্‌এ তাঁর কয়েদীকে রাখা হইয়াছে সেখান হইতে বাহির হইতে হইলে পর পর তিনটি অতি দুর্ভেদ্য প্রাচীর পার হইতে হয়—এবং পাহারাদারও এক-আধটি নয়—বহু। যাহা হউক্, আরও সতর্ক হইবার জন্য তিনি কড়া হুকুম দিলেন, এবং ইহাও জানাইয়া দিলেন

যে কয়েদী যদি কোন রকমে পালায় তবে জেলার হইতে আরম্ভ করিয়া সব ক'টি পাহারাদারের চাকরী যাইবে।

পর দিন খবর আসিল, গত রাত্রে সতীনাথ বাবুর ঘরের জানালা হইতে কেমন একটা ঘ্যাঁষ ঘ্যাঁষ আওয়াজ শোনা গিয়াছিল,—যেন কে কোনও লোহার যন্ত্র দিয়া জানালার গরাদে কাটিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়াও কোন যন্ত্রপাতি বা ঐরূপ কিছু আবিষ্কার করা যায় নাই!

তার পর দিন আবার দেখা গেল, সতীনাথ বাবুর জানালার নীচে দশ টাকার নোট গাঁথা আর একখানা সাঙ্কেতিক চিঠি। তার সঙ্গে সাদা কাগজে পরিষ্কার পেন্সিলে লেখা: "মিঃ আনন্দরামকে পৌঁছাইয়া দিবার পারিশ্রমিক।" চিঠিতেও একটি লাইন লেখা: "ইনা য়ভ, না বইলাপা বেভাএ মিআ।" আনন্দরাম গোলাপগঞ্জের পুলিশ বিভাগের বড়কর্ত্তা। রাজাবাহাদুর তাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তো চিঠি পাইয়া অবাক্। চিঠির সাঙ্কেতিক ভাষার অর্থ বাহির করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের ডাকা হইল, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হইল না। তবে হাতের লেখা যে সতীনাথ বাবুর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অবশেষে মঙ্গলবার আসিল। সতীনাথ বাবু এখনও বন্দী আছেন। কাল সারাদিন তিনি জানালার পাশে চুপটি করিয়া বসিয়াছিলেন। মুখ দেখিয়া মনে হয় বাহির হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া এবার তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। মঙ্গলবার দিনটা একটু মেঘলা ছিল, সারাদিন ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেলা ৫টার সময় খবর লইয়া জানা গেল সতীনাথ বাবু কম্বল জড়াইয়া দিবানিদ্রা দিতেছেন। কি আর করিবেন? আজই যে তাঁর বাজীর শেষ দিন তা বোধ হয় আর খেয়ালই নাই।

সন্ধ্যার পর বৃষ্টিটা একটু জোরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল বাতাস। সেই ঝোড়ো হাওয়ায় হঠাৎ জেলখানার সমস্ত বিজলী আলো গেল নিভিয়া—বিদ্যুতের তার কোথায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে! তখনই কোম্পানীতে খবর দেওয়া হইল; সঙ্গে সঙ্গে খাকি পোষাক আঁটা ছয় জন মিস্ত্রী আসিয়া তার মেরামতের কাজে লাগিয়া গেল। জেলার কড়া হুকুম দিলেন, বাহিরে যাইবার সময় যেন গণিয়া গণিয়া ছয় জন মিস্ত্রীকে ছাড়া হয়—ঐ ফাঁকে যেন আর কেউ পালাইতে না পারে।

আটটা বাজিতে মিনিট ৩।৪ বাকী। রাজাবাহাদুর প্রফুল্ল মনে পারিষদ্‌দের লইয়া বসিয়া আছেন। আরও অনেক কর্ম্মচারী—পুলিশের বড় কর্ত্তা মিঃ আনন্দরাম প্রভৃতিও আছেন। জেলের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া খবর দিল—সতীনাথ বাবু এখনও তেমনি আরামে কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছেন, যা বর্ষা পড়িয়াছে!

"আমি আগেই জানতাম"—রাজাবাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "বেচারা মিথ্যেমিথ্যি সাত দিন ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করল। আমার জেল কি ভাবে তৈরী আমি জানি না? যাক্, ভদ্রলোকের জাঁকটা একটু ভাঙ্গুক।"

"আমিও আগেই জানতাম যে আমি ঠিক ৮টার মধ্যে আপনার কাছে হাজির হবই—আপনার জেল যে ভাবেই তৈরী হোক না।"—বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তে সতীনাথ বাবু ঘরে ঢুকিলেন, পেছনে তাঁর সহকারী রাধামোহন। ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া তখন ৮টা বাজিতেছে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিলে রাজাবাহাদুরই প্রথম কথা বলিলেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখছি! এই মাত্র আমার লোক এসে বল্‌ল, আপনার সেল্‌এ কম্বল মুড়ি দিয়ে—"

"ঠিকই বলেছে; কম্বল মুড়ি দিয়ে আমার জামাকাপড়গুলি এখনও সেখানে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু দেখছেন তো তার ভিতরে আমি নেই।"

রাজাবাহাদুরের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সতীনাথ বাবু আবার তাঁর সেই চিরপরিচিত মিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আপনাদের বিচলিত এবং অবাক্ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সমস্ত ঘটনা বলবার জন্যই এখানে এসেছি।"

গল্প সুরু হইল।

"প্রথমেই বলে রাখি," সতীনাথ বাবু সুরু করিলেন, "আমার এ কাজে আমার সহকারী শ্রীমান্ রাধামোহনের কৃতিত্ব বড় কম নয়, এবং সে না থাকলে কোন কিছুই হ'তে পারত না; প্রতি পদে তার সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে যদিও তার আস্তানা ছিল জেলের বাইরে অনেকখানি দূরে। যাক্ সে কথা। এবার গোড়া থেকে বলি।

"রাজাবাহাদুরের হুকুম মত জেলের লোকেরা তো আমাকে সেল্‌এ পূরে দিয়ে চলে গেল। প্রথমেই আমার কাজ হ'ল ঘরখানা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা। রাজাবাহাদুর ঠিকই বলেছেন, সর্ব্বদিক্ দিয়ে এটিকে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করতে তিনি খরচের কার্পণ্য করেন নি। তা ছাড়া সম্পূর্ণ আধুনিকতম ড্রেন প্রভৃতির ব্যবস্থাও রয়েছে।"

একজন পারিষদ্ বলিল, "হ্যাঁ, বছর চারেক হ'ল এখানকার সমস্ত পুরোনো ড্রেনেজ পালটে নতুন সিষ্টেম্‌এ ড্রেন বসান হয়েছে।"

"হ্যাঁ, তা আমি পাহারাওয়ালার কাছে আগেই শুনেছি। খাটে এসে বসতেই কি একটা ছোট্ট প্রাণী আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল, তার পর আর একটা। বুঝলাম ঘরে অনেক ইঁদুর আছে। তাড়া দিতেই কিন্তু সেগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম দরজার নীচে এতটুকু ফাঁক নেই, জানলার জালিও ইঁদুর বেরোবার মত প্রশস্ত হয়। তবে ইঁদুরগুলো

পালাল কোথা দিয়ে? ঘরের কোণে একটু হাতড়াতেই পথ পাওয়া গেল—একধারে ইঞ্চি ২৷৩ চওড়া একটা গর্ত্ত। হাত দিয়ে দেখলাম ভিতরটা ধূলোয় ভরা কিন্তু সেখানে একটা ফাঁপা নল রয়েছে বলে মনে হ'ল। আমার ঘরের সামনে যে লোকটা পাহারা দিত তার সঙ্গে কথা বলে কথা প্রসঙ্গে জেনে নিলাম—বছর চারেক আগে এই জেলটার সংস্কার হয়েছিল, তখনই নাকি আধুনিক 'ড্রেন-ট্রেনের' ব্যবস্থা হয়। বুঝলাম আমার আবিষ্কৃত গর্ত্তটি আর কিছু নয়, ওটি ঘরের সেই অধুনালুপ্ত নর্দ্দমা। জেল সংস্কারের আগে ঐ পাইপ দিয়েই ঘরের জল বার করে দেওয়া হ'ত।

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই পুরোনো পাইপের অপর মুখ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? নিশ্চয়ই সেল্এর এবং জেলের বাইরে কোথাও। আমার ঘরটাই যে এদিকে জেলের প্রায় শেষাশেষি তা টের পেয়েছিলাম কয়েকটি কারণে। প্রায়ই বিকেলের দিকে শুনতে পেতাম দেয়ালের ওদিক্ থেকে ছেলেদের হল্লা। তারা ক্রিকেট খেলত, ব্যাট্ দিয়ে বল্ পেটার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে 'রান্' করার উল্লাস স্পষ্টই শুনতে পেতাম। কাজেই আমার ঘরের পাশেই যে একটা খেলবার মাঠ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। মাঠের পরেই বোধ হয় এখানকার রঞ্জনা নদী, কারণ ষ্টীমারের ভোঁও থেকে থেকে শোনা যেত, আর জানলা দিয়ে দেখা যেত গাং-চিল, মাছরাঙা প্রভৃতি জলচর পাখী যখন তখন উড়ে আসছে। তবে কি পাইপ্টা নদীতে গিয়ে পড়েছে?

"সন্দেহ মেটাবার জন্য নানা কসরৎ করে কয়েকটা ইঁদুর মেঝে থেকে ধরা গেল। তুলে দেখলাম, সেগুলোর কোনটাই জলার ইঁদুর নয়, সবই মেঠো ইঁদুর, কোনটার গায়েই এক ফোঁটা জল লেগে নাই। বুঝলাম পাইপের মুখ মাঠেই গিয়ে পড়েছে—সম্ভবতঃ ছেলেদের ক্রিকেট-গ্রাউণ্ডেরই এক কোণে।

"যাক্, বাইরের সঙ্গে সংযোগের একটা হদিস মিল্ল—তা সে যত সূক্ষ্মই হোক্ না কেন। এরই সাহায্যে আমাকে এখন বাইরের লোকের সহায়তা যোগাড় করতে হবে। আমার শার্টটা, বোধ হয় কেউ লক্ষ্য করেন নি, ছিল 'ডবল্ ব্রেষ্টের'। সাবধানে তারই ভেতরের দিকের কাপড়টুকু ছিঁড়ে নিলাম, বাইরে থেকে দেখে কিছুই বুঝবার উপায় রইল না। জেলে ঢুকবার আগে জুতোয় খুব ভাল করে পালিশ লাগিয়ে নিয়েছিলাম। কুঁজোর জলে সেই কাঁচা পালিশ গুলে চলনসই রকম একটা কালি তৈরী হ'ল। (এর জন্য একটা কুঁজো ভাঙ্গতে হয়েছিল।) জুতোর ফিতের ডগায় যে টিন মোড়া থাকে তাই হ'ল কলমের নিব, তাই দিয়ে ঐ কাপড়ের টুকরোয় শর্ট হ্যাণ্ডে আমার সহকারী শ্রীমান্ রাধামোহনের নামে একখানা চিঠি লিখলাম কি করতে হবে সমস্ত উপদেশ দিয়ে। আর তার উপর বড় বড় অক্ষরে রাধামোহনের ঠিকানা দিয়ে লিখে দিলাম—এই কাপড়টা ঐ ঠিকানায় নিয়ে গেলে দশটা টাকা পাওয়া যাবে।" টাকা দেবার উপদেশ রাধামোহনকে শর্ট হ্যাণ্ডে দিলাম। এইবার একটা, ইংরেজীতে যাকে বলে

'রিস্ক্' নেওয়া, তাই করা গেল। পায়ে ছিল সিল্কের মোজা, একটু চেষ্টা করে টান দিয়েই সমস্ত বুনন খুলে ফেলা গেল; আমার হাতে এল কয়েক শ' গজ লম্বা বেশ শক্ত সিল্কের সুতো। এইবার চিঠি লেখা কাপড়ের টুক্রোটা সেই সুতোয় ভাল করে বেঁধে, তাগ বুঝে আর একটা ইঁদুর ধরে তার পায়ের সঙ্গে দিলাম বেঁধে। সেই সঙ্গে আমার ছোট্ট রংচংএ চিরুণীটাও বেঁধে দিলাম। ইঁদুরটাকে তাড়া দিতেই সে নর্দ্দমার পাইপের ভিতর ঢুকল। জানতাম ভীত প্রাণী একেবারে পাইপের শেষ প্রান্তে খোলা মাঠে না গিয়ে থামবে না। হ'লও তাই, ছাড়া পেয়ে ইঁদুর পায়ে চিঠি ও চিরুণী নিয়ে চোঁচা দৌড় লাগাল। সুতোর অপর প্রান্ত রইল আমার হাতে। মাঠে পড়ে ইঁদুর নিশ্চয়ই দাঁত দিয়ে পায়ের সুতো কেটে ফেলতে দেরী করে নি। এ কাজটা সে পাইপের মাঝ পথে বসে করলে আমায় সমস্ত প্ল্যান্ই মাটী হ'ত, কিন্তু আশা ছিল নিরাপদ্ দূরে না পৌঁছে ইঁদুর কোন অপকর্ম্ম করবে না। সঙ্গে রঙ্গিন চিরুণী বেঁধে দেবার উদ্দেশ্য আর কিছু না, যাতে জিনিষটা চট্ করে ছেলেদের চোখে পড়ে—এবং তার উপর বালসুলভ একটা লোভ আসে।

"কয়েক ঘণ্টা আমাকে কি ভাবে ধৈর্য্য ধরে ঘরের সুতোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল, এবং সে কাজটা কি ধরণের প্রীতিকর তা বলে লাভ নেই। হঠাৎ দেখলাম সুতোটা তিন বার নড়ে উঠল। আমার চিঠি তা হ'লে যথাস্থানে পৌঁছেছে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একজন চিরুণীর লোভে পড়ে আকৃষ্ট হয়েছিল, তার পর কাগজের লেখা পড়ে (শর্ট হ্যাণ্ডের লেখাটুকু নিশ্চয়ই বোঝে নি) হয়তো কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই রাধামোহনের কাছে যায় এবং দশ টাকার বিনিময়ে রাধামোহনের হাতে কাপড়ের টুক্রোটা অর্পণ করে। ফলে এখন থেকে আমার সহকারী রাধামোহনকে এ ব্যাপারেও আমি সহকারী রূপে পেলাম।

"চিঠি পেয়ে রাধামোহন কিছু টোন সুতো এবং সরু তার নিয়ে সন্ধ্যার অল্প আগে মাঠে হাজির হ'ল। পাইপের মুখ খুঁজে নিতে ওকে বেশী বেগ পেতে হয় নি। প্রথমে ও সিল্কের সুতো তিনবার টেনে ওর আগমনের সঙ্কেত জানাল, আমিও প্রত্যুত্তর দিলাম। তখন ও সিল্কের সুতোর প্রান্তে প্রথমে দু' শ' গজ টোন এবং তার পর টোনের প্রান্তে দু' শ' গজ তার বেঁধে দিল। আমি ধীরে ধীরে কম্পিত হাতে তার সমস্তটা পাইপের অপর মুখে টেনে নিলাম। অর্থাৎ এখন থেকে সমস্ত পাইপ যুড়ে বসান রইল এক লম্বা তার, তার এক দিক্ আমার হাতে, অপর দিকে বাইরে রাধামোহনের হাতে। এই বার এই তারের সাহায্যে আমরা পরস্পরের কাছে চিঠিতে সংবাদ আদান-প্রদান সুরু করলাম, এবং রাধামোহন তারে বেঁধে নানা ছোটখাট প্রয়োজনীয় জিনিষ আমার কাছে পাঠাতে লাগ্ল, আমি তার টেনে নিয়ে সেগুলি হস্তগত করতাম, তার পর সঙ্কেত করলেই রাধামোহন সে তার আবার টেনে নিত। অর্থাৎ—তারটা হ'ল

যেন একটা "রোপ্ ওয়ে"—যা দিয়ে বড় বড় কারখানায় বা পাহাড়ে দেশে মাল চালান করা হয়। এই ভাবে আমার হাতে এল কয়েকখানা দশ টাকার নোট্, কিছু কাগজ, পেন্সিল, ফাউণ্টেন পেন এবং এক বোতল নাইট্রিক্ এসিড্। খানাতাল্লাস হবে আন্দাজ করতে পারলে এগুলি আমি সেই গর্ত্তে পুরে দিতাম। আমার সৌভাগ্য, গর্ত্তের দিকে কারও চোখ পড়ে নি—বা পড়লেও সন্দেহ হয় নি।

"আমাদের এই গোপন ষড়্‌যন্ত্র যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে সেজন্য জেলের কর্ত্তৃপক্ষকে অন্য দিক্ দিয়ে ভাঁওতা দেবার ব্যবস্থা করলাম। প্রথমে দশ টাকার নোট গাঁথা কাপড়ের টুক্‌রোয় লেখা চিঠি, তার পর কাগজে পেন্সিলে লেখা সাঙ্কেতিক চিঠি ইত্যাদি দিয়ে—যাতে কর্ত্তারা মনে করেন আমি পাহারাদারদের ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি।"

সতীনাথ বাবু দম লইবার জন্য একটু থামিলেন, মিঃ আনন্দরাম এই ফাঁকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আমার কাছে সাঙ্কেতিক চিঠিটায় কি লিখেছিলেন? ওটা কি ভাষা?—অসমীয়া, না হিব্রু, না ল্যাটিন, না প্রাকৃত?"

"পরিষ্কার বাংলা, শুধু ফারসীর মত ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে পড়ে যেতে হবে। লেখাটা ছিল এই—'ইনা য়ভ, না বইলাপা বেভাএ মিআ'—তা হ'লে দাঁড়াল গিয়ে 'আমি এভাবে পালাইব না, ভয় নাই।'"

কয়েকজন উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। মিঃ আনন্দরামের মুখ গম্ভীর হইল। সতীনাথ বাবু আবার সুরু করিলেন:

"আর একদিন দুপুর রাত্রে আমার জানলায় ঘ্যাঁষ ঘ্যাঁষ আওয়াজ শোনা গেল, যেন আমি কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে জানলা কাটবার চেষ্টা করছি। ওটারও উদ্দেশ্য কর্ত্তৃপক্ষকে ভাঁওতা দেওয়া—নর্দ্দমার পাইপ্ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ যাতে তাঁদের মনের কোণেও উঁকি মারতে না পারে। 'অস্ত্র'টি আর কিছু না, আমার জুতোর তলায় যে লোহার নাল লাগান ছিল তাই, আপনাদের এই পাথুরে দেশে অনেকেই যা পরেন—জুতো বাঁচাবার জন্য।

"যাক্, এইবার আসল কাজ সুরু করলাম। এবার আমার সহকারী হ'ল নাইট্রিক্ এসিড্—রাধামোহনের সাহায্যে যা সংগ্রহ করা গিয়েছিল। গত কাল থেকে আপনাদের পাহারাওয়ালা আমাকে সারাক্ষণ জানলার পাশে বসে থাকতে দেখেছিল, এবং আমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয় ভেবেছিল আমি নিতান্ত হতাশ হয়েই কোন রকমে সময় কাটাবার জন্য ওভাবে বসে আছি; হয়তো সে রকম রিপোর্ট্‌ও আপনাদের কাছে দিয়ে থাকবে। মুখ ভার করে আমি বসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু চুপ্ করে নয়। আমার হাতে ছিল আমার টুথ ব্রাশ্, তারই গায়ে নাইট্রিক্ এসিড্ লাগিয়ে আমি একটু একটু করে সারাক্ষণ তা জানলার জালির চারপাশে মাখাচ্ছিলাম। নাইট্রিক্

এসিডের পাল্লায় পড়লে অনেক শক্ত ধাতুকেই ঘাল হ'তে হয়। কাজেই গরাদের লোহাও রেহাই পায় নি—একটু একটু করে ক্রমাগতই সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে অবশেষে একদম্ আলগা হয়ে এল। যখন দেখলাম, এবার ইচ্ছা করলেই জানলার গরাদে সরিয়ে বেরিয়ে আসা যায় তখন এক চাল চাললাম। সন্ধ্যা হ'তেই খানিকটা লম্বা তার পাইপ থেকে টেনে নিয়ে তার ডগায় টুথ্‌ব্রাশ্‌টা বেঁধে তা'তে বেশ করে নাইট্রিক্ এসিড্ মেখে নিলাম। তার পর পাহারাদার একটু আড়ালে যেতেই চেয়ারে দাঁড়িয়ে সেটা সন্তর্পণে দিলাম বাইরের ইলেক্‌টি্রকের মেন্ তারে বেশ করে লাগিয়ে। তামার তার, মুহূর্ত্তের মধ্যে গেল গলে—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেল হয়ে গেল ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এদিকে তার অনেক আগেই আমার শার্ট্ খুলে বিছানায় কম্বল দিয়ে এমন কায়দায় ঢেকে রেখেছিলাম যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় একজন লোক বুঝি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ বার বার উঁকি মেরে ঐ দৃশ্য দেখে আর কিছুই সন্দেহ করেন নি।

"তার পর যা বলছিলাম। রাধামোহনের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল সে ইতিমধ্যে এখানকার ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীতে গিয়ে সেখানকার মিস্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে, অন্ততঃ পক্ষে তাদের খাকি 'ইউনিফর্ম্মে'র মত গোটা দুই পোষাক যোগাড় করে রাখবে, এবং যথা সময়ে তার একটি প'রে জেল-ফটকের কাছাকাছি তৈরী থাকবে। রাধামোহনকে এ সব বিষয়ে ভার দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায়। হ'লও তাই। আচম্‌কা জেল অন্ধকার হ'তেই কর্ত্তারা ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীতে ফোন্ করলেন; একটু পরেই যন্ত্রপাতির বাক্স নিয়ে খাকির উর্দ্দি-পরা ছ' জন মিস্ত্রী এসে জেলে ঢুক্‌ল। এদের মধ্যে পাঁচ জন আসল মিস্ত্রী, একজন রাধামোহন। অন্ধকারে উর্দ্দি দেখেই পাহারাওয়ালারা লোক গুণে নিয়ে ছেড়ে দিল, মুখের দিকে আর চাইল না। অন্য মিস্ত্রীরা যখন কাজে ব্যস্ত, রাধামোহন চলে এল আমার ঘরের সামনে। ঘরের নিশানা তাকে আগেই দিয়ে রেখেছিলাম। তার পর তার যন্ত্রপাতির থলিয়া থেকে বেরোল আর এক সেট্ উর্দ্দি—এবং সাবধানে জানলা গলিয়ে বেরিয়ে এসে এই অধমের তা পরিধান করতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী লাগল না। তার পর মিনিট দুইএর মধ্যেই জরুরী যন্ত্র ফেলে আসার অজুহাতে দু'টি উর্দ্দিধারী মিস্ত্রী যখন সদর ফটকে এসে দাঁড়াল তখন পাহারাওয়ালারা কোন বাধাই দেওয়া দরকার মনে কর্‌ল না। তারি পর সে মিস্ত্রীদের পোষাক বদলে হুজুরে হাজির হতে যা দেরী। ঠিক আটটার আগেই বোধ হয় তা হওয়া গেছে।"

সতীনাথ বাবু মুচকি হাসিয়া বক্তব্য শেষ করিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিল একটি নবাগত অর্দ্দালী। সেলাম ঠুকিয়া কহিল, "হুজুর, জেলের ফটক থেকে সেখানকার শান্ত্রী ফোন্ করছে—ইলেক্‌ট্রিকের তার মেরামতির

জন্য ছ' জন মিস্ত্রীকে ভেতরে যেতে দেওয়া হয়েছিল, দু'জন আগেই বেরিয়ে এসেছে, এখন দেখা যাচ্ছে ভেতরে রয়েছে আরও পাঁচজন। ফাউ লোকটিকে কি করা হবে?"

"ছেড়ে দিতে বল।" রাজাবাহাদুর ক্ষীণকণ্ঠে কোন রকমে কথাটা শেষ করিলেন।*

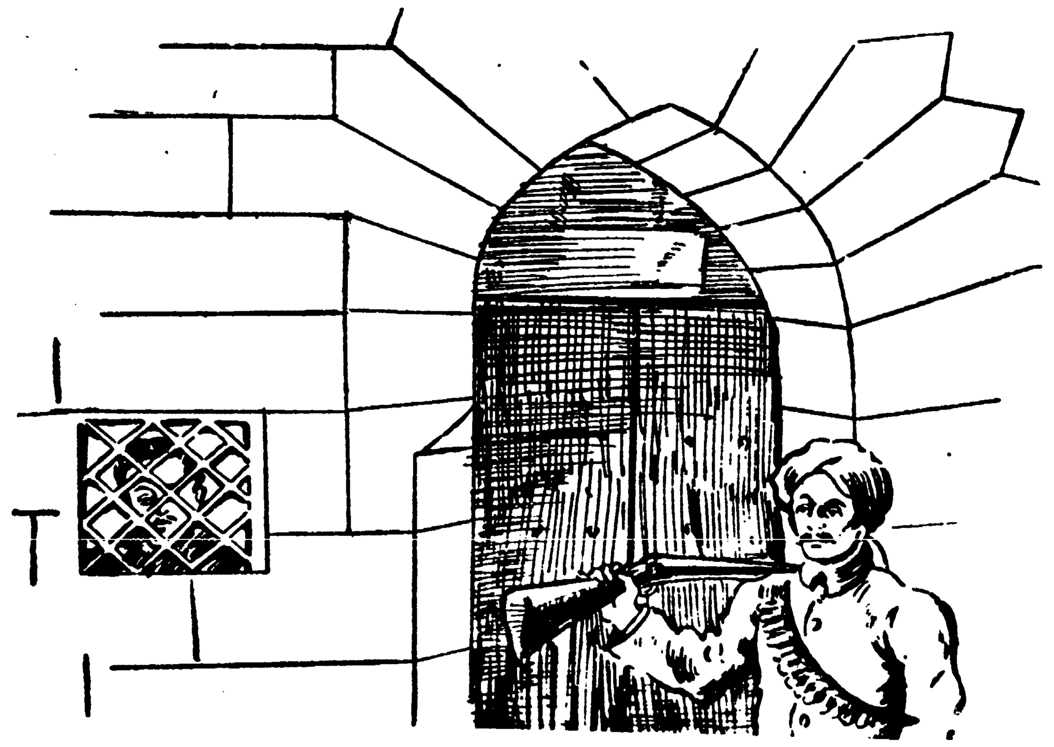

নিঝুম দুপুর

শ্রীবিভাকুসুম চট্টোপাধ্যায়

নীরব দুপুর সূর্য্য যবে ছড়ায় আগুন মাথার উপর এসে,
মেঠো পথে তপ্ত হাওয়ায় বনচারাদের গন্ধ আসে ভেসে।
নিঝুম গাঁয়ের প্রান্ত হ'তে ডাকছে ঘুঘু একঘেয়ে কী সুরে,
আমার গৃহের পথটুকু ওই মাঠের শেষে একটু গেছে ঘুরে।
স্তব্ধক্ষণে কুটীর-মুখে পথ চলেছি একা,
কুঁচ্‌কে ভুরু সেখান থেকে দেখতে পেলেম কাজলা দীঘির রেখা।

শুভ্র ডানা হাওয়ায় মেলে শ্বেতবলাকা কোথায় উড়ে যায়,
হঠাৎ শুনি সুদূর হ'তে ডাক্‌ছে কুকুর কাদের আঙ্গিনায়,

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে

হাল্‌কা বায়ে দুলছে দোদুল বাবুই-বাসা নারিকেলের গাছে,
গাঙের তীরে মাছরাঙাটি শিকার-লোভে নজর রাখে মাছে।
এ পথ দিয়ে প্রতি দিনই যাওয়া-আসা করি,
ধূলায় ধূসর চটী পায়ে আদুর গায়ে মাথায় ছাতা ধরি'।

তীব্র রোদে দীঘির কূলে ধোপারা সব কাপড় কাচে পাটে,
বনের মাঝে কাঠঠোক্‌রা কোথায় বুঝি কি গাছে কাঠ কাটে!
যত এগোই গ্রামের দিকে মৌন বেলা ততই মুখর হয়,
বিশ্ব যেন প্রাণ পেয়েছে—আনন্দেতে কত কথাই কয়!
ক্লান্তি ভুলে দেখি আমি কুটীর পানে চেয়ে,
দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আমার শান্তিরূপা চার বছরের মেয়ে।

তাম্রতত্ত্ব

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

ধাতুর মধ্যে লোহাই বোধ হয় মানুষের সব চেয়ে উপকারী বন্ধু। লোহার পরেই নাম করতে হয় তামার। তামাকে মানুষ এত অজস্র রকম কাজে লাগিয়েছে যে তার ফর্দ্দ দিতে গেলে সে এক বিরাট্ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। পয়সাকড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে বাসন-কোসন, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র—কত কিছুর মধ্যেই না তামা ঢুকেছে! তার পর মানুষ যেদিন থেকে ঘরের কাজে বিদ্যুৎকে লাগাতে শিখল সেদিন থেকে তামার হ'ল এক নতুন রকমের চাহিদা। সস্তা দরের ধাতুর মধ্যে তামার মত বিদ্যুৎ পরিবহন করবার ক্ষমতা—বৈজ্ঞানিকেরা যাকে বলেন "ইলেক্‌ট্রিক্যাল-কণ্ডাক্‌টিভিটি"—আর কোনটারই নেই। কাজেই যত রকম বিজলী-তার আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে সুরু হ'ল তামার অপ্রতিহত রাজত্ব। 'চাই তামা—আরো তামা—আরো তামা'! ছুট্‌ল বৈজ্ঞানিকের দল তামার সন্ধানে।

তামার আর একটা গুণ, অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়ে তামা নানা রকম 'মিশ্র ধাতু' তৈরী করতে পারে। মানুষের নিত্যকার জীবনে এই সব মিশ্রধাতুও কম জায়গা যুড়ে নেই। পিতল-কাঁসা না থাকলে কি অবস্থা হ'ত আমরা আজ কল্পনা করতে পারি না। আর পিতল, কাঁসা, ব্রোঞ্জ, জার্ম্মান্ সিল্‌ভার—এ সবই তৈরী হয় তামার সঙ্গে অন্য ধাতুর খাদ মিশিয়ে। যেমন—তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে হয় পিতল, টিন মিশিয়ে হয় ব্রোঞ্জ, দস্তা ও নিকেল মিশিয়ে হয় জার্ম্মান্ সিল্‌ভার ইত্যাদি। এ ছাড়া অনেক 'তাম্রঘটিত' যৌগিক পদার্থও মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে লাগে।

তামার সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহু দিনের, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। তোমরা বইএ পড়েছ আদ্যিকালের গুহামানব পাথরের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বুনো জন্তু শিকার কর্‌ত; তার পর ক্রমে ক্রমে তারা ধাতুর ব্যবহার শিখল। সেই আদিম ধাতু হচ্ছে তামা—তামা এবং টিন মেশান ব্রোঞ্জ। সেই জন্য সে যুগের নাম দেওয়া হয়েছে 'তাম্রযুগ' বা 'ব্রোঞ্জযুগ' (Bronze Age)। পৃথিবীর নানা জায়গায় তামা প্রায় বিশুদ্ধ ধাতব অবস্থায় সঞ্চিত রয়েছে। এই জন্যই অত পুরাকালেও মানুষ তামার ব্যবহার শিখেছিল। খৃষ্টজন্মের চার হাজার বছর আগেও মিশর দেশে ঢালাই করা তামার জিনিষপত্র ব্যবহৃত হ'ত ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের অধিবাসীরা তামা সংগ্রহ করত সাইপ্রাস্ দ্বীপ থেকে। সেই থেকে তামার নাম হয় "সাইপ্রিয়াম্', তার পর 'কিউপ্রিয়াম্' এবং 'কিউপ্রাম্'—যা থেকে তামার ইংরেজী 'কপার' ও জার্ম্মান্ 'কুপ্‌ফের' শব্দ দু'টির উদ্ভব হয়েছে।

তামা খাঁটী ধাতব অবস্থায় পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে সে কথা আগেই বলেছি। সুইডেনে, ইউরাল পাহাড়ে এবং সুপিরিয়র হ্রদের কাছে এই ধরণের প্রচুর তামা পাওয়া গেছে। সুপিরিয়র হ্রদের কাছে একবার একটা তামার তাল পাওয়া যায় তার ওজন ছিল প্রায় ১১২০০ মণ। এ ছাড়া অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মেশান 'যৌগিক অবস্থায়' পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তামার দেখা পাওয়া যায়,—বিশেষ করে অক্সিজেন, অঙ্গার, লোহা আর গন্ধকের সঙ্গে। বৈজ্ঞানিকেরা এই সব খনিজ পদার্থের নানা নাম দিয়েছেন, যেমন—কিউপ্রাইট্

(তামা আর অক্সিজেন), ম্যালাকাইট্, এজিউরাইট্ (তামা, অঙ্গার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন) চ্যাল্‌কোসাইট্ (তামা ও গন্ধক), চ্যাল্‌কোপায়রাইট্ বা কপার পায়রাইট্ (তামা, লোহা আর গন্ধক) ইত্যাদি। এদের মধ্যে কপার পায়রাইট্‌টাই বেশী উল্লেখযোগ্য, তাই কপার পায়রাইট্ থেকে কি ভাবে তামা বার করা হয় সেই গল্পই আজ বলা যাক্। অবশ্য দেশ ভেদে আরগুলি থেকেও তামা বার করার যথেষ্ট রেওয়াজ আছে।

আরও কতকগুলি জিনিষের মধ্যে তামার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা থেকে তামা সংগ্রহ করতে যাওয়া বিশেষ লাভজনক নয়। যেমন মানুষের রক্তে, যকৃতে (লিভার), কিড্‌নিতে, কোন কোন সামুদ্রিক গাছগাছড়া এবং পোকার শরীরে, কোন কোন জাতের ঘাসে, পাখীর ডিমে তামা মেশান রয়েছে।

তামার খনি একটা দেখবার জিনিষ। বিশেষতঃ আধুনিক বড় বড় খনি আর কারখানাগুলি। এগুলিকে এক-একটা বড় বড় সহর বলা যেতে পারে। তামার চাহিদা এত বেশী এবং দাম এত কম যে খুব বড় আকারে ব্যবসা সুরু না করলে নাকি খরচ পোষায় না। বেশীর ভাগ জায়গায়ই খনি আর কারখানা প্রায় এক জায়গাতেই থাকে, তবে স্থান বিশেষে যে কারখানাগুলিকে খনি থেকে কিছু দূরেও বসান হয় না এমন নয়।

মাটীর ওপর থেকে সুরু করে তামার খনি অনেক সময় শত শত ফুট গভীর হয়। বৈদ্যুতিক শ্যাফ্‌ট্ বা লিফ্‌টে চড়ে শ্রমিকেরা তার মধ্যে নামে। তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তামা-মেশান পাথরের গায়ে বৈদ্যুতিক বা ঘন চাপে চালিত যন্ত্র দিয়ে লম্বা লম্বা ফুটো তৈরী করা। এই ফুটোগুলো এক-একটা প্রায় ৭।৮ ফুট লম্বা হয় (চওড়ায় ইঞ্চি খানেক)। তার পর সেই ফুটোয় মোমবাতির মত লম্বা লম্বা ডিনামাইটের টুক্‌রো ঢুকিয়ে তার মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলেই হ'ল। ভীষণ শব্দে চারদিক্ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে তামা-পাথর গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এবার সেগুলো কোদাল দিয়ে তুলে গাড়ী বোঝাই করলেই হ'ল।

মালগাড়ী বোঝাই হয়ে তামা মেশান পাথর (চ্যালকোপায়রাইট্ বা কপার পায়রাইট্) কারখানায় আসে। গাড়ী খালি করা ব্যাপারটাও একটা দেখবার

জিনিষ। ধীরেসুস্থে ঝুড়ি করে করে তুলে গাড়ী খালি করবার মত সময় দিলে চলে না; বিরাট্ কারখানা, তার সবই বিরাট্, কাজকর্ম্মও তেমনি দ্রুতগতিতে হওয়া চাই। খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলিও তাই যতটা সম্ভব কলের সাহায্যেই সারা হয়। মালগাড়ীগুলো সটান চালিয়ে দেওয়া হয় এক একটা বিরাট্ রোটারী যন্ত্রে। এই ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ীকে গাড়ী উপুড় করে দিয়ে তার সমস্ত মাল খালাস করে নেওয়া হয়; খালি গাড়ী চলে যায়, পরমুহূর্ত্তে আর একটা গাড়ী এসে তার জায়গা দখল করে।

এইবার সুরু হয় আসল তামা 'তৈরীর' কাজ। এর সম্পূর্ণ বিবরণ এত ছোট প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব, লিখে বোঝানও আমার সাধ্য নয়। তা ছাড়া কয়েক রকম প্রণালী আছে, এক-এক কারখানায় তার এক-একটা অনুযায়ী কাজ হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখানে শুধু তার একটার একটু আভাস দেব।

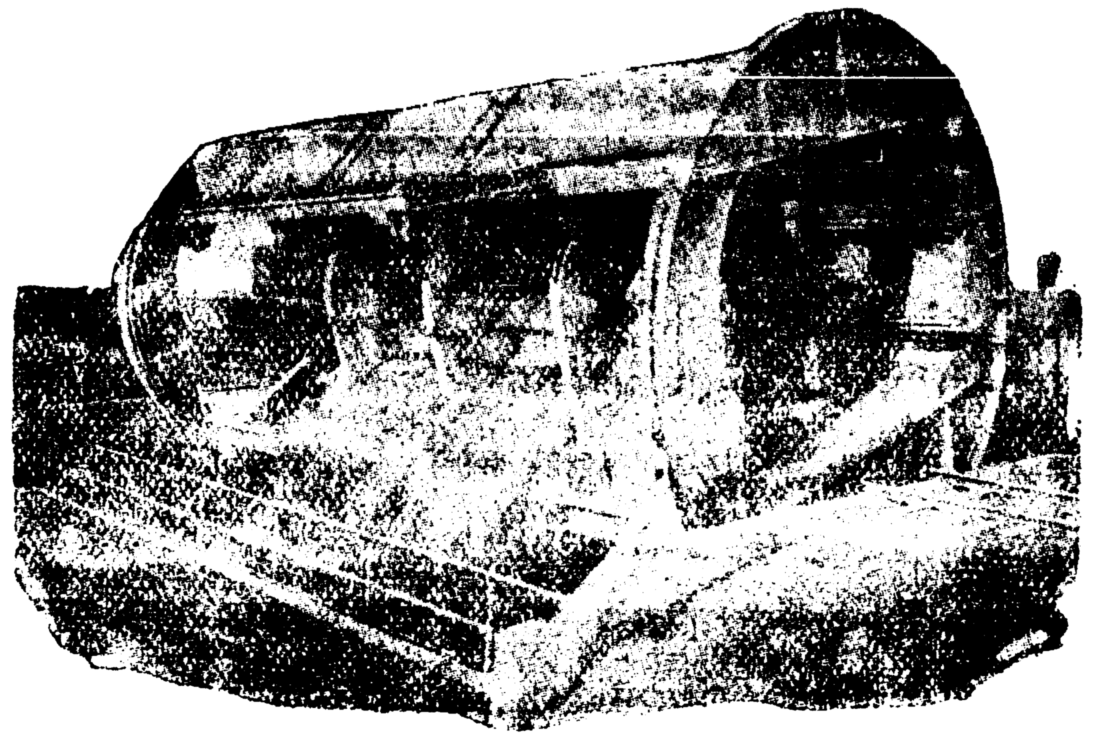

তামার কারখানার একটি দৃশ্য। রোটারী যন্ত্রের সাহায্যে মালগাড়ী থেকে মাল খালাস করা হচ্ছে।

প্রথমেই 'তামা-পাথর' গুলো এনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইস্পাতের তৈরী "ক্রাশার"যন্ত্রে মিহি করে গুঁড়ো করে ফেলা হয়। তার পরে তার সঙ্গে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয় 'চালুনী' যন্ত্রে। চ্যাল্‌কোপায়রাইটের সঙ্গে যে সব ভেজাল থাকে তার অনেকখানিই এখানে আলাদা হয়ে যায়। এইবার আসল জিনিষটা আসে অনেকটা জমাট বেঁধে। সেই প্রায়-জমাট-বাঁধা গুঁড়ো নিয়ে পর পর কয়েকটা জ্বলন্ত চ্যাটাল চুল্লীর মধ্যে পোড়ান হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে অধিকাংশ গন্ধক

যায় পুড়ে—সেগুলি সংগ্রহ করে তা দিয়ে অন্যত্র 'সালফিউরিক্ এসিড' তৈরী হয়, আর গন্ধক পোড়ার দরুণ যে তাপ বেরোয় তাকেই লাগান হয় চুল্লী গরম করার কাজে।

এর পরবর্ত্তী স্থান হচ্ছে গিয়ে আর একটা বড় চুল্লী—তাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন 'রিভারবিরেটরী চুল্লী'—সংক্ষেপে 'রিভার্ব্‌স্'। এগুলি এমন ভাবে তৈরী যে এর ভিতরকার উত্তাপ প্রায় ২৮০০ থেকে ৩১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়। এ উত্তাপটিকে নেহাৎ হেলফেলার চীজ্ মনে ক'র না,—সূর্য্যিমামার বাইরেটায় যে উত্তাপ এ উত্তাপ তার প্রায় অর্দ্ধেক। সুতরাং মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা সহজ ব্যাপার নয়। এ চুল্লী নিয়ে যাদের নাড়াচাড়া করতে হয় তাদের অবস্থাটা ভাব। তবে গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য যতটা ব্যবস্থা করা যায় তার ত্রুটী করা হয় না। এই চুল্লীতে গন্ধক প্রায় সবটাই পুড়ে যায়, লোহারও অনেকখানি বালি জাতীয় পদার্থের সঙ্গে (যা ঐ সঙ্গে মেশান হয়) মিশে বেরিয়ে আসে, পড়ে থাকে কিছু লোহা মেশান তামা। এখন এই লোহাটুকু দূর করতে পারলেই হ'ল। সমস্ত জিনিষটাকে এইবার নিয়ে যাওয়া হয় আর একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রে—তার নাম 'কন্‌ভার্টার'। দেখতে এটা অনেকটা ঘটি আর পিপের মাঝামাঝি—ভিতরে প্রায় পৌণে দু'শ' মণ মাল ধরে। কন্‌ভার্টারের মধ্যে গরম বাতাস তোড়ে চালিয়ে দেওয়া হয়। ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই সমস্ত লোহা পৃথক্ হয়ে অন্য জিনিষের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, সামান্য গন্ধক যদি কিছু থেকে গিয়ে থাকে, তাও এখানে বেরিয়ে যায়। কন্‌ভার্টারের কাজ শেষ হ'ল কিনা বুঝতে হ'লে খুব অভিজ্ঞ লোকের দরকার। চোখে মোটা রঙ্গিন চশমা পরে আগুনের ফুল্‌কির রং দেখে এটা ঠিক করা হয়। প্রথমে কমলা, তার পর হলদে, লাল, সাদা এবং অবশেষে নীল আলো দেখা গেলে বোঝা যাবে কাজ শেষ হয়ে এল। অবশেষে কন্‌ভার্টার থেকে তরল তামা বার করে ফেলা হয়। এগুলিই বাজারের চলতি তামা—মোটামুটি বিশুদ্ধই বলা যেতে পারে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে যে তামা ব্যবহার করা হয় তা একেবারে সম্পূর্ণ খাঁটী হওয়া দরকার। এজন্য বাজারের তামাকে আবার

পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার রেওয়াজ আছে। প্রকাণ্ড একটা পাত্রে থাকে এসিড মেশান 'কপার সালফেট্' (তুঁতে), তার মধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ তামার পাত আর এই সব অবিশুদ্ধ তামার চাঁই বসিয়ে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে যোড়া থাকে বিদ্যুতের কল। সুইচ্ টিপে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিতেই তামার চাঁই থেকে বিশুদ্ধ তামা গলে এসে খাঁটী তামার পাতে গিয়ে জমে, আর অন্যান্য মেশাল ধাতু (লোহা, দস্তা ইত্যাদি) তুঁতের সঙ্গে মিশে নতুন একটা যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। অবিশুদ্ধ তামার সঙ্গে অনেক সময় খানিকটা সোনা-রূপাও থাকে, এগুলি পাত্রের নীচে জড় হয়। এগুলির দামও বড় কম নয়।

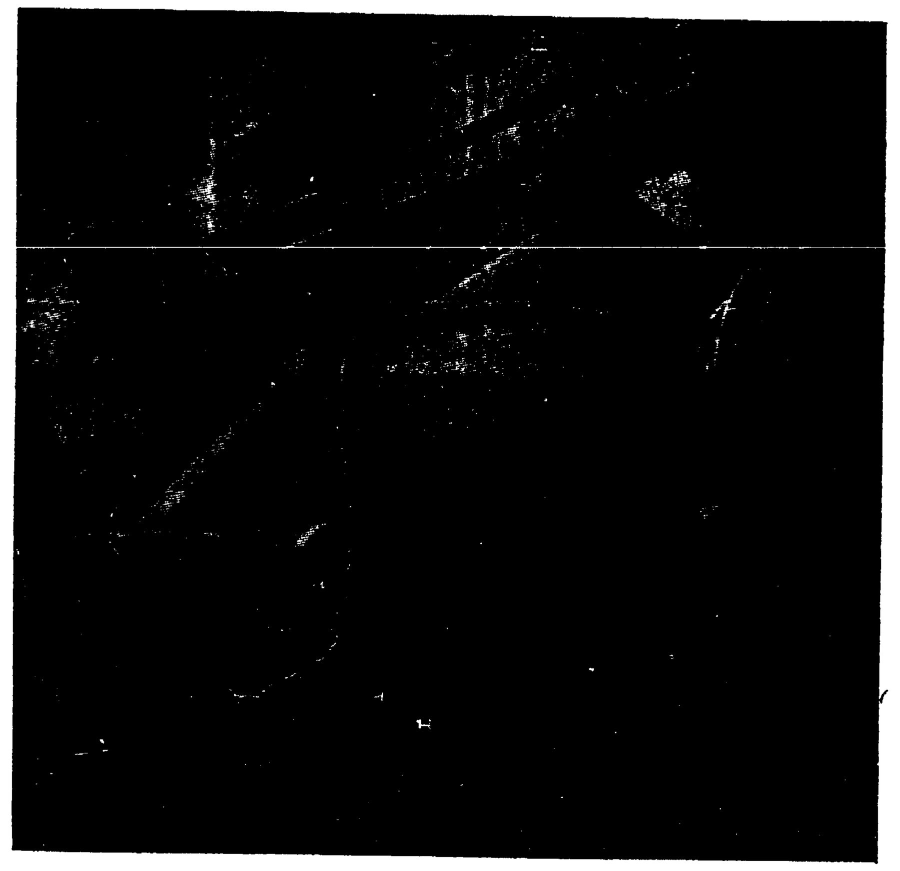

তামার কারখানার আর একটি দৃশ্য। সামনের যন্ত্রই হচ্ছে 'কন্‌ভার্টার'।

পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকাতেই তামা পাওয়া যায় সব চেয়ে বেশী। ১৯৩৪ সনের এক হিসেবে দেখেছিলাম আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সে বছর প্রায় ৫৯ লক্ষ মণ তামা 'তৈরী' হয়েছিল। 'চিলি' দেশে হয়েছিল আরও বেশী—প্রায় ৭২ লক্ষ মণ। এ ছাড়া আফ্রিকায় এবং কানাডায়ও প্রচুর তামা 'তৈরী' হয়েছিল। সমস্ত পৃথিবীতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় চার কোটি থেকে সাড়ে চার কোটি তামা উৎপন্ন হয়।

আমাদের ভারতবর্ষেও কিছু কিছু তামা পাওয়া যায়। আগে দক্ষিণ ভারতে, রাজপুতানায়, হিমালয় অঞ্চলে কুলু, সিকিম, ভুটান, গাড়োয়াল প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর তামা উৎপন্ন হ'ত। বর্ত্তমানে ঘাটশিলার কাছে মসাবিনী তাম্রখনির নাম হয়তো তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। এখানে খনি থেকে তামা-পাথর তুলে ক্রাশার

যন্ত্রে গুঁড়ো ক'রে রোপ্‌ওয়ের সাহায্যে ছ' মাইল্ দূরে মৌভাণ্ডার কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নানা প্রক্রিয়ার পর প্রায় বিশুদ্ধ তামা শত করা ৯৯·৭ ভাগ তামা) বেরিয়ে আসে। এর কতক বাজারে বিক্রী হয়, বাকীটা দিয়ে পিতল-কাঁসা প্রভৃতির চাদর তৈরী করা হয়।

ফ্রান্সের একটী সহরে

(শ্রীঅমলশঙ্কর রায়)

১৯৩৮ সালে ইউরোপের যে চিত্র দেখেছি সে চিত্র আর কখনও দেখতে পাব কিনা জানি না। তবে বর্ত্তমানে রূপ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। স্বাধীন প্যারিসের সে হাসিমুখ, মানুষের হাতে তৈরী লণ্ডন সহরের সৌন্দর্য্য, প্রাগের সে সাম্যভাব এখন কোথায়?

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

আজ মাত্র বছর তিনেক কেটেছে, তারই ভিতর কত পরিবর্ত্তন! অদ্ভুত এই মানব-ইতিহাসের রূপকথা। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বড় বড় পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার ভিতর বেশীর ভাগ আবর্ত্তনই ঘটেছে প্রকৃতির অত্যাচারে, আর বাকীগুলোর জন্য দায়ী মানুষ নিজে। প্রকৃতির খেয়ালে যে সব অঘটন ঘটেছে তার কয়েকটার কথা বলি। যেমন, ভিসুভিয়সের আগ্নেয়গিরির প্রতাপে পম্পাই সহরের ধ্বংসপ্রাপ্তি, সমুদ্র ও ঝড়ের নিষ্ঠুর কোপে প্রকাণ্ড টাইটানিক জাহাজের

বিলুপ্তি, বন্যার চাপে বাংলার সরল, দরিদ্র গ্রামবাসীদের নির্ম্মম দুরবস্থা প্রাপ্তি। কিন্তু এক জাতির মানুষ আর এক জাতির মানুষের কম ক্ষতি করে নি। তার প্রমাণ গ্রীস, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, ইউগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা।

ইউরোপ আজ যুদ্ধে রত। যেদিন যুদ্ধ শেষ হবে সেদিন ঐ সব দেশের ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মনে আবার হয়তো নতুন কত স্বপ্ন জেগে উঠবে। পূর্ব্বের ভাঙ্গা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী ও প্রাসাদের উপর তাদের মনে হয়তো তাচ্ছিল্যের ভাব জাগবে। মনে হবে, ওগুলি যেন কত পুরানো, কত প্রাচীন! তারা আবার গড়বে নতুন নতুন বাড়ীঘর, রাস্তা, মস্তিষ্ক থেকে বের করবে নতুন ধরণের কত শিক্ষা-প্রণালী। ফলে দেখা দেবে কত অভিনব ধরণের জীবনের ধারা। এক একটা বড় বড় যুদ্ধ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার উপর কত দূর প্রভাব বিস্তার করে তার পরিচয় দেবে অতীত যুগের ইতিহাস।

আজ যে সহরের কথা লিখতে বসেছি বিশেষ করে সে সহরের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তা আমার জানা নেই। তবে সমগ্র ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থার কথা তোমরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু জান, আশা করি। সে কথা নিয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে লিখব শুধু একটী সহরের কথা—তাকে যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন দেখেছিলাম। ইংরেজেরা তার নাম দিয়েছে 'লিয়নস্'। কিন্তু ফরাসীবাসী বলে, 'লিয়োঁ'। লিয়োঁ তাদের বড় প্রিয় সহর। সহরটী একটী প্রসিদ্ধ কর্ম্মশিল্পের কেন্দ্র বটে, কিন্তু কলাবিদ্‌রাও লিয়োঁ বলতে অস্থির। সহরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে একটা বেশ চওড়া নদী। দু'পারে সুন্দর বাঁধানো ও গাছের সারি দিয়ে সাজানো রাস্তা। গাছের নীচে পাতা সারি সারি বেঞ্চ। বেঞ্চগুলি খালি পাওয়া শক্ত। সকালের দিকে দেখতে পাওয়া যায় বহু অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে নদীর দিকে চেয়ে বসে আছেন। দুপুরে অনেক কাজের মানুষ কাজের ফাঁকে দু'দণ্ড বসে আরাম করে ও বিকালে অজস্র মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নদীর পাড়ে। নদীর কোলে ষ্টিমার ও নৌকাও ভাসে,—কিন্তু তাদের ব্যবহার সাধারণতঃ বাড়ে ছুটীর দিনে। ইউরোপের লোক পরিশ্রমও করে অক্লান্ত,

অবসরও গ্রহণ করে প্রচুর। দুইয়ের সমন্বয় তাদের শরীরে দেয় শক্তি, মন রাখে প্রফুল্লময় করে ও জীবনে দেয় বাঁচবার অদম্য বাসনা।

যাক্, বলছিলাম লিয়োঁর কথা। আমার হোটেলের পাশ দিয়ে উঠে গেছে একটা পাহাড়। সে পাহাড়ে জঙ্গল এক রকম সাফ করে ফেলা হয়েছে ও তার উপর গড়ে উঠেছে বহু বাড়ী ও কয়েকটী সুন্দর সুন্দর হোটেল।

ফরাসী ভাষা ভাল না জানাতে সহরটা তেমন ভাল করে দেখা হয়ে উঠল না। কিন্তু যত দূর দেখেছি, সহরটা বেশ বড় বলেই মনে হ'ল। যেটা সহরের প্রধান রাস্তা তার দু'ধার দিয়ে উঠে গেছে উঁচু উঁচু বাড়ী ও অজস্র দোকান পসার। রাস্তায় কোন কোন স্থলে কথা বলার দরকার হয়েছিল, কিন্তু দেখলুম বহু লোকেই কোন বিদেশী ভাষা জানে না, পুলিসেরাও নয়। আর লণ্ডন অথবা বার্লিনের পুলিসদের ভিতর যে ভদ্রতার পরিচয় পেয়েছিলুম এখানে সেটা পেলুম না,—পূর্ব্বে প্যারিসেও পাই নি।

ঘুরে ঘুরে ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল। একটা রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলুম, কিন্তু সেখানে কেউ বিদেশী ভাষা না জানাতে বেরিয়ে আসতে হ'ল। আর একটাতে ঢুকলুম, সেখানেও তাই। তার পর আরও একটা। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে শেষে একটা ইংরেজী-জানা রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। বেশ সুন্দর রেস্তোরাঁটি, তাদের রান্নাও ভাল। ফরাসী রান্না আমার কাছে ইংলণ্ড অথবা জার্ম্মান্ দেশীয় রান্নার চেয়ে বেশী ভাল লেগেছে। তার কারণ, ফরাসীরা মাছ বা মাংস রাঁধলে তার ভিতর আমাদের দেশী রান্নার মতন মসলা ব্যবহার করে। যে লোকটীর হাতে আমাকে খাওয়াবার ভার পড়েছিল সে শুনলুম ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে যোগদান করেছিল ও তাই ইউরোপের বহু দেশ ঘুরেছে। খাবার দেবার ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় একটু আলাপ করে গেল ও জানিয়ে গেল আমার খাওয়া হয়ে গেলে সে আমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করতে চায়। তখন সে বেলার মতন রেস্তোরাঁ গোটানোর সময় হয়ে এসেছে। মনে হ'ল আমার খাওয়া হয়ে গেলেই তারা ঘর ও টেবিল ধুতে সুরু করবে।

লোকটী দেখলুম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। কারণ তার বিশ্বাস

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ইউরোপের যে কোন দেশের চেয়ে বেশী শান্তিময়। সে বলে, ইউরোপের মানুষ ধন, দৌলত ও ঐশ্বর্য্য পেয়েছে প্রচুর কিন্তু তবু তাতে তার তৃপ্তি নেই, সে আরও চায়। এই অতৃপ্তি ও লোভই তার বর্ত্তমান দুঃখকষ্টের মূল। তার বিশ্বাস, এসিয়া ও আফ্রিকার মানুষ অল্পেতে তুষ্ট ও তাই তাদের জীবন বেশী শান্তিময়। তার আরও বিশ্বাস, ভারতবর্ষে দারিদ্র্য বলে কোন জিনিষ নেই। আর এ দেশে নাকি সকলেরই কিছু না কিছু জমি-জমা আছে। ইউরোপের দেশগুলির মতন বড় বড় ব্যবসা ও বাণিজ্য এখনও এদেশে আরম্ভ হয় নি। সে বল্‌ল, "যদি কিছু টাকা পয়সা উপার্জ্জন করতে পারি তো ভারতবর্ষ, চীন অথবা মিশরে গিয়ে বাসস্থান গড়ব, ইউরোপের এত বেশী ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যেন প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে। চাই একটু নির্জ্জনতা, একটু শান্তি।" ইউরোপের ধনী দেশগুলিতে ভারতবর্ষ অথবা চীনের চেয়ে বেশী ধন-দৌলত আছে এ কথা ঠিক, কিন্তু ভারতবর্ষে কেউ গরীব নয় এমন অদ্ভুত-কথা তাকে কে বল্‌ল জানি না।

বস্ত্রবিজ্ঞান-ব্যবসায়ীদের কাছে লিয়োঁ বিশেষ পরিচিত, কারণ লিয়োঁ ফরাসী রেশমের একটী শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তাই দেখলুম ষ্টেশনের আশে-পাশে বহু বিদেশী-জানা হোটেল, ও সেগুলি বছরের সব সময়েই প্রায় ভর্ত্তি থাকে। বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করার দিকে এর আগে ফরাসীরা খুব বেশী ঝোঁক দেয় নি। তাদের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স, আর ফরাসী মাল প্রচুর বিক্রি হ'ত তাদের উপনিবেশগুলিতে। ফ্রান্সের উপনিবেশ নেহাৎ কম ছিল না, ধরতে গেলে ইংরেজদের পরেই তাদের নাম করতে হয়। সারা পৃথিবীময় সেগুলি ছড়ান। যেমন ধর, এসিয়ায় পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের কয়েকটী সহর, ইন্দো চায়না, আফ্রিকায় মাডাগাস্কার, মরোক্কো, সাহারা প্রভৃতি ও দক্ষিণ আমেরিকারও কিছু কিছু অংশ। এ ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের আশে-পাশে দু'চারটী দ্বীপও তাদের ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ দেশে দেশে ব্যবসাক্ষেত্রে যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জেগে উঠল তাতে ফরাসী ব্যবসাদারদের পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গেই নানা রকম আদান-প্রদান আরম্ভ করতে হ'ল। সত্যি কথা বলতে, ফ্রান্স দেশটার একটু ভাল করে পরিচয় নিয়ে দেখলাম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও নানা রকম কলাবিষয়ে

পৃথিবীতে ফ্রান্সের আসলে যে স্থান অনেক বিদেশী তাকে তার চেয়ে একটু ছোট করেই দেখেছে। ফ্রান্সের অনেক বিষয় আমাকে তেমন মুগ্ধ করতে পারে নি, কিন্তু তাদের জ্ঞানের আগারে তাদের সত্যিকার প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলাম। এই জন্যই ইউরোপের যে অংশেই বেড়িয়েছি বারে বারে ফ্রান্সের কথা মনে পড়েছে, এবং আজও পড়ছে।

১৩

আজ তিন দিন হইল সুশান্তরা জাহাজ ছাড়িয়া আসিয়াছে। ওদিকে অশোকও তাহাদের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এখানে আর দেরী না করিয়া এইবার ফেরা কর্ত্তব্য। সুশান্ত কহিল—"এখন আর বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কাজ নেই, কারণ ম্যাপে স্পষ্টই বল্‌ছে এই নদীটা ধরে গেলে সব চেয়ে শীঘ্র আমরা সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছুব। বড় জোর সাত মাইল পথ হবে; এই সামান্য পথ আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অতিক্রম করতে পারব। কিন্তু যাত্রা করবার পূর্ব্বে আমাদের আর একটি কর্ত্তব্য আছে। যাঁর দয়ায় আমরা এই দ্বীপ সম্বন্ধে এতখানি জান্‌তে পার্‌লাম তাঁর প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য।" তখন চারিজনে মিলিয়া সেই বীচ্ গাছের তলায় একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর কঙ্কালটিকে টানিয়া আনিয়া সমাধিস্থ করিল। কবরের উপর একটা কাঠের ক্রুশ পুঁতিতেও তাহারা ত্রুটি করিল না।

তার পর গুহায় ফিরিয়া তাহারা গুহার দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল—যাহাতে কোন বন্য জন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। আজ হইতে এই গুহাই যে তাহাদের বাসগৃহ।

সেখান হইতে নদীর নিকটে গিয়া তাহারা নদীর দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিতে

লাগিল। বেশ পরিষ্কার পথ, বিশেষ ঝোপঝাড়ও সে পথে নাই। হ্রদ হইতে প্রথম তিন মাইল নদীর গভীরতা অত্যন্ত বেশী; নদীতে বিশেষ টানও নাই। সুশান্তর মনে হইল জোয়ারের সময় এই নদীতে বেশ সহজে নৌকা চালানো যাইবে। কাঠের একটা ভেলা প্রস্তুত করিয়া জাহাজের জিনিষগুলি এই নদী দিয়া আনিতে তাহাদের কোন কষ্ট হইবে না। বেলা চারিটার সময় তাহাদের কিন্তু বাধ্য হইয়া নদীর তীর ছাড়িয়া উপরে উঠিতে হইল। নদী এখানে একটা দুস্তর জলাভূমির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সেই পচা আগাছাপূর্ণ জলাভূমির কোন কূল-কিনারা নাই। তাহার উপর হইয়া আছে যত রাজ্যের চেঁচো ঘাস ও নলখাগড়ার জঙ্গল। বিলের কিনারায় নিবিড় বেত-ঝোপ ও শরাল, কুকৃসিমের জঙ্গল ও বড় বড় কাঁটা গাছের ঝাড়। সে পথে নৌকাও চলিবে না, মানুষও হাঁটিতে পারিবে না। তাই তাহাদের বাধ্য হইয়া পুনরায় বনপথ ধরিতে হইল। চলিতে চলিতে তাহাদের অনেক বার গাছপালা কাটিয়া পথ করিয়া লইতে হইল! সে এমন নিবিড় জঙ্গল সে দুই পা অগ্রসর হইলেই চারিদিক্ হইতে পথ বন্ধ হইয়া যায়। ক্রমশঃ সন্ধ্যা নামিয়া আসিল তবুও সেই প্রকাণ্ড জলার শেষ নাই। বাধ্য হইয়া তাই তাহারা অরণ্যভূমি ধরিয়া চলিল।

সূর্য্য অনেকক্ষণ হইল অস্ত গিয়াছে; সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আর চারিদিক্ ভালভাবে দেখা যাইতেছে না; তবুও তাহারা সেই বনপথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা যখন সাতটা তখন তাহারা প্রথম বুঝিল যে তাহারা পথ ভুলিয়াছে,—ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল অন্য দিকে চলিতেছে। একজন প্রস্তাব করিল, আর মিথ্যা চেষ্টা না করিয়া সেই রাত্রির মত বনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল। কিন্তু সুশান্ত দাঁড়াইতে চাহিল না, সে মরিয়া হইয়া বলিল—"চল, আমরা সোজা পশ্চিম দিকে যাই, তা হ'লে যত রাত্রিই হোক্ না কেন, শেষে সমুদ্রতীরে গিয়ে উঠ্ব।" রঞ্জিৎ কহিল—"কিন্তু ম্যাপটা যে ভুল আঁকা নেই তাই বা কে জানে? হয়ত বাস্তবিক এই নদীটা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে নি।" সুশান্ত কহিল—"কি বল্‌ছ তুমি রঞ্জিৎ! ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ অত বৎসর এই দ্বীপে বাস করে অত কষ্ট ক'রে ম্যাপ্‌খানা এঁকেছেন, আর তা তুমি বল্‌ছ ভুল!" রঞ্জিৎ তবুও কহিল—"আমার ত মনে হয় ম্যাপটা আগাগোড়াই ভুল।" সুশান্ত কহিল—"অর্থাৎ এটা দ্বীপ নয়, এই বল্‌তে চাও তুমি?" রঞ্জিৎ কহিল—"এটা যে দ্বীপ তা আমি এখনো বিশ্বাস করতে পার্‌ছি না।"

এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতে করিতে তাহারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। চারিদিকে বনের মধ্যে ঘর্ ঘর্ করিয়া সন্দেহজনক শব্দ উঠিতে লাগিল। তিন জনে সুশান্তকে কত নিষেধ করিল, কিন্তু সুশান্ত সমস্ত কথা উপেক্ষা করিয়া সোজা পশ্চিম দিকে চলিল। এখন আর বনের সেই নিবিড়তা নাই। চারিদিক্ খুব ফাঁকা। কিন্তু কি ভীষণ অন্ধকার! হঠাৎ সুশান্তর চোখে পড়িল গাছপালার অন্তরালবর্ত্তী দূর

দিগন্তকোলে একটা আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। জমাট্ অন্ধকার পারে সেই রক্তাক্ত আলো দেখিয়া প্রথমে সকলেই ভয় পাইয়া গেল। উহা আলেয়া না জঙ্গলা জলার কোন পিশাচ! নীলাদ্রি কহিল—"সুশান্ত, ও কি?" রোহিতাশ্ব কহিল—"নিশ্চয় আলেয়া।" রঞ্জিৎ নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কহিল, "আকাশের উল্কা বলে মনে হচ্ছে; দেখছ না কত উপরে জ্বল্‌ছে?" বাস্তবিকই সেটা আকাশের মাঝে জ্বলিতেছিল। সুশান্ত কিন্তু বিচলিত হইল না, ভাল করিয়া দেখিয়া সহজকণ্ঠে বলিল—"তোমাদের এত ভয় রঞ্জিৎ? ও যে জাহাজের উপর আগুন জ্বল্‌ছে! এ নিশ্চয় অশোকের কাজ; আমাদের পথ দেখাবার জন্য সে আগুন জ্বেলে রেখেছে।" দূর হইতে তাহারা যাহাকে আলেয়া বলিয়া ভয় করিয়াছিল এখন কাছে আসিয়া দেখিল, সত্যিই সেটা একটা সামান্য ছোট্ট আগুন। তখন রঞ্জিৎ সঙ্কেত করিয়া বন্দুকের শব্দ করিল। এক মিনিট পরেই জাহাজ হইতে বন্দুকের প্রত্যুত্তর আসিল। যাক্, অশোক বুঝিয়াছে যে তাহারা এত রাত্রে ফিরিতেছে। তার পর তাহারা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। এইচ, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ॥০

ছোটদের উপযোগী কবির জীবনী। কবির জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় কাহিনী গল্পের মত লোভনীয় ভাষায় লেখা হয়েছে। বইখানি সময়োপযোগীও বটে। কবিকে ভাল করে জানতে হ'লে এ ধরণের বইএর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

শুধু হাসির গল্প—(১ম ভাগ) শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত। শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ। ৫৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ॥০

এটি একটি হাসির গল্পের সঞ্চয়ন। ৺সুকুমার রায়চৌধুরী, ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিকের রচনা এতে দেওয়া হয়েছে, কাজেই পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেকটি গল্পই নির্ম্মল হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। ইংরেজীতে এই ধরণের সঞ্চয়ন অনেক আছে, কিন্তু বাংলায় এতদিন ছিল না বল্‌লেই হয়, সম্প্রতি কয়েকখানি বেরিয়েছে বটে কিন্তু আরও প্রয়োজন আছে। আলোচ্য গ্রন্থ-সম্পাদক শীঘ্রই এর আরও কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

বইটির রচনাগুলি যেমন উচ্চাঙ্গের, ছাপা ঠিক তেমনটি হয় নি। আশা করি পরবর্ত্তী

খণ্ডগুলি প্রকাশের সময় প্রকাশক এ বিষয়ে আর একটু দৃষ্টি দেবেন। তবে শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা মলাটের ছবিটি সুন্দর।

শুকসারী—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য। আলো সাহিত্য সঙ্ঘ, ৪১-ডি, একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত অজয় ভট্টাচার্য্য অতি অল্প দিনে সঙ্গীতকার হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। বাংলায় এমন জায়গা খুব কমই আছে যেখানে তাঁর গান নিয়মিত শুনতে না পাওয়া যায়। এর থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। এই বইতে তাঁর বিখ্যাত গানগুলি থেকে ১০০টি গান বেছে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ছায়াচিত্রের বহু বিখ্যাত গানও এর মধ্যে আছে। গীতরসিকদের কাছে বইখানির খুবই আদর হবে সন্দেহ নেই। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর, মলাটটিও বেশ সুদৃশ্য।

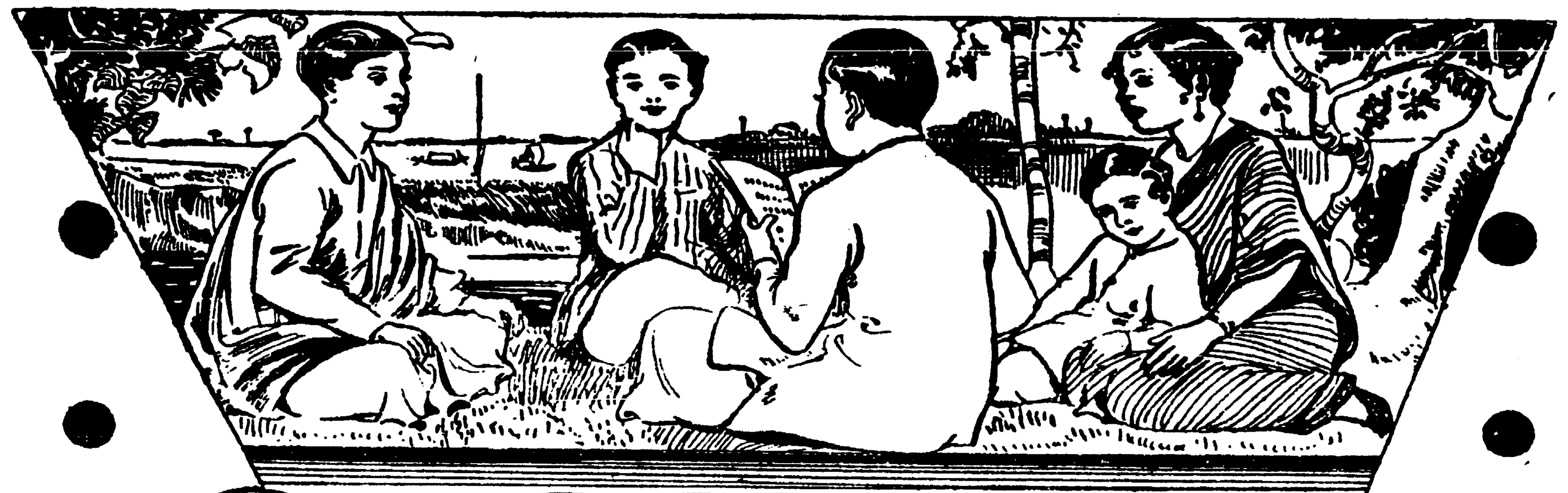

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

বিদায় গোধূলি

[রবীন্দ্র-স্মরণে]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ-আকাশ ফেলে দীর্ঘ ছায়া ধরণীর বুকে,
উচ্ছ্বসিত হাহাকার ভারাক্রান্ত পবনের মুখে।
বিদায়-গোধূলি ঘিরে ওঠে ফুটে নির্ব্বাণের ছবি,
জাহ্নবী-কল্লোল মাঝে অস্ত গেল ভারতের রবি।

দেখেছিনু এ রবিরে শরতের নির্ম্মেঘ আকাশে,
কেতকীর মধু হাস্যে, চামেলীর সুগন্ধি নিঃশ্বাসে।
হেমন্তে সোনার ক্ষেতে ছুটেছিনু তার পিছু পিছু,
আঁকা বাঁকা মেঠো পথে,—মানি নাই কোন বাধা কিছু।
পৌষের কুহেলী সাঁঝে ঝরাপাতা দেবদারু-বনে
গোলাপের গান গেয়ে ফিরেছিনু কম্পিত চরণে।
বাসন্তী প্রভাতে জাগি, দক্ষিণার মলয় পবনে
চন্দন-মর্ম্মর মাঝে বিহগের অস্ফুট কূজনে
শুনেছিনু বাঁশী তার, দেখেছিনু তারে বারে বারে
শুকতারকার সাথে, সঙ্কুচিতা উষার আঁধারে।
দেখেছিনু নিদাঘের চণ্ড তাপে অগ্নিমন্ত্রে করিয়া বোধন
কালভৈরবের পূজা রুদ্রযজ্ঞে করিতে সাধন।
ঘুঘু-ডাকা ব্যাথাতুর মুকুলিত জ্যৈষ্ঠের দুপুরে
আম কুড়াবার ছলে তার সাথে ফিরেছিনু ঘুরে।
সিক্ত গাত্রে ভীরুপদে বরষার ক্ষান্ত বরিষণে,
গন্ধ-ভেজা বনপথে ঘুরেছিনু আমরা দু'জনে।
ভাল সে যে বেসেছিল ধরণীর প্রতি ধূলিকণা,
ধূলার ধরণী মাঝে করেছিল স্বরগ রচনা।
আজ বুঝি গেল চলি মৃত্যুমাঝে অমৃতের করিতে সন্ধান,
না জানি কাহার বুকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে তার দিতে প্রাণদান।

এ কূলেতে অস্ত যায় রবি, ও কূলেতে পূর্ণিমার চাঁদ,
মাঝখানে জাহ্নবীর ধারা গেয়ে যায় কল কল নাদ।
এপারেতে বিদায়-গোধূলি, ওপারেতে উষার উদয়,
এপারেতে ঘনায় তিমির, ওপারেতে জাগে জ্যোতির্ম্ময়।

কণা

শ্রীরেণুকণা রায় (কুমার)

ফুলের উপরে বসিয়া অলি সে
গুণ্ গুণ্ স্বরে বলিল ফুলে,
'তোমার গুণের মহিমা যে গাই
তোমার কদর বুঝেছি বলে।'
ফুল বলে—'অলি, শুধু তো আস না,
শুধু তো বস না আমার দলে,
কারও কাছে কেউ শুধু তো আসে না,
স্বার্থ থাকেই লুকিয়ে মূলে।'

"রামধনু ভাই, তোমায় আমি জানাই নমস্কার"

শ্রীঅজানা গুহ (বাবুই)

মেঘের হাসি রামধনু গো,
বাদল মেঘের ফাঁকে
নানা রংএর উড়িয়ে ধ্বজা
হাস্‌ছ আকাশ থেকে।
ঝরঝরানি মেঘলা দিনে
আঁধার জলদ-ফাঁকে
রামধনু গো, ফিক্ ক'রে যে
হাস্‌ছ কাকে দেখে!
তোমার হাসির লহর হেরি'
হাস্‌ছে ভুবনখানি,
হাস্‌ছে আকাশ, হাস্‌ছে বাতাস,
হাস্‌ছে খুকুরাণী।
চাঁদ ডাকিলে সবাই মিলে
আসে না চাঁদ কাছে,
তুমি তো ভাই দাও গো ধরা
ছোট্ট মুঠির মাঝে।
মাসের প্রথম—পয়লা দিনে
তোল হাসির ঝাড়,
"রামধনু" ভাই, তোমায় আমি
জানাই নমস্কার।

মাঝে মাঝে আমরা এক একখানা নতুন ধরণের চিঠি পাই। কিছুদিন আগে রামধনুতে এই রকম কয়েকটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছিল। এবারে আর কয়েকটি দেওয়া হ'ল :—

(১)

"...আমি হতভাগা অনেক দিন যাবৎ প্রবন্ধ, কবিতা, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি পাঠাইতেছি কিন্তু উহাদের একটির উপরও আপনার কৃপাবৃষ্টি পড়িল না, আশ্চর্য্য! আমার লেখনী কি এতই তুচ্ছ? হতে পারে আপনার মত অত বড় একজন বিদ্বানের নিকট ক্ষুদ্র যুবকের লেখা নগণ্য কিন্তু গ্রাহকমণ্ডলীর কাছে তুচ্ছ এ কথা স্বীকার করতে আমার লেখনী নারাজ। ...আপনি একজন খ্যাতনামা বিদ্বান্ হইয়াও যদি আমার মর্ম্মান্তিক ব্যথা না বুঝেন সেটা আমার দুর্ভাগ্য। মহাশয়, মরুভূমিতে আমার এইবার রোদনই শেষ রোদন।"

(২)

"চোখে আমার ঘনিয়ে আসিছে অন্ধকার, ধরণীর এই আলো আমার চোখের উপর থেকে মুছে যাচ্ছে, এই সুন্দর ধরণীর বাতাস আমার বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। যাত্রী আমি একা—যাত্রা করেছি মহাপ্রস্থানের পথে,...কিন্তু যাত্রা স্থরু না হতেই ফিরে আসতে হ'লো ডাক্তারের ওষুধে।...আমার এ চিঠি লিখবার অন্তরালে রয়েছে একটি কারণ, সেটি হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র সহানুভূতি, মনের একটা ক্ষুদ্র অনুপ্রেরণা।...রামধনু পড়ে আমার মনে যে ভাবধারা নেবে এসেছে তারই একটা কণিকা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।"

(৩)

"আপনার কাছে লুকিয়ে এই পদ্য পাঠাচ্ছি। বাড়ীতে জানলে ভীষণ কাণ্ড হবে। এই বয়সে পদ্য লিখলে নাকি লেখাপড়া ভাতে দিয়ে খাওয়া হয়। কিন্তু আপনিই বলুন, বুড়ো বয়সে কি পদ্য আসে? তখন শুধু পয়সার চিন্তা আর হিসেব কষা। বাড়ীতে বোঝে না।...হ্যাঁ, লেখাটা কিন্তু টুক্‌লিফাই নয়, বানান দেখেই বুঝবেন স্বরচিত।"

(৪)

"সম্পাদক মশাই, আপনার একখানা চিঠি চাই-ই-ই-ই-ই। যদিও আপনি কারও কাকা-বাবু, মামাবাবু, দাদামণি বা দাদাভাই ন'ন—শুধু সম্পাদক মশাই,—এমন কি তাও ন'ন, আড়ালে-বসা "রাঃ সঃ", তবুও আপনার নিজের হাতের

লেখা একখানা চিঠির ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের ক্লাসের —র সঙ্গে আপাততঃ আমার আড়ি চলছে, তারই থোতা মুখ ভোঁতা করবার জন্য চিঠিটা চাই-ই-ই-ই-ই। আপনার ছোট্ট পাঠিকার অনুরোধ রাখবেন তো ?…"

"মহাত্মন্, (৫)

আপনার পত্রিকা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষায় উহা কিরূপে বর্ণনা করিব! হৃদয়ের আবেগ ছন্দে গাঁথিয়া আপনার পদতলে নিবেদন করিলাম। ইতি আপনার শ্রীচরণের নিত্য-সেবকাধম…।"

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

যাঁদের বয়স ১৬ বছরের বেশী তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন—শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী (কলিকাতা) এবং যাঁদের বয়স ১৬ বছরের কম তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন শ্রীঅহল্যাবাঈ দেবী (নিউদিল্লী)।

এ ছাড়া শ্রীগীতা দত্ত, শ্রীপ্রভাসকুমার বিশ্বাস ও আবুল হোসেন মিয়া—এঁদের লেখাগুলিও ভাল হয়েছে।

ছোটদের চিত্রশালা

খেলার সাথী

আলোকচিত্র-শিল্পী—
কুমারী মঞ্জুলা সান্যাল

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি.এ

হে জ্ঞানী, হে গুণী বাণীর তাপস,
তোমার হৃদয়-দ্বারে
গিয়াছে যাহারা, হইয়া ব্যর্থ
ফিরে নাই বারে বারে।

ছিলে শিক্ষক ছাত্রের মাঝে,
মিত্র তাদের ছিলে প্রতি কাজে,
অন্তরে ছিলে ছাত্রের সাজে,
কর্ম্মক্ষেত্রে গুণী,
তাই মনে আজ বার বার জাগে
তব সাধনার বাণী।

নির্দ্দেশ যাঁর পেয়ে এসেছিলে
তাঁহারি আদেশে পুনঃ চলি' গেলে,
শুধু স্মৃতি তব সাধনার বলে
শত কিশোরের বুকে
রেখে গেলে গুণী, অমর করিয়া
জীবনের সুখে-দুখে।

সাথে এনেছিলে শান্ত চিত্ত,
গম্ভীর, নির্ভয়;
অটল, অজেয় কর্ম্মক্ষেত্রে,
পর-দুখে সদাশয়।

অন্তর ছিল সদা অবারিত,
ক্ষমাসুন্দর ছিল ঐ চিত,
জানি না সকলে পেয়েছিল কিনা
তোমার এ পরিচয়।*

একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা

[সত্য ঘটনা]

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ

ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক আলডাস্ হাক্সলির নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্যের শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে ইঁহার নাম গোড়ার দিকেই করিতে হয়। ইঁহারই সম্বন্ধে একটি কাহিনী তোমাদের বলিব।

* ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মরণে, তাঁহার জনৈক গুণমুগ্ধ ছাত্র কর্ত্তৃক রচিত।

লণ্ডন সহরের উপর দিয়া একটি দোতলা বাস্ ছুটিয়া চলিয়াছে। দোতলায় ভীড় একটু বেশীই হইয়াছে। একটি বেঞ্চিতে বসিয়া একজন ভদ্রলোক পাশের একটি বোকামত ভদ্রলোকের সঙ্গে মুরুব্বি চালে অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন, তাঁর কোলে একটি বই। সামনের সীটে আর একজন ভদ্রলোক উভয়ের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছেন।

বইএর অধিকারী ভদ্রলোক একটু কাসি চড়াইয়া বলিলেন, "বুঝলেন না, আজকাল যে সব বই বাজারে বেরুচ্ছে তার প্রায় সবই বাজে—ট্র্যাশ্। এই বইটা আমার নিজের লেখা।"

"বইটার নাম আর মশাইএর নাম?" তৃতীয় ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করিলেন।

"বইটার নাম হচ্ছে "পয়েন্ট্ কাউণ্টার পয়েন্ট্", আর আমার নাম আল্‌ডাস্ হাক্সলি।"

কথা শুনিয়া সমস্ত বাসের লোক রা-রা করিয়া উঠিল। যে সে লোক ন'ন, স্বয়ং বিখ্যাত হাক্সলি সাহেব আজ তাদের আধ ঘণ্টার হাওয়া আর পেট্রোলের গন্ধ ভোগ করার সঙ্গী! তৃতীয় ভদ্রলোক সলজ্জভাবে বলিলেন, "বড় খুসী হ'লাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মিঃ হাক্সলি।"

হাক্সলি সাহেব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "হুঁ"।

খানিকটা যাওয়ার পর গন্তব্য স্থান আসিয়া পড়ায় তৃতীয় ভদ্রলোকের নামিবার সময় হইল। নামিবার মুখে তিনি আবার বলিলেন, "বড় খুসী হ'লাম। আপনার সঙ্গে আর একদিন দেখা করার ইচ্ছে রইল। আমার কার্ডটা দয়া করে রাখুন।"

ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। কয়েকজন বাস্‌যাত্রী কৌতূহলী হইয়া কার্ডের নামটার দিকে উপুড় হইয়া পড়িল। দেখা গেল, কার্ডে পরিষ্কার হরফে ছাপা—"আলডাস্ হাক্সলি"।

পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল, বইএর মালিক ভদ্রলোকটি চলন্তি বাস্ হইতেই লাফাইয়া পড়িতেছেন।

শ্রীমান্ রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

তোমরা শুনে সুখী হবে, রামধনুর গ্রাহক শ্রীমান্ রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্.এ পরীক্ষায় মিশ্র গণিতে (Applied Mathematics) প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। দু' বছর আগে বি.এ পরীক্ষায়ও ইনি অঙ্কে অনার্স নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। আমরা এই কৃতী গ্রাহকটিকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

* * *

রুশ-জার্ম্মান্ যুদ্ধ ক্রমাগতই ভীষণ হ'তে ভীষণতর হচ্ছে। মস্কোর কাছে প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে, কিন্তু জার্ম্মান্‌রা এখনও মস্কো দখল করতে পারে নি। সম্প্রতি রাশিয়ান্‌রাই একটু উল্টো চাপ দিতে সুরু করেছে। তারা শুধু বীরবিক্রমে বাধাই দিচ্ছে না, সুযোগ মত প্রতি-আক্রমণ করতেও কসুর করছে না। তবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলে জার্ম্মান্‌দের হাতে কিছু কিছু ঘাঁটী তাদের ছেড়ে দিতেও হয়েছে। এদিকে শীত তো সুরু হ'ল; শেষ পর্য্যন্ত কত দূর কি গড়াবে বলা কঠিন।

জাপানের মতিগতির কথা গত বারেই তোমাদের বলেছি। পূর্ব্ব এশিয়ায় একটা ঝড়ের আশঙ্কা অনেকেই করছেন। যুদ্ধের ক্ষেত্র ওদিকে ককেশাস্ দিয়ে এবং এদিকে ব্রহ্মদেশ পেরিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসাও নাকি কিছু আশ্চর্য্য নয়—সাংবাদিকেরা ইতিমধ্যেই এ নিয়ে গবেষণা সুরু করে দিয়েছেন।

* * *

গ্রেট্ ব্রিটেন বলতে সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌সকে বোঝায়। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক ছোটখাট দ্বীপ এই গ্রেট্ ব্রিটেনের মধ্যে রয়েছে। তার ২।১টির কথা তোমরা রামধনুতে পড়েছ। এই রকম দ্বীপ গ্রেট ব্রিটেনে কতগুলো আছে জান? প্রায় হাজার খানেক।

* * *

জন্তুদের মধ্যে তিমি, কচ্ছপ প্রভৃতির দীর্ঘায়ু বলে নাম আছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষুদে সামুদ্রিক ঝিনুকও যে আয়ুতে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয় তা জান কি? এদের কোন্ কোন্‌টাকে ৭০, ৮০, এমন কি ১০০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা গেছে।

* * *

'কো-অপ্‌টিমিষ্ট' নামে একখানা নাটক লণ্ডন সহরে ২৩২৫ বার অভিনীত হয়েছিল। পৃথিবীর আর কোন নাটকের বোধ হয় এত বার অভিনীত হবার সৌভাগ্য হয় নি।

* * *

পৃথিবীতে অনেক কিছুরই এন্‌ডিওরেন্স রেকর্ড্ হয়ে গেছে, সাইকেল চালান'তেও বাদ যায় নি। সাঁতারের মত এ রেকর্ড্‌ও করেছেন একজন ভারতীয়। তাঁর নাম কৃষ্ণকুমার শর্ম্মা। বাড়ী এলাহাবাদ। একটুও না থেমে তিনি একাদিক্রমে ৮৮ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট সাইকেল চালিয়েছিলেন। দ্রুত চালাবার রেকর্ড্ যিনি করেছেন তাঁর নাম জি. ওম্‌স্। ইনি এক ঘণ্টায় ২৮ মাইল ৩২ গজ গিয়েছিলেন।

* * *

পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা আর চওড়া নদীর নাম বোধ হয় সকলেই জান কিন্তু স্রোতের বেগ সব চেয়ে বেশী কোন্ নদীর জান কি? ফ্রান্সের 'রোণ্' নদীর। নদীটা খুব বড় নয় কিন্তু ছোটে ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ৪০ মাইল বেগে।

* * *

লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স বা জীবন বীমার আজকাল ছড়াছড়ি। কিন্তু দেড়শ' বছর আগে এ দেশে ওর চলন ছিল না। ১৭৯৫ সনে উইলিয়াম্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী খোলা হয়। এ দেশে সেই প্রথম জীবন বীমার অফিস। ইংলণ্ডে কিন্তু তারও ৯০ বছর আগে জীবন বীমার ব্যবস্থা ছিল। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত "দি এমিকেব্‌ল্ সোসাইটীই" বোধ হয় সেখানকার প্রথম জীবন বীমার অফিস্। তবে সামুদ্রিক বীমার চলন এরও প্রায় একশ' সওয়া শ' বছর আগে হয়েছিল বলে শোনা যায়।

* * *

পৃথিবীর মুষ্টিযোদ্ধা-চ্যাম্পিয়ন্ জো লুইএর নাম তোমরা সকলেই বোধ হয় জান। ১৯৩৭ সন থেকে তিনি এই সম্মানের অধিকারী হয়ে আছেন। সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়ার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা নোভাকে (যিনি কিছু দিন হ'ল ম্যাক্স বেয়ারকে হারিয়েছেন) শোচনীয় ভাবে হারিয়ে তিনি তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই প্রতিযোগিতায় জিতে তিনি ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ডলার পুরস্কার পেয়েছেন। জো লুই জাতিতে নিগ্রো।

* * *

ভারতের লন্ টেনিস্ এসোসিয়েশন্ ১৯৪১-৪২ সনের ভারতীয় খেলোয়াড়দের নামের একটা তালিকা (গুণানুসারে) বার করেছেন। সেটি এই: ১ম — গাউস মহম্মদ, ২য় — ইফ্‌তিকার

আমেদ, ৩য় — এস্. এস্. আর, সোহানী, ৪র্থ — দিলীপ বসু, ৫ম — যুধিষ্ঠির সিং।

মেয়েদের মধ্যে প্রথম — মিস লীলা রাও, ২য় — মিস্ ডুবাস, ৩য় — মিস্ হাজী ও মিসেস্ সি ম্যাসে।

সম্প্রতি পাঞ্জাবের একটি টেনিস্-প্রতিযোগিতায় প্রেম পন্ধী গাউস মহম্মদকে পরাজিত করেছেন। ইফ্‌তিকার আমেদও উক্ত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছেন, এবং তা'তে প্রেম পন্ধীই হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। বল, বালা, ২। নল, নালা, ৩। টন, টানা, ৪। মত, মাতা, ৫। কত, কাতা, ৬। কর, কারা, ৭। রণ, রাণা, ৮। মন, মানা, ৯। পর, পারা।

উত্তরদাতাদের নাম

রামেন্দু দাশগুপ্ত, অজয়, কৃষ্ণা সেন, বকুল (ভবানীপুর); দুর্গা, বেবী, রেণু ও সতী মৈত্র (রাজসাহী); শীলা, অশোক, অমিয়, অমিতাভ প্রভৃতি (ভবানীপুর); শৈল, পুতুল, সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও বাহাদুর (ফরিদপুর); কৃষ্ণবরণ, প্রণব, সুধাময়, ধীরেন (বাণীমন্দির, মুড়াগাছা); বিশ্বজিৎ রায় (কলিকাতা); দেবদাস মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); রত্না দেবী, জয়ন্ত, স্বপ্না (বাঁকীপুর); শান্তি, ভঁদু, গণেশ, জেমস্ (গয়া); কাকী, ময়না, রণজিৎকুমার বসু (ধুবড়ী); অজিতকুমার সেন (ধুবড়ী); রমেশচন্দ্র, লহর, মুক্তি ও ফাল্গুনী পট্টনায়ক সেনগুপ্ত (রামচন্দ্রপুর); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী (বালুভরা); অমূল্যধন দাশ শর্ম্মা (ভবানীপুর); ৫সি জগন্নাথ সুর লেনের কর্পোরেশন স্কুলের বালিকাবৃন্দ (কলিকাতা); দেবী গাঙ্গুলী, বুলু, অশোক ও অনুরাধা (বালিগঞ্জ); সুজিত ও সুবীর রায় (শ্রীহট্ট); এ. রশিদ, কফিল, রাখাল. সামসু প্রভৃতি (লাখপুর শিমুলিয়া); অরুণ, অসীম, শোভা (কাশীধাম); জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); অশোক, অরুণা মজুমদার (কালীঘাট); অমিয়াংশু (কলিকাতা); শরৎকুমার ঘোষ (হাওড়া); মণি, বেবি, ছবি ও কুশল বাগচী (বালীগঞ্জ); অণিমা ও মাসীমা (শিলং); বাচ্চু গুহ (বরিশাল); কালিদাস পাল (বালুভরা); অরুণানন্দ চৌধুরী (চট্টগ্রাম); জ্ঞানময় মজুমদার, পতু ও শম্ভু (কণ্টাই); চিন্ময় ঘোষ (জয়পুর); রবীন্দ্রনাথ মিত্র (পাটনা); রেখা ও ধীরা চ্যাটার্জ্জি (কলিকাতা); অজানা গুহ (কলিকাতা); রামপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও

আলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া), তৃপ্তি সেন (কলিকাতা); পঞ্চানন দাস (ত্রিবেণী); চণ্ডী, জবা, কুন্দ, ছন্দা সরকার (ধানবাদ); আভা, তপেন, রমেন, সত্যেন প্রভৃতি (দিনাজপুর); অমরনাথ, অসিতকুমার, অজয়কুমার, গোরা (বহিরগাছি); বাবু বসু (কুমিল্লা); লক্ষ্মণচন্দ্র সাধু খাঁ (গারুলিয়া); সুশীলচন্দ্র নিয়োগী (আদমদীঘি); কল্পনা ব্যানার্জ্জী (বালীগঞ্জ); রেবা সেন (নয়াদিল্লী); লতিকা লাহিড়ী ও সত্যনারায়ণ লাহিড়ী (ময়মনসিংহ); সৌরীন্দ্র, নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, কনকেন্দ্র (নিমপুরা); মিহির, যতীন, বাচ্চু, মা প্রভৃতি (পাবনা); রামপ্রসাদ কুশারী ও হরপ্রসাদ কুশারী (কুমিল্লা); মাধুরী, বিজু, বেবুন ও ধ্রুব; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (হাওড়া); নবেন্দু সেন (বালীগঞ্জ); রবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় (জেমশেদপুর); সেবা, বাবা, অনিভাই ও মঞ্জু (করিমগঞ্জ); দীপালী রায় (জলপাইগুড়ি); মঞ্জুলা সান্যাল (ভবানীপুর); সুশীলকুমার সরকার (লাহেরিয়া সরাই); নন্দ, কিংশুক, অনুনয় ও দূর্ব্বা (পাটনা); বাণী মৈত্র (নতুন ভারেঙ্গা); বাণী, নেবু (ভবানীপুর); জীবন, নিতু, মণি (জলপাইগুড়ি); মুখার্জ্জি ব্রাদার্স (ভিড়িঙ্গী); ছায়া সেন (মূলঘর); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর); অর্চ্চনা দেবী, গীতাগায়ত্রী, শচীন ও উমা (নীলফামারী); অবনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (পোর্ট ব্লেয়ার—আন্দামান দ্বীপ)।

নূতন ধাঁধা

নীচের কথাগুলির ঠিক মত অর্থভেদ করতে পারলে ধাঁধার রহস্যও ভেদ হবে, — পাবে এক-একটি ভৌগোলিক নাম। চেষ্টা ক'রে দেখ :—

(১) সেকালকার এক রাজা আর তাঁর দুর্গ।
(২) পৃথিবী আর তার আকর্ষণ।
(৩) আরামসূচক একটি ধ্বনি ও শব্দ।
(৪) ক্ষেতের পাশের রাস্তা, তার পাশে পশ্চিমা ব্যবসাদার জাত।
(৫) বৃটীশ পার্লামেণ্টের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আর নাই নাই এমন কৃষ্ণ।
(৬) চলতি কথায়—বিবাহ এবং মাথা কাটা মিষ্টি ফল।
(৭) বৈষ্ণবদের একটি প্রিয় দেশ।
(৮) এ বাদ দিলে পাবে একটি বিখ্যাত সম্প্রদায়।

বাহির হইয়াছে

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্‌
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।
আজই একখানি কিনিতে ভুলিও না।
সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট
দাম মাত্র আট আনা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্‌-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো
—বিজ্ঞানের গল্প—
প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
—বিজ্ঞানের গল্প—
পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

আকাশের গল্প
—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—
অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

আবিষ্কারের গল্প
—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী
অভিযান-কাহিনী—
পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

জন্মদিনের উপহার
—সরস, মজাদার গল্পের বই—
চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট,
চমৎকার ছবি। দাম—॥৴০

ফুলের মূল্য
বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের"
মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্‌ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড্‌, কলিকাতা)

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্‌, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী
ঘি'এর মত কিছুই নয়।
খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

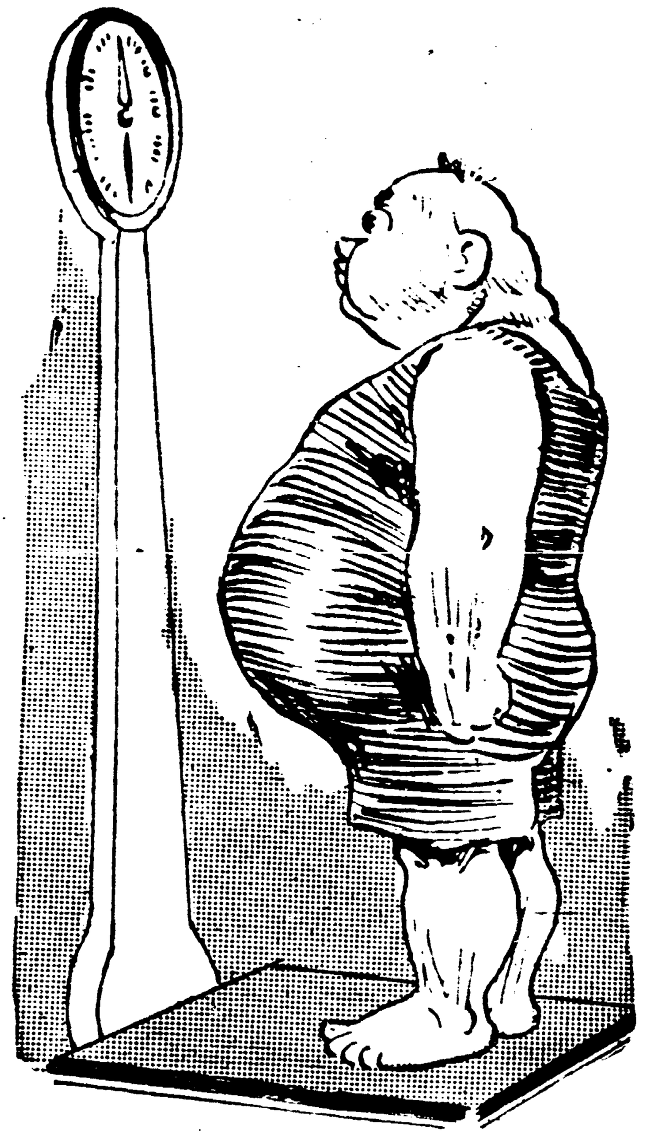

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৬৬০

Cover: C. H. Aran & Co.

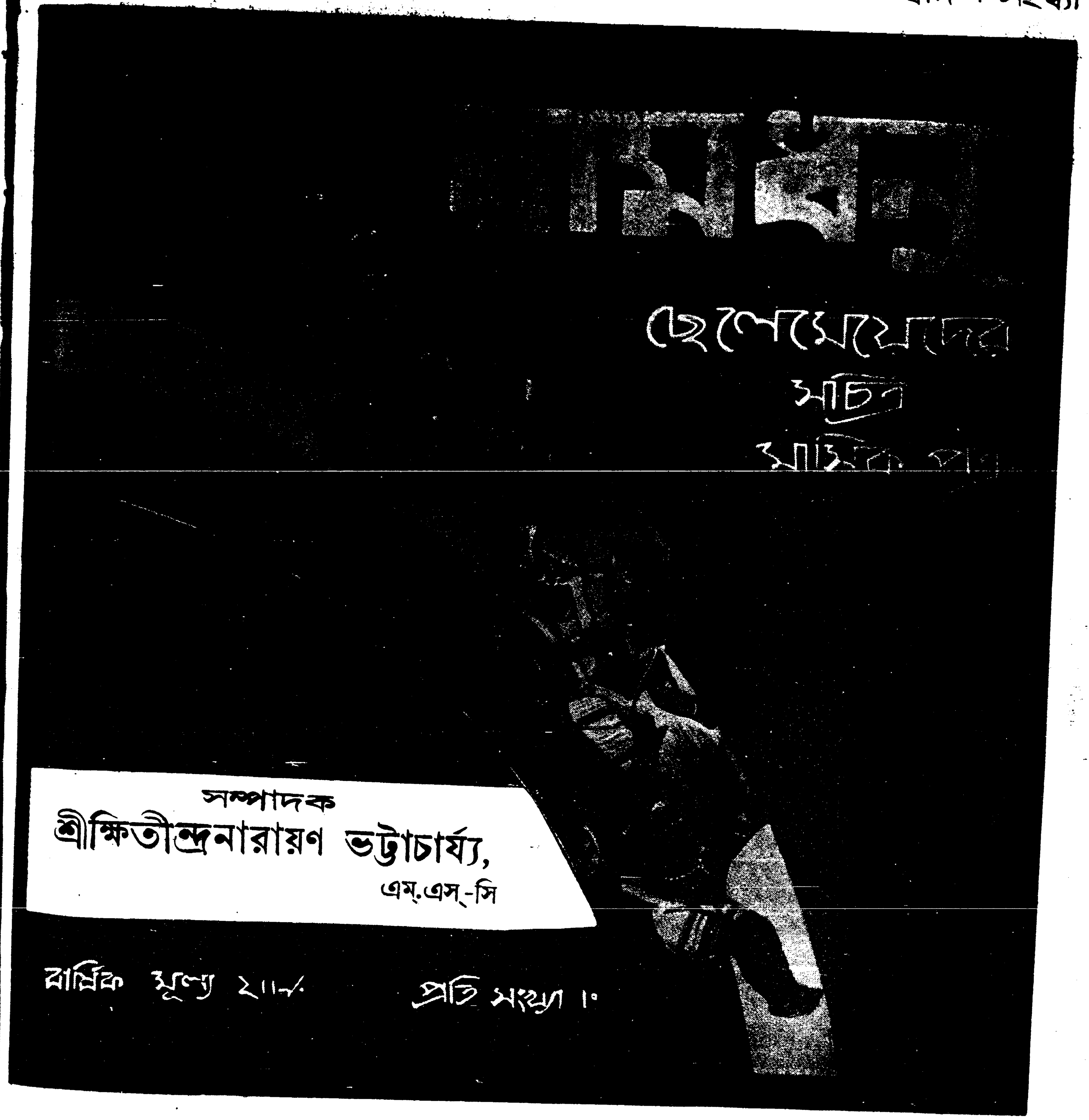

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

Regd. No. C–1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

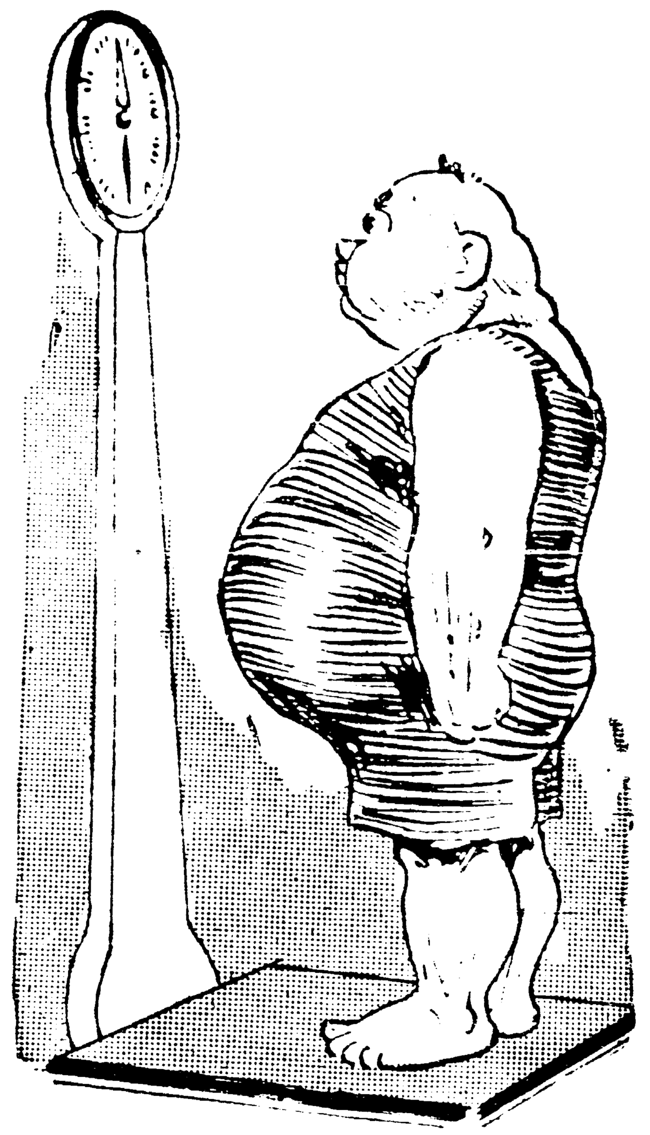

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover: C. H. Aran & Co.

১৪শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৮ | দ্বাদশ সংখ্যা

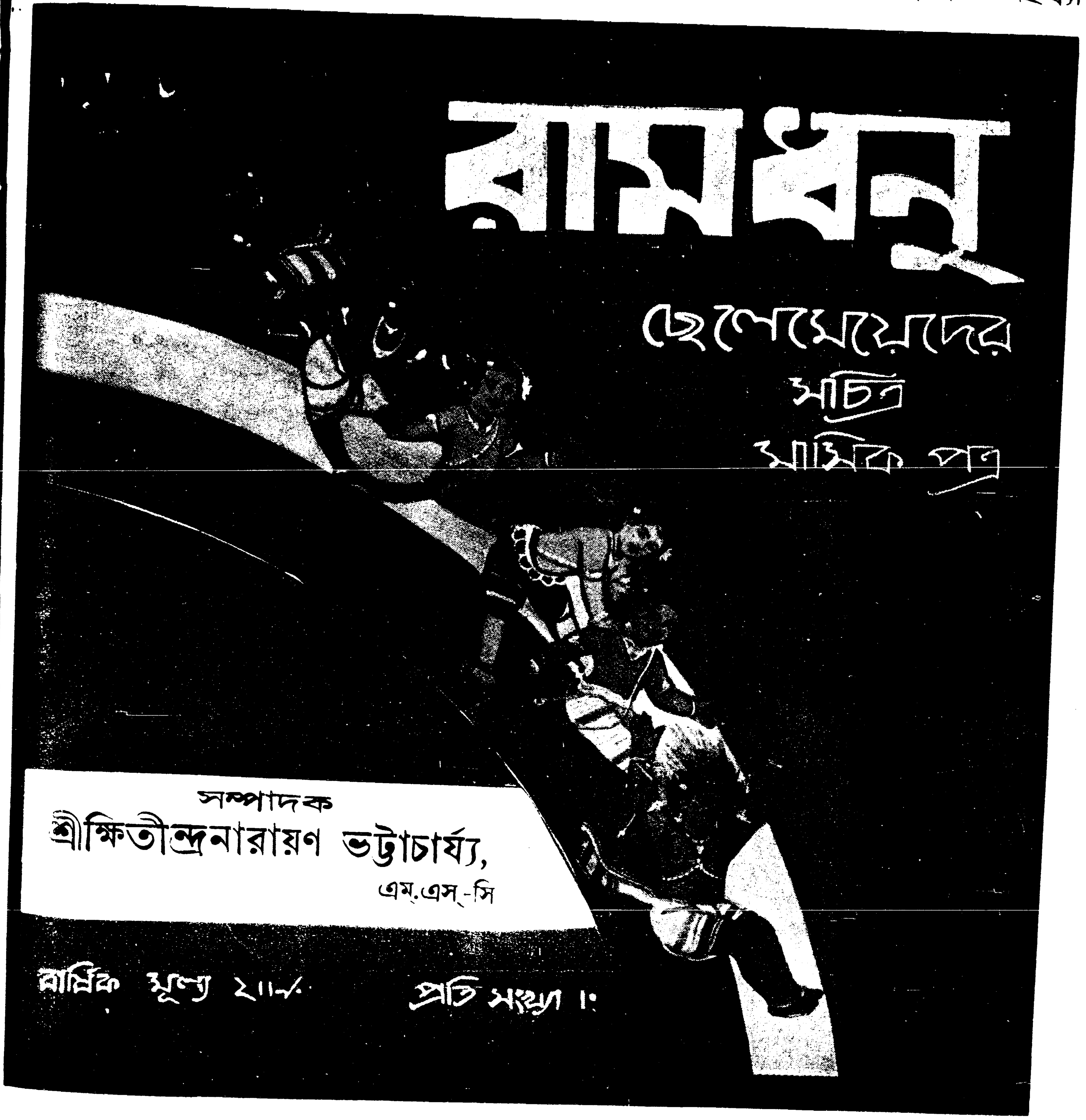

কার্য্যালয়
১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১২৬

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৶০, ষাণ্মাসিক ১৷৶০ ; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্ত চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

ডোঙ্গরের বালামৃত সেবনে
দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
অল্প-দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য
লাভ করে।

=কয়েকখানি উপহার দিবার বই=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—সর্ব্বজন প্রশংসিত উচ্চাঙ্গের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১।০

৺অমরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) শ্রীঅপরাজিতা বসু কর্ত্তৃক সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য—৸৶০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত

কাশ্মীরের কথা—বহু চিত্র শোভিত ৸০

শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) মূল্য—৸৶০

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা রাধারাণী রায়ের

রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা
ভারতের দুইটী বীরাঙ্গনার পবিত্র জীবন কথা মূল্য—।০ ইংরাজীতে। মূল্য—।০

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর ... ১।০ **বাংলার বীরাঙ্গনা** ... ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

= কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ =

(রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্‌ শিশু উপন্যাস)

প্রতি মাসেই বাহির হইতেছে— :: —প্রত্যেকখানি আট আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। **অন্ধকারের বন্ধু**

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২। **ছিন্নমস্তার মন্দির**

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। **তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক**

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। **বিজয় অভিযান**

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর
৫। **ছায়া কালো-কালো**

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
৬। **রাত্রির যাত্রী**

শিশু-সাহিত্যে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম দান

৭। **হারাণো বই**

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

৮। **জীবন্ত সমাধি**

—আমাদের প্রকাশিত এ বৎসরের নূতন বই—

শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী, এম্.এ প্রণীত
স্বর্গে থিয়েটার (পৌরাণিক গল্প) ॥৵০

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প (ভূতুড়ে গল্পসঞ্চয়ন) ১।০

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
দেড়শো খোকার কাণ্ড (শিশু-উপন্যাস) ১৲

শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (কৌতুক কথা) ৸০

শ্রীযুক্ত নিখিলেশ সেনের
রোমাঞ্চকর কাহিনী (ছোট গল্প) ॥০

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়ের
ছেলেধরা সার্কাস (শিশু উপন্যাস) ॥৵০

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
দানবীর কার্নেগী (জীবনী) ॥০

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের
প্রতাপসিংহ (ছেলেদের নাটক) ॥০

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর
আকাশ গঙ্গা (ভ্রমণ কথা) ৸০

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
তাতারের বন্দী (বৈদেশিক গল্প) ৸০

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
বিষের তীর (শিশু উপন্যাস) ॥০
নিশির ডাক (শিশু উপন্যাস) ৸০

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের
বোম্বেটে-দ্বীপ (শিশু উপন্যাস) ৸০
সোনার পাখী (ছোট গল্প) ।৵০

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর
ঋষি অরবিন্দ (জীবনী) ॥০

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের
হারানো দিন (শিশু উপন্যাস) ১৲

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

স্কুলের বই

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে এবার নতুন ক্লাসে উঠলে, তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নতুন ক্লাসের সমস্ত বই-ই আমাদের কাছে পাবে। নিজে এসে বেছে নাও কিংবা আজই ভি. পি অর্ডার দাও।

যারা আমাদের কাছ থেকে বই লইবে, তাহাদের সুন্দর ক্যালেণ্ডার দেওয়া হইবে।

বিনীত

এন্, এল্, পাল এণ্ড কোং

২০৩।২,এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্. কলিকাতা

পাল প্রকাশনা-নিকেতনের

কয়েকখানি সুন্দর ও উচ্চ প্রশংসিত গল্পের বই।

১। **আসামের জঙ্গলে**
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—॥০

২। **রহস্যের ইন্দ্রজাল**
জ্যোতিষ চক্রবর্ত্তী—॥০

৩। **গুপ্ত শত্রুর জালে**
সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী—॥০

৪। **এ যুগের দৈত্য**
শ্রীহারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—।৵০

৫। **শিশুদের বিষাদ-সিন্ধু**
বন্দেআলী মিঞা—।৵০

প্রাপ্তিস্থান

N. L. Paul & Co

বই, কাগজ ও খাতা বিক্রেতা

২০৩।২,এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

—আমাদের ছেলেমেয়েদের নূতন বই—

নগেন্দ্রনাথ দত্তের **কুমড়োপটাস**
তোমাদের পরিচিত জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাহিনী নিয়ে লেখা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ
বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথায় ভরা।

ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়ের
রাতের বিভীষিকা
রাতে যারা ভয় দেখায়—তাদের কথায় ভরা।

সবোজকুমার রায় চৌধুরীব
হরেক রকম
বইখানা শিশুচিত্তের খোরাকে ভরপুর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের **বিজ্ঞানের অ, আ**
বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলি গল্পের ছাঁচে লেখা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রর
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন?
সাধারণ জ্ঞানের অসাধাবণ বই।

কালিদাস রায়ের **জাতকমালিকা**
গৌতমের গতজন্মের কথা।

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর **দুর্গমপথের যাত্রী**
আবিষ্কার ও ভৌগোলিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
যা সকলে চায়
ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

এ, এন, ব্যানার্জ্জি

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক। আর, এন, দাস রোড, ঢাকুরিয়া দক্ষিণ কলিকাতা।

রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল সেন

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৮ { ১২শ সংখ্যা

হিমেল-হাওয়া

শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত

এল রে হিমেল-হাওয়া ফিরে,
শিহরি' উঠিল ধরা ধীরে।
কত নদী উপবন
মাতায়ে শালের বন
ভরিল পরাণ-মন, আবেশে ঘিরে,
ভিজে ভিজে দেহখানি শিশির-নীরে।

আঙ্গিনায় বসে বসে দেখি—
সোনা রংএ ভরা চারিদিক্ই।

রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ

শিল্পী—শ্রীমন্মথনাথ সেন

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৪শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৮ | ১২শ সংখ্যা

হিমেল-হাওয়া

শ্রীমতী সুজাতা গুপ্ত

এল রে হিমেল-হাওয়া ফিরে,
শিহরি' উঠিল ধরা ধীরে।
কত নদী উপবন
মাতায়ে শালের বন
ভরিল পরাণ-মন, আবেশে ঘিরে,
ভিজে ভিজে দেহখানি শিশির-নীরে।

আঙ্গিনায় বসে বসে দেখি—
সোনা রংএ ভরা চারিদিক্ই।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

মেলিয়া সবুজ ডানা
টিয়া গায় একটানা—
নদীপারে নাচে ঘুরে চখা-চখী সে কী!
হিমেল-প্রভাতে বসে চেয়ে চেয়ে দেখি।

আঁকা-বাঁকা মাঠ-ঘেঁষা পথটি সরু
গাড়ী নিয়ে ধীরে বয়ে চলেছে গরু।
দোলাই বেঁধেছে গায়
কাঁপন ধরিল তায়,—
ভিন্ গাঁয়ে চলে চাষা লইয়া তরু,
কানে পশে টুং টাং ছন্দ চারু।

নীল নীল ঘন নীল সুদূর আকাশ,
হিম মেখে থেকে থেকে মৃদু দোলে ঘাস।
ওগো ও হিমেল হাওয়া,
তুমি মোর চির-চাওয়া,
নিও মোরে তোমা-সাথে তোমার আবাস,
আজ্ ভোরে দিলে করে মন যে উদাস।

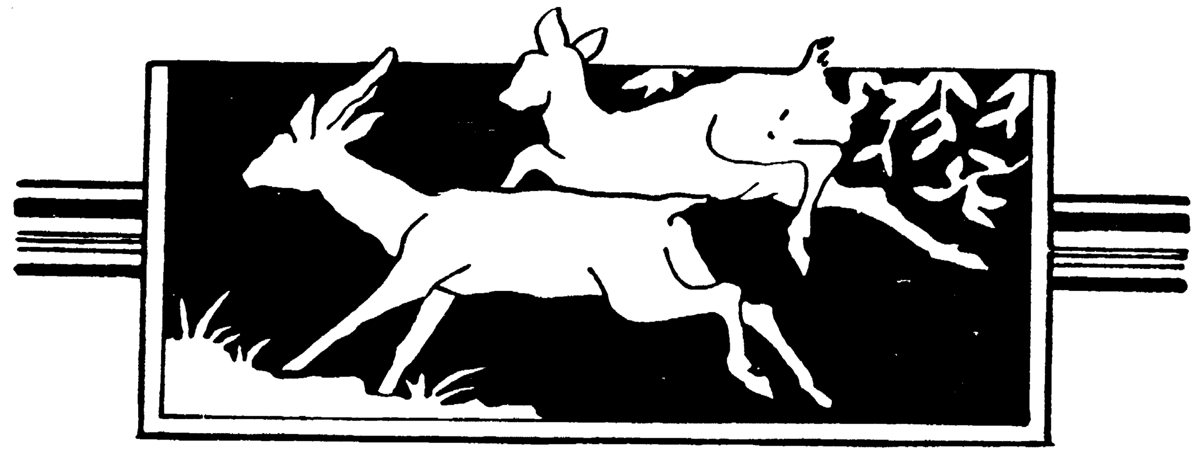

[ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী]

এগারো

—সপ্ সপ্ সপাসপ্!

মসৃণ সুগৌর পিঠের উপর সমান্তরালে রক্তের রেখা ফুটে উঠতে লাগল। যাতনায় মল্লিকা চোখ বুঁজল, চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মুক্তোর মত অশ্রুর বিন্দু। তথাপি তার মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হ'ল না, দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট টিপে রইল।

কন্যাকুমারী আর চুপ করে থাকতে পারল না, ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল—পিতা, সম্রাট্!

—চুপ্ কর—সম্রাট্ তর্জ্জন করে উঠলেন—তোমার বাক্‌বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। যতক্ষণ-না ও বলবে কালো সওয়ার কোথায় আছে, ততক্ষণ বেত্রাঘাত চলবে। দরকার হ'লে লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দেব। এ তো সবে সুরু হয়েছে মাত্র।

কন্যাকুমারী শিউরে উঠল। ভয়ে তার মুখে কথা যোগাল না।

ওদিকে সমভাবে বেত পড়তে থাকে—সপ্ সপ্ সপ্। মল্লিকার মাথাটি বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে, তথাপি মুখে একটা যন্ত্রণা-বোধক শব্দও সে উচ্চারণ করে না।

সামান্যা এক হিন্দু মেয়ের এই দৃঢ়তা দেখে হূনসম্রাট্ বিচলিত হয়ে উঠলেন। দু' চোখ জ্বলে উঠল, ইচ্ছা হ'ল ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে অনুচরের হাত থেকে বেতটা কেড়ে নিয়ে নিজেই ঘা কতক বসিয়ে দেন, কিন্তু ভারত-সম্রাটের পক্ষে তা শোভন নয় বলেই পারেন না। তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—এখনই অত চোখের জল ফেলছ কেন সুন্দরী, এখনও তো লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দেওয়া হয় নি!

মল্লিকা সে কথার কোন উত্তর দিল না।

কন্যাকুমারী এবার বল্‌লে—হয়তো ও সত্য কথাই বলছে সম্রাট্, কালো সওয়ার কোথায় আছে ও জানে না।

সম্রাট্ কট্‌মট্ করে কন্যাকুমারীর মুখের পানে তাকালেন। সে দৃষ্টির সামনে অতিবড় সাহসী হূনও প্রমাদ গণ্‌ত কিন্তু কন্যাকুমারী এবার আর ভয় পেয়ে পিছুল না, মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল—ও হয়তো সত্যিই জানে না সম্রাট্!···

সম্রাটের একজন অন্তরঙ্গ পারিষদ পাশ থেকে বল্‌লে—ও না জানতে পারে, কিন্তু কালো সওয়ার তো জানে যে একটি মেয়ে তার জন্য এই নির্য্যাতন সইছে তারই তো উচিত নিজে এসে ধরা দেওয়া···

কথাটা সে বোধ হয় একটু জোরেই বলেছিল, শেষ হওয়ামাত্রই অট্টহাসিতে চারিপাশের বাতাস কেঁপে উঠল, হাসিটা উপহাসের মত শোনাল। সকলে সেই শব্দ অনুসরণ করে দেখল—পাশে একটি টিলার উপর একটী কালো ঘোড়ার পিঠে বসে আছে এক কালো সওয়ার। তার কালো বর্ম্ম ও কালো শিরস্ত্রাণ বহ্নিমান গৃহগুলির লাল আভায় অগ্নিময় হয়ে উঠেছে। মনে হয় চারিপাশের আগুনের মাঝে স্বয়ং অগ্নিদেব যেন নেমে এসেছেন।

হূনরা সন্ত্রস্ত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

অত্যাচারিত জনগণের মাঝে মৃদু গুঞ্জন উঠল—কালো সওয়ার! কালো সওয়ার!! কালো সওয়ার!!!

চঞ্চল পরিহাসের ধারাল কণ্ঠে কালো সওয়ার বলে উঠল—আপনি নাকি এতক্ষণ আমারই খোঁজ করছিলেন সাম্রাট্, আমি খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, কি করতে হবে আদেশ করুন।

দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মুখে সহসা কোন কথা যোগাল না।

তার পর মুহূর্ত্ত কয় অসহনীয় স্তব্ধতা। একটা বজ্রপাতের অব্যবহিত পরেই প্রকৃতি যেমন থম্‌থমে হয়ে ওঠে, একবার কামান গর্জ্জনের পরে চারিপাশ যেমন সকল শব্দ হারিয়ে ফেলে, তেমনি কালো সওয়ারের আবির্ভাব হূনদের নির্ব্বাক্ করে দেয়।

—তোমার রক্তচক্ষু আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না মিহিরকুল,—সে পরিচয় তুমি বহুবার পেয়েছ, আজ আর একবার পাবে। কালো সওয়ারের কণ্ঠ বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠল—এই দেশের মেয়েদের গায়ে হাত তোলার আগে জেনে রেখো সম্রাট্ যে কোন মুহূর্ত্তে আমার হাতে তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে। আমার উদ্যত অস্ত্রকে রুখতে পার এমন শক্তি তোমার নেই। প্রমাণ চাও? তোমারই উপর আমি এখনই পরীক্ষা করতে পারি!

কোমর-বন্ধ থেকে একটী ছুরিকা খসিয়ে এনে কালো সওয়ার একবার শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লুফে নিলে, পালিশ-করা ধারাল ছুরির ফলাটি ঝক্ ঝক্ করে উঠল, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ মিহিরকুল

বারেকের জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, তখনই কোন আঘাত পাবার শঙ্কায় তাঁর সারা দেহ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কালো সওয়ারের তীক্ষ্ণ চোখে সে মনোভাব ধরা পড়ল কিনা সে-ই জানে, অট্টহাসিতে সবাইকে চমকে দিয়ে বল্‌লে—শিউরে উঠলে কেন সম্রাট্? অন্যের দেহে যে আঘাত কর নিজের দেহে সেই আঘাত নিতে এত ভয় কিসের? বহু পাপ পুঞ্জীভূত হয়েছে, আঘাত তোমায় পেতেই হবে। আজ আর তোমার এমন শক্তি নেই যে সেই আঘাতকে তুমি প্রতিহত করতে পার। তোমার অত্যাচার করার আর আমাদের অত্যাচার সহার দিন ক্রমশঃ সংক্ষেপ হয়ে আসছে। হিন্দুস্থান আজ তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। সেনানায়ক জেতমানার রক্তে যে তর্পণ আমরা সুরু করেছি, সম্রাট্ মিহিরকুলের রক্তে তার শেষ করব। যে ভারতবাসী একদিন বুকের রক্ত দিয়ে কুরুক্ষেত্রের মাটিকে লাল করেছিল, তারাই আর একবার পরীক্ষা করে দেখবে, তাদের ধমনীতে আর রক্ত অবশিষ্ট আছে কিনা। আজই হোক্ আর কালই হোক্, শীঘ্রই আমরা তোমার সম্মুখীন হ'ব—সেইদিন জানা যাবে তোমার বাহিনী কত শক্তি ধরে।

কালো সওয়ারের আর এক অট্টহাসি চারিপাশ চমকে দিলে।

ক' লহমা চুপ করে থেকে মল্লিকার পানে তাকিয়ে কালো সওয়ার আদেশ দিলে—ওকে ছেড়ে দাও!

যে দু'জন হূন মল্লিকাকে ধরেছিল তারা কি করবে ঠিক করতে পারল না, সম্রাটের মুখের পানে তাকাল।

—ছেড়ে দাও!—গলার স্বর আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে কালো সওয়ার আদেশ দিলে।

কিন্তু সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় তখনও হূন দু'জন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, হাতের ছোরাখানি একবার নাচিয়ে নিয়ে সে ছুঁড়ে দিলে। চকিতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকাখানি এসে বিঁধল একজন হূনের হাতে,—যে হাতে সে মল্লিকাকে ধরে ছিল।

পরক্ষণেই কালো সওয়ার আর একখানি ছুরিকা খসিয়ে আনল তার কোমর-বন্ধ থেকে। সেদিক্ পানে তাকিয়েই হূন দু'জনের হাত শিথিল হয়ে গেল, দ্বিতীয় ছুরিকাখানি নিক্ষেপ করার আর প্রয়োজন হ'ল না।

কিন্তু তাদের জোরেই মল্লিকা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে এবার সে বসে পড়ল। কালো সওয়ার একবার তাকিয়েই তার অবস্থাটা বুঝে নিলে, তার পর আর এক বার হেসে উঠল তার বিশেষ অট্টহাসি। তার পর বললে—যদি প্রাণের ভয় থাকে তা হ'লে তোমরা তফাতে সরে যাও।

সেই হাসি আর সেই কণ্ঠ মল্লিকার চারিপাশের হূনদের মনে এমন শঙ্কা জাগাল যে তারা আর সম্রাটের আদেশের অপেক্ষা রাখল না, তাড়াতাড়ি একটু তফাতে সরে গেল।

কালো সওয়ার চারিপাশে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে, বর্শাটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে ঘোড়ার রাশ টানল। শিক্ষিত ঘোড়া টিলার উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ল তার পরেই বিদ্যুতের মত হূন সেনার মধ্য দিয়ে ছুটল মল্লিকার দিকে।

রাজকুমারীর পাশে এসে ঘোড়া থামল। কালো সওয়ার ঘোড়ার পাশে ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু নাগাল পেলে না, ডাকলে—মল্লিকা!

মল্লিকা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, কোন রকমে একখানি হাত সে মাথার উপর বাড়িয়ে দিলে। তখনই সেই হাতখানি ধরে কালো সওয়ার তাকে দাঁড় করাল, তার পর চকিতে তাকে তুলে নিলে ঘোড়াব উপর। মল্লিকা তখনও থরথর করে কাঁপছে। কোন রকমে তাকে সামনের দিকে বসিয়ে নিয়ে কালো সওয়ার রাশ টেনে ধরল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিহিরকুল গর্জ্জে উঠল—খবরদার!

নিমেষমধ্যে কালো সওয়ারের বর্শা-ফলক মাথার উপর ঝল্‌কে উঠল, পরক্ষণেই তা মিহিরকুলের ঘোড়ার গলা ভেদ করল। আহত ঘোড়া আর্ত্তনাদ তুলে ধরাশায়ী হ'ল। হূন সম্রাট্ লাফিয়ে পড়লেন মাটির উপর। কালো সওয়ার আর একবার হা-হা করে হেসে উঠল তার শঙ্কা-জাগানো অট্টহাসি। চকিতে তার ঘোড়ার ক্ষুরে আগুনের ফুল্‌কি দেখা দিল, বিদ্যুতের বেগ দেখা দিল তার গতিতে।

হূনেরা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল, কালো সওয়ার সামনে দিয়ে ঝড়ের মত চলে যেতে তারা সম্বিৎ ফিরে পেলে, তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—ধর ধর, পাকড়াও—

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

হৈ-চৈ কর্‌তে কর্‌তে হূন সওয়ারেরা ছুটল কালো সওয়ারের পিছনে।

এক ঝাঁক ধারাল তীর ছুটে গেল তার পাশ দিয়ে। ঠক্ ঠক্ করে দু' একটা বর্ম্মে লেগে ঠিকরে পড়ল। সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে কালো সওয়ার বরাবর নেমে চল্‌ল ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে।

সামনেই স্রোতস্বতী।

নদীর ওপারেই বন।

কোন রকমে নদীটি একবার পার হয়ে ওপারের বনমধ্যে প্রবেশ করতে পারলেই উপস্থিত নিরাপদ হওয়া যায়। কালো সওয়ারের অভ্যাস আছে, একেবারে ঘোড়া শুদ্ধ লাফিয়ে পড়ল জলস্রোতের বুকে।

কিন্তু জল স্পর্শ করার আগেই আর এক ঝাঁক তীর এসে পড়ল তার উপর। একটি বিঁধল

তার উরুতে,—জানুর লৌহবর্ম্মের সংযোগে। কালো সওয়ার তার কিছুই টের পেলে না, ক্ষণেক পরে জলমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অল্পক্ষণেই বেগবান্ ঘোড়া তা'দের দু'জনকে নিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছাল। পার থেকেই ঘন জঙ্গল। ঘোড়া ও সওয়ার গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল।

হূনেরা কিন্তু তখনও তার সঙ্গ ছাড়ে নি। দিনের আলোয় কোন দিন তারা কালো সওয়ারকে এত কাছাকাছি পায় নি। সোরগোল তুলে তারাও নদী পার হ'তে সুরু করল।

এদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া যতই অগ্রসর হয়, তার প্রতি পদক্ষেপে কালো সওয়ারের মনে হয় সারা দেহের মধ্যে যেন রিম্ ঝিম্ করছে। কিন্তু সহসা কিসের জন্য যে এই দুর্ব্বলতা তা সে বুঝতে পারে না।

একটা বড় গাছের নীচে একটু বিশ্রাম করার জন্য সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গেল কিন্তু উরুর আহত স্থান থেকে নদীর জলে অলক্ষ্যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে শরীর এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে রেকাব থেকে পা পিছলে গেল। নিজেকে সামলাতে পারল না, পড়ে গিয়ে গাছের নীচে একখানি পাথরে মাথা ঠুকে গেল। কালো সওয়ার আর মাথা তুলতে পারল না, লুটিয়ে পড়ল সেই পাথরখানির পাশেই।

মল্লিকা ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে। পাহাড়ী নদীর শীতল জল তার সারা দেহে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে, অবসন্ন স্নায়ুগুলোকে আবার সতেজ করে তুলেছে। কিন্তু তখনও পূরোপূরি শক্তি ফিরে পায় নি। কোন রকমে ঘোড়ার উপর বসেছিল, ওই পর্য্যন্ত।

কালো সওয়ার পড়ে যাবার পর ঘোড়াটি চিঁহি করে একবার ডেকে উঠল। অজানা কি-একটা তখনও পিঠের উপর রয়েছে দেখে একটা ঝাঁকানি দিলে। অবলম্বন অভাবে মল্লিকা গড়িয়ে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

পড়ল মাটিতে নয়, কালো সওয়ারের বর্ম্ম আঁটা আহত পায়ের উপর। ঝনাৎ করে বেজে উঠল পায়ের বর্ম্ম; ব্যথার উপর ব্যথা পেয়ে কালো সওয়ার অস্ফুট গোঁয়ানি তুলল।

আঘাত ও আকস্মিকতায় মল্লিকার মন থেকে অশক্তি ও আচ্ছন্নতার পর্দ্দা সরে গেল। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল কালো সওয়ারের পাশে। কালো সওয়ারের কালো বর্ম্মের পানে তাকিয়ে একে একে অনেক কথাই তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল, আসল মানুষটিকে চেনবার অদম্য কৌতূহল দেখা দিল মনে। কালো-সওয়ারের মুখের বর্ম্ম সে খুলে ফেলল। কিন্তু মুখখানি দেখেই সে চমকে উঠল—সে মুখ রাজবৈদ্য বিষ্ণুবর্দ্ধনের।

সেই সময় নদীর কিনারে সোরগোল শোনা গেল। হূনেরা কালো সওয়ারের অনুসরণ

করে এপারে এসে খোঁজাখুঁজি করছিল। ঘোড়ার হ্রেষা শুনে তারা সেখানে এসে পড়ল। মল্লিকার দেহে তখন এমন শক্তি নেই যে অচেতন বিষ্ণুবর্দ্ধনকে তাড়াতাড়ি অন্তরালে কোথাও সরিয়ে নেয়। অনতিবিলম্বে হূনেরা এসে তাদের দু'জনকেই ধরে ফেল্‌ল। (ক্রমশঃ)

মনিব্যাগ

শ্রীসুবলচন্দ্র ভড়, বি.এস্‌-সি

রবিবারের একটা মায়া আছে—বিশেষতঃ রবিবারের সন্ধ্যার। সারাদিনের আরামের আমেজ ও নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার পর সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইয়া রামবাবু ধরণীকে এক নূতন চক্ষে দেখিলেন। জীবনের গতির পরিচয় পাইলেন জনস্রোতের চলার ছন্দে। অফিস-কেরাণীর একঘেয়ে জীবন-যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে যে এত কোলাহল, আনন্দের জন্য এত অধীর উন্মুখতা আছে—সেটা তিনি কোনদিন জানিবার অবসর পান নাই। রামবাবু সুন্দরী নগরীকে আজ নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন।

সরকারী পার্কে বৃদ্ধদের অলস গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। রামবাবু এক পা দু পা করিয়া হাতের লাঠিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাগানে ঢুকিয়া পড়িলেন। ভিতরে কয়েকজন স্বাস্থ্যান্বেষী চক্রাকারে হাঁটিতেছিলেন; রামবাবুর হাঁটিবার প্রয়োজন নাই, প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর স্বাস্থ্য অটুট—দেহে অমিত শক্তি। রামবাবু একটী বেঞ্চের অর্দ্ধেক যুড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। বেঞ্চের অপরার্দ্ধের অধিকারী সবুজ র‍্যাপার জড়ান এক স্থূলকায় ভদ্রলোক। পরিচ্ছদ দেখিয়া তিরিশ টাকার কেরাণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে হয় না। খানিক চুপচাপের পর অপর ব্যক্তিই আলাপ সুরু করিলেন। পকেট হইতে একটী বিড়ি বাহির করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"মশায়ের ধূমপান করা হয়?"

"না, ধন্যবাদ।" রামবাবু বিনীত উত্তর দিলেন।

"য়্যাঁ—বলেন কি!" ভদ্রলোক অবাক্ হইয়া গেলেন। তার পর বিড়িটা ধরাইয়া লইলেন এবং দু' তিনটি সুদীর্ঘ আরাম টান দিয়া নিজের চারিপাশে আরব্যোপন্যাসের দৈত্যরূপী ধূম্রকুণ্ডলীর সৃষ্টি করিলেন।

"খাঁটি লোক মশাই আপনি"—তিনি সুরু করিলেন—"ছেলেবেলায় রসগোল্লা ভালবাসতাম বলে দরিদ্র পিতা বলতেন—'ওরে অত রসগোল্লা খাস নে—রসাতলে যাবি কিংবা গোল্লাতেও যেতে পারিস।' কিন্তু ও দুটী সাক্ষাৎ নরকের ভয়ও আমার রসগোল্লা-প্রীতি কমাতে পারে নি—এবং সেজন্য রসাতলে গেছি কি গোল্লায় গেছি সে আপনিই বিচার করবেন। গোল্লায় যাবার শ্রেষ্ঠ পথ কিন্তু, মশাই,—এই ধূম্র সেবন। ঠিক কিনা বলুন?"

যেখানে উত্তর আশা না করিয়া প্রশ্ন করা হয় সেখানে উত্তরে বাধে বিভ্রাট; অতএব মৌনং সম্মতিলক্ষণম্‌ই একমাত্র পথ। রামবাবু নিতান্ত নিরীহ, অতএব এই পথই তিনি নির্ব্বাচিত করিলেন।

পা দুটী তুলিয়া লইয়া ভদ্রলোক জাঁকাইয়া বসিলেন। "আর ধোঁয়া কে না খায় বলুন?" তিনি সুরু করিলেন—"আমরা বিড়ি-তামাক ধরিয়ে ধোঁয়া খাই, মা-লক্ষ্মীরা খান উনুন ধরিয়ে। আর দেবতার নেশা ধূপের ধোঁয়ার। আধুনিক কালের মানুষই ধোঁয়া-পাগল, মশাই, ধোঁয়া-পাগল। আমাদের ভাবনা-চিন্তাগুলোও, দেখ্‌ছেন না, আজকাল কেমন ধোঁয়াটে হ'য়ে আস্‌ছে।" বক্তৃতা শেষ করিয়া ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

রামবাবু স্বল্পভাষী। সঙ্গীর অজস্র বাক্যস্রোতের নায়াগ্রা প্রপাতে তাঁর ক্ষুদ্র আলাপ-প্রচেষ্টা তলাইয়া গেল। ভদ্রলোক ধূম্রপর্ব্ব শেষ করিয়া রাজনীতি ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিবার উপক্রম করিলেন। তার পর সহসা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—"বসুন মশায়, আমি দুটো পাক দিয়ে আসি—ওটা আমার নিত্যকর্ম্ম।" ভদ্রলোক উঠিয়া গেলেন।

রাত হইয়াছে। পার্ক প্রায় নির্জ্জন হইয়া গিয়াছে। রামবাবু উঠিলেন। সহসা বুকপকেটে হাত দিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁর মনিব্যাগ? মাত্র গতকল্য তিনি মাহিনা পাইয়াছেন। নগদ দেড় শত টাকা সবই যে উহার মধ্যে। সামনে সারা মাস বাকী। সংসারের বিরাট্ হাঁ তিনি বুঁজাইবেন কি দিয়া? রামবাবু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং লোকটী যে দিকে গিয়াছিল সেইদিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু না, তার পিছন হইতে যে আগাইয়া আসিতেছে—হাঁ, সেই ত, রামবাবু র‍্যাপার চিনিলেন, লোকটীর সাহসে তিনি অবাক্ হইলেন। দুই লাফে তার সন্নিকটে পৌঁছিয়া তিনি লাঠিটা তার মাথার উপর উচাইয়া ধরিয়া মনিব্যাগ দাবী করিলেন। লোকটী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর আদেশ পালন করিল। ব্যাগ খুলিয়া রামবাবু নোটের তাড়াটি দেখিয়া লইলেন, হাঁ, ভিতরে ঠিকই আছে। গ্যাসের পাংশু আলোকে লোকটীর ভয়ার্ত্ত মুখ দেখিয়া রামবাবুর মায়া হইল। নিজের জিনিষ ত পাইয়াছেন। পুলিসের হাঙ্গাম

আর নাই বা করিলেন। লোকটীরও যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। রামবাবু সোজা বাড়ী আসিলেন এবং আজিকার এই লোমহর্ষণ গল্পটী কিরূপে স্ত্রীর নিকট বিবৃত করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

"কি ভুলো মন গো তোমার!" স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ঘরে ঢুকিলেন—তাঁর হাতে একটী মনিব্যাগ। "সকালে বাজারের টাকা বার করবার জন্য ব্যাগ বার ক'রে বসবার ঘরের টেবিলে ফেলে রেখে দিলে—তার পর তুলতে আর মনে পড়ল না! ভাগ্যে আমার চোখে পড়ল। চাকর-বাকরের ঘরকন্না—তোমার কি একটু সাবধান হওয়া উচিত নয়?"

হেমাঙ্গিনীর শেষের কথাগুলি রামবাবুর কানে ঢুকিল না।

শরৎ-প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হচ্ছে দেবানন্দপুর। কিন্তু তাঁর জীবনের অনেকটা সময় তিনি পাণিত্রাসে কাটিয়ে যান। তাঁর দিদি অনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়ীও এই পাণিত্রাসে। আমার কাকা ডাক্তার রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন এই গ্রামের একজন চিকিৎসক। সেই সূত্রে তিনি শরৎবাবুর বাড়ীতেও চিকিৎসা করতেন। কিন্তু শরৎবাবু তাঁকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করতেন—বন্ধুর মত ভালবাসতেন। তোমরা শরৎবাবুকে শুধু সাহিত্যিক হিসেবেই চিনেছ—কিন্তু তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার কথা শুনলে সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়। তিনি প্রায়ই বলতেন, "ডাক্তার, আমি গল্প পড়ি নে।" তিনি সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন অধ্যবসায়ী ছাত্রের মত, গল্প পড়বার সময় তাঁর কোথায়? তিনি প্রত্যেক বই-ই পড়তেন বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে। প্রয়োজনীয় জায়গায় তিনি দাগ দিয়ে দিয়ে পড়তেন। যেখানে যে দুরূহ শব্দ পেতেন তার অর্থ অভিধান দেখে পাশে পাশে লিখে রাখতেন। গল্পের মত করে তিনি কোনদিন কোন বই-ই পড়তেন না। এই না হ'লে কেউ কি কোন দিন এত বড় সাহিত্যিক হ'তে পারে?

শরৎচন্দ্র খুব ভাল দাবা খেল্‌তে পারতেন—এক একটা খেলা দু' তিন দিন ধরে চলত। এ বিষয়ে হৃদয় নামক স্থানীয় জনৈক স্বর্ণকার তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিল।

শরৎচন্দ্র যখন যুবক তখন তাঁর গান-বাজনার সাজ-সরঞ্জাম ছিল। তিনি

শরৎচন্দ্র

নিজেও মন্দ গাইতেন না। একবার আমাদের বাড়ীতেই তাঁর গানের আসর তৈরী হয়েছিল। পাড়ার পাঁচজন জুটল, তিনি গান গাইলেন। অত বড় সাহিত্যিক হয়েও তিনি ছিলেন এমনি মিশুক।

আর একবারের কথা বলছি। আমি তখন ছোট। আমি ও আমার

একজন সঙ্গী—দু'জনে চলেছি শরৎবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়ে। আমার সঙ্গীটিই প্রথম কথা কইল, "দেখ্ দেখ্, শরৎবাবুর গাছে কি রকম পেয়ারা ধরেছে!" আমি হতাশ ভাবে বল্‌লাম, "বেল পাকলে আর কাকের কি?" ব্যস্, এ সম্বন্ধে আর কোনও কথাবার্ত্তা হয় নি। একটু এগিয়েছি, পিছন হ'তে ডাক পড়ল, "বাবু, বাবু!" লোকটাকে চেনা ছিল না, বল্‌লাম, "কি দরকার?"—"ওই যে দোতলা বাড়ীর বাবু, যাঁর ওই টালির ছাদ, আপনাদিকে ডাক্‌ছেন।" আমরা বল্‌লাম—"কে, শরৎবাবু?" সে বল্‌ল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বাবু—যে বাবুর নাম করলেন।" আমরা বল্‌লাম, "শুন্‌তে ভুল করেছ। আমাদের তিনি ডাকছেন, অসম্ভব!" লোকটী ফিরে গেল, যেতে যেতে বল্‌ল, "দাঁড়ান, আমি আস্‌ছি।" কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে এল—"হ্যাঁ, আপনাদিকেই বাবু!" বিস্মিত হ'লাম, কারণ তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় তখন আমাদের দু'জনের কারুরই নেই। তবু তাঁর কাছাকাছি গিয়েই ব্যাপারটা বুঝলাম। শরৎবাবু বসে আছেন একটী চেয়ারে, সামনের টেবিলেই গুটিকতক পেয়ারা। আমরা যেতেই কোন কথাবার্ত্তা না বলে পেয়ারা ক'টী আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তার পর স্মিতহাস্যে বল্‌লেন—"বেল পাকলে কাকের কি হয়?" আমরাও মৃদু মৃদু হাসতে লাগলাম।

নবীন সাহিত্যিকদের তিনি খুব উৎসাহ দিতেন—"লেখ, লেখ, লিখে যাও, হাল ছেড় না। সব জিনিষেই উদ্যম থাকা চাই। গাইতে গাইতে গায়ক, লিখতে লিখতে লেখক। তবে লিখ্‌তে হ'লে জ্ঞান আহরণ করা চাই; বহু বই পড়বে—বহুৎ, বহুৎ। গল্পের মত ক'রে কোন জিনিষ কখনও প'ড় না—তা'তে লাভ নেই, মিছে সময় নষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি।" তিনি প্রথম প্রথম তাঁর নিজস্ব বই গ্রামের লোককে পড়তে দিতেন। কিন্তু তা'র ফলে অনেকেই তাঁর মাথায় হাত বুলাবার চেষ্টা করে। শেষে বাধ্য হয়েই তাঁকে ও ভাবে বই দেওয়া বন্ধ করতে হয়। তবে তাঁর বাড়ী বসে যাতে লোকে বই পড়ে আসতে পারে এ ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

শরৎবাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখেছিলেন শুধু দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য। কত অনাথ আতুর যে তাঁর বিনা মূল্যের অমূল্য ঔষধে মৃত্যুর করাল কবল

থেকে ফিরেছে তার ইয়ত্তা নেই। শরৎবাবু লিখতেন ভিতরের একটা আবেগময়ী ইচ্ছায়। তার প্রমাণ তোমাদের একদিনের ঘটনা থেকে দিলেই যথেষ্ট হবে। সেদিন তাঁর বাড়ীতে গ্রামোফোন শুন্‌তে গেছি। অনেক অতিথি অভ্যাগত—গান হচ্ছে। শরৎবাবুও গান শুনছেন আর মাঝে মাঝে গল্পগুজব করছেন। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন—তার পর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা নিজের টেবিলের ধারে চলে এলেন। সেখানে তাঁর লিখবার সাজসরঞ্জাম সমস্তই প্রস্তুত। তিনি চেয়ারে বসে গড়্‌গড়্ করে লিখে চল্‌লেন বহুক্ষণ ধরে। যেন কলম আরও জোরে চালাতে পারলে ভাল হয়। তার পর যখন ফিরলেন তখন তাঁর মুখের ভাব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এমনও দেখা গিয়েছে তিনি একটা লেখা লিখ্‌তে লিখ্‌তে তাকে অসম্পূর্ণ ভাবে ফেলে রেখেই আর একটা লিখ্‌তে আরম্ভ করেছেন। আবার দিন কতক বাদে যখন খেয়াল হয়েছে তখন পূর্ব্ব গল্পটায় হাত দিয়েছেন।

শরৎবাবু ছিলেন একজন মস্ত বড় স্বদেশ-প্রেমিক। তবু সে অন্তঃসলিলা ফল্গুকে কি কেউ সহজে চিন্‌তে পারত? তখন তাঁর বাড়ী তৈরী হচ্ছে। কাকা বল্‌লেন, "দেখুন শরৎবাবু, আপনার বাড়ী তৈরীতে যা খরচ হ'ল তা'তে অনায়াসেই একটা কোঠা উঠ্‌ত।" শরৎবাবুর পাণিত্রাসের বাড়ী যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন কথাটা কত সত্যি। শরৎবাবু হেসে বল্‌লেন, "আমার গাঁয়ের লোক দু'মুঠো খেতে পেয়ে যে বাড়ী তৈরী করে দেয় সে কি ইমারতের চেয়ে সুন্দর নয় ডাক্তার?" বুঝ্‌তে পার্‌ছ তাঁর গাঁয়ের জন্য ভালবাসা কত গভীর! শেষ জীবনে তিনি বালীগঞ্জে বাড়ী করলেও তাঁর এই পল্লীমায়ের কোলে মাঝে মাঝে পালিয়ে আসতেন, বলতেন, "এই আমার ভাল, এই পল্লীমায়ের কোল, এই রূপনারাণের রূপ। সহরের কোলাহল আর আমার ভাল লাগে না।"

তাঁর দানের কথা বলে এবার শেষ করব। তাঁর মৃত্যুতে আমি অনেক অতিথ ফকিরকে কাঁদ্‌তে দেখেছি। তারা বলেছে, "তিনি আমাদের মা-বাপ ছিলেন বাবু! তাঁর কাছে গিয়ে কখনও খালি হাতে ফিরতে হয় নি।"

বেতারে চিত্র

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী

টেলিফোনে তোমরা একজন আর একজনের সঙ্গে কথা ব'লে থাক, কিন্তু যা'র সঙ্গে কথা বল্‌ছ তা'কে তো আর দেখতে পাও না। কথা বল্‌বার সময় সে দুষ্টুমি ক'রে তোমায় মুখ ভ্যাংচাল কিনা কিংবা জিভ কাটল কিনা তা দেখে যে তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে তার উপায় নেই। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা এমন ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন যা'র ফলে টেলিফোনে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যা'র সঙ্গে কথা বলা হ'চ্ছে তা'কে পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় চোখের সামনে। এটা সম্ভব হ'য়েছে দূরদর্শন (Television) বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে।

সাধারণ ছবি   বেতারে পাঠান ছবি

এই বিজ্ঞান আজ কত দ্রুত উন্নতির দিকে চলেছে তার দু' একটী পরিচয় তোমাদের দিচ্ছি। বেতারে যেমন খবর পাঠানো যায় তেমনি আবার বেতারে ছবিও প্রেরণ করা চলে—সে কথা বোধ হয় তোমরা ইতিপূর্ব্বেই রামধনুতে পড়েছ। বেতারে যখন জীবন্ত প্রাণীর চলাফেরা বা গতির ছবি কিংবা কোন সজীব ছবি পাঠান হয় তখন তার নাম দেওয়া হয় দূরদর্শন বা 'টেলিভিসন'। এই দুই পদ্ধতির দ্বারা আজ অনেক অসম্ভব সম্ভব হ'য়েছে। মনে কর, বিকেল বেলা মনটা ভাল লাগছে না—কলকাতার মাঠে ভাল খেলা নেই, সিনেমাও সব হয়তো দেখে শেষ করেছ। এখন কি ক'রে সময় কাটে? যদি দূরদর্শন যন্ত্র থাকে—খুলে দাও;

হয়তো লণ্ডনের একটী খেলা দেখলে, না হয় প্যারিসের বায়স্কোপ-থিয়েটারই উপভোগ ক'রতে লাগলে। ইউরোপে যুদ্ধ চ'লছে ভীষণ ভাবে – খবরের কাগজের টুক্‌রো সংবাদ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চ'লছে; বা ছোট ছোট ছাপান ছবি দেখে একটা ক্ষীণ ধারণা মনে সৃষ্টি ক'রছ। দূরদর্শন যন্ত্র যদি থাকে তবে তোমাকে পায় কে? যন্ত্রের কল্যাণে যুদ্ধের সব দৃশ্য ভেসে উঠবে তোমার চোখের সামনে ঝুলান পর্দ্দার উপরে।

দূরদর্শন বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতি হ'য়েছে ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায় ও বিশেষ করে জার্ম্মানীতে।

জার্ম্মানীতে একটী বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা সবাক্ চিত্র প্রস্তুত এবং বেতার-যন্ত্রে ফিল্ম দেশদেশান্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। প্রথমে একটী গাড়ীতে বেতার দূরদর্শন এবং চলচ্চিত্রের সরঞ্জাম ঠিক করে রাখা হয়। তার পর গাড়ীটীকে প্রয়োজন অনুযায়ী জায়গায় নিয়ে সবাক্ চিত্র গ্রহণ ক'রে গাড়ীর মধ্যেই ফিল্ম প্রস্তুত করা হয়। তার পর সেই ফিল্মকে বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। এইবার এই বেতার-তরঙ্গ ইচ্ছামত দিকে দিকে প্রেরণ করা যেতে পারে। এইভাবে অষ্ট্রেলিয়ার ফুটবল খেলাও ভারতবর্ষে দেখান অসম্ভব নয়।

টেলিভিসন যন্ত্রের সামনে আমেরিকার মেয়েরা

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ধীরে ধীরে এই যন্ত্রের প্রচলন সুরু হ'য়েছে। এই

ব্যাপারটিকে আরও নানা ছোটখাট ব্যাপারে লাগাতেও ওদেশের বৈজ্ঞানিকেরা কসুর করছেন না। একটা উদাহরণ দেই। ধর, স্কুলে যখন মাষ্টার মশাই তোমাদের অঙ্ক শেখাতে আরম্ভ করেন তখন তিনি পেছন ফিরে বোর্ডে অঙ্কের সংখ্যা লিখে বোঝাতে থাকেন। এতে ছাত্র ও শিক্ষক—উভয়েরই একটু অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। জার্ম্মানীর একটী স্কুলে এই অসুবিধা দূর করা হ'য়েছে। সেখানে শিক্ষক ছাত্রদের দিকে মুখ রেখে বোঝাতে থাকেন এবং যা' লিখবার সামনে টেবিলের ওপর সেলোফেন নামক এক প্রকার ধাতুর পাতে লিখতে থাকেন। এদিকে ঐ লেখা পেছনের দিকে ঝুলান পর্দ্দায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হয়। কেমন মজা বল তো?

আমাদের দেশে এখনও এই বিজ্ঞানের প্রচলন হয় নি। কিন্তু আবিষ্কার যখন হ'য়েছে তখন একদিন আমাদের দেশেও এর প্রচলন হ'বে বৈ কি! সুতরাং সবাই অপেক্ষা ক'রে থাক।

হরে মাঝি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১১

হরির পূর্ব্বের সে অধীরতা আর নাই। সাধুবাবার সংস্পর্শে আসা অবধি সে পৃথক্ মানুষ হইয়াছে। 'কটা'র এই আকস্মিক ক্ষণিক দর্শনে সে বিচলিত হইল না। কোন আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করিল না। জয়গৌরবেও তাহার কোন উল্লাস পরিলক্ষিত হয় নাই।

বজ্‌রা ভাটায় তর তর বেগে ছুটিয়াছে। যখন প্রায় সন্ধ্যা অতীত হইল, দীনু, তিনু ও দু'জন কর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া হরি বজ্‌রা ত্যাগ করিল। তাহার জন্য একখানি সুন্দর ছোট ডাউলে সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা উহাতে আরোহণ করিয়া ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই কর্ম্মকাণ্ডে পৌঁছিল। সেখানকার কর্ম্মীরা বিপুলভাবে হরির সংবর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিল। হরি সঙ্কোচে ও বিনয়ের সহিত বার বার নমস্কার জানাইয়া আশ্রমে তাহার নির্দ্ধারিত আবাস অভিমুখে রওনা হইল। দীনু-তিনুও সঙ্গে গেল।

আশ্রম সচিব সহাস্যবদনে হরিকে অভিনন্দিত করিলেন। হরি প্রথমেই বালগোপাল মন্দিরে গিয়া—

"নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

বলিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবতাকে প্রণাম করিল। তার পর কমলে কামিনীর মন্দিরে সতৃষ্ণ সজল নয়নে দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রণিপাত জানাইল। আশ্রম-সচিব বলিলেন—"মা, রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কমলে কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া দীনু তিনুর আনন্দ ধরে না। এ যে তাহাদের চির আরাধ্য দেবী প্রতিমা। সন্তান যেন বহুদিন পর জননীর দর্শন লাভ করিল। তিনুর মনে হইতে লাগিল—এ মূর্ত্তি জীবন্ত, ইহার সঙ্গে 'দুটো দুখের কথা কই'। আশ্রম-বালকেরা এক সঙ্গে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইল। তিনু এতগুলি অনিন্দ্যকান্তি সমবয়স্ক বালক এক সঙ্গে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল, বলিল, "এ যে চাঁদের হাট!—এরা সমুদ্রে থাক্‌লে মুক্তা হ'ত—আকাশে থাক্‌লে তারা ত হ'তই। এ কি স্বর্গে এলাম নাকি? আমি এই স্বর্গেই থাক্‌তে চাই—অন্য স্বর্গে আমার আবশ্যক নাই।" উল্লাসে আশ্রম-সচিবকে বলিল—"দাদাঠাকুর, আমি এদের কাঁধে করে নাচ্‌ব, ফুলের মালা গেঁথে দেব, আমায় কেবল এক মুঠো করে ভাত দিয়ো—কোথাও যাব না। চোখ ভরে এদের দেখব, বুক ভরে ভালবাস্‌ব, এদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার দাঁত দিয়ে তুলে দেব"। তিনুর কথায় হরির গম্ভীর মুখেও হাসি দেখা দিল।

বিদায় লইয়া হরি দীনু তিনুর সঙ্গে তাহার আবাসে প্রবেশ করিল—সেখানে আহার ও শয়নের ব্যবস্থা ছিল।

আহারাদির পর তিনুকে দীনু বলিল—"দেখ, এ তোমার গ্রাম নয়—সাধুদিকে দাদাঠাকুর বল না, মনে কররেন কি?"

তিনু—"কেন ভাই, দাদাঠাকুর বলায় দোষ কি? দাদাঠাকুরের বড় ত বাবাঠাকুর, তাই বলব কি?"

দীনু—"শুধু 'বাবা' সম্বোধন করলেই চলবে—ছেলে বুড়ো সবাইকেই এই নামে ডেকো, শুনতে ভাল লাগবে।"

তিনু—"আচ্ছা! তোর কি এত বুদ্ধি দীনু! শেষ কালে দেখছি ভগবান্ কপালে বহু সুখই লিখেছে। এই রাজার মত আহার, খাসা খাটে শয়ন, তার উপর চাঁদের হাটের মধ্যে থাকা!"

সন্ধ্যার পর দীনু ও তিনুকে সঙ্গে লইয়া হরি সাধুবাবার সন্দর্শনে গেল। তিনু শিকলে

বাঁধা প্রকাণ্ড বাঘ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—বলিল, "ওরে বাবা! আঁকা বাঘ যে এখানে জীবন্ত হয়েছে! ছবি প্রাণ পেয়েছে।"

সাধুবাবা প্রসন্ন দৃষ্টিতে হরির পানে চাহিলেন। তাহার ভাগিনেয়কে পাইবে এই ভবিষ্যৎবাণী করিলেন। দীনু তিনুর মস্তকে হস্ত দিয়া ভগবানের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন।

তিন জনে সাধুর পদধূলি লইয়া, জীবন সার্থক মনে করিয়া আশ্রমে ফিরিল।

হরি 'কর্ম্মকাণ্ডে' গিয়া শুনিল—গোয়েন্দা গোপন সংবাদ আনিয়াছে। সমস্ত সংবাদ সে সম্ভ্রমে হরিকে নিবেদন করিল। পাগলা দহের নিকট একটা নির্জ্জন চরে এক সাহেবের প্রকাণ্ড সুন্দর বাগানবাড়ী আছে, 'কটা' সেখানে আমোদ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইতেছে। সেখানে কাহারও প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। সেখানকার মালী পূর্ব্বে মঙ্গলকোটে সহিসের কাজ করিত, হরি তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল তাই সে নিজের বিপদ্ উপেক্ষা করিয়া গোয়েন্দাকে বাগান বাড়ীর সমস্ত দেখাইয়াছে। গোয়েন্দা একটী নক্সা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে—কটা কোন্ ঘরে থাকে, কোথায় বেড়ায় এবং অন্যান্য বিবরণও তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে। গোয়েন্দা জানাইল—কটাকে উদ্ধার করা কঠিন। কারণ সে স্ব-ইচ্ছায় ফিরিবে মনে হয় না। বাড়ী ঘেরাও করিয়া, দাঙ্গা করিয়া তাহাকে লইয়া আসিতে হইবে। গোয়েন্দা অধিকন্তু জানাইল যে 'ডাইক্'কে মুক্তি দেওয়া ভাল হয় নাই। সে পুনরায় আমাদের বহর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। এ বিষয়ে কটার আগ্রহ ও উত্তেজনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হরি ধীর ভাবে সব শুনিয়া, নক্সা প্রভৃতি লইয়া গোয়েন্দাকে বিদায় দিল।

দুই সপ্তাহ অতীত না হইতেই এক বিশিষ্ট দূত মারফৎ ডাইক্ সাহেবের এক পত্র হরির হস্তগত হইল। অনুবাদ করিলে উহার ভাব এইরূপ দাঁড়ায়—

"আমি আপনার বীরত্ব ও সৌজন্যের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ দিতে চাই। আপনি একাকী বা সদলবলে উপস্থিত হইবেন। স্থান, সময় পত্রবাহক জানাইবে। আপনার সুবিধা মত স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করিয়াও দিতে পারেন।"

অনুগত

ডাইক্।"

(ক্রমশঃ)

অরুণের গল্প

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, এম্.এ

আমাদের ক্লাসের অরুণকে আমরা সবাই হিংসে কর্‌তুম। ঐ তো নিরীহ গোছের ছোটখাট মানুষটী, বয়সে আমাদের সবার চাইতে ছোটই হবে হয় তো। কিন্তু এমন সব চমৎকার গল্প সে লেখে যে বাংলার সেরা মাসিকগুলোতে প্রায় প্রতিমাসেই ওর গল্প পড়ে সবাই বাহবা দেয়। আমাদের হেড্‌মাষ্টার থেকে সুরু করে কেরাণীবাবু পর্য্যন্ত সবাই একবাক্যে বলেন অরুণ আমাদের স্কুলের গৌরব, এবং এই বয়সেই সে যে আশ্চর্য্য প্রতি ভার পরিচয় দিয়েছে তাতে অদূরভবিষ্যতে সে যে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হবে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই। কাজেই এই ভাবী শ্রেষ্ঠ-সাহিত্যিককে সবাই অসম্ভব রকম খাতির করেন। খুন কর্‌বার লোক অরুণ নয়, কিন্তু সে সাত খুন কর্‌লেও বোধ হয় তা মাপ হয়ে যেত। ক্লাসের সবগুলো পরীক্ষাতেই যে অরুণ প্রথম হয়, আমাদের নিশ্চিত ধারণা তার সব চেয়ে বড় কারণ সে ভাল গল্প লেখে বলে স্যরেরা তাকে বেশী নম্বর দিয়ে থাকেন। গল্প লিখ্‌তে পারি না বলেই আমরা সবাই ওর চাইতে কম নম্বর পাই। এ অন্যায় মুখ বুজে সয়ে থাকা কি সোজা কথা? তাই অরুণের ওপর আমরা সবাই চটা। ওর গল্প প্রত্যেকটী আমরা পড়ি, ভালোও লাগে খুব; যত ভালো লাগে ওর ওপর তত বেশী রাগ হয়। কেন সে এত কম বয়সে এত ভালো লিখ্‌বে?

এই সময় সুনীল এলাহাবাদ থেকে এসে আমাদের সঙ্গে ভর্ত্তি হ'ল। তার বাবা এসেছেন এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হয়ে—নানা ভাষায় সুপণ্ডিত তিনি। সুনীল নতুন এসেই আমাদের ওপর বেশ প্রতিপত্তি করে নিল। আশ্চর্য্য রকমের তুখোড় ছেলে সে। দেশ-বিদেশের সমস্ত খবর যেন তার নখ-দর্পণে, যদিও পাশের পড়ার দিকে তার বড় একটা নজর দেখা গেল না।

অরুণকে সে প্রশ্ন কর্‌লো, "তুমি অমন চুপচাপ থাক কেন ভাই? ঠিক যেন একঘরে।"

অরুণ কিছু বল্‌বার আগেই আমরা বল্‌লুম, "ও মস্ত লেখক কিনা, তাই আমাদের সঙ্গে মিশ্‌বে কেন?"

সুনীল বল্‌ল, "ওঃ, তুমি লেখক! বেশ তো। কি লেখো ভাই তুমি?"

"গল্প।"

"বেশ। আমায় একবার তোমার লেখা পড়িও তো ভাই। আমি বাংলা লেখা বড় একটা পড়ি না।"

"কেন?"

"বাংলা তো আছেই হাতের পাঁচ। আমি সব বিদেশী লেখা পড়ি। বাবার কাছে অনেকগুলো ভাষা শিখি কিনা! রাশিয়ান্, স্প্যানিশ্, রুমানিয়ান্, পোলিশ্—আরো অনেক কিছু, সে সবের নামও তোমরা জানো না।" শুনে আমরা প্রথমটা ভড়্কে গেলুম। কি সর্ব্বনাশ! এক গল্প-প্রতিভা নিয়েই তো অস্থির ছিলুম, আবার কোত্থেকে ভাষা-প্রতিভা এসে জুটলো! শেষটায় কিন্তু খুশী হলুম এই ভেবে যে নতুন একটী প্রতিভার আবির্ভাবে অরুণের দেমাকটা কম্‌বে বাধ্য হয়ে। অরুণ আর একচ্ছত্র রইল না।

"কী সব শক্ত ভাষা!" সুনীল বল্‌তে লাগ্‌লো। "তবু আমি খুব ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে শিখে আস্‌ছি বলে আমার কাছে এখন সোজা হয়ে গেছে। প্রায় বাংলার মত সোজা হয়ে গেছে। তাই ওসব ভাষায় গল্প, কবিতা, নাটক হর্‌দম পড়ি। অভ্যাস না রাখ্‌লে শেষকালে হয়তো বা আস্তে আস্তে ভুলে যাবো। বুঝ্‌লে না?"

মনে মনে আমরা বল্‌লুম, "একেই বলে বাপের ব্যাটা।"

সুনীল বল্‌ল, "এবার ভাই তোমার লেখা পড়ে একটু মুখ বদ্‌লে নেবো। কাল তোমার লেখা যা পার নিয়ে এসো, টিফিন পিরিয়ডে পড়া যাবে। কেমন?"

অরুণ মাথা নেড়ে জানালো সে আন্‌বে।

পরদিন অরুণ নিয়ে এলো একখণ্ড বাঁধানো "আল্‌পনা" আর একখণ্ড বাঁধানো "প্রবাহিনী"। ভারী খুশী সে। তার আর কোনো সহপাঠী এমন আগ্রহ করে তার লেখা পড়্‌তে চায় নি। টিফিনের ঘণ্টায় অরুণের সঙ্গে আমাদেরও সুনীল টেনে নিয়ে গেল স্কুলের বিরাট্ বটগাছটীর তলায়।

অদ্ভুত রকম তাড়াতাড়ি পড়্‌তে পারে এই সুনীল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার তিনটী গল্প পড়া শেষ হয়ে গেল। যেতেই তার মুখও ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গিয়ে অরুণকে ভয় খাইয়ে দিল, আমাদেরও ভাবিয়ে তুল্‌লো।

সুনীল প্রশ্ন কর্‌ল, "অরুণ ভাই, আমায় সত্যি করে বলো তো তুমি কি হাঙ্গেরীয়ান্ আর বুল্‌গেরিয়ান্ ভাষা জানো?"

অরুণকে মুখ কাঁচুমাচু কর্‌তে দেখে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লুম। অরুণ বল্‌লে "না তো!"

"তা হ'লে নিশ্চয় ইংরিজী অনুবাদ পড়ে থাক্‌বে।" সুনীল বল্‌ল। "তোমার তিনটী

গল্পই হাঙ্গেরীয়ান্ লেখক এল্‌গার ষ্টেফান্‌সন্ আর বুল্‌গেরিয়ান্ লেখক মিট্‌শার লোগানেষ্টের লেখা গল্পের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় একেবারে লাইনকে লাইন।"

অরুণের প্রতিভার রহস্য ভেদ হয়ে যাওয়ায় আমরা খুসী হয়ে উঠ্‌লুম, আর অরুণের মুখ হয়ে উঠ্‌লো মরা মানুষের মুখের মত ফ্যাকাশে। হবেই তো। এতদিন পরে শক্ত পাল্লায় পড়ে আমাদের সামনে একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছে যে!

তবু সে তার ফাঁকি স্বীকার না করে বল্‌ল, "না ভাই, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌তে পারি আমার এ গল্পগুলো অন্য কোন গল্পের ভাব নিয়ে আমি লিখি নি।"

সুনীল বল্‌ল, "হতে পারে। দৈবক্রমে মিলে গেছে হয়তো। আচ্ছা, তোমার এ গল্পটা দেখা যাক্—হারানো রতন। আশ্চর্য্য! এর আরম্ভটা যে করেছো একেবারে কন্‌রাড নিকোলভ্‌স্কীর গল্প 'এন্‌রিকো কাজ্ঞানা'র মতো। শুধু রাশিয়ান্ গল্পের মাজুরকা হ্রদের জায়গায় তুমি বসিয়েছো অশ্রুমতী নদী। আচ্ছা, এ গল্পের শেষটা কি করেছো বলো তো?"

প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে অরুণ বল্‌ল, "মর্‌বার আগে মনুর বাবা মনুকে ফিরে পেলো এক গায়ক-ভিখারীর কাছ থেকে।"

"ঠিক যা আন্দাজ করেছিলুম।" সুনীল বলে উঠ্‌লো। "নিকোলভ্‌স্কীর গল্পে কাজ্ঞানা তার মেয়ে ইরিয়ানাকেও ঠিক ঐ ভাবেই ফিরে পেয়েছিলো। এ গল্পটা এ দেশে বেশী লোক পড়ে নি। কিন্তু যারা পড়েছে তারাই মনে কর্‌বে রাশিয়ান্ গল্পটীকে তুমি স্রেফ্ টুকে মেরে দিয়েছো।"

আমরা বল্‌লুম, "এও তো হ'তে পারে যে নিকোলভ্‌স্কীই অরুণের গল্প চুরি করে নিয়েছে।"

সুনীল বল্‌ল, "গাঁজাখুরী কথা বোলো না। নিকোলভ্‌স্কীর গল্প অরুণের গল্পের আগে লেখা।"

"তা হ'লে অরুণ কি লিখ্‌বে তা আন্দাজ করেই নিকোলভ্‌স্কী তার গল্পটী লিখেছিল।" বলে আমরা হো হো করে হেসে উঠ্‌লুম। অরুণের যা কিছু প্রতিভা তা যে শুধু বিদেশী লেখা থেকে 'না বলিয়া লওয়া' এ কথা টের পেয়ে আমরা যে কি আরাম পেলুম তা আর বল্‌বার কথা নয়। স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারা গেল অরুণ আমাদেরই মত সাধারণ—শুধু সে চুরিতে ওস্তাদ, আমরা যা নই।

কান্তিকুমার বল্‌ল, "হেড্‌মাষ্টার মশাইর কাছে বল্‌তে হচ্ছে ব্যাপারটী। তিনি তো অরুণের নাম শুন্‌লেই মূর্চ্ছো যান্।"

ধমক দিয়ে সুনীল বল্‌ল, "খবরদার, এ কথা কারো কাছেই বলা চল্‌বে না বলে দিচ্ছি।

এ হচ্ছে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। অরুণ আমাদের বন্ধু। লেখক হিসেবে সে যে নাম করেছে তা যাতে বজায় থাকে সে চেষ্টাই আমাদের প্রাণপণে করা কর্ত্তব্য। অরুণের নাম খারাপ হয়ে গেলে আমাদেরই যে মাথা হেঁট হয়ে যাবে।"

সুনীলের কথায় মন সায় না দিলেও আমাদের মেনে নিতে হলো। ওর একটা এমন অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিলো যাতে ওকে সবাই রীতিমত ভয় করে চল্‌তুম।

অরুণ বল্‌ল, "সত্যি বল্‌ছি ভাই, আমার গল্পগুলো সব আমার নিজের মাথা থেকে প্লট্ বার করে লিখেছি। একটাও নকল নয়।"

"কিন্তু আমরা এ কথা মেনে নিলেও", সুনীল বল্‌ল, "বাইরের লোক এ কথা মান্‌বে কেন? তোমার কাছে চোরাই মাল দেখে তারা তোমায় চোর বলেই জান্‌বে। তোমাদের লেখার লাইনে একটা মস্ত বিপদ্ কি জানো? একবার যদি চোর বলে বদ্‌নাম হয়ে যায়, তার পর খাঁটি হ'লেও কেউ আর বিশ্বাস করে না। গল্পের রাখাল বালকের মতো।"

অরুণ ছলছল চোখে চুপ করে রইলো। যদিও সুনীলের হুকুমে অরুণের রহস্য সকলের কাছে জাহির করে দিতে পার্‌বো না, তবু আমাদের কাছে তার মাথা যে চিরদিনের জন্য হেঁট হয়ে গেল তাতেই আমরা খুসী।

মহা উদ্বেগের ভাব দেখিয়ে কান্তিকুমার বল্‌ল, "তাই তো! তা হ'লে আমাদের বন্ধুকে লোকের কাছে ধরা পড়্‌বার হাত থেকে কি করে বাঁচানো যায়?"

সুনীল বল্‌ল, "কাউকে এ বিষয় কিছু বল্‌বে না। যে সব বিদেশী লেখার সঙ্গে অরুণের গল্প প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে, সুখের বিষয় সে সব লেখার সঙ্গে আমাদের এ দেশের পাঠক-পাঠিকারা মোটেই পরিচিত নয়। এ দিক্ দিয়ে অরুণের বরাত ভালো বল্‌তে হবে।"

আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌ল, "বরাত নয়, বুদ্ধি বলো। ধরা না পড়্‌লে এ বিদ্যার মত বিদ্যা নেই।"

সুনীল বল্‌ল, "বাজে বকো কেন?···অরুণ ভাই, আমার কিন্তু জোর বিশ্বাস তোমার একটা গল্পও নকল নয়। এ রকম মিলে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। কারণ গল্পের প্লট্ হাজারে হাজারে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে রেডিওর গানের মতো। একই গান যেমন ভিন্ন ভিন্ন রেডিও-সেটে ধরা পড়ে, একই প্লট্ তেমনি ভিন্ন ভিন্ন লেখকের মাথায় ঢোকা খুবই সম্ভব। এই সোজা কথাটা না বুঝে আমরা নিতান্ত মূর্খের মতো অনেক লেখককে চোর বলে ভুল করি।"

মূর্খের দলে পড়ে গিয়ে মনে মনে আমরা একটু লজ্জিতই হলুম।

সুনীল বল্‌তে লাগ্‌ল, "কিন্তু যেহেতু এদেশে মূর্খের অভাব নেই, সেহেতু তোমায় আত্মরক্ষার

উপায় করতে হবে অরুণ। এখন থেকে তোমায় সাবধান হতে হবে যেন তোমার আর কোন লেখায় বিদেশী কোন লেখকের লেখার সঙ্গে কিছু না মেলে।"

অসহায়ভাবে অরুণ বল্‌ল, "কিন্তু ঐ রেডিওর গানের মত যদি মিলে যায়?"

"তা হ'লেই তো বিপদ্।" সুনীল বল্‌ল। "কারণ এখন না হ'লেও দু'দিন বাদে ধরা পড়তে হবে। বাবা যখন এখানে এসেছেন তখন এ সব বিদেশী ভাষা আর সাহিত্যের সঙ্গে অনেকের পরিচয় না ঘটিয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু আমি তোমায় সাহায্য কর্‌তে পারি। এখন থেকে যা লিখবে তাই কোথাও ছাপতে দেবার আগে আমায় দেখিয়ে নিও। আমি তোমায় সাবধান করে দিতে পার্‌ব।"

এর পর অরুণ যা লিখত তাই দেখাত সুনীলকে। কিন্তু একটা গল্পও ছাপা নিরাপদ নয়, সুনীল বল্‌ল। "কি আশ্চর্য্য, রুমানিয়ান্ কবি গুস্তাফ্ ষ্টেফান্‌সনের একটা গল্প-কবিতার সঙ্গে তোমার এ গল্পের প্লট্ অদ্ভুত রকম মিলে যাচ্ছে। যদিও গুস্তাফের ভাষার জোরটা তোমার লেখায় নেই।" "পোলিশ লেখক নিকোলাই পিল্‌সুডকীর গল্পের গোড়ার দিক্‌টা ঠিক এই রকম, আর তোমার গল্পের শেষের দিক্‌টা হয়েছে বোরিস্ মোমোনফের ঠিক মৃত্যুর আগের দিন লেখা গল্পের ছাঁচে।" ইত্যাদি ধরণের কথা শুনে অরুণ একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। সে যা লেখে তা-ই তার আগে কোন না কোন বিদেশী লেখক লিখে ফেলেছে! বহু বছর আগে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ সলোমন বলেছিলেন পৃথিবীতে নতুন কিছু নেই, এ কথা এত সত্য!

"নার্ভাস হয়ো না অরুণ।" সুনীল বলে। "তোমার উচিত হচ্ছে কিছুদিন লেখা স্রেফ বন্ধ রাখা। আর বিদেশী লেখকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। প্রথমটা আমি তোমায় শেখাতে পারবো, তার পর তোমায় দেবো বাবার ছাত্র করে। বিদেশী ভাষা শেখাতে বাবা ভারী ভালোবাসেন।" বিদেশী লেখকদের লেখার নমুনা শোনাবার জন্য একদিন সুনীল আমাদের নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে তার বাবার লাইব্রেরীতে। হাঙ্গেরীয়ান্, রাশিয়ান্, রুমানিয়ান্, ইত্যাদি নানা দেশের লেখকদের লেখা আমাদের সে পড়ে শোনালো। বলা বাহুল্য তার একটী অক্ষরও আমরা বুঝলুম না, কিন্তু সুনীলের পড়া শুন্‌তে একদিক্ দিয়ে যেমন উদ্ভট লাগলো অন্যদিকে আবার তেমনি ভালোও লাগলো। সুনীলের ভাষাজ্ঞানের নমুনা দেখে বিস্ময় হলো। বাপকা বেটাই বটে। এই বয়সেই এত শিখেছে!

যাই হোক্, অরুণের গল্প লেখা বন্ধ হয়ে গেল। সুনীল বল্‌ল, "য়্যানুয়্যাল্ পরীক্ষার জন্য খুব ভালো করে পড়ো অরুণ। এবারে রেকর্ড্ নম্বর পাওয়া চাই। শুধু প্রথম হ'লেই হবে না।"

সুনীলের কথাতেই হোক্, বা সাহিত্য-ব্যাপারে ঘা খেয়েই হোক্, অরুণ সাংঘাতিক রকম

পড়া সুরু কর্‌ল। ফলে কিছুদিন ধরে অরুণের লেখা আমরা দেখতে পেলুম না কোন কাগজে, কিন্তু পরীক্ষার ফল যখন বেরুলো তখন দেখা গেল সব পেপারেই অরুণ এত বেশী নম্বর পেয়েছে যে অত নম্বর আমাদের ইস্কুলের চল্লিশ বছরের ইতিহাসে কোন ছেলে পায় নি। সেবার তাই অরুণকে বিশেষ করে একটা দামী সোনার মেডেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল। এতে সুনীলকেই সব চাইতে বেশী খুসী দেখলুম, যেন মেডেলটা সে-ই পেয়েছে।

কিন্তু নতুন বছরে নতুন ক্লাসে যখন আমরা আবার একত্র হলুম, কে জান্‌তো তখন সুনীল আমাদের এমন ক'রে চমকে দেবে? নতুন বছরের প্রথম দিন, একটা ক্লাস হয়েই ছুটী হয়ে গেল। সুনীলের সঙ্গে সবাই জড় হলুম স্কুলের বটগাছটার তলায়।

সুনীল বল্‌ল, "আজ একটা মস্ত কাজের জন্য তোমাদের এনেছি এখানে। তোমরা যে কত বড় মূর্খ সে কথাটাই আজ বুঝিয়ে দেবো। আমার ধাপ্পায় ভুলে গিয়ে তারি তালে তালে নেচে তোমরা অরুণকে উপহাস করেচ, কিন্তু আসলে ওর প্রত্যেকটী গল্পই ওর নিজস্ব, বিদেশী গল্পের ছায়া ওর কোন গল্পে পড়েছে ব'লে অন্ততঃ আমার তো জানা নেই।"

এতে আমরা তো অবাক্ হলুমই, অরুণও অবাক্ হয়ে গেল। কান্তিকুমার বল্‌ল, "তবে যে অতগুলো বিদেশী লেখকের নাম করলে?"

সুনীল বল্‌ল, "ও নামগুলো সব ধাপ্পা। আর ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন বিদেশী ভাষাও আমি জানি না। তোমাদের যে ধাপ্পা দিয়ে অত সহজে বোকা বানাতে পারবো এ আমি ভাবতেও পারি নি। আমি ভেবেছিলুম আমার কথাগুলো তোমরা হাল্‌কাভাবে নিয়ে একটু মজা পাবে। কিন্তু সব কথাই যে তোমরা সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে নেবে তা কে আর ভাবতে পেরেছিল! অরুণ কিন্তু আমার ওপর রাগ কোরো না ভাই। আমি ধাপ্পায় ভড়কে দিয়ে তোমার লেখা থামিয়ে দিয়েছিলুম; কিন্তু তারি ফলে তুমি ইস্কুলে রেকর্ড্ রাখলে তো?"

অরুণ বল্‌ল, "হ্যাঁ ভাই। আমি এতে বরং তোমার ওপর কৃতজ্ঞই থাক্‌বো।"

"সেটা অবশ্য না থাক্‌লেও চল্‌বে।" সুনীল বল্‌ল। "এখন থেকে আবার তুমি লিখতে সুরু করো। বাংলা মাসিকের কোন লেখাই পড়্‌তে আমার বাদ থাকে না। আমি বল্‌ছি অরুণ, তুমি সত্যিকারের একজন বড় সাহিত্যিক হবেই। আর আমরা তোমার জন্য বরাবর গর্ব্ব অনুভব করবো।"

আমরা সবাই মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েছিলুম। এলাহাবাদ থেকে সুনীল এসে আমাদের চোখ খুলে দিল। সত্যিই তো! অরুণের জন্য কোথায় আমরা গর্ব্ব করব, আনন্দ করব, তা না করে হিংসা ক'রে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলুম একঘরে করে!

এতদিনের যত কিছু হিংসা-বিদ্বেষের ময়লা জমা হয়েছিলো আমাদের মনে, অনুতাপের

স্রোতে সব ভেসে গেল। অরুণকে বল্‌লুম, "অরুণ, আমাদের সব কিছু ভুল তুমি ভুলে যেও ভাই।"

অরুণ এখনও গল্প লেখে। তার গল্প পড়ে শুধু আমরা নয়, সারা বাংলা দেশ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

১৪

সুশান্তদের ফিরিতে দেখিয়া জাহাজের অন্য ছেলেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কয়দিন কি দুশ্চিন্তায়ই না তাহাদের কাটিয়াছে! সুশান্ত এ কয়দিনের সমস্ত ইতিহাস শুনাইল - খুঁটিনাটীও বাদ দিল না। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া মতলব করিতে বসিল কেমন করিয়া জাহাজের জিনিষগুলি সেই পর্ব্বতের গুহায় লইয়া যাওয়া যায়। সুশান্ত বলিল—"দেখ, এই জিনিষগুলি নিয়ে যেতে যদিও আমাদের এখন একটু কষ্ট পেতে হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক গুণ কষ্ট হ'তে আমরা রক্ষা পাব।" "তবে আর দেরী করে কি লাভ?" অশোক কহিল—"দেরী করা আর মোটেই চল্‌বে না। এদিকে জাহাজের অবস্থা যা হয়েছে তা আমিই জানি। একটানা বৃষ্টির জলে ভিজে ও রোদে পুড়ে সমস্ত তক্তা একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে। শীতের সময় এখানে থাক্‌লে আর কাউকে প্রাণে বাঁচতে হবে না। ওদিকে আবার জাহাজ দিনকে দিন ক্রমশঃ কাৎ হয়ে পড়ছে।" প্রদ্যোৎ কহিল—"এখন একটা ঝড় উঠ্‌লে আর দেখ্‌তে হবে না; জাহাজের সব তক্তাগুলো দশদিকে উড়ে যাবে, আর আমরাও প্রাণে মরব; তার চেয়ে আগে হ'তে জাহাজের তক্তা, কাঠ, কড়ি, লোহালক্কড় সমস্ত সেই গুহায় নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানে সেই সব জিনিষ দিয়ে বেশ ঘর ও আসবাবপত্র বানানো যাবে।" কুণাল কহিল—"আমাদের ভবিষ্যতের বাসস্থানের একটা নাম হওয়া দরকার।" রঞ্জিৎ কহিল—"নিশ্চয়। সেই ফরাসী ব্যক্তির

স্মরণার্থ গুহার নাম হোক 'ফরাসী গুহা'।" সুশান্ত ও অশোক সমস্বরে কহিল—"বেশ, আজ থেকে তাই নাম হ'ল।" রঞ্জিৎ কহিল—"কিন্তু জিনিষপত্র সরাতে কম দিন লাগ্‌বে না ; ততদিন আমরা কোথায় রাত্রিবাস করব ?" অশোক কহিল—"ততদিন আমরা তাঁবুতে রাত কাটাব। নদীর ধারে কোন গাছতলায় একটা তাঁবু খাটালেই চল্‌বে 'খন।" সুশান্ত তখন উঠিয়া দাঁড়াইল, উৎসুক ভরে কহিল—"সেই ঠিক ; তবে আর দেরী কেন ভাই ? যাত্রার আয়োজন এখন হ'তেই করা যাক্।"

বাস্তবিক, মিথ্যা দেরী করিবার সময় তাহাদের তখন ছিল না। সামনে তখন কত সব বড় কাজ ! জাহাজের অত সব বড় বড় ভারী তক্তা আস্তে আস্তে খোলা, জাহাজের সমস্ত সামগ্রী বাহির করিয়া আনা, নদীতে মাল বহন করিবার জন্য একটা ভেলা প্রস্তুত করা প্রভৃতি কাজেই তাহাদের মাসাধিক কাটিয়া যাইবে। ততদিনে মে মাস আসিয়া পড়িবে। অর্থাৎ এদেশে তখনই শীতের আরম্ভ। শীত আসিবার আগেই তাহাদের সমস্ত শেষ করিতে হইবে।

অশোক বুদ্ধি করিয়া নদীর তীরে একটা অস্থায়ী তাঁবু খাটাইল। জাহাজের অত সামগ্রী বনপথে বা নদীর তীর ধরিয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক নদীপথ ছাড়া তাহাদের গতি নাই। বর্ষার পর নদীতে তখন একেবারে ছাপাছাপি জল। ভেলায় অক্লেশে সমস্ত জিনিষ যাইবে। তবে একটা বিষয় ভাবিবার আছে। হ্রদ হইতে প্রথম তিন চারি মাইল নদীর জল বেশ গভীর। তার পর নদী সেই দুষ্প্রবেশ্য জলায় আসিয়া পড়িয়াছে। জলা হইতে যেখানে নদী পুনরায় সাগর অভিমুখী হইয়াছে সেখান হইতে নদীপথ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। এ কাজ একদিন সহজেই সম্পন্ন হইল। জাহাজে একটা ভগ্নপ্রায় নৌকা ছিল তাহা তোমাদের হয়ত মনে আছে। একদিন সেই নৌকায় চড়িয়া সুশান্ত ও বুনো জলা পর্য্যন্ত নদীতে ঘুরিয়া আসিল। এখানেও নদীর বেশ গভীর জল। অর্থাৎ এক জলা ব্যতীত সমস্ত জলপথই পরিষ্কার। ফরাসী গুহায় জিনিষপত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। নদীতীরের সেই তাঁবুর মধ্যে তাহারা প্রথমে বিছানাপত্র হইয়া গেল ! সেই সঙ্গে কিছু আসবাবপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র লইতেও ভুলিল না। তার পর তাহারা তাঁবুর আশে পাশে জাহাজের অন্যান্য সামগ্রী লইয়া গেল। কারণ জাহাজ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আগে সমস্ত জিনিষ নামানো দরকার। জাহাজের সমস্ত জিনিষ নামাইতে ও সেই সব নদীতীরে বহন করিয়া লইয়া যাইতেই তাহাদের কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

এ কয়দিন বাতাসও বেশ পরিষ্কার ছিল ; ঝড়-জলের নামগন্ধ ছিল না। তাই তাহাদের অত পরিশ্রম করিতে কোন কষ্টই হইল না। সুশান্ত ও তাহার দল যখন জিনিষপত্র নামানো কাজে নিযুক্ত তখন রঞ্জিৎ, কমলাক্ষ, কুণাল ও রোহিতাশ্ব প্রতিদিন সকালে বন্দুক লইয়া পাখী

মারিতে চলিয়া যাইত। যেন এই সব শ্রমসাধ্য কাজ তাহাদের অনুপযুক্ত। যেন ফরাসী গুহায় যাইবার জন্য একমাত্র সুশান্তরই উদ্বেগ ; যেন শীতের প্রকোপ হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্য যত মাথাব্যথা তাহারই। কিন্তু রঞ্জিতের এইরূপ কর্ম্মবিমুখ আচরণে সুশান্ত রাগ করিত না। ২।১ জন বিরক্ত হইলে সুশান্ত তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিত—"যাক্, বেশ, না করে না কর্‌বে, ওদের সাহায্য না নিয়েও যে আমরা সব কর্‌তে পারি তা ওরা বুঝুক ; আর রোজ অত পাখী মেরে আন্‌ছে, তাতেও ত আমাদের একটা উপকার হচ্ছে।"

এই সব করিতেই এপ্রিল মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ওদিকে শীতও বেশ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রিতে শীতে তাহাদের বেশ কষ্ট হইত। সকালেও দারুণ ঠাণ্ডা। কিন্তু জাহাজে গরম জামা-কাপড়ের অভাব নাই। সকলেই গরম পোষাকপরিচ্ছদে নিজ নিজ শরীর আবৃত করিল। ছেলেদের ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকে সুশান্ত ও অশোকের প্রখর নজর।

অবশেষে জাহাজ হইতে সমস্ত জিনিষ নামানো শেষ হইল। এইবার জাহাজটিকে ভাঙিতে হইবে। সেটি নিতান্ত সহজ কাজ নয়। অনেক কষ্টে সাঁড়াশি, শাবল, গাঁতি ও হাতুড়ির সাহায্যে প্রথমে জাহাজের তলস্থিত পিতলের ঢাক্‌নি খুলিয়া ফেলা হইল। বড় বড় পেরেক ও স্ক্রুগুলি অতি কষ্টে খোলা হইল। তার পর জাহাজের পাশের তক্তাগুলি আস্তে আস্তে খোলা হইতে লাগিল। সে যে কত অসংখ্য তক্তা তা আস্ত জাহাজ হইতে বোঝা যায় না। সেই সব তক্তা খুলিতেই তাহাদের বহুদিন লাগিয়া যাইত যদি না ভগবান্ একটা উপায় করিয়া দিতেন।

সেদিন পঁচিশে এপ্রিল। বিকাল হইতেই সেদিন আকাশ আঁধার করিয়া আসিল ; চারিদিক্ হইতে যত রাজ্যের মেঘ সেই দ্বীপের উপর আসিয়া জমা হইতে লাগিল। সন্ধ্যা নামিবার আগেই বেশ ঝড় সুরু হইল। ছেলেরা জাহাজ হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নদীর তীরে কতকগুলি গাছের নিম্নে তাঁবু ফেলা হইয়াছিল। গাছের ডালে ডালে তাঁবুর দড়ি বাঁধা। তাই তাহাদের সে রাত বেশী ঝড়ে পড়িতে হইল না। ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়ের দাপট সমানে চলিল। সকালে ঝড় থামিল। সকলে বাহিরে আসিয়া দেখে—এ কি কাণ্ড ! ঝড় সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত দ্বীপের উপর কি ধ্বংসচিহ্নই না রাখিয়া গিয়াছে ! সমস্ত তক্তা খুলিয়া গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, জাহাজের সমস্ত কাঠামো একেবারে ভাঙিয়া ধরাশায়ী হইয়াছে ! সেই ধ্বংসদৃশ্য দেখিয়া তাহাদের আনন্দই হইল। ঝড়ের জন্য তাহারা প্রভূত পরিশ্রম হইতে বাঁচিয়া গেল।

এইবার ভেলা তৈরী করিবার পালা। জাহাজের কাঠ, তক্তা প্রভৃতি এই কাজে লাগান হইল। বহু চেষ্টায় এক বিরাট্ ভেলা তৈরী হইল। লম্বায় তাহা প্রায় ত্রিশ ফুট, চওড়ায় পনেরো ফুট। অত বড় ভেলা, কিন্তু জলে তাহা সুন্দর ভাসিয়া রহিল। ওদিকে জোয়ারের টান

আরম্ভ হইয়াছে, ভেলাও আর স্থির থাকিতে চাহে না। তাই তাহারা শক্ত দড়ি দিয়া ভেলাটিকে একটি গাছে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন সকালবেলায় ভেলার উপর তাহারা একটা উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিল। ডেকের পাৎলা তক্তাগুলিতে মঞ্চটি প্রস্তুত হইল। তার পর বড় বড় পেরেক মারিয়া ও দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সমস্ত ভেলাটিকে দৃঢ়বদ্ধ করা হইল। এই হইল দ্বিতীয় দিনের কার্য্য। তৃতীয় দিনে তাহারা ভেলার উপর সমস্ত জিনিষপত্র একে একে তুলিতে আরম্ভ করিল। সেদিন ভীষণ শীত পড়িয়াছিল। সুশান্ত কহিল—"চল, আমরা পরশু বেরোই।" অশোক কহিল—"আবার পরশু কেন? ভেলায় তো সমস্ত জিনিষই তোলা হয়েছে, চল না কালই ভেলা ছাড়া যাক্।" সুশান্ত কহিল—"না, কাল আমাদের যাওয়া হ'তে পারে না; কারণ পরশুদিন অমাবস্যা, সেদিন নদীতে খুব জোর বান আসবে; সেই সাগর-জোয়ারের মুখে আমাদের ভেলা সহজেই ভেসে চল্‌বে। ভেলা তো আর কম ভারী হয় নি। একে এখন লগি মেরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।" ভেলার উপর অত জিনিষ তোলা হইয়াছে; তবুও কিন্তু নদীর জল হইতে ভেলা বেশ উঁচুতে। ভেলায় একদিকে তাহারা জলের পিপা, বাক্স ইত্যাদি রাখিল, আর একদিকে লোহার যন্ত্রপাতি, ষ্টোভ, স্পিরিটের বোতল, ঔষধের বাক্স, বন্দুক, কামান, বারুদ, জাহাজ চালাইবার যন্ত্রগুলি ও ক্যান্‌ভাস্ কাপড়গুলি রাখিল। মাঝখানটা ফাঁকা রাখা হইল, সেইখানে ছেলেরা বসিবে। ভেলার চারিকোণে চারিটি লগি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে স্বয়ং সুশান্ত, অশোক, রঞ্জিৎ ও বুনো। এইরূপ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া তাহারা অমাবস্যার জোয়ারের জন্য বসিয়া রহিল।

কিন্তু পর দিন সুশান্ত এমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করিল যাহাতে তাহার মুখ একেবারে ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরিত

শ্রীপ্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য

ও কি, পাতা উল্টে যাচ্ছিলে বুঝি? উঁহুঃ, এটা মহাভারতের শ্রীরামচরিত নয়, যা তোমাদের কাছে একেবারে পচা পুরোনো হয়ে গেছে। সত্যি বলতে গেলে এর সঙ্গে কলকাতা ছাড়া মহাভারতের কোন অংশেরই সম্বন্ধ নেই। রামায়ণের তো নেই-ই। আর কলকাতাকে মহাভারত

বলে ধরে নেওয়াও অন্যায়—কি বলো? এ হচ্ছে আমাদের বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রামবাবুর দুষ্কীর্ত্তি-কাহিনী। য়্যাঁ, রামবাবুকে চেনো না? তা হ'লে তাঁকে দেখ নি বুঝি কোন দিন? দেখলে চিনে ফেলতে—অনন্যোপায় হয়ে দস্তুর মত পরিচিত হয়ে পড়তে তাঁর সঙ্গে। তোমরা যারা রামবাবুকে কোন দিনই দেখ নি তাদের সঙ্গে কোন দুর্ম্মুহূর্ত্তে যদি উক্ত-নামধারী ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে তারা মিনিট দুয়েকের মাঝেই বুঝতে পারবে যে ভদ্রলোক রামবাবু ছাড়া আর কেউই হতে পারেন না। রামবাবুর বৈশিষ্ট্য এখানেই। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা, ধরো তোমরা যারা রামছাগল দেখ নি তারা যদি দৈবাৎ রামছাগলের সামনেই পড়ে যাও (না না, ভয় পেয়ো না—ও নিরীহ জীব) তবে তোমরা আকৃতি ও প্রকৃতি দেখেই বুঝতে পারবে ও হিপোপটেমাসও নয়—জাগুয়ারও নয়, ওটা নেহাৎ রামছাগল। রামছাগল সম্বন্ধে অতীতের কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা না থাকলেও ওটা বুঝে ফেলতে দেরী হবে না। রামবাবুর ব্যাপারটাও অনেকটা এই রকম আর কি!

রামবাবুর চেহারার সবিস্তার বর্ণনা দিতে গেলে তা একটা অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত (যে ভয়ে তোমরা পাতা উল্‌টে যাচ্ছিলে) দাঁড়িয়ে যাবে। তবে একটা সাধারণ আইডিয়া তোমাদের জন্যে দিয়ে দেওয়া যায় বটে। চেহারা তাঁর মন্দ নয়—এই আর একটু ভাল হ'লেই ভাল হ'ত এই গোছের আর কি! রামবাবু গোঁফ পুষছেন এক জোড়া—তাই ভালোবাসেন তিনি, এবং তাঁর মতে জমকালো গোঁফই নাকি হচ্ছে 'ম্যান্‌লিনেস্' অর্থাৎ কিনা মনুষ্যত্বের লক্ষণ। দীর্ঘতা সম্বন্ধে রামবাবু সম্পূর্ণ উদাসীন। অতিরিক্ত লম্বা হওয়া তাঁর নাকি অপছন্দ হয় বড়। য়্যাঁ, পরিধি? ও সম্বন্ধে আমি একটি কথাও বলবো না। এই তো রামবাবুর জন্যে একটা গেঞ্জি আনতে গিয়েছিলুম; তেতাল্লিশটা দোকান ঘুরে ঘামে ভিজে ভিজে বেড়াল হয়ে ফিরেছি, অবশ্য খালি হাতেই। গেঞ্জিওয়ালাদের ঝাড়া দেড় ঘণ্টা গালাগালি করে রামবাবু অতঃপর মত প্রকাশ করলেন—গেঞ্জি গায়ে দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে সাংঘাতিক রকমে খারাপ।

দৃঢ়চেতা পুরুষ রামবাবু। বছর তেরো আগে তাঁর কোটের বাঁ পকেট থেকে একটা নোট হারিয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভব কেউ হয়তো যুগপৎ তাঁর পকেট ও মাথায় হাত বুলিয়েছিল। যা হোক্, নোটের সন্ধান আর পাওয়া যায় নি। পকেটের এ হেন বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত রামবাবু বাঁ পকেটকে সে দিনই ডিসমিস্ করলেন…একেবারে সমূলে উচ্ছেদ সাধন করে। বাঁ পকেটের কোন চিহ্নই রইলো না ওদিকে। স্বচক্ষে দেখেছি বর্ত্তমানে তা নেই—আর রামবাবু বলেন ভবিষ্যতেও তা থাকবে না। রামবাবুর চিত্তের দৃঢ়তাকে আমি সভয় শ্রদ্ধা করি—জানি, তোমরাও তা করবে। রামবাবুর আকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা আর মাত্র একটি কথা বল্‌লেই শেষ হবে। সেটা হচ্ছে এই যে সাধারণ মানুষের মত রামবাবু নিজেকে একটু

অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্ বলেই মনে করেন। এজন্ত মধ্যে মধ্যে বিপদেও পড়েন অবশ্তি। সদাগরী অফিসে বছর পনেরো চাকুরী করেও তাঁর এই সহজ বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন বলে তিনি গর্ব্বিত। তবে এ তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে রামবাবুর এ বৈশিষ্ট্যটুকুর অভাব থাকলে ‘শ্রীরামচরিত’ লিখে ধন্ত হবার স্থযোগ আমি বোধ হয় এ জীবনে পেতাম না।

সে দিনটা বোধ হয় মাসের পয়লাই ছিলো। রামবাবু বেতন পেয়েছিলেন সেদিন—স্থতরাং পয়লা হওয়াই সম্ভব। অফিস থেকে বেরোতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেলো। গোটা কতক জিনিষপত্র কিনে রামবাবু হন্‌হন্ করে হাঁটতে স্থরু করলেন। বাড়ীর দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। দিন কয়েক আগে তাঁর এক পুরোনো বন্ধু অনেক বছর পরে ফিরে এসেছেন কল্‌কাতায়। লাহোরে না কোথায় চাকুরী করতেন মোটা মাইনেয়। অন্থকূলবাবু রামবাবুর বাল্যবন্ধু ছিলেন কিনা, স্কুলে থাকতে দু’জনে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো। একসঙ্গে বেড়াতেন, চুরি করে আনা আচার মহা-উৎসাহে ভাগ করে খেতেন; প্রায় একসঙ্গে বেঞ্চেও দাঁড়াতেন শোনা যায়। এ হেন বন্ধু বহুদিন পর ফিরে এসেছেন; তাঁর সঙ্গে দেখা করাটাএকটা মহা কর্ত্তব্য—রামবাবু তাই ভাবেন। দৃঢ়চিত্ত রামবাবু অদ্বৈধ মত নিয়ে সে মুহূর্ত্তেই বন্ধুর বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলেন। ক’দিন আগে অন্থকূলবাবু তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর সাথে দেখা করবার জন্তে; ঠিকানাটা তাতেই দেওয়া ছিল। গলিতে ঢুকে বাড়ীর নম্বর মিলিয়ে নিয়ে রামবাবু বন্ধুপ্রেমে ভরপূর হৃদয়ে কড়া নাড়লেন। দরজাটাও খুল্‌লো—বেরুলো এক ইয়া লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী,—মোটেই অন্থকূলবাবু ন’ন।

“য়্যাই, ক্যা মাংতা?” যেন বাজ পড়লো।

হিন্দী ভাষাটা রামবাবুর জানা ছিল ভাগ্যে—

“বেশী কিছু নেই মাংতা। অন্থকূলবাবু হাম্‌কো মিত্র—ফ্রেণ্ড হ্যায় কিনা,—তাই উস্‌কো মাংতা।” রামবাবু বলেই ফেল্‌লেন যদিও বন্ধুবাৎসল্যের জায়গায় তখন ত্রাসের সঞ্চার হচ্ছিলো।

“নেহি পচাস্তে।” পুনর্ব্বার বাজখাঁই আওয়াজ।

“কিন্তু নম্বর তো……” ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

রামবাবু কি আর করেন, ফিরে চল্‌লেন বাড়ীর দিকে—এ গলি ও গলি ধরে শর্ট্‌কাট্ করছেন—ওটা তাঁর একটা অভ্যাস। আমায় তো প্রায়ই বলেন, ‘দেখ হে লাইফটা শর্ট্‌কাট্ করো। দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে কিই বা লাভ?’ যাক্, চলেছেন একমনে—হঠাৎ মনে হ’ল কে যেন তাঁর পেছন পেছন আসছে। আড়চোখে পেছনে চেয়ে দেখেন রীতিমত ধবধবে ধুতি পরা যণ্ডামার্কা একটা লোক। চেহারাটা ভদ্রলোকের মত নয় মোটেই—ঐ এক নজরেই তাঁর ধারণা হ’ল।

রামবাবু বুঝতে পারলেন এ গুণ্ডা না হয়ে যায় না। বেশটা ভদ্র বটে—তবে আজকালকার সব গুণ্ডা ব্যাটাই তো ‘ভদ্রলোক’! মাসের পয়লা—পকেটে তাঁর নোটের তাড়া—ঘেমে উঠলেন রামবাবু। আর একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখেই তিনি হন্‌হন্ করে হাঁটতে স্থরু করে দিলেন। কি আশ্চর্য্য, গুণ্ডাটাও যে জোরে জোরে হাঁটতে স্থরু করেছে! রামবাবু ইচ্ছা করলেই চীৎকার করতে পারতেন—ধারে কাছে কোন বাড়ীতে ঢুকে পড়লেও বিশেষ ক্ষতি হ’ত না। কিন্তু তা তিনি করলেন না। ততক্ষণে তাঁর বুদ্ধির প্যাঁচ খুলতে স্থরু করেছে। ‘আমার সঙ্গে চালাকী—ব্যাটাকে ঘোল খাইয়ে দিতে হবে!’ রামবাবু মনে মনে হাসলেন। গলির মোড় ফিরেই তিনি তাঁর বিরাট্ বপুখানা বিদ্যুৎবেগে চালিত করে, যে কাণ্ড করে বসলেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ইতিহাসে তা একেবারে আদি ও অকৃত্রিম। গলির মোড়েই যে ডাষ্টবিনটা ছিল, ঝপ্ করে…. । ঝপ্ করে বল্‌লাম অবশ্য, যদিও কাজটা অত সহজে হয় নি। সে বিরাট পরিধিবিশিষ্ট দেহটাকে ডাষ্টবিনের গহ্বরে প্রবেশ করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হ’ল। তাঁর হাতের কয়েকটা জায়গা রক্তাক্ত হ’ল কেটে গিয়ে। রামবাবু তাতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। অসাধারণ বুদ্ধির এক প্যাঁচে তিনি তাঁর পূরো মাসের মাহিনা ছিয়াশি টাকা সাড়ে তেরো আনা বাঁচিয়ে ফেললেন। রামবাবুর যেন মনে হ’ল সামান্য মাথা খাটিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার উপার্জ্জন করলেন টাকাটা। বিজয়গর্ব্বে সেই ডাষ্টবিনের ভেতরে বসেও তিনি রীতিমত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ডাকাতটা কোথায় গেল? পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না! ও ব্যাটা তাঁর আশ্রয় ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই তিনিও বেরিয়ে এসে উল্টো মুখে পা চালিয়ে দিয়ে ব্যাটাকে কদলী প্রদর্শন করবেন—এই ছিল তাঁর প্ল্যান্। ভাবতে ভাবতে রামবাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়ে উঠলেন। তবে কি……ঝপাং……! তাঁর চিন্তাধারায় বাধা পড়লো—নিখুঁত প্ল্যান্‌টায় যে একটা মহা খুঁত রয়ে গেছে এতক্ষণে রামবাবু তা বুঝতে পারলেন। উপর থেকে কে তাঁর মাথায় ফেলেছে একরাশ তরকারীর খোসা। রামবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু বেরুতে তাঁর সাহস হ’ল না। হতভাগারা আর রাবিশ ফেলবার সময় পেলো না—ভাবলেন তিনি। ব্যাটাদের যদি একবিন্দু……। রামবাবুর আর ভাবা হ’ল না। এবারে যা ঘটলো সেটা একেবারে বিসদৃশ ব্যাপার! রাগে রামবাবু প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন। ধবধবে পাঞ্জাবীটায় ডাল তরকারীর দাগ…মাথা থেকে পচা ডিমের রস গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা করে তাঁর ভূঁড়ির ওপর। সে বিশ্বাসঘাতক পরিবেষ্টনীতে থাকা তিনি আর সমীচীন মনে করলেন না, বেরিয়ে পড়লেন যা হোক্ কপালে বলে। কিন্তু বেরিয়েই তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেলো। কিছু দূরেই সেই পাঞ্জাবী-পরা “ডাকাত ভদ্রলোকটা” এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছে। তাঁকেই খুঁজছে নিশ্চয়। ধনে প্রাণে মারা পড়লেন রামবাবু এবার। ডাকাতটা তাঁকে দেখতে পেয়েই তাঁর

দিকে হন্‌হন্ করে আসতে লাগলো। ভয়ে রামবাবুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো—চীৎকার করতে চাইলেন। কিন্তু গলা থেকে অওয়াজ মোটেই বেরুলো না। ভবিষ্যতে—অদূর ভবিষ্যতে পথে বসার দুশ্চিন্তায় তিনি সেই ডাষ্টবিনের পাশেই ফুটপাথে বসে পড়লেন। আর দেরী নেই···ভয়ে তিনি চোখ বুজলেন।

"আরে! রেমো যে! তা তোর এ অবস্থা কেন?" পরিচিত উত্তেজিত গলার আওয়াজ শুনে নির্ভয়ে রামবাবু চোখ খুললেন। চেয়ে দেখেন, ডাকাত নয়, বন্ধু অনুকূলবাবু! ঢোক গিললেন—প্ল্যান্ ধ্বংস বটে তবু প্রাণরক্ষা।

"তাই তো, অনুকূল যে·· তবে···য়্যাঁ···আমার···মানে···পেছন পেছন আসছিলো কে?"

"আরে, সে তো আমিই!" উৎসাহে অনুকূলবাবু বলে চলেন।

"তোকে যে ঠিকানাটা দিয়েছিলুম, সেখান থেকে চলে এসেছি কিনা, তাই ভাবলুম বিকেলের দিকে ওদিকেই পায়চারি করি—যদি তুই ওখানেই খোঁজ নিস্ আমার। হঠাৎ দেখলুম তোর মত কে একজন বেরিয়ে হন্‌হন্ করে চলে যাচ্ছে। অনেক দিন দেখি নি, ভাল বুঝতে পারলুম না—তুই কি না। তাই ভাল করে দেখে নেবার জন্যে পেছন পেছন আসছিলুম—ডাকতে পারি নি ভরসা করে। তা' তুই এমনি ছুট লাগিয়ে দিলি—ভূতে তাড়া করেছিলো নাকি? আবার এ গলিটাতে ঢুকে একেবারে বাতাসেই মিলিয়ে গেলি! কি ব্যাপার বল দিকি? জামা-কাপড়েরই বা এমন দশা হ'ল কেন?"

রামবাবু ঢোক গিললেন আরো দু'-চার বার।

"না ভাই, সে কাহিনী আর এখানে নয়, আগে আমার বাড়ী চল।"

"তাই চল্।" তাঁরা রওনা হলেন।

এ কাহিনী রামবাবুই আমায় বলেছিলেন—আর আমি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে তোমাদের দিলুম। কিন্তু দেখো সাবধান—কোন রকমেই যেন এটা রামবাবুর কানে না যায়। যায় তো—আমিও গেছি আর কি! বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নির্জ্জীব পকেট বেচারার যা হাল হ'ল তা তো দেখেছোই। তা হ'লে বুঝতেই পারো এ অপরাধে আমার মুণ্ডুচ্ছেদ না হয়ে যায় না! তা গল্পটা পড়ে তোমরা যদি খুসী হও—তা হ'লে মুণ্ডুটা চলে গেলেও আমি দুঃখ পাবো না মোটেই। হাসতে হাসতেই মারা যেতে পারবো বলতে গেলে।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের এই পৃথিবীকে কম্বলের মত ঘিরে রেখেছে যে বাতাসের পর্দ্দা (তাঁরা যার নাম রেখেছেন 'বায়ুমণ্ডল') সেটা কম ক'রে দু'শ' মাইল পুরু। দু'শ' মাইল দূরত্ব মাটী বা জলের উপর লম্বালম্বি ভাবে হ'লে এমন কিছুই ভয়ানক মনে হ'ত না কিন্তু সোজা আকাশের দিকে হ'লে ব্যাপারটা বড় সহজ কথা নয়। আমাদের পৃথিবীর যে সব চেয়ে উঁচু জায়গা এভারেষ্ট—যেখানে মানুষ আজও পা দিতে পারে নি—তা হ'ল গিয়ে মাত্র সাড়ে পাঁচ মাইল। কাজেই দু'শ' মাইল উচ্চতা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কষ্টকর। কিন্তু পণ্ডিতদের কথা আলাদা। তাঁরা এই দু'শ' মাইল পুরু পর্দ্দার সমস্ত অংশের খুঁটিনাটি খবর না পেলে সন্তুষ্ট ন'ন। ভাল মত খবর যে পেয়েছেন তা নয়, তবে চেষ্টার ক্রুটী নেই।

ভূপৃষ্ঠের উপরকার প্রাকৃতিক অবস্থা আর হিমালয়ের চূড়ার কাছে প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন এক নয়, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরেও তেমনি প্রচুর প্রভেদ। ডাঙ্গা থেকে প্রায় ছ' মাইল পর্য্যন্ত উপরকার যে আকাশ পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন ট্রপোস্ফিয়ার। এই ট্রপোস্ফিয়ার সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় সব রকম খবরই যোগাড় করেছেন এবং তা নিয়ে নিয়ত নানা রকম গবেষণাও করছেন।

ট্রপোস্ফিয়ারের উপরকার অংশের নাম দেওয়া হয়েছে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই জায়গাটা নিয়েই পণ্ডিতেরা পড়েছেন গোলমালে। অত উঁচুতে গিয়ে হাতে-নাতে পরীক্ষা করা তো সহজ কথা নয়, অথচ আব্‌হাওয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পূর্ণ করতে হ'লে ওর খবর না জানলেও নয়। তা ছাড়া ট্রপোস্ফিয়ার আর ষ্ট্র্যাটো-

স্ফিয়ারের মধ্যে নানা বিষয়ে এত তফাৎ যে তারই জন্য গবেষণার প্রয়োজন আরও বেশী। ট্রপোস্ফিয়ার হচ্ছে ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ, কুয়াশা, তুষার ইত্যাদির রাজ্য কিন্তু ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ও সবের বালাই নেই বল্‌লেই চলে। বাতাস সেখানে অনেক হাল্কা, তার চাপও তাই অনেক কম। তা ছাড়া বাতাসের উপাদান, উত্তাপের তারতম্য, আলোর গতি ইত্যাদি সব কিছুই সেখানে অন্য রকম।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অভিযাত্রী এরোপ্লেন-চালকের অদ্ভুত পোষাক

কিন্তু নানা বাধা সত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা আজ ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে অনেক তথ্য যোগাড় করেছেন। দূর আকাশে ঘুড়ি পাঠিয়ে তার সঙ্গে যন্ত্র ঝুলিয়ে কিংবা যন্ত্র-বাঁধা বেলুন উড়িয়ে সে ঘুড়ি ও বেলুন ফিরে এলে সেই সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে অনেক খবর জানা গেছে। সূর্য্যাস্তের সময় আকাশ লাল হয়—অনেক সময় তার ওপর রূপালী মেঘের টুক্‌রো পড়ে সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক্ করে; কতটা ঘন হ'লে সেখানকার বাতাস ঐ রকম লাল আলো ছড়িয়ে দিতে পারে, কত উঁচুতে থাকলে মেঘের মধ্যে সূর্য্যের আলো ঐ ভাবে ঠিকরে পড়তে পারে নানা প্রক্রিয়ায় এ সব হিসাব কষে আকাশের উপরকার খবর জানবার চেষ্টা হয়েছে। মনে হয় সে দূরত্ব ৪৫ থেকে ৫০ মাইলের কম নয়।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে এমন যন্ত্রপাতি আছে যা দিয়ে কোন জিনিষের আলো পরীক্ষা করে তার উপাদান বলে দেওয়া যায়। আকাশের আলো—বিশেষ ক'রে মেরুর দেশে আকাশে যে অদ্ভুত বৈদ্যুতিক আলো দেখা যায়, যাকে বলা হয়

অরোরার আলো, তাই পরীক্ষা ক'রে এইভাবে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপাদান জানবার ব্যবস্থা হয়েছে। নরওয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ষ্টর্মার এইভাবে ৬০ থেকে ৪৫০ মাইল উঁচু আকাশের উপাদান সংগ্রহ করতেও কসুর করেন নি।

আকাশ থেকে খসে পড়া উল্কা পরীক্ষা করেও পণ্ডিতেরা ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে অনেক তথ্য বার করেছেন। শব্দের গতিবিধিও এ ব্যাপারে কম সাহায্য করে নি।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে মোটামুটি যে সব খবর জানা গেছে তার কয়েকটার কথা বলছি। বাতাসের উপাদান মোটামুটি অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন তা বোধ হয় অনেকেই জান। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ বেশ প্রচুর বলেই জানা গেছে—বিশেষ করে অক্সিজেনেরই আর একটা রূপ 'ওজোন'এর বাহুল্য সেখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। এই ওজোন আমাদের ভারী উপকারী। স্বাস্থ্যকর বলে ওজোনের বিশেষ খ্যাতি আছে। তা ছাড়া ওজোনের আর একটা কাজ হচ্ছে সূর্য্যালোক থেকে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ বা অতিবেগুনী রশ্মি শুষে নেওয়া। সূর্য্যদেব ওপর থেকে অজস্রধারে পৃথিবীর ওপর কিরণ ঢালছেন। সে কিরণে রয়েছে প্রচুর আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি। সূর্য্যালোকের এই আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি পরিমিত ভাবে এলে আমাদের প্রভূত উপকার করে কিন্তু অতিবাড় কোন কিছুরই ভাল নয়, ওই জিনিষটাই বেশী এলে হয় মারাত্মক। ওজোন এই অতিরিক্ত রশ্মির কতকটা শুষে নেওয়ার ভার নেওয়ায় আমরা রেহাই পেয়েছি।

দূর আকাশে আর একটা জিনিষের প্রাবল্য আছে। পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন 'কসমিক্ রে' বা আকাশ-রশ্মি। এই অদ্ভুত রশ্মি নিয়ে আজকাল খুব গবেষণা চলেছে। জিনিষটি যেমন শক্তিশালী এর প্রাচুর্য্যও তেমনি আমাদের পক্ষে ভয়াবহ, কারও কারও মতে একেবারে প্রাণঘাতী। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচে এই রশ্মি বড় বেশী আসতে পারে না; ঘরের ছাদ যেমন করে উপরকার আলো আটকিয়ে রাখে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারও তেমনি ধারা এই কস্‌মিক্ রশ্মিকে ঠেকিয়ে রাখে—নইলে হয়তো আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারত। শুধু তাই নয়, এই ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের একটা অংশকে (ডাঙ্গা থেকে ত্রিশ

মাইল (দিনে ৎও ষাট মাইল ' রাত্রে)এর মধ্যে) রেডিও-ছাদও বলা যেতে পারে। তোমরা হয়তো জান রেডিও বা বেতারে সংবাদ পাঠানো হয় ইথারে কতকগুলো ঢেউএর সৃষ্টি করে। ইথারের ঢেউ ক্রমাগত উঠতে উঠতে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ঐ অংশে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে—মহাশূন্যে হারিয়ে যেতে পারে না। এরই ফলে বহুদূরে বেতারবার্ত্তা পাঠান সম্ভব হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬ মাইল্ পর্য্যন্ত উত্তাপ ক্রমশঃ কমতে থাকে—মোটামুটি প্রতি ৩০০ ফুটে ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট্, এই ভাবে। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচেকার স্তরের উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী থেকে প্রায় ৬৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট্ কম। কিন্তু আশ্চর্য্য, এর পরে যত উঁচুতে যাওয়া যায় উত্তাপ আর তেমন কমে না—বরাবর প্রায় একই রকম থাকে। অন্ততঃ ২৫ মাইল পর্য্যন্ত এই ভাবে চলে। কিন্তু আরও ওপরে উত্তাপ আবার বেশী হয়। নানা পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ডাঙ্গা থেকে ৬০ মাইল উপরের উত্তাপ বোধ হয় আমাদের ভূপৃষ্ঠের উত্তাপেরই সমান।

কিন্তু এত ক'রেও ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে সব কিছু খবর জানা যায় নি। পণ্ডিতেরা এখন বুঝেছেন সঠিক খবর পেতে হ'লে শুধু দূর থেকে যন্ত্র নেড়ে বা অঙ্ক কষেই তা সম্ভব হবে না, দস্তুরমত সশরীরে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে গিয়ে হাজির হ'তে হবে। সেখানকার অবস্থা নিজের চোখে দেখতে হ'বে,—মাল-মশলা হাতে-নাতে পরীক্ষা করতে হবে। তাও কি সম্ভব ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে অসম্ভব কিছুই নয়। শুনলে অবাক্ হবে, এ দুঃসাধ্য কাজেও তাঁরা হাত দিতে ছাড়েন নি। যাঁরা এ কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের সকলকার কথা বলা এখানে সম্ভব হবে না—শুধু কয়েকজনের নাম উল্লেখ করব।

বেলুনে চড়ে আকাশের উঁচু স্তরে পৌঁছবার চেষ্টা মানুষ অনেক দিন থেকেই করে আসছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রাণ বিপন্ন করে আকাশে ওঠার রেওয়াজ বর্ত্তমান যুগেই সুরু হয়েছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গ্লেশিয়ার ও কক্সওয়েল সাহেব এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম আকাশে ওঠেন। বেলুনের নীচে একটা বেতের ঝুড়ি মত বসান থাকে, তার নাম গণ্ডোলা। আরোহীরা এইখানেই বসে। এই

বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বেতের ঝুড়ির বদলে চারদিক্ ঢাকা গণ্ডোলা ব্যবহার করেন। গ্লেশিয়ার অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বটে কিন্তু খুব বেশী ওপরে উঠবার আগেই তিনি আব্‌হাওয়ার পরিবর্ত্তনে অজ্ঞান হয়ে পড়েন, কাজেই ঠিকমত পরীক্ষা করা আর হয়ে ওঠে নি।

১৮৭৫ সনে টিসেনভিয়ার নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক দু'জন সঙ্গী নিয়ে আকাশে যাত্রা করেন। এঁকেও কম বিপদে পড়তে হয় নি. সঙ্গী দু'টি তো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারাই পড়েন। টিসেন্‌ভিয়ার তাঁর অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেমন ভয়াবহ তেমনি বিস্ময়কর। বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার ফলে দেখতে দেখতে তাঁর নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৭৫ বার থেকে ১১২তে এসে ঠেকে। ক্রমে সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে আসে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—কোন রকমে তিনি বেলুন নামিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।

পিকার্ড্ সাহেবের বেলুন আকাশে রওনা হচ্ছে।

এর পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক আকাশ-অভিযানে রওনা হন। ডাক্তার বারসন, সুরিং, ডিবর্ট্, গ্রে, সুসেক প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই দুরন্ত অভিযানে এঁদের কাউকে কাউকে প্রাণও হারাতে হয়।

ক্রমে বেলুনের বদলে এরোপ্লেনে চড়ে ষ্ট্র্যাটো-স্ফিয়ার অভিযানও সুরু হল। কিন্তু দেখা গেল এরোপ্লেনের চাইতে, অত উঁচু আকাশে উঠতে, বেলুনই বেশী সুবিধাজনক।

বেলজিয়ামের অধ্যাপক পিকার্ডের নাম তোমরা শুনেছ। তাঁর কথা তোমরা রামধনুতে আগেও পড়েছ। ইনি এলুমিনিয়াম্ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা বলের মত গণ্ডোলা তৈরী করলেন, এমন ভাবে করলেন যাতে তার

ভিতর বাইরে থেকে বাতাস না ঢুকতে পারে, ভিতর থেকেও বাতাস না বেরোতে পারে। ভিতরে বসে বাইরের দৃশ্য দেখবার জন্য পুরু কাচের পর্দ্দার ব্যবস্থা রইল। গণ্ডোলার ভিতরে নানা রকম যন্ত্রপাতি আর প্রচুর অক্সিজেন নিয়ে তিনি তাঁর সহকারী কিপ্‌ফের সাহেবের সঙ্গে গণ্ডোলায় ঢুকলেন। তাঁর বেলুনের ব্যাস ছিল ১০০ ফুট; তার সাত ভাগের একভাগ মাত্র গ্যাসে ভর্ত্তি করা হ'ল—যাতে উঁচু আকাশে আব্‌হাওয়া বদলে গেলে গ্যাস আয়তনে বেড়ে বেলুন না ফাটিয়ে দিতে পারে। ১৯৩১ সনে জার্ম্মেনী থেকে তাঁদের বেলুন আকাশে উঠল,—একেবারে ডাঙ্গা থেকে ৫২,০০০ ফুট (প্রায় দশ মাইল ওপরে। সেখানকার বাতাসের চাপ ভূপৃষ্ঠের উপরকার চাপের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই অভিযানে পিকার্ড্ সাহেব ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করেন; নানা রকম নমুনা সংগ্রহ করতেও কসুর করেন না। এর পর তিনি আরও একবার আকাশ অভিযানে বেরিয়েছিলেন।

১৯৩৩ সনে দু'জন আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক, সেট্‌ল্ ও ফর্ড্‌নি, বেলুনে ডাঙ্গা থেকে ৬১,২৩৭ ফুট (প্রায় ১১½ মাইল) ওঠেন। তার পর এণ্ডারসন্, ষ্টিভেন্‌স্ ও কেপ্‌নার (এঁরাও আমেরিকান্) প্রচুর যন্ত্রপাতি সহ ৬০,৬১৩ ফুট ওঠেন। এঁরা বেলুন ফেটে যাওয়ায় ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন। কোন ক্রমে প্রাণ নিয়ে বেঁচেছিলেন বটে কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলো বাঁচাতে পারেন নি। শুধু খুব দামী দামী ২।৪টা মাত্র যন্ত্র প্যারাশুটে বেঁধে নামিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এর পর রাশিয়ান্ বৈজ্ঞানিক বির্ণবাউস, প্রোকেফিয়েভ্ ও কন্‌ষ্টান্‌টাইন্ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৬২,৩৪০ ফুট উঠলেন, এবং এণ্ডারসন্ ও ষ্টিভেন্‌স্ (আমেরিকার) উঠলেন ৭৪,১৪৭ ফুট—অর্থাৎ ডাঙ্গা থেকে প্রায় ১৪ মাইল উঁচুতে। এঁদের বাহাদুরীর কথা ভাবলে অবাক্ হতে হয়। এঁদের গণ্ডোলার ওজন ছিল প্রায় ২০০ মণের কাছাকাছি। কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে এঁরা যে সব তথ্য যোগাড় করেছিলেন তা খুবই মূল্যবান্। ১৪ মাইল্ উপরে সে রশ্মি নাকি ডাঙ্গার উপরকার রশ্মির চাইতে প্রায় ১৫০ গুণ তীব্র। এঁদের সংগৃহীত ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে তোলা বিভিন্ন ফটোও বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে কম মূল্যবান্ নয়।

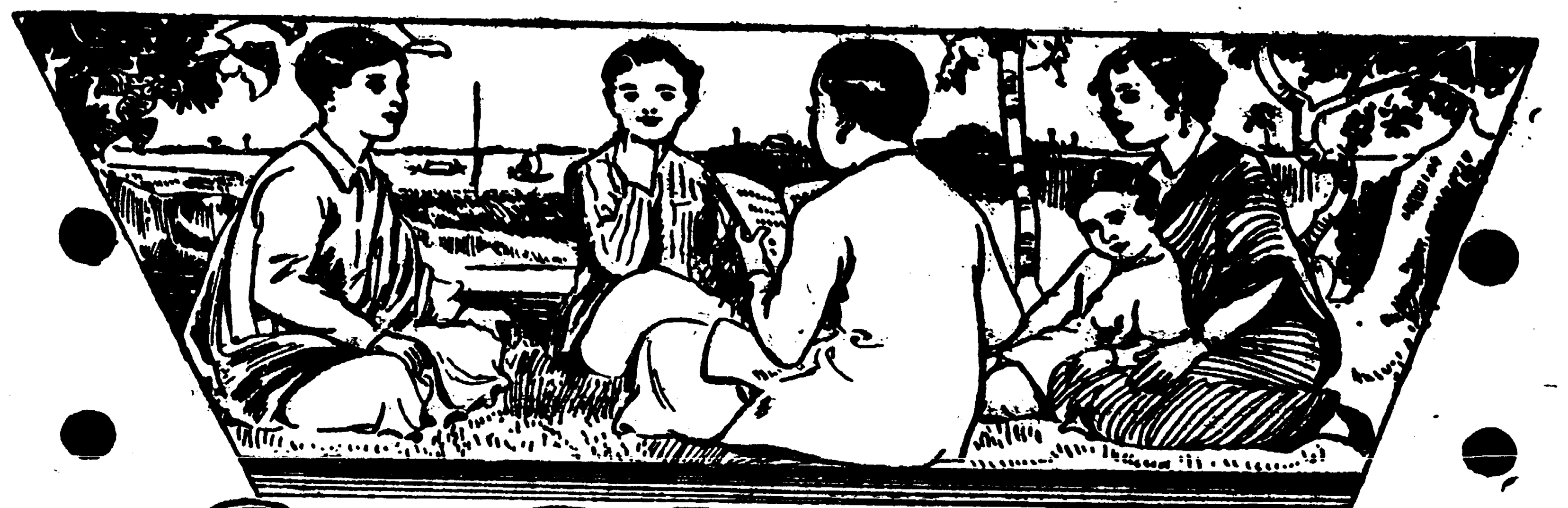

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

শরণ

[তুলসীদাস অবলম্বনে]

শ্রীরবিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়

উজান জলে
    মৎস্য ধায়,
হাতীর দল
    ভাসিয়া যায়।

শরণ লয়
    যে জন যার
রাখে সে লাজ
    সদাই তার।

"স্বপন-কাজল প'রিয়া চোখে"

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

দু'নয়ন ভ'রে প'রেছ কি কবি স্বপন-কাজল রঙেতে ভরা,
আঁক কি শুধুই স্বপনের ছবি, সুখের ছন্দ র'য়েছে ধরা?
সুখ দিতে পার যে আছে গো সুখী, হৃদয়-ভুলানো মিষ্টি সুরে,
সুখ দিতে পার দুখময় প্রাণে? নাহি কি তোমার দৃষ্টি দূরে?
তোমারি পাশেতে কত শত প্রাণী মরে অনাহারে, মরিছে রোগে,
চাহে নাক কেহ তাহাদের পানে, দারুণ জ্বালায় যাহারা ভোগে।

শিশু-সন্তান পায় না আহার, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিছে ধুঁকে,
পাশে আছ তুমি মরীচিকা সম, রঙীন কবিতা লেখ যে সুখে।
বাঁচাতে তোমারে যুদ্ধে যারা ঐ রণাঙ্গনেতে জীবন দানে,
তাহাদের গাথা পার কি লিখিতে, জান রণভেরী বাজাতে প্রাণে?
ফুলের সুবাসে হ'য়ে উচ্ছল লেখ যদি শুধু কবিতারাশি,
ব্যথিতের ব্যথা যদি নাহি বোঝো, ফুটাতে না পার তাদের হাসি,
স্বপন-কাজল প'রে শুধু চোখে আঁক যদি ব'সে স্বপন-ছবি,
কথামালা গেঁথে কিবা ফল লভ, নহ তুমি কবি, নহ গো কবি।

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই

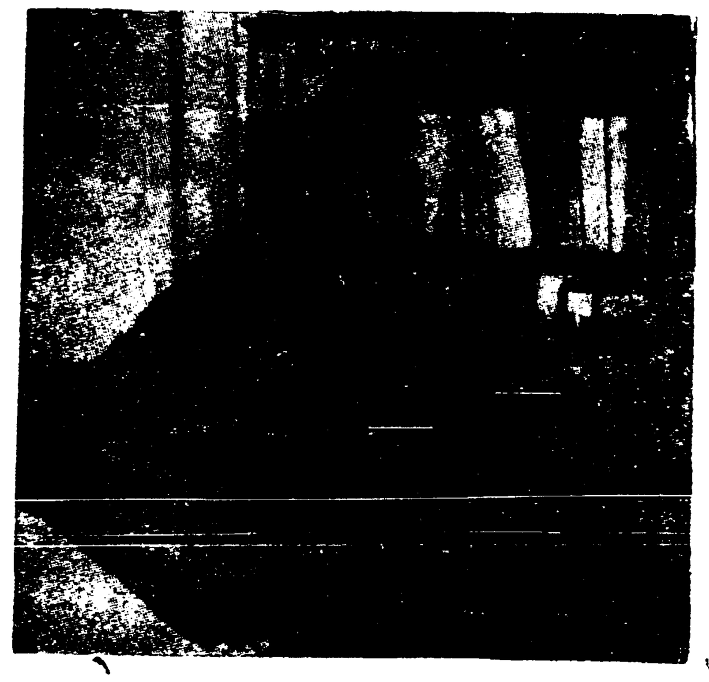

পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। এ বছর (মাঘ, ১৩৭৭—পৌষ, ১৩৪৮) রামধনুতে যে সব 'লেখা' প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে তোমার মতে সব চেয়ে ভাল ৫টি গল্প, ৫টি কবিতা ও ৫টি প্রবন্ধের নাম লিখে পাঠাবে। সমস্ত মিলিয়ে ভোট নেওয়া হবে এবং যার তালিকা এই ভোটের তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে তাকে বিনামূল্যে এক বছর রামধনু পাঠান হবে। রচনা ২০শে পৌষের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। তালিকার সঙ্গে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

চিঠিপত্র

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পৌষ মাসের 'রামধনু' তোমাদের হাতে পৌঁছে দিলাম। এই সঙ্গে রামধনুর বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হ'ল। আসছে মাসে সে ১৫ বছরে পড়বে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে কাগজ সংগ্রহ করা এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজের দাম যে শুধু অস্বাভাবিক রকম বেড়েছে তা নয়, অতিরিক্ত দাম দিয়েও প্রয়োজন মত কাগজ সংগ্রহ করা যাচ্ছে না,—বাজারে যা কাগজ পাওয়া যায় চাহিদার তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রচুর। এরই ফলে মাঝে মাঝে আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিক ১লা তারিখে পত্রিকা প্রকাশ হয়ে উঠছে না, ২।৩ দিন দেরী হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও তা হ'তে পারে। আশা করি গ্রাহকেরা অবস্থা বুঝে এ ত্রুটী গ্রহণ করবে না।

কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার দরুণ রামধনুর পৃষ্ঠা-সংখ্যাও সামান্য কমানো হয়েছে। ছবির ব্লক সম্বন্ধেও তাই। এ না করলে 'রামধনু'র দাম বাড়াতে হ'ত, এবং বর্ত্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এত বেড়েছে এবং বাড়ছে যে সব দিক দেখে আপাততঃ আমরা আর গ্রাহকদের ব্যয়ের বোঝা না বাড়ানই যুক্তিযুক্ত মনে করছি। তবে ভবিষ্যতে কত দূর কি গড়াবে বলা বড় কঠিন।

এ সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও রামধনুর পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টার ত্রুটী হবে না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখায় আগামী বছরের রামধনুরও প্রতিটি সংখ্যা সমৃদ্ধ করবার ব্যবস্থা থাকবে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখা ধারাবাহিক উপন্যাসও থাকবে। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা দূর হলেই পৃষ্ঠা-সংখ্যা আবার বাড়ানো হবে।

রামধনুকে তোমরা কি রকম ভালবাস আমরা জানি। আগামী বছরও তোমাদের সেই স্নেহদৃষ্টি থেকে রামধনু নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকবে না।

—রাঃ সঃ

সন্দেশ

সম্প্রতি ভারতের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল্ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ভারতের অধিকাংশ নাম-করা বিশ্ববিদ্যালয়ই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। ফাইন্যাল হয় কলকাতা আর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। এই খেলাটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। একদিন ড্র (২-২ গোলে) হবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ৩-১ গোলে জয়ী হয়ে ট্রফী পাবার গৌরব অর্জ্জন করে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও (রণজী ট্রফী) সুরু হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন দেশ এতে যোগ দিয়েছে। দুর্দ্ধর্ষ নবনগর দলকে এবার বোম্বাইএর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। বাংলা দল বিহার দলকে মাত্র ১ রানের দৌলতে হারাতে পেরেছে। প্রতিযোগিতা এখনও চলছে।

* * *

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি একেবারে নতুন পথে

অগ্রসর হয়েছে, তা বোধ হয় সকলেই জান। জাপানীরা আমেরিকান্ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। জার্ম্মান্ ও ইটালিয়ান্‌রাও তাদের সহায়—তারাও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীময় এখন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়্‌ল। প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন, হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে, হংকংএ, মালয়ে, সিঙ্গাপুরে এখন প্রবল যুদ্ধ চলেছে। ইংরেজদের সুবিখ্যাত ব্যাট্‌ল্‌শিপ্ 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স' ও ক্রুজার 'রিপাল্‌স' সিঙ্গাপুরের কাছে জাপানীরা ডুবিয়ে দিয়েছে। 'হারুণা' নামে জাপানীদের বিরাট্ যুদ্ধজাহাজও আমেরিকান্‌রা ডুবিয়েছে। এত দিন আমাদের দেশ থেকে যুদ্ধ দূরে ছিল, জাপান যোগ দেওয়ায় যুদ্ধ আমাদের ঘরের পাশে এগিয়ে এল। কলকাতায় বিমান-আক্রমণের আশঙ্কাও বাড়্‌ল।

ওদিকে রাশিয়ার রণক্ষেত্রেও যুদ্ধের গতি ফিরে গেছে। রাশিয়ান্‌রাই এখন জার্ম্মান্‌দের উপর পাল্‌টা আক্রমণ চালাচ্ছে এবং একটি একটি করে জায়গা পুনরুদ্ধার করছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) রামগড় (২) ভূটান (৩) আরব (৪) আলবেনিয়া (৫) আমেরিকা (৬) বেনারস (৭) শ্যাম (৮) এশিয়া।

উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল :—কল্যাণব্রত দাশগুপ্ত (বর্দ্ধমান); উষসী সেনগুপ্তা (ঢাকা); মনীষা, প্রতিমা, রতন ও অশোক (গৌহাটী); জামগ্রাম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (জামগ্রাম); রঘুনাথ, নীহার, অন্নপূর্ণা, প্রতিমা, অশোক, সোমনাথ (ভাগলপুর); অশোক দত্ত (কলিকাতা); শীলা, অশোক, প্রভাত, অমিয়, অমিতাভ (ভবানীপুর); অমল, বিমল, নিতু, জীবন (জলপাইগুড়ি); বাণী ও নেবু (ভবানীপুর)।

আংশিক :—শান্তি, ভঁদু, গণেশ, জেম্‌স (গয়া); সুনন্দা সেন (বরিশাল); গৌরী, ময়না, গণেশ, রণজিৎ বসু (ধুবড়ী); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগচী (বালুভরা); কাকীমা, বড়দি, প্রতিভা, মাষ্টার বাবু (তেজপুর); সুশীলচন্দ্র নিয়োগী (আদমদীঘি); অমিয়াংশু; নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, সৌরীন্দ্র, কনকেন্দ্র, শোভা, গৌরী, মা-বাবা (নিমপুরা); জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা); রেবা সেন (নিউদিল্লী); সেবা, ছোটকু, অন্নদা বাবু, হরিপদ বাবু, বাপ্পা (করিমগঞ্জ); কুমারী রেখা ও ধীরা চ্যাটার্জ্জি (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার

এমন একটি সংখ্যা বার কর যার ৮টিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে যোগ করলে যোগফল ঠিক ৫০০ করা যায়।

বাহির হইয়াছে

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্

হুকা-কাশির

বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

আজই একখানি কিনিতে ভুলিও না।

সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট

দাম মাত্র আট আনা

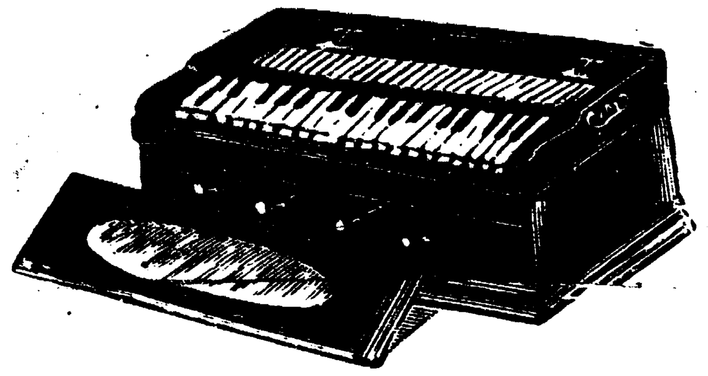

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং-র

হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

অরগ্যান কোং

৬।১১, রসা রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

একখানি চাই-ই

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত

বদ্যিনাথের বড়ি

অজস্র ছবি অজস্র হাসি

অজস্র মজা

দাম আট আনা

মৌচাক বলেন :—

"ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে। এই রকম নূতন ধরণের হাসির গল্প ছেলেমেয়েদের যে খুব ভাল লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড্, কলিকাতা

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে

Regd. No. C—1641

শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

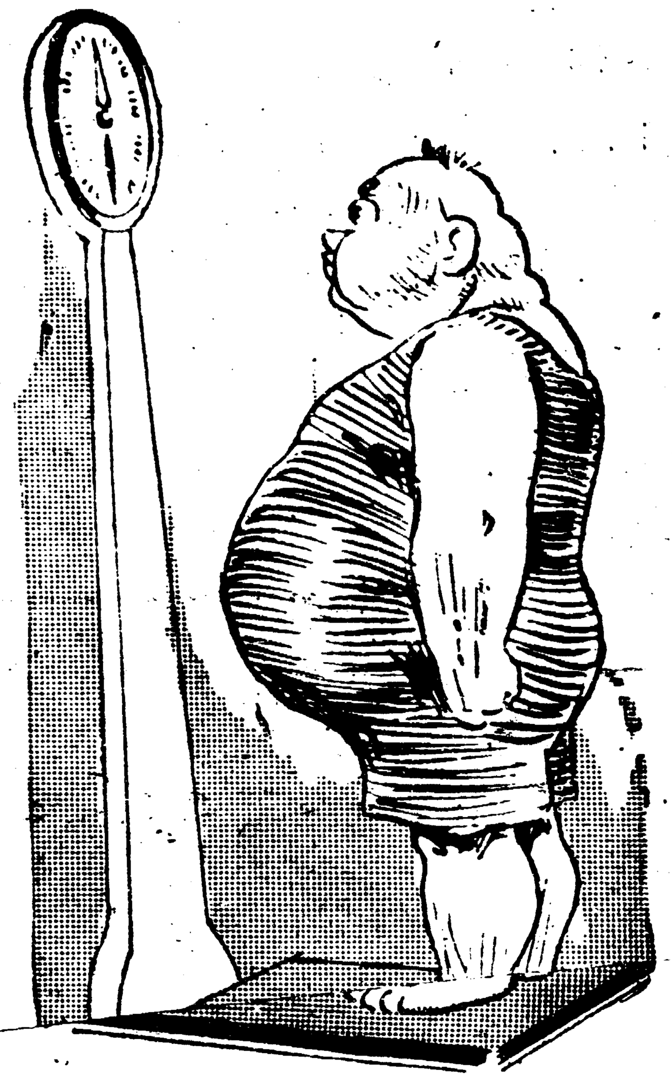

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী
ঘি'এর মত কিছুই নয়।
খাঁটী ঘি বলতে

লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলি: ৩৬৬০

Cover: C. H. Aran & Co.

VOLUME

ENDS.

১৫শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৮ | প্রথম সংখ্যা

রামধনু

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

কার্য্যালয়

১৬, টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বার্ষিক ২॥৵৹ | প্রতি সংখ্যা।৹

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৶০, ষাণ্মাসিক ১৷৶০; [illegible]। ভি, পি, চার্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তেল ব্যবহার করুন
২৪৩, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা
ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ডোঙ্গরের বালামৃত সেবনে
দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
অল্প-দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য
লাভ করে।

=কয়েকখানি উপহার দিবার বই=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

জীবন ও সাহিত্য—সর্ব্বজন প্রশংসিত উচ্চাঙ্গের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী। মূল্য—১৲

আবিষ্কার যাত্রী—(Heroes of Exploration) মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১।০

৺অমরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

বাংলার নবরত্ন—(Nine Gems of Bengal) শ্রীঅপরাজিতা বসু কর্ত্তৃক সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য—॥৶০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত

কাশ্মীরের কথা—বহু চিত্র শোভিত ৬০

শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত

আচার্য্য শঙ্কর—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) মূল্য—॥৶০

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা রাধারাণী রায়ের

রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা

ভারতের দুইটী বীরাঙ্গনার পবিত্র জীবন কথা
মূল্য—।০ ইংরাজীতে মূল্য—।০

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বীর ... ১।০ **বাংলার বীরাঙ্গনা** ... ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

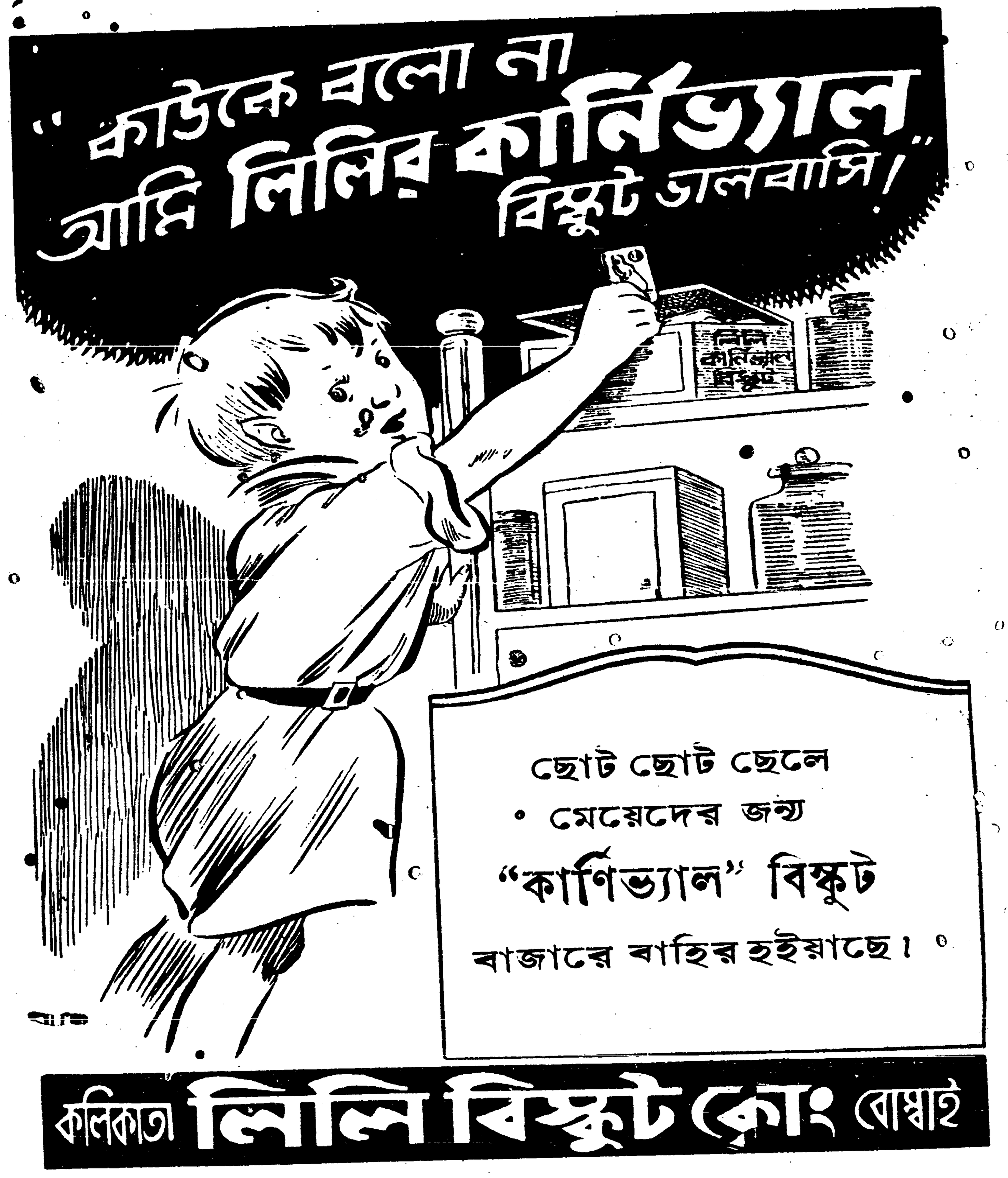

—কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ—

(রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ ডিটেকটিভ্ শিশু উপন্যাস)

প্রতি মাসেই বাহির হইতেছে— :: —প্রত্যেকখানি আট আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। অন্ধকারের বন্ধু
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২। ছিন্নমস্তার মন্দির
শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। বিজয় অভিযান
শ্রীবুদ্ধদেব বসুর
৫। ছায়া কালো-কালো
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
৬। রাত্রির যাত্রী

শিশু-সাহিত্যে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম দান

৭। হারাণো বই

প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

৮। জীবন্ত সমাধি

—আমাদের প্রকাশিত এ বৎসরের নূতন বই—

শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী, এম্.এ প্রণীত
স্বর্গে থিয়েটার (পৌরাণিক গল্প) ৷৷৵০
শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প
(ভূতুড়ে গল্পসঞ্চয়ন)— ১।০
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
দেড়শো খোকার কাণ্ড
(শিশু-উপন্যাস) ১৲
শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
(কৌতুক কথা) ৸০
শ্রীযুক্ত নিখিলেশ সেনের
রোমাঞ্চকর কাহিনী (ছোট গল্প) ৷৷০
শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়ের
ছেলেধরা সার্কাস (শিশু উপন্যাস) ৷৷৵০
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
দানবীর কার্নেগী (জীবনী) ৷৷০

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের
প্রতাপসিংহ (ছেলেদের নাটক) ৷৷০
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর
আকাশগঙ্গা (ভ্রমণ কথা) ৸০
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
তাতারের বন্দী (বৈদেশিক গল্প) ৸০
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
বিষের তীর (শিশু উপন্যাস) ৷৷০
নিশির ডাক (শিশু উপন্যাস) ৸০
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের
বোম্বেটে-দ্বীপ (শিশু উপন্যাস) ৸০
সোনার পাখী (ছোট গল্প) ।৵০
শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর
ঋষি অরবিন্দ (জীবনী) ৷৷০
শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের
হারানো দিন (শিশু উপন্যাস) ১৲

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

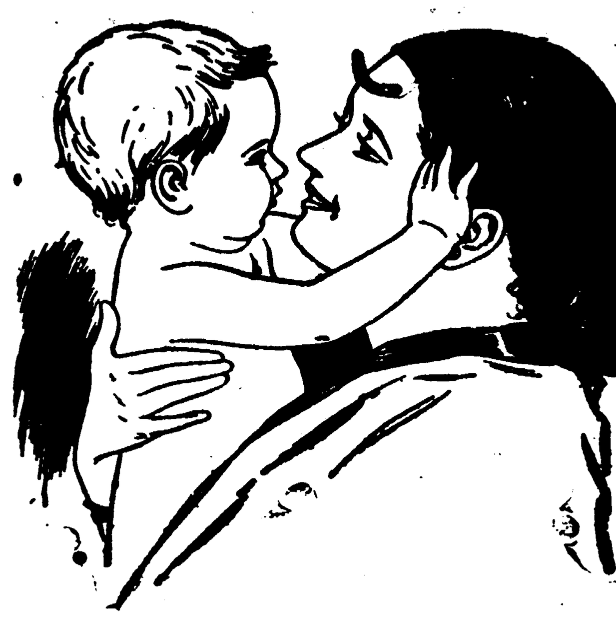

* প্রচুর ফেন
* স্নেহময় স্পর্শ
* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

—আমাদের ছেলেমেয়েদের নূতন বই—

নগেন্দ্রনাথ দত্তের **কুমড়োপটাস**
তোমাদের পরিচিত জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাহিনী নিয়ে লেখা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ
বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথায় ভরা।

ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়ের
রাতের বিভীষিকা
রাতে যারা ভয় দেখায়—তাদের কথায় ভরা।

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর
হরেক রকম
বইখানা শিশুচিত্তের খোরাকে ভরপুর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের **বিজ্ঞানের অ, আ**
বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলি গল্পের ছাঁচে লেখা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রর
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন?
সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই।

কালিদাস রায়ের **জাতকমালিকা**
গৌতমের পূর্বজন্মের কথা।

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর **দুর্গমপথের যাত্রী**
আবিষ্কার ও ভৌগোলিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
যা সকলে চায়
ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

এ, এন, ব্যানার্জ্জি
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক। আর, এন, দাস রোড্, ঢাকুরিয়া দক্ষিণ কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
স্মৃতিরঞ্জিত

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র
মাসিক পত্র

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এস্-সি

পঞ্চদশ বর্ষ (মাঘ, ১৩৪৮—পৌষ, ১৩৪৯)

কার্য্যালয় :—১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সূচীপত্র

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
অঙ্ক শেখার মজা (প্রবন্ধ) …	শ্রীঅজিতলাল ঘোষ, বি.এস.সি …	১৭৮
অদ্ভুত অভিজ্ঞতা (সত্য ঘটনা) …	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি …	৪৩০
অনাদৃত (কবিতা) …	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্	১৬১
অনেক—অনেক দূরে …	শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় …	৪০০
অভাব (কবিতা) …	শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় …	১৯৬
অভিভাষণ (ঐ) …	অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম্.এ …	৩৮৬
অযাত্রার জীবনযাত্রা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ …	১২৬
অশথচারার মিনতি (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ …	৩৭১
অষ্টমী পূজোর দিন (গল্প) …	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় …	২৭
অসি বাজে ঝন্ ঝন্ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর …	১৩৩, ৫০, ৯৫, ১৪৯, ১৬৩
আওতে-আরোয়া (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ …	৪২০
আজগুবি খেয়াল (প্রবন্ধ) …	শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ …	১৮৭
আফ্রিকার জঙ্গলে (ঐ) …	শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ …	৫
আমার মামার কাহিনী (গল্প) …	শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী …	১১
আমার স্বর্গ (কবিতা) …	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় …	৬১
আমেরিকার একটি ছোট্ট ছেলে (জীবন-কথা)	শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় …	৩২৬
আষাঢ় এল (কবিতা) …	শ্রীআশীষকুমার লাহিড়ী …	২০১
আসামে ঘড়িয়াল শিকার (শিকার-কাহিনী)	শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত …	২৬৭
একটি অদ্ভুত হ্রদ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি …	৪৬২
একটি রহস্যময় চুরি (গল্প) …	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় …	১৪০
একটি সত্যিকার বীরের কাহিনী (জীবন-কথা)	শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ …	২৮৬
এক বিন্দু নয়নের জল (গল্প) …	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি …	৩৩০
এক যে ছিল ফুলের পরী (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় …	৩২১
কণ্টক (গল্প) …	শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ …	১৫৫
কলকাতার কুকুর (ঐ) …	শ্রীশামুক …	৩৪৬